সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ যুগ পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

সম্পাদক

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৮শ বর্ষ

শ্রাবণ ১৩২৯—আষাঢ় ১৩৩০

বার্ষিক মূল্য সডাক- -৩

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট
৪৪ডি, পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইণ্টালী কলিকাতা

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

উপাসনা প্রেস,
শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,
৪৪-ডি, পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালি কলিকাতা।

সূচীপত্র

১৮শ বর্ষ

শ্রাবণ ১৩২৯—আষাঢ় ১৩৩০

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
অবন্তী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি	২৪৩
অনন্তে [কবিতা]	সুধীরচন্দ্র সরকার	২২
অগ্নিপরীক্ষা [উপন্যাস]	বিনয়ভূষণ সরকার বি-এ, বি-টি,	৬০, ১১১, ২১৯, ৩৩১, ৪২৩, ৪৮৬, ৫৫৭, ৬৫২, ৬৮১
অপাংক্তেয় [গল্প]	" সরোজ নাথ ঘোষ	১৮৯
অরুবৌদি [গল্প]	" সত্যরঞ্জন বসু বি-এ	২২৪, ৩৬১
অভাগিনী [গল্প]	৺মোক্ষদাকুমার বসু বি-এ	২৩৫
অজ্ঞাতরহস্য [কবিতা]	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ	৪১৬
অনাহূতা [গল্প]	শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	১৫৬
আগমনী	সম্পাদক	১৩৮
আলোচনী	"	১, ১৪৫
আস্তানা [কবিতা]	মতিন উদ্দীন আহমদ	১৮১
আর্টহিসাবে সাহিত্যের বিকাশ	শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী বি-এ	৩৮৭
আকর্ষণ [কবিতা]	" শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ	৫৪৯
আর্ট ও ভাবুকতা	" অতুল চন্দ্র দত্ত বি-এ	৬২১
আফিং খোরের জাগ্রৎস্বপ্ন	" সুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬৬
আষাঢে প্রবাসে [কবিতা]	" সুধীরচন্দ্র রায় বি-এল	৭৩০
ইউরোপ শান্তির পথে	" হৃষীকেশ সেন	১৮০
ইব্‌সেন্‌	" অতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ	৫০৯
ইন্দুস্মৃতি	" সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৬৬৯
ইতিহাস	" বিশ্বমোহন সান্যাল	৬৭০
উমার বিদায় [কবিতা]	" গোবিন্দলাল মৈত্রেয়	১৪১
উদাসী [কবিতা]	" বুদ্ধদেব বসু	১৮৭
ঋতুউৎসব [কবিতা]	" বিষ্ণুরাত সেন বি-এল	৩০০

একখানি চিঠি [গল্প]	শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী বি-এ	৪০৬
কবির পণ [কবিতা]	৺শরদিন্দুনাথ রায় বি-এ	৯৮
কুয়াসা [কবিতা]	" হেমচন্দ্র বাগচী	১০৩
কি যেন কি বলতেছিলাম [কবিতা]	" কালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর	১৮২
কল্পনা [রূপ কথা]	" অশোক চন্দ	২৭৮
কর্ম্মতত্ত্ব	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী	২১২, ৩৫৮, ৪৩০, ৫৫১, ৬২৮, ৬৯৮
কলকতা গেল		৪৮১
কুলটা [গল্প]	শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী বি-এ	৫৯৪
কালবৈশাখী [কবিতা]	" প্রদীপ্তানন্দ	৬০৪
কবি [কবিতা] অধ্যাপক	" পবিমল কুমার ঘোষ এম-এ	৬৬৬
কাঠের শুঁটীর ব্যবহার	" নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বি, এস-সি	৩৬
গ্রামের পথ [কবিতা]	" চণ্ডীচরণ মিত্র	১২৫
ঘোষক [কবিতা]	" গোবিন্দলাল মিত্র	১৭০
ঘুমরানী [কবিতা]	" পার্ব্বতীমোহন রায়	২৫৬
চোর [কবিতা]	" অমরেন্দ্রনাথ বসু	১১৬
চিরপ্রিয়া [কবিতা]	" সুশীলকুমার মজুমদার বি-এ	২৮৪
চিরআদরিনী [কবিতা]	" সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৭২৩
চন্দ্রশেখর স্মৃতিসম্মান	" শ্রীহেমাঙ্গপদ বরাট	৩৪৮
জার্ম্মেনীতে বাঙ্গালী বন্দী	" অনন্তকুমার সান্যাল	৯৯
জোঁকের গায়ে জোঁক [গল্প]	" বিনয় ভূষণ সরকার বি টি	১৬৫
জ্যোৎস্নালোকে [কবিতা]	" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২২
জামাই বাবু [নক্সা]	" উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ	৪৯৯
জবাব দিহি [কবিতা]	" সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	৫২৪
জীবন সঙ্গীত [কবিতা]	" সুবোধ রায় বি-এ	৫৪২
জাতীয় শিক্ষার কথা	" সুভাষচন্দ্র বসু বি-এ [কেম্ব্রিজ]	৫৫৮
জীবনের অধিকার [কবিতা]	" সুবোধ রায় বি এ	৫৭৭
ঝঞ্ঝা [গল্প]	" অশোক কুমার চন্দ	১৯৯
টোলপ্যাসেঞ্জার [কথানাট্য]	" সুবোধ রায় বি-এ	৬০৫
তর্পণ [গল্প]	" হেমন্ত কুমার সরকার এম-এ	১৮৬
তরুণের আহ্বান	" সুভাষচন্দ্র বসু বি-এ	২৬৯

তর্পণ	[কবিতা]	শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার ভাদুড়ী বি-এ	২৭৪
তীর্থধন্য		শ্রীমতী সরোজ বাসিনী দেবী	৩২৮
তামাকু-তত্ত্ব		শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত বি-এ	৪৯৬
তীর্থ ও অনর্থ		" অতুল চন্দ্র দত্ত বি-এ	৬৬০
তমাল	[কবিতা]	" মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৭২১
তোমরা ও আমরা		" কালিদাস রায় বি-এ কবিশেখর	২১৬
দুর্দ্দিনে	[কবিতা]	" অক্রুর চন্দ্র ধর	৭৬
দত্তক	[গল্প]	" শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য	১০৫
দ্বিজেন্দ্রলাল	[কবিতা]	" খগেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৮৯
দায়িত্ব কার কাছে ?		" হৃষীকেশ সেন	৫৮৯
দুনিয়ার কথা		" দেবীকুমার গোস্বামী	৬০১
দোসরা বাদল		" যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৪
দেড়বছরের খোকা		" চণ্ডীচরণ মিত্র	২৭৭
নিরাশ্রয়	(গল্প)	" পরেশ চন্দ্র মজুমদার বি-এ	১২৪
নব-আগমনী		" সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	১৩৭
নৈসর্গিক অধিকার		" অমূল্য কুমার ভাদুড়ী বি-এ	১৭১
নারীর জীবন সত্য		" বারীন্দ্র কুমার ঘোষ	১৮৩
নীরব দান	(কবিতা)	" পাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায়	২৩১
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল		" হৃষীকেশ সেন	২৪০
নন্দিতা	(গল্প)	" প্রিয় কুমার গোস্বামী বি-এ	২৮৬
নারীর ক্রন্দন		" বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়	৩৬৯, ৪০৮
নির্ব্বাণে	(কবিতা)	" মুনীন্দ্র নাথ ঘোষ	৪৫৪
নাস্না	(গল্প)	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৬৪৪
নারীর পূর্ণ বিকাশ		" মহামায়া দেবী	৬৭৯
নবজীবন	(গল্প)	" প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৬৮৫
নারীর শিক্ষা		" শিশিরা দেবী	৬৯৪
নারীধর্ম্ম		শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৯

পঞ্চামৃত

(১)	বাস্তব ও ভবিতব্য	শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত	৪৬
(২)	জাপানের খবরের কাগজ		৪৯
(৩)	ভোগের অনাচার	আচার্য্য " প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	৫০, ১৩১
(৪)	বিজয়া		২৫৭

(৫) ভাগবত বিধান ২৫৭
(৬) সাহিত্যে স্বাধীনতা ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল ২৬১, ৩০১
(৭) নব জাগরণ ২৬৪
(৮) ছোটলোক ” কিরণ শঙ্কর রায় বি-এ [অকস্‌ফোর্ড] ৩০৩
(৯) বিলাতের কথা ” বিপিন চন্দ্র পাল ৪৩৪
(১০) আমার দেশ ৪৩৯
(১১) সাহিত্যিকের খেয়াল ৪৬১
(১২) মানুষের গুপ্ত শত্রু ৪৬২
(১৩) ইজিপ্টের নারীশক্তি ৪৬৩
(১৪) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ৪৬৬
(১৫) গ্রাম্য সমাজ বলিবে কি করিয়া ৪৬৮
(১৬) রাজ বন্দীয় জবানবন্দী কাজী নজরুল ইসলাম ৪৭০
(১৭) ত্যাগ শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার ৭৩১
প্যারিসের পাড়ায় পাড়ায় ” বিনয় কুমার সরকার এম-এ ৭
পুষ্পচয়ন (কবিতা) ” চণ্ডীচরণ মিত্র ৮৬
পথশ্রান্ত (গল্প) শ্রীমতী নৃসিংহ দাসী দেবী ৮৭
প্রকৃতির রাজ্যে বিজ্ঞানের অধিকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বি-এস-সি ১৫১
পাগলের ডায়েরী ১৪২, ৩৮৫, ৫৪৪, ৬১১
প্রেম (কবিতা) ” বিষ্ণুরাত সেন বি-এল ২৪২
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ জীবন শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম-এ ২৭৪
পর্দ্দানশিন (গল্প) ” প্রভাত কিরণ বসু ৩৫০
পাড়াগাঁ ” নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য বি-এল, ৩৫৪, ৪৩২ ৪৫৫
পাহাড়ের পথ ৺ মোক্ষদা কুমার বসু বি-এ ৩৬৭
প্রকৃতির পরিহাস শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৩৮১
পল্লীসম্পদ (কবিতা) ” রেবতীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯৪
প্রেমের বন্ধন (কবিতা) ” বিষ্ণুরাত সেন বি-এল ৪০৫
প্রবাসীর শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক ৪৪৫
প্রলয়নৃত্য (কবিতা) ” সুবোধ রায় বি-এ ৪৫৮
পৌত্র (গল্প) শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৩৩
পরিচয় (কবিতা) শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় বি-এ ৬২৫
পিয়াসী (কবিতা) ” শ্যামাপদ সরকার ৬৫১
পুস্তক সমালোচনা ৭১, ৩০৬, ৫০৫, ৬১৫, ৭২২

বর্ষারাণী (কবিতা)		শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার ভাদুড়ী বি-এ	১২০
বিগ্রহী প্রেম (কবিতা)		" দ্বিজেন্দ্র নাথ বাগচী	১৪৩
বিশ্বকাব্য (কবিতা)		" গোবিন্দ লাল মৈত্র	১৫০
বাদল বেদন		" অমরেন্দ্র নাথ বসু	২০২
বিবাহে পণপ্রথা		" সুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩২
বৃন্দাবনে (কবিতা)		" মুনীন্দ্র নাথ ঘোষ	২৭৯
বাঞ্ছিত (কবিতা)		" "	৩৬৭
বঙ্গনারী (কবিতা)		" সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়	৪৮৩
বঙ্গের ভিক্ষুক		" রাধারমণ দাস	৪৮২
বিদ্রোহী (কবিতা)	অধ্যাপক	" পবিমল কুমার ঘোষ এম-এ	৬১০
বসন্তের আবির্ভাব		স্বামী প্রদীপ্তানন্দ	৬৩৮
বন্ধু ও শত্রু (কবিতা)		শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক	৬৫৯
বর্ষামঙ্গল (কবিতা)		" সুবোধ রায়	৭০৩
বাঙ্গলায় কথা		ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ-ডি-এল	৭০৪
ভাববার কথা			১৮, ৫৮৫
(১) ভুক্ত ভোগীর কর্ত্তব্য		শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	১৮
(২) বধূ নির্য্যাতনের পালা			৫৮৫
(৩) বাঙ্গালায় শিশু মৃত্যু			৫৮৬
(৪) সমবায়			৫৮৭
ভারতের সাধনা		শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম-এ	৭৩, ৩০৮
ভ্রষ্টাচরিত্রা (কবিতা)		" যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬৯৪
মাসিক কাব্য সমালোচনা		পঞ্চভূত	১৩৫, ২৬৫, ৩১১, ৩৭৩
মানুষের গান (কবিতা)		শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ লাহিড়ী	১৯৮
মুক্তিপথে		" সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	২০৪
মাতিও ফলকানি (গল্প)		" মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ	২৪৭
মুঞ্জলিকা (গল্প)		" অশোক কুমার চন্দ	৩৯৫
মুক্তিপথে		" সুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৭
মজুর (কবিতা)		মোহন	
মুরলী (কবিতা)			
মঞ্জরী			৪৪০, ৫০১, ৫৬২, ৫৮২, ৬৬৫,
মেয়ের মা রূপ (কবিতা)		" চণ্ডীচরণ মিত্র	৩৫৭
রুদ্রমঙ্গল (কবিতা)		" অচ্যুত কুমার সেন	৪৮৫
রথযাত্রা (কবিতা)		স্বামী প্রদীপ্তানন্দ	৬৪৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি	(কবিতা)	শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ	১৫
শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ		শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী,	২৩, ৮৮
শিল্প কলা বিজ্ঞান		শ্রীযুক্ত মন্মথ ধন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২১
শরৎ দুর্য্যোগ	(কবিতা)	” সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২০৫
শোক সংবাদ			২৬৫
শুভক্ষণে	(কবিতা)	” সরসী কান্ত দত্ত এম-এ	৪২৯
শ্বশুর বাড়ীর যাত্রী	(গল্প)	” দ্বিজরাজ ঘোষ	৫২১
শৃঙ্খলিত	(কবিতা)	” সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়	৬৩৫
শিক্ষা		” হৃষিকেশ সেন	৬৯৬
স্মৃতিতর্পণ	(কবিতা)	” হরিপ্রসাদ মল্লিক	৩৫
সন্ন্যাসিনী	(কবিতা)	” দয়ানন্দ চৌধুরী	৪২
সন্ধ্যায়	(কবিতা)	” বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ	১০৯
স্ত্রীশিক্ষা		” রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
সখ্য	(কবিতা)	” বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
সহধর্ম্মিনী		” রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৯
সন্ধি		” সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৫৬৫
সাহিত্যে সুপ্ত চৈতন্য		” রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পি, এইচ-ডি	৫৭৮
সংশয়	(কবিতা)	” সরসী কান্ত দত্ত এম-এ	৫৮২
সুর	(কবিতা)	” অবনী কুমার দে	৫৯৮
হরতন	(গল্প)	অধ্যাপক ” মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম এ	৪৩
হজরত মহম্মদের মহত্ব		মৌলভী মঈন উদ্দীন হোসয়েন	৫৯
হারধন	(কবিতা)	” সরসী কান্ত দত্ত এম-এ	
হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্র লাল ও অমৃত লাল		” উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ	১৭৫
হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম্মে যুগ সমস্যা		৺ শরদিন্দু নাথ রায়	৩১৭
হাড়জোড়া	(গল্প)	” দ্বিজরাজ ঘোষ	৪৭৪
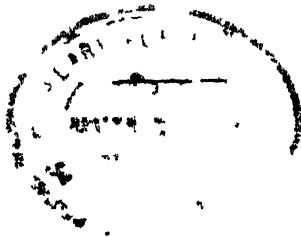
> "সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার,
> অকূল হতে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
> লক্ষ যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২৯ | ১ম সংখ্যা

আলোচনী

মজুরের কাহিনী

বিদেশী মজুর

বর্ত্তমানযুগে আমাদের দেশের কল কারখানাগুলির কুলী মজুরদের জীবন আদৌ স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক নহে। কলের কুলী মজুরগণ সাধারণতঃ কৃষককুল হইতে আসে। স্ব স্ব ভরণপোষণোপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এবং বাড়ীতে নিয়মিত কিছু অর্থ পাঠাইয়া যখনই তাহারা কিছু অর্থের সংস্থান করে তখনই তাহারা আবার দেশে ফিরিবার সুযোগ খুঁজে। দেশে তাহাদের প্রত্যেকের সামান্য কিছু জমি জায়গা আছে মাত্র। তদ্দ্বারা নিজের ও সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ অসম্ভব দেখিয়া অবশেষে তাহারা কলে চাকরী করিতে আসে। প্রথমতঃ তাহারা গ্রামস্থ মহাজনগণের নিকট ঋণ করিয়া চাষবাসের চেষ্টা করে। তাহাতে সুফল করিতে না পারিয়া অধিক ঋণজালে জড়িত হয়। অবশেষে মহাজনের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দলে দলে কাজের চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কদাচিৎ তাহাদের পরিবার সঙ্গে আসিয়া কল কারখানার নিকটস্থ বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বোম্বাই প্রদেশের কাপড় ও তুলার কলের—ঘাটিজাতীয় কুলীগণ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। অল্প সংখ্যক কুলী বাংলা দেশের কয়লার খনিগুলিতে কাজ

করিতে আসিয়া তাহাদিগের পরিবার সহ স্থায়ীভাবে বাস করে। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকজাতীয় শ্রমিক চাষের বা ফসল কাটিবার সময় নিজ নিজ স্বদেশে ফিরিয়া যায়। বাংলা দেশের পাটকলের কুলী মজুরগণ সাধারণতঃ সারণ, চাম্পারণ, বালীয়া এবং যুক্ত বা বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আসিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মকালে ফসলের সময় পুনরায় দেশে ফিরিয়া যায়। এই সমস্ত কলগুলিতে স্থানীয় মজুরের সংখ্যা অতীব অল্প। এমন কি এক তিন অংশেরও কম বলিলেই হয়। হাওড়া সহরের লোক সংখ্যা ১৭৯,০০০, তাহার মধ্যে দুয়ের তিন অধিবাসীর জন্মস্থান হাওড়া জেলার বাহিরে। অর্থাৎ সমগ্র লোক সংখ্যার মাত্র শতকরা ৪০ জন বাঙালী, ৫২ জন পশ্চিমদেশীয় এবং ৩ জন উড়িয়া। দূরদেশ হইতে আসিবার সময় কুলীমজুরেরা তাহাদের পরিবার বাড়ীতে রাখিয়া আসে, সেই কারণে হাওড়ায় প্রতিহাজারে মাত্র ৫৬২ জন স্ত্রীলোক আছে। ১৮৭১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন স্ত্রীলোক কিন্তু শতকরা ১১০ জন পুরুষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বস্তির ভিড়

গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই কতকগুলি কারখানার সহরের লোক সংখ্যা অদ্ভুত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১০ বৎসরে বাংলা দেশের মধ্যেই ভদ্রেশ্বরে দ্বিগুণ, টিটাগড়ে তিনগুণ ও খড়্গাপুরের লোক সংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক জনতা এবং স্বাস্থ্যহীনতা একেই অতি বিপজ্জনক তাহার উপর লোক সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্ত স্থানগুলি বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। মিলের কর্তৃপক্ষগণ অবশ্য পুচা বা কুচা কুলীদিগের জন্য ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ স্থান সংকুলান হয় না। যেখানে সকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয় ও ৭-৩০ মিঃ, ১০টা ১২ ৩০ মিঃ, ৩টা ও রাত্রি ৮ ঘটিকা সে সমস্ত কলে বদলী হইবার সময় এবং যেখানে কুলীমজুরদিগকে এই সময় ধরিয়া ১০ ঘণ্টা কার্য্য করিতে হয় সেরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া মিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে বস্তিগুলিতে ভিড় না হইয়া পারে না। আবার অধিকাংশ কলেই প্রচুর পরিমাণে চুক্তির কাজ হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুলী চুক্তিতে কাজ করে কলওয়ালাগণ তাহাদের বাসস্থানের জন্য দায়ী নহেন। মিলের কর্তৃপক্ষগণ ঠিকা কুলীর সর্দ্দারদিগকে মিলের নিকটবর্ত্তী কিছু জায়গা নিষ্কর প্রদান করিয়া থাকেন। সর্দ্দারগণ এই সমস্ত স্থানে ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কুলীদিগের নিকট হইতে খাজানা লইয়া বাস করিতে দিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই খাজানা আবার অত্যধিক হইয়া পড়ে। এই ঘরগুলি খুব সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময় এবং সেখানে আলোক বা রৌদ্র প্রবেশ করিতে পায় না বললেই হয়। তাহার চারিপার্শ্বে আবার ময়লা জমা হইয়া বা ছড়াইয়া থাকে। এইরূপ অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় ছোট ছোট ১॥ খানি কুঠরীর খাজানা সাপ্তাহিক ১।৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা। প্রতি ৬০ জন লোকে মাত্র একটী পায়খানা এবং তাহারই জন্য প্রত্যেককে সপ্তাহে ⁄১০ পয়সা করিয়া খাজনা দিতে হয়। হাওড়ার ৫নং ওয়ার্ডে প্রতি একরে ৯০ জন লোক বাস করে। ঢাকায় শাঁখারি বাজারে

সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতি বলিয়া আমরা জানিতাম। কিন্তু সেখানকার লোক সংখ্যা প্রতি একরে ৬১'৬। অতএব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে হাওড়ার তুলনায় শাঁখারিবাজারের অবস্থা অনেক ভাল।

ঘনবাসের কুফল

বোম্বাই সহরে শতকরা ৭৬ জন লোক একখানি ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে বাস করে। সেখানে এইরূপ ১৬৬,০০০ বাড়ীর মধ্যে প্রতি কুঠরীতে গড়ে ৪'৪৭ জন লোক বাস করে। সাধারণতঃ কুলী মজুর শ্রেণীই এইরূপ বড় বড় চলে (chawl) এক এক কুঠরীতে বাস করে। তাহাদের জন্য এক এক তলায় মাত্র একটী করিয়া স্নানের জায়গা। কোন কোন স্থানে প্রতি ঘরে একটী করিয়া 'নাহান' বা মোরা দেখিতে পাওয়া যায়। ৫।৬ খানি ঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে বাস করে—এরূপ লোকের সংখ্যা সেখানে মাত্র ১'৪৩ এবং ১'৪৫।

কলিকাতার বস্তিগুলিতেও বড় ভীষণ রকমের ঘন বসতি আছে। সমগ্র কলিকাতা মহানগরীতে কুঠরী প্রতি ২'৫ জন লোক বাস করে। অবশ্য স্থানে স্থানে কম বেশী আছে। পার্ক ষ্ট্রীটে কুঠরী প্রতি মাত্র ১'৩ কিন্তু জোড়াবাগানে ৪৪ জন লোকের বাস। হিসাব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সাধারণতঃ কুলী মজুর শ্রেণীই বহু জনাকীর্ণ বারাক্ বা বস্তিগুলিতে বাস করে।

পৃথিবীর মধ্যে নিউইয়র্ক নগরই বহুজনাকীর্ণ বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু বোম্বাই নগরীর লোক সংখ্যা তদপেক্ষা আরও অধিক। এই হিসাবে কলিকাতা নগরীর লোকসংখ্যা ও ঘনবসতি কোন অংশে ন্যূন নহে। নিউইয়র্কে ঘর প্রতি দেড়জন লোক বাস করে বলিয়াই তাহা বহু জনাকীর্ণ এবং সেই হিসাবে মাত্র ৪৫ টী পরিবার সেখানে এইরূপ অবস্থায় থাকে। কিন্তু বাইকুল্লা এবং ওদ্‌ওয়াদিতে ঘর প্রতি যথাক্রমে ৪'৪৪ এবং ৫'৪৫ জন লোকের বাস। এমনকি মাণ্ডবী সহরে ঘরপ্রতি ১৫ ৭জন লোকও বাস করে তাহা আমরা জানি। এই ভীষণ বহুজনাকীর্ণতা ও ঘনবাসের অগণিত কুফল ও অনিষ্ট যে কত তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে।

এইরূপ বড় বড় নগরীর অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিয়া আমাদের দেশের পর্দ্দানসীন্ স্ত্রীলোকেরা অত্যধিক পরিমাণে যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হইতেছে। তন্মধ্যে আবার বালিকা ও যুবতীদের সংখ্যাই অধিক। বোম্বাই নগরী অপেক্ষা কলিকাতাতেই এরূপ রোগীর সংখ্যা বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নীচের তালিকাদৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু সংখ্যা

	কলিকাতা	বোম্বাই
স্ত্রীলোক	— ৩'৩,২৯	১'০২,২'২০
পুরুষ	— ১'৭,১'৬	'৪১,৩'২৪
অন্যপ্রকার হৃদ্‌রোগাক্রান্ত	—৮'০	—২৩'৯৭

কলিকাতা সহরে এই ভীষণ রোগ ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাদের মধ্যে ৬ গুণ, ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা যুবতীদিগের মধ্যে ৪ গুণ এবং ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ অধিক।

শিশু-মৃত্যু

এইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস শিশুদের পক্ষেও কম হানিকর নহে। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার ২৮০। অন্যান্য দেশীয় সহর ও নগরীর শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাও নীচে দেওয়া হইল।

হাজার করা শিশু-মৃত্যুর হার

		১৯১৪ ও তৎপূর্ব্বে।	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৯
ভারতবর্ষ	—	২০৯'৪	—	২০৬	—
বঙ্গদেশ	—	২০০	—	১৮৯	—
মাল্দ্রাজ প্রদেশ	—	১৮২ ৮	—	১৯৪	—
ফ্রান্স	—	১৬৬	—	—	—
গ্রেটব্রিটেন	—	১৪৫	—	—	৮৯
ডেনমার্ক	—	১৩৮	—	—	—
সুইডেন	—	১৩০	—	—	—
নরওয়ে	—	১০৪	—	—	—
আয়র্ল্যাণ্ড	—	৯৭	—	—	—
কলিকাতা	—	২৮২	২৪৯'১	২৪৯ ০	—
বোম্বাই	—	৩২৫	৩৮৮	৪০৯'৬	—
মান্দ্রাজ নগরী	—	৩০৮	২৬৫	২৭৭'৩	—
বাঙ্গালোর	—	১৯৬'৮	—	—	—
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	—	২৬৫'৩	—	১২৭	—
লণ্ডন	—	১০০	৮৯	—	৮৫
বার্মিংহাম	—	১২২	১০৪	—	—
ম্যাঞ্চেষ্টার	—	১২৯	১১১	—	—
লিভারপুল	—	১৪০	১১৭	—	—
পোর্টসান্লাইট্	—	৭৮	—	—	—

কলিকাতা নগরীর কোন কোন স্থান অধিক শিশু মৃত্যুর জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে জোড়াবাগান অন্যতম। এই অঞ্চলের বসতি অতি ঘন ও এক একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি সরু গলিদ্বারা বিভক্ত। তাহার উপর লোকাধিক্য। রৌদ্র ও বাতাস এরূপস্থলে প্রবেশ করিতে পায় না। কাজেই শিশু বাসের পক্ষে এরূপ স্থান গুলি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সহরতলিগুলিতে যদিও ঘন বসতি নাই তথাপি এই সমস্ত স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি স্যাঁত্স্যাঁতে, অন্ধকার এবং দুর্গন্ধময়। কাজেই বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার সার, কৈলাস চন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতার ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের শিশু মৃত্যুর হার যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহা দেখাইয়াছেন।

৫নং ওয়ার্ড (জোড়াসাঁকো ও বড়বাজার)

	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
জন্ম — —	৭২৫	৭২৫	৮১০	৬৬৩	৭৫৬
মৃত্যু — —	৪৩২	৪৫০	৪৬২	৪৪৮	৪৩৬
জীবিতাবশিষ্ট [Balance living].	২৯৩	২৭৫	৩৪৮	২১৫	৩২০
হাজার করা মৃত্যুর হার	৫৯৫	৫৮০	৫৮০	৬৭৫	৫৭৭

৭নং ওয়ার্ড (আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট ও রাধাবাজার)

	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
জন্ম —	৩১৮	৩৮৫	৮১০	৩০৭	৩৪৫
মৃত্যু —	১৯৭	১৬৯	২১৫	১৫৫	১৬৬
জীবিতাবশিষ্ট —	১২১	২১৬	৫৯৫	১৫২	১৭৯
হাজার করা মৃত্যু —	৬২১	৪৩৯	২৬৫	৫০৫	৪৮১

১৯১৮ সালে সমগ্র বোম্বাই নগরীর শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ৫৯০'৩। কিন্তু কোন কোন বস্তিতে মৃত্যুর হার অধিক—ধোচিতালাও—৪৮১, কামাথিপুরা—৭০৩, নাগপদা—৭১৪ ও মাণ্ডবী—১০২৪। নিম্নের তালিকায় ঘর হিসাবে জন্ম মৃত্যুর হার বেশ বুঝা যাইবে—

		১ খানি ঘর ও তদ্রূপ স্থান।	২ ঘর	৩ ঘর	প্রতি ৪ ঘরে	রাস্তা	হাঁসপাতাল	মোট সংখ্যা। ১৯১৬
শিশুর জন্ম	—	১১,৪৪২	২,১১৭	৫১৫	৫৭৮	৩০	৪,০৫১	২১,৭৭৩
শিশুর মৃত্যু	—	১১,০৮১	১,০৫৬	১৯৩	১৩৮	৪০	৩২১	১২,৮২৯
শতকরা মৃত্যুর হার	—	৭৬'৭২	৪৯'৮৮	৩৭'৪৭	২৩'৮৭	১৩৩'৩৩	৭'২৯	৫৯ ০৩

উপরে লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে শিশু-মৃত্যুর হার অকুলান ঘরের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। জন্মস্থানের যত অসুবিধা মৃত্যুর হার তত অধিক।

সয়তানের কুচক্র।

আমরা প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা ও বসন্ত হইতে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ করিলাম না। ইহা বলা বাহুল্য যে কল কারখানার সহরে মহামারী একবার উপস্থিত হইলে এমন বিভীষিকা হয় যে লোকে পলাইয়া বাঁচে। সেবারে যখন বোম্বাই সহরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিল তখন কুলী মজুরেরা মাছির মতন মরিতে লাগিল অথবা পলাইয়া গ্রামে গ্রামে ঐ রোগের প্রসার বৃদ্ধি করিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০,০০,০০০ লোক সেবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বোম্বাইএর 'চল' ও খিদিরপুরের বস্তিতে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ভয়াবহ হইয়াছে। যক্ষ্মা রোগের প্রসার জীবনী শক্তির সর্ব্বোতোমুখী ক্ষয় জ্ঞাপন করে। এই ভয়ানক ব্যাধি কুলী মজুরগণকে পাইয়া বসিয়াছে।

হাজার করা।

		নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের রোগে	সকল রকম রোগ হইতে
কোলার কয়লার খনি		৬'২৩	৫৬'৭০
বোম্বাই	—	১০ ৭৪	৩৫'০
মান্দ্রাজ	—	২'১ [যক্ষ্মা]	৩৯'৫
কলিকাতা	—	২'৩ [ঐ]	৩৫'০
বার্মিংহাম	—	১'২৮	১৪'১
লণ্ডন	—	১·৪৪ [ঐ]	১৫'০
লণ্ডনের বস্তি	—	৬'১০	১৬'২

উপযুক্ত আলো ও বাতাস অভাবে কুলী মজুরগণের দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। রোগের বীজাণু হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি কমিয়া আসে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেও উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা ভিন্ন বিশ্রাম ভোগ অসম্ভব হয়। তখন তাড়িখানা ও বেশ্যালয় হয় কুলী জীবনের একমাত্র আশ্রয়। কঠোর পরিশ্রম হইতে স্বাস্থ্য হানি, স্বাস্থ্য হানি ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রতিরোধ করিবার জন্য মদের নেশা, নেশা হইতে পাপ, পাপ হইতে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য হইতে কঠোর পরিশ্রম,—এইরূপে সয়তানের কুচক্র ক্রমাগত নির্ম্মমভাবে ঘুরিতেছে। উহার ভিতরে একবার পড়িলে আর নিস্তার নাই। সয়তানের এক রূপ কোথায়ও ফুটিলে সমগ্র সমাজ-শরীরে তাহার রূপ প্রকাশিত হইবে।

নিস্তারের উপায় এক। সমাজের জাগ্রত চৈতন্য, দারিদ্র্য, পাপ ও অবিচারের প্রতি মানুষের গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা। তাহাই নরনারায়ণের সুদর্শন চক্র হইয়া সয়তান হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার এক মাত্র সহায় ও আশ্রয়*।

প্যারিসের পাড়ায় পাড়ায়

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

[১]

প্যারিসের রাস্তাগুলা স্থাপত্য শিল্পের মিউজিয়ম। আমেরিকার কোনো সহরে পাথরের বা ধাতুর মূর্ত্তির এমন ছড়াছড়ি দেখি নাই। বাস্তবিক পক্ষে নিউইয়র্কে ও কলিকাতার চেয়ে বেশী মূর্ত্তি চৌমহনিতে অথবা আরাম বাগানে দেখা যায় না। লণ্ডনও এই বিষয়ে প্যারিসের নিকট সহজেই হার মানিবে। এতোআল-পাড়ায়ই (Etoile) যাই অথবা নাসিওঁ (Nation) পাড়াতেই যাই কঁকর্দ মহাল্লায়ই (Concorde) ঘুরি অথবা ত্রোকাদেরোর অঞ্চলে ঘুরি—ফরাসী ভাস্করদের হাতের কাজ সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে। তা ছাড়া ছোট খাটো স্কোয়ারেও—ছোট বড় সকল স্কোয়ারকেই প্লাস (place) বলা হইয়া থাকে—কোনো না কোনো মূর্ত্তি আছেই আছে।

মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ফরাসী জাতিভেদ করে নাই। যোদ্ধা বল যোদ্ধা পাইবে, বৈজ্ঞানিক বল বৈজ্ঞানিক পাইবে, ইস্কুল মাষ্টার দেখিতে চাও ইস্কুল মাষ্টার পাইবে, আর লেখক নাট্যকার ইত্যাদির ত কথাই নাই। বুল্‌ভার সাঁ জার্ম্যাঁ (Boulevard St. Germain) তে বিপ্লব-প্রবর্ত্তক দাঁতোঁর (Danton) মূর্ত্তি দেখিতেছি,

*সম্প্রতি প্রকাশিত "তুলনা-মূলক ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

বুলভার হওস্মানে দেখিতেছি বালজাকের (Balzac) চেহারা। যদি প্যারিসের রিয়ু [Rue], বুলভার ও অ্যাভনিউগুলার তালিকা করা যায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি রাস্তার ধারের অথবা প্লাস বা বাগিচার মূর্ত্তিগুলার তালিকা করা যায় তাহা হইলে গোটা ফরাসী সভ্যতার সকল প্রকার প্রতিনিধিকে এক জালে টানিয়া আনিতে পারি।

১৯১৪ সালে জঁ জরে [Jean Jaures] গুপ্ত ঘাতকের হাতে মারা পড়িয়াছেন। আজ কালকার ভাষায় বলিব যে, তাঁহাকে দুনিয়ার স্যোসালিষ্টরা ফ্রান্সের "লেনিন" জ্ঞানে সম্মান করিত। এই ধরণের বিপ্লববাদী চরমপন্থীর নামেও একটা অ্যাভিনিউ দেখিতেছি। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের এক ধুরন্ধর ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) ইতালীর ম্যাটসিনি, জার্ম্মানির কার্ল মার্কস্‌ ইত্যাদির তিনি ছিলেন সহযোগী। তাঁহার বিপ্লবকে বর্ত্তমান কালের বলশেভিক বিপ্লবের পথ প্রদর্শক বলিতে পারি। খাঁটিকথা, ফরাসী লুইব্লাঁ রুশ লেনিনের আধ্যাত্মিক জনক। সেই সেই লুইব্লাঁও ফ্রান্সের রাস্তায় বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ভিক্টর হিউগোর নামে ত এক অতি প্রসিদ্ধ অ্যাভিনিউ আছেই। আর যথাস্থানে তাঁহার মূর্ত্তিও রক্ষিত হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার ঘর গুলাও বেনামী নয়। কোন ঘরের নামে রাষ্ট্রবীর তুর্গো [Turgol] বা গীজোর [Guizot] স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। দার্শনিক দেকার্ত্তে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ কীনে, [Quinet], মন্ত্রিবর রিশলিয়ো (Richelieu) অথবা ঐতিহাসিক মিশেলে [Michelet] অন্যান্য বক্তৃতাগৃহের নামকরণে বিরাজ করিতেছেন। মোটের উপর, ফরাসী বাহ্য জীবনের যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেশীয় মহাপুরুষগণের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। উঠতে বসতে প্যারিসের নর নারী তাঁহাদের চিরস্মরণীয় বীরদের মূর্ত্তি অথবা নাম দেখিতে পায়। প্যারিস সহরটা স্বয়ংই এই হিসাবে একটা খাঁটী মূর্ত্তিমন্ত ইতিহাস।

পাঁচ ছয় সপ্তাহের ভিতর ম্যাতাঁ [Matin] নামক দৈনিক কাগজে তিন চারটা খবর পড়িলাম ইংরেজ বিরোধী ভারত-ঘেঁশা। অন্য কোনো কাগজে,—যথা তাঁ [Temps] কিম্বা দেবা [Debats]—এই ধরণের সংবাদ এখনও বাহির হয় না। ফ্রান্সে যুদ্ধের জের এখনও থামে নাই কিনা। কিন্তু আমেরিকাতে আজ কাল নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সেও গরম গরম প্রবন্ধ না হ'ক বেশ চড়া সুরের সংবাদগুলা স্থান পাইতেছে।

সেদিনকার এক সংখ্যায় পড়িলাম যে মার্কিন রাষ্ট্রীর সব দল পাকাইয়া হোটেল ম্যাক আলপিনে [নিউইয়র্কের এক সেরা হোটেল] সভা করিয়াছে। সেই সভার উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতে রিপাব্‌লিক স্থাপনে সাহায্য করা ইত্যাদি।

এই ধরণের সংবাদ আর প্রবন্ধ যুদ্ধের সময়ে কেবল সোশ্যালিষ্ট "কল" [New York Call] কাগজে ছাপা হইত। "কল"-জাতীয় ফরাসী কাগজের নাম 'লিয়্যানিতে" [L'humanite]। এই কাগজে যুবক ভারতের স্বপক্ষে যা দাও তাই ছাপা হইবে বিনা বাক্যব্যয়ে। কর্ম্মকর্ত্তারা মানব-সেবক—নামেই প্রকাশ। খবর পাইলাম এই দৈনিকের কাটতি একলক্ষ মাত্র। ম্যাতাঁ কাটে রোজ দশ লক্ষ। "তাঁ" আর "দেবা"'র পশার বেশী নয়। মাত্র ৫০।৬০ হাজার। এই কাগজ দুইটা বিলাতী ও মার্কিন 'Times" এর

মাসতুত ভাই। অর্থাৎ বিপ্লববাদীরা এইগুলাকে ক্যাপিট্যালিষ্ট, বুর্জোআ, ইম্পিরিয়্যালিষ্ট বা ধন-সেবক, মজুর চাষার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপিপাসু, পরজাতিবিদ্বেষী এবং অবনত ও পরাধীন জাতির দুস্‌মন ইত্যাদিরূপে গালাগালি করিয়া থাকে। এইসকল কাগজে পরাধীন জাতির পক্ষে কোনো সংবাদ বাহির হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তথাপি যদি বাহির হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পরাধীন জাতির মধ্যেও খেলোয়াড় লোক আছে। অনেক দিনের "তদ্‌বিরের" ফলে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স বা প্যারিসের "দেবা" ইত্যাদি কাগজে মাতৃপিতৃহীন নরনারীর দীর্ঘশ্বাস প্রচারিত হইতে পারে।

শুনিতেছি রবিবাবু সম্বন্ধে এক আধটা ছোট খাটো প্রবন্ধ যা কিছু ফরাসিতে বাহির হইয়াছে সবই দৈনিক "হিম্যানিতে" কিম্বা সাপ্তাহিক "ক্লার্ত্তে" কাগজে। অর্থাৎ ফ্রান্সে ভারত সন্তানের কাজ সুরু হইতেছে মাত্র—সবে অ, আ, ক, খ, সাধা হইতেছে। জগদীশ চন্দ্র সম্বন্ধে বোধ হয় তিন লাইনের একটা সংবাদও কোনো ফরাসী কাগজে ছাপা হয় নাই। ফ্রান্সে এখনও দন্তস্ফুট করা কঠিন। তবুও রাস্তা ক্রমশঃ যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

[২]

আর্মিষ্টিসের পর দুইবৎসরের অধিক চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পুরান মিত্রেরা ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হইতে চলিল। পুরান শত্রুরা মিত্র-পদ-বাচ্য হইতে চলিল। এই পরিবর্ত্তনগুলা কোনো একদিনকার কোনো বিশাল ঘটনার প্রভাবে জগতে উপস্থিত হয় না। সবুরে কুড়াইয়া বেল পাকাইতে হয়। এই যে রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রতিদিন নয়া নয়া শক্তি গজাইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য ও হজম করিবার জন্য কোনো ভারত সন্তানের গতিবিধি দেখা যায় না কেন? যে দুচারজন লোক ভারতের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে রাষ্ট্রমণ্ডলের সরিষাগুলা কুড়ানো কি একমাত্র তাহাদেরই দায়িত্ব? আজও যুবক-ভারত রাষ্ট্রনীতির মারপাঁচ বুঝিতে অগ্রসর হইতেছে না। বড়ই বিস্ময়ের কথা। দুনিয়া যেমন যেমন বদলাইতেছে ভারতের কর্ম্মবীরদের নীতি ঠিক তেমন তেমন বদলাইতে হইবে। এই নীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাটা সমঝিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে হরদম লোকের স্রোত চাই দুনিয়ার নগরে নগরে। অমুক চন্দ্র অমুক মহাশয় যখন বিদেশে গিয়াছেন অথবা আছেন তাহা হইলে ভারতের যাহা কিছু দরকার সবই সাধিত হইতেছে—এই ধরণের খেয়াল কোনো চতুর লোক মাথায় স্থান দিতে পারে না। নয়া নয়া তাজা লেখক, চিত্রকর, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, উকীল, বক্তা, ছাত্র মাষ্টারের আমদানি করিয়া "বৃহত্তর ভারতের" লোক সংখ্যা মাস মাস বাড়াইতে হইবে। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার অন্য উপায় নাই।

একখানা মাসিক কাগজ প্যারিসে জাঁকিয়া উঠিতেছে। নাম La Nouvelle Revue Francaise. সম্প্রতি গ্রাহক সংখ্যা মাত্র ৪০০০। নয়া রোশনাইওয়ালা লেখকের রচনা এই কাগজে স্থান পায়। "প্রোগেসিভিক" সাপ্তাহিকের কাটতি ৫২,০০০ (নিউ ইয়র্কের "নেশুন" কাটে এক লক্ষেরও বেশী)। প্যারিসের L'Europe Nouvelle সাপ্তাহিকের গ্রাহক সংখ্যা দশহাজারে ঠেকিয়াছে। এই কাগজ তিনখানায় ভারত-বাসীর আসন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইগুলা একদম "হিম্যানিতে" "ক্লার্ত্তের"

মত্তন অধম-তারণ বিশ্ববন্ধু নয়। অর্থাৎ "সভ্য" সমাজের পাতে দেওয়া চলে। বিশেষতঃ "লা নুভেল রেভ্যি ফ্রাঁসেজ" টা ত নিতান্ত কেতাব ঘেঁশা লিখিয়ে পড়িয়ে লোক জনেরই মাসিক পত্র।

তাহা সত্ত্বেও এটাকে ফ্রান্সের 'ভদ্র" ঘরের লোকেরা অর্থাৎ "বুর্জোআরা" নিতান্তই র‍্যাডিক্যাল এবং প্রায় 'অস্পৃশ্যই বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। "অ্যাকাদেমী ফ্রাঁসেজ্— (Academie Francaise) পন্থী "রেভ্যি দে দো মঁদ" (Rivue des deux mordes) পত্রিকাকে যদি ফরাসী সাহিত্যের উত্তর মেরু বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে "নুভেল রেভ্যিকে" দক্ষিণ মেরু বিবেচনা করিতে হইবে। এই হিসাবে "অ্যাক্সিওঁ ফ্রাঁসেজ্" (Action Francaise) ও উত্তর মেরুই বটে। অর্থাৎ রেভ্যি দে দো মঁদের ছোট ভাই। বুড়া ফ্রান্সকে দখল করিতে হইলে এই দুই কাগজের লেখক হইতে হইবে। ছোক্‌রা ফ্রান্সকে হাত করিতে চাও ত দক্ষিণ মেরুর দিকে ঝুকিয়া পড়। "যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্।"

আনাটোল ফ্রাঁস (Anatole France) আমাদের পাঠক সমাজে অপরিচিত নন। ইনি ফরাসী অ্যাকাদেমীর—অর্থাৎ রিশলিয়্যো প্রবর্ত্তিত পরিষদের মেম্বর। ইহার দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে ইনি বুড়া ফান্সের প্রতিনিধি। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে,—ইহার "বাণী" একদম চরমপন্থী সোশ্যালিষ্ট দলের মন-মাফিক। তাহা সত্ত্বেও ইনি অ্যাকাদেমিতে স্থান পাইলেন কি করিয়া? কারণ রচনা হিসাবে ষ্টাইল হিসাবে, ইনি খাঁটি পুরান পথের পথিক। অর্থাৎ কর্ণেইয়ে (১৬০৬-৮৪, Corneille), মোলিয়্যার [১৬২২-৭৩, Moliere], রাসিন [১৬৩৯-৯৯, Racine] ইত্যাদি পূর্ব্ব সুরিগণ যে ধরণের রচনা পদ্ধতি কায়েম করিয়া গিয়াছেন আনাটোল ফ্রাঁস সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন।

কেবল ফ্রান্সে কেন, গোটা ইয়োরামেরিকায়ই নয়া রোশ্‌নাই বলিলে লোকেরা প্রধানতঃ বুঝে যুদ্ধবিরোধী, শান্তিপ্রিয়, মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বরাষ্ট্রের সেবক ইত্যাদি ধরণের নরনারীর খেয়াল। প্যারিসের ম্যার্সেয়্যো এই জাতীয় নয়া রোশ্‌নাই ছড়াইতেছেন, কবি লা রোশেল (La Rochelle) এবং গল্পলেখক বার্নিয়ে (Bernier) ইঁহারাও ম্যার্সেয়্যোর জুড়িদার। ইঁহারা কেহই বুর্জো-আদের প্রিয়পাত্র নন। যে সকল অভিজ্ঞতার ফলে ইয়োরামেরিকার চিন্তাশীল উদ্যমশীল চরিত্রবান্ করিৎকর্ম্মা যুবারা জাতীয়তার বিরুদ্ধে, লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিতেছে সেই সকল অভিজ্ঞতা ভারতে পৌছিতে এখনো দেরি আছে ভারতীয় মান্ধাতার আমলের তথাকথিত শান্তিপ্রিয়তা আর বিপ্লবী সোশ্যালিষ্টপন্থীদের শান্তিপ্রিয়তা এক বস্তু নয়। যুবক ভারত, প্রত্নতত্ত্ব ঘাঁটিয়া প্রচার করিতে বসিও না যে প্রাচীন উপনিষদেও সোশ্যালিজমের দস্তুর ছিল!

"স্যালোঁ দোতোনের স্থাপয়িতা ফ্রান্ত্স্ জুর্দ্যাঁ (Frantz Jourdain) স্বয়ং বাস্তুশিল্পী। এঞ্জিনিয়ারি কাজকর্ম্মে খ্যাতি যথেষ্ট। অধিকন্তু নানা সদনুষ্ঠানে ইঁহার হাত। সুকুমার শিল্পের একাধিক কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। পয়সাওয়ালা লোক—লেখকও বটে। শাঁজ এলিজে (Champs Elysees) বা "নন্দন কানন" মহাল্লার গ্রাঁ প্যালে [Grand Palais] ভবনে কয়েক বৎসর ধরিয়া শারদীয় বাজার বসান হইতেছে। এই বাজারে

বর্ত্তমান ভারতের শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত হইতে পারে কি? ফ্রাঁজ জুর্দ্যাঁ মহাশয় বলিতেছেন:—"নিশ্চয়ই হইতে পারে। অবশ্য আমরা আসল লোকের তৈয়ারি জিনিষ চাই। পুরানা ভারতের নিদর্শন আমরা দেখাইব না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির "দোআইয়াঁ বা ডীন লার্নোদ [Larnande] একটা টিকেট পাঠাইয়াছিলেন। আইনে ডিগ্রি পাওয়া যুবকদের কন্‌ভোকেস্‌ন দেখিলাম। লাল গাউন পরা অধ্যাপকদের আবহাওয়ায় খানিকক্ষণ কাটানো গেল। দেখিবার শুনিবার বিশেষ কিছু নাই। লার্নোদের বক্তৃতা হইল এক ঘণ্টা ধরিয়া। একদিন লার্নোদ বলিলেন:—"বর্ত্তমানে ভারত সম্বন্ধে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে।" আমি বলিলাম:—অবশ্য ভারতীয় অধ্যাপক আমদানি করা চাই।" ইনি বলিলেন:—"তাহাও সম্ভব।"

ফ্রান্সে কোন বিদেশী ডাক্তারকে চিকিৎসালয় চালাইতে দেওয়া হয় না! যদি কেহ এখানে ডাক্তারি করিতে চান তাঁহাকে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট লইতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাকে ছাত্রভাবে লেখা পড়া শিখিতে হইবে। কিন্তু রোজে [Rogar] বলিতেছেন:—"এই ধরণের পরীক্ষা স্বীকার করিয়াও আজ এক প্যারিসেই ২০০০ বিদেশী লোক ডাক্তারি করিতেছে। ভারতীয় ডাক্তাররা যদি স্বদেশে পাশ করিয়া এখানে আসেন তাহা হইলে আমাদের সার্টিফিকেট পাইতে হয়ত দু-এক বৎসর মাত্র ইস্কুলে পড়িতে হইবে। পূরাপূরি পাঁচ-ছয় বৎসর লাগিবে না। উচ্চতম বিদেশী ডিগ্রির অধিকারী হইয়াও কেহ ফ্রান্সে মেডিক্যাল লাইনে ডাক্তারী হইতে রেহাই পায় না!

কয়েকদিন মাত্র জগদীশচন্দ্র প্যারিসে ছিলেন। মিউজিয়াম দিস্তোয়ার ন্যাচুরেলের ডিরেক্টর মাঁজাঁ [Maugin] একটা বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছিলেন। এখানে লোকজন ছিল প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। আর একটা বক্তৃতা হইয়াছে ম্যুজে গীমে ভবনে। উদ্যোগকর্ত্তা ছিল "ফরাসী প্রাচ্য সুহৃৎ সমিতি।" দু-একজন বৈজ্ঞানিকও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ব্যার্থেলো (Berthelot) হন সভাপতি। নিতান্ত বিশেষজ্ঞ মহলে জগদীশচন্দ্র সুপরিচিত বটে,—কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্য দিন দিন এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, আর প্রত্যেক বিজ্ঞানে হোমড়া চোমড়ার সংখ্যা এত বেশী যে নিজ নিজ লাইনের বাহিরে কেহ কোনো লোকের নাম পর্য্যন্ত জানে না বলিতে পারি। তার পর বিদেশী পণ্ডিতদের কাজের সহিত পরিচিত থাকা ত আরও কঠিন ব্যাপার। কয়জন আমেরিকান্‌ ফরাসী-বৈজ্ঞানিকদের খবর রাখেন? আর কয়জন ফরাসীই বা আমেরিকান আবিষ্কারকদের নাম জানেন? কালেভদ্রে কোথাও কোথাও এক একটা আইনষ্টাইন (Einstein) আবির্ভূত হইয়া সারা জগতে আলোড়ন উপস্থিত করিতে সমর্থ হন। গৌরবের কথা, কোন কোন ইংরেজ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলিকে আইনষ্টাইনের কাজের সঙ্গেই তুলনা করিয়াছেন। যাক্‌ সে কথা এখন।

কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক আটপৌরে আবিষ্কারকের কৃতিত্বেই মানব সমাজ রোজ রোজ বাড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল আবিষ্কারক

বা বৈজ্ঞানিক বা গবেষণাকারীর অনুসন্ধান সমূহ জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করাও একটা বড় কাজ। এই জন্যই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার নগরে নগরে অধ্যাপক পাঠাইতেছেন। তাঁহারা ইয়াঙ্কির মুল্লুকে ফরাসী দর্শন কলা সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই মার্কিন মুল্লুক হইতেও মাষ্টার, ছাত্র, সওদাগর, সংবাদপত্রের সম্পাদক আসিয়া ফরাসী সমাজেও মার্কিন সভ্যতা প্রচার করিতেছেন। এই ধরণের সভ্যতা বিনিময়, আদর্শ-বিনিময়, অধ্যাপক-বিনিময় ও ছাত্র বিনিময় ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে।

আজকালকার দিনে পৃথিবীতে যতগুলা বৈজ্ঞানিক কাগজ ছাপা হইয়া থাকে প্রায় সকলগুলিতেই কম বেশী বিদেশী অনুসন্ধানের ফল সমূহ হয় প্রবন্ধাকারে না হয় সংবাদাকারে প্রকাশিত হয়। কোনো লাইব্রেরিতে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলি পড়িলেই যে কোনো ব্যক্তি জগতের সকল ল্যাবরেটারির, সকল হাঁসপাতালের, সকল কারখানার খবর সহজেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশ দেশান্তরে লোক পাঠানো আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় বসিয়া বসু-ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক পত্রিকায় তাঁহার অনুসন্ধানগুলি ছাপাইয়া দুনিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানকেন্দ্রে পাঠাইয়া দিলেই কাজ শেষ হইবে না। বৈজ্ঞানিক মহাশয়কে মাঝে মাঝে সফরে বাহির হইতে হইবে। যখন নিজে পারিবেন না তখন চেলাকে পাঠাইতে হইবে। কেতাবের নাম শুনিয়া অথবা কেতাব পড়িয়া মানুষ কতটুকু বুঝিতে পারে? চাক্ষুষ আলাপ না করিয়া কথাবার্ত্তা না বলিয়া তর্ক প্রশ্ন না করিয়া আন্দোলনে যোগ না দিয়া বাজারে হট্টগোলে হাতাহাতি না করিয়া মানুষ কখনো কোনো সত্যকে জীবন্তভাবে দখল করিতে পারে না। জগদীশচন্দ্রের সকল অনুসন্ধানের জন্যই এই শ্রেণীর জ্যান্ত সমালোচনা বা রক্তমাংসের "পরখ" আবশ্যক।

প্যারিসে সংস্কৃত জানা লোকেরা দেখিতেছি প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চীনা বা তিব্বতী ভাষা জানে। এক যুবক নামজাদা হইয়া উঠিতেছেন। ইহাঁর লেখা ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্ম্ম পত্রিকায় প্রায়ই বাহির হয়। ভারতবর্ষ ও চীন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থই ফরাসী ভাষায় সমালোচিত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক সমালোচনার নীচেই দেখিতে পাই মাসোঁ উর্সেলের [Masson-Oursel] নাম। চীনা ও হিন্দু তর্কবিজ্ঞানের সঙ্গে গ্রীক-তর্কবিজ্ঞানের তুলনা করিয়া ইনি একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ১৯১৭-১৮ সালের রেভিউ ফিলোজোফিকে [Revue Philosophique] ফরাসী-শেক্স্পীয়র মোলিয়্যারকে [১৬২২-৭৩] প্যারিস বাসীরা রিশলিয়োর গলির [Rue de Richelieu] বগলে একটা ছোট গলি দিয়াছে। অনতিদূরে বিব্লিওটেক ন্যাশন্যাল বা পাব্লিক লাইব্রেরি। দুই গলির মোড়ে মোলিয়্যারের খাড়া মূর্ত্তি। লেখা আছে যে মূর্ত্তিটা বসানো হইয়াছে জনসাধারণের চাঁদায়। পাশ কাটিয়া উপস্থিত হওয়া যায় রিভলি সড়কে [Rue de Rivoli]। কোনে পড়ে প্যালে রোইআল [Palais Royal]। এই বাড়ীটা ছিল ফরাসী-কৌটিল্য রিশ-লিয়োর ভবন। পরে এই প্রাসাদে বহু

বাদশা নবাবেরও বসবাস ঘটিয়াছে। আজ-কাল এখানে চাঁদনি চকের বাজার আর সরকারী আফিস। কয়েকটা ঘরে ফরাসী উপনিবেশগুলীর প্রাকৃতিক সম্পদের মিউজিয়াম। মাডাগাস্কার দ্বীপ, ইন্দোচীন, মরক্কো, আলজিরিয়া সাহারা ইত্যাদি জনপদের ধাতুজ, কৃষিজ ও অন্যান্য পদার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। এই ধরণের বিলাতী মিউজিয়ামটার কাছে অবশ্য এটা লাগে না।

রিয় দ' রিভলি পারিসের এক অতি প্রসিদ্ধ রাস্তা। বড় বড় দোকান আফিস ব্যবসাসংক্রান্ত হোটেল, রেষ্টরাণ্ট, কাফে, গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয়, তুইলারির [Tuileries] বাগান ও ভবন, লুভর মিউজিয়াম,—আর লোকজনের হুড়াহুড়িতে পাড়াটা গুল্‌জার্‌। এই রাস্তায়ই প্যারিসের টাউনহল বা ওতেল দ' ভিল [Hotel de Ville]। হোটেল (ফরাসী উচ্চারণে হ''লুপ্ত) শব্দে ফরাসীরা যে কোনো বড় বাড়ী, প্রাসাদ বা অট্টালিকা বুঝিয়া থাকে। এমন কি হাঁসপাতালও বুঝায়। যেমন l'hotel-Dieu বা "ল্োতেল দিয়ো" বলিলে সহরের সর্ব্ববৃহৎ আরোগ্যশালা বুঝিতে হইবে। প্যারিসের টাউনহলের নানা গৃহে স্থাপত্য শিল্পের বহু নমুনা রক্ষিত হইতেছে। বাড়ীটা আর বাড়ীর ভিতরটা দেখিবার জিনিষ। এইটা নূতন গড়া। ১৮৭১ সালের কমিউনিষ্ট পন্থী বিপ্লবীরা পুরানা টাউনহল জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার স্থানে আজকালকার ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মান রীতিকে বলে ফরাসী রেণেসাঁসের ঢঙ। ওতেল দ' ভিলের সম্মুখে ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে সেইনের ভিতরকার ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর দেখা যায় চিরপ্রসিদ্ধ মন্দির "নোত্‌র্‌দাম" [Notre Dame]। গির্জ্জাটা অতি পুরানা সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল যে সৌধটা দেখিতেছি তাহার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ৬০।৭০ বৎসর। "গথিক" নির্ম্মান ঢঙের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ প্যারিসের নোত্‌র্‌ দাম শিল্পী মহলে সুবিদিত। আর সাহিত্যিক মহলে ভিক্টর হিউগের উপন্যাস এই মন্দিরকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ হিউগের কলমের জোরেই "নোত্‌র্‌ দাম" আজ শিক্ষিত সমাজের আপনার জিনিষ।

ওতেল দ' ভিল হইতে বাস্তিয়্যের মনুমেণ্ট পাঁচ মিনিটের পথ। কোন লোক যদি এই মনুমেণ্ট হইতে রিয় দ' রিভলি দিয়া বরাবর হাঁটিয়া কঁকর্দ চৌমহনি পর্য্যন্ত আসে, আর তার পর শাঁজ এলিজে বুল্‌ভারের পথে সোজাসুজি এতোআল পাড়ার বিজয়স্তম্ভ "আর্ক দ' ত্রিয়ঁফ" [Arc de Triomphe] পর্য্যন্ত পৌঁছে, তাহা হইলে সে পাঁচ মাইল ধরিয়া এমন সড়ক দেখিবে যাহা দেশের দুনিয়ায় ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে না। বিলাসকে বিলাস, বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যকে ঐশ্বর্য্য, শিল্পকে শিল্প। মানুষ ইউরোপীয় সভ্যতার যত কিছু গৌরব একমাত্র চোখের সাহায্যে বুঝিতে চায় সবই এই পাঁচ মাইলের পথে মজুত। বোবার মতন হাঁটিলেও মনে হইবে বাস্তবিক এক গরিমাময় আবহাওয়াতেই পায়চারি করা হইতেছে।

যদি কঁকর্দ হইতে এতোআলের দিকে না যাইয়া সেইনের কিনারা দিয়া হাঁটিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলেও অল্পক্ষণের ভিতরেই উপস্থিত হইব গ্রাঁ প্যালে আর পেতি প্যালে [Petit Palais] নামক দুই বিরাট ভবনে। এইখানে এক সুনির্ম্মিত সাঁকো [আলেক-জাঁদার পুল] পার হইলে আসিয়া পৌঁছিব

নেপোলিয়ানের ... লিয়ানের "...... জানানো হইয়াছিল! তিনি নিজের কবর চাহিয়াছিলেন সেইনের কিনারায়,—আমরা যেমন অনেকে মরিতে চাই "গঙ্গাজীকে তটুপর।" সেন্ট হেলেনাতে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৪০ সালে কবরটা তুলিয়া আনা হয়, আর প্যারিসের দরিয়াতটে মহাসমারোহে পুনরায় গাড়া হয়। পাড়াটার নাম অ্যাঁভালিদ [Invalides]। এইখানে লড়াইয়ের আহত সৈন্য ও নাবিকদের প্রকাণ্ড ওতেল বা হাঁসপাতাল। এই সঙ্গে সমর মিউজিয়াম। অনতিদূরে "একল মিলিতেযার" বা সমর-বিদ্যালয় যেখানে ছাত্র ছিলেন নেপোলিয়ান। আর নিকটেই এফেল মনুমেণ্টের মাথায় তারহীন সংবাদের যন্ত্র। মোটের উপর দুই মাইল জমিন ধরিয়া এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই 'আবাহন মার যুদ্ধ ঝননে, তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে।" নেপোলিয়নের উইল মাফিকই কাজ করা হইয়াছে। তাঁহার কবর প্যারিসের আর কোন মহাল্লায় শোভা পাইত না।

কবরের গায়ে নেপোলিয়ানের সাধ খোদা আছে:—"Je desire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, ...ple francais ...র্শক মাত্রেই বলিবে ... সাধ পূর্ণ হইয়াছে। ... পাথরের নয় শুনিতেছি—কাঠের উপর সীসার কাজ। মাথাটা গিল্টি করা। কবরের ভিতর যুদ্ধের বৃত্তান্ত যেখানে চিত্রিত বা খোদিত দেখি সেখানে প্রধানতঃ ওষ্টার্লিট্‌স্‌ [Austerlitz] লড়াইয়ের কাহিনী পাই। এই যুদ্ধই ছিল নেপোলিয়ানের চরম কীর্ত্তি—যাতে জার্ম্মানি আসে ফ্রান্সের তাঁবে। বস্তুতঃ ১৮০৬ সালে নেপোলিয়ান ইউরোপের আধখানাই পকেটস্থ করেন। এত বড় সাম্রাজ্য পাশ্চাত্য মুলুকে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর আর স্থাপিত হয় নাই।

অবশ্য নেপোলিয়ানের একৃত্তিয়ার টিকিয়াছিল অল্পকাল মাত্র;—১৯১৬।১৭ সালের ভিল্‌হেল্মও পলকের জন্য জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সীমানা নেপোলিয়ানি বহরে বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র বাহুবলের উপর যে দিগ্‌বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার আয়ু নেহাৎ অল্প হইতে বাধ্য। সাম্রাজ্যলীলা অনেক দিন টিকিতে পারে, যদি তাহার পশ্চাতে ডিপ্লোমেসি বা ধড়িবাজি থাকে। কৌটিল্যের আমল হইতে লয়েড জর্জ্জ পর্য্যন্ত ইহাই রাষ্ট্রনীতির চরম বাণী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি)

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ওগো কবি,
তোমার জীবন-রবি
মহিমার তেজে দীপ্ত, অর্দ্ধ-গগণের উর্দ্ধে উঠি'
মধ্যাহ্নেই পড়িল যে লুটি
অসীম অনন্ত পারাবারে ;
আপনার বেদনারে
রক্ত রাগে ছড়াইয়া ক্ষুব্ধ তরঙ্গের দলে দলে
ডুবিল যে অস্তাচলে,
দিয়ে গেল বিদায়ের সর্ব্বশেষ দান
করুণা মাধুর্য্যে ভরা একখানি তরুণ পরাণ !

হে সত্য, সুন্দর
হৃদয় কন্দর
ছিল তব পরিপূর্ণ সতঃস্ফূর্ত্ত অনুভূতি-রসে,
আপনার বশে
রাখিয়া অভ্রান্ত দৃষ্টি, নিরখিয়া বিশ্ব চরাচর
শিল্পি তুমি, করেছ অমর
মোহন পরশ দিয়া যে অপূর্ব্ব 'তুলির লিখন'
পারে কি কখন্
আপনার পদতলে দলিবারে সর্ব্বধ্বংসী কাল ?—
বস্তুর কঙ্কাল
শুধু সে চূর্ণিয়া যায় রক্তরাঙা নখদন্তাঘাতে ;
বিমল প্রভাতে
যে জ্যোতি উজলি' উঠে বিনাশিয়া অন্ধকার রাশি
সে যে সত্য, সে যে অবিনাশী !—

আপনি উঠিলে জাগি আপনার বলে
জয়মালা গলে,
তূর্য্য নিনাদিয়া তুমি করিলে যে অমোঘ সন্ধান,
থর থরি ভয়ে কম্পমান
অনাচারী অবিচারী, মুহূর্ত্তেকে ছাড়িল বিপথ,
তব অভিযান-রথ
জয়-পত্রে বিভূষিত ঘর্ঘরিয়া চ'লে গেল, অপ্রধৃষ্য গতিবেগ তার
ভীষণ দুর্ব্বার !

অক্ষয় তোমার দান
তব 'তীর্থ সলিলের' স্নিগ্ধ ধারা অমৃত সমান ;
হাস্যরসে অভিসিক্ত তব 'হসন্তিকা'
ভাঙ্গিয়াছে তুচ্ছ অহমিকা,
'ইজ্জতের দায়ে' তুমি
আপন বুকের রক্তে অর্চ্চিয়া জনমভূমি
শুনালে যে বজ্র-গর্ভ বাণী,
বুকে নিলে টানি'
নিগৃহীত ভারত সন্তানে ;
প্রিয়তম জ্ঞানে
সত্যেরে করিয়া শ্রেয় মিথ্যারে গিয়াছ পায়ে দলে ;
'ফুলের ফসলে'
আপন মনের বীজ অঙ্কুরিয়া হরিৎ-শোভায়
ফুলে ফুলে বিকাশিয়া তায়,
ফলে পরিণত হয়ে দিল দেখা ;
এমনি ভাগ্যের লেখা,
গান্ধীরে বন্দিয়া তুমি, করি স্বজাতির 'নান্দী' পাঠ,
রাখিয়া বিরাট
ক্ষোভের গৈরিক জ্বালা মাতৃযজ্ঞ-হুতাশনময়
তুমি গেলে,—কে দিবে অভয় ?

সবারে শুধাই

নাই তুমি ? সত্য তুমি নাই ?

বিশ্বাস না মানে মন, বলে মন আছ তুমি আছ,

বুঝি রচিয়াছ

কর্ম্মকোলাহল হ'তে, লোকলোচনের অন্তরালে

আপন ভবন খানি, ছায়াসুপ্ত দিকচক্রবালে !

নর নারী গাহে তব জয়

এ নহে বিস্ময় !

শত কণ্ঠে তুলি সুর গাহে তব গান ;

লোভে কম্পমান

রাত্রি যামী

ছিনু আমি,—

কি গাহিব ? কি শুনাব ? কি জানাব হৃদয়ের ব্যথা ?

আমি জানি মোর অক্ষমতা !

তাই যবে,

শ্রান্ত পদে ঘরে ফিরে গেল সবে

রাখিয়া উদ্দেশে তব, শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রীতি-উপহার

সঙ্গোপনে এনেছি আমার

সেই ক্ষণে,

নিতান্ত নির্জ্জনে

শ্রদ্ধার বাসরে তব নেত্রপুটে অশ্রু-মণি-হার

সে যে সত্য, একান্ত তোমার।

ভাববার কথা

ভুক্তভোগীর বক্তব্য

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

জাতিভেদ হিন্দুর পক্ষে উপযোগী কি অনুপযোগী-বর্ণভেদ জন্মগত কি গুণগত-ত্রিকালদর্শি আর্য্যঋষিগণের চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ বর্ত্তমান সময়ে থাকা উচিত কি অনুচিত-বর্ণাশ্রম এখনই ধ্বংস হউক কি উহাকে রাখিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইতে হইবে এ সকল এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

প্রকৃত ঘটনা হইয়াছে এইখানে—যাঁহারা অধ্যাপক শ্রেণীর লোক-শাস্ত্রালোচনা তৎপর তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সৃষ্ট ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে ব্যাকরণের পদ শ্রুতি স্মৃতির নিগলিতার্থ বেদান্তের নানা বিষয়িনী ভাষ্য-মালা ন্যায় সাংখ্যের কূট অর্থবাদ লইয়া ব্যস্ত, বাহিরের দিকে তাকাইবার তাঁহাদের অবসর কম; এতাদৃশ ব্যক্তির আশৈশব চরিত্রও বাহিরের দিকে তাকাইবার প্রতিকূলে। আর যাঁহারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত পারিপার্শ্বিক ঘটনা পরম্পরায় পাশ্চাত্যভাব প্রবণতা দোষ দুষ্ট তাঁহারা শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ পক্ষান্তরে দুই চারি জন ব্যতীত শাস্ত্রার্থ অনভিজ্ঞ।

জাতি ভেদের স্বপক্ষে যাঁহারা ওকালতি করেন তাঁহারা যেরূপ শাস্ত্রীয় বচন ও উদাহরণ দ্বারা তাহা সমর্থনের চেষ্টা করেন আবার উহার বিপক্ষে যাঁহারা ব্যারিষ্টারী করেন তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনের অপরাংশ আত্ম প্রতিভাবলে ঐতিহাসিক জ্ঞান গরিমায় চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া উহা খণ্ডনের প্রয়াস পান।

গণ্ডগোল বাধিয়াছে "তিনে"—

গাড়ীতে প্রথমশ্রেণী মধ্যমশ্রেণী তৃতীয়-শ্রেণীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় বিভাগে, আর বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে গোঁড়া সমন্বয়ী ও ভুক্তভোগীতে যাঁহারা গোঁড়া তাঁহাদের স্বীয় মতানুবর্ত্তিতায় যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান নাই, কর্ম্মান্তর্গত সহজ বা কৃচ্ছ্র অনুষ্ঠান থাকিলেও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুণাবলী নাই।

সমন্বয়ীরাও ঐ সকল অর্জ্জন পূর্ব্বক সমন্বয়ের পথ সুগম করিয়া স্বীয় আচার ব্যবহার বা কার্য্য দ্বারা উহা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন না।

যে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক লইয়া সমাজ তদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর জীব এই সময়ের মধ্যেই সামান্য একটু স্থান লইয়া বাস করে তাহারা 'ভুক্তভোগী'।

আভিজাত্য গর্ব্বদৃপ্তের গর্ব্ব আজই চূর্ণিত হউক, স্ত্রী-বৈশ্য-শুদ্র আজ হইতেই বেদ পাঠে মনঃ সংযোগ করুক (বেদ যেন ডুমুরের ফুল) বর্ণ চতুষ্টয় আজই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাউক এবমপ্রকার ভাষার ভাসা কথা বলা যেরূপ সরল ও সহজ কাজে প্রমাণ করা যে তদপেক্ষা কত গুণে কঠিন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ধাতু প্রত্যয় দ্বারা সংস্কৃত শব্দের (দেবভাষার) অঙ্গ কলেবরের পরিবর্জ্জন বা আমূল পরিবর্ত্তন করা শক্ত কাজ নহে কিন্তু ভাবার্থ প্রকৃতমর্ম্ম তাঁহারাই পরিগ্রহ করিতে পারেন যাঁহারা ও পথে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিশ্বাস পূর্ব্বক চলেন।

শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুষ্কর। জষ্টিস্ উড্রফের হৃদয়ে তন্ত্রাকাশের সাধনচন্দ্রালোক কিরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা তিনিই জানেন।

পরবর্ত্তীকালে স্বকপোলকল্পনাসংশ্লিষ্ট নানা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট সেই যে অগণিত শাস্ত্র তাহার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত কয়জন? কে জানে?

শাস্ত্রে কিম্বা লোকোপচারে আছে—

"ব্রাহ্মণ! তুমি ব্রাহ্মণেতর জাতির পূজা প্রাপ্ত যে দেবদেবীর প্রতিমা তাঁহাকে প্রণাম করিও না, ব্রাহ্মণেতর জাতি প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীবিগ্রহ দৈবাৎ তাঁহার কোনো সেবাংশের ব্যাঘাত ঘটিলে তোমার তাহা পূরণ করিবার অধিকার নাই।"

যিনি গোঁড়া তিনি তো খোঁড়া হইয়া রহিলেন। যিনি সমন্বয়ী তিনিতো বক্তৃতা আর লেখায় রহিয়া গেলেন।

ভুক্তভোগী হয় দশ জনের কাছে সরল সাজিবার ভানে—সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার প্রয়াসে অথবা আন্তরিক ভগবদ্ভক্তি কণিকার উচ্ছ্বাসে এরূপ কার্য্যে যোগদান করিলেন।

পূজা হইয়া গেল, ভোগ হইল, সন্ধ্যায় কাঁসর ঘণ্টা মুখরিত ঠাকুরের সন্ধ্যারতি সমাপিত হইল। গৃহস্থ আপন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। ফল হইল সমাজ লাঞ্ছনার ভুক্তভোগীর কর্ম্মভোগ।

এদিকে ঠাকুরের ভোগ হইতেছে, ওদিকে সমালোচনা মহালে সংবাদ গেল "আর কি চাও অমুক বাড়ীর অমুকে তো আজ আমাদের ওখানে ঠাকুর পূজা ভোগ দিতেছে কেবল কি এই কথা? নিজেও প্রসাদ পাইবে।" শেষোক্তটী সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক উহার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া থাকিল। "কফ ভরা রুমালের মত বাইরে একটু আতর মাখা" সমাজ আর কোনো ভাল কাজ করিতে পারুক আর নাই পারুক "গো বেচারীর রাগে" লাগিয়া গেলেন। সমাজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইলেও অল্প শক্তি সম্পন্ন সামাজিককে যে কোন উপায়ে লাঞ্ছিত করিবার ক্ষমতা এখনও তাহার সমূহই আছে।

অবস্থা ভাল হইলে কোন কথা থাকিত না; হইলেও কিছু কিঞ্চিৎ রজত চাক্তি আর না হয় বড় জোর পছন্দ সই একটা খাওয়ার অপেক্ষা রাখিত।

মধ্যম শ্রেণীর "সকল রকমে কাঙ্গাল" জীবটীর কপালে তো নানা লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হইল। সমাজের শাসনই বল আর ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধিই বল অম্লান বদনে তাহা তাহাকে মানিয়া লইতে হইল।

সাংসারিক জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই হউক, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যই হউক, কর্ম্মফলেই হউক, অদৃশ্য শক্তির অপ্রতিহত বলেই হউক, অথবা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক, "সংঘটিত বিষয়" যদি অস্বীকার না-ই করা যায় তবে তাহার বাদানুবাদ কেবল কথায় আর ভাষায় থাকিয়া যাইবে মাত্র।

বন্ধুত্বের খাতিরে কেহ অপর কাহারো সহিত অথবা বনভোজের ভোজনানন্দে কেহ দশজনের সহিত মিলিত হইলে, তাহার ফল—ব্যষ্টি বা সমষ্টিবদ্ধ জাতি বিশেষের বিদ্রূপ

তাচ্ছিল্য সহ অযথা আত্মপ্রসাদ ও অহঙ্কার।

ঋষিশাস্ত্র যাহার লক্ষণ করিয়াছেন-অনুমোদন করিয়াছেন তাহার সঙ্গে একত্র অবস্থান আহারবিহারের উপহার সমধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির যথেচ্ছ আদেশ লব্ধ প্রায়শ্চিত্তের মস্তক মুণ্ডন।

যে দুষ্কৃতি বসে সমাজ রূপ দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হইয়া গিয়াছে সময় না হইলে তাহা প্রকৃতিস্থ হইবার আশা করা পুরুষকারের আয়ত্ত কি না? প্রাচীন সংস্কার প্রাচীন শিক্ষাগ্রন্থ প্রাচীন শিক্ষা তাহার সন্তোষ জনক কি উত্তর দেয় সমন্বয় বাদীরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি?

কি প্রণালীতে কোন্ উপায়ে সমাজ সংস্কারের সমাধান হইবে ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার ভিত্তি প্রস্তুত হইতেছে বা হইয়া আছে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্র বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপ্লব, শস্য সমস্যায় খাদ্য বিপ্লব রোগ শোক সমাকুল "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এ হেন ভীষণ যুগে গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে কিরূপে চলিতে পারা যায় তাহা ভুক্তভোগীর বক্তব্যের মধ্যে।

"স্বদেশী বয়কট," "প্যাটেল প্রস্তাবিত যথেচ্ছ বিবাহ" মহাত্মা গান্ধীর "সত্যাগ্রহ" অনেকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া সমর্থন করেন কিন্তু কয়জনে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানেন? বাক্যে বলা এবং কার্য্যে পরিণত করায় যে কত পার্থক্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রের লাঞ্ছনা গঞ্জনা লব্ধ জীবনের মধ্যে অনুভবের বিষয়। স্বীয় অভীষ্ট পথের বিঘ্ন স্বরূপ যাহাই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে আমরা স্বীকৃত নহি।

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর শ্রেণীর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত সোপানের বংশ মর্য্যাদা সম্পন্ন বনিয়াদি ঘরের কন্যা আনিতে পারিলে যে নিজেকে ধন্য মনে করেন তাহার দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র হিন্দু সমাজে নহে তথাকথিত উদার ব্রাহ্মসমাজ ও অপরাপর সমাজেও বিরল নহে। সামাজিক সংস্কার—রীতিনীতি—নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন কি উচ্ছেদ অভিলাষে ফেনায়িত ভাষায় লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লেখা বা বক্তৃতা দেওয়া শক্তি বিশেষের কায হইতে পারে কিন্তু তাহাতে দশজনের লাভা-লাভ বিবেচনা সাপেক্ষ।

আমি মৎ কথিত উপদেশের ভাষার সহিত নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্যের কোন মিল রাখিব না অথচ অন্য সকলকে আমার মতে আনিতে প্রাণপণ যত্ন করিব ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? আবার কেহ কেহ যুক্তি শানিত অস্ত্রে সকল প্রকার বিঘ্ন কণ্টক উন্মূলন পূর্ব্বক কল্পনা জগতে পথ সৃষ্টি করিয়া রাখেন, বিপদ সঙ্কুল সে পথে আপনি বিচরণ করিতে ভীত হন—নিজে অনিষ্ট আশঙ্কায় "চলিত পথেই গতায়াত করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সকল কার্য্য করেন তদিতর ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করে।

যদি কাল প্রভাবে সমাজ অট্টালিকায় কোনো ব্যক্তি বিশেষ, রাজ বিশেষ বা অবতারবিশেষ আগমন করেন তবে তাঁহার কার্য্যে সম্ভবতঃ এ মিল থাকিতে হইবে—গ্রন্থ-মূর্খ হইলেও শাস্ত্রজ্ঞানতা, পারিপার্শ্বিক পরস্পর বিবদমান ঘটনাবৈচিত্রের সহিত স্বকীয় শিক্ষালব্ধ প্রচুরতম অভিজ্ঞতা,—কালতরঙ্গাভিঘাতে সতত প্রহৃত সমাজের জাগতিক আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-

পর্য্যালোচন তৎপরতা আর এতৎ সহ জাগতিক শক্তির অতীত কোনো বিশেষ শক্তিশালিতা।

পরিশেষে ভক্ত-সাধক-কবিজনবন্দ্য-শব্দমধুর সঙ্গীত কবি জয় দেবের সেই সর্ব্বলোক পরিচিত দশাবতার স্তোত্রের শেষ সঙ্গীত জয়ধ্বনি—

"ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে।"

কলিতে এক বর্ণ হইবে এ কথা সত্য স্বীকার করিলে এ সাধন সঙ্গীতের ভাব ভাষাও বর্ণে বর্ণে সত্য স্বীকার করিতে হইবে যেহেতু ডুইটাই অতীতের কাহিনী। ম্লেচ্ছ শব্দে যদি সংজ্ঞা বিশিষ্ট জাতি বিশেষকে না বুঝাইয়া ম্লেচ্ছ ভাবসম্পন্ন সজ্ঞ শক্তিকেও বুঝায় তাহা হইলেও সমন্বয়বাদীরা ইহার কিরূপে সামঞ্জস্য সমন্বয় করিবেন?

শাস্ত্রের এক পৃষ্ঠা স্বীকার করিব না অপর পৃষ্ঠ স্বীকার করিব, অন্ধকার স্বীকার করিব না আলোক স্বীকার করিব, দুঃখ স্বীকার করিব না সুখ স্বীকার করিব, তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মেও একথা টিকে না।

তথাকথিত রক্ষণশীলদের (গোঁড়া হিন্দু-দিগের) যেরূপ বিধিলিপির বিরুদ্ধে হস্ত ক্ষেপ করিয়া কোনো লাভ নাই সেইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদীদেরও ঝড়ের অনুকূলে ঘরে পেলা লাগাইয়া কোনো লাভ নাই। প্রসঙ্গাধীন একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল—

এক সময়ে খুব উতরোল তুলিয়া প্রবল ঝড় উঠিয়া আসিল, জনৈক গৃহস্বামী ঝড়ের ভাব গতিক দেখিয়া কিছু ঠিকানা করিতে না পারিয়া যে দিক্ হইতে পবন দেবতা প্রাণপণ জোরে হানা দিতেছেন তদনুকূলে বাঁশ-কাঠ দিয়া পেলা লাগাইতে লাগিলেন—জনৈক প্রতিবেশী এতাদৃশ অসংলগ্ন কাণ্ড দেখিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে গৃহস্বামী তদুত্তরে এই বলিয়া আত্মকৃত মতের সমর্থন করিলেন—

"বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কাজ করা যায় ভাই!" তাঁহার ইচ্ছা ঘরখানা ফেলিয়া দিবেন কাজেই আমিও ঝড়ের দিকেই পেলা বাধাইয়া দিলাম।

যাহা হইবার—যাহা ঘটিবার—যাহা ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা কাল বিপর্য্যয়ে—অবস্থা বিপর্য্যয়ে—যুগ বিপর্য্যয়ে পরিবর্ত্তিত—পরিবর্দ্ধিত—পরশোভিত আকারে তাহা আপনা আপনিই হইয়া পড়িবে, তথাপি উক্ত প্রকার কার্য্যে লাভ লোকসানের খবরটা তিনিই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন যাঁহাকে সর্ব্বদা ঘরের নীচে বসবাস করিতে হয়, ঘর পড়িয়া গেলে যে কি দুঃখ তাহা ভুক্তভোগী-গৃহস্থ ছাড়া অন্যে কি বুঝিবে?

বাদ-প্রতিবাদ করাটা আমাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ লক্ষণ। আবার যাহাকে যাহা করিতে দিয়াছেন সেতো তাহা করিবেই—চুপ করিয়া থাকিবার যো কি?

———

অনন্তে

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার]

অসীম সাগরতটে
গগণের নীলিমা জড়া'য়ে
রহিয়াছি একেলা দাঁড়ায়ে,

নিখিল জীবন মাঝে
চিরন্তন মৃত্যু-বিভীষিকা
ফেলিয়াছে আপনা হারা'য়ে !

পরিপূর্ণ বিশ্ব মাঝে
এতটুকু নাহিক দীনতা
নৈরাশ্যের করুণ ক্রন্দন,

নাহি উষ্ণ হাহাকার
বিরহের বুক ভাঙা শ্বাস,
জীবনের কঠিন বন্ধন !

নাহি অশ্রু, নাহি দুঃখ,
বেদনার কোন অনুভূতি
নাহি ক্ষোভ, নাহিক কামনা;

বিদ্রোহের কোলাহল
বিদ্রুপের স্ফুরিত অধর
নাহি কোন পার্থিব বাসনা !

নীলিম সাগর বুকে
আকাশের উদার নীলিমা
ঢলিয়া পড়েছে আলিঙ্গনে,

অনন্ত রহস্যময়
স্বর্গে মর্ত্যে দিকচক্রবালে
বাঁধিয়াছে সেতুর বন্ধনে ।

জীবন-মরণ-সন্ধি
অসীমের মাঝারে দাঁড়ায়ে
চাহে মিলাইতে ক্ষুদ্র প্রাণ,

আপন অসীম সত্ত্বা
অন্তহীন নিখিলে ডুবায়ে
তুলিবারে চাহে মুক্তি-গান !

তোমার শীতল ছায়ে
মাগে প্রাণ শান্তি লভিবারে
বিকাইতে নশ্বর জীবন,

সসীমে অসীম করি'
দাও তা'রে—যাহা চায় প্রাণ
হে দয়াল ! হৃদয়রঞ্জন !

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

চতুর্থ বিভাগ ;—অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ে কর্তৃত্ব করিত, বিক্রয়ের বন্দোবস্ত, পরিমাণের নির্দ্দেশ প্রভৃতি এই বিভাগীয় কার্য্য, মন্বাদি শাস্ত্রেও বাণিজ্য বিষয়ক বিধান রহিয়াছে। অর্থ শাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ২১ অধ্যায় ও ২২ অধ্যায়ে শুল্ক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী রহিয়াছে, মনুও বলিয়াছেন,—

"ক্রয় বিক্রয় মধ্বানংভক্তং চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমংচ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎকরান্" ॥

অন্যত্র দেখিতে পাই,—

পঞ্চাশদ্ভাগআদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ"।

গৌতমও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

"পশুহিরণ্যয়োরপ্যেকে পঞ্চাশদ্ভাগমিতি"।

বিষ্ণুসূত্রেও দেখিতে পাই,—

পশু, হিরণ্য ও বস্ত্রেরও এই প্রকার শুল্কদাপ্য।

"দ্বিকংশতং পশুহিরণ্যেভ্যো বস্ত্রেভ্যশ্চেতি"।

এইরূপ শাস্ত্রকারগণের বিধান বলেই বাণিজ্য বিভাগের সৃষ্টি, অর্থশাস্ত্রে পরিমাণ পদ্ধতিনির্ণয়ের জন্য কর্ম্মচারীর কার্য্য-প্রণালী বর্ণিত আছে, এই কর্ম্মচারীর নাম পৌত-বাধ্যক্ষ।

পঞ্চম বিভাগ ;—এই বিভাগের কার্য্য—শিল্পের প্রসার ও প্রচার করা, অর্থশাস্ত্রে 'সূত্রাধ্যক্ষ' নামক কর্ম্মচারী ও তাহার কার্য্যাবলীর নিয়ম প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই বিধানে ভদ্রগৃহস্থের স্ত্রীলোক হইতে সাধারণ স্ত্রীলোক সকলের বয়ন শিল্পের ব্যবস্থা করিবার বিধান রহিয়াছে। আমরা অর্থশাস্ত্র হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

"সূত্রাধ্যক্ষ, সূত্র, বর্ম্ম, বস্ত্র এবং রজ্জুনির্ম্মাণে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন।

বিধবা খঞ্জ, স্ত্রীলোক, বালিকা, ভিক্ষুণী, সন্ন্যাসিনী, দণ্ডপ্রতিকারিণী [যাহারা দণ্ড দিতে অসমর্থা হওয়ায় কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে] বেশ্যাগণের মাতা, রাজার বৃদ্ধাদাসীগণ, এবং যে সকল বেশ্যা মন্দিরে কার্য্য করিতে বিরতা হইয়াছে, তাহারাই উর্ণা, বল্কল, কার্পাস, তুলা এবং শণ কর্ত্তন করিবে।

যে প্রকার সূত্র বয়ন করিবে [অর্থাৎ সূক্ষ্ম, স্থূল এবং মধ্যম] উহাও বয়নের পরিমাণ-দেখিয়া উহাদের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। যাহারা অধিক পরিমাণে সূত্র বয়ন করিবে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তৈল, হরিতকী, ও আচার উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। বিশেষরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া ইহাদের পুণ্য তিথিতে কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

* * * *

* * * *

যে সকল স্ত্রীলোক বাটীর বহির্দ্দেশে গমনা-

গমন করেন না, যাঁহারা প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং যাঁহারা বিধবা বা অবিবাহিতা যখন এই সকল স্ত্রীলোক উদরান্নের জন্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবেন, তখন বয়নালয়ের দাসীদ্বারা তাঁহাদের নিকট তন্তুপ্রস্তুতের উপাদান সসম্মানে প্রেরণ করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা—১২৯ —১৩১

এই সূত্রাধ্যক্ষই যুদ্ধের কবচাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেন, কারণ দেখিতে পাই, "নানা প্রকার পরিচ্ছদ, আস্তরণ এবং কম্বলাদি প্রস্তুত করিতে হইবে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কবচ নির্ম্মাণ করিবে।" এইরূপে শ্রম শিল্পের উন্নতি সাধিত হইত, দরিদ্রের উদরান্নের সংস্থান হইত, শিল্প ও কারুকার্য্যেরও বিকাশ হইত। এস্থলেও State Socialism সবিশেষ স্ফুট, এইরূপ বিধানের ফলেই শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ বিভাগের কার্য্য :—বিক্রীত বস্তুর শুল্ক গ্রহণ। অর্থশাস্ত্রে শুল্কাধ্যক্ষ নামক কর্ম্মচারী ও তৎকার্য্যাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। স্মিথ সাহেব লিখিতেছেন—"The collection of a tithe of the value of the goods sold was the business of the sixth and last Board, and evasion of this tax was punishable with death. Similar taxation on sales always has been common in India, but rarely, if ever, has its collection been enforced by a penalty so formidable as that exacted by Chandra Gupta." ইহার সারার্থ এই, ষষ্ঠ বিভাগ বিক্রীত পণ্যের শুল্ক আদায় করিত, এই শুল্ক কেহ প্রদান না করিয়া ঠকাইতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত, এইরূপ শুল্ক আদায় ভারতীয় বিধি। কিন্তু এইরূপ কঠোর শাস্তি চন্দ্রগুপ্তের সময় ভিন্ন অন্য কোনও ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের এ স্থলে স্মিথ্ সাহেবের বাক্যের প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে হইল, প্রথমতঃ ভারতীয় শাস্ত্রে এরূপ কোনও বিধান আদপেই নাই। সামান্য দণ্ডের বিধান আছে কিন্তু প্রাণদণ্ডের বিধান কুত্রাপি দেখিতে পাই না। অর্থশাস্ত্রেও এরূপ বিধান নাই। অর্থশাস্ত্রে যে শাস্তির উল্লেখ আছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যাহারা শুল্ক সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিবে তাহাদের চৌরের ন্যায় শাস্তি হইবে। বিনা শুল্কে পণ্য প্রেরণ করিলে অথবা মুদ্রা দেওয়া শুল্কের সহিত অপর পণ্য প্রেরণ করিলে গোপনেপ্রেরিত পণ্যমূল্যের সমান দণ্ড হইবে। যাহারা মিথ্যাপূর্ব্বক গোময় স্পর্শ করিয়া গোপনে পণ্য প্রেরণ করিবে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড হইবে। কোনও ব্যক্তি নিষিদ্ধ পণ্য যথা শস্ত্র, বর্ম্ম, কবচ, লৌহ, রথ, রত্ন, ধান্য, পশু আমদানি করিলে অন্যত্র বর্ণিত শাস্তি ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য হইতে তাহার সত্বচ্যুতি হইবে।"

১২৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ২১ অধ্যায়।

এই বিধানের কোথাও প্রাণদণ্ড দেখিতে পাই না। "চৌরের ন্যায় শাস্তি হইবে।" বলায় প্রাণদণ্ড বুঝায় না। হত্যাকারী দস্যুরই প্রাণদণ্ড বিহিত। শাস্ত্রেও তাহাই দেখিতে পাই। বিশেষতঃ তৎপরেই "মিথ্যাপূর্ব্বক গোময় স্পর্শ" কারীর গুরুতর দণ্ডের বিষয় লিখিত আছে।

অর্থ দণ্ডই বিশেষ ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইত এইরূপই প্রতীয়মান হয়, প্রাণদণ্ড হইতে গুরুতর দণ্ড হইবার যো নাই, এস্থলে অর্থশাস্ত্রের বিধানই চন্দ্রগুপ্তের

বিধান বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, এ স্থলে স্মিথ্ সাহেবের বাক্য ভ্রান্তি প্রণোদিত বলিয়াই বোধ হয়। এই ছয় বিভাগের কমিশনরগণ সম্মীলিত ভাবে নগরের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা বাজার, মন্দির, বন্দর প্রভৃতি সুশৃঙ্খলে রাখিতেন, এক কথায় সাধারণ কার্য্য মাত্রেই তাহাদের হস্তে নিয়োজিত ছিল, প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতীয় বিধানে নাগরিক সমাজ ও গ্রাম্য সমাজ নিহিত ছিল। বহুশতাব্দী ব্যাপী ক্রম বিকাশেই মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় (State Socialsm) সকল ব্যাপারেই পরিলক্ষিত হয়।

নাগরিক প্রণিধির বিধানে অর্থশাস্ত্রে Fire Brigadeএর স্থায় তাৎকালিক ব্যবস্থাও দেখিতে পাই, অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আমরা অর্থশাস্ত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বাস্তবিক অতি প্রাচীন কালেও নগর রক্ষার বন্দোবস্ত দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

"গ্রীষ্ম কালের দিনমানকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার মধ্য দুই ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে নিষেধ করিতে হইবে। এই সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে এক পণের অষ্টমাংশ দণ্ড হইবে, গৃহস্বামীগণ গৃহের বহির্ভাগে রন্ধন করিতে পরিবেন।

যদি কোন গৃহস্বামীর নিকট পাঁচটী জলপাত্র, এক কুম্ভ, একদ্রোণ, এক অধিরোহিণী, একপরশু, একশূর্প, এক অঙ্কুশ, এক সাঁড়াশী, এবং একটী চর্ম্মের থলি না থাকে তবে তাহাকে একপণের এক চতুর্থাংশ দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে। তাহারা তৃণাচ্ছাদিত চাল স্থানান্তরিত করিবেন। কর্ম্মকারগণ সকলে একত্র হইয়া একই পল্লীতে বাস করিবে, প্রত্যেক গৃহস্বামী রাত্রিতে নিজ গৃহের দ্বার দেশে উপস্থিত থাকিবেন, বৃহৎ রাজপথে 'চতুস্পাদ্বারে' যে স্থানে ৪টী রাজপথ মিলিত হইয়াছে এবং রাজকীয় গৃহের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র জলপূর্ণ কলসী রক্ষা করিতে হইবে।

যে কোন গৃহস্বামী অপর স্থানে অগ্নি নির্ব্বাণে সহায়তা করিবেনা তাহার দ্বাদশ পণ অর্থ দণ্ড হইবে; এবং যে 'ভাড়াটিয়া' অগ্নি নির্ব্বাণে সহায়তা করিবে না, তাহার ৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে।"

অর্থশাস্ত্র ২ য় খণ্ড ৩৬ অ: ১৫৯ পৃ:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যে সকল নিয়ম বিহিত ছিল তাহাতে নাগরিক নিয়মের (Municipal-By-Law) যে সবিশেষ প্রচার ও প্রসার ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়, বিধান এইরূপ,—"যে রাজপথে পঙ্ক নিক্ষেপ করিবে তাহার এক পণের এক অষ্টমাংশ দণ্ড হইবে। যে পথে কর্দ্দম বা জল একত্র করিবে তাহার এক চতুর্থাংশ দণ্ড হইবে। রাজমার্গে যে উপর্য্যুক্ত অপরাধ করিবে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে পুণ্য স্থানে, মন্দিরে, রাজপ্রাসাদে, বা জলাশয়ে মল মূত্র ত্যাগ করিবে তাহার এক পণ অর্থ দণ্ড হইতে অপরাধানুযায়ী গুরুতর অর্থ দণ্ড হইবে, কিন্তু যখন এই সকল মল মূত্র ত্যাগ পীড়া বা ঔষধ হেতু হইবে তখন কোন শাস্তি হইবে না, নগর মধ্যে যে বিড়াল, সারমেয়, নকুল, অথবা সর্পের মৃত দেহ নিক্ষেপ করিবে তাহার তিন পণ, যে গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং পশু নিক্ষেপ করিবে তাহার ৬ পণ এবং যে মনুষ্যের মৃত দেহ নিক্ষেপ করিবে তাহার ৫০ পণ অর্থ দণ্ড হইবে।

এই সকল বিধান ব্যতীতও নির্দ্দিষ্ট দ্বার

ভিন্ন অন্য দ্বার দিয়ে মৃত দেহ নগরের বাহিরে নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, শ্মশান ব্যতীত অন্যস্থানে মৃতদেহ দাহ করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইত, এই সকল বিধি দৃষ্টে মনে মনে হয় নাগরিক সমাজের নিয়মাবলী বিশেষ সুচারু রূপে বিরচিত ও প্রতিপালিত হইত, যে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আজ ভারতবাসী কাঙ্গাল সেই নাগরিক স্বায়ত্ব শাসন মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় কিরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র জাগিয়া উঠে, ইউরোপীয় আধুনিক জাতি যখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিল তখন ভারতে নাগরিক সমাজের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, আর আজ বলদর্পিত ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীকে অসভ্য বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, William Archer সাহেব ভারতবাসীকে অসভ্য বর্ব্বর তুল্য বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের প্রতিবাদ কল্পে সে দিন ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের Justice উড্রফ 'Woodroffe' সাহেব "Is India civilized" নামক গ্রন্থ বিরচিত করিয়া ভারতের সভ্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন, হায়! আজ ভারতবাসী অসভ্য! ভারতবাসী অসভ্য নহে ইহাও প্রমাণের বিষয়ীভূত হইল, ইহাকেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। চন্দ্রগুপ্তের শাসন সময়ে রাজ প্রতিনিধি নিয়োজিত হইত, অশোকের সময় ইহার বিবরণ আরও বিস্তৃতপ্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রেও রাজ্যাধ্যক্ষের বা Viceroy এর উল্লেখ দেখিতে পাই, গুণাবলীও বিবৃত আছে।

কুলশীলগুণোপেতঃ সত্যধর্ম্ম পরায়ণঃ।
রূপেণ সুপ্রসন্নশ্চ রাজ্যাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥ *

রাজকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য গুপ্তচর বিভাগের প্রবর্ত্তন ভারতীয় বিধান-বলেই হইয়াছে। গ্রীকগণ এই সংবাদ-লেখকগণকে Overseers এবং Inspectors বলিয়াছেন, দেশের যাবতীয় খবর গোপনে সংগ্রহ করাই এই বিভাগের কার্য্য, সংবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্যই সমুচিত সাবধানতা অবলম্বিত হইত, গুপ্তচর নিয়োগ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের প্রথম খণ্ডের ১১শ অধ্যায় হইতে ১৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। এই তিন অধ্যায়ে গুপ্তচর নিয়োগ, ভ্রমণকারীচর নিয়োগ ও নিজ রাজ্যে স্ববিষয়ে পক্ষাপক্ষ রক্ষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ জন্যও সমুচিত বন্দোবস্ত ছিল।

মৌর্য্য চন্দ্র গুপ্তের সময়ের দণ্ডবিধি আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য, এ স্থলে স্মিথ্ গ্রীকলেখকগণের বিবরণ হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বানুমোদিত হইতে পারে না। তাঁহার লিখিত বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—"The general honesty of the people and the efficient administration of the criminal law are both attested by the observation

* বিষ্ণুসূত্রেও দেশাধ্যক্ষ বা Viceroy এর উল্লেখ ও কার্য্যবিবরণ দেখিতে পাই, "গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ, পরিহারং কুর্য্যাৎ, অথাশক্তো দর্শগ্রামধ্যক্ষায় নিবেদয়েৎ, সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায়, সোঽপ্যশক্তো দেশাধ্যক্ষায়, দেশাধ্যক্ষোঽপি সর্ব্বাত্মনা দোষমুপচ্ছিন্দ্যাৎ।

মনুও 'সহস্রপ্রতি' নামে রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। "সহস্রপতিমেবচ" ও "গ্রাম দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্। সংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতী শিনে" বিংশতি শস্তুতৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ। শংসেদ্ গ্রাম শতেশস্তু সহস্র পতয়ে স্বয়ম্।

recorded by Megasthenes" that while he resided in Chandragupta's camp containing 400,000 persons, the total of the thefts reported in any one day did not exceed two hundred *drachmai* or about eight pounds sterling. When crime did occur it was repressed with terrible severity. Ordinary wounding by mutilation was punished by the corresponding mutilation of the offender, in addition to the amputation of his hand. If the injured person happened to be an artisan devoted to the royal service, the penalty was death. The crime of giving false evidence was visited with mutilation of the extremities; and in certain unspecified cases, serious offences were punished by the shaving of the offender's hair, a penalty regarded as specially infamous. Injury to a sacred tree, evasion of the Municipal tithe on goods sold, and intrusion on the royal procession going to the hunt were all alike capitally punishable. These recorded instances of severity are sufficient to prove that the code of criminal law as a whole must have been characterrized by uncompromising sternness and slight regard for human life." Ibid P.P. 128.

অর্থাৎ মেগাস্থিনিসের বিবরণ জনসাধারণের সততা ও দণ্ড বিধির প্রকৃত ব্যবহারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন তিনি চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধাবারে অবস্থান করেন তখন দৈনিক অপহৃত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ ২শত ড্রাক্‌মৈ বা ৮ পাউণ্ডের অধিক হইত না। এই স্কন্ধাবারে ৪০০,০০০ লোক থাকিত, কোনও অপরাধ হইলে গুরুতর শাস্তি প্রদত্ত হইত। কেহ কাহারও অঙ্গহানী করিলে দোষীর সেই অঙ্গ কর্ত্তিত হইত অধিকন্তু হাতও কাটিয়া দেওয়া হইত। আহত ব্যক্তি রাজকীয় শিল্পী হইলে অপরাধীর প্রাণ দণ্ড হইত। মিথ্যা সাক্ষের শাস্তি প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন এবং অনির্দ্দিষ্ঠ ঘটনায় গুরুতর অপরাধে মস্তক মুণ্ডিত করাইতেন। ইহা অতীব জঘন্য বলিয়া পরিগৃহীত ছিল, কোনও পবিত্র চৈত্য বৃক্ষে আঘাত করিলে মিউনিসিপ্যালিটির শুল্ক প্রদান না করিলে, রাজকীয় মিছিলের ভিতর প্রবেশ করিলে প্রাণদণ্ড হইত। এই সকল দৃষ্টে মনে হয় দণ্ডবিধি অতিশয় কঠোর ছিল এবং মনুষ্যের জীবনের মূল্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

এ স্থলে আমরা প্রথমতঃ অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিব। অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য প্রণীত, নরেন্দ্রের জন্য লিখিত, যে সমস্ত ব্যাপার বৈদেশিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাইলে অবশ্যই স্বীকার্য্য। মিউনিসিপ্যাল শুল্ক সম্বন্ধে প্রাণদণ্ড অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই না। যে প্রকার শাস্তি বিহিত ছিল তাহাও অর্থ শাস্ত্রের ২য় খণ্ডের ২১শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, অর্থদণ্ড ও বস্তুর সত্বচ্যুতি-এইরূপ শাস্তিই বিহিত হইয়াছে। সেই সেই স্থল পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ১০০ পৃষ্ঠা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। মিথ্যা সাক্ষীর প্রত্যঙ্গ কর্ত্তনও অর্থশাস্ত্রে দেখিতে

পাইনা। আমরা এ স্থলে সাক্ষীগণের শাস্তি বিধান উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে সুধীগণ বিচার করিবেন মিথ্যা সাক্ষ্যের ওরূপ কঠোর শাস্তি বিহিত ছিল কিনা?

"উশনা বলেন যে কেবল যে ক্ষেত্রে সাক্ষীগণ নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করে অথবা জ্ঞানশূন্য হয় অথবা যে ক্ষেত্রে ব্যবহারের দেশ, কাল ও প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া কোনই ফল হয় না, কেবল সেই সকল স্থানেই সাক্ষীগণের তিন প্রকার দণ্ড হইবে।

মনু বলেন সাক্ষ্য সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক কূটসাক্ষীগণের দশগুণ অর্থ দণ্ড করিতে হইবে। বৃহস্পতি বলেন যে সাক্ষীগণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কোন অভিযোগ সন্দেহ জনক হইলে নির্য্যাতন করাইয়া তাহাদের প্রাণত্যাগ করাইতে হইবে। কৌটিল্য বলেন, না; সাক্ষীগণের নিকট সত্য কথাই শুনিতে হইবে; যদি ইহাতে তাহারা অমনোযোগী হইয়া থাকে, তবে তাহাদের চতুর্ব্বিংশপণ দণ্ড হইবে। যদি তাহারা অনুসন্ধান না করিয়া সাক্ষ্য দান করে তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে"

অর্থশাস্ত্র ২য় খণ্ড ১১শ অধ্যায় (১৯৮—১৯৯পৃঃ)

এ স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত কোনও শাসনের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

কৌটীল্যের মতে অর্থ দণ্ডই শাস্তি। বৃহস্পতির মত অনাদরণীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। মনু ও উশনার মতের অর্থদণ্ডই কৌটিল্য কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। এমতাবস্থায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য 'প্রত্যঙ্গচ্ছেদ রূপ দণ্ড বিহিত ছিল, ইহা সম্ভাবিত বলিয়া

চৈত্য বৃক্ষে আঘাত জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজকীয় শোভ যাত্রার ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রাণদণ্ড হইত এরূপ কোনও নিদর্শন অর্থশাস্ত্রে নাই। রাজার বহির্গমনের সময় রাজমার্গ সুরক্ষিত থাকিত, এরূপ বিধান দেখিতে পাই কিন্তু কুত্রাপি প্রাণদণ্ড বা অন্য প্রকারের শাস্তির উল্লেখও নাই। এরূপ কোনও বিধান থাকিলে অর্থশাস্ত্রে নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকিত। রাজার আত্মরক্ষার বিধানে ধনুকধারিণী স্ত্রীগণের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে, গ্রীক গ্রন্থকার মেগাস্থিনিস্ ও চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিংর গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, অবশ্যই ওরূপ বিধান থাকিলে অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার বিধিতে তাহার উল্লেখ থাকিত বহির্গমনের সময় বিধান আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "বহির্গমনের সময় কিংবা প্রত্যাগমন কালে রাজপথের উভয় পার্শ্বই সুরক্ষিত থাকিবে, এবং যাহাতে অস্ত্রধারী পুরুষ, তাপস ও খঞ্জ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেবল মাত্র যখন দশবর্গ প্রহরী থাকিবে, তখন মাত্র তিনি যাত্রা, সমাজ-উৎসব, ও যজ্ঞ দেখিতে গমন করিবেন।" এই বিধান কেবল আত্মরক্ষার বিধান মাত্র, দণ্ডের কঠোরতা অর্থশাস্ত্রকার নিষেধ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গুলি সংকেতে মৌর্য্যশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহার শিষ্য রূপে চন্দ্রগুপ্ত ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট, তাঁহার অনুশাসন বলেই রাজ্য শাসিত হইত।

বিশেষতঃ চাণক্য নিজেই লিখিয়াছেন, "কৌটীল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ।" এই বিধি অনুসারেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত। স্মিথ্ সাহেবও 'অর্থশাস্ত্রের

প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন * তিনি গ্রীকগ্রন্থকারগণের বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ নাই সে বিষয়ে গ্রীক গ্রন্থকারগণের বিবরণ ভ্রান্তি প্রণোদিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। বিশেষতঃ গ্রীক্ গ্রন্থকারগণের বাক্য তত্তদ্দেশবাসী কেহ কেহ মিথ্যাও বলিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার [অবশ্যই সেকেন্দরের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যাহারা লিখিয়াছেন] লোকের মুখের শ্রুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে ভ্রমপ্রমাদ, অনবধানতা অনেকটা পরিমাণে সম্ভব। মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে থাকিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশ সত্য হইলেও স্থল বিশেষে ভ্রান্তি হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় যে যে বিষয় অর্থশাস্ত্রের সহিত মিলিয়া যায়, তাহাই গ্রহণীয়; অন্য বিষয় পরিত্যক্ত হওয়াই সমীচীন। স্মিথ সাহেব প্রথম সংস্করণের সময় গ্রন্থখানি দেখিতে পান নাই, তাহা তিনি লিখিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এই সকল স্থল সংস্কৃত হওয়াই সমীচীন। তিনি তাঁহার ইতিহাসের ১৩৪-১৩৬ পৃষ্ঠায় চাণক্যের বিধানের সহিত গ্রীকগণের যে যে স্থল মিলে আছে তাহাই দেখাইয়াছেন। যে স্থলে মিল নাই তাহা পরিত্যাগ করেন নাই বা সংশোধন বা উল্লেখও করেন নাই। অর্থশাস্ত্রে দণ্ডপ্রদান সম্বন্ধে যে উদারতা দেখিতে পাই তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের সময় ঐরূপ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা কখনই সম্ভব নহে।

রাজশিল্পীর অঙ্গহানি করিলে প্রাণদণ্ড হইত এরূপ বিধান কোন অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অঙ্গচ্ছেদন সম্বন্ধেও অর্থশাস্ত্রের বিধান অন্যরূপ দেখিতে পাই। চাণক্য অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্তে জরিমানার বিধান দিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড—কণ্টক দূরীকরণের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত 'অঙ্গচ্ছেদ পরিবর্তে জরিমানা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আমাদের মনে হয় অঙ্গচ্ছেদ প্রথা কমাইবার চেষ্টাই সমধিক ছিল। এ প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের একটী বিষয়ের বিচার আবশ্যকীয় মনে হয়। কারণ সে স্থল সম্বন্ধে মহীশূরের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি উপক্রম ও উপসংহার বিরোধী ও অর্থশাস্ত্রকারের মতের বিরুদ্ধ বলিয়া অসমীচীন মনে হয়। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ব্যবহার বিধি আছে। তাহার ২৯ অধ্যায়ে দণ্ডপারুষ্য [Assault] সম্বন্ধে বিধান রহিয়াছে। তাহাতে একস্থলে আছে,—"কাহাকেও ভূপাতিত

* "The substance of the precepts and regulations has an extremely archaic aspect, and in my judgment the polity described is mainly that of the Maurya age. The treatise, in fact, may be read as a commentary on and exposition of, the notes recorded by the Greek observers. A few passages in illustration of certain details have been cited above, but a fuller notice of some of the contents of the work bearing Chanakya's name will be of interest as throwing much additional light on the matters briefly treated by Megasthenes and his fellow authors." Ibid P. P. 134,

করিয়া পলায়ন করিলে উল্লিখিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। শূদ্রে যে অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবে তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে।" এই বিধান সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী বলিয়াছেন,—

"This singular passage dealing with an abnormally high punishment for a minor offence is evidently an interpolation as it is inconsistent not only with the author's principle of gradation in punishments proportional to crimes, but also with his intention to get rid of mutilation of limbs by fines levied in lieu thereof."

যোগীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন,—"অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের মতে লঘুপাপে গুরুদণ্ড চাণক্যের অনুমোদিত নহে; সম্ভবতঃ উহা লিপিকর প্রমাদ। এতদুত্তরে আমাদের মত যে পুরাকালে ব্রাহ্মণকে যেরূপ প্রাধান্য দেওয়া হইত, তাহাতে শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অঙ্গচ্ছেদ হইলে যে 'লঘুপাপে গুরুদণ্ড' হইবে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই।"

যোগীন্দ্রবাবুর উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এস্থলে উপক্রম ও উপসংহার দেখিলে স্পষ্টতঃ মনে হয় অঙ্গচ্ছেদের সামান্য স্পর্শও নাই। পূর্ব্বেই উচ্চবংশীয় ও নিম্নবংশীয় ব্যক্তির প্রতিপদস্পর্শ প্রভৃতির শাস্তি বিহিত হইয়াছে। তৎপরে বিহিত হইয়াছে, 'কোন ব্যক্তির বস্ত্র, হস্ত, পদ, বা কেশ আকর্ষণ করিলে ছয় পণের ঊর্দ্ধে দণ্ড হইবে। অপরের শরীর পীড়ন, বেষ্টন বা আকর্ষণ করিলে অথবা অপরের অবয়বের উপর উপবেশন করিলে প্রথম প্রকারের দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" ইহার অব্যবহিত পরেই বিহিত হইয়াছে, "কাহাকেও ভূপাতিত করিলে...... অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে।" তৎপরে শূদ্র যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে ইত্যাদি রহিয়াছে। এস্থলে অঙ্গচ্ছেদের চিহ্ন যোগীন্দ্রবাবু কোথায় পাইলেন? ইহার পরেই দেখিতে পাই, "স্পর্শের জন্য যে দণ্ড হইবে, আঘাতের জন্য তাহার অর্দ্ধেক ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হইবে। এই নিয়ম চণ্ডাল ও অন্যান্য অপবিত্র জাতির প্রতিও প্রযোজ্য হইবে। হস্তদ্বারা আঘাত করিলে তিন পণ দণ্ড হইবে; পদদ্বারা আঘাত করিলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, যন্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে যদি কোন স্থান স্ফীত হয় তবে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। আঘাতে জীবন বিপন্ন হইলে মধ্যম প্রকারের দণ্ড হইবে।" এস্থলে অঙ্গচ্ছেদের চিহ্ন দেখিতে পাই না। যে স্থলে, "আঘাতে জীবন বিপন্ন হইলে মধ্যম প্রকারের দণ্ড হইবে" এইরূপ বিধান রহিয়াছে, সে স্থলে বা সেই প্রকরণে সামান্য আঘাতে 'অঙ্গচ্ছেদ' কখনই সম্ভব নহে। আরও কারণ বিদ্যমান। মারাত্মক আঘাতের বিষয় ইহার পরেই লিখিত আছে। নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, লৌহদণ্ড বা রজ্জুদ্বারা আঘাত করিলে চতুর্ব্বিংশতি পণ অর্থদণ্ড হইবে। দুষ্ট শোণিত ব্যতীত অপর শোণিতপাত হইলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। শোণিতপাত ব্যতিরেকে আঘাত করিয়া মৃতকল্প করিলে, হস্ত, পদ বা দন্ত ভঙ্গ করিলে কর্ণ বা নাসাচ্ছেদ করিলে এবং দুষ্ট ব্রণ কর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে প্রথম প্রকারের দণ্ড হইবে। ঊরু বা গ্রীবায় বা চক্ষুতে আঘাত করিলে অথবা যে আঘাতে আহার বা বাক্য রোধ হয় অথবা অঙ্গহানি হয়, সেই সকল অপরাধে

দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ড হইবে। অধিকন্তু আঘাতকারীর চিকিৎসার ব্যয়ও বহন করিতে হইবে।”

অঙ্গহানি বা কর্ত্তন প্রভৃতির দণ্ডবিধি পরে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য আঘাতের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। পণ্ডিতবর শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয়ও যাহা বলিয়াছেন তাহাও নিতান্ত সঙ্গত, প্রকরণ দেখিলে স্পষ্টতঃ বোধ হয় দণ্ড-পারুষ্য বা Assault এর জন্য এরূপ দণ্ড বিহিত হইতে পারে। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন কাহারও অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ হইত। অর্থশাস্ত্র দেখিলে ইহার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্ত্তে অর্থ দণ্ডই অনেক স্থলে বিহিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রকার চাণক্য যে মহান মতের উপরে দণ্ডনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা হইতে শূদ্রের সামান্য অপরাধে ওরূপ দণ্ড অসম্ভব। সাহসেও (Robbery) অনেক স্থলেই অর্থদণ্ডের বিধান রহিয়াছে, দস্যুতা বা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির জন্য যে স্থলে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা, সে স্থলে সামান্য আঘাতের জন্য অঙ্গচ্ছেদ কথনই সম্ভব নহে। ‘সাহস’ সম্বন্ধীয় বিধান (অর্থশাস্ত্রের ২১৬—২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, যোগীন্দ্র বসুর Edition) সাহসের দণ্ড বিধান সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকার যে একটী বিধান দিয়াছেন তাহা হইতেও আমার বাক্যের সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

গুরুদেবের মতে বল পূর্ব্বক নারী বা পুরুষকে বন্ধনাগারে রাখিলে অথবা তাহাদের বন্ধনাগার হইতে মোচন করিলে পাঁচশত হইতে সহস্র পণ দণ্ড হওয়া বিধেয়। এইরূপ দণ্ডকে সর্ব্বোচ্চ দণ্ড বলে।” ২১৭ পৃষ্ঠা। এরূপ স্থলে সর্ব্বোচ্চ দণ্ড ৫০০ হইতে ১০০০ পণ। আর সামান্য আঘাতে অঙ্গচ্ছেদ, কথনই সম্ভব নহে। দণ্ডের কঠোরতা যে নিতান্ত হেয় তাহা কৌটিল্য গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন, “বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি” শীর্ষক ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে চাণক্য নিজ শিক্ষকের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষকের মতে রাজা সর্ব্বদাই দণ্ড উত্তোলিত রাখিবেন। চাণক্য বলিতেছেন, “কিন্তু আমি [চাণক্য] বলি তাহা নয়; কেননা যাঁহারা প্রজাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তাঁহারা প্রজার চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া পড়েন, পক্ষান্তরে যাঁহারা মৃদু শাস্তি প্রদান করেন তাঁহারা ঘৃণার্হ হয়েন, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ দণ্ড প্রয়োগ করেন তাঁহারা পূজিত হয়েন, বিবেচনার সহিত দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজা ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং উহাতে অর্থ ও ভোগ বৃদ্ধি হয়। আর লোভ, ক্রোধ এবং অজ্ঞানতার বশে দণ্ড প্রযুক্ত হইলে উহাতে গৃহীর কথা দূরে থাকুক সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকেরও অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক করে।” এই সকল দেখিলে বোধ হয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েও বিশেষ সহৃদয়তার সহিত দণ্ডনীতির প্রয়োগ হইত। অর্থশাস্ত্র ও গ্রীকগণের বিবরণের মধ্যে অর্থশাস্ত্রের প্রাধান্যই স্বীকৃত হওয়া উচিত। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন খৃঃ ৪০৫—১১ পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালীর বিষয় অবগত হওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণও দেখিতে পাই ভারতীয় দণ্ডনীতি চৈনিক দণ্ডনীতি হইতে সমধিক কোমল। পরিব্রাজক ফাহিয়েন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের সাম্রাজ্যকালে

সুশাসনের ফলে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দস্যুর উপদ্রব ছিল না এবং সর্ব্বোপরি প্রজার স্বাধীনতা ছিল। দণ্ডনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রাণদণ্ড একপ্রকার হইত না, এবং বিশেষ গুরুতর অপরাধেই দক্ষিণ হস্তচ্ছেদ হইত। বিদ্রোহীর পক্ষেই এই দণ্ড বিহিত হইত। এই সময়ের দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা এস্থলে স্মিথ্ সাহেবের লিখিত অংশই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন হিন্দুভারতে "জীবনের মূল্য রক্ষিত হইত কি না।"

The region to the South of Mathura, that is to say. Malwa, specially excited the admiration of the traveller; who was delighted alike with the natural advantages of the country, the disposition of the people, and the moderation of the Government. The climate seemed to him very agreeable, being temperate and free from the discomforts of frost and snow with which he was familiar at home and in the course of his journey. The large population lived happily under a sensible Government which did not worry. With a glance at Chinese institutions, Fa-hien congratulated the Indians that they have not to register their house-holds, or to attend to any magistrates and rules. They were not troubled with passport regulations, or, as the pilgrim bluntly puts it: 'Those who want to go away, may go; those who want to stop may stop. The administration of the criminal law seemed to him mild in comparison with the Chinese system. Most crimes were punished only by fines, varying in amount according to the gravity of the offence, and capital punishment would seem to have been unknown. Persons guilty of rapeated rebellion, an expression which probobly include brigandage suffered amputation of the right hand; but such a penalty was exceptional, and judicial torture was not practised. The revenue was mainly derived from the rents of the crown lands, and the royal officers, being provided with fixed salaries, had no occasion to live on the people."

Ibid p. p. 281.

অর্থাৎ মথুরার দক্ষিণ অর্থাৎ মালব দেখিয়া ভ্রমণকারী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, জনসমাজের ব্যবহারে ও শাসন শৃঙ্খলার কোমল শাসনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশে এবং পথিমধ্যে বরফ ও হিমে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়া নাতিশীতোষ্ণ আব্‌হাওয়ায় পরিতুষ্ট হইলেন। মহান্ জনসংঘ সুখের সহিত সুশাসনে বাস করিত। সরকার তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিত না। চৈনিক শাসনশৃঙ্খলা দেখিয়া তিনি ভারতবাসীদিগের অবস্থায় হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসীগণকে যে

পত্রস্থালী রেজেষ্ট্রী করিতে হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট কানও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না।' ইহা দেখিয়া ভারতীয় অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় প্রজাগণের ছাড়পত্র নির্গমের জন্য বেগ পাইতে হইত না। তীর্থ যাত্রীদের ভাষায় বলিতে গেলে যাহারা যাইতে ইচ্ছুক যাইতে পারে। যাহারা বিশ্রাম করিতে চায় থামিতে পারে। চৈনিক দণ্ডনীতি হইতে ভারতীয় দণ্ডবিধি অধিকতর কোমল বলিয়াই তাঁহার বোধ হইয়াছিল। অপরাধের তারতম্যানুসারে প্রায় সকল অপরাধেই অর্থদণ্ড হইত। প্রাণদণ্ড এক প্রকার অপরিজ্ঞাত ছিল অর্থাৎ হইত না। যে সকল লোক বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছে তাহাদের দক্ষিণ হস্ত ছেদিত হইত। কিন্তু এরূপ শাস্তি বিশেষ ক্ষেত্রেই হইত। [illegible] [illegible] ভাবে দস্যুতাও অন্তর্নিবিষ্ট। [illegible] আদেশই প্রদত্ত হইত না। [illegible] রাজকীয় ভূমির খাজানা হইতে [illegible] এবং রাজকর্মচারীগণকে নির্দিষ্ট [illegible] প্রজাগণের উপরে নির্ভর [illegible] হয় না।"

চৈনিক পর্যটকের বিবরণে ভারতীয় সনাতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসন কাল প্রায় ৮০০ বৎসর ব্যবধান। আমাদের মনে হয় ভারতের সনাতনবিধির ঐতিহাসিক ধারা কেন্দ্রবিচ্যুত হয় নাই। শাস্ত্রীয় অনুশাসন বলেই দণ্ডনীতি পরিচালিত হইয়াছে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে সামান্য কঠোরতা পরিলক্ষিত হয় তাহার একমাত্র কারণ বিপ্লবের অন্তে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন আরোহণ করেন, বিপ্লবের অব্যবহিতপরে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে দেশকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকটা শৃঙ্খলার দরকার। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন দেশবাসীর পক্ষে শৃঙ্খল স্বরূপ ছিল না,—ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। কারণ অত্যাচার প্রতিহত করিবার শক্তি দেশে তখন জাগ্রত। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন তীব্রাতিতীব্র হইলে বিপ্লব অনিবার্য্য হইত। শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া চলা ভারতের অস্থিমজ্জাগত সংস্কার। অর্থশাস্ত্রকার চাণক্যের হৃদয়ে শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা দেখিতে পাই, গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য কালেও তাহা সুব্যক্ত। ইহা হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি ভারতের শাস্ত্রীয় অনুশাসন প্রাচীন ভারতের রাজনয়েও প্রতিফলিত হইয়াছিল। দেশের যাহা জিনিষ তাহার বিকাশ দেশেই সম্ভব। বহুশতাব্দীব্যাপী জাতীয় সাধনার ফলে যে শৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করে তাহাই জাতীয় জীবনের প্রধানতম উপাদান, ইহা বিস্মৃত হইলেই জাতীয় জীবন সংকুচিত ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। ইউরোপের দেশ বিশেষে যে শাসন শৃঙ্খলার অভ্যুদয় হইয়াছে সেই সেই দেশে সেই শাসন শৃঙ্খলাই শোভন। ফরাসী দার্শনিক অগষ্ট কোমতে একটি সার সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বহুশতাব্দীব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে জাতীয় জীবনে যে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার বিলোপ সাধন এক-রকম অসম্ভব।" অন্ততঃ দুই এক শতাব্দীর কার্য্য নহে। সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম অপ্রতিহত প্রভাবে বর্ত্তমান। যাঁহারা বিপর্য্যয় সাধন করিতে চান তাঁহারা ভ্রান্তির উপর ভবিষ্যতের সৌধ গড়িতে অগ্রসর হয়েন, এবং কার্ত্তিক গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসেন। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারেই জীবন গঠিত হইবে। জাতি

তাহার ইতিহাস ভুলিতে পারে না, ইতিহাসের পৃষ্ঠা মুছিয়া ফেলা সন্ন্যাসীর জীবনে সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সাধারণের জীবনে অসম্ভব। "বিশ্বমানব" "বিশ্বমানব" বলিয়া চিৎকার করিলেই মানুষ ইতিহাস ভুলিয়া, ইতিবৃত্ত ভুলিয়া একই মানব সমাজে পরিণত হইতে পারিবে না।

চৈনিক পর্য্যটক যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, প্রাণদণ্ড একপ্রকার হইত না। অঙ্গচ্ছেদও কদাচিৎ হইত। বিশেষ গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অঙ্গচ্ছেদও ছিল না। এই বিবরণে যে তথ্য প্রকট তাহাই মনুর অনুশাসনের প্রাণ।

"অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশ কালৌচ তত্ত্বতঃ
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥
অধর্ম্মদণ্ডনংলোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যংচ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি॥
বাগদণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্॥
বধেনাপি যদাত্বেতান্নিগ্রহীতুংন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্ব্বামপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্॥"

৮।১২৬—১৩০ [মনু]

অর্থাৎ অনুবন্ধ, দেশ কাল প্রভৃতি তত্ত্বতঃ জানিয়া সামর্থ্যও অপরাধ পর্য্যালোচনা করিবে, এবং তদনুসারে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিবে। অধর্ম্মপূর্ব্বক দণ্ডপ্রদান ইহলোকে যশোঘ্ন ও কীর্ত্তি নাশক এবং পরলোকে নরকপ্রদ, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। অদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে দণ্ড প্রদান করিলে এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে দণ্ড প্রদান না করিলে রাজা মহৎ অপরাধের ভাগী হয়েন, ও পরলোকে নরকভোগ করেন। প্রথম অপরাধে বাক্‌দণ্ড প্রদান করিবে অর্থাৎ সাবধান করিয়া দিবে, তৎপরের অপরাধে ধিক্ ধিক্ করিয়া তিরস্কার করিবে, ইহা সত্ত্বেও অপরাধ করিলে ধনদণ্ড বিধান করিবে অর্থাৎ জরিমানা করিবে, ইহাতেও সংশোধিত না হইলে শারীরিক দণ্ড প্রদান করিবে, শারীরিক দণ্ড প্রদত্ত হইলেও যাহাকে নিগৃহীত করা যাইবে না তাহার প্রতি এই চারি প্রকারের সমস্ত দণ্ডই প্রদত্ত হইবে। এ স্থলে 'বধদণ্ডমতঃ পরম্" দেখিয়াই যেন প্রাণ দণ্ড কেহ না বুঝিয়া বসেন। আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে ইহার সম্ভাবনাই সমধিক। কারণ উপক্রম উপসংহার ও প্রকরণ ইত্যাদি দেখিবার সময় আমাদের নাই। "বধদণ্ড" অর্থে যদি প্রাণদণ্ড হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকে "বধেনাপি যদাত্বেতান্নি গ্রহীতুংনশক্নুয়াৎ" এইরূপ লিখার কোনও তাৎপর্য্য থাকিত না। কারণ যাহার প্রাণ দণ্ড হইয়াছে তাহাকে পুনরায় নিগ্রহ করবার বিধান কখনই উন্মত্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারে না। অবশ্যই শাস্ত্র অধ্যয়নকালে বিশেষ প্রণিধানের সহিত পাঠ করা সঙ্গত বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হয়। সেই বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনুর এই বিধানে আমরা "জীবনের মূল্য" সবিশেষ স্ফুট দেখিতে পাই। এই বিধানের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতীয় দণ্ডনীতির প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রীয় অনুশাসনই ভারতীয় রাজধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা, উহাই আশ্রয়।

স্মৃতি-তর্পণ

(শ্রদ্ধেয় কবিবর সত্যেন্দ্রনাথের স্মরণে)

[শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক]

লুকিয়ে রেখে আপনাকে সে দেখিয়ে গেছে অনেক দেখার
আড়াল থেকে শিখিয়ে গেছে, শেখার মতন অনেক শেখার !
দেশ-বিদেশের পুণ্য-গাথায় চিত্ত তাহার উঠ্‌ত নেচে
দেশকে ভাল বাসতো বলেই "তীর্থ-রেণু" কুড়িয়ে দেছে !
"তীর্থ-সলিল" ছিটিয়ে দিয়ে ফিরিয়েছে মন পবিত্রতায়
সত্যেরে সে মানতো শুধু কাটিয়েছে দিন সত্য-সেবায় ।
"কুহু কেকা'র" রাগ-রাগিণী, "চীনের ধূপে"র গন্ধ ঘরে
"বেণু-বীণার" সুর মায়াবী আজও যে প্রাণ মায়ায় ভরে !
"ফুলের-ফসল" সৃষ্টি নূতন কল্পলোকের অতুল কবি
দিলে বলে'ই দেখতে পেলুম "তুলির লিখন" মোহন-ছবি,
"অভ্র-আবীর"ভাব-রাধিকার সঙ্গে হোলী খেলার প্রীতি
"হোম-শিখা" তার যোগ-জীবনের-যোগ্য-হোমের পুণ্য স্মৃতি !
তরুণ প্রাণের সোহাগ আদর উৎসাহ তার কম ছিল না
বন্ধু-প্রীতি ! বন্ধুরা তার ভাবছে কোথা মিলবে কি না !
জ্ঞান ছিল তার নাই তুলনা ! মান ছিল না একটু খানি
তেজ ছিল গো রৌদ্রক্ষরা, মধুর ছিল মিষ্ট বাণী !
মতের উপর মন ছিল তার ক্ষমা এবং দয়ায় ভরা
অহং ভাবের উর্দ্ধে জীবন জানতো সে জন বিধির গড়া ।
ভাবে যে তার বিপুল-গভীর জ্ঞানের কথা থাকত শুধু
ভাষায় যে তার ক্ষরতো কেবল নিরাশ মনের আশার মধু !
সে প্রকৃতির নন্দ-দুলাল ছিল মায়ের স্নেহের কোলে
জীবন ভরে গাইলে সে গান প্রাণের সাধা মিষ্ট বোলে
—মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে গেছে তোমরা ওগো আর ডে'ক না
"সত্য-স্মৃতি" রাখতে কি চাও ? মিথ্যা নিয়ে আর থেকো না ।

কাঠের গুঁড়ার ব্যবহার

(শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেব)

এমন এক দিন ছিল যখন প্রত্যেক লোকের এমন কি সমগ্র জাতির উন্নতাবস্থা এবং আড়ম্বরের মাপ কাঠি ছিল তাহার পরিত্যক্ত জিনিষ। তখন যে জাতি যত অধিক জিনিষ বৃথা নষ্ট করিতে পারিত সেই জাতিকে তত অধিক উন্নত বলা হইত। কিন্তু কালের ঘূর্ণনে আজকাল তাহার বিপরীত অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল যে জাতি যত অধিক পরিমাণে পরিত্যক্ত নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষের সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহাকে তত অধিক উন্নত বলা হইয়া থাকে। তাই আজকাল পৃথিবীতে উন্নত নামধারী হইতে হইলে যে সমস্ত জিনিষ আজ পর্য্যন্ত আমাদের কোন কাজে লাগে নাই সেই সমস্ত জিনিষ যাহাতে আমাদের কাজে লাগে তাহার উপায় বাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকগণ ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই আজকাল সেই সমস্ত দেশে সামান্য রাস্তার আবর্জ্জনা, শিঙের গুঁড়া, আলকাতরা, কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি চির পরিত্যক্ত জিনিষগুলি আর ফেলিয়া দেওয়া হয় না; এগুলি হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অশেষবিধ মূল্যবান্ জিনিষ প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বকালের "উন্নত" দেশগুলিতে রপ্তানী হইতেছে।

এই প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র কাঠের গুঁড়া হইতে কি কি জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, আশা করি পাঠকগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন বা না হউন এই সামান্য কাঠের গুঁড়া হইতে কি কি জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা জানিয়া রাখা খারাপ মনে করিবেন না এবং এই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের সহিত আমাদের দেশের শিল্পের কতদূর তারতম্য তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

কাঠের গুঁড়া হইতে আজকাল কৃত্রিম কাষ্ঠ প্রস্তুত হইতেছে। এই কৃত্রিম কাষ্ঠ আসল কাষ্ঠ অপেক্ষা দৃঢ়তায় বা অন্যান্য গুণে কোন অংশে খারাপ নয়। নকল কাষ্ঠ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ:—পাঁচ ভাগ ভাল সাধারণ শিরিস [Glue] এবং এক ভাগ উৎকৃষ্ট মৎস্যজাত শিরিস [isinglass] একটি পাত্রে রাখিয়া অল্প জল দিয়া গরম করিতে থাকুন, কিছুক্ষণ পরে দেখিবেন শিরিস জলে মিশিয়া গিয়াছে। জলের পরিমাণ এমন হওয়া চাই যে ঠাণ্ডা হওয়ার পর উক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ কেবল 'বসিতে' আরম্ভ করে মাত্র। দুই একবার পরীক্ষা করিয়া জলের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পটাশ ডাইক্রমেট জলে গুলিয়া দিলে বিশেষ ভাল হয়। তার পর এই মিশ্রিত তরল পদার্থের মধ্যে কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া একটি পিণ্ড প্রস্তুত করুন। ইহার পর একটি

ধাতব বা অন্য কোন রকম ছাঁচকে উত্তমরূপ তৈলাক্ত করিয়া কাঠের গুড়ার পিণ্ডদ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলুন। ছাঁচের ভিতরের প্রথমস্তরটি খুব সূক্ষ্ম কাঠের গুঁড়ার পিণ্ডদ্বারা প্রলেপের মত দিতে হইবে। সম্পূর্ণ ভর্ত্তি হইয়া গেলে পর একখানা ভারি পাথর দ্বারা চাপা দিয়া রাখিয়া দিন। একটু শুকাইয়া গেলে পরই উপরের পাথর খানা সরাইয়া এক খানা ভাল ছুরি দ্বারা উপরের দিকটা সমান করিয়া কাটিয়া ফেলুন। তার পর জিনিষটি ছাঁচ হইতে তুলিয়া আনিয়া পালিশ করিয়া ইচ্ছামত রঙ্গ দিয়া ফেলুন। এই উপায়ে কাঠের মূর্ত্তি ইত্যাদি যে কোন জিনিষ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে একটা কাঠের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ হইতে মূর্ত্তিটি খোদাই করিয়া লইতে হইত; ইহাতে কত পরিশ্রম এবং কত কাষ্ঠ যে বৃথা নষ্ট হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু আজকাল সামান্য পরিশ্রমে পরিত্যক্ত কাঠের গুঁড়া হইতে উক্ত কার্য্য সাধন করা হইতেছে।

পাকা বাড়ী করিতে হইলে বিলাতী মাটির [Cement] বিশেষ দরকার। কারণ বিলাতী মাটী দ্বারা আস্তর করিলে ইহা শুকাইয়া গেলে পর তাহাতে ছোট ছোট ফাটা দেখা যায়। এই দোষ নিবারণের জন্য আজকাল বিলাতী মাটির সহিত কাঠের গুড়া ব্যবহার করা হইতেছে। প্রথমতঃ কাঠের গুড়াকে উত্তমরূপ শুকাইয়া নিয়া একখানা চালুনি দ্বারা সূক্ষ্ম কণাগুলি চালিয়া ফেলুন। তার পর দুই ভাগ সূক্ষ্ম কাঠের গুড়ার সহিত এক ভাগ বিলাতী মাটী এবং দুই ভাগ বালুকণা মিশ্রিত করুণ এবং তৎপর এই মিশ্রণের সহিত দুই ভাগ চুণ মিশাইয়া আবশ্যক মত জল দিয়া সুরকী প্রস্তুত করুন। এই সুরকী [mortar] দ্বারা ইটগুলা গাঁথিলে আর ফাটিবার আশঙ্কা থাকে না।

কাঠের গুঁড়াকে জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারেনা বলিয়াই সাধারণ লোকের বিশ্বাস কিন্তু সামান্য পরিশ্রম করিলেই কাঠের গুঁড়া হইতে প্রচুর জ্বালানি কাষ্ঠ প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের দেশে প্রচুর গঁদ বৃথা নষ্ট হইয়া যায়; এই গঁদের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাঠের গুঁড়া ফেলিয়া দিন এবং মিশ্রিত পদার্থকে একটি পিণ্ডাকারে পরিণত করুন। তার পর ইহা হইতে চতুষ্কোণ বা চোঙ্গার মত জিনিষ প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট জ্বালানি কাষ্ঠ হইল। যেখানে আলকাতরা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে গঁদের পরিবর্ত্তে আলকাতরা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ আগুণ জ্বালানের জন্য কাঠের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না কেননা প্রথম আগুণ জ্বালানের জন্য সহজদাহ্য কোন জিনিষের বিশেষ আবশ্যক না হইলে অনেক সময় আগুন জ্বালান বিশেষ যন্ত্রনাদায়ক হইয়া পড়ে। সামান্য কাঠের গুঁড়া হইতে যে এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী সহজদাহ্য জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। বাজারে নেপ্‌থেলীন (Napthelene) অতি সস্তায় কিনিতে পাওয়া যায়। একটু গরম করিলেই এই নেপ্‌থেলীন গলিয়া যাইবে, তখন ইহাতে কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া পিষ্টকাকারে প্রস্তুত করা অতি সহজ। এই উপায়ে দুই চারি

পয়সা খরচ করিয়া অনেকগুলি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে পারেন। এগুলিতে আগুণ দিলে অতি সহজেই জ্বলিয়া উঠে। এই উপায়ে অনেক কেরোসিন বাঁচান যাইতে পারে এবং ইহাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হইবে।

আমাদের দেশের সহরাদিতে যে সমস্ত মাছ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ দুই তিন দিন দূরের পথ হইতে রেলগাড়ী করিয়া আনা হইয়া থাকে। মাছ সাধারণতঃ এক দিনেই পচিয়া যায়, সেই জন্য এই সমস্ত মাছ বরফ চাপা দিয়া আনা হইয়া থাকে। এই বরফ আবার যেথানে ইচ্ছা প্রস্তুত করা যায় না, কেননা বরফ প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক রকম বড় বড় যন্ত্রের আবশ্যক; সেই জন্য প্রায়ই বড় বড় সহরে বরফ প্রস্তুত হইয়া যেথান হইতে মাছ আসে সেথানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। খোলা বাতাসে বরফ রাখিলে উহা অতি শীঘ্রই গলিয়া জল হইয়া যায় সেইজন্য বরফ পাঠাইবার সময় কাঠের গুঁড়া দ্বারা আবৃত করিয়া পাঠান হইয়া থাকে। বেশী দূরে পাঠাইতে হইলে একটি বাক্সের মধ্যে প্রথমে তলায় কাঠের গুঁড়া দেওয়া হয়, তৎপর ইহার উপর বড় একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিয়া তাহার চতুর্দ্দিক কাঠের গুঁড়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কাঠের গুঁড়া দ্বারা আবৃত থাকিলে বরফ না গলিবার কারণ এই যে কাঠের গুঁড়ার মধ্য দিয়া তাপ খুব কম চলিতে পারে সুতরাং বাহিরের উত্তাপ বরফের গায় না লাগাতে উহা শীঘ্র গলিতে পারে না। মাছ পাঠাইবার সময়েও মাছগুলিকে বরফ দ্বারা ঢাকিয়া একটি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া কাঠের গুড়া দ্বারা বরফের চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া দিতে হয়, কেননা বরফ যদি শীঘ্র গলিয়া ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে মাছ নষ্ট হইয়া যাইবে।

কাঠের গুড়াকে ইন্ধনরূপে (fuel) ব্যবহার করিবার জন্য অনেক দিন হইতেই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ইতি পূর্ব্বে এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। কাঠ এবং কয়লা দ্বারা কত কাজ করা হইতেছে; যদি এই সকল কাজে কাঠের গুড়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা হইলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। আজ কাল অনেক নূতন ধরণের যন্ত্র বাহির হইয়াছে যাহা দ্বারা পূর্ব্বে যেথানে কাঠের ব্যবহার ছিল সেথানে কাঠের গুড়ার ব্যবহার লাভ জনক বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমাদের দেশে কাল এবং লাল এই দুই রকম মাটির কলসী দেখিতে পাওয়া যায়। লাল কলসী অপেক্ষা কাল কলসীর আদর অধিক এবং দামও বেশী। লাল কলসী অপেক্ষা কাল কলসী দেখিতে বেশী সুন্দর এবং ইহা অধিক দিন স্থায়ী বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। আমাদের দেশের কুম্ভকারেরা কি উপায়ে এগুলি প্রস্তুত করে জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে অতি সহজেই কাল কলসী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কুম্ভকারদের বাসন পোড়াইবার একরকম চুলা (hearth) আছে এইগুলি এমনভাবে প্রস্তুত যে ইহার নীচ দিক খোলা থাকে এবং উপরে কাঁচা বাসন সাজাইয়া রাখা হয় এবং সমস্ত বাসন সাজান হইয়া গেলে পর ইহার উপর এক স্তর খড় দিয়া তাহার উপর কাদা দিয়া বেশ একটা প্রলেপ দেওয়া হয়। তার পর কুম্ভকারেরা এই নীচের খোলা দিক দিয়া কাঠ পোড়াইয়া উত্তাপ দিতে থাকে অনেক সময় ভিতরে

প্রচুর কাঠ দিয়া সামান্য দুই একটী পথ রাখিয়া কাঠ দিবার পথটিও বন্ধ করিয়া দেয় তখন খুব উত্তাপ হইয়া থাকে। আমি যে উপায়ে বাসন কাল করিবার কথা বলি তাহা এই :—যে ভাবে সাধারণতঃ বাসন পোড়ান হইয়া থাকে ঠিক সেই রকমেই সব প্রস্তুত করিতে হইবে কেবল বাসন গুলি কাঠের গুড়া দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতে হইবে। তার পর আগের মত কাঠ পোড়াইয়া তাপ দিতে হইবে। কাঠের গুঁড়া জ্বলিতে আরম্ভ করিবে; এই অবস্থায় দশ বার ঘণ্টা তাপ দিলে পর কলসীগুলি কাল হইয়া যাইবে। তার পর এই কলসীগুলিকে খড়ের আগুণ দ্বারা কিছুক্ষণ তাপ দিলে পর সম্পূর্ণ কাল হইয়া যাইবে। ইউরোপে এই উপায়ে মাটির বাদা রঙ্গের নল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

কাঠের গুঁড়া হইতে বোতলের বা অন্যান্য কার্য্যোপযোগী উত্তম ছিপি প্রস্তুত হইতে পারে। ছিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই রকম :—একটা সরু গোলাকার কাষ্ঠ দণ্ড লইয়া একটি ভাল আঁটা যুক্ত তরল পদার্থের মধ্যে ডুবাইয়া নিন। তৎপর এই কাষ্ঠ দণ্ডটি কাঠের গুঁড়ার মধ্যে কিছুক্ষণ গড়াইয়া লউন; কাঠের গুঁড়া উক্ত দণ্ডের চতুর্দ্দিকে লাগিয়া যাইবে, এইরূপে যতক্ষণ ইহা ছিপির মত বড় না হয় ততক্ষণ উক্ত কাঠের গুঁড়ার মধ্যে আঠা লাগাইয়া ইহাকে কাঠের গুঁড়ার মধ্যে গড়াইতে হইবে। তার পর ইহাকে চাপ দিয়া উপর দিক সমান করিয়া লউন। তার পর উহা হইতে ছোট ছোট ছিপি কাটিয়া তাহাদের অর্দ্ধেকাংশ গলিত মোমের মধ্যে ডুবাইয়া লইলেই উত্তম ছিপি হইল।

কাঠের গুঁড়া হইতে আজ কাল প্রচুর পরিমাণে অক্সেলিক এসিড্ (Oxalic Acid) প্রস্তুত করা হইতেছে। সাধারণ অক্সেলিক এসিড্ প্রায় সমস্তই আজকাল কাঠের গুঁড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঠের গুঁড়া হইতে অক্সেলিক এসিড্ প্রস্তুত করিতে হইলে দুইটি জিনিষের বিশেষ দরকার—কষ্টিক সোডা (Caustic Soda) এবং কষ্টিক্ পটাশ (Caustic Potash)। কষ্টিক্ সোডার দাম কষ্টিক্ পটাশের দাম অপেক্ষা অল্প; কিন্তু কেবল 'কষ্টিক্ সোডা' ব্যবহার করিলে কাষ্ঠের ওজনের শতকরা তেত্রিশভাগ মাত্র অক্সেলিক এসিডে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে 'কষ্টিক পটাশ' ব্যবহার করিলে কাঠের ওজনের শতকরা একাশি ভাগই অক্সেলিক এসিডে পরিণত হয়। কষ্টিক পটাশ এবং সোডা সমান ওজনে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে শতকরা আশি ভাগই অক্সেলিক এসিডে পরিণত হয়। সেই জন্য কষ্টিক পটাশ এবং কষ্টিক সোডা সমান ওজনে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সমান ওজনের কষ্টিক পটাশ এবং সোডা জলের মধ্যে মিশ্রিত করিতে থাক যেপর্য্যন্ত না উক্ত মিশ্রণ জল অপেক্ষা $\frac{২৭}{২০}$ গুণ ভারী হয়। কোন তরল পদার্থ জল অপেক্ষা কত গুণ ভারী বা হাল্কা তাহা নির্ণয় করিবার এক প্রকার যন্ত্র আছে, ইহাকে হাইড্রোমিটার Hydrometer) বলে। ইহার সাহায্যে অতি সহজে কোন তরল পদার্থ জল অপেক্ষা কত গুণ ভারী বা হাল্কা নির্ণয় করা যায়। সাধারণ হাইড্রোমেটারের গায়ে অনেকগুলি সংখ্যা লিখা আছে; ইহাকে যে কোন তরল পদার্থের মধ্যে ভাসাইয়া দিলে ইহার কতক অংশ ডুবিয়া যায়। যে চিহ্ন পর্য্যন্ত হাইড্রোমেটার তরল পদার্থে ডুবিয়া যায় সেই চিহ্নে যে সংখ্যা লেখা থাকে তাহাই

সেই তরল পদার্থ জল অপেক্ষা কত গুণ ভারী বা হাল্কা নির্দ্দেশ করে। তার পর একভাগ কাঠের গুঁড়ার সহিত তিন ভাগ উপরোক্ত মিশ্রণ ওজন করিয়া মিশ্রিত করুন। তৎপর ইহাকে একখানা লোহার থালার উপর পাতলা স্তরে বিস্তৃত করুন। তার পর ইহাকে সাবধানের সহিত গরম করিতে থাকুন যেন কোন অংশ জ্বলিয়া না যায়। ক্রমাগত এই মিশ্রিত পদার্থকে নাড়া চাড়া করিতে থাকুন। একটি বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্র (Thermometer in centigrade scale) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যেন তাপ ২৫০° ডিগ্রীর উপরে না উঠে। কিছুক্ষণ তাপ দেওয়ার পর মিশ্রিত জিনিষগুলি একটি তরল পদার্থে পরিণত হইবে। তখন ইহাকে কিছু জলে ফেলিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লউন। তার পর ইহাকে জ্বাল দিয়া গাঢ় করিতে থাকুন যে পর্য্যন্ত না অক্সেলিক এসিড্ জাত এক প্রকার লবন স্ফটিকাকারে (crystal) পৃথক হইয়া যায়। তার পর এগুলিকে ছাকিয়া লইয়া গরম জলে দ্রব করিয়া চুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিলে পর অক্সেলিক এসিড্ জাত আর এক প্রকার লবণ নীচে পড়িয়া যাইবে। এই লবণকে ফিল্টার করিয়া পৃথক করিয়া ফেলুন; এই প্রক্রিয়ায় যে তরল পদার্থ পাওয়া গেল ইহা কষ্টিক পটাশ এবং সোডার মিশ্রণ সুতরাং ইহা আরও কাঠের গুড়ার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় যে লবণ পাওয়া গেল তাহাতে গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric acid) দিলে পর অক্সেলিক এসিড্ তরল পদার্থে চলিয়া যাইবে; উহাকে ফিল্টার করিয়া আনিয়া গাঢ় করিলেই অক্সেলিক এসিড্ স্ফটিকাকারে পাওয়া যাইবে। এই অক্সেলিক এসিড্ এবং ইহা জাত লবণ আজকাল প্রচুর পরিমানে বিবিধ শিল্পে ব্যবহার হইতেছে; সুতরাং ইহার ব্যবসায় বিশেষ লাভ জনক।

বায়ু সংস্রবশূণ্য অবস্থায় কাঠ চুয়াইয়া (Dry distillation) তাহা হইতে অনেক জিনিষ বাহির করিতে পারা যায়। একটা সরু মুখ বিশিষ্ট পাত্রের মধ্যে কয়েকখণ্ড শুক্না কাঠ রাখিয়া একটি ছিপি দ্বারা ইহার মুখ বন্ধ করিয়া দিন। ছিপির মধ্যে পূর্ব্ব হইতে একটি ছিদ্র করিয়া রাখুন। অপর একটি পাত্রের মুখ এইরূপ একটি ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া দিন্; তারপর একটি কাচের বা লোহার সরু নল বক্র করিয়া উক্ত ছিপি দুইটির ছিদ্র দিয়া ঢুকাইয়া দিয়া উভয় পাত্রের সংযোগ করিয়া ফেলুন। তারপর একটি পাত্রকে আগুণের উপর বসাইয়া তাপ দিতে থাকুন অপর পাত্রটি অন্য একটি বড় পাত্রের মধ্যে রাখিয়া আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া দিন। জল যাহাতে গরম হইয়া না উঠে সেই জন্য কিছুক্ষণ পরই জল বদলাইয়া দিতে হইবে। প্রথম পাত্রটি গরম হইতে আরম্ভ করিলেই ইহার মধ্যস্থ কাঠ হইতে বাষ্পাকারে অনেক পদার্থ উঠিতে থাকিবে এবং দ্বিতীয় পাত্রে উপস্থিত হইয়া সেই ঠাণ্ডা পাত্রের সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া তরল পদার্থরূপে পাত্রের তলায় জমিয়া থাকিবে। এইরূপ কতক্ষণ উত্তাপ দিলে পর কাঠ অঙ্গার হইয়া প্রথম পাত্রেই থাকিবে এবং দ্বিতীয় পাত্রে অনেক তরল পদার্থ সঞ্চিত হইবে। তারপর দ্বিতীয় পাত্রটিকে কতক্ষণ রাখিয়া দিলে পর ইহার মধ্যস্থ তরল পদার্থ দুই স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহার উপরের জলীয় ভাগকে পাইরোলিগনিয়াস এসিড্ (pyroligneous

acid) এবং নীচের ভাগকে আলকাতরা [Tar] বলে। এই আলকাতরা এবং জলীয় ভাগ হইতে মিথিল এল্‌কহল [methyl alcohol], এসেটিক্ এসিড [acetic acid], জমির সার [manure], নানাবিধ রং এবং অন্যান্য কত রকম জিনিষ যে প্রস্তুত হইতেছে তাহার সীমা নাই। প্রথম পাত্রে যে অঙ্গার থাকে তাহার আদর খুব বেশী। ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকাল কোটি কোটি মন কাষ্ঠ প্রতিবৎসর এইরূপ চুয়ান হইতেছে। এখন কাঠের গুড়াকে এইভাবে চুয়ান যায় না তাহার কারণ [১] কাঠের গুড়াতে জলীয় ভাগের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক [২] ইহাতে রজনের ভাগ খুব বেশী এবং সেই জন্য ইহা সহজেই অঙ্গার হইয়া কঠিন আবরণরূপে পরিণত হয় সুতরাং এই কঠিন আবরণের ভিতরস্থ কাঠের গুড়া অমনিই থেকে যায়; [৩] সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কারণ এই যে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কাঠের গুড়ার ভিতর দিয়া তাপ চলিতে পারে না সুতরাং পাত্রের মধ্য ভাগের কাঠের গুড়া কাঁচা থাকিয়া যায়। হালিডে নামক এক জন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি এই যন্ত্রের আরও উন্নতি করিয়াছেন; এই যন্ত্র দ্বারা কাঠের গুড়া আজকাল কাঠেরই মতন চুয়ান হইতেছে।

বড় বড় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ একযোগে বলিতেছেন যে আজকাল কেরেসিন তৈল এবং পেট্রোল ইত্যাদি যে ভাবে খরচ হইতেছে যদি ঠিক এভাবে খরচ হইতে থাকে তবে ১৯৯০ খৃঃ মধ্যেই ভূগর্ভস্থ সমস্ত তৈল শেষ হইয়া যাইবে এবং যে ভাবে প্রতিবৎসর আমাদের খরচ বৃদ্ধি হইতেছে যদি এই হারে ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি হইতে থাকে তবে ভূগর্ভে এখন যত তৈল আছে তাহাতে ১৯৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত আমাদের কোন রকমে চলিতে পারে। কয়লার সম্বন্ধেও ঠিক এই রকম কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা এবং তৈল ফুরাইয়া গেলে রেলগাড়ী কল কারখানা এমন কি আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলি কি ভাবে পরিচালিত হইতে পারে সেই বিষয় নিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মত এই যে কয়লা এবং তৈল ফুরাইয়া গেলে সুরাসার [alcohol] দ্বারা আমাদের সমস্ত কাজ চালান যাইবে। তাই আজকাল কি ভাবে কম খরচে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পাবে তাই নিয়া সকল জাতিই চিন্তা করিতেছেন। জার্ম্মানী আলুর চাষ করিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চাহিতেছে। সে সব কথা এই প্রবন্ধের বাহিরে বলিয়া সেই বিষয়ে আর কিছু বলিতেছি না। আজ কাল কোন উপায়ে কাঠের গুড়া এবং খড় ইত্যাদি হইতে সুরাসার বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে; এবং এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হওয়া গিয়াছে। আমেরিকার দুইটি বড় কারখানায় আজকাল কাঠের গুড়া হইতে সুরাসার বাহির করা হইতেছে। কাঠের গুড়া হইতে সুরাসার বাহির করিতে হইলে কাঠের গুড়াকে গন্ধক দ্রাবক বা লবণ দ্রাবক মিশ্রিত জলদ্বারা চাপ যন্ত্রের মধ্যে [under pressure] রাখিয়া অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিতে হইবে; ইহাতে কাঠের গুড়ার কতক অংশ এক প্রকার চিনিতে পরিণত হয়। তার পর চূণ ঢালিয়া এসিড দূর করিয়া জলীয় ভাগটি ফিল্টার করিয়া পৃথক করিয়া ফেলুন। তারপর ইহাতে সামান্য কতক জীবাণু [yeast] দিয়া রাখিয়া দিলে সমস্ত চিনি সুরাসার হইয়া

যাইবে ; তার পর ইহাকে অন্যান্য যন্ত্র দ্বারা জল ইত্যাদি হইতে আলগাইয়া লইলেই উত্তম সুরাসার প্রস্তুত হইল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পয়তাল্লিশ পাউণ্ড কাঠের গুড়া হইতে কিঞ্চিদধিক তিন পাউণ্ড সুরাসার পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে যখন আরও উন্নত যন্ত্রের আবিষ্কার হইবে এবং যখন সুরাসারের উপরই সমস্ত কল কারখানা নির্ভর করিতে হইবে তখন বোধ হয় শতকরা নব্বই ভাগ কাঠের গুড়া সুরাসারে পরিণত করিবার ব্যবস্থা বাহির হইবে।

আর কয়েকটি শিল্পে কাঠের গুড়ার অল্পাধিক ব্যবহার আছে। এক রকম বারুদ প্রস্তুত করিবার সময় অন্যান্য উপকরণের সহিত কাঠের গুড়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অনেক বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে অল্পাধিক কাঠের গুড়ার ব্যবহার হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসিনী

[শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী]

হে জননি ! অয়ি প্রিয় জন্মভূমি মম !
জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতা অতুল বৈভব
যাহা লয়ে ছিলে গর্ব্বে রাজরাণী সম
বিশ্বের বরেণ্য হয়ে তব সে গৌরব
লুপ্ত আজি চিরতরে ধরাতল হ'তে।
তুমি আজি সগৌরবে ভিক্ষাবৃত্তি ধরি
দু'মুটো অন্নের তরে দাঁড়ায়েছ পথে
রুক্ষকেশে শুষ্কমুখে ছিন্নবস্ত্র পরি,
কি গভীর প্রেম ভরে সন্ন্যাসিনী সাজি-
আপনার সরবস্ব বিলায়েছ পরে
বিশ্বের সেবায় প্রাণ উৎসর্গিয়া আজি—
অভাবে অটল তবু আছ হর্ষ ভরে।
হেরি মাতঃ মৃত্যুঞ্জয়ী ত্যাগমূর্ত্তি তব
ধূলি সম মনে হয় বিশ্বের বৈভব।

হরতন

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

(১)

বাপ মা ঘনশ্যাম বাবুর নামটী বেশ মানানসই করিয়া রাখিয়াছিলেন। তার বর্ণটী ঠিক কালবৈশাখীর মেঘের মতই ঘন এবং শ্যাম, আর চক্ষু দুটী পটল-চেরা না হইয়া ছোট কালজামের মত। রাগিলে সে চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিত, ঘুমাইলে সে ঘনশ্যাম বদনমণ্ডলে তাহাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইত না।

কবে মান্ধাতার আমলে এণ্ট্রেন্স ফেল্ করিয়া সে দেশের কাজে লাগিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায়না। পিতৃভূমিতে কেবল দূর সম্পর্কীয়া বুড়ী জ্যেঠাই মা ও তার একটী বোন্-ঝি আছে। ঘনশ্যাম সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দেশে আসিয়া কৃষকমহলে লেখাপড়া শিখাইতেছে; ধর্ম্মঘটের নীতি প্রচার, রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ, স্কুল-কলেজ ত্যাগ, মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র প্রচার, এ সব ত আছেই। স্কুল-ছাড়া ছাত্রগণের একটী প্রকাণ্ড দল তার পিছনে পিছনে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে।

ঘনশ্যাম বলিল, "চণ্ডী' তোমাকে স্বরাজ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আজ মণ্ডল গ্রামে গিয়া সেখানে মিটিং কর।'

ফোর্থ্ ক্লাশের ফেরৎ চণ্ডীচরণ বলিল, "গুরুদেব, মিটিং যে কেউ শুনতে চায় না। কেবল কতকগুলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে জটলা করে, মজা দেখে আর ভুঁয়ে পটকা ছোড়ে।'

'আচ্ছা, তুমি তা হলে হাঁসপাতালের ভার নাও। ঈশ্বরচন্দ্র যাও।'

ঈশ্বরচন্দ্র সেকেণ্ড্ ক্লাশের ফেল্-করা। তার বাবা জমীদারের গোমস্তা। সে স্বদেশী বিড়ীর পরম ভক্ত—বিলাতী সিগারেট কখনো ব্যবহার করে না। সে কহিল, 'গুরুদেব, লেক্‌চারে রসদ চাই

গুরুদেব কহিল, 'বেশ, কোঁচড় ভরিয়া মুড়ি বাতাসা নিয়ে যাও।'

নেতার আদেশে এক একজন দিক্‌পাল এক একদিকে বাহির হইয়া গেল।

(২)

শ্রাবণের দ্বিপ্রহরের মেঘান্ত রৌদ্র। কোথাও একটু বাতাস নাই। ঘরের দাওয়ার এককোণে ঘনশ্যাম বিপুল দেহ খানি লইয়া পল্লীসংস্কারের রিপোর্ট লিখিতেছে।

'ও ঘনু, খাবি কখন বাবা, বেলা যে গড়িয়ে গেল!"

ঘনশ্যাম তন্ময়। দর্জ্জিসাহেবের মত নাসিকাগ্রের চশমা নাসিকাস্তে ঠেকিয়া আছে, অঙ্গুলির মধ্যে বেশ মোটা একটী কলম, আর রাশি রাশি বালির কাগজ পত্র চারিদিকে ছড়ানো। পৈতৃক বন্দোবস্তে ভাতের ভাবনাটা আর ভাবিতে হয় না, আর বিবাহের বয়স পার না হইলেও অকৃতদার বলিয়া পুরামাত্রায় দুশ্চিন্তাহীন।

'দাঁড়াও জেঠী, আগে দেশ-সেবা না, আগে আত্ম-সেবা?'

অক্ষরজ্ঞানবিবর্জ্জিত, পাড়া গেঁয়ে জ্যেঠি

অত দেশটেশ বুঝিতেন না! তিনি ভাবিতেন, ঘনশ্যাম কালক্রমে একটা মস্ত বড় লোক হইবে। গরীবের ঘরে সে কৃষ্ণোপম মূর্ত্তিতে শুধু ছলনা করিতে আসিয়াছে, কেবল তার বাঁশী ও কদমতলা নাই—এই যা তফাৎ। তিনি তাঁর বোন্‌-ঝি পরিকে বলিলেন, 'ও পরি, যা মা, ঘনুকে একটু পাখা কর।"

পরিকে বড় সুন্দর দেখিতে। তার পুরানাম পরিমল! নামটা বোধহয় কর্ত্তার আমলের, কারণ কর্ত্তানাকি খুব সৌখীন ছিলেন। পরিমল সব কার্য্যেই নিপুণা। তার আদরের বিড়াল 'হরতন' প্রভুপাদ পদ্মে একটু জায়গা করিয়া লইয়াছিল। ঘনশ্যাম রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সজোরে পা ছড়াইয়া দিল। চমকিত হরতন তিড়িং করিয়া লাফাইয়া সম্মুখের পা দুটীতে ভর দিয়া ত্রিভঙ্গ ধনুকের মত আলস্যত্যাগকরতঃ পরীর গায়ে গা ঘসিতে লাগিল।

'কি রে, তোর খাওয়া হয়নি?'

'তোমার যে হয়নি দাদা।'

ঘনশ্যাম সেই লাবণ্যময় সরল সুন্দর কোমল মুখখানির দিকে একবার চাহিল মনে মনে ঘনশ্যাম পরীকে ভালবাসিত কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে দেশ সেবার কার্য্যে আলস্য হইলে প্রিয় বিড়াল হরতন দুইজনের মধ্যে একটা ঘটকালি করিত। বৃদ্ধা জ্যেঠী মনে করিতেন, 'পরীকে নিশ্চয়ই ঘনু বিয়ে করবে, তবে দেশে নাকি কি একটা মন্বন্তর এসেছে, এটা একটু কমুক।'

পরী ভাবিত, 'হরতন আমাকে ভালবাসে।'

ঘনশ্যাম ভাবিত, 'আগে দেশ, না আগে বিবাহ?'

হরতন কি ভাবিত তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে সে দুইজনের গায়ে জড়াইয়া অব্যক্তগুরুস্বরে শব্দ করিতে করিতে যখন গভীর আনন্দে ল্যাজ নাড়িত, তখন মনে হইত তার ভিতরের কথাটা এই—'তোমরা কি খাওয়াদাওয়া ভুলে গেলে গা? আমি বেচারা যে মারা যাই!'

ফলতঃ ব্যাপারটা সুবিধার দিকে মোটেই অগ্রসর হয় নাই।

[৩]

আজ কদিন ধরিয়া হরতনের দেখা নাই। ঘনশ্যামের দেশসেবাও আপাততঃ স্থগিত আছে। বিকালে ঘনশ্যামের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে নামকাটা ছাত্রদের এক মস্ত সভা বসিল। গুরুদেব সভাপতি। ব্যাপার জরুরী। হরতন চুরির তদন্ত। গ্রামের জমীদার পুত্র অরুণ কুমার পরীকে দেখিয়া নাকি মুগ্ধ হইয়া তার সখের হরতনটীর গলায় শিকল দিয়া তাঁহাদের সিংহদ্বারের সম্মুখে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হরিহর, বিষ্ণু, চণ্ডীচরণ, বোকারাম—সকলেই তাহা দেখিয়া আসিয়াছে।

সভাপতি প্রথম প্রস্তাব করিবার মুখবন্ধে বলিলেন, আজ আশ্রমের মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা অসহযোগী বলিয়া আমাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারিব না। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের আশ্রম-ভগিনী এই সরলা বালিকাকে কেমন করিয়া মরিতে দেখিব? সে তার আদরের পোষ্যটীর বিরহে আজ তিনদিন অনাহারে আছে। আমার মতে তাহার সেবার জন্য, প্রীতির জন্য, জীবনের জন্য, শক্তিমানের বিরুদ্ধে আমাদের খড়্গ উত্তোলন করিতে হইবে। সেই জন্য আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে জমীদারের দরোয়ান গুমা সিংএর বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রা। কারণ সে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল।'

প্রস্তাব সমাপ্ত হইতে না হইতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পলাতক ছাত্র বোকারাম বলিল, 'আমি গুরুদেবের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।' বোকারাম বোকা হইলে কি হয়, তার গায়ে অসুরের ক্ষমতা। সে হেড পণ্ডিতের টিকিতে টিক্‌টিকি বাঁধিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে তিনি তাহাকে বিনাবাক্যব্যয়ে সংস্কৃতে পাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

দস্তিদারের পিতা অধিক্ সুদে টাকা খাটাইত। সে নন্-কো-অপারশনের চারি বৎসর পূর্ব্বেই স্কুল ছাড়িয়াছে। ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়া ঘনশ্যাম তাহাকে একটু খাতির করিত, কিন্তু এই বীরচূড়ামণি সম্মুখ সমরে বড় রাজী নয়। সে বলিল, 'আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে গুরুদেব স্বয়ং আমাদের যুদ্ধদলটী সমর ক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন ও আমাদের আশ্রমলক্ষ্মীও আমাদের অনুগামিনী হইবেন। তাহা হইলেই বিজয়শ্রী আমাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন। দস্তিদার বটতলার নভেল উজাড় করিয়াছে ও যাত্রার দলে লক্ষ্মণ এবং অর্জ্জুন সাজিয়াছে। সকলেই করতালি সহযোগে যখন এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল, তখনও পরীর অস্ফুট ক্রন্দন জ্যেঠাইমার ঘর হইতে শোনা যাইতেছে। বক্তৃতা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় শিবচক্ষু হইয়া বলিলেন, 'সাধু সাধু!' সভা ভঙ্গ হইল।

[৪]

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। জমীদারের বাড়ীর কলকূজন থামিয়া গিয়াছে। কেবল বাহিরে দেউড়ীতে শুয়া সিং সিদ্ধির নেশায় খাটিয়াতে বিভোর হইয়া শুইয়া একটা পুবাণো ভৈঁরো রাগিণী ভাঁজিতেছে। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর বর্ষারাত্রি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। ঘনশ্যাম পাগড়ি বাঁধিয়া লাঠি হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়াছে, তৎপরে পরী—মাথায় গতবর্ষের ব্যবহৃত সরস্বতীর শোলার মুকুট, হাতে শড়কি, কটিতটে অঞ্চল বেষ্টন। তারপর মশাল হস্তে সেই অক্ষৌহিণীর দল। বোকারাম বলিল, 'গুরুদেব, আজ্ঞা করুন, পিছন হইতে আক্রমণ করি।' দস্তিদার বলিল 'আগে শত্রু পক্ষের সেনাপতি শুয়া সিংকে বন্দী করা হউক।' গজানন ফাষ্ট ক্লাশের ফেরৎ, সে বলিল, 'না আমরা ট্রেঞ্চ্ ফাইট্ করিব।' দূরে জলাভূমি হইতে ভেকধ্বনি ও সম্মুখে বুভুক্ষু হরতনের আর্ত্ত 'মিউ-মিউ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না। শুয়া সিং দেউড়ীর কাছে সমবেত জনতার অস্পষ্ট গুঞ্জন ও গুরুগম্ভীর একটা 'বন্দে মাতরং' শব্দ শুনিয়া চোর ডাকাতের আবির্ভাব হইয়াছে বিবেচনা করিয়া খাটিয়ায় উঠিয়া বসিল। 'কোন্ হ্যায় রে?'

বোকারাম বলিল, 'আমরা কামান দাগিয়াছি, ইচ্ছা হয়ত কামানের উত্তর দিতে পার। অন্য উত্তর "নট্ টেক্!' দরোয়ান ভাবগতিক ভাল নয় বুঝিয়া সাহায্যার্থে ডাকিল, 'এ মাধো সিং, হীরালাল, ছক্কু, এ শিউচরণ, চৌবে! আবে দেউড়ীকাপর চোট্টালোগ্ আয়া! আরে জলদী আইয়ে রে!'

মুহূর্ত্তমধ্যে শুয়া সিং বোকারামের স্কন্ধে উঠিয়া ধরাতলে শায়িত হইল। হরতন্ শিকল খোলা পাইয়া পরীর কোলে আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে মুক্তির আনন্দে

মুক্তিদাতা ঘনশ্যামের পানে মিটি-মিটি চাইতে লাগিল। এমন সময় উচ্চ দ্বিতল হইতে অরুণকুমারের বন্দুক ডাকিল—'গুড়ুম্!'

সমস্ত পল্লী সেই শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। যোদ্ধাব দল তখন ঘনশ্যামের গৃহদুর্গের সন্ধানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে।

'পরী, কাঁদিসনে, আর ভয় নেই। আর এইটুকু রাস্তা। তুই না থাকিলে কি আজ যুদ্ধে জয় করে হরতনকে ফিরে পাওয়া যেত?'

ঘনশ্যাম পরীকে বুঝাইতেছিল। যুদ্ধাবসানে বিজয়-শ্রীর সংবর্দ্ধানার জন্য বিপুল ভোজের আয়োজন হইল। সে দিন রাত্রে গুরুদেবের সঙ্গে আশ্রম-লক্ষ্মীর বিবাহে ছেলের দল খুব খাটিল। অরুণকুমারও আসিলেন। তিনি সোনা বাধানো একটি শিকল পরীকে উপহার দিলেন। বোধ হয় হরতনের গলায় বাঁধিবার জন্য।

ফুলশয্যার দিন রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া মুগ্ধ ঘনশ্যাম বলিল, 'পরী, আজিকার কি মধুর জ্যোৎস্না! এমনি জ্যোৎস্নায় যুগে যুগে তোমার বুকের মাঝে পেতে ইচ্ছে করে। তোমার ইচ্ছা হয় না, পরী?'

পরীর বড় ঘুম পাইতেছিল। সে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে-পারে নাই। তন্দ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে সে শুধু বলিল, 'হাঁ, করে বৈ কি। হরতন—আমার হরতন কই, ঘনুদাদা?' বিস্মিত, লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ঘনশ্যাম বলিল, 'সে কি, পরী? আর আমি কি তোমার 'ঘনুদাদা' আছি?'

ঘোমটাটা একটু বেশী টানিয়া পরী বলিল, 'ওঃ!'

পঞ্চামৃত

(১)

বাস্তব ও ভবিতব্য

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের উপর গঠিত—এটা অতি পুরাতন, সকলের জানা ও মানা কথা। কিন্তু গোলমাল উপস্থিত হয় ঐ কথাটির গোড়ার দুটি শব্দের কোন্‌টি বেশী জোর দিয়া বলিব তাহা লইয়া। কেহ জোর দেন ভবিষ্যতের উপর, কেহ বা জোর দেন বর্ত্তমানের উপর। এবং এই জোর দেওয়ার পার্থক্যের ফলেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্ম্মপদ্ধতি এমন কি লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৃথক হইয়া পড়ে। "যাহা হইবে" তাহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে "যাহা আছে।" সুতরাং একদল বলিতেছেন "যাহা আছে" সেইটিই আসল কথা। কি আছে ভাল করিয়া দেখ, তবেই বুঝিবে তাহার মধ্যে কতদূর কি সম্ভাবনা। নতুবা শেষে আফশোষ করিবে—"আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে।" হাতের কাছে যে উপকরণ আছে তাহাই তোমার আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, বাঁধিয়া দিতেছে। "আছে যাহা" সে সম্বন্ধে যাঁহাদের সম্যক জ্ঞান নাই

তাহাদিগকেই বলে কাণ্ডজ্ঞানহীন। বস্তুজ্ঞান, ফ্যাক্ট [Fact]এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হইতেছে কুশলী কর্ম্মীর কথা। ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখ। ইউরোপ এত বড় কেন? ইউরোপ বড় তার সায়ান্সের জোরে, আর সায়ান্স হইতেছে চরম বস্তুজ্ঞান। ইউরোপ জানে সে কি ধরণের জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সে সব জিনিষের ধর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি, আর সেই পথে চালতেছে। যাহা দিয়া যাহা গড়া যায় তাহা দিয়া সে তাহাই গড়িতেছে, যাহা দিয়া যাহা গড়া যায় না কখন সে দিকে সে দৃষ্টিও দেয় না। কাণ্ডে যাহা নাই তাহার জন্য চেষ্টা বকাণ্ড প্রত্যাশা। ভাবুকদের ভুল এইখানে, তাঁহারা বর্ত্তমানকে চেনেন না, ভবিষ্যতের উপর তাঁহাদের এমন ভক্তি যে বর্ত্তমানের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেও তাঁহাদের ভয় হয়।

ভাবুকরা বলেন ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের উপর দাঁড়াইতে হয় হউক। কিন্তু বর্ত্তমানটা হইতেছে আশ্রয়, অবলম্বন মাত্র। ভবিষ্যৎটাই আসল কথা। তোমার মনে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে লক্ষ্য জাগিয়াছে সেই অনুসারেই তোমার পথ ঠিক করিতে হইবে, সেই অনুসারেই বর্ত্তমানকে ঢালিতে পিটিতে হইবে। বস্তুর ফ্যাক্টএর নিজস্ব নিত্যধর্ম্ম কিছু নাই—তুমি উহার মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া দিবে, সেই ধর্ম্মেই উহা গড়িয়া উঠিবে। কাণ্ডের রূপান্তর ত এই রকমেই হয়। তোমার কাণ্ডজ্ঞান লইয়া যদি পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে চিরদিন নিযুক্ত থাকিতে, সেই জ্ঞান দিয়াই যদি পাথরের ধর্ম্মকর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিতে তবে পাথরের ভিতর হইতে অপরূপ শিল্পমূর্ত্তি সব কোন দিন ফুটিয়া উঠিত না। শব্দকে যদি কেবলি জানিতাম বাতাসের তরঙ্গ বলিয়া, তবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কোন দিনই শুনিতে পাইতাম না। এ সব ক্ষেত্রে বস্তুর জানা ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হই নাই, একটা অজানা লোকের ধর্ম্মই টানিয়া আনিয়া বস্তুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছি, বস্তুর স্বভাব স্বরূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছি। সকল সৃষ্টির ব্যাপারেই এই রকম হয়। মাট্‌সীনি যে উপকরণ—যে লোকবল ও অস্ত্রবল—লইয়া ইতালীর স্বাধীনতার জন্য লাগিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যদি সেই সব উপকরণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিতেন, তবে দেখিতেন সে ধরণের ভাঙ্গাচুরা পচাগলা জিনিষ দিয়া কোন দিন কিছু করা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চলা নয়, আসল পদ্ধতি হইতেছে ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমানের দিকে চলিয়া আসা।

এই দুই দলের দুই কথার সামঞ্জস্য আমরা করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, উভয়েরই মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে—বিপরীত দিকের চূড়ান্ত জের যেখানে আসিয়া মিশে সেইখানেই পুরা সত্য। বস্তুবাদী যখন বলেন বস্তুকে জানিতে হইবে, যাহা আছে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্মের পরিচয় লইতে হইবে, বর্ত্তমানের সম্ভাবনার খোঁজ লইতে হইবে, তখন তাঁহারা অন্যায় কিছু বলেন না। কিন্তু কথা হইতেছে এই অনুসন্ধান তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত চালাইয়া লইতে পারিয়াছেন। ফ্যাক্টএর গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নিবিড়তর নিবিড়তম অন্তঃস্থলে পৌঁছিতে হইবে। নতুবা আমরা পাইব উপরকার ভাসা ভাসা স্তরের ক্ষণিক ধর্ম্ম। বর্ত্তমানের সব সম্ভাবনা ধরিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমানের ব্যক্তরূপের পিছনে যে ব্যক্তশক্তি এবং ব্যক্তশক্তিরও পিছনে যে শক্তিগর্ভ সত্তা আছে তাহার

গুণের সন্ধান লইতে হইবে। আর এ কাজটি কেবল বস্তুবাদীব বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টি দিয়া হয় না, সাহায্যেব জন্য দরকার ভাবুকের কল্পনা, সূক্ষ্ম অনুভব, দিব্য দৃষ্টি। কিন্তু ভাবুকের ভুল হয় তখন যখন তিনি ভাবাবেশে, নিজের বাসনাব আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ঢলিয়া ভাসিয়া চলেন। চিন্তাবেগ যে রঙীন স্বপ্ন গড়িয়া তোলে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যে মনের মতন রূপ আঁকিয়া দেয় তাহা বাস্তবে সফল হইবে না, জীবন্ত হইবে না যদি বাস্তবের গভীরতম সত্তাব সহিত তাহার অব্যর্থ মিল অটুট সংযোগ না থাকে। স্বপ্ন দেখা চাই কিন্তু সে স্বপ্ন হওয়া দরকার সত্যসন্ধ, মনের খেয়াল দেখে এক স্বপ্ন কি যে স্বপ্ন ফলে তাহা হইতেছে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির স্বপ্ন, অপরোক্ষানুভূতির স্বপ্ন।

বিচার বুদ্ধি দিয়া বর্ত্তমানের স্বরূপকে বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। বিচার বুদ্ধি দেখিতে পারে বর্ত্তমানের আজকার রূপ আর যে শক্তি সেই রূপ দিয়াছে তাহার কিছু কিছু—হয় ত সেই জোরে জানিতে পারে কালকার শক্তির কিছু ও কালকার একটা রূপ। কিন্তু পরশু দিনের কথা সে খুব ভয়ে ভয়েই বলিতে পারে। অন্তপক্ষে ভাবালুতা যে পরশু দিনের খবর আনিয়া দেয় তাহাও যে সব সময় ঠিক ঠিক হইবে, এমনও কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ ভাবালুতা ভবিষ্যতের চিত্র গড়িয়া দেয়, ভবিষ্যতের ভাব দিয়া ততখানি নয় যতখানি বর্ত্তমানের অভাব দিয়া। আমার প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানে মিটিতেছে না, তাহা মিটিবে যে রকমে আমার বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী গড়ন দিয়া আমি ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছি। বিশ্বাসেরও রকমফের আছে, সব বিশ্বাসই পাহাড় টলাইতে পারে এমন কোন কথা নাই। ম্যাট্সীনির বিশ্বাস ইতালীকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আর একটি বিশ্বাস যে ইতালী হইবে নূতন যুগের নূতন মানবজাতির নূতন দীক্ষাগুরু, তাহা কার্য্যতঃ সফল হয় নাই।

সবই হইতেছে সত্যের ও শক্তির কথা। বাস্তববাদী এক ধরণের সত্য ও শক্তি লইয়া চলিয়াছেন—যাহা ব্যক্ত যাহা আছে তাহার সত্য ও শক্তি লইয়া। আর ভাববাদী চলিয়াছেন আর এক ধরণের সত্য ও শক্তি লইয়া—যাহা অব্যক্ত যাহা হইতে পারে তাহার সত্য ও শক্তি লইয়া। বাস্তববাদী দাঁড়াইয়াছেন বুদ্ধির জোরের উপর, ভাববাদী আশ্রয় লইয়াছেন চিন্তাবেগের তোড়ের উপর। ভবিষ্যৎকে এই দুই রকমেই গড়া যায়, কিন্তু কিছু দূর পর্য্যন্ত—ফলতঃ আমরা দেখি ভবিষ্যৎ যখন বাস্তবিক গড়িয়া উঠে তখন রূপ লয় একটা তৃতীয় ধরণের, কি বস্তুবাদী কি ভাববাদী কেহই তাহা দেখিতে পারেন নাই বা দেখিয়াছেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকমে। সে তৃতীয় রূপটিকে ফলাইয়া ধরিবার পথে বস্তুবাদীর বুদ্ধিবল কাজ করিয়াছে, ভাববাদীর প্রাণের আবেগও হয়ত তাহার অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছে; কিন্তু আসল শক্তি দুইএরই সীমার বাহিরে।

কি সে শক্তি? কোথাকার সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা? সেই সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ঋষি-দৃষ্টিতে, সেই শক্তি উৎসারিত হইতেছে তপোবলে। আমাদের স্থূলচক্ষে যাহা বস্তু বা কাণ্ড অর্থাৎ ফ্যাক্ট বলিয়া দেখা দেয়, তাহা সেই সত্য ও শক্তির ক্রম-পরিণাম ধারার একটা বিশেষ সাম্যাবস্থা। কিন্তু এই সাম্যাবস্থা নিরেট চিরন্তন কিছু নয় সে সাম্য আপেক্ষিক সাম্যমাত্র—সে সাম্য ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নূতন একটা সাম্যের দিকে, নূতন

বস্তু বা কাণ্ড বা ফ্যাক্ট সৃজনের দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যেমন বলিয়া দিতেছেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তিধারা স্তরের পর স্তরে কেন্দ্রগত হইয়া এক একটা স্থির সাম্যাবস্থা পাইয়া এক এম রকম মূল ভৌতিক দ্রব্য (element) সৃজন করিতেছে—ইউরেনিয়ম্ এই রকম একটী স্থির সাম্যাবস্থা, উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া লইতেছে থোরিয়ম বলিয়া আর একটী সাম্যাবস্থা, থোরিয়ম ভাঙ্গিয়া রেডিয়ম হইতেছে এবং এই রকমে ক্রমে সীসা পারা ও সোনার উৎপত্তি হয়—সেই রকম ঘটনার জগতেও একটা শক্তির ক্রম পরিণামী ধারায় ফ্যাক্টের পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। অতীতের বাস্তব বর্ত্তমানের বাস্তবকে জন্ম দিতেছে, বর্ত্তমানের বাস্তব ভবিষ্যতের বাস্তবকে জন্ম দিতেছে। বস্তুবাদীর ভুল হয় এই খানে যে তিনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ফ্যাক্টকে সব একই কোঠায় ফেলিয়া দেখিতে চাহেন অর্থাৎ সীসাকে তিনি সীসা ভাবেই দেখেন, তাহার সহজ স্বাভাবিক পরিণামই যে সোনা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ভাববাদী বিশ্বাস করেন আজকার কলিযুগ কালকার সত্যযুগে পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ সীসা সোনায় পরিণত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের গোড়ায় অভাব জ্ঞানের দৃষ্টির। তিনি সে কাজটি করিতে চান যাদুবিদ্যার (alchemy) জোরে। ভাববাদীর সোনার স্বপ্ন সব বিফল হইতেছে ও হইবে যদি তিনি যাদুবিদ্যার পথ ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ও দৃষ্টির পথ না খোঁজেন। তিনি যে দিন শক্তির মূল ধারাটির অনুসন্ধান পাইবেন, তাহার ক্রম পরিণামের রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন, সেই দিন তিনি বস্তুকে বাস্তবকে যথেচ্ছ সত্যসন্ধ করিয়া বদলাইতে পারিবেন। —বিজলী

[২]

জাপানের খবরের কাগজ

বাংলাদেশে আটখানা বাংলা দৈনিক খবরের কাগজ বার হচ্চে দেখে অনেকে "গেলরে গেল!" রব তুলেচেন। তাঁরা বলেন, বাঙ্গালী কিনা শুধুই বক্তৃতাবাজ, তাই নিত্য নতুন খবরের কাগজের উদয়!

জাপানের অবশ্য গলাবাজির বদনাম নেই আর তারা যে কাজের লোক নয়, সে কথা জোর করে বলবার সাহস আজ দুনিয়ায় কারুরই নেই। তাদের দেশে 'কাজের লোক' যত বেশী হচ্চে, খবরের কাগজের দরকারও তাদের ততই বেশী হচ্চে। এর ওপর যদি বলা যায় বাংলায় কাজের লোকের সংখ্যা বাড়চে বলেই খবরের কাগজ বেশী বার হচ্চে, তা'হলে মিথ্যা কথা বলা হবে না। সে কথা এখন থাক। জাপানের খবরের কাগজের সংখ্যা আর তার কাটতি সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলি।

জাপানের রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রেতা খুবই কম দেখা যায়। প্রতি প্রভাতে ছোকরার দল প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী খবরের কাগজ বিলি করে বেড়ায়। তাই বলে কেও যেন মনে না করেন যে খবরের কাগজ পড়বার আগ্রহ জাপানীদের তেমন বেশী নেই। শুনলে বিস্মিত হতে হবে যে, জাপানের বড় বড় দু'খানা দৈনিকের কাট্তি প্রায় **সাড়ে সাত লক্ষ!** অথচ জাপানের লোক সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশী নয়। জাপানী কাগজের ইংরেজি সংস্করণের কাটতিও কম নয়। 'ওসাকা মাইনিচি' কাগজের ইংরেজী সংস্করণের কাটতি হচ্চে দৈনিক ৪৫০০০। আমাদের দেশে largest circulation যাদের তাদেরও তার আধা-আধি কাগজ বিকায় কিনা সন্দেহ।

টোকিয়ো হতে বার খানা দৈনিক প্রকাশিত হয়। এদের সব কয়খানিরই কাটতি **দুই লাখ থেকে চার লাখ**। এ ছাড়া মফঃস্বল থেকেও বহু দৈনিক কাগজ বার হয় তার মধ্যে অন্ততঃ চৌদ্দখানা কাগজের খ্যাতি প্রতিপত্তি খুবই বেশী। বাংলার মফঃস্বল হতে একমাত্র 'ঢাকা হেরাল্ড' প্রকাশিত হয়। এই কাগজ খানি অবশ্য কোনমতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলচে, বাংলার বড় বেশী কেউ এর কোন খবরই রাখেন না।

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র জাপানে নেই বল্লেই চলে; কিন্তু মাসিক কাগজ আছে অনেক। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জন্য অনেক মাসিক পত্র জাপানে আছে। গার্হস্থ্য নীতি সম্বন্ধীয় কাগজেরও অভাব নেই। ছেলেদের জন্যও জাপানে অনেক মাসিক আছে।

মেয়েদের কাগজে চিত্র-শিল্পের ভাল ভাল নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাদের কাটতিও হয় একলাখ, দেড়লাখ। Japan Ladies Patriotic Societyর মুখপত্র "Aikolu Fujiu" কাগজের কাটতি সব চেয়ে বেশী।

জাপানের "রঙ্গমঞ্চ" সম্বন্ধে আলোচনা করবার মাসিকও অনেক আছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকাদির আলোচনা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চিত্র দিয়ে এই সব কাগজ চিত্তাকর্ষক করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে জাপানে চল্লিশখানা মাসিক প্রকাশিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ক মাসিকের অন্ত নেই।

রাস্তার কুলী থেকে সুরু করে ক্রোড়পতি ধনী, যার যেমন রুচি, যেমন প্রয়োজন, তিনি তেমন কাগজ খরিদ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা হচ্চে এই যে, এত পড়েও এত খবর রেখেও জাপানি জাতটা জাহান্নামে যাবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না।

—বিজলী

[৩]

ভোগের অনাচার।

[শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়]

এক-ফসলের দেশে লোকে কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে চাষারা সমস্ত বৎসর ধরিয়াই কাজ পায় সেখানেও তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই এমনি। এই যে মাড়োয়ারী বণিক কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশাল ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, যাহাদের ব্যবসা সুদূর মফঃস্বলেও চলিতেছে, রেল ষ্টেশনের ধারে যাহাদের কুশ্রী করোগেটের গুদাম ব্যবসায়প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, তাহাদেরও দেশ রাজপুতনা মাড়্‌বাড়ে গেলে দেখা যাইবে যে সেখানকার জনসাধারণও দারিদ্র্য-দুঃখে পীড়িত।

ভাদ্রমাসের শেষভাগে যাঁহারা বি, এন, রেলপথে পূর্ব্ব উপকূল দিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন কলিকাতার রেল-ষ্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক সবুজ শস্যে ভরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেণ দ্রুত চলিতেছে, বাংলার সমতল ছাড়িয়া উড়িষ্যার বন ও পাহাড় দেখা দিল; কিন্তু পাহাড়ের কোলে, চিল্কার লবণ-জলের ধারে, গঞ্জামের প্রান্তরে কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি গেল। ইতিমধ্যে ট্রেণ কত পথ অতিক্রম করিয়াছে; সকালে উঠিয়াও দেখি সবুজ শস্যের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণতা। তারপর মান্দ্রাজের দিকে শস্যের রকম বদলাইয়া

কোথাও বা হলুদের ছাপ, কোথাও বা পাকা শস্যের সোনার রং, আবার কোথাও বা চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের নেশায় যখন পাইয়া বসিয়াছে, পূর্ণতার আনন্দে যখন মন ভরা, তখন শস্যের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও দেখি তাহাই। মাঠে মাঠে লোক ভরা। কোথাও বা নিড়াইবার সময় বলিয়া সমস্ত গ্রাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ এমন কি কুব্জদেহ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। গায়ে কাপড় নাই, পরণে নেংটী, কালো কালো মূর্ত্তিগুলি মানুষ বলিয়া চেনা যায় কি না যায়! কেবল মেয়েদের শাড়ীতে রৌদ্র পড়িয়া দূর হইতে মানুষের দল বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথাও বা লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে, গরুগুলির চেহারা মানুষের অপেক্ষা কতক ভাল। শীর্ণ লোকগুলি হয়ত নিজেরা না খাইয়াও গরুগুলিকে সবল রাখিয়াছে; না হইলে যে, যাহা কিছু খাইতে পায় তাহাও বন্ধ হইবে। জলভরা গোদাবরী দুই পার সিক্ত করিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। তুতিকোরিনের খাল বড় বড় প্রান্তর জল দিয়া উর্ব্বর করিয়াছে। ফসলে ভরা ক্ষেত। কিন্তু লোকের চেহারা ঐ এক—গায়ে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। এ কি বিপুল পরিহাস! বাংলায় চাষার দুর্দ্দশা, মাদ্রাজে বুঝি আরও বেশী। এই যে ফসল হইয়াছে ইহাতে উহাদের ভাত জুটিবে না, কাপড় জুটিবে না, ইহারা সকলে ঋণে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার সময় হইলেই সাউকার আসিয়া মাঠে দাঁড়াইবে। অসমান বিনিময়ে সে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্যে শস্য লইয়া যাইবে। যে সামান্য শস্য চাষার ঘরে থাকিবে তাহাতে বীজ রাখিবে, দুই বেলা বা এক বেলা অন্নের সংস্থান করিবে ও কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিবে, এমন দুরাশা কোনও চাষার নাই। যে ফসল চাষার ঋণ শোধ করিয়া ঘরে আইসে তাহা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। তারপর আবার মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহারা নেশা করে না, জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখে না, বিলাতী বিলাসের জিনিষ একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের অবস্থা এত হীন। যেখানে এতটুকু জমি আছে, নালার ধার, আনাচ্ কানাচ্, কোথাও বাদ নাই, শস্য শস্য। ভাবিতেছিলাম যদি চেষ্টা করিয়া কারখানায় যেমন করিয়া কাজ করে তেমন করিয়া যদি হিসাব রাখিয়া সুপারভাইজার রাখিয়া এই শস্য উৎপাদন করিতে হইত। কি প্রচণ্ড আয়াসে কত কম ফল হইত! চাষার কাজ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে মরিয়া হইয়া শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। যদি কোনও একজন বা একদল মালিকের জন্য লোকে চাষ আবাদ করিত তবে এ জমি ভাল নয়, সে জমিতে সময়-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল চলে না, এমনি করিয়া হয়ত অর্দ্ধেক জমি বাদ যাইত। কিন্তু তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা নিষ্ঠার ভাব সমস্ত ক্ষেতের কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি ভাবি যাহারা এমন করিয়া ফসল তুলিয়াছে, যাহারা নেশা করে না, আলস্যে সময় কাটায় না, তাহারা কেন খাইতে পরিতে পাইবে না?

এই কেনর জবাব অতি নিদারুণ। সমস্ত ঊর্দ্ধতন সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

দশজন শতজন শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে,—একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার বড়লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং শ্রমলব্ধ ফলে ভোগলালসা তৃপ্ত করিবে। যখন মজুরের অভাব, চাহিবামাত্র পাওয়া দুষ্কর, তখনও দিন মজুরকে দশ আনা মজুরী দিই। একজনার উপর চার পাঁচজনার অন্ন জোগাইবার ভার, অসুখ আছে, বৃষ্টি বাদল আছে, অজন্মা আছে। এমনি করিয়াই না গড়পড়তা ভারতবাসীর দৈনিক এক আনা মাত্র আয় হিসাবে দাঁড়ায়।

তাহার ফল কি তাহা চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি। বয়স্ক নরনারী অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, শিশুগুলি অধিক সংখ্যায় মারা যায়। তাহারা অন্ন-বস্ত্র-অর্থহীন। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই ত বাঁচিয়া থাকিবার একটা সামাজিক দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমজীবীর আবশ্যক, তখন তাহাকে ও তাহার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের কর্ত্তব্য। জনসাধারণ যতই অশিক্ষিত ও অকর্ম্মা হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অর্জ্জনের যথেষ্ট চেষ্টা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কি? প্রতিকার ব্যবসা বাণিজ্য নহে। বড় বড় কলকারখানা করিয়া সস্তায় পণ্য উৎপন্ন করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। প্রতিকার কেবলমাত্র শিক্ষাও নহে। শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু খাটিবার ও খাটাইবার পরস্পর অবস্থাগত সম্পর্ক পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিল্প সম্বন্ধে পাওয়া আবশ্যক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা-অর্জ্জন পটুত্ব জন্মিতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকিলে আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে পারে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের সংস্কারগত ভাবে আছে। তারপর লোকসংখ্যার আধিক্যও এই দুর্দ্দশার হেতু নহে। যত লোক ভারতবর্ষে আছে, তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, অনেকটা বিদেশেও চলিয়া যায়। Supply and demand অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা যায় তাহাও এ হীনতার হেতু নহে। কলকারখানা, চা বাগান ও কয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই আছে। তবুও তাহাদের অবস্থার হীনতা অপরিসীম। জনসাধারণের দুর্দ্দশা যদি বাণিজ্য ব্যবসায়ের অভাবে না হইয়া থাকে যদি অশিক্ষাও ইহার মূলে নাই, যদি লোকাধিক্য ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয় তবে তা কি? কোন্ সে দানব আমাদের সাধারণকে পীড়িত করিয়া এমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাকে সহজে ধরিতেও জানি না?

আমার মনে হয় এই ছদ্মবেশী দানব struggle for existence—জীবন সংগ্রাম ভোগলিপ্সার ইহা নামান্তর মাত্র। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হইয়া থাকে। যোগ্যতমের জয়ই যে চরম লাভ তাহা আমরা জানিতাম না। বিলাতী সভ্যতার শক্তির মদ যখন আমাদের মস্তিষ্ক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই নৃশংস মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে উহার কদর্য্যতা অনুভব করার মত শক্তিও আমাদের নাই। যখন এই ধরণের চলিত কথা লোকের মনকে পরুষ করিয়া হীন করিতে থাকে, তখন তাহার প্রতিবাদও অসহনীয় হয়। শক্তিবাদী

বলিলেন struggle for existence জীবন সংগ্রাম বৈজ্ঞানিক সত্যবাদ। গাছের নীচে যদি ২৫টা চারা হয়, তবে দুই চারিটি জোরাল চারা বাকীগুলিকে আবছায়ার আওতায় ফেলিয়া অপুষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রোস্কোপে এক বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত সহস্র প্রাণী একে অন্যকে ঠেলিয়া মারিয়া নিজে বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিতেছে। বাকীগুলি মরিতেছে। এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় একেবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার উপর আর যুক্তি প্রয়োগ অসম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের নৃশংসতা ধরা পড়ে। শক্তিবাদী বলিবেন, মজুরী দশ আনায় পাই বলিয়াই রোজ দশ আনা দিয়া থাকি, তাহাতে যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না পায় তবে সে ভাবনা নিয়োক্তার নহে। মজুরের যদি সাধ্য থাকে তবে বেশী আদায় করিয়া লউক—যদি আদায় করিতে পারে ভাল, কিন্তু নিয়োক্তা বিধিমত বাধা দিবে, আর যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না পারে, তবে নিয়োক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দিক্ষীত নিয়োক্তার সমাজ পরাজিত শত্রুর সাজা দিবে। কিন্তু খাস বিলাতেও ইহার কদর্য্যতা ও অমানুষিকতা উপলব্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ ত আর গাছপালা বা জলবিন্দুস্থ সহস্র প্রাণীর একটি নয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, মানুষ বলিবে বাঁচাও, দশজনকে বাঁচিতে দাও। মানুষ বলিবে অহিংসা পরমধর্ম্ম। মানুষ বলিবে সমাজ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহাই না হয় তবে সন্তান পালনের বিড়ম্বনা লই কেন? অসহায় শিশু ত যোগ্যতমের বিপরীত। আর যত জীব আছে তাদের তুলনায় মানুষের শিশু ত সর্ব্বাপেক্ষা অসহায় এমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আগুনে সেঁকিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া কাহাকেও বড় করিতে হয় না। এমন অসহায় জীবকে মারিয়া না ফেলিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কারণ মানুষের সমাজ বিলাতী নৃশংসবাদ অপেক্ষা অনেক পুরাতন। যে প্রেম সন্তানে প্রকাশ হয় তাহাই দশে বিতরণের জন্য মানুষের অন্তরাত্মা চিরকাল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় আচ্ছন্ন করিতে পারে না।

সামাজিক জীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদিগকে কেমন কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে এবং উহাই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তথাপি দুই এক জায়গায় নিতান্ত নিদ্রিত সমাজের নিকটেই উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে। যুদ্ধের সময় কাঁচা পাটের রপ্তানি বন্ধ হয়। চট্ বা থলে বিক্রয়ের অনুমতি সরকার দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য পাটের বস্তার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া সাধারণ ব্যবহারের জন্য পাটের বস্তা ভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তির জন্য যোগান হয়। যুদ্ধের মাল যোগাইয়া কিছু লাভ করার কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে বাংলাদেশের চাষাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহারে কদাহারে রোগগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় কত যে চাষা মরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর সেই পাটের কাজে কলওয়ালারা একশত টাকা

খাটাইয়া একবছরে ছয়শত টাকা লাভ করিয়াছে। ইহা যে সম্ভবপর হইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী লোকের হাতে না থাকিয়া দেশী লোকের হাতে থাকিত তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? সুযোগ পাইলে টাকা রোজগার করিবার পথ, অতিরিক্ত লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই ছাড়িত না। এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দর তিনটাকা মণ মাত্র দাঁড়াইল, একমণ পাট বিক্রয় করিয়া আধমণ ধানও পাওয়া গেল না আর তার সঙ্গে সঙ্গেই পাট কলে একশত টাকায় ছয়শত টাকা মুনফা দেওয়া হইল,—এই অবস্থা কোন শিক্ষায় অসম্ভব হইত? প্রাথমিক শিক্ষা চাষারা পাইলেও এই ঘটনা ঘটিত। মাড়বাড়ী মধ্যবর্ত্তী না থাকিয়া সবটা হাত-ফেরতার কাজ হাটখোলার বাঙ্গালী মহাজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ হইত না। কুটীর-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দ্দশার নিবারণ হইত না, কেননা পাটে নিযুক্ত শ্রমেরই মূল্য পাওয়া যায় নাই। কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই এই ব্যাপারের সংঘটন বন্ধ করিতে পারিত না। ইহা যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল লোক লক্ষ লক্ষ টাকা জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের ক্ষেতে কাজ করিয়া, কোমর অবধি পচাজলে ডুবাইয়া পাট ধুইয়া, পুড়িয়া পাট শুখাইয়া যে হতভাগ্য পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, সে অন্নাভাবে, দারিদ্র্যে, সংক্রামক ব্যাধিতে মরিল; আর সেই পাটে গুটীকতক মাত্র লোক, তাদের দেশ যেখানেই হউক, চামড়ার রং সাদা বা কালোই হউক, চাষার অনাহার ও অকাল মৃত্যুর হেতুভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল। Supply and demand, 'চাহিদা ও সরবরাহের' মন্ত্রে সমস্ত জিজ্ঞাসু মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই জেদ করিলেন না যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। বাঁচিবার অধিকার **Right to live** এক দিন সমাজকে মানিতেই হইবে। যে সমাজ মানব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সমাজেরও একদিন প্রেমের শান্ত মন্ত্রে নয় ত ধ্বংসের গর্জ্জনে স্বীকার করিতেই হইবে যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে।

যদি চাষারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বলিত যে বারো টাকার কমে পাটের মণ বেচিব না, তবে কলওয়ালাকে হয়ত ঐ দরেই পাট কিনিতে হইত কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শিক্ষা অন্যরকম! লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা করে। ধর্ম্মাশ্রিত সমাজ উহা মানিয়া লয়; আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে সমাজ ভোগ করাই পরম লাভ বলিয়া জানিয়াছে, সে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; তখন বিরোধ সংঘর্ষ ও প্রাণহানি আরম্ভ হয়। সঙ্ঘ নানা রকমের ও নানা ছোট ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট হয়। আজকাল আমাদের দেশে নির্ব্বিসংবাদী এক প্রকার সঙ্ঘ দেখা দিয়াছে। এইগুলি সমবায়-সমিতি নামে পরিচিত। মহাজনের হাত হইতে কৃষক ও শিল্পীকে রক্ষা করিয়া তাহার ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূল ধন যোগানই এই সকল সমিতির কাজ। কোনও কোনও স্থানে জোলা, তাঁতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে। আবশ্যক-মত অল্প সুদে ধার পাইতেছে। সুদও শতকরা সাড়েবারো টাকার বেশী নয়। টাকা শোধের ও প্রত্যেক সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে।

তথাপি এইসকল সমিতি দ্বারা চাষাদের দুঃখ দূর হইবার অনেক অন্তরায় আছে। যখন এই সমিতি গুলি শক্তির কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে, যখন কৃষকেরা সমবায় সমিতিকে কেবলমাত্র ঋণ লইবার আফিস বলিয়া ব্যবহার করিবে না তখন ধনিক শীর্ষ সমাজ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেণ্ট ও ধনিক সমাজ আজ যে সমিতিগুলি অর্থদ্বারা লোক দ্বারা গঠন করিবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতেছেন সেই সমিতিগুলি চাষাদের স্বার্থরক্ষার সজ্ঘরূপে সত্যই ব্যবহৃত হইলে দেখাক্ষজ্ঞানে এখনকার পৃষ্ঠপোষকেরা এসকল সমিতি দমন ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক মনে হয়।

এই প্রকার সমবায়-সমিতিগুলির মূলে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের স্বার্থ থাকায় ইহারাও অপর অর্থাধিকারীর ন্যায় পরপীড়ক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক, কোনও গ্রামের কৃষকেরা দেখিল ধান না বিক্রয় করিয়া চাল বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় সমিতির অর্থে একটী ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়া লইল এবং উদ্বৃত্ত ধান লাভে বিক্রয় করিল; তাহাতে নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিম্বা আরোও লাভ হইল। কিন্তু ঐ কলে যে-সমস্ত মজুর দিন মজুরী খাটিবে তাহাদের অবস্থা আজ কলের মজুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না হইবার কথা। এই কেন্দ্রভূত সমিতির স্বার্থই হইতেছে যত সস্তায় পারা যায় ধান ভানা। অন্যান্য মূলধনের অধিকারীর যে দোষ,—অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যবসায়ের লাভ বাড়ান—সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে মরিবে না। সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট ছোট কেন্দ্রের ইষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় যে অবিচার নির্ধনকে পিষ্ট করিতেছে তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে না। সমবায় সমিতি এক জাতীয় শ্রমিককে ধনিক করিতে পারে এই পর্য্যন্ত। সমবায়ের সজ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় কোনও একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অন্য ধনীর সহিত আর তাহার প্রভেদ থাকে না।

দেখা যাইতেছে যে কোনও এক দল চাষা বা শিল্পীর যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয় তাহা হইলেও সমষ্টি হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে না। প্রথমে যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্য থাকিতেও উৎপাদক চাষীরা অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার হয় না। ধনী ও নির্ধন, যাহারা খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই একই সমাজের অঙ্গ। যদি এই ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি একে অপরকে পীড়ন করিয়া সম্পদ সংগ্রহ করিবে এই ইচ্ছা থাকে এবং তাহার কর্ম্মে প্রকট হয় তবে সে সমাজের অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ এখন চরকায় কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। নিষ্কর্ম্মা কর্ম্ম পাইয়া ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিবে। কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা যে স্থায়ী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় পাটের চাষীর অবস্থা যাহা হইয়াছিল, চরকার সূতা কাপড়ের বেলায় তাহাই যে আংশিকভাবে হইবে না তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ নির্দ্দেশ করে

করিয়াছি। আর সর্ব্বোপরি আমাদের চরিত্রের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিয়া যে সকল জড়যন্ত্র বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া এদেশে আমদানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে জড়েই পরিণত হইতেছি। চিত্তের সে সন্তোষ নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্র এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশে সামাজিক অসমতা কাঁটার মত সমাজকে বিঁধিয়াছিল, এখনো আছে। তথাপি একটা দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ্য কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ভোগ করাই পরম এবং চরম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন কালেই সমাজস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন করিত না, তবুও সমাজের শীর্ষে যাঁহারা, তাঁহারা ত্যাগের সম্মান করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকও ঐ আদর্শের বলে সমাজকে সুস্থ রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্ব্বেও দারিদ্রব্রত পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া এবং পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী হইয়াও দরিদ্রোচিত অশন বসনে অতি শ্লাঘ্য জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্কীর্ণতা ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া রিক্ততার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারা এক প্রকারের পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পূজ্যতে এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্ষই পৃথিবীর সমক্ষে খাড়া করিয়াছিল। রাজা বিদ্বানের সম্মানে দৈন্যেরই সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের সম্মান করা ভারতবাসীর পক্ষে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। আজও ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে সম্মান পাইতেছেন তাহার মূলে পুরাতন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রাণ নাই। ধর্ম্মগত ও সাম্প্রদায়িক শত মতে বিচ্ছিন্ন বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট সমাজের শেষ প্রাণবায়ু ভোগের মোহে বহির্গত হইয়াছে। এতটুকুও যদি সত্য পদার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে কিসে আর তাহা বাঁচিতে পারে? আমরা জন্মগত জাতিগত অসমতা বর্জ্জন করি নাই, উপরন্তু ধনগত অসমতাও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ ধনী ও নির্ধন সকলে নিজের ও বংশপরম্পরার ভোগের জন্য সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যস্ত। শিশুকালে পাঠশালায় শিখি "লেখা পড়া করে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই"—কেহ গাড়ীঘোড়া চড়িতে পায়, কেহ পায় না, কিন্তু সমান অসন্তোষ লইয়া দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরাজীতে ভাষা শিক্ষার পথে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করি "Honesty is the best policy" আর সেই পলিসি বা চালই বজায় রাখিতে জীবন ও কর্ম্ম শেষ করি। "জীবনে ও মিথ্যা আচরণে শেষ আর ভেদ নাহি রয়।"

ভোগলিপ্সাই আমাদের অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম হেতু। যিনিই যে পরিমাণে ভোগ করিতেছি, সেই পরিমাণে দুই টাকা মাসিক আয়ের চাষার অন্নে ভাগ বসাইতেছি। আমার ভোগের সহিত চাষার দুর্দ্দশা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতেছি, ততদিন চাষারা যতই ক্ষেতে খাটুক, দেশে যতই চরকা তাঁত চলুক, দুর্দ্দশার বাস্তবিক পরিবর্ত্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম, যে কেন চাষারা এত খাটিয়াও অন্নবস্ত্রের

অভাব মিটাইতে পারে না এই খানেই তাহার জবাব।

বিলাতী পণ্যের আমদানী ও দেশী মালের রপ্তানীর হিসাব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া যাইতেছে। আমরা বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাঁচা মাল পাঠাই। আমদানী যে সকল দ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই দিয়া থাকি। ১৯১৮।১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে আড়াই শত কোটী টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি। এবং তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট প্রাপ্য ইংলণ্ডের ঋণের সুদ ও পেন্‌শন্‌আদি শোধ দিয়াও একশত শত্তর কোটী টাকার মাল আমদানী করিয়াছি। যাহা আমদানী করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকই হইতেছে বিলাতী সূতা, বিলাতি কাপড় ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আর কতক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, খেলনা, আয়েসের বস্তু। আমরা তুলা রপ্তানী করিয়া কাপড় আমদানী করিয়াছি, খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতী সখের জিনিস কিনিয়াছি; যাহারা কৃষিক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই রপ্তানীর মাল জন্মাইতেছে, আমদানী মালের সামান্য অংশই তাহাদের নিকট পঁহুছিতেছে। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে এই রকম দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষে ধনী সমাজ চাষার শ্রমলব্ধ ফল গ্রহণ করিতেছে এবং বিনিময়ে নিজের ভোগস্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। যদি এই ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও মন্দের ভাল হইত; টাকাটা দেশের মধ্যেই চলাফেরা করিত; কিন্তু বিলাতে যাইতেছে বলিয়া ইহাতে দেশের দৈন্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বৎসর বৎসর দৈন্য বাড়িয়াই চলিতেছে। সুব্যবস্থা না হইলে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

(ক্রমশঃ)

প্রবাসী—শ্রাবণ

"আমরা যখন জগৎকে কেবল তার একটি মাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই—নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য।"

হজরত মোহম্মদের মহত্ব

[শ্রীমঈনউদ্দীন হোসায়ন]

ক্ষাত্র শক্তিতে বলীয়ান মদগর্ব্বিত প্রাচ্য সজোরে ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন যে "মোহম্মদ এক হস্তে কৃপাণ ও অপর হস্তে কোর্আন লইয়াই জগতে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।"

যদিও দানশৌণ্ডের অবতার ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টান লেখকগণের পবিত্র ইসলামের প্রতি এই স্বকপোল কল্পিত ভিত্তিহীন ঈর্ষ্যাপূর্ণ মিথ্যা দোষারোপের বহু যুক্তি সঙ্গত প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে বহু গভীর গবেষনাপূর্ণ গ্রন্থরাজি লিখিত হইয়াছে, তথাপি আমরা জগদগুরু মহামানব হজরত মোহম্মদের পূত পবিত্র জীবনকথা হইতে নিম্নে অদ্য এমন একটী চিত্তাকর্ষক চিরস্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি যাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া সকলকে দেখাইবে যে খৃষ্টান লেখকগণের প্রাগুক্ত মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন ও ঈর্ষ্যাপূর্ণ।

যেদিন পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদের পুত্র হজরত এব্রাহিম প্রাণত্যাগ করেন সেদিন আকাশ সূর্য্যগ্রহণের ফলে অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল। এই দুই ব্যাপার একই সময়ে ঘটিতে দেখিয়া মক্কার কয়েকজন অ-মুসলমান বিশেষরূপে বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা এই অকস্মাৎ ব্যাপারকে হজরত-পুত্রের শোক প্রকাশার্থে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইল এবং তাহারা ইহাও ভাবিল যে, যে ব্যক্তির পুত্রের অকালমৃত্যুতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত পয়গম্বর-তত্ত্ববাহক। অতঃপর ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হইয়া হজরত মোহম্মদের সন্নিধানে আগমন করিল। হজরত তাহাদের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা ভাবিয়াছ যে, বাহ্যজগৎ আমার পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছি যে তোমাদের এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ মানব জীবনের জন্ম ও মৃত্যুর সহিত প্রকৃতি জগতের কোন সম্বন্ধই নাই। আর এই কারণেই যদি তোমরা আমাকে একজন স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি বলিব, তোমরা আমাকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পার নাই—আমার ক্ষুদ্র জীবনের উদ্দেশ্য তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। এ কারণে আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহি না, বরং তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও।" তাঁহার এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া অনেকেই ব্যর্থ মনোরথে প্রস্থান করিল। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহা অপেক্ষা সরলতা, সততা, ও সাধুতার সুমহান দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কি? ইহা কোন "প্রতারকের" [Impostor prophet] কার্য্য হইতে পারে কি? যে সময় হজরত মোহম্মদ মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন সে

সময়ে তাঁহার অধিকতর দলপুষ্টি করিবার বাসনাত্যাগটী বড়ই মধুময় ও আদর্শ স্থানীয়। সংখ্যাবাত্মক মক্কাবাসিগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় দূত বলিয়া মনে করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে ঐ সকল অশিক্ষিত লোককে অনায়াসে নিজ ধর্ম্মের আশ্রয়তলে আনিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কি করিলেন? তিনি পরিষ্কাররূপে সরলভাবে তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিলেন। এমন কি তিনি যদি প্রোগুক্ত ঘটনায় কেবল নীরব থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিত। কিন্তু তিনি ইহাও করেন নাই। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে সনাতন ইস্লাম ধর্ম্ম তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয় নাই।

অগ্নি-পরীক্ষা

(উপন্যাস)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

১ম দৃশ্য

সীমান্ত প্রদেশে কুটীর

সূচনা

স্থান—ফ্রান্স

ঘটনা কাল—১৮৭০ খৃঃ অঃ [ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধের সময়]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুইটী নারী।

অন্ধকারময়ী রজনী। মুষলধারে বৃষ্টি-পাত হইতেছিল। লা গ্রেঞ্জ নামক ক্ষুদ্র [illegible]র নিকট জার্ম্মান্ ও ফরাসী সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে একবার ফরাসীগণ জার্ম্মাণদিগকে পরাজিত করিয়া [illegible] দেন। ইহার পূর্ব্বে সকল বারই জার্ম্মাণগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

ফরাসী ক্যাপটেন্ আরনল্ট্ একটী কুটীরে বসিয়া ক্ষীণ বর্ত্তিকালোকে কতকগুলি কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। জার্ম্মাণদের নিকট এই কাগজগুলি পাওয়া গিয়াছিল। কুটীরের একটী দ্বার দিয়া রন্ধনশালায় গমন করা যায়। এই দ্বারের একটী কবাট খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহা দ্বারা আহত ব্যক্তি-দিগকে রণস্থল হইতে বহিয়া আনা হইতেছিল। সেই কবাটের স্থানে এখন একটী পর্দ্দা বিরাজ করিতেছে।

আর একটী দ্বার দিয়া বহিরাঙ্গনে গমন করা যায়—সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। গৃহে যে একটী জানালা আছে—তাহাও রুদ্ধ। চারিদিকে প্রহরীগণ কুটীর রক্ষায় নিযুক্ত।

রন্ধনশালা এক্ষণে হাঁসপাতালে পরিণত—সেখানে আহত ব্যক্তিদিগকে রাখা হইয়াছে। ফরাসী ডাক্তার ও একজন ইংরেজ শুশ্রূষা

কারিণীর তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছে।

এই সময় গৃহে একজন প্রবেশ করিলেন। ইনিই ফরাসী ডাক্তার সার্‌ভিল্‌।

ক্যাপ্টেন্‌ বলিলেন—"কি ডাক্তার, কি চাও?"

"একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই। অদ্যকার রাত্রির জন্য আমরা নিরাপদ কি?"

"এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কারণ?"

"আহতগণ এই সংবাদ জানতে ব্যাকুল। তাদের ভয়, হয়ত আবার জার্ম্মাণগণ কখন্‌ এসে আক্রমণ করবে। আপনি কী বলেন—এক রাত্রির জন্য বোধ হয় আমরা নিরাপদ? আপনি অবশ্য এর ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।"

আমি শুধু জানি এই মুহূর্ত্তে আমরা পল্লীগ্রামখানি দখল করে বসেছি—ইহা ছাড়া আর আমি কিছুই জানি না। পর মুহূর্ত্তে কি ঘটবে তা বলা শক্ত। হয়ত এই খানেই আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য কোথায় লুক্কায়িত আছে। এখনই তারা আমাদের আক্রমণ করে ব'সতে পারে।"

এই কথা বলিয়া ক্যাপটেন্‌ তাঁহার টুপিটা মাথায় টানিয়া দিলেন এবং বাতির শিখায় একটী চুরুট ধরাইয়া লইলেন।

ডাক্তার বলিলেন "কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমাদের আড্ডাগুলি দেখতে"

"কিছুক্ষণের জন্য কি আপনার এই ঘর খানিতে কোন প্রয়োজন আছে?"

"না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ ঘরে আমার কোন কাজ নেই। তুমি কি কোন আহত ব্যক্তিকে এই ঘরে আনতে চাও?"

"হাঁ, আমি সেই ইংরাজ রমণীটীর কথা ভাবছি। রন্ধনশালায় তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। এ ঘরটীতে তিনি অনেক আরামে থাক্‌তে পারবেন। আর এখানে ইংরাজ শুশ্রূষাকারিণীর সঙ্গে তিনি কথা বার্ত্তা ক'রতে পারবেন।"

"আচ্ছা সেই বন্দোবস্তই কর"—এই কথা বলিয়া ক্যাপটেন্‌ বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। হঠাৎ তাঁহার কি যেন মনে হইল। তিনি বাতির আলোকের দিকে তাকাইলেন—রুদ্ধ জানালার দিকে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"দেখ, মেয়েরা প্রায়ই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়। তোমার এই দুটী স্ত্রীলোককে ব'লে দিও তাঁরা যেন তাঁদের কৌতূহলের গণ্ডী এই ঘর টুকুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন।"

"এ কথা বলার অর্থ কি?"

ক্যাপটেন্‌ জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাহিরে কি হ'চ্ছে জান্‌তে ব্যাকুল নয় এমন স্ত্রীলোক দেখেছ? এই স্ত্রীলোক দুটী কিছুক্ষণ পরেই হয়ত জানালা খুলে ব'সবে। আমি চাই না যে জানালা খুলে তাঁরা জার্ম্মাণ শত্রুকে আমাদের আড্ডার খবর জানিয়ে দেন।—ভাল কথা, জলঝড়ের অবস্থা কি?" এখনও বৃষ্টি হ'চ্ছে?

"মুষলধারে হ'চ্ছে।"

"সে ভালই। জার্ম্মাণগণ আমাদের দেখতে পাবে না।" এই কথা বলিয়া ক্যাপটেন্‌ বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার পর্দ্দা উঠাইয়া রান্না ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"মিস্‌ মেরিক, তোমার একটু বিশ্রাম করবার এখন অবকাশ আছে কি?"

একটী কোমল বিষাদবিমিশ্র কণ্ঠে উত্তর হইল—"যথেষ্ট সময় আছে।"

"তা হ'লে সেই ইংরাজ স্ত্রীলোকটীকে নিয়ে এই ঘরে এস। এটী বেশ নির্জ্জন ঘর—তোমরা দুজনে বেশ আলাপ করবার সুযোগ পাবে।"

শুশ্রূষাকারিণী অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আসিলেন। দীর্ঘায়তনদেহ—তন্বঙ্গী; চলিবার ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। অঙ্গে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ—বাম স্কন্ধের উপর রক্তবর্ণ ক্রুশের চিহ্ন। মধুর মুখ খানিতে বিষাদের পাংশুবর্ণ ছায়া—দেখিলেই মনে হয় হৃদয়ে কোন দুঃখের আগুণ চাপা আছে। পদ্মপলাশের ন্যায় চক্ষু দুইটীর দৃষ্টিতে মহিমার জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত—অঙ্গ-ভঙ্গিতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য লীলায়িত—মুখ খানি এমন একটী অব্যক্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে দেখিলেই হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এমন অনুপম রূপ সকল পরিচ্ছদেই মনোহর।

তাঁর সঙ্গিনীটী খর্ব্বাকৃতি—বর্ণও অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল—কিন্তু তাহারও দেহে সৌন্দর্য্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। একটী ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদে অপাদমস্তক আবৃত—দেহের সৌন্দর্য্যে যেন পরিচ্ছদকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। দেহে ও বাক্যে ক্লান্তির ভাব পরিস্ফুট। সে সঙ্গিনীর বাহু-যুগলকে আশ্রয় করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিলেই মনে হয় যেন আধুনিক কোন ভীতিসূচক ঘটনায় তাহার দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন—"একটী কথা মনে রেখো। তোমরা ঐ জানালাটী যেন খুলো না। তা হ'লে বাইরে আলো দেখা যাবে—সেই আলো দেখে আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের অবস্থান জানতে পারে। জানালা না খুলে ভিতরে তোমরা বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ ক'রতে পার।"

ঠিক এই সময়ে পর্দ্দাটী একটু সরিয়া গেল। একজন লোক খবর দিল—একজনের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া যাওয়ায় অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতেছে—ডাক্তারের দেখা আবশ্যক। ডাক্তার কর্ত্তব্য পালনে চলিয়া গেলেন। গৃহে থাকিল—দুইটী রমণী।

শুশ্রূষাকারিণী বলিল—"মহাশয়া, আপনি চেয়ারে বসুন।" ইংরাজ রমণী বলিল—"আমাকে 'মহাশয়া' বলো না। আমার নাম—গ্রেস্ রোজবেরী। তোমার নাম কি?"

শুশ্রূষাকারিণী ইহার উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আপনার নামের মত আমার সুন্দর নাম নয়।" ইহার পরও সে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমাকে 'মার্সি মেরিক্' ব'লে ডাকতে পারেন।"

ইংরাজ রমণী বলিল—"অপরিচিত আমার প্রতি তোমার সহোদরা সদৃশ স্নেহের জন্য আমি তোমাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানি না।"

"আমি মাত্র আমার কর্ত্তব্য পালন ক'রেছি—তার বেশী ত কিছুই করিনি। এ কথার আর কোন উত্থাপন করবেন না।"

"আমি এ কথা না ব'লে থাকতে পারি? বলতো, কি অবস্থায় আমাকে তুমি দেখেছিলে! যখন ফরাসী সৈন্য জার্ম্মান সৈন্যকে পরাভূত ক'রে হটিয়ে দিলে—তখন আমার গাড়ীর গতি রোধ হ'ল—তারা ঘোড়া আটকালে—আমার অর্থ ও জিনিষপত্র কেড়ে নিলে—আর বৃষ্টিতে আমি একেবারে ভিজে নেয়ে উঠলাম। এখানে তো তুমিই আমাকে আশ্রয় দিলে—সে জন্য তোমার কাছে আমি

চিরকৃতজ্ঞ। এখনো দেখ আমার শরীরে তোমারই বস্ত্র, তোমারই কোট। তুমি না থাকলে ভয়ে ও ঠাণ্ডাতে আমি এতক্ষণ হয়তো মরেই যেতাম। এ উপকারের আমি কী প্রত্যুপকার ক'রতে পারি?"

মার্সি অতিথির জন্য টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার পাতিয়া দিয়া নিজে কিছু দূরে একটী পুরাতন সিন্দুকের উপর বসিল। সে সহসা বলিয়া উঠিল "আপনার সম্বন্ধে আমি কি একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি?"

অন্য সময় হইলে গ্রেস অপরিচিতের সহিত মন খুলিয়া কথা বার্ত্তা বলিতে সম্মত হইত না—কারণ তাহার প্রকৃতি কিছু সন্দেহশীল ছিল। কিন্তু বিপদ ও দুরবস্থা হৃদয়ের অনেক বাধা ও বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। সুতরাং গ্রেস কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিল—

"একটী কেন? একশোটা প্রশ্ন ক'রতে পার। এই বাতিটায় ভাল আলো হচ্ছে না; বাতিটাও বোধ হয় আর বেশী ক্ষণ জ্বলবে না। আচ্ছা এর চেয়ে আর একটু বেশী আলো করা যায় না?—তুমি এত দূরে ব'সলে কেন? কাছে স'রে এস—ঘরে যাতে একটু বেশী আলো হয় তার যোগাড় কর।"

মার্সি সেই খানেই বসিয়া থাকিয়া বলিল—"যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাতি বা কাঠ খুব দুর্ম্মূল্য জিনিষ। ঘরে কম আলো হলেও আমাদের সে অসুবিধা ধীরভাবে সহ্য ক'রতে হবে।—আচ্ছা—এখন আমাকে বলুনতো—এই যুদ্ধের সময় আপনি কেন এই বিপদজনক সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন?"

এই কথায় গ্রেসের প্রফুল্ল ভাব যেন সহসা বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল—

"কোন বিশেষ কারণে আমার ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছিল।"

"একাকী? সঙ্গে কাউকে সহায় না নিয়ে?"

গ্রেসের মস্তক তাহার বক্ষঃস্থলে নত হইয়া পড়িল।

"আমার সংসারের একমাত্র সহায় আমার পিতাকে আমি রোমের সমাধিস্থলে রেখে এসেছি। আর, আমার মা তো বহুদিন পূর্ব্বেই কানাডায় মারা গিয়েছিলেন।"

মার্সি যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল—গ্রেসের শেষ কথাগুলিতে সে একটু যেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রেস বলিল—"তুমি কানাডা জান না কি?"

"হাঁ, কানাডা আমি ভাল করেই চিনি।"

"পোর্ট লোগানের কাছে কখনও ছিলে?"

"হাঁ, এক সময়ে আমি পোর্ট লোগানের কাছেই থাকতাম।"

"কখন্?"

"কিছুকাল পূর্ব্বে"—এই কথা বলিয়া মার্সি যেন এ কথা চাপা দিবার জন্যই বলিল—"ইংল্যাণ্ডে আপনার আত্মীয়েরা আপনার জন্য নিশ্চয়ই খুব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছেন!"

গ্রেস দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"ইংলণ্ডে আমার কেউই আত্মীয় নাই। আমার মত নিঃসঙ্গ একাকী সংসারে তুমি কম লোকই দেখতে পাবে। কানাডায় যখন আমার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল, তখন ডাক্তার ইটালিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হ'ল। এখন জগতে আমি শুধু

নিঃসঙ্গ নহি—কিন্তু একেবারে নিঃস্ব।" তারপর সে কোটের পকেট হইতে একটী চামড়ার চিঠির আধার বাহির করিয়া বলিল—"আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব এখন এই খাতার মধ্যে! যখন আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হ'ল—তখন এইটীকে আমি সযত্নে রক্ষা করেছিলাম।"

মার্সি বর্ত্তিকার ক্ষীণালোকে সেটী দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"ইহার মধ্যে টাকা কড়ি আছে?"

"না, কেবল কতকগুলি দলিল পত্র আছে—আর আছে পিতার একখানি পত্র—। সেই পত্রে তিনি ইংল্যাণ্ডের একটী বয়স্কা সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সে মহিলাটী তাঁর আত্মীয়—কিন্তু আমি তাঁকে কখনও দেখি নি। তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর পাঠিকা ও সঙ্গিনী ক'রে নিতে রাজি হয়েছেন। যদি ইংল্যাণ্ডে আমি শীঘ্র ফিরতে না পারি তা হ'লে ও চাকরীটী নিশ্চয় আর কেউ নিয়ে নেবে।"

আপনার কি আর কোন অবলম্বন নেই?"

"কিছু না। আমার তেমন শিক্ষা হয় নি। শিক্ষয়িত্রী হ'বে—এমন জ্ঞান আমার নেই। এই অপরিচিতা মহিলাই এখন আমার একমাত্র আশ্রয় স্থল—পিতার খাতিরেই তিনি আমাকে তাঁর চাকরীটুকু দিতে রাজি হয়েছেন।—মার্সি, আমার জীবনের কাহিনী বড় দুঃখের কাহিনী। নয় কি?"

শুশ্রূষা-কারিণী কতকটা যেন তীব্রস্বরে সহসা উত্তর করিল—"আপনার চেয়েও অনেক বেশী দুঃখের কাহিনী জগতে আছে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা আপনার অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারলে নিজেদের পরম সুখী মনে করতে পারে।"

গ্রেস চমকিয়া উঠিল। "আমার ভাগ্যের মধ্যে এমন কি আছে যা অপরে পেলে সুখী হয়?"

"আপনার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রখ্যাতি—একটী ভদ্র পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হবার আপনার ভাবী সম্ভাবনা।"

গ্রেস্ সিন্দুকের দিকে একাগ্র দৃষ্টে চাহিয়া দেখিল। সে বলিল—"তোমার মুখে একথা শুনে আমি বড় বিস্মিত হচ্ছি।" মার্সি এ কথার কোন উত্তর দিল না—সে একটু নড়িলও না। গ্রেস্ নিজের চেয়ার মার্সির কাছে সরাইয়া লইয়া গেল। সে বলিল—"তোমার জীবনে কি কোন গূঢ় রহস্য আছে? আমাকে বলতো—তুমি এই নবীন বয়সে এমন কঠোর বিপদসঙ্কুল সেবাব্রত ধারণ করেছ কেন? তোমার কথা জানতে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে। তোমার হাতখানি একবার আমার হাতে দাও।"

মার্সি একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। সে হাত বাড়াইয়া দিল না।

গ্রেস বলিল—"তুমি কি তবে আমাকে তোমার বন্ধু মনে কর না?"

"আমরা কখনও বন্ধু হ'তে পারি না।"

"কেন পারি না?"

মার্সি নিরুত্তর রহিল। মার্সি নিজের নাম বলিবার সময় ইতস্ততঃ করিয়াছিল। গ্রেসের সে কথা স্মরণ হইল। সে তখন বলিল—"তুমি কি তবে ছদ্মবেশে কোন বিত্তশালিনী মহিমান্বিতা রমণী? আমার অনুমান কি ঠিক?"

মার্সি মনে মনে হাসিল। সে হাসি কি তীব্র জ্বালাময়! "আমি মহিমান্বিতা রমণী!! হাঃ, হাঃ—ভগবানের দোহাই—আসুন আমরা অন্য কথা বলি।"

গ্রেসের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তুমি প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে কথা বলবে না? আমি তো তোমার শত্রু নই।" গ্রেস্ সাদরে মার্সির স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল। মার্সি সে হস্ত দূরে সরাইয়া দিল। সস্নেহ আচরণের একি কর্কশ প্রতিদান! গ্রেস্ ক্রুদ্ধ ভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হায়! তুমি বড় নির্দ্দয়!"

মার্সি দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল—"আমি অতি সদয়।"

"আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া—আমাকে কোন কথা না বলা—এই কি দয়ার চিহ্ন? তোমাকেত আমি নিজের জীবন কাহিনী জানিয়েছি।"

মার্সি উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল—"আমার কাহিনী বলবার জন্য আমাকে উত্তেজিত ক'রবেন না। তা হ'লে পরে আপনাকে এর জন্যে অনুতাপ ক'রতে হবে।"

গ্রেস্ ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না। "আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে অকপট চিত্তে তোমার কাছে সব কথা ব'লেছি। তার প্রতিদানে তুমি তোমার সব কথা হ'তে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও! একি তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহার নয়?"

"তবে আপনি সে কথা শুনতে চান? বেশ শুনতে পারেন। বসুন।" মার্সির কাহিনী শুনিবার জন্য গ্রেসের হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে তাহার চেয়ার খানি মার্সির আরো নিকটে টানিয়া লইয়া গেল। মার্সি নিজের চেয়ার আরো দূরে সরাইয়া বলিল—"আমার এত নিকটে ব'সবেন না।"

"কেন ব'সব না?"

"না না, এত নিকটে নয়। আমার যা বলবার আছে আগে তা শুনুন—তখন বুঝবেন কেন নিষেধ ক'রছি।"

গ্রেস্ দ্বিরুক্তি না করিয়া মার্সির কথা শুনিল। অল্পকালের জন্য গৃহ নিস্তব্ধ হইল—কাহারও কোন কথা নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তিকার ক্ষীণ আলোকে গ্রেস্ দেখিতে পাইল মার্সি জানুর উপর কনুই স্থাপন করিয়া দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া সিন্দুকের উপর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছে। পর ক্ষণেই আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সেই নির্জ্জন গৃহের নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে মার্সি নিজের জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"আপনার মাতার জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে কখনও কি আপনি রাত্রিতে কোন বড় সহরের রাস্তায় বের হয়েছেন?"

গ্রেস্ বলিল—"আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।"

"তবে কথাটা অন্যরকমে জিজ্ঞাসা করি। অন্যান্য লোকের ন্যায় আপনিও তো সংবাদ-পত্র পড়ে থাকেন। সংবাদপত্রে এমন কোন হতভাগিনী নারীর কথা পড়েন নি কি, যে দুঃখিনী দারিদ্র্য ও অভাবের পীড়নে প'ড়ে পাপের পায়ে মাথা বিকিয়েছে?"

গ্রেস্ আরো অধিক বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল—"হাঁ এমন অনেক নারীর কথাই তো পুস্তকে ও সংবাদপত্রে পড়েছি।"

"আর এই সব হতভাগিনীদের রক্ষা ও সংস্কারের জন্য যে পতিতাশ্রম আছে তাদের কথা পড়েছেন কি?"

গ্রেসের বিস্ময় যেন কতকটা কাটিয়া

গেল—এবং তাহার স্থানে একটা সন্দেহের মেঘ তাহার মনে ঘনাইয়া উঠিল। সে ভাবিল এইবার সে মেরিকের মুখে একটা শোচনীয় ঘটনার কথা শুনিতে পাইবে। সে বলিল—"তোমার এ সব বড় অদ্ভুত প্রশ্ন! এই সকল প্রশ্নের অর্থ কি?"

"আমার কথার জবাব দিন—পতিতাশ্রমের কথা শুনেছেন কি? এমন হতভাগিনীদের কথা শুনেছেন কি?"

"হাঁ"

"তা হ'লে আমার নিকট হ'তে আপনার চেয়ারখানি আর একটু সরিয়ে নিন্।" তারপর সে স্থির অথচ মৃদু স্বরে বলিল—"আমি সেই সব হতভাগিনীদের একজন।"

অস্ফুট চীৎকার-ধ্বনি সহ গ্রেস্ চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না—সে এমনি বিহ্বল হইয়া পড়িল।

বিষাদপূর্ণ মধুর কণ্ঠে মেরিক বলিয়া গেল—"আমি এক সময়ে এই রকম পতিতাশ্রমের মধ্যে বাস ক'রেছি—আমি কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলাম। এইবার আপনি কি আমার নিকটে ব'সতে চান—আমার হাত আপনার হাতে নেবার প্রবৃত্তি আপনার আছে?" সে উত্তরের প্রতীক্ষা করিল—কিন্তু কোন উত্তরই আসিল না। তখন সে পুনরায় বলিল—"এখন আপনি বুঝতে পারছেন তো যে যখন আপনি আমাকে নিষ্ঠুর ব'লে তিরস্কার ক'রেছিলেন—তখন আপনার ভ্রম হ'য়েছিল, আর আমি যখন ব'লেছিলাম যে আমি খুব সদয়—তখন আমি ঠিক কথাই ব'লেছিলাম?"

গ্রেস্ আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিল—"আমি তোমার মনে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না।"

মেরিক্ কিছুমাত্র বিরক্তি বা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—"না না, আপনার কথাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আমার গত জীবনের মর্ম্মচ্ছেদী শূলের উপর দাঁড়াতে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি। তবে মধ্যে মধ্যে আমার মনে এই কথা জাগে—"এর জন্যে কি আমিই কেবল দোষী? আমার প্রতি সমাজের কি কোন কর্ত্তব্য ছিল না? যখন আমি রাস্তায় রাস্তায় দেশলাই ফিরি ক'রে ফিরতাম—যখন খাদ্যাভাবে শেলাইয়ের কাজ ক'রতে ক'রতে আমার আঙ্গুল অবসন্ন হ'য়ে পড়ত—তখন আমাকে একটু সাহায্য করা কি সমাজের কর্ত্তব্য ছিল না? কিন্তু এখন আর এসব কথার আলোচনা করা বৃথা। সমাজ এখন আমার সংস্কারের জন্য চাঁদা দান ক'রতে পারে-কিন্তু সমাজ আর আমাকে তার বুকে আশ্রয় দিতে পারে না। এখন আপনি এখানে আমাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ ক'রতে দেখচেন—আমি ধৈর্য্য সহকারে আমার শক্তিমত কর্ত্তব্য পালন ক'রছি—কিন্তু—"এখন যা আমি" তা তো আর "আমি যা ছিলাম" তাকে বদলাতে পারবে না! অনুতপ্ত হৃদয় যতটুকু ক'রতে পারে—গত ৩ বৎসর ধ'রে আমি সমস্তই ক'রে আসছি। এতে কোন ফল নেই। সমাজ আমার গত জীবনের কথা জানলেই আমার উপরে কলঙ্কের কালি ঢেলে দেবে। দয়ালু ব্যক্তিরাও আমার ছায়া দেখলে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়বে।"

মেরিক একটু থামিল। অপর নারীর

মুখ হইতে একটী সহানুভূতির কথা কি তাহার ব্যথিত হৃদয় শান্ত করিতে উচ্চারিত হইবে? না! গ্রেস্ এ কাহিনীতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—সে মেরিকের সঙ্গ ঘৃণা-জনক বোধ করিতেছিল। সে শুধু বলিল—"তোমার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"আমার জন্য সকলেই দুঃখিত। আমার প্রতি সকলেই কৃপা প্রদর্শন ক'রে থাকেন—কিন্তু সমাজে যে স্থানটুকু আমি হারিয়েছি তার উদ্ধারের আর কোনই উপায় নেই!! আর ফেরবার কোন উপায় নেই—ফেরবার যে আর কোন পথ নেই! আমার অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে শোনাব? আপনি নিরাশ্রয়া হতভাগিনীর কথা শুন্‌তে চান?"

গ্রেস্ এক পদ পশ্চাৎ হটিয়া গেল। মার্সি ইহার অর্থ বুঝিয়া বলিল—"আমি আপনাকে এমন কিছুই শোনাব না যা শুনে আপনি শিউরে উঠবেন। আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থা মহিলা আমার দুঃখ ও যন্ত্রণার কাহিনী বুঝেই উঠতে পারবেন না। পতিতাশ্রম হ'তে আমার কাহিনী আরম্ভ করি। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধান-কারিণী আমার সংস্কৃত চরিত্র সম্বন্ধে একখানি পরিচয় পত্র লিখে দেন। তার বলে আমি একটী চাকরি পাই। আমি প্রাণপণে দাসীবৃত্তি পালন ক'র্‌তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু একদিন আমার প্রভু আমাকে বললেন—"মার্সি, আমি তোমার জন্য বড়ই দুঃখিত। লোকে জান্‌তে পেরেছে যে আমি তোমাকে পতিতাশ্রম হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। এখন আর কোন চাকরই আমার কাজে থাকতে চাচ্ছে না—অতএব তোমার আর এখানে থাকা হবে না।" আমি আবার ফিরে আশ্রমে গেলাম—সেখানকার কর্ত্রী আমাকে মায়ের মত আদর দেখিয়ে গ্রহণ ক'রলেন। তিনি বল্লেন "মার্সি, আমি আবার তোমার চাকরির জন্যে চেষ্টা ক'রব—তুমি নিরাশ হ'য়ো না।" আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছি যে আমি কানাডায় ছিলাম।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রেসের কৌতূহল জাগ্রৎ হইয়াছিল। সে নিজের চেয়ার খানি একটু দূরে সরাইয়া লইয়া তাহাতে বসিল। তাহার পর আগ্রহ সহকারে বলিল—"হাঁ সে কথা বলেছ।"

মার্সি বলিল—"এর পর কানাডায় একটী রাজ-কর্ম্মচারীর পত্নীর আমি দাসী হ'য়ে যাই। সেখানে আমি বেশ শান্তি সুখে দিন কাটাতে লাগলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম—সমাজের বুকে তবে কি আবার আমি স্থান পেলাম! সমাজ কি তবে আমায় আবার গ্রহণ ক'রল?" সেই সময় আমার কর্ত্রীর মৃত্যু হ'ল। কিছুদিন পরে আমার প্রভু আবার বিবাহের মতলব ক'রলেন। আমার দুর্ভাগ্য যে বিধাতা আমাকে রূপ দিয়েছেন। এই রূপই লোকের মনে আমার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে দেয়। কন্যাপক্ষীয়েরা আমার প্রভুর কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। প্রভুর বিবরণে তাঁরা সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না—আমার সম্বন্ধে গুপ্ত অনুসন্ধান চ'লতে লাগল—আমার ইতিহাস বের হয়ে' প'ড়ল। আবার সেই প্রাচীন কাহিনী!—"মার্সি, আমি বড় দুঃখিত; তোমার সম্বন্ধে আর আমার সম্বন্ধে সমাজে খুব গুজব ও আলোচনা উঠেছে। আমরা নির্দ্দোষ, কিন্তু এতে সমাজের হাতে

পরিত্রাণ নেই ; আব আমাদের একত্রে থাকা চল্‌চে না।"

আমার চাকার গেল। তবে কানাডায় থাকবার সময় একটা বিদ্যা লাভ ক'রেছিলাম —সেটা দেখচি এখন আমার কাযে লাগছে।"

"সে কি ?"

আমাদের প্রতিবাসীরা ফরাসী দেশীয় লোক ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় আমি ফরাসী ভাষায় কথা কইতে শিখে ছিলাম।"

"তুমি কি লণ্ডনে ফিরে গিয়েছিলে ?"

"তা না হ'লে আব কোথায় আমার স্থান ছিল, বলুন ? আবার আমি আশ্রমে ফিরলাম। সেই সময় আশ্রমে ব্যাধি দেখা দিল—আমি শুশ্রূষাকারিণীর কায ক'রতে লাগলাম। একজন ডাক্তার আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন—আমাকে ভালবেসে ফেললেন। তিনি আমাকে বিবাহ ক'রতে চাইলেন। আমি কর্ত্তব্য বোধে তাঁকে আমার ইতিহাস ব'ললাম—আর ফিরে তিনি আমাকে দেখা দেন নি। আবাব সেই প্রচীন কাহিনী! আমি বারংবার মনে মনে ব'ললাম—"সমাজে ওঠবাব আমার কোন পথ নেই—কোন পথ নেই।" নিরাশা তখন আমার হৃদয়কে আশ্রয় ক'রল—যে নিরাশা হৃদয়কে কঠোর করে, সেই নিরাশা আমার প্রাণে আধিপত্য বিস্তার ক'রলে। আমি আত্ম-হত্যা ক'রতে পারতাম—আমি হয়তো আবার আমার প্রাচীন জীবনেই প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতাম—কিন্তু একজন আমাকে এই সব হ'তে উদ্ধার ক'রলেন।"

মার্সির কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া উঠিল—সে কিছুক্ষণের জন্য থামিল। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্ব-স্মৃতির তুফান বহিয়া গেল—পূর্ব্ব-জীবনের কত কথাই মনে জাগিল। সে সেই ঘরের অপর একজনের অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত বুঝি ভুলিয়া গেল। তখন গ্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল—

"সে লোক কে ? কিরূপে তিনি তোমার বন্ধু হ'লেন ?"

"আমার বন্ধু হ'লেন ? মার্সি ব'লে এ পৃথিবীতে একটী জীব আছে—সে কথা পর্য্যন্ত এখনও তিনি জানেন না।"

এই উত্তরে গ্রেসের কৌতূহল আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তুমি এখনই ব'ললে—"

"আমি এখনই ব'ললাম যে তিনি আমাকে রক্ষা ক'রেছিলেন। তিনি সত্যিই আমাকে রক্ষা ক'রেছিলেন—আপনি এখনই শুনতে পাবেন কেমন ক'রে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। একদিন রবিবারে আমাদেব পতিতাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট পাদ্‌রী অনুপস্থিত ছিলেন। সে দিন তাঁর জায়গায় একজন যুবা পাদ্‌রী উপাসনা ও উপদেশেব কাজ ক'রেছিলেন। তাঁর নাম—জুলিয়ান্ গ্রে। আমি পিছনের বেঞ্চে ব'সেছিলাম—সেখান হ'তে আমি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম—কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পান নি। সে দিন তাঁর উপদেশের বিষয় ছিল, বাইবেলের এই কথাগুলি "নিরানব্বই জন সাধু লোক, যাঁদের অনুতাপের কোনই প্রয়োজন নেই—তাঁদের জন্য স্বর্গে যে আনন্দ হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ হবে একটী পাপীর জন্য যে নিজের পাপের কথা ভেবে অনুতপ্ত হবে।" ভাগ্যবতী রমণীগণ তাঁর এ উপদেশের বিষয়ে কি ভাববেন জানি না—কিন্তু সে দিন আমাদের আশ্রমে একটী

চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। আমার নিজের সম্বন্ধে বলি; সে দিন তিনি যেমন ক'রে এ হৃদয় স্পর্শ ক'রেছিলেন—যে ভাবে একে গলিয়ে দিয়েছিলেন—তার পূর্ব্বে বা পরে কেউ আর তেমন ক'রে পারেন নি। তাঁর বাক্যে আমার নিরাশার কঠোরতা একেবারে গলে' গিয়েছিল—আমার জীবনের মত হীন জীবনেরও যে মূল্য আছে, গৌরব আছে—তাঁর কথায় হৃদয়ে এ ভাব জেগে উঠেছিল। সেই দিন হ'তে আমার এ দুঃখের জীবন আমি ধীর ভাবে বহন ক'রতে শিখেছি—। আমার মনে হয় আমার জীবন হয়তো সুখী হ'তে পারত যদি আমি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লতে পারতাম। কিন্তু আমি তা পারি নি।"

"কি জন্য পারলে না?"

"আমার ভয় ক'রতে লাগল।"

"কিসের ভয়?"

"আমার কঠোর জীবনকে হয়ত কঠোরতর ক'রে ব'সব—এই ভয়।"

কোন সহৃদয়া নারী মার্সির এ উত্তরের প্রকৃত ভাব অনুভব করিতে পারিতেন—কিন্তু গ্রেস্ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে বলিল—

"আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।"

সুতরাং, মার্সিকে কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইল। "আমার ভয় হ'ল তাঁকে আমার কথা জানালে তিনি হয়তো আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রবেন—আমার হৃদয় হয়তো তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়তে পারে।"

গ্রেসের অন্তঃকরণে মার্সির প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতির ভাব না থাকায় সে বলিয়া ফেলিল—

"তোমার প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হবে?"

মার্সি ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল। সে বলিল—"আমার কথায় আপনি বিস্মিত হ'য়েছেন। হায়! ভাগ্যবতী নারী—আপনি কি এ কথা বুঝবেন যে নারীর হৃদয় শত নির্য্যাতন, শত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও নিষ্কলঙ্ক ও মহান্ থাকতে পারে! জুলিয়ান্‌কে দেখবার আগে আমি জগতের পুরুষগুলিকে কেবল ভয়ের বস্তু ব'লে মনে ক'রতাম। যাক্, এ কথার আলোচনায় আর কোন প্রয়োজন নেই। আশ্রমের সে দিনকার সেই প্রচারক এখন তো কেবল একটি স্মৃতি মাত্র—তবে সে স্মৃতি আমার জীবনের বড় মধুময় স্মৃতি। আর আপনাকে আমার কিছুই বলবার নেই। আপনি আমার কাহিনী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন—তাই সে কথা আপনাকে শোনালাম।"

গ্রেস্ বলিল—"কিন্তু তুমি কিরূপে এখানকার এই চাকরী পেলে সে কথা তো এখনও শুনতে পেলাম না।"

মার্সি বলিল—"আশ্রমের কর্ত্রীর ফ্রান্সে আত্মীয় আছেন—সৈনিক হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে তাঁদের জানা শুনা আছে। তাঁরাই আমাকে এ চাকরী দিয়েছেন। এখানে সমাজ আমার কাছ হ'তে কিছু উপকার পাচ্ছে। আমি আহতদের সেবা শুশ্রূষা ক'রছি। এখানে একদিন যদি একটা গোলা এসে আমার উপর পড়ে—তা হ'লে সমাজ অতি সহজেই এই হতভাগিনীর হাত হ'তে মুক্তি লাভ ক'রবে।"

এই কাহিনীর পর ভদ্রতার খাতিরেও দুঃখিনীকে দু এক কথা বলা আবশ্যক—

গ্রেস্ এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিল। সে মার্সির দিকে এক পদ অগ্রসর হইল—আবার সহসা থামিল। তাহার পর যেন চক্ষু লজ্জার খাতিরেই বলিল—"যদি তোমার জন্য আমি কিছু ক'রতে পারি—" কথা আর শেষ হইল না। যে পতিতা নারী তাহার জীবন বাঁচাইয়া তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিল—তাহার জন্য ইহার অধিক কিছু বলার বোধ হয় কোন প্রয়োজন ছিল না!

মার্সি পর্দ্দা উঠাইয়া শুশ্রূষা কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইল। মনে মনে বলিল—"মিস্ রোজবেরি একবার আমার হাত খানিও ধ'রতে পারতেন।" না, না, সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিতা রমণী গ্রেস্ কি রূপে তাহা করিবে? সে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল!

মার্সির অন্তরে ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"আপনি আমার জন্য কি ক'রতে পারেন? কিছুই না। আপনি কি আমার স্বরূপ বদলাতে পারেন? সমাজে নিষ্কলঙ্ক নারীর প্রতিষ্ঠা আমাকে দিতে পারেন? হায়! যদি আপনার মত শুধু আমার খ্যাতি ও আশা থাকত—যদি সমাজে আমার একটু স্থান থাকত! যাক্; আপনি এই খানেই থাকুন। এখন আমি আমার কাজে চললাম। আপনার পরিচ্ছদ শুকুলো কি না আমি দেখছি। ততক্ষণ আমার পরিচ্ছদই প'রে থাকতে হবে—তবে যাতে আমার পোষাক আপনাকে বেশী-ক্ষণ প'রে থাকতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি ক'রছি।"

এই কথা বলিয়া মার্সি চলিয়া যাইতেছিল—এমন সময় গ্রেস্ একটী প্রশ্নের দ্বারা তাহার গমনে বাধা দিল।—"আকাশের অবস্থা বদলাল না কি? কৈ আর তো জল ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।"

মার্সি তাহাকে নিরস্ত করিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতপদে জানালার কাছে গিয়া জানালাটী খুলিয়া ফেলিল।

মার্সি বলিল—"শীঘ্র জানালা বন্ধ করুন। কাপ্তেন আমাদের জানালা খুলতে বারংবার নিষেধ ক'রে গেছেন।"

গ্রেস্ মার্সির কথায় কান না দিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আকাশের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিল।

সলিলাচ্ছন্ন আকাশে তখন অস্পষ্ট আলোক লইয়া চন্দ্র ধীরে ধীরে উদিত হইতেছিলেন। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল—যে অন্ধকার বন্ধুরূপে ফরাসীদিগের অবস্থান জার্ম্মান শত্রুদিগের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল—তাহা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল। আর কএক ঘণ্টা অতীত হইলেই গ্রেস্ ইংলণ্ডের পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে পারিবেন। আর কএক ঘণ্টা পরেই রজনী প্রভাত হইবে।

মার্সি দ্রুতপদে স্বয়ং যাইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই দূরে একটী বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। তাহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় আওয়াজ শ্রুত হইল। এ আওয়াজ আরো নিকটে মনে হইল। মার্সি আর আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য স্থির ভাবে দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

বন্দীর ডায়েরী। শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকাদের কাছে হেমন্ত বাবুর পরিচয়ের আবশ্যক নাই। হেমন্ত বাবু আজ কয় বৎসরের মধ্যে নিজের সাহিত্য-আলোচনা ও চিন্তা শক্তির দ্বারা আপনাকে আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখার মধ্যে তাঁহার একটা বিশেষ ধারা আছে—তিনি যাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করেন তাহাই লিখেন, তাই তাঁহার রচনা কখনও অনাবশ্যক আড়ম্বর ও চিন্তাক্লিষ্টতার দ্বারা আড়ষ্ট নহে। সহজ ও সরল ভাষায় এমন করিয়া ভ্রূকুটি করিতে কি রঙ্গ করিতে বাঙ্গলা সাহিত্যে দু' একজন ছাড়া আর কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে যে টুকু মুখবন্ধ করা হইল তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক, অধ্যাপনা ছাড়িয়া দেশের কাজে কর্ম্মী সাজিলেন, কোথায় রহিল তাঁহার ভাষাতত্ত্ব আর কোথায়ই বা গবেষণা। নিজের মধ্যে যে কর্ম্ম-চাঞ্চল্য ও সত্য কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত ছিল তাহাই তাঁহাকে এই বিপুল কর্ম্ম ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া নিক্ষেপ করিল।

তিনি কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভাল মন্দ যাহা বিস্ময়কর মহত্ব বা হাস্যোদ্দীপক দুর্ব্বলতা যাহা নিজের চোখে দেখিয়াছেন তাহা তিনি উপযুক্ত ভাষার ব্যঞ্জনা দ্বারা সাধারণের উপভোগ্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহার "গ্রেপ্তারের পূর্ব্বদিন" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে না পড়িয়া থাকা যায় না। গ্রেপ্তারের দিন, গ্রেপ্তারের পর দিন, বিচারের দিন, আলিপুর জেলে, দশ দিনের নির্জ্জন কারাবাস, কংগ্রেসের সপ্তাহ, রঙ্গরসের পর্ব্ব, নন্দলালের কাহিনী প্রভৃতি ১৮টি অধ্যায়ই বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শেষের কয়েক অধ্যায় সল্প সময়ের মধ্যে লেখা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

আটের পরিচ্ছেদ "শিশু শিক্ষায় স্বরাজ" শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া "তারিফ" না করিয়া থাকা যায় না। হেমন্ত বাবুর "বন্দীর ডায়েরী"র মধ্যে দেশের একটা পরম সান্ত্বনা আছে এই যে বন্দীর দল সচ্ছন্দচিত্তে কারা-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। অবসাদ বা অশান্তি কাহারো জীবন অতিষ্ঠ করে নাই। স্বেচ্ছাবৃত দুঃখবরণের মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহাতেই বন্দী জীবনের মূল্য নিরূপিত হইয়াছে।

স্বরাজ কোন পথে ? এ পুস্তকখানিও শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকারের লেখা—প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক্ ক্লাব। মূল্য আট আনা।

স্বরাজ পথে বাহির হইয়া হেমন্ত বাবু

বলিতেছেন "স্বরাজ কোন্ পথে? ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই—সুখ সম্পদ আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনের শক্তি যাঁহার আছে তাঁহার যে নিজের সংশয় অভিজ্ঞতার তীব্র ফল সাধারণে প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

হেমন্ত বাবুর মত দেশের জন্য যাঁহারা অনুভব করেন, দেশ-সাধনাকে যাঁহারা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের স্বরাজ পথে চলিতে চলিতে যদি মনে হয় 'কঃ পন্থা' তবে তাহাতে দুঃখ' বা নৈরাশ্যের কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না—কারণ চিন্তা করিবার মত বুদ্ধিবৃত্তি যাহাদের আছে তাহারা কঃ পন্থার সমস্ত সংশয় দূর করিয়া একদিন নিশ্চয় বলিতে পারিবে—"নান্য পন্থা!" তিনি ত্রয়োদশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বরাজ সাধনার কথা নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বই খানিতে বাজে বক্তৃতা নাই—রাজনীতির "চাল বাজী"ও নাই—যাহা আছে তাহা তাঁহার নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সকল স্থলে আমাদের মতের সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও আমরা তাঁহার প্রস্তাবগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়াছি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা আছে তাহা লইয়া আর যে কোনও কাজ সম্ভব নহে এ কথা সত্য, এ একান্ত প্রয়োজনকে আমরা সকলেই স্বীকার করি।

কাউন্সিলে প্রবেশ করা সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি প্রয়োগ কালে তিনি যে বলিয়াছেন—সদস্যগণের Majorityর মত গভর্ণর Veto করিতে পারেন না অতএব আমাদের দলের লোক Council এ অধিক সংখ্যায় থাকিলে আমরা Majority পাইব এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরের শেষ ক্ষমতার উপর আমাদের যথেষ্ট হাত থাকিবে এ কথা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। কারণ খুব বেশী দিন নয় বাঙ্গলায় এবং বিহারে Majorityর মতকে Veto করিয়া শাসন কর্ত্তার মতানুযায়ী কার্য্য হইয়াছে। কারণ বিশেষ কারণ ঘটিলে গভর্ণর State Necessityর খাতিরে সবই করিতে পারেন।

যাক মোটের উপর পুস্তক খানিতে বর্ত্তমান সমস্যার দিনে যে সকল নূতন কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রণিধান যোগ্য।

ঊনপঞ্চাশী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ নং রামরতন বোস লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবুর নাম, এবং তাঁহার 'ঊনপঞ্চাশীর' নিবন্ধাবলী বাঙালায় পাঠকদের কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত!

এই সব লেখার অধিকাংশই আমরা 'বিজলী'তে প্রকাশ কালে বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এমন শক্তিশালী লেখক আর নাই বলিলেই হয়। তিনি নিজের চিন্তাকে এমন করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন যে নানা দুরূহ সমস্যাকেও বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখার অবকাশ ঘটে। সহজভাবে রসাল করিয়া বলিবার এমন সুন্দর ভঙ্গিটী আর কাহারো লেখায় দেখি নাই। তাহার বিচিত্র 'বেড়াজালে' কখনও কখনও নিজেও ধরা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। নিজের দুর্ব্বলতা অপরের কলমের আগায় কেমন করিয়া বাহির হইল ইহা মনে করিয়া বিস্মিত হই, লজ্জিত হই—কিন্তু হইতে পারিনা যাহা সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক অর্থাৎ রুষ্ট!—লেখক নিজের শক্তির কাছে পাঠকের সে সতত উন্মুখ রিপুকে সংযত করিয়া রাখেন।

তাঁহার "মন আমার" প্রবন্ধটি আমরা মুগ্ধবিস্ময়ে অনেকবার পড়িয়াছি। কল্পনা ও ভাব প্রকাশের মধ্যে তিনি কোথাও আপনাকে এতটুকুও হারান নাই। অধিকাংশ প্রবন্ধই বর্ত্তমান আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া লেখা, অনেক স্থলে আমাদের মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা ঊনপঞ্চাশী পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি।

ওগো সুদূর বনের শিকারা

আমি দাঁড়াইয়া থির, আশাপথ চেয়ে তোমারি।

বাসন্তীর সৌজন্যে
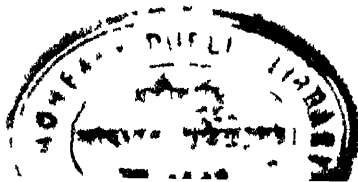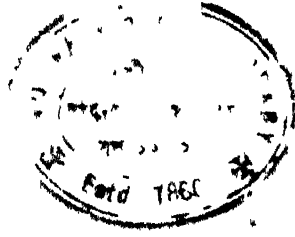
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } ভাদ্র ১৩২৯ ২য় সংখ্যা

ভারতের সাধনা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

সাধনার ধারা

যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ সুখের কামনায় একা একা বা জাতিবদ্ধভাবে কোনও একটা ধারণাকে সত্য ব'লে আশ্রয় ক'রে কত ওলট্-পালটের সৃষ্টি করেছে। ধর্মের নামে স্বাধীনতার নামে যে সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল কোন্‌টা বেশী ঘটেছে বলা সত্যই কঠিন। তবুও প্রকৃতির নিয়মে আমাদের এমন একটা কিছু না করেও উপায় নেই। কাজেই আমাদের সকল কর্মের পরিণাম কোথায়, সকল চেষ্টা পরম লক্ষ্যের পথে ঠিক যাচ্ছে কি না—এ'সব বিচার না ক'রেই যুগধর্মের বশে এবং প্রকৃতির প্রেরণায় কাজ আমাদের ক'রে যেতেই হবে। ভগবান গীতায় বলেছেন—

স্বভাবজেন হি কৌন্তেয়! নিবদ্ধ স্বেন কর্মনা।
কর্ত্তুম্ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ ॥

—আমরা আমাদের স্বভাবগত কর্মে নিবদ্ধ, মোহবশত যা করতে ইচ্ছা করি না, তাও ক'রে যেতে হবে—এতে নিজের উপর নিজেরও হাত নেই।

এই কথাটা মনে রাখলে আর কোনও বিরোধ থাকে না—সংসারের সকল মানুষের সকল কাজের সার্থকতা দেখা যায় এবং সকলের এই চেষ্টার মাঝে অখণ্ডের পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। বৈচিত্র্যের বিনাশে একত্বের প্রতিষ্ঠা নয়—তার বিকাশেই সৌন্দর্য্যের সমগ্রতা। সকল মানুষ সকল জাতি যেন

নানা জাতীয় ফুলের মত ফুটে উঠছে—তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য্যেই প্রাণের হাটে সুন্দরের মেলা বসেছে। এই বৈচিত্র্যের ধ্বংসকারী প্রতিকূল শাসনের বাঁধন জীবনের স্ফূর্ত্তির পথে অন্তরায়। মানুষের ভিতরকার শক্তি এই শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে তাই এতদিকে বিদ্রোহের আলোড়ন প্রয়োজন হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

এই বিদ্রোহের মূলে মস্তবড় একটা কথা আছে। এ শুধু একটা রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়ে বিরোধ নয়। মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর দেওয়া দু'টি বৃহৎ সভ্যতার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাধনার শক্তি পরীক্ষার দিন এসেছে। এ সাংঘাতিক সংঘর্ষের ফলাফলের উপর জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করছে। দেবদৈত্যের সংগ্রামে দেব গুরু বৃহস্পতি, বা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কা'র জয় হবে, আজ সেই কথা দাঁড়িয়েছে।

পাশ্চাত্যের বহির্মুখীনতা

বহির্মুখী পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে জগতকে আহ্বান করেছে! শক্তির মত্ততায় সে ধরিত্রীকে ভোগের দাসী করবে ব'লে অধীর হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতির বাইরের দানে বঞ্চিত হ'য়ে সে অন্তঃপ্রকৃতির সমস্ত শক্তি বাইরে প্রয়োগ ক'রে আজ সকল অভাব ঘুচুতে চা'চ্ছে। আকাশে, জলে, স্থলে তার দাপটের অন্ত নেই। সংসারের কোথায় কোন্ ভোগের বস্তু আছে, দখল কর। প্রকৃতির কৃপণতা বুদ্ধির বলে পরাস্ত কর। আমার আকাশে যদি চন্দ্র-তারা না দেখা দেয়, তবে মশাল জ্বেলে রাতের আঁধার দূর কর।

এই জাতির যৌবনের রাজসিকতা তার জীবনকে ভোগসর্ব্বস্ব করেছে। তার মনীষা, তার বুদ্ধি—সমস্ত ঐ একদিকে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছে। এ ভোগের পথে যে বাধা হবে, তাকে ধ্বংস করবার কত যন্ত্র সে আবিষ্কার করেছে। আত্মসুখের লালসায় সে পরের সুখ দুঃখ ভুলে গেছে। জগতের আর সবাই আমার সুখ সাধনের জন্য সৃষ্ট—এই ধারণা তাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করেছে। তাই জগতের দুর্ব্বলজাতি সমূহের স্ব-নিযুক্ত অভিভাবক হ'য়ে সে কি পাশবিক অত্যাচারই না করছে!

বর্ত্তমান ইউরোপের আদর্শ জার্ম্মান দার্শনিক নীটশের বাণীর মধ্যদিয়ে অতিরঞ্জিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে।—"দয়াধর্ম্ম কাপুরুষের দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলের ধ্বংসেই সমাজের উন্নতি, যুদ্ধেই জগতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল।" অতি-মানুষের (Superman) সৃষ্টি এই রাক্ষসী মতবাদের গর্ভে—তা না হ'লে জগতের কল্যাণ নেই!

খৃষ্টের মহান্ আদর্শের সেখানে স্থান নেই "There was only one christian on earth and he was crucified"—জগতে একজন খৃষ্টান জন্মেছিল এবং তাকে ক্রুশে বিঁধে মরতে হয়েছিল! তার আবির্ভাবে সংসারে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশী হয়েছে! দুর্ব্বলের স্থান এ জগতে নেই—বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা!

এই দার্শনিকের শিষ্য জার্ম্মাণ জাতি মানুষের বুদ্ধিতে যতটা কুলোয় ততটা নিজেকে সুসজ্জিত ক'রে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল—কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপরে যে বিরাট্ শাশ্বত বুদ্ধিটা বিশ্বসৃষ্টি চালাচ্ছে, সেই বুদ্ধির নির্দ্দেশে তার সকল গর্ব্ব কোথায় চূর্ণ হ'য়ে গেল। রক্তপিপাসু ইউরোপ আজ মরণের আঘাতে

অবশ হ'য়ে প'ড়ে হাঁপাচ্ছে। এ আঘাতেও তার চৈতন্য না হ'লে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে তার ভাগ্যে আরও কি গুরুতর শাস্তি আছে, তা ভবিষ্যতই জানে!

প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা

রূপকথার রাজকন্যার মত অলস তন্দ্রাবেশে প্রাচ্য যেন নিবিষ্ট হ'য়ে আছে। তার যোগনিদ্রা অমৃতের সোনার কাঠির স্পর্শে মাঝে মাঝে ভাঙে। কোন্ দিন কোথা হ'তে কোন্ স্বর্গের দূত মানুষের আকারে যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে এসেছে, অমৃতের অভয় মন্ত্রদানে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে গেছে। কত রাজদস্যু, কত অত্যাচারীর দানবলীলা তার বুকের উপর হ'য়ে গেল, সে নীরবে সব সহ্য ক'রে ধ্যান-নিদ্রায় স্তিমিত হয়ে কত যুগ কাটিয়ে গেল!

প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদ দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন। বাইরের অভাবের তাড়না তাকে কোনও দিন সহ্য করতে হয় নি—তাই বাইরের সাম্রাজ্যে লোলুপ না হ'য়ে সে অন্তরের বিরাট্ রহস্যময় রাজ্য জয়ে ব্রতী হয়েছিল। ভোগকাতর প্রাচী প্রবৃত্তির পথে সুখ না পেয়ে, নিবৃত্তি আশ্রয় ক'রে যোগী হয়েছিল। তার সেই অন্তর্দৃষ্টিতে কত সত্যের সন্ধান মিলেছিল—মানবজীবনের ভিতরকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলেছিল। সে সাধনা অনেকটা সফলও হয়েছিল।

উপনিষদের ব্যাপক দর্শনের মধ্য দিয়ে তার সত্য সাধনার রূপ ফুটে উঠেছিল। "ন হি বিত্তেন মনুষ্যঃ তর্পনীয়ঃ"—ধনের দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হয় না। জীবনের সারভূত সেই সত্যশিব সুন্দরকে পেতে হ'লে বীরের মত ত্যাগের পথে আত্মোপলব্ধির জন্য অগ্রসর হ'তে হ'বে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বলহীন এই আত্মার উপলব্ধি করতে পারে না। যে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়, সে বহির্জগৎ অন্তর্জগৎকে জয় করে অক্ষয় আনন্দলাভ করে এবং জীবের আনন্দ-স্বরূপ উপলব্ধি করে—তখন বুঝতে পারে—"আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দমেব অভিসংবিশন্তি।" আনন্দ হ'তে সমস্ত জীব জন্মায়, আনন্দে বেঁচে থাকে এবং আনন্দের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করে। সুখ দুঃখে তরঙ্গায়িত এই অপার জীবন রহস্য আনন্দ রস ধারায় সরস হ'য়ে ওঠে। জীব তখন শিব হয় এবং 'অয়মহম্ ব্রহ্ম"—এই আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে জ্ঞানবান হ'য়ে স্বর্গের দেবতাকেও স্পর্দ্ধা ক'রে ব'লে :—

> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
> বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
> যমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি—
> নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—"শোন বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী; আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

মৃত্যুর পরপারে স্থিত প্রাচীর সেই জ্ঞানোজ্জ্বল মূর্ত্তি জগৎকে এক নতুন সাধনার সন্ধান দিয়ে গেছে। অন্তর-রাজ্যের গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কারেই তার সমস্ত সভ্যতা অন্তর্মুখী হয়েছে। বহির্জগৎকে ভুলে তার ব্যবহারিক জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে বটে

কিন্তু চরম লাভ ক্ষতির হিসাব যেখানে হয়, সেখানে প্রাচী বোধ হয় একটুও ঠকে নি। দু'দিনের হার-জিত সে হিসাবের মধ্যে গণ্য নয়, প্রাচীর অক্ষয় দান সভ্যতার ভাণ্ডারে চিরদিন অমূল্য রত্নরূপে বিরাজ করবে।

(ক্রমশঃ)

দুর্দ্দিনে

[শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর]

মনে ছিল এই ভাদরে পাট বেচে
মনের মত আনব ঘরে বউ বেছে
দেনার টাকা চুকিয়ে দেব বণ্ডীদের,
গিন্নীকে আর দিব নতুন নথগড়ি
জমিদারের খাজনা দিব শোধ করি
নামটীওত ভাবিনি এই দুর্দ্দিনের !
কার্ত্তিকে হায় পাট যে হলো তিন টাকা
ভাবনা এলো কেমন করে প্রাণ রাখা
বৃষ্টি নাহি সৃষ্টি নাশের সূত্রপাত ;
এক টাকাতে চাল মিলেনা আড়াইসের
দুই বেলাতে ভাত জুটেনা সক্কলের
ভাবলে পরে মাথায় যেন বজ্রাঘাত।

কর্জ্জভূতা কিছুই নাহি যায় পাওয়া
বীজের ধানেও হ'য়ে গেছে ভাত খাওয়া
গয়না গাঁটি সব রয়েছে বন্ধকী ;
মহাজনে তলপ করে টাকার সুদ
বন্ধ হলো ঠাকুরপূজা, খোকার দুধ
কেঁদে কেঁদে হবে নয়ন অন্ধ কি ?

বিকিয়ে গেছে দাদার কে'লে মালামাল ,
হাত ছেড়েছে লক্ষ্মী পূজার রূপার থাল
বলদ দুটা—রাণীর গায়ের কাপড়খান ;
পরের কাছে কেমন করে হাত পাতি
ভাত কাপড়ের অভাবে যে যায় জাতি
কন্যাদায়ে হয় যে আবার অসম্মান !
চিন্তারোগে শয্যা নিল গিন্নী অই
ডাক্তারেরে ভিজিট দিব অর্থ কই
রোজ দুবেলা পথ্য জোটা হয় যে ভার
এমনি করে রোজ খেয়ে এই আধপেটা
অকর্ম্মণ্য হয়েছি দুই বাপ বেটা
শরীরে আর জোর নাহি সে পূর্ব্বকার।

সবাই যেন কেমন আজি মনমরা
আঁখি দুটি সকলেরি জল ভরা
বুক ফেটে যায় মেয়ে দুটোর ক্রন্দনে ;
মুখের পানে চায়না ফিরে কেহ কার
দেশের কারো নাই সে দয়া স্নেহ আর
ইচ্ছা করে প্রাণ ত্যজি উদবন্ধনে।

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধর্ম্মের উপরেই রাজনীতির সৌধ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্থল বিশেষে যদি কোনও বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহা কেবল তাৎকালিক। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সঙ্ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে যেরূপ অপরাধীর প্রতি শাস্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা কেবল তাৎকালিক মাত্র। হিউয়েন্‌-সঙ্ ৬৪৩-৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন, হিউয়েন্ সঙ্ হইতে ফাহিয়ান্ দুই শতাব্দী (৪০৫-১১) পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ শাস্তির মাত্রা না কমিয়া বৃদ্ধি পাইবার কারণ অন্য কিছুই হইতে পারেনা, হর্ষবর্দ্ধনের সময়েও গুরুতর অপরাধের সংখ্যা বিরল, স্মিথ্ সাহেব চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "Violent crime was rare" কিন্তু এই সময়ে কয়েদই সচরাচর শাস্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। তবে কয়েদির প্রতি অত্যাচার হইত, কারণ আহারাদির বন্দোবস্ত ছিলনা, চৈনিক পর্য্যটকের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়—"The prisoners are simply left to live or die and are not counted among men." বাস্তবিক এই রূপ ভাব কেবল হর্ষবর্দ্ধনের সময় সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কারণ হর্ষবর্দ্ধন্ যেরূপ অবস্থায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন সেরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করা কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের সময়ও সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ড হইত— "Minor offences were visited with fines" গুপ্ত সময়ে দণ্ডের যেরূপ কোমলতা দেখা গিয়েছে হর্ষবর্দ্ধনের সময় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মনে হয় যে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে পরিবর্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একরূপ কমিয়া গিয়াছে, পুনরায় দুই শতাব্দী অন্তে সেই দণ্ডের কঠোরতা বৃদ্ধি পাওয়া সাময়িক ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। অঙ্গচ্ছেদ প্রাণদণ্ড বা বন্ধন প্রভৃতি যে কোনও দণ্ডই প্রদত্ত হয়, তাহাই আমাদের মনে হয় কৃত-কর্ম্মের প্রতিশোধের মতন। অঙ্গচ্ছেদ যে পরিমাণে দোষাবহ প্রাণদণ্ডও সেই পরিমাণেই দোষাবহ, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড অত্যন্ত কঠোর বলিয়াই মনে হয়, প্রাণদণ্ডের মূল "জীবনের জন্য জীবন", অঙ্গচ্ছেদের মূলেও অঙ্গচ্ছেদ। আমাদের মনে হয় ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আদপেই নাই। নরঘাতক দস্যুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া অঙ্গচ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডিত করিলে তাহাকে কঠোর দণ্ড বলা যায় না। আততায়ীর প্রাণদণ্ড না করিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিলে তাহাকেও

দণ্ডের কোমলতা বলা যাইতে পারে। অনেকে অঙ্গচ্ছেদের নামে শিহরিয়া উঠিতে পারেন, আমাদের মনে হয় 'প্রাণদণ্ড' ও 'অঙ্গচ্ছেদ' উভয় একই প্রকারের, শিহরিবার কারণ প্রাণদণ্ডে যত বেশী অঙ্গচ্ছেদে তত নয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে বা রোগে অঙ্গচ্ছেদ আবশ্যক হয়। যুদ্ধে কোনও স্থানে আঘাত লাগিলে প্রাণ রক্ষার জন্য অঙ্গচ্ছেদ করিতে হয়, রোগেও করিতে হয়, জীবনের মূল্য দেখিলে অঙ্গহীন করা অপেক্ষা প্রাণদণ্ডই বেশী গর্হিত। কেহ কাহাকেও কয়েদ করিয়া রাখিলে যে অপরাধীর কয়েদ হয় তাহাও যে মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, অঙ্গচ্ছেদও তাহার উপরই প্রতিষ্ঠিত, আমরা অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতির পক্ষপাতী নহি, কেবল মনে হয় দণ্ডের তাৎপর্য্য অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য মূলক শাস্তিতে, এবং দণ্ডও যাহাতে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই আমাদের কাম্য। 'অধর্ম্ম দণ্ড' বলিতে অত্যাচারমূলক দণ্ড বুঝিতে হইবে, ভারতীয় শাস্ত্র তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসেও দণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়াছে,—ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, অতিরিক্ত দণ্ড প্রদান রাজার পক্ষে মঙ্গলকর নয়। ইহা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া। সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥ ৭।১১১

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন "দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ও ধর্ম্মাদ্‌বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্।"

রাজস্ব

চন্দ্রগুপ্তের সময়ও মোটামুটি উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজস্ব সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া স্মিথ্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে, তিনি লিখিতেছেন,—

"The native law of India has always recognized agricultural lands as being crown property, and has admitted the undoubted right of the ruling power to levy a crown rent or 'land revenue,' amounting to a considerable portion, either of the gross produce or of its cash value." অর্থাৎ ভারতীয় আইনে কৃষিক্ষেত্রসকল রাজকীয় সম্পত্তি এবং রাজার ইহার উপরে কর ধার্য্য করিবার নিঃসন্দেহ ক্ষমতা স্বীকৃত আছে। উৎপন্ন শস্যের অথবা তৎমূল্যের অনেকাংশই রাজস্বরূপে গৃহীত হয়। আমরা শাস্ত্রানুসারে দেখিতে পাই কৃষকই ভূমির মালিক। 'Native law' বলিতে অবশ্যই মন্বাদি শাস্ত্রকে বুঝাইবে। মনু বলিতেছেন,—"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম," রাজা কেবল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ষষ্ঠাংশভাক্। রাজাকে ভূস্বামী বলিবার তাৎপর্য্য রক্ষণাবেক্ষণে। শাস্ত্রীয় বিধানে আপদ্ কালভিন্ন রাজার ধনভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই। শিলবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ রাজার পক্ষে প্রশস্ত। ভারতীয় বিধানে প্রজাই ভূমির মালিক। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রণীত "রাজনীতি," গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধান প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বহু বাক্য উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। ৫ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ চন্দ্র কীর্ত্তিও রাজাকে 'গণ দাস' ও ষড়ভাগের ভৃত্য' এইরূপ অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ভারতীয়

শাস্ত্রে কৃষকই ভূমির প্রকৃত মালিক। রক্ষণাবেক্ষণ জন্যই রাজা ষষ্ঠাংশ পাইতেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারেই রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইত. মনু বলিতেছেন,

"ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এবচ"
অর্থাৎ ভূমির উৎকর্ষ অপকর্ষানুসারে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠভাগ বা অষ্টম ভাগ বা দ্বাদশ ভাগ রাজপ্রাপ্য।

গৌতম বলিয়াছেন,—

"রাজ্ঞো বলিদানং কর্ষকৈর্দশমমষ্টমং ষষ্ঠম্"
বিষ্ণু স্মৃতিতেও ষষ্ঠভাগের উল্লেখ রহিয়াছে-

"প্রজাভ্যো বল্যর্থং সংবৎসরেণ ধান্যতঃ ষষ্ঠমাংশ মাদদ্যাদিতি"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শূকধান্যের ছয় ভাগ গ্রহণের ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয় শূকধান্য ব্যতিরিক্ত অন্যান্য ধান্যের সম্বন্ধেই মন্বাদি শাস্ত্রকারের দশম ও দ্বাদশ প্রভৃতি ভাগের ব্যবস্থা। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর দেখিতে পাই,—

"শূকধান্যেষু ষড়্ ভাগং শিম্বীধান্যেষু অষ্টমম্। রাজা বল্যর্থমাদদ্যাদ্দেশকালানুরূপতঃ॥

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন,—

"দশমাষ্টষষ্ঠ নৃপতের্ভাগং দদ্যাৎ কৃষীবলম্।
খিলাদ্বর্ষা বসন্তাচ্চ কৃষ্যামাণাদ্‌যথাক্রমম্॥

ষড় ভাগ গ্রহণেই শাস্ত্রীয় বিধি। কেবল বিপদের সময় এক চতুর্থ গ্রহণ করিবার বিধি আছে। আপদের সময় সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—"চতুর্থমাদদানো হি ক্ষত্রিয়ো ভাগমাপদি, প্রজারক্ষন্ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ প্রতিমুচ্যতে॥

মনুর মতে এক বিপদ সময়েই রাজা উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পারেনা। পরন্ত ষষ্টভাগই রাজার প্রাপ্য। বস্তুতঃ 'ষড় ভাগ' রাজার প্রাপ্য এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ সকলেই ঐক্যমত। এবং রাজা প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়াই ষড় ভাগ তাঁহার প্রাপ্য রাজস্ব। এইজন্য মনু বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞোভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপিষড়্ভাগো ভবত্যস্যহ্যরক্ষতঃ॥
যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কং চপার্থিবঃ।
প্রতিভোগংচদণ্ডংচ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥
অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকম্॥
অনবেক্ষিত মর্য্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলোপকং।
অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্॥

এই উদ্ধৃত বাক্য সকল হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে রাজা কেবল রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হইতেন, ভূমির মালিক তিনি নহেন। রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়াই প্রজাকৃত ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হয়েন। এবং রক্ষণ ও পালন না করিলে অধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হয়েন। উপরোদ্ধৃত মনু বাক্য হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় রাজা ভূস্বামী কেবল রক্ষণ পালন অর্থে। ভোগদখলের অধিকার কৃষকের, এই সকল প্রমাণ দেখিয়া স্মিথ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়। ষষ্ঠভাগই রাজার প্রাপ্য, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময় যে এক চতুর্থাংশ পরিগৃহীত হইত তাহার কারণ বোধ হয় তাৎকালিক অবস্থা, তাঁহার রাজ্য গ্রহণকালে আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা ছিল. সেই বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিবার জন্যই বোধ হয় আপদনীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কারণ সর্ব্বত্রই প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রীয় বিধান পালন করিবার চেষ্টা পরিস্ফুট। ১২৬ খৃঃ অন্ধ্র বংশীয় বিলিবায়কুরা শকদিগকে পরাজিত করেন। ১৪৪ খৃঃ তাঁহার মাতা যে শিলালিপি খোদিত করে

তাহাতেও শাস্ত্রানুমোদিত কর গ্রহণই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মিথ্ সাহেবের বিবরণই উদ্ধৃত করিলাম,—

"This disgust is vividly expressed in the long inscription recorded in 144 A. D. by queen—mother Balasri, of the Gautama family in which she glorifies herself as the mother of the hero who destroyed the Sakas, Yavanas, and Pahalvas......Properly expended the taxes which he levied in accordance with the Sacred law and prevented the mixing of the four castes."

রাজমাতা বলশ্রীর শিলালিপি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় শাস্ত্রীয় অনুশাসন বলেই কর ধার্য্য হইত, এবং তদনুসারেই ব্যয়িত হইত, হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে হিউয়েন্‌সঙ্ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও ষষ্ঠভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে যদিও স্মিথ সাহেব বলিয়াছেন ষষ্ঠভাগে কেবল theoretically তে ছিল কিন্তু ব্যবহারে অধিক গৃহীত হইত। কিন্তু আমাদের মনে হয় ষষ্ঠভাগই পরিগৃহীত হইত, স্মিথ্ সাহেব চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল,—

The principal source of revenue was the rent of the crown—lands, amounting, in theory at all events, to one sixth of the produce. The officials were remunerated by grants of land, compulsary labour upon public works was paid for; taxes were light; the personal services exacted from the subject were moderate in amount; and liberal provision was made for charity to various religious communities." p p 315.

অর্থাৎ রাজস্বের প্রধান মূল রাজকীয় ভূমির খাজনা। Theoretically ষষ্ঠভাগই খাজনা রূপে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। কর্ম্মচারিগণকে জমি দেওয়া হইত, সাধারণের কার্য্যে বাধ্যতা মূলক পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইত। ট্যাক্স অতি লঘু ছিল। ব্যক্তিগত পরিশ্রমও পরিমিত রূপে গৃহীত হইত, এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দান বিহিত ছিল। স্মিথ্ সাহেব ষষ্ঠভাগের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে না পারিয়া "in the theory at all events" এরূপ মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেও ষষ্ঠভাগই নির্দ্দিষ্ট ভাগ বলিয়া অঙ্গীকৃত ছিল, রাজা হিন্দুই হউন অথবা বৌদ্ধই হউন, কর আদায় সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিই পালন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্ত্তিও খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রাজাকে "ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্যঃ" ষষ্ঠভাগের ভৃত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এই বিধান চলিয়া আসিতেছে তাহাই প্রতিপন্ন হয়, স্মিথ্ সাহেব মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের "Land Revenue" সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

"The share of the produce taken by the state as land revenue or rent ordinarily was one fourth, as stated by Diodorus, but in certain cases the king took one fifth."

p. p, 134,

স্মিথ্ সাহেব বলেন এক চতুর্থই সাধারণতঃ

রাজস্বরূপে গৃহীত হইত, এস্থলে তিনি মেগাস্থেনিসের সহিত ঐক্যমত। কিন্তু স্থল বিশেষে একের পাঁচ অংশও গৃহীত হইত। আমরা একের পাঁচ অংশের উল্লেখ শাস্ত্রে কোথাও দেখিতে পাইনা। অর্থশাস্ত্রেও এরূপ কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইনা, বরং কৃষকদিগের সাহয্যার্থ শস্য, পশু, ও অর্থ দেওয়ার বিধান দেখিতে পাই। "যদি কৃষকগণ সহজেই তাহাদের কর দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট চিত্তে শস্য, পশু ও অর্থ দেওয়া যাইতে পারে।"

অর্থশাস্ত্র-২য় খণ্ড-১ম অঃ (৫৯ পৃঃ)

অর্থশাস্ত্র পাঠে মনে হয়, রাজার খাসে কতক জমি থাকিত, সেই খাসের জমি পত্তন ও বিলি হইত এবং এই জমিই "রাজকীয় ভূমি" বা crown lands রূপে গৃহীত হইত, অর্থশাস্ত্রের ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নানারূপ রাজকরের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে দুর্গ, রাষ্ট্র, খাল, গৃহ ও সেতু বন ব্রজ এবং বাণিজ্য পথ হইতে রাজস্ব গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর বলিতে "রাজকীয় ভূমি হইতে উৎপাদিত শস্যাদি, ও রাজ ভাগের" উল্লেখ আছে, এ স্থলে রাজকীয় ভূমি বলিতে রাজার খাসের ভূমি এবং রাজ-ভাগই প্রজার নিকট হইতে গৃহীত ষড়্‌ভাগ। এই সকল দেখিয়া মনে হয় ষষ্ঠাংশ গ্রহণই প্রকৃত বিধান, এবং তাহাই অনুসৃত হইত।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় ভূমির বিভাগ, আব্‌গারী বিভাগ, জল সরবরাহ বিভাগ, (Irrigatin Dept.) প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাস্তাগুলির সংস্কার রাজকীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন, "The roads were maintained in order by the officers of the proper department; and pillars, serving as mile-stones and sign-posts were set up at intervals of ten *Stadia*, equivalent to half a kos," E. H. I. p. p. 132.

কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় শাসনের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইত। স্মিথ্ সাহেব লিখিতেছেন, "The central government, by means of local officers, exercised strict control and maintained close supervision over all classes and castes of the population"

E. H. I. p. p. 131.

অর্থশাস্ত্র পাঠে দেখিতে পাই, নানা বিভাগে নানা রূপ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইত এবং কার্য্যের শৃঙ্খলা সবিশেষ রক্ষিত হইত, অর্থশাস্ত্রে প্রসাস্তৃ, সমাহর্তৃ প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গের উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থশাস্ত্রের ১ম খণ্ডের ১২শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী-সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। বর্ত্তমানের ইংরাজী নাম দিলে তাহাদের কার্য্যগুলি পরিস্ফুট হইবে মনে করিয়া প্রাচীন নাম ও ইংরাজী নাম দিলাম,—

প্রাচীন নাম	ইংরাজী নাম
প্রসাস্তৃ	Magistrate
সমাহর্তৃ	Collector-general

সমাহর্তৃর অধীনে গোপ ও স্থানিক প্রভৃতি কর্ম্মচারী ছিল, ইহারা সকলে গ্রাম ও জনপদ প্রভৃতির যাবতীয় খবর রাখিত এবং জন্মমৃত্যু প্রভৃতির সংবাদও রাখিত। নগরেও সমাহর্তৃ থাকিত, তাহার অধীনেও এইরূপ কর্ম্মচারী থাকিত।

সন্নিধাত্রী	Chamberlain
প্রদেষ্টি	Commissioner

নায়ক	City-constable.
পৌর	Kotwal
ব্যবহারিক	Superintendent of Transaction,
কর্ম্মান্তিক	Superintendent of manufactories,

ইত্যাদি

সন্নিধাতা বা কঞ্চুকী কোষাগার, পণ্য-গৃহ, শস্যাগার, বন্ধনাগার এবং অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করিত।

এই কঞ্চুকীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনায় একটী সুন্দর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাপাত পরীক্ষার জন্য কুণ্ড স্থাপিত হইত। বর্ত্তমান Meteoro logical department যেরূপ বর্ষাপাত প্রভৃতির খবর রাখে, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ বিধান ছিল। অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই,--

"কোষ্ঠাগারের সম্মুখে বর্ষাপাত পরীক্ষার জন্য অরত্নিমাত্র প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট এক কুণ্ড স্থাপন করিতে হইবে।" এই সকল বিধান দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, তখনকার শাসন-শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের শাসন-শৃঙ্খলা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ফল। অর্থশাস্ত্রে শাসনাধিকারেও নানা বিভাগীয় কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য বিহিত রহিয়াছে। কোষাধ্যক্ষ, আকরাধ্যক্ষ, সুবর্ণা-ধ্যক্ষ (Superintendent of the mint) কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ (কর্ত্তব্য পরিদর্শন, রাষ্ট্র-সংক্রান্ত রাজকর প্রভৃতি পরিদর্শন করাই ইঁহার কর্ত্তব্য ২য় খণ্ড ১৫শ অঃ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা ছিল, পণ্যাধ্যক্ষ বাণিজ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিত। কুপ্যাধ্যক্ষ (Conservator of forests) বন বিভাগীয় কার্য্য সম্পাদন করিত। আয়ুধাগারাধ্যক্ষ (Secretary for munitions) অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিত। পৌতাধ্যক্ষ পরিমাপ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের বিধানাদিও পরিদর্শন করিত। শুল্কাধ্যক্ষ শুল্ক আদায় করিত। সূত্রাধ্যক্ষ সূত্র বস্ত্র এবং রজ্জু নির্ম্মাণে লোক নিযুক্ত করিত। বর্ম্মাদি নির্ম্মাণও তাহার কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। সীতাধ্যক্ষকে Director-general of agriculture বলা যায়। সমস্ত কৃষিবিভাগ তাহার হাতে নিয়োজিত ছিল। সুরাধ্যক্ষ আবগারী বিভাগ পরিচালন করিত। সূনাধ্যক্ষ পশুহত্যাকারী প্রভৃতি কসাই প্রভৃতির ও হিংস্রপশু নির্যাতনের বিধিব্যবস্থা পরিচালন করিত। গণিকাধ্যক্ষ বেশ্যাগণের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত রাখিত। নাবধ্যক্ষের কার্য্য অনেকটা পরিমাণে port commissionerএর কার্য্যের ন্যায়। গোরক্ষা প্রভৃতির জন্য গোহধ্যক্ষ, অশ্বের জন্য অশ্বাধ্যক্ষ, হস্তীর জন্য হস্ত্যধ্যক্ষ, ও চিকিৎসক (Veternery surgeons) নিযুক্ত ছিল। রথাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অশ্বাধ্যক্ষের অনুরূপ। অশ্ব, হস্তী ও রথ প্রভৃতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ সামরিক কর্ম্মচারিগণের কার্য্য, অন্য একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাই, পাশপোর্ট দেওয়া তাহার কার্য্য ইহার নাম মুদ্রাধ্যক্ষ। ফাহিয়ান চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমা দিত্যের সময় pass port এর বিধান দেখিতে পাই বোধহয় চন্দ্রগুপ্তের সময় বৈদেশিকগণের গমনাগমনের জন্য বিধেয় এইসকল বিধান দৃষ্টে মনে হয়, ভারতীয় শাসন-শৃঙ্খলা অতি প্রাচীন কালেই অত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য State Socialism অনুসৃত হইত। আমাদের মনে হয়, ভারতীয়

শাস্ত্রের অনুশাসনই State Socialism এর অনুকূল। অধিক কি State Socialismই ভারতীয় শাস্ত্রের প্রাণ। সমাজের সহিত ব্যক্তির অভিন্নতা সংসাধন করিয়া সমষ্টির মঙ্গল বিধানই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভারতীয় শাসনতন্ত্র পরিচালিত হইত। অর্থশাস্ত্রের ব্যবহার তত্ত্বের বিধান পর্য্যালোচনা করিলেও মনে হয় আইন প্রণয়ণ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উদারতা ও সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইত। প্রয়োগ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিচার ও মৃদুতা ছিল, তবে সাময়িক প্রভাবের জন্য কতকটা বিপর্য্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। অর্থশাস্ত্রের ব্যবহারাধ্যায়ে একটী বিধান দেখিয়া মনে হইল প্রাচীন ভারতেও দেশ চিনিত। ভারতীয়গণের দেশপ্রাণতা ছিল।

অর্থ শাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডের ২৮শ অধ্যায়ে মানহানি প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিধান রহিয়াছে,—

"স্বদেশ বা স্বগ্রামের নিন্দা করিলে প্রথম প্রকারের, স্বজাতির বা সংঘের নিন্দা করিলে মধ্যম প্রকারের এবং দেবতা ও চৈত্যের নিন্দা করিলে উত্তম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে" [illegible]েও কোন ব্যক্তিকে দেশ তুলিয়া গাল [illegible] অর্থদণ্ডের বিধান দেখিতে পাই আমারা কিন্তু স্বদেশ স্বজাতির নিন্দায় মুখর। আমাদের বর্ত্তমানের চরিত্র দেখিলে মনে হয় আমরা কতক পরিমাণে অধঃপতিত হইয়াছি। স্বজাতির স্বদেশের নিন্দা করিতে আমরা যেমন মজবুত এরূপ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। ব্যক্তি যেমন আপনাকে হীন মনে করিতে করিতে হীন হইয়া যায় জাতিও তেমনই নিজকে হীন ভাবিতে ভাবিতে হীন হইয়া যায়। কেবল স্বজাতি তুলিয়া গালাগালি দিতে আমরা খুবই অগ্রসর। ইহারই ফলে আমরা জাতিগত হীনতায় আরও সমাচ্ছন্ন হই। আমাদের মনে হয় ব্যক্তি বা জাতির সমক্ষে উজ্জ্বল আদর্শই স্থাপন করিতে হইবে। ব্যক্তি যদি কেবল শুনিতে পায় "তুমি অপদার্থ, তুমি অকর্ম্মণ্য, তুমি হীন, তুমি অসভ্য" তাহাহইলে ব্যক্তির অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। সমাজ বা জাতির সম্বন্ধেও তাই, ভারতীয় সমাজের ভিত্তিতে একটী মহান সত্য নিহিত, সেই সত্য এই যে সকলেই নিজ নিজ সমাজে শ্রেষ্ঠ। জাতিকে সম্মোহন বলে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত গর্হিত। তোমার শাসন শৃঙ্খলা ছিলনা, উদারতা ছিলনা, প্রতিষ্ঠান ছিলনা, এইরূপ শুনিতে শুনিতে জাতির ধারণা হইয়া বসে বাস্তবিকই আমাদের কিছুই ছিলনা। এইরূপ সম্মোহন 'Hypnotism) বলে জাতি আপন সত্বা ভুলিয়া যায়। যে প্রস্রবণ হইতে জাতি তাহার শক্তি লাভ করিবে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, জাতি অধঃপতিত হয়। ইতিহাসই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে। জাতি নিজের ইতিহাস ভুলিয়া গেলে জাতীয় জীবনের প্রধান মূল সূত্র ছিন্ন হয়। আমাদের মনে হয় ভারতীয় জাতি অনেকটা পরিমাণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতের সহিত তাহার যোগাযোগ নষ্ট হওয়াতেই জাতীয় অধঃপতনের অন্যতম কারণের উদ্ভব হইয়াছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ইতিহাসের আলোচনায় দেখিতে পাইলাম যখনই প্রতিষ্ঠান শক্তির ভারতে বিকাশ হইয়াছে তখনই ভারত নব মূর্তিতে, নব জাগরণে, নূতন সজ্জায়, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রতিষ্ঠান শক্তিই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাণ। গুপ্ত সম্রাজ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার

বিকাশও সংসাধিত হইয়াছে। আর একটী মহান্ সত্য প্রকট দেখিতে পাই, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ফলেই জাতীয় জীবন বিক্ষিপ্ত হইবার উপাদান পাইয়াছে, এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানেই জাতির নব জাগরণ সাধিত হইয়াছে। মৌর্য্য অশোকের অন্তর্ধানের সহিতই এক প্রকার মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরাজগণের আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জাতি এক হইতে সচেষ্ট হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষায় জাতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের স্বতন্ত্রতাই আমাদের মতে অধঃপতনের প্রধানতম কারণ, জাতীয় স্বতন্ত্রতাই জাতির প্রতিষ্ঠান শক্তি লোপ করিয়াছে। প্রতিষ্ঠান শক্তির অভাবেই জাতীয় অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা হিন্দুভারতের বিবরণ এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছি। মুসলমান সময়ে ভারতের হিন্দুরাজনীতির কতকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের প্রণালীরও অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কর্ম্মচারীবর্গের নাম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও ভিন্নতার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার ফলেই হিন্দুভারতের কার্য্যাবলী বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল, ভারতের সেই প্রাচীন সভ্যতার বিষয়ে আমরা অজ্ঞ রহিলাম। যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যে সভ্যতার বলে জাতি জ্ঞানবিজ্ঞানের পসরা, দেশ বিদেশে বহিয়া লইয়া গিয়াছে সেই সভ্যতার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছিল। যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন বলে ভারতীয় জাতির জীবন অক্ষুণ্ণভাবে আপন প্রতাপে দাঁড়, হইতেছিল সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসন কেবল সমাজের ক্রিয়াকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইল। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবহারিক অনুশাসন প্রয়োগের অভাবে কেবল পুঁথিগত হইয়া কীট দষ্ট জীর্ণ চীরের ন্যায় স্তূপীকৃত হইয়া গ্রন্থের ভার বৃদ্ধি করিল। বর্ত্তমান ভারতের সম্মুখে একটী মহত্তর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, প্রাচীন ভারতের সহিত সংযোগ সাধন করা। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় সভ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানের যোগ্য,—

The fore-going review of the civil and military system of government during the reign of Chandra Gupta proves clearly that Northern India in the time of Alexander the Great had attained to a high degree of civilization which must have been the product of the evolution continued through many centuries" অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কালে সামরিক বা বে-সামরিক শাসন শৃঙ্খলার যে বিবরণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সেকেন্দারের সময় উত্তর ভারতে সভ্যতা সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং এই সভ্যতা বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফল। অমাদের ইহা অতীব সত্য বলিয়া মনে হয়।

বিশেষতঃ রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগেও সভ্যতার বিকাশ সুপরিস্ফুট। চন্দ্রগুপ্তের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। ইহা অবিসংবাদিত সত্য, শাসন শৃঙ্খলায়, রাজনীতিতে ভারতীয় জাতি হীন ছিলনা। শাস্ত্রীয় অনুশাসনও জাতীয় জীবনে ব্যর্থ হয় নাই।

ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় নহে। কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসন কিরূপে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শনই আমাদের কর্ত্তব্য। যিনিই রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক তাহাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবহিত হইতে হইবে। কোথায় জাতির প্রাণ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রাচীনের সহিত নবীনের সংযোগ বিধান করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় মন্দিরে নারায়ণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিশ্বনরের আশ্রয় নারায়ণ, জাতির হৃদয় মন্দিরে রাজনৈতিক সিংহাসনে নারায়ণকে স্থাপিত করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণতলে সর্ব্বজাতির সমন্বয় গঠনে প্রতিষ্ঠান শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠান শক্তি বা সম্মিলন শক্তি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ইহাই ভারতীয় শাস্ত্রের শিক্ষা, এই প্রতিষ্ঠান শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ভারতীয় চরিত্রে একটী দোষ সবিশেষ স্ফুট। ভারতে ব্যক্তি বড় হইতে পারে, ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যও সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু দশকে নিয়া বড় হইবার শক্তি জাতি কতকটা পরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছে। দশের কার্য্যেই যত অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহারই ইহার নিদর্শন। প্রতিষ্ঠান শক্তি বা সম্মিলন শক্তিই পথ্য এবং ইহাই আবার জাতীয় রোগ নিবারণের অমোঘ ঔষধ। শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই, "নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

পুষ্পচয়ন

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

পুষ্প চয়নে কণ্টক বিঁধি অঙ্গুলে
রক্তগোলাপ তুলেছি কয়টি তাজা,
গন্ধমধুর রঙটিতে মন ভুলে
সন্ধ্যার-শেষ-লোহিত বরণে মাজা;
কাঁটায় মিলেছে গোলাপেরি পরিচয়,
নয়নের জলে মিছে কেন তিতি আর:
নিবিড় দুখের অমারাতি সে ত ক্ষয়
হাসে নভে এ যে ক্ষীণ শশী তৃতীয়ার

পথশ্রান্ত

[শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবী]

"শুধু দেহ আর আত্মা, আত্মা আর দেহ এমনি করেই কি দিন গুলো কাটাতে হবে স্থির করেছ ?"

"তবে করবো কি উপদেশ দাও" বলিয়া প্রমথ প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। প্রফুল্ল একটু গম্ভীর হইয়া বলিল "তোমাকে উপদেশ দিতে আমি কিছুতেই পারবো না, কিন্তু এটা কি খুব ভাল ?"

"তবে কি খুব মন্দ" সংক্ষেপে উত্তর দিয়া প্রমথ প্রফুল্লের দিকে চাহিল।

"না মন্দ বলতে পারিনে।"

তবে ?"

"এত বোঝ, আর এ সরল ভাষাটা বোঝ না, আমরা তোমাকে লক্ষীছাড়া কিম্বা সৃষ্টি-ছাড়া এই রকম একটা কিছু ধরে নিয়েছি আর কি।" বলিয়া প্রফুল্ল একটু হাসিল।

কিছুদূরে হুগলীর তরঙ্গময়ী গঙ্গা সগৌরবে বহিয়া যাইতেছিল, তীরে কয়খান নৌকা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল,—তখন, অপরাহ্ণের অস্তোন্মুখ তপন জাহ্নবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণতি করিতেছিলেন। প্রমথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল "তাই! বেশত ক্ষতি কি ?" প্রফুল্ল সহজভাবে উত্তর দিল "ক্ষতি আছে কি না, তা বুঝতে পারিনে, আর যদি থাকে, সেটা তোমার না আমাদের তাও ঠিক পাইনে, তবে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, কাজেই তোমার ওই অসহায় উদাসীন অবস্থাটা দেখলে মোটেই সুখী হতে পারিনে।"

প্রমথের চোখে মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, বলিল "কেন যে তোমরা আমাকে অসহায় মনে কর এই বড় আশ্চর্য্য - দেখ প্রফুল্ল তোমাদের জন্য তোমাদের আত্মীয় স্বজন কতটুকু মমতা দিতে পারে, আমি তার অনেক বেশী পরিমাণে পাইনে কি ?"

প্রফুল্ল বিস্মিতভাবে বলিল "কি রকম ?"

প্রমথ উদার দৃষ্টিতে একবার উদার আকাশের দিকে চাহিল, পরে বলিল 'প্রমাণ তুমি—কেন আমাকে অসহায় মনে করে তোমার কষ্ট হয়! ভালবাস বলে,—এই রকম উদাসীনের জন্য ভগবান চতুর্দ্দিক হতে অজস্র ধারায় প্রীতির উৎস খুলে রেখেছেন—যা ওজন করতে গেলে, তোমাদের চাইতে অনেক বেশী হয়ে পড়ে।"

প্রফুল্ল নীরব হইয়া অনেকক্ষণ প্রমথের কথাগুলি ভাবিতে লাগিল, বুঝিল, প্রমথ যা বলিয়াছে তার একবর্ণও অসত্য নয়, তথাপি সে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল "যাইহোক আমি একদিন তোমার গেরুয়া কথানা এনে গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দেব।"

তাহার এই উত্তরে প্রমথ একটু হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না, কেবল স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আকাশের বুকের উপর চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে ধরণীর উপর মৃদুপাদক্ষেপে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। ভক্তের ললাটস্থিত চন্দন বিন্দুর মতই, দূরে—নীলাকাশে উজ্জ্বল সান্ধ্য নক্ষত্র হাসি মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নিম্নে—তরনীর উপর অসংখ্য দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়া, জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রফুল্ল বলিল "বলতে পারিনে, মৃত্যুর পরে কি আছে,—আর সংসারী হলে সেখানে অপরাধী হতে হয় কি না,—প্রমথ অন্যমনস্ক হইয়াছিল, প্রফুল্লের কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "সংসারী হলেই সেখানে অপরাধী হতে হয়, তার কোন প্রমাণ নেই, আর, আমার মত উচ্ছৃঙ্খল হলেই যে তার জন্য সিংহাসন পাতা থাকে তারও কোন প্রমাণ নেই, তবে কি, স্বাধীন মুক্ত জীবনটাকে বিব্রত করতে আমার মোটেই রুচি হয় না, এর জন্য তুমি বুঝি মনে করচো, আমি তোমার চাইতে খুব উঁচু দরের একজন হয়ে গিয়েছি না? হয়ত তা মোটেই নয়।"

প্রফুল্লের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে প্রথম তার অন্তরটা সূক্ষ্ম দৃষ্টে দেখিয়া অভিমানটুকু ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাই সে কৌশলে নিজেকে প্রফুল্লের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিতে চায়, শ্রদ্ধায় প্রফুল্লের সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল, বলিল—"একটা কথা তুমি কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারবে না, ত্যাগীর আসন চিরদিনই শ্রেষ্ঠ।"

প্রমথ তাহার দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিল "উপর দেখে, কোন মতামত স্থির করোনা,—মানুষের ভিতরটায় যে কত ভাবের হাওয়া চলে সেটা ঠিক করতে মানুষ নিজেই ভুল করে, ও সব বিচার আমাদের হাতে নয়—খেয়া পার হয়ে যেখানে পহুঁছিলেই যাব যা পুঁজি ধরা পড়ে যায়।"

এতবড় যুক্তির উপর উত্তর দিবার মত আর কিছু প্রফুল্ল পাইল না, সে অন্তর দিয়া বিশেষ ভাবে বাল্যবন্ধুর এই দেবত্বমণ্ডিত হৃদয়ের অনাবিল মহত্ব অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্য জীবনের কত কথাই আজ তাহার মনে পড়িল, মনে হইল বিশেষ ভাবে একটী দিনের ঘটনা, সেদিন শিক্ষক ক্লাসে আসিলে এমন ব্যাপার ঘটিয়াছিল যাহাতে সমস্ত ছাত্র বিদ্রূপসূচক হাসিতে সমস্ত ঘরটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল,—শেষে যখন শিক্ষকের কঠোর বেতের কাছে একে একে সকলকে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল, তখন সকলেই নির্দ্দোষী সাজিল, সাজে নাই কেবল প্রমথ, সমপাঠীদের অনুরোধ স্বত্বেও সে বলিয়াছিল, "যা করেছি তা স্বীকার করবোই।" সেই দৃঢ়তা, সেই ধর্ম্মভীরুতা যে এখন এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিবে কে তাহা জানিত! সেই একটী মাত্র সত্য বাক্যের অন্তরালের মধ্যে, একটী মাত্র ছোট দেহের ভিতরে এত বড় প্রাণটা যে তখনো ছিল তাহা বুঝবার উপায় তখন কিছুই ছিল না। প্রফুল্ল নিজেই তাহাকে কত দিন কত উপহাস করিয়াছে যে! সহসা একটা অনুশোচনাপূর্ণ নিশ্বাস পড়িয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

সেই সময়ে প্রমথ আবার বলিল "তা হলে বিদায় দাও, এবারের মত চলছি।"

প্রফুল্ল বিস্মিতভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল "আজ নাকি?"

প্রমথ গাঢ়স্বরে বলিল "নিশ্চয়ই আজ রাত্রের ট্রেণ ধরবো।"

প্রফুল্ল বলিল "তা হলে দেশে আর থাকবে না মনে ভেবেছ, কেমন।"

প্রমথ উত্তর দিল "এখন ত যাচ্ছি, দেশে

আমার কেইবা আর আছে, এক মা ছিলেন—তিনি ও ছ'মাস হ'ল আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন ; আর কেন, এখন যাই—গুরুর আশ্রমে পড়ে থাকি গে।"

প্রফুল্ল ব্যথিত ভাবে একবার তাহার দিকে চাহিল, বলিল "যাতে সুখী হও করো।"

প্রমথ আর কিছু বলিল না, কি যেন একটা চিন্তার সঙ্গে একবার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল, শেষে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

প্রমথ চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লের মনে প্রমথের কথাই ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল জগতের অনন্ত স্রোতের ভিতরে, সমানগামী দুটী স্রোতের মতই তাহারা চলিয়াছিল, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নিয়মে ক্রমে ক্রমে কেমন তাহারা দুই পথে ছুটিয়া পড়িল। ওই প্রমথ ! মায়ের স্নেহ-আঁচল নহিলে একদিন যে ঘুমাইতে পারিতনা, সে এখন কোথায় কোন আশ্রমের মধ্যে ধূলি মলিন কম্বলের উপর পড়িয়া কেমন করিয়া অবশিষ্ট দিবস কাটাইবে। তারপর হয়ত একদিন কোন্ বিদেশে, অপরিচিতের মধ্যে কোন বৃক্ষের মূলে অবসন্ন ভাবে পড়িয়া আপনার গণাদিনের শেষ করিবে। জগতে তাহার জন্য একবিন্দু স্নেহের অশ্রুও সেদিন কেহ বিসর্জ্জন করিবে না। একটী ব্যথিত অন্তরও সমবেদনায় 'আহা' করিবে না।

(২)

সুখের সংসার বলিলে যতদূর মানব বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে, প্রফুল্লের সংসারে বাস্তবিক পক্ষে তার কোনটীরই অভাব ছিলনা। স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া, মনোরমা স্ত্রী, ভবিষ্যের আশা-প্রদীপ শিশু পুত্র কন্যা সর্ব্বদাই তার সংসার খানি আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিত। তার দিনগুলি এই রকম ভাবে কেবল হাসি-প্রীতির উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া কখন আসিত কখন যাইত তাহা সে অনুভব করিতেও পারিত না।

সেই জন্য সেদিন যখন অনেক রাত্রিতে সে মুখখান একটু বিষণ্ণ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্ত্রী সুরূপা বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "শরীর কি খারাপ কচ্চে ?"

সুরূপার এই কথায় প্রফুল্লের চিন্তাসূত্র অনেকটা ছিন্ন হইয়া গেল, সে বলিল "কই না, বেশ আছি ত।"

সুরূপা একটা আশঙ্কার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া বলিল "যাক, তাহলেই হ'ল।"

প্রফুল্ল এই অযাচিত প্রীতিটুকু অনুভব করিয়া অনেকটা তৃপ্তি বোধ করিল, মানুষের অন্তরাত্মা মানুষের কাছে স্নেহের প্রত্যাশায় কতখানি লালায়িত হইয়া থাকে তাহা উপলব্ধি করিয়া নিজেই একটু বিস্মিত হইল, মনে হইল যাহারা স্বেচ্ছায় এই স্নেহ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করিতে পারে কিন্তু স্নেহের রাজ্যে তাহারা প্রাণহীন মর্ম্মর মূর্ত্তি মাত্র। সে নিজেকে অনেকক্ষণ দেখিল, বুঝিল ইহা সে কখনই পারিবে না, এই ভাবে জীবনের দিন গুলি কাটাইয়া দিতে পারিলেই সে সুখী হইবে. এই অবসরে কখন যে তাহার চোখের পাতা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতেও পারিলনা।

এমনি ভাবে আরো পনর দিন কাটিয়া গেল। সেদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য্য ধরণীর প্রত্যেক রেণুকণাকে উদ্ভাসিত করিয়া কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন। তখনো তরুশির হইতে নীহারবিন্দু সকল ঝরিয়া পড়িতেছিল,

তখনো প্রভাত পাখীর গান সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। গৃহ প্রাঙ্গণস্থিত শেফালী তরুটীর তখনো সব ফুল গুলি ঝরিয়া ধূলার উপর অনাদৃতের মত লুটিয়া পড়ে নাই। সম্মুখাগত হেমন্তের অভ্যর্থনার নিমিত্ত মন্দ সমীরণ তখনো প্রসন্ন মুখে দ্বার হইতে দ্বার প্রান্তে ঘুরিতেছিল। প্রফুল্ল কেবল মাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছে।

সেই সময়ে তাহার বৌদিদি নিকটস্থ হইয়া বলিল "কাল থেকে ভাবছি তোমাকে একটা কথা বলবো, তা সময়ই হয়ে ওঠেনি" -

সম্পূর্ণ কথায় বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল "এমন কি কথা বৌদিদি?"

"কথাটার একটু গুরুত্ব আছে ভাই! আমি কিছু দিনের ছুটী চাচ্চি!" বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

প্রফুল্ল কিন্তু ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারিল না বলিল "ছুটী, ছুটী বললেই পাওয়া যায়না বৌদিদি, কারণ দেখাতে হবে তা জান ত? আমার বাড়ী থাকার ঠিক নেই, যখন দরকার বোধ করবো, যখন কণ্ট্রাক্টরী এসে জুটবে তখনি চলে যাব, তুমি গেলে এদের দেখবে কে?"

বৌদিদি একটু চুপ করিয়া রহিলেন পরে বলিলেন "দেখ কাল চিঠি পেয়েছি; মার অসুখ না হলে আমি কোন দিন তোমার উপর কিছু বলিনি ভাই, এ সময়ে তোমার মতে চল্‌তে বোধ হয় পারবো না,"

কথাটা শুনিয়া প্রফুল্লও একটু গম্ভীর হইয়া গেল, সত্যই যে এসময়ে সে বৌদিদিকে আটকাইবে কি বলিয়া, বলিল "তবে আর আমার বলবার কিছু নেই,—আমি জানি আমার সংসারে তোমার কোন স্বার্থ নেই, তবু তুমি এতদিন সে ভাব দেখাওনি বলেই আমি তোমার উপর জোর করে এসেছি,—আজ তুমি যখন বিরক্ত হচ্চো তখন আর কিছু বলবো না।"

প্রফুল্লের এই অভিমানের সুর বিধবার বুঝিতে বাকী রহিল না: তিনি একটু স্নেহের সঙ্গে বলিলেন "না ভাই, আমি বিরক্ত হচ্চিনে একটু ভেবে দেখ, আমার মা! সংসারে আকর্ষণের জিনিষ আমার কিছুই নেই, ওই মা, সেই মায়ের শেষ সময়ে দেখতে যেতে বাধা দিওনা।" বলিয়াই সহসা বিধবার চোখের জল টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল একটু অপ্রস্তুত হইল, বলিল "তা বেশ ত, দেখতে যাবে বইকি, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরতে ভুল করোনা।"

উত্তরে বৌদিদি বলিলেন "সে এখন প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনে ভাই, ভগবানের ইচ্ছায় তুমি সংসারী হয়েছ, সুখে থাক, আমি শুনলে সুখী হব, তবু আর কেন আমাকে বেঁধে রাখতে চাও।"

প্রফুল্ল আর কোন উত্তর দিলনা, শুধু তার উদাস চোখদুটী একবার আকাশের উপর পড়িল। বৌদিদি ধীরে ধীরে নিজের কাজে ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া গিয়াও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ভিতরটা বেশ শান্ত হইতে পারিল না, মনে হইতে লাগিল কাজটা একটু বোধহয় খারাপ হইয়া গিয়াছে, কথা গুলি বোধ হয় ঠিক যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা হয় নাই।

প্রফুল্ল যে তাঁহার ব্যবহারে একটু দুঃখিত হইয়াছে, তাহা অনুভব করিতে তাঁর বিলম্ব হইল না। এমনি ভাবে দিনের বেলাটা যখন চলিয়া গেল, যখন নেহাইত যাবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন প্রফুল্ল আবার তাঁহার কাছে আসিয়া নত মুখে

দাঁড়াইল, বলিল "নেহাইতই চললে তা হলে, কেমন বৌদিদি!"

সকালের ঘটনার পর বৌদিদিও একটু ব্যথিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলিলেন "যাচ্ছি আবার আসবো, তবে অনেক দিন পরে যাচ্ছি কি না, তাইতেই কি জানি যদি দু'দিন দেরী হয়।"

প্রফুল্ল আর কোন উত্তর না করিয়া নত ভাবে তাহার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল, কিন্তু তার ভিতরটা একটা রুদ্ধ অভিমানে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, যে বৌদিদি এতদিন সমানে বিপুল স্নেহে তাহার সংসার খানি বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই বৌদিদি যে কখনো আবার এমন ভাবে তাঁহার স্নেহ-বন্ধন ছিঁড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন, এ বিশ্বাসই তাহার কখন ছিল না। ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে কত অচিন্তিত ঘটনা সহসা ঘটিয়া যায়!

বোঁচকাটী বাক্সটী বাহকের হাতে দিয়া বৌদিদি সস্নেহে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দুঃখিত হয়ো না, এবার আমি একটু দুষ্টুমী করেই গেলাম ভাই, তোমার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না তা আমি বেশ জানি,"

অসমাপ্ত কথার সঙ্গে তিনি গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র বেগে গাড়ীখানি বাহির হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল একটু স্তব্ধ ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, মনের ভিতর অনেকগুলি কথা আসা যাওয়া করিতে লাগিল,—কয়দিন আগে প্রমথও অনেকটা এইভাবে বিদায় লইয়া গিয়াছে, আর আজ বৌদিদি—তিনিও স্নেহের বন্ধন শিথিল করিয়া কেমন স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন

ব্যথিত ভাবে প্রফুল্ল ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, সুরূপা তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিতেছে, ধীরে ধীরে ডাকিল "সুরূপা!"

সুরূপা প্রদীপটী রাখিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল বলিল "কেউত আমার অপেক্ষা করে না সুরূপা! কেউত আমার মতা মতের ধার ধারে না, কেমন উপেক্ষা করে চলে যায়, কেবল পার না তুমি!"

সুরূপা বুঝিল বেদনাটা কোথায়, একটু নীরব থাকিয়া সন্ধ্যার মতই শান্ত ভাবে বলিল "এ যে ফুলের বাঁধন কি না, তাই বেশী শক্ত।"

সন্ধ্যার উদার সমীরণে নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল "তাতে সংশয় নেই, শক্ত দড়ির শক্ত বাধন, ফট করে ছিড়ে যায়, স্থায়ী হতে নরম বাঁধনই হয়।"

সুরূপা একটু হাসিল বলিল, "সেই জন্যই ভগবান ফুলের বাঁধন বেঁধে দাম্পত্যটাকে এত মধুর, এত গভীর, এত স্থায়ী করে তুলেচেন!"

প্রফুল্ল কোন উত্তর দিলনা, কেবল সস্নেহ দৃষ্টিতে সুরূপার মুখের দিকে চাহিল, —গৃহ দীপের উজ্জলরশ্মি বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতই তাহাদের ললাটের উপর শোভা পাইতে লাগিল।

[৩]

তারপর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রফুল্ল প্রায়ই বিদেশে বাস করে, বৌদিদিও আর ফিরিয়া আসেন নাই। কাজেই সুরূপা তার মেয়ে দুটী ও ছেলেটীকে লইয়া মার

পরিচারিকার উপর নির্ভর করিয়া বাড়ী-খানিতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

সেদিন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, সুরূপা তার ছেলেমেয়েকটীকে কাছে করিয়া বিছানায় শুইয়া প্রফুল্লের কথাই ভাবিতেছিল, অনেক দিন যে চিঠি আসে নাই। চৌকির নীচে মাদুর বিছাইয়া পরিচারিকা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। সেই সময়ে বিদ্যুতের আলোকে একবার চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল; এবং পর মুহূর্ত্তেই বাহির হইতে কাহার কণ্ঠস্বর আসিল—"প্রফুল্ল।"

কে এ! সুরূপা বিস্ময়ের সঙ্গে শব্দের দিকে লক্ষ্য করিল, আবার কণ্ঠস্বর আসিল "প্রফুল্ল, ও প্রফুল্ল।"

এবার সুরূপা উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝিকে ডাকিয়া বলিল "ওঠ্‌না ভুলোর মা, কে ডাক্‌ছে যে?"

ভুলোর মা চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বিরক্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া পাশের ঘর অতিক্রম করিয়া বাহিরের ঘরের দরজায় আসিয়া বলিল "কে গা।"

উত্তর হইল "আমি প্রমথ।"

পাশের ঘরের দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সুরূপা ঝিকে দরজা খুলিয়া দিতে সঙ্কেত করিল। ভুলোর মা দরজা খুলিতেই আগন্তুক বলিল "প্রফুল্ল কোথায়!"

"তিনি ত বাড়ী নেই,—"বলিয়া ভুলোর মা একটু বিরক্তিজনক মুখভঙ্গী করিল।

প্রমথ কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মনে হইল "প্রফুল্ল বাড়ী নেই অথচ সে এই প্রফুল্লের ভরসাতেই আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়াছে, দুদিন হোক, দশদিন হোক এইখানেই কাটাইবে স্থির করিয়াছে, অনেকদিন হইতে তাহার অন্তরটা এই বাল্য বন্ধুর স্নেহটুকুর আকাজ্ক্ষা করিতে-ছিল, তাই শরীর বিশেষ সুস্থ না হইলেও সে আসিয়াছে—কিন্তু সে যখন বাড়ীতে নেই তখন কি আর তার এ বাড়ীতে আশ্রয় লওয়া উচিত? কিন্তু এই গ্রামে আর কাহার বাড়ীতেই বা সে আশ্রয় লইবে, এমন কে আছে, যে তাহার আশ্রয় গ্রহণে সন্তুষ্ট হইবে। দেশের সঙ্গে তারত' তেমন সংশ্রব নাই! তার নিজের বলিতে সে যে কিছুই রাখে নাই! তাহাকে এইভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া, ভুলোর মার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বিরক্তভাবে বলিল "কি করবে গা, আর তোমার কি বলবার আছে?"

প্রমথ চকিত-ভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অপ্রস্তুতের মত বলিল "না আর কিছু বলবার নেই, আমি যাচ্চি দরজা বন্ধ কর।"

সেই মুহূর্ত্তে পাশের ঘরের দরজার পাশ হইতে ব্যস্তভাবে সুরূপা বলিয়া উঠিল "না, আপনার ফিরে যাওয়া হতে পাবে না, তিনি এসে শুনলে বিশেষ দুঃখিত হবেন, অন্ততঃপক্ষে তিনি না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে এইখানেই থাকতে হবে।"

প্রমথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যে এ কণ্ঠস্বর প্রফুল্লের স্ত্রীর! কিন্তু এ যেন ঠিক অনুরোধ নয়, একটা গভীর আদেশ। ইহার ভিতর প্রফুল্লের দুঃখিত হওয়া যতটা থাক বা না থাক, একটা গভীর ভদ্রতা আছে—আর আছে, একটা উদার কোমল প্রাণ।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সে নিঃশব্দে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং প্রফুল্লের পরিত্যক্ত বাহিরের ফরাসটী নিঃশঙ্কচিত্তে দখল করিয়া লইল।

এই ব্যাপারে ভুলোর মা বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া স্বরটাকে একটু মোলায়েম করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই প্রশ্ন করিল "খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই।" ইহার মধ্যে অনেকখানি যে তাহার দোষ ক্ষালনের চেষ্টা আছে প্রমথ তাহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিল, সংক্ষেপে বলিল "না, সেজন্য মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না, আমার শরীর বড় ভাল নয়।"

সুরূপা পাশের ঘর হইতে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, প্রফুল্ল না থাকায় প্রমথের অভ্যর্থনায় যে কত খানি ত্রুটী হইল, তাহা অন্তরের ভিতর বেশ অনুভব করিল, তার উপর ভুলোর মার অপ্রীতিকর ব্যবহার তাহারই চোখের সম্মুখে; কিন্তু উপায় নাই, এ অবস্থায় ইঁহার সম্মান রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, সামনের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা।

রাত্রি প্রভাত হইলে পরদিন যখন সুরূপা প্রমথের সন্ধান লইল তখন জানিতে পারিল 'প্রমথ শেষরাত্রি হইতে জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বিছানায় পড়িয়া আছে',—খবরটা দিয়া ভুলোর মা বিরক্তভাবে বলিল "তুমি বাছা যত জান, বাবু বাড়ী নেই, এখন তত্ব তল্লাস করে কে?"

মুহূর্ত্তের জন্য সুরূপার চোখে একটা তীব্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল "আমি করবো, তুমি যাও ডাক্তারবাবুকে খবর দাওগে!"

তার দৃঢ়স্বরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভুলোর মা উত্তর দিল "তুমি করবে, বাবু শুনলে কি বলবে?"

সুরূপা আরো কঠিন ভাবে বলিল "সে ভাবনা তোমার চাইতে আমার আরো অনেক বেশী, সে জন্যে তোমাকে একটুকুও ভাবতে হবে না, এখন ডাক্তার বাড়ী গিয়ে খবরটা দাওগে।"

ভুলোর মা বিরক্ত হইলেও আর উত্তর করিতে সাহসী হইল না, নীরবে ডাক্তার আনিবার জন্য বাড়ীর বাহির হইল। সুরূপা অনেকক্ষণ এ বিষয়ে অনেক রকম করিয়া ভাবিল—তবু কিছুতেই সে এ অবস্থায় প্রমথকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতে পারিল না।

এমনি ভাবে আরো দিন পাঁচেক কাটিল, এই ক'দিন প্রমথ সমানে জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিত, যখন একটু চৈতন্য আসিত, তখনি দেখিতে পাইত সুরূপা তাহার জন্যই ব্যস্ত,—কখন পথ্য লইয়া তাহার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠিত মুখে ভুলোর মার মারফতে তাহাকে অনুরোধ করিতেছে, কখন বেদানার রস লইয়া, কখন ঔষধ ঢালিয়া তাহার জাগরণের আশায় দাঁড়াইয়া আছে। আবার যখন জ্বরটা একটু বেশী আসিত তখন পরম আত্মীয়ার মত তাহার মাথাটা টানিয়া লইয়া জল ধোয়াইয়া বাতাস করিতে নিযুক্ত!

প্রমথ এতদিন যাহাকে কেবল প্রফুল্লের স্ত্রী বলিয়া অন্তরাল হইতে সম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছে, এই রোগ শয্যায় পড়িয়া তাহাকে মাতৃত্বের আদর্শ মূর্ত্তি, সমগ্র নারী জাতির গৌরব বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—সেই জন্য যত বিশ্রী পথ্য হোক না কেন, সে সুরূপাকে তাহা লইয়া অপেক্ষা করিতে দেখিলেই, মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার স্নেহ গম্ভীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভীত শিশুর

মতই বাটিটা টানিয়া লইয়া, এক চুমুকে সবটুকু নিঃশেষ করিয়া দিত।

ছয় দিনের দিন ভোরের বেলায় প্রফুল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রমথের জ্বরটা তখন একটু কম ছিল, প্রফুল্লকে সম্মুখে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল "এতদিনে বুঝি আসবার সময় হ'ল ?"

প্রফুল্ল সন্তর্পণে তাহার মাথাটা একটু নাড়িয়া বলিল "কি করবো, কর্মক্ষেত্র, সহজে বেরোবার উপায় ত নেই। আশা করি তোমার অযত্ন কিছু হয় নি।"

সুরূপা তখন একটা পেয়ালায় খানিকটা বেদানার রস করিতেছিল, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই দিকে চাহিয়া প্রমথ বলিল "না, মোটেই নয় অনেক দিন আগের সেই মায়ের স্নেহ, সেই সেবা আবার আমি ফিরে পেয়েছি ভাই, আমার আর একটুও কষ্ট নেই প্রফুল্ল।"

গাঢ় স্বরে কথা কয়টী শেষ করিয়া প্রমথ একটী নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে তার বন্ধ চোখের পাতা হইতে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রমথ বলিল "ও কি, প্রমথ।

প্রমথ একটু স্থির হইল "সেদিনত তুমি বাড়ী ছিলে না ভাই, কিন্তু সেদিন যদি আমি আশ্রয় না পেতাম তা হলে, আজ বোধহয় পৃথিবী খুঁজলেও আমাকে পেতে না, পথে পড়েই মরতে হতো"

প্রফুল্ল, প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার সুরূপার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, সুরূপার কিন্তু ঠিক তাহা হইল না,—এই যে কদিন সে কেন দেরী করিয়াছে, তাহার জন্য ভুলোর মার কাছে নিত্য নানা কথা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা স্বত্বেও সম্মুখের কঠোর কর্ত্তব্যকে নিঃশব্দে বহন করিতে হইয়াছে, এই সমস্ত মনে প'ড়য়া একটা প্রবল অভিমানের সৃষ্টি হইল,—প্রফুল্ল সুরূপার দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া তাহার অভিমান পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র।

সেই সময়ে প্রমথ তার রোগশীর্ণ হাতের ভিতরে প্রফুল্লের ডান হাতটা টানিয়া লইয়া বলিল "এই রকম মা বোনের সৃষ্টি যদি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হয়, তা হলে আমার মত হতভাগাদের আর কষ্ট থাকে না।"

স্নেহকোমল কণ্ঠে প্রফুল্ল বলিল "সে সব দুদিন পরেই আলোচনা করবো, তুমি ভালই হও আগে।"

সুরূপা বেদানার রস আনিয়া সেই সময়ে বলিল "এইটে খেয়ে নিন।

প্রমথ রসের বাটিটা টানিয়া লইয়া এক চুমুকে শেষ করিয়া বলিল "একটু ঘুমুই, জ্বরের জন্য রাত্রের ঘুমটা ভাল হয় না।"

প্রীতির সঙ্গে তাহার ললাটের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে প্রফুল্ল বলিল "ঘুমোও ভোরের হাওয়ায় রোগের অনেকটা শান্তি আসে।"

এমনি ভাবে আরো কয়দিন অতীত হইলে, প্রমথ ক্রমে ক্রমে বেশ আরোগ্য হইয়া উঠিল, ডাক্তার বাবু ভিজিটের টাকাটা বামহাতে গ্রহণ করিয়া রোগীর অন্নপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিদায় লইলেন।

প্রফুল্ল একটু হাসিয়া বলিল "ডাক্তার বাবুর হাত যশ আছে।" প্রমথ স্থির স্বরে উত্তর দিল "তা নয় আমার পরমায়ু আছে।"

[৪]

কয়দিন পরে প্রমথকে অন্নপথ্য দিয়া সুরূপা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তারপর বিশৃঙ্খল সংসার অযত্নে মলিন পুত্র কন্যাকে আবার সে পূর্ব্বের মত শৃঙ্খলার ভিতরে আনিতে মনো নিবেশ করিল, কিন্তু বিধাতা সকলের অলক্ষ্যে একটু বিদ্রুপ করিলেন। আন্তরিক পরিশ্রমের দরুণ সুরূপার শরীর কয়দিন হইতেই একটু খারাপ হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিনের দিন অপরাহ্নে জ্বরটা বেশ ভাল রকমেই আসিল।

প্রফুল্লের মুখে খবরটা পাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে প্রমথ বলিল "আমার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিজের শরীরটাও খারাপ করে বসলেন"

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল "জ্বর কি মানুষের হয় না?''

এর উত্তরে প্রমথ আর কিছু না বলিলেও, প্রফুল্লের চিন্তিত ভাবটা তাহার অগোচর রহিল না। এই রকম ভাবে এক, দুই করিয়া তিনদিনেও জ্বর যখন সমান থাকিল এক বারও ছাড়িল না, তখন প্রফুল্লকে সত্যই ব্যস্ত হইতে হইল, তার উপরে যখন ডাক্তার বাবুও "জ্বরটা সুবিধার নয়" বলিলেন তখন অবশিষ্ট নিশ্চিন্ত ভাবটুকুও মুহূর্ত্তের মধ্যে গভীর চিন্তায় পরিণত হইল। ব্যাধিও দিনের পর দিন বৃদ্ধির পথেই ছুটিয়া চলিতে লাগিল. প্রফুল্লও রোগের অবস্থা দেখিয়া—ক্রমশঃই উৎসাহ ভঙ্গ হইতে লাগিল, তথাপি প্রাণপণে রোগের সঙ্গে লড়িতে লাগিল। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, সুশ্রূষা সাধ্যমত কিছুরই সে ক্রটী করিলনা, কিন্তু নিয়তি যখন জবাব দিয়া থাকেন তখন ধন্বন্তরির ব্যবস্থাও ব্যর্থ হইয়া যায়—এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল, দিন চারিক পরে, অপরাহ্নে সুরূপা নেহাৎই অজ্ঞাত পথের যাত্রী সাজিয়া বসিল। অবস্থা বুঝিয়া ডাক্তার বিদায় লইয়া গেলেন। এবার আর 'হাতযশ' বজায় রাখিতে পারিলেন না।

আশায় নিরাশায় প্রফুল্ল এতদিন ধৈর্য্য এক রকম বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ তার সমস্ত অন্তর অব্যক্ত বেদনায় অধীর হইয়া উঠিল, সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যের বন্ধন আজ তার বড় শিথিল বোধ হইল, একবার আকুল দৃষ্টিতে মলিন মুখ পুত্র কন্যাদের দিকে চাহিয়া, সে দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল,—কি গভীর অন্ধকার, কি অশান্ত বেদনার হাহাকার। সুরূপা অভাবে এই দুর্ব্বহ জীবন তাহাকে বহন করিতে হইবে।"

আর সে ভাবিতে পারিল না, অস্থির ভাবে ছুটিয়া আসন্ন মৃত্যুর করস্পর্শে বিবর্ণ তুহিন-শীতল সুরূপার দেহটাকে একান্ত ভাবে টানিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সুরূপা তুমিই না একদিন বলেছিলে এ শক্ত বাঁধন এ ছিঁড়বার নয়।" কিন্তু তার এই আকুল বেদনা ভরা ভাষার আর উত্তর আসিল না, সঙ্গে সঙ্গে একটী সশব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে তার শেষ নিশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রমথ এতক্ষণ একবার ঘরের ভিতর ও একবার বাহিরে যাতায়াত করিতেছিল শেষে আবার যখন সে ঘরের ভিতর আসিল, দেখিল কাজ শেষ, সুরূপার যে ব্যাধিকে তাড়াইবার জন্য দুই বন্ধুতে সমানে পরিশ্রম করিয়াছে, অথচ তিল মাত্র দূর করিতে পারে নাই, আজ মৃত্যুর করস্পর্শে তাহা চিরদিনের মত আরোগ্য হইয়াছে, আর ফিরিবার আশঙ্কাও নাই। সে একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রফুল্লের মুখের দিকে

চাহিল—কি গম্ভীর কি হতাশাচ্ছন্ন সে মুখ! তাহার নিজের অন্তরও এই দৃশ্যে অনেক খানি বিচলিত হইয়া উঠিল।

প্রমথ বুঝিল 'বন্ধুর নিকট বন্ধুর কর্ত্তব্য এখন তাহার উপর অনেক খানি দাবী করিতেছে, সে আর অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। লোক সংগ্রহ আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রের যোগাড় শেষ করিয়া আসিয়া যখন প্রফুল্লকে বলিল "আর কেন তৈরী হও।" তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল তখন উদভ্রান্তের মতই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তৈরী হতে হবে, কেমন!"

প্রমথ আর কোন কথা না বলিয়া সমবেদনার সঙ্গে তাহাকে একটু সরাইয়া দিয়া মৃতের দেহ গৃহের বাহির করিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বাহকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "বলহরি হরিবোল।" যথা নিয়মে মৃতকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসা হইলে, সকলের উদ্যোগে চিতা সাজান হইল, তাহার পর চিতা জ্বলিল, নিভিল, ধৌত করা হইল। প্রফুল্ল স্তব্ধ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া সমস্তই লক্ষ্য করিল। বাহকেরা ক্রমে ক্রমে স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল। কেবল প্রমথ তখনো তাহাকে রাখিয়া স্নানের জন্য নামিতে পারেনাই, নিষ্কাম আত্মীয়-হীন ত্যাগীর অন্তরটাও আজ বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সকলে চলিয়া গেলে, সে শ্রদ্ধায় একবার চিতার পাশে প্রণাম করিল, সেই সঙ্গে সহসা একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ইহাতে নিজেই সে অনেক খানিক বিস্মিত হইল, —'একি! কৃতজ্ঞতা? শ্রদ্ধা? না স্বর্গগতার উপর অপরিসীম প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন? কিছুরই সে মীমাংসা পাইল না, কেবল বুঝিল তার মমতাহীন অন্তরেও আজ আঘাতটা কিছু জোরেই লাগিয়াছে, দেখিল, তার নিজের কিছু সংসার বলিয়া না থাকিলেও বন্ধুর প্রীতিতে, বন্ধু-পত্নীর সুশ্রূষায়, তাহার সংসারের সহিত অনেক খানি জড়াইয়া গিয়াছে।

প্রমথ চকিত ভাবে উঠিয়া পড়িল, শেষে নিজেকে একটু সংযত করিয়া প্রফুল্লকে বলিল "চল বাড়ী যাই।"

প্রফুল্ল এতক্ষণ নীরবেই ছিল এইবার সে করুণ ভাবে বলিয়া উঠিল "বাড়ী না গেলে কি চলবে না?"

"তাই কি চলে,—তোমার যে ছেলে মেয়ে আছে, কর্ত্তব্য আছে, নিজের শোকের ভারে কাতর হয়ে সব ভুলে গেলে চলবে না ত, তাদের কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ কি?" বলিয়া প্রমথ সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

উদাস দৃষ্টিতে প্রমথের মুখের দিকে চাহিয়াপ্রফুল্ল বলিল "কি করবো আমি তাদের কিছুই ত পারবো না।"

"কিছু তোমাকে করতে হবে না, বৌদিদি এসেছেন, সে ব্যবস্থা আমি সব করেছি, তবু তোমাকে সংসারে থাকতে হবে তাদের প্রতিপালনের জন্য।"

"বৌদিদি এসেছেন, কে আনলে তাঁকে?" কথা কয়টী বলিয়া প্রফুল্ল স্থির দৃষ্টিতে প্রমথের দিকে চাহিল।

"আমি আনিয়েছি, আমরা যখন আসি, সেই সময় তিনি এসেছেন, তোমার বেদনা ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে, তিনি আর তখন তোমার কাছে যান নি, তোমার ছেলে মেয়েদের শান্ত করতেই তাঁকে তখন নিযুক্ত করে এসেছি।"

প্রফুল্ল কোন কথা কহিল না, কেবল

উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া উঠিল, উন্মাদ শ্মশান বায়ু অট্ট হাসিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বহিয়া গেল। অমাবস্যার গভীর অন্ধকার আরো গভীরভাবে প্রফুল্লের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

তিমিরাবৃতা কলনাদিনী জাহ্নবী সুরূপার চিতাভস্ম বুকে ধরিয়া অচিন ভাষায় বলিতে লাগিল শেষ! শেষ! শেষ!

তারপর বহুকাল অতীত হইয়াছে। তটিনী-তরঙ্গের মতই দিনগুলি আলোক আঁধার মাখিয়া একে একে কাল স্রোতে মিশাইয়াছে। কাহারো হাসি কান্নার অপেক্ষা করিয়া চন্দ্র সূর্য্য একদিনও উঠিতে বিলম্ব করেন নাই। একদিনের জন্যও ধরণী তাঁর নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম সাধনে বিরত হন নাই।

হিমালয়ের সমস্ত অঙ্গ প্লাবিত করিয়া চন্দ্রদেব তখন কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন। নিম্নে স্বচ্ছতোয় নির্ঝরিণী কুলুনাদে বহিয়া সেই নিস্তব্ধ কানন ভূমি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। নীল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ শিখর সমূহ স্তরে স্তরে রহিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া গুরু-গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিল।

এই বর্ণনাতীত গম্ভীর সৌন্দর্য্য শ্রীমণ্ডিত হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়া এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বলিতেছিল—

"মানুষের আত্মা পৃথিবীর মধ্যে তার প্রার্থিত শান্তির সন্ধানে বহুবৎসর অতীত করে,—তারপর ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত অন্তরে বার্দ্ধক্যে পতিত হয়, শেষে কাল মৃত্যু! এই ভাবে জন্মের পর জন্ম সে উন্মাদের মতই ছুটিয়া [illegible] যায়,—কিন্তু [illegible] যখন তার চৈতন্য প্রস্ফুটিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে সে জগতের এই অনশ্বর শান্তির পরিণাম উপলব্ধি করে।"

আর একটু নিম্নে দাঁড়াইয়া প্রৌঢ় আগন্তুক বলিল "কিন্তু এই যে বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদের মতই এই বিরাট অতৃপ্তি মানুষ বহন করে তার সে অতৃপ্তির পরিতৃপ্তি কোথায়?"

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী উত্তর দিল "সে বিরাট তৃষ্ণার শান্তি অমৃতে, জগতের শিশির বিন্দুতে নয়, যা ক্ষণেকেই শুষ্ক হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষ প্রথমে ভুল করে, শিশিরেই তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু যখন তার শুষ্কতা দেখে তখন কাতর হয়ে পড়ে, তখন তার অন্তরাত্মা আকুলভাবে অমৃতের সন্ধানে ব্যস্ত হয়।"

প্রৌঢ় আগন্তুক নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল "মানুষ কি চায় এই একটা প্রথম প্রস্তাব, কিন্তু প্রথমেই অনুভব করতে মানুষ নিজে ভুল করে, সংসারের সমস্ত বস্তুতে একে একে ক্রমশঃ সে তার চিরবাঞ্ছিত ধনের সন্ধান করিয়া থাকে। শেষে পৃথিবীর কাম্য বস্তুতে তার বীতস্পৃহা আসে, তখন সে প্রথম ধারণা করে, সে আরো কি চায়, যা এই পরিদৃশ্যমান জগতে একান্ত দুর্লভ।"

হিমালয়ের পবিত্র সমীরে আপনার ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ় আগন্তুক বলিল "এবার তবে বন্ধুর কাজ কর, এখন কর্ত্তব্যের শেষ করেছি, সংসারপথশ্রান্তকে আর ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করো না।"

সন্ন্যাসী উত্তর দিল "আরত তার প্রয়োজন নেই—এসো, অনন্তের আনন্দ-রস—সমুদ্রের মধ্যে নিজের সমস্ত নিরানন্দ বিসর্জ্জন দেবে এসো বন্ধু!"

তারপর সন্ন্যাসী আগন্তুকের হাত ধরিয়া অনন্ত মহিমান্বিত হিমাচলের শিখরান্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। জ্ঞান আসিয়া কর্ম্মকে আলিঙ্গন করিল। দূরে—তখন কোন ভক্ত সাধক কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল—

"ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়া
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাপর।

কবির (P) পণ

[শ্রীশরদিন্দুনাথ রায়]

হব, পদ্য লিখে সদ্য কবি চৌদ্দ মিলিয়ে,
এবং, অখাদ্য অপাচ্য যত দেবই গিলিয়ে,
আর, জগৎ বল্‌বে চাই না দাদা
দপ্তর তোর থাকুক সাদা
কাজ কি বল থাক্‌তে সুখে দানোয় কিলিয়ে
বাব্‌লা কাঠের কাব্য তোমার কাজ কি গিলিয়ে ?

ভাব্‌ছ বুঝি শুন্‌ব সে সব, মানব সোজাতে ?
'উড্ডীয়মান' কবিরে কেও পারবে বোঝাতে ?
কাব্য ভরা প্রাণটা তরল
নেই তা'তে কি ? শক্ত সরল
বাব্‌লা গাছের গুঁড়ির ভেতর রস কি চলে না ?
তোমরা হয়ত বল্‌বে আবার
"তাও তা'র ফুল গরুর খাবার
মানুষ কেন ? পাখীরও তা গলায় গলে না।"

যতই বল "নোতূন" রকম গড়্‌ব কবিতা
গভীর হবে সাগর চেয়ে
হাঙ্গর কুমীর থাক্‌বে ছেয়ে,
ভাষার তেজে রক্ত লাজে ডুব্‌বে সবিতা।

দেখছ যত Departmental Technicalities.,
তন্ত্র, পুরাণ, ষড়দর্শন
প্রাণীতত্ত্ব, হলকষণ,
সব ব্যবসার 'বুকনি' গুলো কর্‌বে যে গিজ্‌ গিজ্‌ !
'সুমার' খুলে নেব তুলে "ইজাফা" "জমা"
Geometry'র 'ট্রাপিজিয়ম' গ্রামারের 'কমা',
নেব তন্ত্রের 'ষটচক্র ভেদ'
চক্রদত্তের 'গোমূত্র, স্বেদ'
নেব Lawএর 'Voidable' 'Temporary lease'
এসব দিয়ে গড়্‌লে কাব্য হ'বে "নোতুন" "চীজ" !

শ্রোতৃবর্গ সমস্বরে—"দোহাই কর রক্ষে
তোমার যে সব পদ্য ঘুটিং
বন্দ ক'র ওদের Shooting
তোমার কাছে 'কাব্যি' বটে মৃত্যু মোদের পক্ষে।
শুনতে বিষম কাণে বাজে, পড়তে বেঁধে চক্ষে !
দোহাই দাদা, দোহাই তোমার, দোহাই কর রক্ষে।

জার্ম্মেণীতে বাঙ্গালী বন্দী

(শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল)

মানুষের ভয়ের অনেক খানিই থাকে একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তাকে আশ্রয় করিয়া। কোনিগস্‌বর্গের সহর ছাড়িয়া আমি যে দিন সন্ধ্যাকালে পল্লীর দিকে চলিলাম সে দিনও এই 'কোথায় যাই' অনিশ্চয়তাটাই আমাকে একটু অস্থির করিয়া তুলিল। মুক্তির যতটা আনন্দ আর শান্তি তা আমি একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। যা হোক, আজ কিন্তু মনে মনে বেশ একটু আরাম বোধ করিতেছি "লিপসির" সঙ্গে থাকিয়া।

লিপসির কথা পরে বলিতেছি।

জানালার মধ্য দিয়া তাকাইয়া সকাল বেলা বসিয়া যখন ভাবিতে ছিলাম আমার এই সুন্দর শস্যশ্যামল বাংলার কথা, আমার ছোট ঘর খানির কথা, আর সেই আমার শৈশবের ও গৌরবের সঙ্গীদের কথা তখনই পর পর করিয়া মনে পড়িয়া গেল বিলাতযাত্রা আর যুদ্ধে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইবার কথা।

নিমিষেই মনে পড়িল শক্রর হাতের কতবড় বিপদ হইতে আজ আমি মুক্ত। আর মনে পড়িল যাহাদের মধ্যে আজ আমি প্রায় তিন মাসের বেশী কেমন পারিবারিক স্বচ্ছন্দে আছি। এমন সময়ে হাসিতে হাসিতে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় সুকুমার একটি বালক আসিয়া খবর দিয়া গেল ভন্ লণ্ডপ ডিনারের ঘরে আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লিয়নের এত উল্লাস দেখিয়া আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না কিসের জন্য আজ ওটী ভাই বোনের এত হর্ষ। গৃহস্বামী লণ্ডপই বা আজ ভৃত্যকে না পাঠাইয়া কন্যাকে পাঠাইলেন কেন? লিপসি ও ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল 'মাষ্টার, বাবা চায়ের ঘরে বসে আছেন। যাও সেখানে।' বলিয়া বুঝাইতে হইবে না বোধহয় যে বাক্যালাপ তাহাদের ভাষাতেই হইয়াছিল। 'যাচ্ছি' বলিয়া তাহাদের বিদায় দিলাম।

যে দিন একটা কিছু আশ্রয় না পাইলেই নয় এই মনে করিয়া পল্লী পথ ধরিয়া সন্ধ্যার সময় পশ্চিম মুখো হইয়া হাঁটিতে লাগিলাম ও শত্রুর দেশে সূর্য্যাস্তে কোথায় গিয়া পড়ি এই একটা বিমর্ষতা পায়ের গতি একটু একটু করিয়া শিথিল করিয়া দিতেছিল সেদিন হঠাৎ একখানি কচিমুখ আমার চোখে পড়িল। বুক ভরা সাহস আর প্রাণভরা সরলতা লইয়া একটি বালক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল আমার লেকসিযেগে কি দরকার। আমিত অবাক! অতটুকু ক্ষুদ্র বালক সদর্পে এক যুবকের মত বলিয়া ফেলিল কি দরকার? বালকের বুকেও একটা সাহসিকতা দেখিয়া নিজেকে আর বিপন্ন মনে করিলাম না জানিলাম, লিপসি, না এমনি একটা কি বলিয়া উহাকে ডাকা হয়। সেই অবধিই স্নেহের পুত্তলী হইয়া লিপসি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া ছিল। আমি বালকের নিমন্ত্রণ লইয়া তাহাদের গৃহেই আশ্রয় লইলাম। গৃহস্বামী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যুদ্ধে হারাইয়া তাহার সমস্তটুকু প্রাণ ঢালিয়া দিল এই অপ্রত্যাশিত নবীন ও নব অতিথিটিকে। তাঁহার পত্নীর শূন্য হৃদয় খানিও আমি অধিকার করিয়া লইলাম। লিপসি আর লিয়ন এখন আমার ও ছোট ভাই আর ছোট বোন। সত্যই যারা বুক বাঁধিয়া ছেলেকে সাজাইয়া মরণের মুখে পাঠাইতে পারে তাহারা বুক ভরিয়া পরকেও সহজেই আপন করিয়া লইতে পারে। এমনি ব্যাপার যে আমি না বসিলে ভন্ লণ্ডপ সকালের চা টুকুও পান করিতে পারেন না। আমি এক সঙ্গ না থাকিলে তাঁহার পত্নীও চায়ের আরামটুকু উপভোগ করিতে পারেন না। আমি যে এখন তাহাদেরই হৃদয়ের ধন, তাহাদেরই পরিণত বয়সের স্নেহের মূর্ত্তি।

আজ প্রাতে উভয়ে আমার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন এখন আমি যাই। তবে লিপসি ও লিয়নের এত আহ্লাদের কারণ ছিল আর এক রকমের।

আজগুবি গল্প করিয়া করিয়া যখন আমার ভাণ্ডার শেষ হইয়া গেল তখনও এই উৎসুক মানবকলি দুটির আগ্রহ কমে নাই, একটুও না। কেবল গল্প আর গল্প। আমার তখন কাজ হইল যে সব গল্প অনেক আগে করিয়াছি তাহাদেরই একটার মাথা আর একটার লেজ জুড়িয়া জুড়িয়া নানা রকমের উদ্ভট ও বিকট কাহিনী তৈয়ার করা। এদেরও 'তার পর' 'তার পর' এই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু

মুখের ভাব সত্য সত্যই আমার মনটি পুলকে ভরিয়া দিত। গল্পটি লম্বা করিবার নিরতিশয় ব্যাকুলতা আর তজ্জনিত কচি মুখের অনুপম সারল্য আমাকে একেবারে জগৎ ভুলাইয়া দিত। লিপসি লিয়নের কিছু বড়। ইহাদের ফুল লইয়া কাড়াকাড়ি, পরস্পরের কোন্দল, কত যে ভাল লাগিত! আজ বাংলায় বসিয়াও সেই দুটী নির্ঝরের উচ্ছল খল খল কল কল স্নেহধারা আমার প্রাণে আসিয়া মিলিয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে গিয়া ডিনারের ঘরে উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামীদিগকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়া মনে মনে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। এত বড় সঙ্কোচটা কিন্তু ভাঙ্গিয়া দিল তাহাদের সাদর ও স্নেহের সম্ভাষণটী। লিপসি তার বাপের সঙ্গে আজ ব্যাঙ্কে যাইতে চাহে এই বলিয়া লণ্ডপ পত্নী হাসিয়া আমার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিলেন। বাপ বলিলেন এখন আমার মত হইলেই সব হয়। এতক্ষণে বুঝিলাম কেন লিপসি আর লিয়নের আজ এত উল্লাস। লিয়ন চুপটি করিয়া তাহাদের কথা হইতেছে শুনিয়া আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। আমি একবার লিপসি আর একবার লিয়নের মুখের দিকে তাকাইলাম। দুই জনেই মাথা নোয়াইল। বলিলাম সন্ধ্যার আগেই ত ফিরিবে, আর যখন ভন্ লণ্ডপ নিজেই যাইবেন সঙ্গে তখন আর মতামতের কি দরকার। বলার বা কি দরকার। তা হইলে কি হয়। এই ছোট পরিবারটীর একটি ক্ষুদ্র কাজও যে আমার মতের অনেক অপেক্ষা রাখে। এক কথায় আমাকেও আলোড়ন না করিয়া তাহাদের স্নেহের সাগরের একটী বুদবুদও উঠিতে পারিত না। আমার পসন্দ না হইলে যে একটি জামাও শিশুদের পসন্দসই হইত না। আবার বলিলাম—"লিপসি, আমার উপর যে পিন্ দিয়া আঁটা আমার 'ক্রস'টা ছিল সেটা কি আছে না এত দিনে হারাইয়াছ?" একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বালক অভিমানে বলিল, "হাঁ হারাইয়াছি; এখনো ছোটটী কিনা, যে সব হারাবে!" ছোট মুখের সুধাবর্ষী কথা আর অভিমান ব্যঞ্জক মুখ খানির দীপ্তি দেখিয়া ভাবিলাম তুমি আমার মত সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেল না? লিয়ন ও বায়না ধরিল দাদা গেলে সে কি করিয়া একা একা ঘরে থাকে, সেও যাইবে। আমার হাত ঝাঁকিতে লাগিল আর মুখ গম্ভীর করিয়া মায়ের কাছে গিয়া গম্ভীর হইয়া জানাইয়া দিল সে কিন্তু থাকিতে পারিবে না। মা এক চুমুক চা পান করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" এতক্ষণে লণ্ডপ সমুদয় চাটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বুদ্ধি আছে বটে, মেয়ে হইলে কি হয়?" তিন জনেই হাসিয়া ফেলিলাম।

পর পর দুই খানি নবনীর মত কোমল হাত, আমার কর মর্দ্দন করিয়া শিশু দুইটী হাসিতে হাসিতে ব্যাঙ্কে চলিয়াছে। দুই জনের ছোট দুইটী ঘোড়া। পিতা আগে আগে, শিশুরা পিছনে। টুপি খুলিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কত বার যে তাহারা তাহাদের শ্রদ্ধা জানাইল! আর চলিতে চলিতে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। আমিও একটু একটু মাথা নত করিয়া তাহাদের অভিবাদনের প্রতিদান করিলাম। করিলাম বটে কিন্তু অমন অপরিমেয় স্নেহ অমন অনাবিল সরলতা আমি কোথায় পাইব?

প্রায় এক বৎসর হইয়া গেল আমি জার্ম্মেনীতে বন্দী রহিয়াছি; মাথার ঠিক এক

হাত উপর দিয়া যে গোলাটী উড়িয়া গেল, মূর্ত্তিমান রক্তবর্ণ মৃত্যু আর একটু নীচ দিয়া গেলে আজ আমি কোথায় থাকিতাম ? প্রথম যুদ্ধে হুন দিগকে হটাইয়া লইয়া গিয়া আবার কেনই বা ফিরিয়া আসিলাম তাহাদের মুখো মুখী হইয়া ; আমার যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া যে ক্রস্ টী উপহার পাইয়াছিলাম এই সব ভীতি-কর কথা মনে উঠিয়া তাহা যেন ম্লান হইয়া উঠিতে লাগিল। বলিতে লজ্জা কি, এক দিন মনে মনে ধিকার আসিল কেন আমার কপাল ভাঙ্গিতে বিদেশে আসিলাম। এই সমস্ত চিন্তা গুলির সঙ্গে সঙ্গে আবার কবে বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কোলে যাইব এই অদম্য স্পৃহাও মনে জলন্ত হইয়া উঠিল। "মাষ্টাব" বলিযা ডাকিয়া গৃহস্বামীর পত্নী আমাব চিন্তা-কর্ষণ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত রকম ডাক শুনিয়া আমি একটু না হাসিয়া পারিলাম না। তিনি হাতে একটী মোজা বুনিতেছিলেন আর মুখে কথা বলিতেছিলেন।

আমি এখানে 'মাষ্টার' বলিয়া অভিহিত হই, হইনা, সে কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আশ্চর্য্য এই যে ইনি এই ইংরাজী কথাটী বলিতে মুখ খানি এমন বিকৃত করিয়া বলেন আর কথাটার প্রথম অংশটায় এমন জোর দেন যে কিছু দিন না গেলে একটী বালকও উহা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিবে। মাষ্টাবকে তিনি কতকটা 'ম্যা-ষ্ট্র্' করিয়া বলেন। আমি তাহার ডাকে একটু মৃদু হাসিলাম কিন্তু জানিতে দিলাম না যে ঐ ডাকটাই আমার এমন মুখের বিকৃতি জন্মাইয়াছে। তাহার কথার সহিত মিলিয়া আরও একটু হাসিলাম। এবার সব অন্তরঙ্গতা ঘুচিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মাষ্টার, তুমি যে কবে আবার আমাদের ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাও ঠিক নাই ; বনের পাখী খাঁচায় পোষ মানে কি না কে বলিবে।" কি আশ্চর্য্য ! যে কথা কয়েকটী আগেই আমার মনে হইতেছিল কেমন করিয়া ইনিও সেই সূত্রটী ধরিয়া টান দিলেন ! মুখে বলিলাম না, তাকি হয়, তাকি হয়। যতদিন না লিপসি লিয়ন বড় হয় আমি কোথায় যাইব ? এখানে যে আমার বাড়ীর সকল সুখই আছে, অভাব কিসের ? ইনি মৃত পুত্রের কথা মনে করিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অশ্রুরেখা আমারও হৃদয় স্পর্শ করিল। "বাছা, তোমাকে দিয়াই বা বিশ্বাস কি ? তোমার মত এমন একটীকেই ত এই সেই দিন হারাইলাম," বলিয়া আবার চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

সারাদিন এদিক ওদিক করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার পর নিজের ছোট ঘর খানিতে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। শিশুরাও সন্ধ্যার আগে আসিল না। ভাবনাই বা কি লগুপ যখন সঙ্গে আছেন ? ১০টা হইবে এমন সময় লিপসি আসিয়া হাজির। মুখ খানি মলিন করিয়া আমার ঘরে ঢুকিয়াছে। খপ্ করিয়া হাত খানি ধরিয়া ফেলিতেই সে আর কথাটী না বলিয়া বুকের উপরের ক্রস্ টা আমার টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। বুঝিলাম মেজাজটী কিছু কড়া। কিন্তু কেন যে তা বুঝিলাম না। লিয়ন কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেও আর উত্তর করিল না।- আমি হাত ছাড়িয়া দিলাম আর বলিলাম যাও এখন খাইয়া শোও গিয়া। এমন কুসুমকলিত কখনও ম্লান দেখি নাই। বুঝি লগুপ কিছু বলিয়া থাকিবেন। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

রাত্রি ভোর না হইতেই খটা-খট্ করিয়া

কয়েকবার কড়া নাড়ার মৃদু শব্দ কানে গেল। উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দুয়ার খুলিয়া দিলাম। নিদ্রা যাইবার পরিচ্ছদটী তখনও গাত্রেই ছিল। লিয়ন আসিয়া ঝাঁপাইয়া আমার গায়ের উপর পড়িল। চক্ষু দুটি ফুলিয়াছে, চুল গুলা মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; পায়ে কাদা মাখা। দেখিতে দেখিতে লণ্ডপ পত্নীও আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমার গলায় দুইহাত জড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মাষ্টার, আমার লিপ্‌সি, আমার লিপ্‌সি! ওগো লিপ্‌সি আমার নাই।" কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। থতমত খাইয়া গেলাম। গৃহস্বামীও মুখে বিশ্বের অন্ধকার মাখিয়া আসিয়া উপস্থিত। একটানে বলিয়া ফেলিলেন আসিবার সময় ঘোড়া শুদ্ধ হুড়কিয়া বাচ্ছা পাহাড়ের উপর পড়িয়া গিয়াছে। সারা রাত কাটিয়াছে তাহার খোঁজ করিতে। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলাম ক্রসটি টেবিলের উপর তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে।

কুজ্ঝাসা

[শ্রীহেম চন্দ্র বাগচী]

ব্যপ্ত করি' সর্ব্বচরাচর,
অবিচ্ছিন্ন তমসায় আবরিয়া আকাশ ভুধর,
আবরিয়া মানবের প্রতি দিবসের তুচ্ছ কাজ
তুচ্ছ কথা তুচ্ছতম লাজ
তুচ্ছ ঘাত-প্রতিঘাত, তুচ্ছ আবেষ্টন,
কুয়াসা করেছে আজি ধীর-সঞ্চরণ।

তোমার ও সুবিপুল বিস্তারের তলে,
ক্ষণিক আবরি' রাখ' ধরণীর মুগ্ধ শিশুদলে।
আবরিয়া সর্ব্বতুচ্ছ লোক লজ্জাভয়
প্রদানি' অভয়,—
মন্ত্র পড়ি' দিয়া যাও সুবিপুল বিশ্রামের বাণী
মস্তকে রাখিয়া তার শান্তিময় স্নেহহস্তখানি!
তারপরে ধীরে—অতি ধীরে
ছিন্ন, রবি-রশ্মিজালে চলে' যেও অদৃশ্য তিমিরে!

তোমারে ত দেখি নাই হে অজানা নিস্পন্দ অতিথি!
আস' নাই স্বর্গহ'তে বিথারিয়া বনপুষ্প বীথি,

তোমারে ত চিনিনাক' ক্ষণস্থায়ী, অচল ধূসর
আবরিয়া সর্ব্বচরাচর
কি কাজে আসিয়াছিলে ধরণীর কর্ম্মকোলাহলে ?
যেথায় সকলে—
গাহিতেছে অবিরাম চলিবার গান !
তুমি কিগো গেয়ে গেলে তাহাদেরি দু'একটী তান ?

ওগো স্তব্ধ, ওগো বাকহীন,
প্রবল প্রভাবে তব খররবি আজি অতি দীন
আজি তার মূর্চ্ছাতুর আলো—
এ উষায় লাগে বড় ভালো—
লাগে ভাল আজি তব অতিমন্দ পক্ষ প্রসারণ
—ধূসর, ভীষণ !
নাহি মেঘ, নাহি আলো নাহি রবি আজ
সর্ব্বব্যাপী করিছ বিরাজ।
ছায়ামন্ত্রে ধরণীরে শান্ত করি রাখি'
সুবিপুল পক্ষ-পুটে সযতনে রাখিয়াছ ঢাকি।

রশ্মি-তরবারে,
ছিন্ন ভিন্ন করি তোমা, তাহার ধরারে
রবি লয়ে স্বীয় করপাশে
তুমি তবু রবে তার আশে ?
চলি' যাও পরিম্লান গোধূলির তীরে
সঞ্চরি তিমিরে।
ধীরে ধীরে চলি যাও নিস্পন্দ ধূসর
চির অসুন্দর !

———

কলঙ্ক

[শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য]

সুদীর্ঘ সপ্তদশবর্ষ ব্যাপী নিয়মিত দুর্ব্যবহার-এর পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন গৃহিণীকে হঠাৎ ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন তখন ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশিনীগণ এক বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল গৃহিণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে 'ঔষধ' করিয়াছে। এই কথায় ভট্টাচার্য্য গৃহিণী তৈলযোগে বার্ত্তাকুর মত জ্বলিয়া উঠিতেন এবং দগ্ধাননী "ভর্তৃপুত্রপাদি কাদের" লেশমাত্র নৈতিক সাহস থাকিলেত তাহারা তাঁহার সম্মুখে ইহা উচ্চারণ করিবে? এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বারবার পল্লীপানিকে মস্তকে উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইলেও বিপক্ষ হইতে যখন কোন প্রত্যুত্তর আসিত না তখন এই স্বভাব শান্তশীলা রমণীর ক্রোধের সমস্ত ঝাঁঝ টুকু পড়িত বেচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর। কারণ তাঁহারই জন্য নাকি তাঁহার এতরূপ অপমান।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে কোন্ নীতি শাস্ত্র হইতে হঠাৎ সহ্য গুণের এমন মাহাত্ম্য টুকু মন্থন করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছেন অনেক অনুতপ্ত অসংযমী স্বামী বহুগবেষণার দ্বারাও তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। তবে অতিবড় শত্রুতেও নাকি বলাবলি করিত যে অপুত্রক হইলেও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি "সার্ব্বভৌম" উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা বলিতেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের কনিষ্ঠ হইলেও প্রত্যেকের ইষ্টদেবতার প্রাপ্য বিশেষ ইন্দ্রিয়টীকে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুই তিন বৎসর সংসারধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং বিনাকারণেই যে তিনি এরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন একথা স্বয়ং জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব আকণ্ঠ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

আমরাও গোপনে যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে একেবারে ভুল তাহা বলিতে পারি না। সম্প্রতি কিছুদিন হইল পিতার সাংঘাতিক পীড়া উপলক্ষে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী পিতৃভবনে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগ্যক্রমে প্রলাপের মুখে পিতা গৃহের কোণে এক বিশেষ অংশে কোন এক বিশেষ বস্তুর অবস্থিতির কথা নির্দ্দেশ করিয়া, সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই জীবলিলা সম্বরণ করেন। বুদ্ধিমতি কন্যা রাত্রি যোগে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অতি সন্তর্পনে উপবিউক্ত বিশেষ বস্তুপূর্ণ পাত্রটী উত্তোলন করতঃ সংসারের বড় বিদ্যাটী জাহির করিয়া একেবারে ভর্তৃভবনে উপনীত হইলেন। প্রভাতে প্রতিবেশিনীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন পিতার মৃত্যুর পর কোন কন্যার পক্ষেই বিমাতা ও বিমাতা পুত্রের নিকট থাকা সম্ভবপর নয়।

শুনা যায় সেই দিন হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণীকে তেমন করিয়া আর উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না। কথায় কথায় কোন বন্ধুকে বারণ নাকি

একদিন বলিয়াও ছিলেন "ব্রাহ্মণী আর যাই হো'ন বিশেষ বুদ্ধিমতী" বন্ধুটী তাঁহার এই অকস্মাৎ আবিষ্কারে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ ভিতরকার কোন কথাই বাহির করেন নাই। কিছুদিন হইতে মৎস্য ক্রয়ের আধিক্য হেতু ব্রাহ্মণীর সহিত ব্রাহ্মণের আর বচসা হয় না। ব্রাহ্মণী এখন নারিকেল তৈল সহযোগে প্রত্যহ প্রসাধন করিলেও ব্রাহ্মণ কোন কথাই বলেন না, এক কথায় একপক্ষ অবলম্বন করিতে না পাওয়ায় পল্লীর শুভাকাঙ্খিনীদের বদনে ইতি মধ্যেই বিশেষ কণ্ডুয়ন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা হিতার্থে দিবাভাগে সাত-বার আনা গোনা করিতেন এখন আর তাঁহারা আসিবার পন্থা খুঁজিয়া পান না। এবং সাধারণতঃ বৃদ্ধবয়সে প্রীতির প্রগাঢ়ত্ব জমিয়া থাকে বলিয়াই যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আজকাল একান্ত শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন সে কথা বহুগবেষণার পর তাঁহারা এক প্রকাশ্য নারী সমাজে হঠাৎ আবিষ্কারও করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক ব্রাহ্মণ বিস্তর শাস্ত্র পাতি উদ্ঘাটন করতঃ একদিন সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণীর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে অপুত্রক অবস্থায় ইহলীলা সংবরণ করিলে পুন্নামক কোন বিশেষ নরক হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণ নাই! এবং ব্রাহ্মণীর আর যখন পুত্রবতী হইবার মত বয়ঃক্রম নাই (ব্রাহ্মণী কিন্তু তাহা স্বীকার করিতেন না) তখন দত্তকগ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ব্রাহ্মণী হস্তমুষ্টির মধ্যে যেন স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ঘুমন্ত মাতৃ হৃদয় বংশীস্বর উল্লসিত সর্পের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। আশা রাক্ষসী তাঁহার অরক্ষিত হৃদয়ের বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র উঁকি মারিয়া নিঃশব্দে কত কথাই না বলিয়া গেল। তিনি আনন্দের আতিশয্য ও হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া করুণ হৃদয় স্বামীকে গড় হইয়া একটী প্রণাম করিলেন।

স্থির হইল ৺নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নীর যে একটী পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র আছে তাহাকেই দত্তক লওয়া হইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত কালে প্রথম মর্টগেজ গোপন করিয়া তিন বিঘা জমি বন্ধক দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আড়াইশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। প্রথম দেনার দায়ে দরিদ্রের ভূসম্পত্তি যা কিছু ছিল সমস্তই ডিক্রী হইয়া যায়, ইতিমধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রকে কোলে লইয়া এই বান্ধবহীন সংসার সমুদ্রে একরূপ অনাহারে অনিদ্রায় কাল কাটাইতে ছিলেন। আজ প্রায় ছয়মাস দুঃখিনী পুত্রের মুখে দুই বেলা অন্ন তুলিয়া দিতে পারেন নাই, নিজে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া মাত্র ফেনটুকু খাইয়া একরূপে দিনাতপাত করিতেছিলেন। পাড়ার মোক্ষদা পিসী কোন দিন কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া একটু সান্ত্বনা দিতে আসিলে তাঁহার রোদনের উৎস যেন সহস্র মুখে উৎসারিত হইয়া উঠিত। ক্ষীণ দেহ যষ্টি মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া যাইত। দুগ্ধপোষ্য বালক হতভম্ব হইয়া কেবলই চিৎকার করিয়া কাঁদিত। এইরূপে অতি কষ্টে মাতা কোন রূপে পুত্র রত্নটীকে বুকের কাছে টানিয়া দিন যাপন করিতে ছিলেন। কিন্তু ইহার উপরও তাঁহার দুঃখের কারণ আরও ভয়ানক ছিল।

প্রতি প্রত্যূষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া তাঁহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে যখন নিয়মিত ভাবে অজস্র অকথ্য কুকথ্য নানা রূপ গালি বর্ষণ করিতেন তখন সহায় সম্বল হীনা বিধবার বুকে যে কি শেল বাজিত তাহা স্বয়ং অন্তর্যামীই জানেন! এ সময়ে অভাগিনী আর কাঁদিতে পর্য্যন্ত পারিতেন না; সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে উত্তমর্ণের এই গালি গালাজ গলাধঃকরণ করিতেন· কিছু ক্ষণ পরে দুঃখের মাত্রা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাঁহার নয়নে রোদনের উৎস খুলিয়া যাইত।

এইরূপ অবস্থায় মোক্ষদা পিসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধা হইয়াই হোক বা শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হোক, একদিন বিধবার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে অনাথকে (বিধবার পুত্রের নাম অনাথ) ভট্টাচার্য্য মহাশয় দত্তক লইতে রাজী আছেন।

অকস্মাৎ বিধবার বুকে কথাটা পট্ করিয়া বিঁধিল। তিনি অঞ্চলের নিধিকে বুকের নিকটে একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শুভাকাঙ্খিনী পিসী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি বলিলেন, ইহাতে তাঁহার স্বামীকৃত ঋণও পরিশোধ হইবে উপরন্তু ছেলেটাও দুবেলা খাইতে পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে। ঐ স্বামীকৃত ঋণ কথাটা বিধবাকে আর এক বার ব্যথা দিল, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পিসী যখন আবার বলিলেন, "যিনি যাহাই বলুন না কেন ঋণ থাকিতে কিন্তু প্রেতাত্মার সদগতি হয় না" তখন বিধবার বাহুলতা শিথিল হইয়া আসিল পুত্রকে যে বাহু দিয়া অতি যত্নে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এলাইয়া পড়িল। দুই দিন পূর্ণ অনাহারের পর তিনি সংজ্ঞা পাইলেন। অতঃপর তিন দিন তিন রাত্রি অহরহ দুঃসহ চিন্তার পর অভাগিনী স্বামীর উদ্দেশে একটী প্রণাম করিয়া পিসীর শুভেচ্ছায় সম্মত হইলেন। এই সৎকর্ম্মের জন্য পিসী তাম্বুল ভক্ষণ বাবদে কত পাইয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ আমরা অবগত নহি, তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ভোজের দিন তিনিই যে গৃহিনীপনা করিয়াছিলেন তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ নিমন্ত্রিতেরা সকলেই দিবেন।

যথাদিনে ৺নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান অনাথনাথ ভট্টাচার্য্যে পরিণত হইল। এবং এ ব্যাপার যে মহাসমারোহেই সম্পন্ন হইল তাহা বলাই বাহুল্য। শুভাকাঙ্খিনীরা এক বাক্যে বলিলেন "ছেলেটী খেতে পেয়ে বাঁচবে।" পিসী আসিয়া ভট্টাচার্য্য গৃহিণীকে বলিলেন "গর্ভ যন্ত্রণা পাইয়া পুত্র মুখ দর্শনের সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

সমারোহ ব্যাপারে মানুষের মেলা, গণ্ডগোল, হৈচৈর মধ্যে পড়িয়া এবং নানাবিধ সুস্বাদু আহার্য্য সামগ্রী আহার করিয়া অনাথও প্রথম দিন বেশ শান্তভাবেই ছিল। দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যাকালে মাতার সেই তপ্ত বক্ষটিতে মস্তক রাখিবার জন্য পুত্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃথাই নানাবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বালককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ব্রাহ্মণীই এখন হইতে

তাহার মা, তিনি তাহার পিতা এবং সে তাঁহাদের দত্তকপুত্র। বালক কাঁদিতে লাগিল; প্রতিবেশীর প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, যে "চণ্ডী গ্রন্থখানি উপবীত ধারণের পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ তনয়েরই স্পর্শ করা উচিত নয় বালক তাহাই পাঠ করিবে বলিয়া বায়না ধরিয়াছে।"

রাত্রিতে কিছুই না খাইয়া বালক কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শৌচার্থে বাহিরে যাইতে ছিলেন দেখিলেন দ্বারের পার্শ্বে রুক্ষকেশা, ছিন্নবসন পরিহিতা অনাথের মা দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে দেখিয়াই বিধবা পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি সম্পূর্ণ সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন. "ওঃ ভুল হয়ে গ্যাছে বাপু তাইত" এই বলিয়া গৃহের ভিতরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাড়াতাড়ি 'লৌহ বক্সে'র অভ্যন্তর হইতে একখানি দলিল ও পাঁচটী টাকা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বিধবা তখনও সেই স্থানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি বলিলেন, "এই নাও তোমার স্বামীর দলিল, আর এই পাঁচটী টাকা আমি তোমাকে দিলাম: এদিকে কিন্তু আর এসো না বাছা তোমার ছেলে বড় দুষ্টু," এই বলিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অনাথের মা অনাথকে দেখিবার নিমিত্তই মধ্যরাত্রি হইতে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে; স্বামীকৃত দলিল বা পাঁচটী টাকা লইতে আসে নাই, সে কথা ঐ সংসারী অপুত্রক ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিয়াছিলেন কিনা জানি না কিন্তু অন্তর্য্যামীর কাছে তাহা যে গুপ্ত ছিল না এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। তৃতীয় দিন সকাল হইতেই অনাথ কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যা বেলায় তাহার ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিল; মধ্য রাত্রে জ্বরের ঘোরে অনেক ভুল বকিল "মা, মা, যাই মা যাই, উঃ, কাঁদসনে মা, এই যে, আ. বাবা মা, উঃ বড় জল তেষ্টা,--" "এই যে বাব !" ভট্টাচার্য্য গৃহিণী অনাথের মুখে জল দিলেন: —এইরূপ শুশ্রূষায় অনভ্যস্তা ব্রাহ্মণীর মনে একটু ভয় হইয়াছিল, তিনি অনাথের মাকে সংবাদ দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। স্বামী শাস্ত্র হইতে কিম্ভূত কিমাকার এক বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "গোত্রান্তর জন্মান্তরেরই অনুরূপ। দত্তকের পক্ষে প্রথম প্রথম এইরূপে রোগাক্রান্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।"

অনাথের মাকে সংবাদ দেওয়া হইলনা। অভাগিনী বৎসহারা গাভীর ন্যায় দুই তিন বার অনাহূত অবস্থায় দ্বারের কাছে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া গেল। অনাথের জ্বর বাড়িল---ক্রমে সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইলে চিকিৎসক আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু রোগের কোন উপশম হইলনা।

ঔষধের কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রোগীর জন্য স্বগৃহস্থিত শালগ্রাম শিলার স্নান জলের ব্যবস্থা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে ভুলিলেন না ইহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

যথাকালে অনাথ গোত্রান্তর গ্রহণের ফলে চিকিৎসক ও ধন্বন্তরীর কৃপায় জন্মান্তর গ্রহণ করিতে চলিয়া গেল।

গৃহিণী কি করিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, নিতাই মুখোপাধ্যায়ের সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও তাহার পুত্রকে দত্তক না লইয়া এক জুয়াচোরের পুত্রকে জোর করিয়া তাহার

স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাতেই তাঁহার ভোজের খরচটা দ্বিগুণিত হইল। কারণ নিতাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী সোণার চাঁদকে এক্ষণে দত্তক লইতে হইলে পুণরায় সমারোহ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে তাহাতে অনেক ব্যয়।

সুতরাং তাঁহার অর্থের অপব্যয়ের জন্য অনাথের মাতাই সম্পূর্ণ দায়ী; সেই "অষ্ট-কুষ্টির" কন্যা সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই তাঁহাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়াছে।

পুত্র-শোকাতুরা অনাথের মা মৃত পুত্রের মুখ খানি জন্মের মত একবার দেখিতে আসিলে শুদ্ধ ভাবি দত্তকের অশুভের জন্যই ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুত্র বিক্রেয়ীকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। আরও তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন;—বিশেষ করিয়া বিক্রিত পুত্রের উপর স্নেহের দাবী পিতা মাতার পক্ষে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় তাহাতে মহা-পাতকের ভয়ও নাকি আছে। সুতরাং নিজেই ব্যবস্থা দিয়া এতবড় একটা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার মহাপাতকের ভাগী হইতে পারেন না।

রোরুদ্যমানা জননী আত্মহারা হইয়া তখন শ্মশানের দিকে ছুটিলেন; জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া অভাগিনী পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। অদূরে মুখাগ্নির সরঞ্জাম হস্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখা গেল।

দারুণ মর্ম্মভেদী সুরে জননী কাঁদিয়া উঠিলেন "বাবা অনাথ কোথায় গেলি বাপ?"

অদূরে কে যেন গাহিয়া গেল—

"বলিস খোকা সেকি হারায়!
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছ আমার বুকের কোলে।"

সন্ধ্যায়

[শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী]

ধরণীর আকুল অন্তরে,
যে বাসনা জেগেছিল সারাদিন ধরে'—
মিলিবারে আকাশের সাথে,
বাধা দিল তাতে,
প্রান্তর শেষের ঐ চক্রবাল রেখা,
বিধাতার লেখা।

তারি উতরোল—
দিল দোল,
ধরণীর বক্ষ দোলাটারে—
সারাদিন ধরে।

কৃষক ছুটিল মাঠে,
পসারি সে হাটে,
ত্যজি গৃহ দ্বার
কোথাও বিশ্রাম নাহি আর!

ঘরে দ্বারে, পথে ঘাটে, ধরণীর পঞ্জরে পঞ্জরে,
সারাদিন ধরে,
ব্যস্ততার একি সুর বাজে
মানুষের দিবসের কাজে।

পাখীদের বাসা ছেড়ে আকাশেতে ভাসা,
গাভীদের মাঠে চরে আসা,
এ সবারি মাঝে
একই সুর বাজে!
ধরণীর চিত্ত-উতরোল
এসবারে দিল বুঝি দোল।

নীরব সন্ধ্যায়,
দিগন্তের ব্যবধান রেখা, ঐ মুছে যায়।
ধরণী ও আকাশের মাঝে
মিলনের কি বাঁশরী বাজে!

একি শান্তি, একি তৃপ্তি ধরণীর বক্ষ জুড়ি রাজে!
বাজে শুধু বাজে,
দূর দেবালয় গৃহে নহবতে পূরবীর তান,
মিলনের গান,
আবেগের সুরে;
দূরে বহুদূরে।

তারি সুর বাজে,
নীরব এ সাঁঝে।

কৃষকের কর্ম্ম অবসানে,
পাখীদের নিজ কুলাপানে
ফিরে আসা, দিনান্তের পরে ;
গোয়ালের ঘরে,
মাঠ হতে ফিরে আসা গাভীদের অলস শয়নে,
খেলাসাঙ্গ বালকের নিদ্রালস নয়নে নয়নে,
তারি সুর বাজে
নীরব এ সাঁঝে।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

৯ম দৃশ্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জার্ম্মান গোলা।

তৃতীয় বার বন্দুকের আওয়াজ হইল—এবার কুটীরের অতি নিকটে। গ্রেস্ চমকিয়া উঠিয়া জানালা হইতে সরিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"এই সব আওয়াজের অর্থ কি? কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে না কি? জার্ম্মানরা কি আবার ফিরে এসেছে?"

ডাক্তার সাবৃভিল্ এ কথার জবাব দিলেন। তিনি এই সময়ে পর্দ্দা সরাইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"জার্ম্মানরা আবার আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসছে—তাদের অগ্রবর্ত্তী সেনাদল দেখা যাচ্ছে।"

গ্রেসের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মার্সি ডাক্তারের নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা তাদের গতি রোধ ক'রতে পারবতো?"

ডাক্তার বলিলেন—"অসম্ভব, আমাদের চেয়ে তাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী।"

বাহিরে ফরাসীদের ঢক্কানিনাদ শ্রবণ গোচর হইল। ডাক্তার বলিলেন—"ঐ শোন, ফরাসী সৈন্য পশ্চাৎ হ'টে আসছে। এখন আমাদের নিজে নিজে সাবধান হ'তে হবে। আর ৫ মিনিটের মধ্যেই আমাদের এ স্থান ত্যাগ ক'রতে হবে।"

এইবার এককালে অনেকগুলি বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। গ্রেস্ সভয়ে ডাক্তারের হাত ধরিয়া বলিল—"আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। মহাশয়, জার্ম্মানদের হাতে আমি
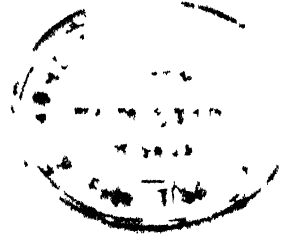
এর পূর্ব্বেই অনেক নির্য্যাতন সহ্য ক'রেছি। আমাকে ফেলে চলে' যাবেন না।"

ডাক্তার গ্রেসের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"আপনার কোন ভয় নাই, ফরাসী পুরুষ এমন কাপুরুষ নয় যে এ অবস্থায় একজন রমণীকে ফেলে দূরে পালাবে।"

মার্সি ভাবিতে লাগিল—আহতদের কি গতি হইবে। সে ডাক্তারকে তাঁহার সেই কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল—"রুগ্ন ও আহতদের কি উপায় হবে?"

ডাক্তার বলিলেন—"তাদের মধ্যে যারা যথেষ্ট সবল আছে তাদের আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আর সকলকে এই খানেই থাকতে হবে।—তোমার নিজের জন্য কোন ভয় নেই। মালের গাড়িতে তোমার যথেষ্ট স্থান হবে।"

গ্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল—"সেই গাড়ীতে আমারও একটু স্থান হবে না কি?"

মার্সি বলিল—"আপনি মিস রোজবেরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। আপনি যাদের এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন আমার স্থান তাদেরই সঙ্গে হবে।"

গ্রেস্ বিস্ময়ে বলিল—"তুমি যদি এখানে থাক তা হ'লে তুমি কি রকম বিপদের মধ্যে থাকবে সে কথা একবার ভেবে দেখ।"

মার্সি তাহার বাম স্কন্ধের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আমার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই; এই রক্তবর্ণ ক্রুশই আমাকে রক্ষা করবে।"

আবার চক্রানিনাদ শ্রুত হইল। ডাক্তার দেখিলেন আর বিলম্ব করা চলিবে না। এই মুহূর্ত্তেই পলায়নের উদ্যোগ করিতে হইবে। তিনি গ্রেসকে চেয়ারে বসাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"যে পর্য্যন্ত আমি ফিরে না আসি, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। কোন ভয় নাই। মার্সিলের কথার কখনও অন্যথা হয় না।—তার সত্যবাদিতার উপর নির্ভর ক'রে থাকুন।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার পর্দ্দার অপর পারে অপসৃত হইতে না হইতেই—গভীর কামান গর্জ্জন শ্রুত হইল। তৎপর মুহূর্ত্তেই জানালার অনতিদূরে বাহিরের উদ্যানে একটা গোলা পড়িয়া ফাটিল। গ্রেস্ ভয়ে চীৎকার করিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। মার্সি ধীরচিত্তে জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

সে বলিল—"বাগানে সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো। জার্ম্মান সৈন্য এই পল্লীর উপরে গোলা বর্ষণ ক'রছে।"

গ্রেস্ উঠিয়া আশ্রয় লাভের জন্য মার্সির নিকটে ছুটিয়া গেল। সে বলিল—"আমাকে এখান হ'তে নিয়ে চল। আমরা এখানে থাকলে এখনই নিহত হব।"

সে চক্ষু উঠাইয়া দেখিল—মার্সি অবিচলিত ভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মুখে তাহার ভয়ের কোন চিহ্ন নাই।

তখন সে বলিল—"তোমার প্রাণ কি লোহায় তৈরী? তোমার যে কিছুতেই ভয় হয় না!"

মার্সি বলিল—"আমার জীবনের জন্য ভয় কি বলুন? যার জীবনে কোন আকর্ষণ নেই তার আর জীবননাশের ভয় কি?"

কামান গর্জ্জন পুনরায় গৃহকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। আর একটা গোলা প্রাঙ্গনে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। এই ধ্বনিতে গ্রেসের

অন্তরাত্মা ভয়ে শুষ্ক হইয়া উঠিল—সে ভাবিল পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। সে ভয়ে মার্সির গলা জড়াইয়া ধরিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে মার্সিকে স্পর্শ করিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইয়াছিল—প্রাণের দায়ে সেই মার্সিকে সে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"বল, বল, কোথা গেলে নিরাপদ হওয়া যায়: লুকিয়ে থাকতে পারা যায় এমন একটু স্থান দেখিয়ে দাও না।"

মার্সি বলিল—"এর পরের গোলা যে কোথায় প'ড়বে তার ঠিকানা কি?" মার্সির নীরবতা ও ধৈর্য্য গ্রেস্‌কে যেন পাগল করিয়া তুলিল। সে তাহার গলা ছাড়িয়া কুটীর হইতে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রন্ধনশালার দিকে বিষম গোলমাল ও লোকের ভিড়। গ্রেস্ সহসা দেখিল পাশ্চাতের দিকে কুটীরের আর একটী দরজা রহিয়াছে। সে সেই দিকে ছুটিল—ভাবিল এবার কতকটা নিরাপদ হইলাম। কিন্তু যখন সে তালার উপরে হস্ত স্থাপন করিয়াছে সেই সময় তৃতীয় বার কামান গর্জ্জিয়া উঠিল।

সেই ভীষণ গর্জ্জনে গ্রেস্ কতকটা পশ্চাতে হটিয়া কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তৃতীয় গোলা ছাদ ভেদ করিয়া গৃহের মধ্যে পড়িয়া ঠিক সেই দরজার নিকট ফাটিল। মার্সি জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িল। গোলার বিদীর্ণ অংশ গুলিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের অঙ্গন জ্বলিতেছিল—আর তাহাদেরই মধ্যে পুঞ্জীভূত ধূমরাশি ভেদ করিয়া অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল—গ্রেসের স্পন্দহীন দেহ!

এই ভয়াবহ মুহূর্ত্তেও মার্সি উপস্থিতবুদ্ধি হারাইল না। নিকটে কএকটী পাটের বস্তা পড়িয়া ছিল—সে সেই গুলির দ্বারা মেঝের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সংজ্ঞাহীন রমণীর পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তার পর সে তাহার মস্তক তুলিয়া ধরিল—।

গ্রেস আহত না মৃত? মার্সি তাহার একটী অসাড় হাত উঠাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল—জীবনের কোন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে কি না? এমন সময় ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানিতে আসিয়াছিলেন—স্ত্রীলোকদের কোন অনিষ্ট হয় নাই তো?

মার্সি তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল—"আমার মনে হচ্ছে—ইতি গোলাতে গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। আপনি দেখুন তো আঘাত সাংঘাতিক হয়েছে না কি।"

ডাক্তার রমণীর এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বলিলেন—"ওপরের কোটটা খুলে দাও দেখি। আহা! পড়ার সময় ঘুরে পড়েছে—কোটের দড়িটা দেখছি গলায় জড়িয়ে গেছে!"

মার্সি কোট খুলিয়া দিল। ডাক্তার দুই হাতে গ্রেসকে উঠাইয়া তুলিলেন—তখন কোটটা ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন—"শীঘ্র একটা বাতি নিয়ে এস। রান্নাঘরে বাতি পাবে।"

তারপর তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। মার্সি বাতি আনিলে দেখা গেল—গ্রেসের মস্তকে গোলার একটী টুকরা পড়ায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। ইহা দেখিয়া ডাক্তারের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। দুশ্চিন্তার ভাব কাটিয়া গেল—চিকিৎসকের ধৈর্য্য তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকট হইয়া উঠিল। দুশ্চিন্তার আর কোন অবসর নাই—কারণ

এখন যাহা তাঁহার হস্তে রহিয়াছে—তাহা একটী জড়পিণ্ড মাত্র।

ডাক্তারের ভাব বিপর্য্যয়ে মার্সি শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাংঘাতিক ভাবে আহত হ'য়েছেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন—"আর তোমার আলো ধরবার কোন আবশ্যকতা নাই। সব শেষ হ'য়ে গেছে—এর জন্যে আর কিছু করবার সাধ্য আমার নেই।"

"মারা গেছেন?"

"হঁ।"

তাহার পর ডাক্তার দন্তে অধর চাপিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন—"পাষণ্ড জার্ম্মান! হায়—এই সব হ'চ্ছে যুদ্ধদেবতার বিচিত্র খেলা! মার্সি, এর পর হয় তো—তোমার কিম্বা আমার পালা! এই মানুষের জীবন!" তাহার পর তিনি গৃহের এক কোণে একটী শয্যার উপর প্রেসের দেহ স্থাপন করিয়া বলিলেন—"এই খানেই এ দেহ থাকল। কিছু পূর্ব্বে কি মনোহর সৌন্দর্য্যের আধার ছিল এই শরীর—আর এখন এ কেবল একটী জড়ের স্তূপ!—মার্সি, এখন এস আমরা এখান হতে চলে যাই—না হ'লে হয়তো আমাদেরও এই গতি হবে।"

মালের গাড়ীর চক্রধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। পুনরায় ঢক্কা নিনাদিত হইয়া উঠিল—ফরাসী সৈন্য হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মার্সি পর্দ্দা একটু সরাইয়া দেখিল—গুরুতর রূপে আহত ব্যক্তিগণ নিরাশ্রয় অবস্থায় তৃণশয্যায় পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিবার কেহই নাই। তাহাদিগকে শত্রুদের দয়ার উপর নিক্ষেপ করিয়া সকলেই পলায়ন করিয়াছে। সে ডাক্তারকে বলিল—"আপনি যান; আমি আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি আহতদের সঙ্গেই থাকব।"

ডাক্তার ভদ্রভাবে প্রতিবাদ করিলেন—এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকা কিছুতেই নিরাপদ নহে। মার্সি কেবল পর্দ্দাটী একটু সরাইয়া রন্ধনশালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তার পর সে বলিল—"আপনি চলে যান; আমি স্থির করেছি—আমি এখান হতে যাব না"

ডাক্তার আপনার বক্ষস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া মার্সির দিকে ঈষৎ মস্তক নত করিল। "মার্সি, তুমি যথার্থই মহিমান্বিতা নারী!"—এই কথা বলিয়া ডাক্তার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মার্সি তখন দরজার উপর পর্দ্দা টানিয়া দিল। গৃহে থাকিল সে, আর শয্যাশায়িতা সেই মৃত রমণী।

ক্রমে পলায়নপর নরনারীর পদধ্বনি নীরব হইয়া আসিল—যানের চক্রশব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। আর বন্দুক বা কামানের কোন শব্দ নাই। চারিদিক যেন ক্ষণকালের জন্য নীরব নিস্পন্দ হইয়া উঠিল। সে নিস্তব্ধতা কি ভয়ঙ্কর! ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির যেন এ শান্ত মূর্ত্তি! এখনই জার্ম্মান সৈন্য আসিয়া পল্লী অধিকার করিবে। দুর্ভাগ্য আহত ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত নীরবে তাহাদের ভাগ্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

একাকী সেই গৃহে—মার্সি প্রথমেই সেই শয্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

যুদ্ধের প্রথম গোলমালের ভিতরে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পর মার্সি শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। শেষে কাপ্তেনের গৃহেই তাহাদের আলাপ হয়।

তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়াও পরস্পরের সহিত পরিচিত হয় নাই। উভয়ের প্রকৃতিপার্থক্য মার্সি বুঝিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।—কিন্তু এক্ষণে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃতার প্রতি মার্সির হৃদয় যেন আকৃষ্ট হইয়া উঠিল সে আলোক লইয়া মৃতার শয্যাপার্শ্বে দাড়াইল। সেই নির্জ্জন গৃহের ভীষণ নীরবতার মধ্যে সে একদৃষ্টে মৃতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সস্নেহে মার্সি মৃতার মুখের উপর হইতে বিশৃঙ্খল কেশরাশি সরাইয়া দিল—তাহার অঙ্গের পরিচ্ছদ গুছাইয়া দিল। সে মনে মনে বলিল—"পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমি তোমার সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছিলাম। হায়! এখন যদি তোমার সঙ্গে সত্যিই আমি আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রতে পারতাম।" অভাগিনীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।

গৃহের দুঃসহ নীরবতায় তাহার মন একান্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে গৃহের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল।

গৃহের অঙ্গনে গ্রেসের সেই কোটটী পড়িয়া ছিল। সে যে তাহার নিজেরই কোট—সে উহা মার্সিকে পরিতে দিয়াছিল। সেই কোটের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে সেটীকে ভূমি হইতে উঠাইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িল—শেষে সেটীকে একটী চেয়ারের উপর স্থাপন করিল। তাহার পর টেবিলের উপর আলোক রাখিয়া সে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া জার্ম্মানদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বহিরে কোন শব্দ নাই—প্রকৃতি নীরব; শুধু বৃক্ষপল্লবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বায়ুর মৃদুল মর্ম্মর ধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

সে ফিরিয়া টেবিলের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মৃতের প্রতি তাহার কোন কর্ত্তব্য সে কি অসম্পন্ন রাখিতেছে? ধর্ম্মের কাছে সে দায়ী হইবে না তো?

তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল—তাহার কথা মার্সির মনে পড়িল। গ্রেস্ ইংল্যাণ্ডে যাইবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। একটী ভদ্র মহিলা তাহার পিতার খাতিরে তাহাকে একটী চাকরী দিয়াছেন—তিনি গ্রেসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিরূপে গ্রেসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল সে সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া তো একান্ত কর্ত্তব্য। কে দিবে সে সংবাদ? কে জানে সে সংবাদ? মার্সি দেখিল জগতে গ্রেসের মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী সে নিজেই।

মার্সি চেয়ার হইতে কোট উঠাইল। তাহার পকেট হইতে সে সেই চামড়ার ব্যাগটী বাহির করিয়া লইল। গ্রেস্ তাহাকে সে ব্যাগ দেখাইয়াছিল। যদি ইংলণ্ডে সংবাদ দিতে হয়—তাহা হইলে সেই ভদ্র মহিলার ঠিকানা জানা আবশ্যক। মার্সি ব্যাগ খুলিল—কিন্তু কাগজ পত্র পড়িয়া ঠিকানা অনুসন্ধান করিতে তাহার হৃদয় যেন একটা দারুণ সঙ্কোচ অনুভব করিল।

পরক্ষণেই তাহার মন বলিল—এ সঙ্কোচ কেন? সে যদি ব্যাগটী স্পর্শ না করিয়া রাখিয়া দেয়—এখনই জার্ম্মান সৈন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা হস্তগত করিবে। তাহারা কি ইংলণ্ডে সেই মহিলাকে গ্রেসের মৃত্যু সংবাদ জানাইবে? বিদেশী পুরুষ শত্রু আসিয়া তাহার কাগজ পত্র পরিদর্শন করিবে ইহা ভাল, না তাহার স্বদেশ বাসিনী একজন রমণী তাহা পরীক্ষা করিবে

ইহা ভাল ? মার্সির সঙ্কোচ দূরীভূত হইল। সে টেবিলের উপর ব্যাগের জিনিষ পত্র ঢালিয়া ফেলিল। কিন্তু--এই সামান্য কার্য্যটীতেই মার্সির জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ অতি জটিল ভাবে জড়িত হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

চোর

[শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু]

জীবন মধুপ্রাতে কহিল ফুলরাণী
"কলিকে, একি হল ? শূন্য হৃদিখানি ?
নয়ন দুটি মেলি' দেখ্‌লো দশা মোর,
কাঁদায়ে নিয়েগেল কোথা সে কোন চোর ?
আমারি হৃদিমাঝে লুকালো মধুবাস ;
কে নিল চুরি করি পাব কি আছে আশ ?
সোনার ভোরে আজি কে নিল সোনা মোর
আমারে ফাঁকি দিয়ে লুকাল মনচোর ?
গাহিয়া গুণ্ গুণ্ কে আসে মোর পানে ?
ভোমরা এস সখি এসলো মোর পানে।
তুমি কি জান কিছু ? জানত বল ত্বরা ;
চোর সে কোথা মোর হৃদয চুরি করা ?"
ভোমরা কহে হাসি "ক্ষুব্ধ এত কেন ?
হৃদয গেল চুরি ছিলি কি অচেতন ?
হৃদয়ে বসি চুরি একিলো সোজা চোর !
ভাগ্যবতী ওলো সরলা বোন মোর।
শোনলো শোন ঐ মধুর গলাখানি—"
"হৃদয়-চোর আমি ও সখি ফুলরাণী !
মনে কি নাই প্রিয়ে অফুট-প্রেম কথা ?
থেকগো প্রিয়তম আমি গো থাকি যথা'
তোর তা তোর আছে একি লো থাকা নয় ?
হৃদয় চুরি করি ছড়ালো ধরাময়।"

স্ত্রীশিক্ষা

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিবাহের মহত্তর উদ্দেশ্য সুপুত্র ও সুকন্যার জন্মদান। বিবাহরূপ সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি পতিপত্নীর আদর্শে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সেই আশ্রমে যদি সহধর্ম্মিণীর সহিত সুগৃহস্থের মিলনে বা সাহচর্য্যে নৈতিক উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয়, উচ্চতর মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও শারীরিক শক্তিদ্বারা আত্মোন্নতি হয়, সমাজের বা দেশের, জাতির বা জগতের মঙ্গল সাধন হয়, তাহা হইলে উন্নতির আদর্শে, স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক মিলন দ্বারা আমরা মনুষ্যত্বের আদর্শকেই পূর্ণাঙ্গভাবে পূজা করিতে পারিলাম। বিবাহের সর্ব্বোত্তম মহত্তর আদর্শ স্ত্রী ও পুরুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, সুপুত্র উৎপাদন তাহার উপাদান, গার্হস্থ্যাশ্রম তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, সত্য ও স্বার্থত্যাগ তাহার নৈতিক বল। অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী ও অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ বিবাহ-বন্ধন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ হইবেন, এবং নৈতিক আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা মানব জীবনের পক্ষে সঙ্গত, শোভন ও সম্ভব, যথাসাধ্য সেই কর্ম্মের অনুশীলন করিয়া মনুষ্যত্বের সাধনা করিবেন। সমাজবদ্ধ জীবই হউন, আর নির্জ্জনপ্রিয় জীবই হউন, মনুষ্যত্বের সাধনা ও মানব জাতির বা সমগ্র প্রকৃতির কল্যাণ বিধানের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাহার প্রবল কর্ম্মশক্তির আর কোনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

যদি এই সব কথা আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে কি পুরুষ আর কি নারী, তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কত মহৎ হইয়া পড়ে আমরা তাহা ভাবিবার অবসর পাই। জীবনের উদ্দেশ্য পথে কর্ম্মক্ষম হইতে হইলে জাগতিক অভিজ্ঞতা লাভ ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। শিক্ষা ছাড়া এই দুটী কথনই অনায়াসলভ্য নহে। শিক্ষা দ্বারা যে মন নির্ম্মল ও তেজস্বী হয়না, অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু হয়না, যে মন আপনার মেধা ও বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা দ্বারা গরবিষ্ঠ হয় না, সে মনের দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা অত্যল্প। স্বাধীনতা লাভ ও স্বাবলম্বন, বিচার ও মীমাংসা, সংযম ও কর্ম্ম প্রবৃত্তি এই সমস্তই শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ, ইহা সহজ হওয়া সৌভাগ্যের কথা।

নারী জাতিকে জগতের ইতিহাস জানিতে দিলে জগতবাসীর যত লাভ, নারীর লাভ তার চেয়ে অনেক কম। জগতের দর্শনশাস্ত্র নারীর অবোধগম্য হইলে নারীর অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ, নৈতিক শক্তির সাধনা কিসে যে স্ফূর্ত্ত হইবে, তাহা বুঝিয়া ওঠা সুকঠিন। জগতের এমন সভ্য, অসভ্য দেশ নাই, নারী যেখানে গার্হস্থ্যধর্ম্মের মধ্যে আপনার জগদ্ধাত্রী জননী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন মনে করে নাই। নারীও তার প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছেন, পুরুষও তাঁহার জননী মূর্ত্তি

সমাজ বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সন্তান-জননী মূর্ত্তির কাছে, মাতৃমূর্ত্তির সাধনা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সুতরাং জননীমূর্ত্তির আদর্শও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

জ্ঞানের বিকাশ যে নরনারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের উপাদান, ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নবীন ও প্রাচীন, হিন্দু ও মুসলমান খৃষ্টান ও বৌদ্ধ কেহই কখনও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শিক্ষা যদি সেই জ্ঞানের আলোচনারই উপায় হয়, তাহা হইলে জগতের কোনও মানুষের জ্ঞানের বা শিক্ষার অধিকার হইতে আমরা তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারি না। স্বাধীনতা মনে, মনের স্বাধীনতা জ্ঞানের ও কর্ম্মের স্বাধীনতা; জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুশীলন সাপেক্ষ, এই অনুশীলনই শিক্ষা। শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। অভ্যাস যদি বিচারদ্বারা পূর্ব্বে মীমাংসিত না হয়, তাহা হইলে সে অভ্যাস যে সৎ, সে সম্বন্ধে অন্যের সহিত নিজের মতের সামঞ্জস্য হয় না। অভ্যাসের দ্বারা শারীরিক শক্তি বাড়ে, লেখা-পড়াও শিখিতে পারে, নৈতিক শক্তিও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে পাবে। সুতরাং এই অভ্যাসের শিক্ষা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই পাইতে সমান অধিকারী।

আবার লেখাপড়া শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কিছুমাত্র স্বাবলম্বন নাই। স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্য আলাদা জিনিস। নৈতিক অপকর্ষতা যাঁহার বর্ত্তমান, তাঁহার পক্ষে স্বাতন্ত্র্য আদর্শ হিসাবেও ব্যবহারিক জীবনের হিসাবে প্রার্থনীয় নাও হইতে পারে, কিন্তু মানব জীবনের পক্ষে স্বাবলম্বন প্রার্থনীয় নহে, মানব সমাজ এমন ধৃষ্ঠতার কথা বলিতে পারেন না।

শিক্ষা পুরুষের জন্যও প্রয়োজন, নারীর জন্যও প্রয়োজন। মনের সুখ দুঃখ নারীরও যখন আছে, তখন সে সুখ দুঃখের ইতিহাস, সুখ দুঃখের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জনিত মনস্তত্ত্ব দর্শন নারীকে শিখিতে দেওয়া হইবে না কেন? যে সমাজে নারী নানা কারণে, নানা দিক থেকে অত্যাচারে প্রপীড়িতা সে সমাজের ধারাবাহিক, আংশিক ও সম্পূর্ণ সমাজতত্ত্ব নারীকে জানিতে দেওয়া হইবে না কেন? যে সাহিত্যে নারীর নিন্দা ও সুখ্যাতি প্রচুর, সে সাহিত্য তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহাকে দেখানো হইবে না কেন? এই-রূপ ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ন, কোন শাস্ত্রই নারী শিক্ষার বহির্ভূত হইতে পারে, এমন কোনও স্বাভাবিক কারণ নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে নারী শিক্ষার আপত্তি মোটেই নূতন কথা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপত্তি যদি অল্প বিস্তর পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কারণেই এ দেশেও স্ত্রীশিক্ষার অবাধ প্রচলন কি সম্ভবপর নহে? আর প্রাচীন সভ্যতার যুগেও এদেশের নারীও অশিক্ষিতা ছিলেন না; নর নারীর সম্মিলিত জ্ঞানও কর্ম্মময় সমাজে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছিল।

স্ত্রী-শিক্ষায় আপত্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কি উপায়ে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তা করিবেন চিন্তা করুন। যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষায় আপত্তি করেন না, স্ত্রীর স্বাবলম্বনে মনে মনে লজ্জিত হন না, শুধু স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য বিধান না হয়, ইহাই প্রার্থনা করেন, তাঁহারা নারীজাতির জন্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করুন। উপন্যাস পাঠের বন্দোবস্ত নয়, শিক্ষার বন্দোবস্ত। আব

যাহারা স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করেন স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাঁহারাও শিক্ষার বন্দোবস্ত পাকা করুন। নৈতিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করুন।

নারীত বন্দিনী নহেন যে, বাহিরে কোনও অবস্থাতেই নৈতিক শক্তিতে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। নারীত স্বেচ্ছাচারিণী নন যে, সন্দেহ, সংশয় দ্বারা তাঁহাদের বাঁধিয়া না রাখিলেই তাঁহাদের নারীত্বের অপমান ঘটিবে। সংযম ও শৃঙ্খলা তাঁর নৈতিক শক্তি। নারী সমাজ কখনও তাহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইতে দিতে পারেন না। নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রও সকল দেশেই বহির্ভাগের চেয়ে পুরোভাগেই বেশী। আর এ কথাও সত্য যে পুরুষ ও নারী চিরদিনই পরস্পরের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যপ্রার্থী। নারীর চরিত্রগত ভাল মন্দের জন্য পুরুষ ও পুরুষের চরিত্রগত ভাল মন্দের জন্য নারীর গুরুতর দায়িত্ব চির দিনই বর্ত্তমান।

দেশের অর্দ্ধেকের উপরে নারী। সেই নারীকে শিক্ষা, সামাজিক অধিকার হইতে বাদ দিয়া দেশোদ্ধার হইতে পারে, এমন বিশ্বাস এখন আর দেশের শিক্ষিত লোকের নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রেও নারী এখন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সন্তান পালনে, গৃহস্থালীর কর্ম্মপটুতায়, পারিবারিক সেবায়, সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে নারীর অযোগ্যতা কোথাও নাই। যদি কোথায়ও থাকে, তাহা তাহার শিক্ষার অভাবে ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন। প্রাচীন কালে নারী জ্ঞানের পূজায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য দেশের নারী জ্ঞান রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচ্যে, চীনে, জাপানে এমন কি তুরস্কে, আফ্‌গানিস্থানে, বেলুচিস্থানে পর্য্যন্ত নারী বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনে অগ্রণী হইতেছেন। ভারতের নারীও রাজনৈতিক ও সামাজিক জ্ঞানে ক্রমশঃ বিদুষী হইয়া উঠিতেছেন। নারীর সামাজিক জ্ঞান যত অধিকতর পরিস্ফুট হইবে, ততই তাহার সামাজিক শক্তি ও সামাজিক অধিকার বাড়িবে। শিক্ষা ও নারীর অধ্যবসায়ের ঐকান্তিক কর্ম্ম সাধনাই তাহার শক্তি ও সামাজিক অধিকার প্রদান করিবে।

নারীর উচ্চ শিক্ষা উপেক্ষিত হইলে নারীর উচ্চ চিন্তা দ্বারা জাতি অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের পরে নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইলে বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবেই। কিন্তু যাঁহারা কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন চাহেন না, অথচ নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা চাহেন, যদি তাঁহাদের অর্থ থাকে ত তাহারা শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। আর যাঁহাদের অর্থ নাই, তাঁহারা বাড়ীর মেয়েদের যতটা সম্ভব, উচ্চ শিক্ষা হয় এমন গ্রন্থাদির অনুশীলন করাইতে আরম্ভ করুন, অথবা দশজনে মিলিয়া এক একটি নারী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করুন ও আপাততঃ অন্তঃপুর বাসিনী সুশিক্ষিতা মহিলা পান ভাল না হয়ত সুপণ্ডিত বৃদ্ধকে এই শিক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিয়া নারীর মানসিক শক্তি উচ্চতর ভাব বিশিষ্ট ও বিচারসহ করিয়া গড়িয়া তুলুন। অজ্ঞতা পাতিত্য, অজ্ঞতা একপ্রকার মৃত্যু, অজ্ঞতা অন্ধত্ব। অজ্ঞতার নরক হইতে নারী শক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের সম্মিলিত জাতীয় শক্তি জাগরিত হউক, ভগবানের বিশিষ্ট বিকাশ মানুষের নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বর্ষারাণী

[শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী]

কেয়া ফুলের কর্ণভূষণ
লীলায় চল সঞ্চরি
নিশ্বাসেতে ফোটাও পিয়া
কুন্দ ফুলের মঞ্জরি ;

বুকে তোমার ফোটাও
কদম ফুল
চাঁদের মত মুখা'নিতে
মেঘের দুকুল।

চমকে ওঠা চোখের কোণে
কেমন করে চাওয়া,
আকুল ধরার ব্যাকুল শ্বাসে
বয়যে বাদল হাওয়া ;

ঘোমটা তোলা একটুখানি বিকচ
হাসির রেখা
ধরার বুকে ফোটায় যেন তরুণ
অরুণ লেখা

মুক্তধারে সিক্ত কর
শুষ্ক জীবন-কুঞ্জরে
ঘনিয়ে আসা মেঘের কোলে
কতই আশা মুঞ্জরে ;

প্রেমের ব্যথা কাঁপায়
বুকের উত্তরী
নীলাম্বরী--'ওগো আমার
গহন মনের নীল পরী !

তোমার বীণা কেমন বাজে
কেমন গমক মীড়,
বাতায়নের তলায় জমে
সকল পথের ভীড় ;

সারা আকাশ কাঁপে
বীণার নিক্কনে
আলোর ঝলক তোমার
মণি কঙ্কণে।

ঘুচবে কবে দাহ দহন
তোমায় পাব বাঞ্ছিত,
জুড়োবো বুক তোমার বুকে
জুড়োবো প্রাণ লাঞ্ছিত ?

শুষ্ক কাঁদন পরশ পেয়ে কাঁপ্‌বে
কবে থরথরি
লহর লীলায় বইবে কবে মন্না জীবন
তর তরী ?

শিল্পকলা বিজ্ঞান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভারতের অধ্যাত্ম শিল্পবিদ্যা ত্যাগের ভিতর দিয়া, পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম শিল্পশক্তি ভোগের ভিতর দিয়া এই মাত্র প্রভেদ। ভারতীয় শিল্প বাহিরের পার্থিব শক্তিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া উপহাস করে বলিয়া দেখার নিয়ম (perspective) মানে না কারণ এযে সেই যাকে দেখা যায়না তাকে দেখার চেষ্টা, সেই অচেনাকে চিনিবার প্রাণাত্মকর সাধনা। কারণ সেই অদেখাকে দেখিতে গেলে যে "সব দিয়া" দেখিতে হয়। শুধু চক্ষু দিয়া দেখিতাম যদি তবে দেখার নিয়ম মানিতাম এযে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর্শন সেই চিত্র-শিল্প দর্শন যা "প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে, প্রাণ আকুল করিবে" তবেই না সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সেই চিত্র-শিল্পখানি বুকে রাখিব। ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় সাহিত্য সবই ভিতরের জিনিষ বাহিরের শিখান (Etiquete) বুলি নহে। ভারতীয় শিক্ষক শিক্ষকতার ফাঁকি শিখিয়া শিক্ষক নহেন সেই জন্য ইউরোপে শিক্ষকতার জন্য কোটি কোটি পুস্তক, সংস্কৃত সাহিত্যে একখানাও নাই।

ভারতের প্রায় সকল শিক্ষাই মৌলিক, পুঁথিগত নহে। ভারতের শিল্প-সিদ্ধি অণিমা লঘিমা অষ্ট সিদ্ধির মূলে শম দম ষট্ সম্পত্তি ভারতীয় যোগ চিত্তবৃত্তির নিরোধ চিত্তের সংযম, পাশ্চাত্যের বৈঠক খানার আমোদ বা ভোগ নহে, ইহা তপোলব্ধ মানসিক শক্তি। পাশ্চাত্য যোগশক্তি আগাগোড়া উপহাস, ফাঁকি একথা তাঁরা নিজেই স্বীকার করচে। Millais Culpin তাঁহার Spiritualism & the new Psychology গ্রন্থে স্পষ্টই লিখেছেন "That the mind should pass through disease [Hysteric madness] on its way to divine revelation" is an impossible judgment of Myres...Stainton Moses received communications from the dead, produced spiritlights, transfered objects from one room to another through closed doors...all these deliberately concocted upon his unsuspecting friends...the former (Madam Blaveskey) was a self-composed deceiver"

অনুকূল মৃত্তিকা জল হাওয়া সূর্য্যালোক প্রভাবে বীজ যেমন গাছকে পায় তপোবলে সিদ্ধার্থ যেমন বুদ্ধত্বকে পেয়েছিলেন সেইরূপ ভূতগ্রস্থ (Hysteric) বালিকা Joan of Arc তাহার তথাকথিত রোগের ভিতর দিয়া যে দৈব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহার স্বরাজ্য কতদূর গৌরবান্বিত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য ঐতিহাসিক দিবেন ; এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে শুধু

হইতে যখন ঘৃত হয় বীজ হইতে যখন গাছ হয়, গুটিপোকা হইতে যখন রেশম হইতে থাকে তখন তাহার মধ্যের অবস্থা দেখিয়া এ সত্যকে কে প্রত্যয় করিবে? এই অবিশ্বাস জন্য পাশ্চাত্য দেশে কত জোয়ান আর্ক ডাইনী বলিয়া নিহত হইয়াছে, দস্যুর সহিত কত খৃষ্টের ক্রুশ বিদ্ধ হইতে হইয়াছে কে তাহার হিসাব দিবে? স্বর্গ বিচ্যুত (paradise lost) পতিত মনুষ্য যে আবার ত্যাগের (Sacrifice) আদর্শে তৈয়ার হইলে স্বর্গলাভ (paradise regained) করিতে পারে তাহা এ বৈজ্ঞানিক যুগে কে বুঝিবে?

রুষের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Edgar Allen Poe এই কথাই তাঁহার পাগলাটে নায়ক নায়িকার মুখ হইতে বুঝাইতে গিয়াছিলেন :—

"Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence, whether much that is glorious, whether all that is profound does not spring from disease of thought from moods of mind exalted at the expense of the general intellect"

এখানে একটি কথা বলা উচিত তাহা এই যে পাশ্চাত্য সকল অধ্যাত্ম শিল্পশক্তি সম্পন্ন লোকেই ভূতগ্রস্থ নহে। সব বীজই রোগগ্রস্থ নহে। কীটদষ্ট বীজে যে গাছ হয় তাহা শীঘ্রই মরিয়া যায়। Purie Janet এর theory of Dissociation ও Friend of veinna র theory of unconsciousness এর মধ্যে সব অধ্যাত্ম যোগ শক্তির spiritualism প্রমাণ হয় না। মহাপ্রভু চৈতন্যের মহাভাবকে অনেকেই পাগলামি বলিয়া উপহাস করিলেও চৈতন্যের অধ্যাত্ম শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া এটিকে রোগ প্রমাণ করিতে সকলে পারে নাই। শ্রীচৈতন্য নিজ মুখে বলিয়াছেন "শ্রীবাস তুমি যদি আমার এই ভাবাবেশকে রোগ বল তবে আমি এখনই দেহ ত্যাগ করিব"। সত্য সত্যই মহাভাব ত্যাগের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ। রোগ সেবা বা ঔষধ সেবন কে বলি ভোগের ভিতর দিয়া শরীর ও মনের যন্ত্রাদির সুনিয়মে গঠন। ঘড়ির শিল্পী যেমন ঘড়ির ঘণ্টা বাজান ঠিক করিতে সব কটা একসঙ্গে বাজাইয়া দেখিয়া লয় সেইরূপ "মৃত্যুর দ্বারে," "সমাধির দ্বারে," "সুষুপ্তির দ্বারে" আমরা সেই অতীন্দ্রিয় বিষয় অনুভব করিতে সক্ষম হই। মৃত্যু যেমন আকস্মিক হয় আত্মহত্যা ও যোগে দেহত্যাগ অথবা হত্যার দ্বারাও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুষুপ্তি বা স্বপ্ন সমাধিও সেইরূপ যত্নের দ্বারা আনয়ন করা যায় একথা "ব্রহ্ম বিদ্যা" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে এখন "সমাধি" বা আধ্যাত্মিক শক্তি ও যত্নের দ্বারা (Practical) আনা যায় এই অবস্থাই শিল্পীর সাধন অবস্থা এটি সকলের পক্ষে সুলভ না হইলেও হিন্দু যোগীর একচেটিয়া সম্পত্তি (not the exclussive monopoly of Hindu clairvoyant) নহে। নিম্নে অধ্যাত্ম মহাভাবের অবস্থা আনায়নের জন্য কার্য্যকরি উপায় মাত্র উল্লিখিত হইবার পূর্ব্বে যুক্তি বা অধিকার প্রসঙ্গ দেওয়া গেল :—

আধ্যাত্মিক শিল্প সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন বিচার করিবার প্রথমেই প্রফেসার Charles

(অধিকার) Rischloly তাঁহার "Should Spiritua ism be Seriously Studied" গ্রন্থে বলেন এই না বলিবার অধিকার কোন বৈজ্ঞানিকেরই নাই। কোন দ্রব্য নিজের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন না হইলে ক্রমাগত উত্তাপ দিতে পারে না এ কথা "রেডিয়াম" আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে লোকে বলিত এখন বলিতে পারে কি? শরীর বিদ্যা একথা প্রমাণ করিতে পারে নাই যে "মাথা" ওয়ালা শরীরি জীব না থাকিলে বুঝিতে বা কথা কহিতে পারিবে না।

"To conceive of an absolute inteligence which has not a brain as substratum is not criminal" বীজ হইতে গাছ কেন হয়? চুম্বক লোহা টানে কেন? এ সকল প্রশ্নের কি বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। পণ্ডিত Bonille টেলিফোন টাকে Ventriloqnism এর কার্য্য বলে কি প্রথমে মনে করেন নাই! Lavonisoer কি প্রথমে ধূমকেতু আকাশে থাকার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন? তিনি কি বলেন নাই যে আকাশে কখনও পাথর থাকিতে পারে না"। অন্ধকার না হলে "ভূত" দেখান যায়না বলে যিনি হাসেন তাঁহাকে যদি বলা যায় ফটোগ্রাফিও তাহা হইলে ফাঁকি কারণ অন্ধকারেই (Darkroom) তার সৃষ্টি! আবার থারমমিটার দিয়ে "ভূত" বেচারির উত্তাপ নিতে গেলেই ভূত সরে পড়েন এও বলা হয় কিন্তু উত্তরে যদি বলা হয় কুকুরের অন্তকরণে বিদ্যুতের প্রয়োগে ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয় অথচ খরগোসের হয় না কেন? মৌখিক পরীক্ষার সময় ছাত্রকে পরীক্ষক ইচ্ছা করিলে ভড়কাইয়া দিতে পারেনা কি? স্বদেশীর বিরুদ্ধে যত বড় বুদ্ধিমানই এখন কিছু বলিতে চান তাহাকে গোলমাল করিয়া বলাইয়া দেওয়া হয় কেন? কেহ বলেন এখনি ভূত দেখাও বিশ্বাস করিব উত্তরে বলি "আকাশের ধূমকেতু" যখন চাহিবে তখনি দেখিতে পাও কি? ফরাসি যখন ইংলণ্ডে অনেক দিন থাকিলে মাতৃভাষা ভুলিয়া যান তখন ভূত হইয়া যে আসে সে তার ভাষা না বলিতে পারিলে কি জুয়াচুরি ধরা পড়িল বলিব।

কেহ বা বলেন এ ভুতুড়ে কাণ্ড জানিয়া লাভ কি? স্যার অলিভার বলেন প্রথম লাভ সত্যকে নানা দিক থেকে বোঝা। সাহিত্যের সত্য সব সময়ে দেখা যায় বিজ্ঞানের সত্য নিত্য নূতন। গানের সুর সমজদার নইলে নিরর্থক নয় কি? আমরা উচ্চাঙ্গের শিল্প বুঝতে পারি না এজন্য কি উচ্চাঙ্গের শিল্প নাই। এ নাই বলা সহানুভূতির অভাব মানসিক অবসাদ (But a deny may only signify a mental dislocation a failure to understand) বাবু ভগবান দাস বলেন পার্থিব শিল্প বিজ্ঞান (Material Science) অধ্যাত্ম শিল্প বিজ্ঞানে যুদ্ধ, দেবসুরের সমুদ্র মন্থন এটি শ্রীভগবানের লীলা এ চির কালই চলিবে কখনও "সুরের" জয় কখনও "অসুরের" জয়; মানুষের মধ্যে এ দুই শক্তি একটি ভোগের দিকে (Matterwords) একটি নিবৃত্তির দিকে (Spiritwords) এজন্য মানুষেরাও দুই দলে বিভক্ত। দেবতার ভাগ্যে অমৃত অসুরের ভাগ্যে বিষ।

"West has been engaged in the mastery of things. East has been an explorer in the realm of spirit & soon or late our separate experience will fuse into the experience & knowledge—the matured wisdom of the unified human race." Tyndal

নিরাশ্রয়

[শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার]

চামেলীকে আমার বেশ ভাল লাগত। তাহার ম্লান, কচি মুখখানি যেন আপনা হতেই আমার প্রাণ থেকে স্নেহ আকর্ষণ করত। তার হাল্কা পায়ে, হাল্কা গায়ে, পাখীর মত উড়ে উড়ে সে তার কাজ গুলো করত। আর তার মিষ্ট কথা চাপা মধুর হাসি, ম্লান চাহনি যেন তার প্রত্যেক কাজের সঙ্গে মিশে কাজের দামটুকু বাড়িয়ে দিত। আহা, তাকে দিয়ে কাজ করানই যেন একটা আরাম ছিল। যেমন কাঁচ বয়স, তেমনি কাঁচা, কোমল স্বভাবটি, তাকে চাকর বলে কখন মনে হোতনা।

প্রায় আমায় একাই থাকতে হোত। শিলং এ একটা পাহাড়ের গায়ে ছিল আমাদের বাঙ্গলা। উনি আফিস গেলে আমায় প্রায় একলাটিই থাকতে হোত। বামুন ঠাকুর যে ছিল, সে এক পশ্চিম দেশীয় আস্ত বর্ব্বর, সকালের খাওয়া দাওয়ার পরই এক দফা বেড়াতে যেত তার দেশী লোকের আড্ডায় চামেলীর সঙ্গে তার বড় ঘনিষ্টতা ছিলনা। তাই থাকত এক চামেলী এক ঘরে, বাঙ্গলার পিছনে, আর থাকতাম আমি। চামেলীর ঘর আর ঠাকুরের ঘর ছিল পৃথক পৃথক, কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক ছিল না। চামেলী ছিল খাসীয়া, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বার্ত্তারও তেমন সুবিধা ছিল না। তাই চুপটি করে একলাটি থাকতো চামেলী, আর তেমনি থাকতাম আমি। এক একদিন দুপুরট যেন কাটতোইনা—শুয়ে, বসে, হেটে, পড়ে, লিখে-যেন কোন মতেই দিনটা কাটতনা, তাই এক একবার চামেলীকে নিয়ে ফুলের বাগানে গিয়ে রোদ পোয়ান আর বাগান তৈরী কত্তাম। যখন তাতেও বেলা কাটতনা, আর অন্য কিছুই ভাল লাগতোনা, তখন বারান্দায় এসে একখানা ইজি চেয়ারে বসে, চামেলীর সঙ্গে গল্প কত্তাম, আর এক একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখতাম পাঁচটার কতটুকুন বাকি।

চামেলী বড় একটা বেশী কথা কইতনা। সে ছিল স্বল্পভাষী। তার সেই ম্লান মুখখানার একটু চাহনীর সঙ্গে সে যা দুই একটী কথা কইত, তাই যেন আমার বড় ভাল লাগত। আর সব চেয়ে ভাল লাগত তাকে দেখতেই। আহা তার পরিষ্কার ম্লান মুখ খানা চাঁদের মতন, চোখ দুটি, কি যেন একটা পাতলা কালো মেঘে ঘেরা। মুখখানা তার বড়ই ভাল লাগত, মনে হত যেন একটি ফুল, ফুটেও ফুটছেনা। উনি আমায় ঠাট্টা করে বলতেন "আমার গিন্নি সাহেবের চামেলী ফুল," "তোমার সখের খানসামা," আরো কত কি। আমি বলতাম "সখের নয়, আদরের। আমি সত্যিই ওকে বড় ভাল-বাসি।" আমি তাঁকে বলতাম যে চামেলীর মুখখানা বড়ই ম্লান মধুর, ওকে ভাল না বেসে থাকা যায় না।

তার কাজ কর্ম্মটুকুও তেমনি ছিল।

কেন গুছিয়ে কেমন পরিস্কার করে. কেমন বিবেচনা করে বুদ্ধি খাটিয়ে, আর তেমনি হেসে দুলে, হেসে, চেয়ে স্ফূর্ত্তীর সঙ্গে কাজগুলো কও, যেন মনে হত হাওয়ায় সব হয়ে যাচ্ছে। বলতে হয় না, কইতে হয়না যেন সবই আপনা আপনি কেমন করে হয়ে যাচ্ছে যেন তারই নিজের সংসার তারই নিজের কাজ। চামেলী আসা অবধি আমার কাজগুলি শুদ্ধ যেন সে এক একটা করে আমার হাত থেকে তুলে নিলে। কেউ বলেনি, কেউ দেখায় নি, সে আপনিই কখন কখন একবার একবার আমার কাজগুলো দেখতো, বুঝতো, মনে রাখত। তার পর আমার হাত থেকে এক একটা কাজ নিজের হাতে নিয়ে কত্ত, আর আমায় বলত "মাই, তুমি ছাড়, আমি কত্তে পারব, তুমি কেন করবে?" কাজগুলো তার হাতে আমার চেয়ে ভালই হোত। আর এই জন্যেই বোধ হয় সে আমার কাজ নিজেই কত্ত। এখন এমন কি খাবার বানান চা তৈরি কিছুই আমায় কত্তে হোতনা। উনি একদিন এই সব দেখে ঠাট্টা করে আমায় বলতেন, "আমার আফিসে এসিষ্টাণ্ট থাকে, আবার বাড়ীতেও দেখছি এক এসিষ্টাণ্ট।" আমি উত্তর দিতাম, "অর্থাৎ কি তোমার এসিষ্টাণ্ট সহধর্ম্মিণী? সে যে পুরুষ মানুষ গো।" সরকারী কাজ করে করে উনি একটু শুষ্ক, নীরস প্রকৃতির হয়ে পড়েছিলেন, তাই চামেলীর ভেতর তিনি তার কাজটুকুই কেবল দেখতে পেতেন, আমি কিন্তু কি যেন আরো অনেক দেখতাম। তার সেই ম্লান মুখখানা কোমল টুক টুকে হাত দুখানি, নীরব মধুরতা প্রাণস্পর্শী চাহনি, তাদের দেশের সেই পরিচ্ছদ, মাথায় ছোট পাগড়ী গোছের, সব গুলো মিলে যেন মনটাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী করেছিল তার সেই ম্লান মুখের মেঘে ঘেরা চোখের চাহনি, আর তার ভাঙ্গাভাঙ্গা কথা।

তাঁর মাঝে মাঝে খেয়াল উঠতো যে অমন সখের একটা ছোকরা চাকর ভাত মাইনে দিয়ে না পুষে, একটা ঝি রাখলে আমায় আগলান হয়। আমি বলতাম, "এমন পাহাড়ে জায়গায় দেশী ঝি আনতে একেত অনর্থক বেশী খরচ, তারপর সে আমায় আগলাবে, না, আমারই আগলাতে হবে তাকে? তারপর ঝি হলেত তোমার চলবে না, একটা পুরুষ মানুষ তোমার চাই-ই। আর ওই ছোকরা চাকরত কম খরচেই হচ্ছে।" "তার মনটা একটু খুঁতখুঁত কবত বটে, কিন্তু তাঁকেই পরাস্ত মানতে হত।

কিছু দিন পর বামুন ঠাকুর বাড়ী গেল, একটা নতুন খাঁটি বর্ব্বর পশ্চিমা জুটিয়ে দিয়ে। উনি এবার বল্লেন "একটা নতুন ঠাকুর, আর এই তোমার সখের চামেলী চাকর, এত' সুবিধা হচ্চে না! একটা ভাল রকম পুরো দস্তর বাঙ্গালী প্রবীন চাকর আনি, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।" এবার উনি ঝি এর কথা বাদ দিয়ে চাকরের ঝোঁকই ধরলেন। আরো, বল্লেন "ওসব সখের চাকর পুষে টুষে হবে না, একটা বয়েস ওয়ালা দেশী বাঙ্গালী চাই।" এবার সত্যি করেই আমার একটু বিরক্তি হলো। উত্তর না দিয়ে থাকতে পারিনি, "যদি অত চিন্তাই তোমার হয়ে থাকে আমার জন্ত, তবে তোমায় আফিস টাফিস সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, তুমিই আগলাওনা কেন আমায় দিন রাত বসে বসে? মানুষ সখ করে কুকুর বিড়াল পোষে, আমি

যদি সখ করে একটা চাকরই পুষি। বলছ সুবিধা হচ্ছে না, কি অসুবিধাটাই হচ্ছে বলতো? ওব দোষটা কি হয়েছে? এক নতুন জঙ্গলী ঠাকুর, তারপর এক নতুন চাকর আনলে গেরস্থালি তোমার কে চালাবে? তুমি পারবে আমি পারব না। তবে একটা কাজ কর, নতুন ঠাকুর, একটা নতুন চাকর আন আর একটা নতুন বিয়ে করে নিয়ে এসো আমার বদলে, বেশ ত্রয়োস্পর্শ যোগ হবে তোমার মনের মত।" আমাব এমন ভাব দেখে তিনি চুপ করেই থাকলেন, আর ও কথা তুললেন না। তার পব দেখি আস্তে আস্তে চামেলীব উপব তাঁরও একটু টান হচ্চে। যাক্, সেকথা।

আমি চামেলীকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পাত্তাম না। তার সেই মুখ খানা সব সময়েই আমার চোখের সামনে ভাসত। আহা তার সেই মেঘে ঢাকা চাঁদের মত মুখ খানি, সেই ফুলের মত পবিত্র মুখ খানি, তার সেই স্তব্ধ শেষরাতের মত মুখ খানি, আর তার সেই শান্ত নীল কানায় কানায় জলে ভরা পুকুরের মত চোক দুটি! মুখ খানা তার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ছিল, চোখ দুটি সর্ব্বদাই ছল ছল করত যেন মনের ভিতর কোনখানে একটা অস্ফুট কান্না রয়েছে। সত্যিই সে কখন কখন কাঁদতো। এক দিন দুপুরে তার ঘরে গিয়ে দেখি, চামেলী তেমনি পাগ বেঁধে তেমনি তাদের দেশী কাপড় চোপড় গায় দিয়ে খাটিয়ার ওপর এক পাশ ফিরে একটা হাত মাথার তলায় দিয়ে শুয়ে রয়েছে, চোখ দুটো জলে ছল ছল কচ্ছে। আমায় দরজার কাছে দেখে চোখ দুটো মুছে উঠে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "চামেলী কাঁদছিস?" কিন্তু কোন উত্তর দিল না। চোখ দুটো যেন তার আবার জলে ভরে উঠল, আমার মনটাও যেন কেমন হয়ে পড়ল, আমার চোখেও জল এলো। তাকে ডেকে নিয়ে এলাম বাঙ্গলায়, কত জিজ্ঞাসা কত কৌশল করলাম, কোনমতেই কিছু বের কত্তে পারলাম না।

একদিন দুপুর বেলায় বারান্দায় এক খানা ইজি চেয়ারে ব'সে চামেলীকে নিয়ে গল্প কচ্ছিলাম। দেখলাম তার মনটা একটু ভাল। জিজ্ঞাসা করলাম, "হাবে চামেলী, তুই মাইনেব টাকাত আজ পর্য্যন্ত নিলিনে?" চামেলী উত্তর দিল, 'মাই, টাকা আমি কি করব? থাক তোমাব কাছে।" আমার অনেক দিন অবধি একটা বড় ইচ্ছে ছিল জানতে, ওর আর কে আছে বিয়ে হয়েছে কি না, কোন খানে কত দূরে বাড়ী। আজ তাই একটু সুবিধা পেয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবলাম "তোব বাড়ীতে আর কে আছেরে?" চামেলী বল্লে, "আমার কেউ নেই, বাড়ী নেই আমি নিরাশ্রয়া। গরীবের কি বাড়ী কি কেউ থাকে মাই?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা চামেলী, বল দেখি সত্যি করে, তুই অমন কাঁদিস কেন মাঝে মাঝে?" সে উত্তর করলে, "মাই যখন মনে হয় আমার স্থান নেই এ পৃথিবীতে আশ্রয় নেই তখনই কাঁদি।" চামেলীর মুখ খানা আঁধার হয়ে এলো, চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো আমার ও দেখে কষ্ট হল। কিছুই আর জিজ্ঞাসা করা হোলনা।

চামেলীর মনের অতলে কি ছিল জানি না, কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছিলাম

যে তার হৃদয়টা একেবারে তুষারচাপা ঠাণ্ডা ছিল না। কোন দিন কিছু না বল্লেও, সে যে আমার ভালবাসা টুকু বুঝত, আমার স্নেহটুকু যে তার প্রাণের এক গুপ্ত স্থানে গিয়ে পৌছত তা আমি নিজের মন থেকেই বেশ বুঝতে পাত্তাম। সে যে আমায় একটু আপনার বলে মনে করত, তাতে সন্দেহ ছিল না।

সে দিন দুপুর বেলাতেও তেমন কন কনে শীত আব হাওয়া ছিল। তাই চামেলীকে সঙ্গে করে বাগানে গিয়ে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ফুল গাছ গুলির তত্ত্ব লওযা আর চামেলীব সঙ্গে গল্প করা, দুইই চলছিল। চামেলী ফুলগাছ গুলিরও খুব যত্ন করত, দেখে মনে হোত যেন ছোট ছোট ছেলে পিলে নিয়ে সোহাগ কচ্ছে, আর যত্ন কচ্ছে বাগানে কাজ করতে করতে চামেলী বল্লে, "মাই আমার মত আমার দেশের আর একটি চাকর রাখবে, আমার সঙ্গেই থাকবে তোমাদের কাজ করবে, মাহিনা দিতে হবে না?" আমি বল্লাম "না, বাছা, আর কাজ নেই, এক তোমাকে নিয়েই ঢের শুনতে হয়েছিল।" কিন্তু তখনি আমাব মনে হল, আর একজন পেলে বোধ হয় চামেলী একটু মিলে মিশে সুখে থাকত। চামেলীর মুখ খানার দিকে তাকিয়ে যেন আমার মনটা আরো বসে গেল। ওর নিরাশ্রয়তার ভাব, সেদিনকার চোখের জল, সে দিনের কথা "নিরাশ্রয়" সব আমার মনে এসে মনটাকে বড় বিষন্ন করে দিল, ভাবলাম ওর প্রস্তাব শোনা সম্ভব কি না। ওকে একটু সুখী করার চেষ্টা করা যায় কি না। কিন্তু অনেক ভেবেও দেখলাম, হয় না। ও কথা ওঁকে বল্লে, উনি কিছুতেই শুনবেন না, আর অনর্থক আমাকেও লাঞ্ছিত হতে হবে। ও কথা আর তাঁর কাছে তোলাই হয়নি। আমার মনে একটু ধিক্কার এলো, সংসারে এসে একটা লোককে একটু সুখী করবারও ক্ষমতা নেই। তাবলে আমার অপরাধও নেই, আমি যে পরাধীন। অবশ্য দুঃখ আছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রস্তাব করা বা কথা কওয়া চামেলীর ওই প্রথম দেখেছিলাম। আর ওই শেষ। আমার মনের কষ্ট সেই জন্য আরও বেশী হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চামেলীর সেই শান্ত উদার, মেঘেঢাকা মুখ খানি স্বভাবতঃ যেমন থাকত, তেমনেই ছিল। জানিনা সে কি ভেবে ছিল, সে আমায় ক্ষমা করেছিল কিনা! সে আদৌ কিছু ভেবে ছিল কিনা! তার কাজ তেমনিই করত, যেমন ভাব তেমনিই ছিল, আমি তার যেমন "মাই" তেমনিই ছিলাম।

আমাদের নতুন ঠাকুরটা তেমন সুবিধার ছিলনা। হাট বাজারে যাওয়া, জিনিষপত্র আনার কাজ চামেলীর কিছু বেড়ে পড়ল।

বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসে এক খানা নভেল পড়ছিলাম। ক্লকটার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে। এখনও দুঘণ্টা, তবে পাঁচটা বাজবে; তিনি আসবেন! এই দিনের কয়েক ঘণ্টা বিরহের পর, এই মিলনের জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ত। আমার যৌবন অনেক দিন পার হয়ে গিয়ে ছিল. কিন্তু মিলনের আকুলতা বিয়ের পর থেকে সমানই ছিল। আমার ছিলেপিলে হয়নি, তাই বোধহয় আমার অমন ভাব ছিল। ছেলেপিলে হলে বোধ হয় মনটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। কি হয় জানিনা, যার হয়েছে, সেই জানে। আমার কাছে কিন্তু সেই

পাঁচটার মিলনের সুখের এক কণাও কখন নষ্ট হয়নি বিয়ের পর থেকে। কুড়িবছর আগে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর বুকের উপর মাথা রেখে যে আশ্রয়, যে সুখ, যে শান্তি পেয়েছিলাম, আজও ঠিকতা তেমনিই পাই। এই বোধ হয় নারী জন্মের সার্থকতা; সফলতা। এসুখ থেকে যারা বঞ্চিতা তাদের কি আছে জগতে? তাদের সব সুখেই ছাই। এ মিলনের আশা যাদের ছাই হয়ে গিয়েছে, তাদের কি আছে? কোন সুখে তাদের সুখ? কোন আশায় তাদের জীবন ধারণ? ওঃ— দুঘণ্টা, এখনো দুঘণ্টা তার পর তিনি আসবেন। এসে বসবেন, চামেলী কাপড় চোপড় জুতো ছাড়িয়ে দেবে, তার পর হাত পা ধুইয়ে দেবে, তারপর খাবার চা এনে দেবে চা খেয়ে পাইপ ধরিয়ে আমায় নিয়ে বারান্দায় বসবেন। পাইপ টুকু শুদ্ধ তৈরি রেখেছি আমি।—দুঘণ্টা—এখনও দুঘণ্টা!

চামেলী এলো, বল্লে "যাই চিনি আনতে যাই"। আমি বল্লাম, "আচ্ছা যাও"। চামেলী বারান্দা থেকে নেমে গেটের কাছে গিয়েছে, এমন সময় চামেলীকে আমি হটাৎ আবার ডেকে ফেল্লাম। চামেলী এলো। আজ সারা দুপুর বই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম চামেলীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। এখন চামেলীকে দেখে বই টই কোথায় চলে গেল! কেবল চামেলীকেই ভাল লাগল। তার মুখ খানা আর একবার দেখবার জন্তেই তাকে ডেকে ছিলাম সেই মেঘে ঢাকা মুখ খানি। চামেলী এসে জিজ্ঞেস কল্লে, "আর কিছু কি আনতে হবে?" আমি বল্লাম "না কিছু না, কেবল তোকে দেখবার জন্তেই ডেকেছি। তুই বলতে পারিস, চামেলী তোর মুখখানা দেখতে আমার এত ইচ্ছে যায় কেন? এত ভাললাগে কেন? কি লুকোনো রয়েছে রে তোর মুখে?" চামেলী আমার দিকে পিছন দিয়ে গেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, যেন যাবার জন্তে প্রস্তুত। আমি বল্লাম, "যা দোকানে"। কিন্তু আবার আমার ইচ্ছে হোল, যে ওকে আবার ডাকি।—যেতে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, যাই ওর সঙ্গে ওর পেছনে পেছনে।

আমি বারান্দায় একটু পাইচারি করতে আরম্ভ করলাম। কেমন যেন একটা একা একা ঠেকতে লাগল, যেন একটা শূন্যতা এসে আমায় ঘিরে ফেল্লে। বারান্দা থেকে ভেতরে এসে এঘর ওঘর করতে আরম্ভ করলাম। ওঃ এখনও যে আমার পাঁচটা হতে অনেক দেরী,—দেড় ঘণ্টা!

কৈ, চামেলী ত এখনও ফিরলনা? সে যে অনেকক্ষণ গিয়েছে। সাড়ে তিনটে, তার পর চারটে, তাও চামেলী ফিরলনা। ওত কোথাও গিয়ে বসে থাকবার ছেলে নয়!

সাড়ে চারটে, তাও চামেলী ফিরল না। আমার একটু বিরক্তি এলো। ওঁর আসবার সময় প্রায় হয়ে এলো, চামেলী কখন এসে কখন কি করবে? মুখ ধোয়ার জল, চার জল, খাবার তৈরি, এসব হবে কখন? উনিত এসে পড়বেন।

তবুও দেরী হচ্ছে দেখে, দুটো ষ্টোভ জেলে, একটাতে মুখ ধোয়ার জল চরিয়ে দিয়ে, আর একটায় খানিকটা পাঁউরুটি টোষ্ট করে, খানিকটা সুজি তৈরি করলাম। তারপর চার জল বসিয়ে দিলাম। কি আশ্চার্য্য, তবু চামেলী ফিরল না! কৈ, সে ঠাকুরটাও ত এখনো আজ এলো না, পাঁচটাত প্রায় হয়ে এলো!

অন্ধকার হয়ে আসচে, কারুর দেখা নাই!

দরজা জানালা গুলি বন্ধ করে বাইরে এসে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। মনে হল অন্ধকার ত হয়ে এলোই, আলো গুলি জ্বেলে ফেলি। গিয়ে দেখি বাতিগুলো পরিষ্কার করে তেল টেল ভরে রেখেই চামেলী গিয়েছে—আমার মাত্র জ্বেলে নিতে হল। বাতিগুলো সব ঠিক জায়গায় দিয়ে ষ্টোভ দুটো কমিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাঁর বসবার ঘরে এসে বসলাম।

সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল। কি জ্বালা উনিও যে আজ এখনও এলেন না। আমার যেন কেমন কেমন বোধ হতে লাগল, এমন ত কোন দিনই হয় নি। আমার যেন একটু ভয় ভয় ঠেকতে লাগল! সে হত-ভাগা বামুনটাও যে আসচে না।

ওমা, এ যে ছটা বেজে গেল। কারুর ত দেখা নেই। এমন করে অন্ধকার রাতে একাই বা আর কতক্ষণ থাকি? উনি ও যে এলেন না? আফিসে ত এত দেরী কখনও হয় না। কারুর যে কোন খবরই নেই। কি মুস্কিল! কাকে দিয়েই বা খবর নি?

আমার জন্তে নাকি উনি চিন্তিত হন —তার একেই বলে চিন্তা। পুরুষ মানুষের ধরণই ওই। তাঁদের মুখখানিই সর্ব্বস্ব!

রাত্তির আটটা। বসবার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দেখি, উঃ কি নিস্তব্ধ সব! কি কুয়াসা! কি অন্ধকার! আমার গা ছম ছম করে উঠল, আর বাইরের দিকে চাইতে পারলাম না। সব দরজা জানালা বন্ধ করে, আলো গুলো ভাল করে বাড়িয়ে দিয়ে, শোবার ঘরে চলে এলাম। আজ সবারই কি হল? সে সয়তান ঠাকুরটাই বা কি কচ্ছে? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়টাও প্রবল হয়ে উঠল, বড়ই অসহায় বলে মনে হতে লাগল, আমার কান্না এলো। এমন কেউ নেই, যাকে পাঠাই।

বিছানায় এসে ধপাস করে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার বুকের ভেতরটা ধরাস ধরাস কত্তে লাগল। আমার কাণ দুটো কেবল দরজার দিকে। একটু শব্দ কাণে গেলেই মনে হয় ওই বুঝি উনি এলেন, ওই বুঝি ঠাকুর এলো, ওই বুঝি চামেলী; মিছে শব্দ। কৈ, না, কেউ না ত। আমার গুমরিয়ে গুমরিয়ে কান্না এলো।

বসবার ঘরের দরজায় হঠাৎ একটা ঘা পড়ল। থর থর করে আমার শরীর কেঁপে উঠল। তারপর আবার একটা ঘা, তারপর শুনলাম "আমি।" যাক, উনি এসেছেন। আমার বুকের দপদপানি তখনও কমে নি। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। আমি বলতে যাচ্ছিলাম "এমনি বলেই ডাকতে হয়' কিন্তু বলবার আগেই ঘরে ঢুকে উনি বল্লেন, "শুনেছ? চামেলীর কথা?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম "চামেলীর কি কথা হয়েছে?"

"চামেলী পুরুষ নয়, মেয়ে?"

"সে কি।"

"হাঁ শোন ত। বড় দুর্ঘটনা।'

"কি আশ্চর্য্য। হয়েছে কি?"

"শোন, শোন, সবই বলছি। অতি অল্প দিন হোল ওর বিয়ে হয়ে ছিল। দুজনাই পরস্পরকে ভাল বেসেছিল, তার পর বিয়ে। কিন্তু চামেলীকে আর একটা লোকও ভাল বাসত, চামেলী তাকে ভাল বাসেনি, তাই চামেলীর সঙ্গে তার বিয়েও হয়নি। চামেলীর বিয়ের পর থেকেই সেই লোকটার

ভয়ঙ্কর রাগ ছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে ঘুরে বেড়াত। এরা তাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে নিরাপদ হবার জন্যে এখানে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকত। সে ব্যাটা না সন্ধান পেয়ে এসে সুবিধে বুঝে, আজ চামেলীর স্বামীটাকে খুন করেছে। উঃ কি ভয়ানক ঘটনা, কি ভয়ানক দৃশ্য! স্বামীটা বোধ হয় এতক্ষণ নেই।"

"তুমি শুনলে কোথায়?"

"সে ব্যাটা খুন করে এসে নিজেই আমায় বলেছে সব। পুলিশ গিয়ে সন্ধান করে লাশটাকে নিয়ে এসেছে, আহা বোধ হয় আর নেই। চামেলীও সেখানে কিছুতেই এলো না। ঠাকুরকে রেখে এসেছি দেখে আসবার জন্যে। চামেলী, আমায় বল্লে বাবু আর তোমার বাঙ্গলায় যাব না।" উঃ কি কাণ্ড!

"চামেলী সেখানে গেল কি করে? তাকে কেমন দেখলে?

"সে বুঝি বাজারে গিয়েছিল। থানার কাছে ভিড় আর গোলমাল দেখে তার কেমন সন্দেহ হয়, গিয়ে দেখে ওই। তোমার চিনির পয়সা কটা আমায় দিয়ে বল্লে "মাইকে দিও।" কি আশ্চর্য্য! চামেলীর মুখখানা ঠিক তেমনিই দেখলাম। একই ভাব। কেবল মাথার পাগ, পুরুষের বেশ নাই।

আমার আর কথা বেরুল না। একটা একটা করে তার সব মনে হোলো, সব অর্থ ই এখন বুঝলাম। আমার মনে তেমনি এক ধিক্কার আর গ্লানি এলো। মনে হোলো নিরাশ্রয়ত আমিই করেছি। তার এ পরিণামের মূলে আমিই। যদি তার আর একটা চাকর আনার প্রস্তাবটা শুনতাম! এ দুঃখ রাখবার আমার স্থান কই? সে কি আমার জন্যই নিরাশ্রয়া হয়ে চির বিরহিনী?

ঘোষক

[শ্রীগোবিন্দ লাল মৈত্র]

স্বাস্থ্য সে ডাকিয়া কহে—"ব্যাধি দূরাচার!
কোন্ অপরাধে দেহে ঘটাস বিকার?
পর সুখে চিত্ত তোর কেন পোড়ে দুখে
হানিস ব্যথার কাঁটা মানবের বুকে?
ব্যাধি কহে" নর যবে ধরণীর ধ্যানে,
মত্তরহে আত্ম সুখে ভুলি ভগবানে,
আমি সে ঘোষণা করি হ'লো দিন শেষ,
তরিবারে ভব নদী ডাক পরমেশ।

ভোগের অনাচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়]

যে পরিমাণে লোকের মজুরী বাড়িতেছে তাহার তুলনায় খাদ্যদ্রব্য অধিক দুর্মূল্য হইতেছে। সাধারণতঃ মনে হয় খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় তাহার বিপরীত হইতেছে। সমাজে ভোগের স্পৃহাই এই অঘটন ঘটাইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্যে ভোগস্পৃহা মিটাইবার ব্যবস্থাতেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে তবে তাহাদিগকে খাটাইয়া চাষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে গরু-গুলিকে অল্পাহারে কদর্য্য অবস্থায় রাখিয়াও চালাইতে পারে, যতদিন না তাহার ফসল কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে। দেশের শতকরা দশজন লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, আর নব্বই জন গরু। তাহারা খাটিতেছে কিন্তু অনাহারে কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ রাখিয়াছে। আর নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে।

দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য রপ্তানী করিয়া অনাবশ্যকীয় বিদেশী মাল আমদানী করিয়া শেয়ারের জুয়া খেলিয়া, পাট তুলা বস্ত্র শস্যাদি পণ্য একচেটিয়া (কর্ণার) করিয়া পীড়াদায়ক সর্ত্তে ও সুদে টাকা খাটাইয়া অস্বাভাবিক ও অধর্ম্মোচিত উপায়ে আমরা অর্থ একদিকে পুঞ্জীভূত করিয়া ফেলিতেছি। ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের অন্যায় মনে হইতেছে না। আর সেই পুঞ্জীভূত অর্থ এমন সকল ভোগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহা দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। সহরের অনেক লোকের হাতে হাতে একটা রিষ্ট্ ওয়াচ্ দেখা যাইবে, এই অনাবশ্যক আভরণ দুই মণ চাউলের মূল্যে পাওয়া যায়। চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার দুইমণের বিনিময়ে এমন সূক্ষ্মকারুকার্য্যকরা দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে! বিলাতী সৌখীন ও অনাবশ্যক পণ্য যত দিন আমাদের ঊর্দ্ধতন সমাজে ব্যবহার হইবে তত দিনিই শতকরা নব্বই জন দেশবাসী, যাহারা কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইবে। কোন কঠিন শ্রমেই তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে না। যদি কৃষকের গরু গুলি বলে যে আমরা না খাইতে পাইলে কাজ করিব না, গুঁতাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের বাঁচিবার পথ হয়। কিন্তু কৃষকের সঙ্গে লড়াই করা দুইটি মাত্র শিং সম্বল লইয়া গরুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, আমাদের শতকরা

নব্বই জনেরও ধনী সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই করা তেমনই অসম্ভব। ধনীর হাতে নিজের গড়া আইন আছে। আর ধনীরা পরস্পর লড়াই করিয়া ও-বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া আছে। সাধ্য কি যে নির্ধন-সমাজ ভয় দেখাইয়া কিছু করে। তবে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বিপ্লব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস হইবে। এ অবস্থায় দেশের কর্ত্তব্য নব্বইয়ের দিকে দেখা, যাহাতে তাহারা খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা কর, অর্থাৎ বিদেশী ভোগের অনাচার ত্যাগ করা।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

'On the whole it may be said a rise in prices tends to emphasize the economic differences throughout the rura population of India, those who are well to do becoming more well to do, those who are poor becoming poorer."—India in 1920, Page 134

"জিনিষের মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকের আর্থিক অবস্থার অসমতা বাড়াইয়া দেয়। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা আরও ধনী হয়, আর যাহারা দরিদ্র তাহারা আরও দরিদ্র হয়।"

অন্য দিক চড়ার জন্য সেটেল্‌মেণ্টের [illegible] খাজনা বাড়ান হয় যাহাতে দরিদ্র [illegible] ও পীড়িত হয়। এইসকল কারণে ভারতবাসী শতকরা নব্বই জন গ্রাম্যলোক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শতকরা দশজনের [illegible] ক্রীত [illegible] মজুর

হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ত পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক আছে, কোথাও কোথাও আবার সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কয়েক জায়গায় এই কথাটি কৃষক মহাজনকে বলিতেছে যে "আমি গরু চরাই, আপনি মনুষ্য চরান।" কথাটা কতদূর কল্পিত তাহা গ্রন্থকার বলিতে পারেন, কিন্তু সরকারী বিবরণে এই অবস্থাটির অস্তিত্ব নির্ম্মম ভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

"সারা ভারতবর্ষেরই চাষার অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তাহারা এত দরিদ্র, এত অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না। তাহারা অজ্ঞ ও অসমর্থ বলিয়া তাহাদের অপেক্ষা একটু সঙ্গতিপন্ন লোকের পীড়ন সহ্য করিয়া থাকে। গত বৎসরের ছোটনাগপুরের সেটেল্‌মেণ্টের বিবরণে জানা যায় যে তথাকার কৃষক মজুরেরা কষ্টে পড়িয়া সময় সময় নিজের স্বাধীনতা বন্ধক রাখিয়া দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সামান্য মাত্র সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে না পারিয়া তাহারা এই সর্ত্তে ধার করিতে বাধ্য হয় যে গায় খাটিয়া ঐ টাকা শোধ দিবে। নিয়ম এমন, যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে সে বাৎসরিক দুই হইতে চারি টাকা পাইবে এবং বৎসরে দুইখানা কাপড় পাইবে। তাহার মহাজনই তাহার শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী। এই রকম ঋণ সন্তানাদিতে বর্ত্তে এবং তাহারাও ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সর্ত্তে বাঁধা থাকে। যদিও দাসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন বিরুদ্ধ, তথাপি এই প্রকারে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে দাসত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্পরাকে সেই দাসত্ব দিয়া যাইতেছে।"

* * * The general condition of the peasantry up and down the country can only be described by saying that the average cultivator is poor and helpless to a degree to which Europe can afford little parallel. Ignorant and without resources he is always liable to be oppressed by those richer and more influential than himself. Mention was made in last year's report of certain settlement operations in Chotanagpur which have disclosed the fact that agricultural labourers in that region are not infrequently compelled in time of stress to mortgage their personal liberty. In return for a small sum of money which they happen to need at the moment, they agree to serve the individual from whom they borrowed. The rule is that a man who has so bound himself gets from two to four rupees a year as pocket money and two pieces of cloths. His labour belongs to his creditor. The debt extends to the children, who remain bound till it has been discharged. There are therefore in Chotanagpur people who have inherited servitude and who in turn have passed it on to their children although slavery has long been illegal in India."—India in 1920, page 159. *The Indian peasant.*

এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব। ইহা ছোটনাগপুরেই বদ্ধ নহে। বাংলা বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের পল্লীজীবন অনুসন্ধান করিলে কোন না কোন প্রকারে এই অবস্থা বিদ্যমান দেখা যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ দাসত্ব করে তাহারা ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে ঊর্দ্ধতন শতকরা দশজনের সমাজের দাসত্ব করিতেছে। বাহ্যিক আবরণ ঠিক আছে বলিয়া এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ এই দাসত্বের ফল গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া এই দশ জনার নব্বইজনাকে দাস ভাবে ব্যবহার করার কদর্য্যতা ও দোষ চোখের আড়াল আছে। ক্ষেতে যতই শস্য হউক, কৃষক যতই খাটুক, তাহার শ্রমফল টানিয়া লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম আছে। মহাজনের ঋণের সুদে, বর্দ্ধিত খাজনায় ও ট্যাক্সে, কাপড় নুন-তেলের চড়া দামে সে শ্রমের ফল তাহার হাত ছাড়া হইয়া, তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব হইবেই।

কৃষকের শ্রমলব্ধ ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া তাহা যে প্রকারে ব্যয় হয় তাহাতে তাহা আর ঐ নব্বইএর মধ্যে ফিরিয়া যায় না। বড় লোকেরা বেশী ইন্‌কম ট্যাক্স দিতেছেন, তাহাতে সরকারের আয় বাড়িতেছে। কিন্তু সরকারের আয়ের সামান্য অংশই লোকহিতে ফিরিয়া আইসে। সরকার এই দরিদ্র দেশকে, চাষীর দেশকে শাসন করিতে আর সামরিক ঠাট বজায় রাখিতে এত ব্যয় করেন যে আর বিশেষ কিছু লোকহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য থাকে না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ অর্থ রকমবেরকমে বিলাতে চলিয়া যায়। ওদিকে আবার অর্থ ধনীর ঘরে আসিয়াই বিলাতী ভোগের বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে বিলাতে

চলিয়া যায়। কাগজ-পেন্‌সিলে, রিষ্ট‌ওয়াচে, মোটরকার-সাইকেলে, কাপড়ে, সুতায়, রঙে, চিনিতে তাহা দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে। বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজের খোল ভরিয়া কি যাইতেছে, আর তাহার খোল খালি করিয়া কি দ্রব্য উদ্গিরণ করিয়া যাইতেছে।

আমাদের ভোগলিপ্সার "প্রেতই" কৃষকের সোনার ক্ষেত শুষিয়া লইতেছে। বিদ্যাচর্চ্চায় জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্তু সেই বিদ্যা যে-পরিমাণে মানুষে মানুষে অসমতা সৃষ্টি করিতেছে সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই হয় যে এক দেশ আর-এক দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেদেশের লোককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দাসবৎ ব্যবহার করিবে, যদি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা মানুষের সমাজ জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে এই হয় যে কে কাহার অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে পারে সেই পথে সমাজের অধিকাংশ লোক চেষ্টা করিতেছে, তবে ধিক্ সে বিদ্যাচর্চ্চায়, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে। আলো বাতাস আর নদীর জল যেমন সাধারণ সম্পত্তি কাহাকেও মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মানুষের সাধারণ সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত আবশ্যক। মানুষ সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হইবার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, উন্নতির যুগে সমাজ ত ইহাই মানিয়া লইতে পারে। সহজ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, অল্প পরিশ্রমে প্রভূত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাষ্প বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া যে সুবিধা সমাজের হইয়াছে, তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণের ব্যবহারে আনাই ত মানুষের কাজ। কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত সুবিধাই ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় নিয়োজিত হইতেছে। আমাদের দরিদ্রের দেশে আমরা জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতসারে ভোগের পথে পা দিয়া কেবল দরিদ্রকে তাহার বাঁচিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চয়-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছি।

হিন্দুগণ তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ তাঁহাদের নমাজে যে সৎকথা প্রত্যহই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সে গুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার কথঞ্চিৎও আচরিত হইলে ভোগলিপ্সা কমিয়া আসিবে অর্থোপার্জ্জন করাই কাম্য না করিয়া সদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া লোকহিতে অর্থব্যয় করাই কাম্য বলিয়া গৃহীত হউক।

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সাময়িক প্রয়োজনে সকলকেই চর্‌কা কাটিয়া খাদি পরিয়া গৃহে গৃহে সুতা তৈয়ারীর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। তাহাতে নিতান্ত দৈন্যে পীড়িত নরনারীর আপাততঃ অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরো বড় কাজ এই হইবে, যে, চর্‌কায় কায়িক শ্রম করিয়া দশজনের নরহজনকে দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। চর্‌কা ও খাদি সেই মনোবৃত্তির অনুশীলনে সমাজকে পাপ-নির্মুক্ত ও নির্ম্মল করিবে, পবিত্র করিবে। সেই পথেই স্বরাজের শুভাগমন হইবে

কোনও সম্প্রদায়ে উৎসবে, শোক ও উপাসনায় এই সুন্দর মন্ত্রটি কতবার উচ্চারিত হইয়া থাকে—

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়;
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেমন মাং পাহি নিত্যং।

যদি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয়; বিদেশী জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমরা দেশে অভাব ও দারিদ্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমরা বুঝিতে পারি তবে অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বিদেশী বস্ত্র আপনি খসিয়া পড়ে, বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত মনে হয় এবং যে ভোগের প্রেত দেশকে শ্মশান করিতেছে সে প্রেত আলোকের আগমনে অন্ধকারের ন্যায় তৎ ক্ষণাৎ সমাজ হইতে প্রস্থান করে।

"না জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

চরিবা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

সাজসজ্জা আসবাব্ ধনরাশির স্তূপ প্রভৃতি উপকরণে পীড়িত হওয়াই কি জীবনের চরম লক্ষ্য ? বিলাসের তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হইয়া ভুলিয়া যাই কোনদিকে বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় নিজেকে আহুতি দিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি। উদভ্রান্ত মনকে সুস্থির রাখিতে পারি না। হায়! যে ভারতে অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রমণী কণ্ঠ হইতে বজ্র গম্ভীর নিনাদ উঠিয়াছিল "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম," আজ কোন্ পথে সেই ভারত ধাবিত হইতেছে! প্রবাসী।

মাসিককাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

মিলন। শ্রাবন।

কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহার সনেট সম্বন্ধে আলোচনাটি সুন্দর হইয়াছে। লেখক জয়দেবের উপর চারিজন কবির চারটি ভিন্ন ভিন্ন সনেট এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ১। মাইকেল মধুসূদন, ২। স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র, ৩। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ৪ শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় জয়দেবের ন্যায় ললিত ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গি ও তরঙ্গায়িত সঙ্গীত মাধুর্য্যের রস প্রস্রবন বিলাসকলা কুতূহলী কবির উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি কঠিন বন্ধন-বদ্ধিত নিস্তরঙ্গ সনেট। যাঁহারা জয়দেবের মধুর কান্ত পদাবলী ভাল বাসেন তাঁহারা চটুল লীলাময় মধুর কান্ত ছন্দে তাঁহার অর্চ্চনা না করিয়া সনেটের অষ্টকে ষষ্টকের কঠোর উপচারে অর্চ্চনা করিয়াছেন কেন বোঝা যায় না।

মিলন মঙ্গল—শ্রীপরিমল কুমার। সুরচিত—রচনায় বেশ লালিত্য আছে।

প্রার্থনা। শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক। কবিতার অধিকাংশ পংক্তিই সুললিত ও সুরচিত।

"মোরা পূর্ণ করিনে ব্রতযাগ—
শুধু শঙ্খে বিদারি ব্যোম।"
"মোরা—নিভিয়া আসিছে হোমানল
কই, কোথাসে কঠিন পণ
সেই—যোগের আসন দৃঢ় কই?
কই, শুদ্ধ শান্ত মন।
মোরা, নির্ব্বোধ ভীরু খেয়ালী
শুধু—দিবসে জ্বালাই দেয়ালী
সেই—গৌরবময় গৈরিক কই
কোথা সে রুদ্র চীর।

হৃদয়রাজ। শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ১ম পংক্তি—"সারা সকালের মহাসাধনের সিদ্ধি"। যুগ যুগান্তরের জন্ম জন্মান্তরের অন্ততঃ বহুবৎসরের মহাসাধনার কথাই আমাদের পরিচিত ছিল। কবি লিখেছেন—সারা সকাল বেলার মহাসাধন। বাকী পংক্তি গুলি রসহীন বিশেষত্ব শূন্য।

ভূষণ—না—দূষণ। কবিতাটি মুদ্রাকর কৃত প্রমাদেই পূর্ণ—আলোচনা আর কি করিব? ১ম অন্তরায় একটী লাইন কম্পোজে বাদ পড়েছে। তৃতীয় পংক্তিতে ঐরূপ প্রমাদের জন্য ছন্দঃ পতন হয়েছে। ২য় অন্তরাতে 'ঘ' এর স্থলে 'ব' ছাপ হয়ে অপূর্ব্ব অর্থ ও অনর্থ ঘটায়েছে। একটী শব্দের বদলে মুদ্রাকৃত প্রমাদে যদি অর্থযুক্ত অন্য একটি শব্দ ছাপা হয় তাহা হইলেই মহাপ্রমাদ উপস্থিত হয়। অর্থহীন শব্দ ছাপা হলে পাঠক শব্দটা ঠিক করে নিতে পারে। শুধু মাছি মারা কেরাণী হইলে সম্পাদকের ঠিক সম্পাদকত্ব করা হয় না। ছন্দ ভাবা যতি সম্বন্ধে সম্পাদকের কতকটা জ্ঞান থাকা চাই।

কবিতার বিষয়টিতে নূতনত্ব কিছুই নাই বৈষ্ণব কবিদের এরূপ ভাবের কবিতা যথেষ্ট আছে। এই কবিরও যেন এ ভাবের কবিতা আরো পড়েছি। অন্যের অনুকরণ বা অনুসরণ ততটা দৈন্য প্রকাশ করে না যতটা কবির নিজের অনুকরণে প্রকাশ পায়।

কবি যখন নিজে' অনুকরণ নিজেই কবিতে থাকেন অথবা নিজেবই বচনার পুনবাবৃত্তি কবিতে থাকেন তখন বুঝিতে হবে কবিব কিছু কাল বিশ্রাম কবার সময় এসেছে। জানিনা এ কবিতা কবির কোন সময়ে লেখা—মাসিকপত্রে যখনই প্রকাশ হবে সেই সময়ই যে সে কবিতা বচিত হযেছে একথা ঠিক নয়।

পতিতা। শ্রীবসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায়। কবিতার বচনা আড়ষ্ট—ভাব সর্ব্বত্র ফোটে নাই। অস্পষ্ট ও কষ্টাকৃত। ভাষা এলো মেলো কষ্টজল্পিত। কবিব যা বলবাব ছিল ভাষার পঙ্গুতার জন্য তা বলা হয় নাই।

পল্লীশ্রী। ভাদ্র।

পল্লীশ্রী। কুমুদবঞ্জন মল্লিক। মিলনের 'ভূষণ না দূষণ' কবিতা সম্বন্ধে শেষাংশে যাহা বলা হয়েছে এ কবিতা সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। আবাহন। উল্লেখযোগ্য নয়।

পল্লীস্পন্দন। শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। জাপানী ঢঙের ১১টা কবিতা (৪ লাইনের) প্রত্যেকটাতে ২।১ লাইন সুরচিত ও কতকটা বিষয়োপযোগী। বাকী গুলি টেনে বোনা ও বিশেষত্ব শূন্য। ১। পল্লী—ব্যর্থ ২। চাষীর ছেলে—প্রায় ব্যর্থ ৩। গ্রাম্য কবিরাজ—তৃতীয় পংক্তিটা মন্দ নয়।

৪। ধনীর প্যাদা—শেষ ২ লাইন মন্দ নয়।

৫। তহশীল কাছারী—শেষ ২ লাইন।

৬। ধনীর বৈঠকখানা—শেষ ২ লাইন।

৭। হিন্দুবাড়ী—ব্যর্থ। "শিশুর মুখে পাকা কথা"—বাড়াবাড়ি।

৮। মুসলমানবাড়ী—শেষ ২ লাইন ভাল।

৯। বিবাহবাড়ী—বেশ হয়েছে।

১০। নববধূ—কতকটা ব্যর্থ।

১১। বৈষ্ণবগৃহস্থ—মন্দ নয়।

মোটের উপর এ শ্রেণীর শ্লোকগুলি যতীন্দ্র বাবুর হাতে তেমন জমে নাই।

গান। শ্রীপ্রমথ নাথ সান্যাল। শেষ কলিটি মন্দ হয় নাই। গোটা গানটিতে বেশ আন্তরিকতা আছে।

পেটেরদায়। শ্রীকালিদাস রায়। সেই পুরাণো কথা—যা সরস্বতীর যে সেবা করবে সেই দরিদ্র হবে। কবি নূতন ঢঙে বলেছেন। কবিব পেটেব জ্বালাটা কবিতায় বেশ ফুটেছে। কবি যখন সাবস্বত সেবা স্বেচ্ছায় বরণ কবেছেন তখনই দৈন্যকেও স্বেচ্ছায় বরণ কবেছেন এখন আব পেটেব ভাত জোটেনা বলে লাভ কি?

বাদলবাতে। শ্রীযুক্ত সবোজ কুমার সেন—মামুলী বুলি তবে মিষ্টি করে লেখা।

বায লেখা। শ্রীমন্মথ কুমাব রায়। বহুদিন পবে রামপ্রসাদী ঢঙেব একটী কবিতা পেলাম। এ ভঙ্গি আমাদের চির প্রিয় বাংলামাটীব নিজস্ব। গানটী আমাদের ভাল লেগেছে।

বাসন্তী। ২য় সপ্তাহ ভাদ্র।

বাসন্তী আবার নূতন আকারে ছবি গল্প কবিতায় শোভিত হইয়া বাহির হইতেছে। আশাকরি পরিচালকবর্গের যত্নে এই সাপ্তাহিক খানি অচিরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করিবে।

স্বরূপ। লীলাদেবী। তেমন সুরচিত নয়। মিনতি। শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ। Heine হইতে। অনুবাদ বেশ সুন্দর হয়েছে।

পরিচারিকা। ভাদ্র।

আত্মার প্রতি। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। Whitman হইতে চলনসই অনুবাদ।

স্পর্শ। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। স্পর্শে রোমাঞ্চ নাই। কর্কশহাতের স্পর্শ নয় সত্য কিন্তু "তড়িৎ লহরী"ও ঠিক ছোটে না।

প্রলয়ের গান। শ্রীধর শ্যামল। কবি আত্যভিমানীদের দূরে সরে' দাঁড়াতে বলেছেন অস্পৃশ্যদের বাহুপাশে আহ্বান করেছেন এটা বেশ বুঝলাম কিন্তু এত বেশী চীৎকার তর্জ্জন গর্জ্জন হুঙ্কার কেন?

কবির গান। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় Tennyson হইতে অনুদিত। অনুবাদ মন্দ হয় নাই। আর একটী অনুবাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ কিংবা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের পড়েছিলাম, সেটি আরো সুন্দর লেগেছিল।
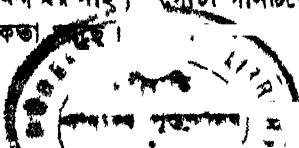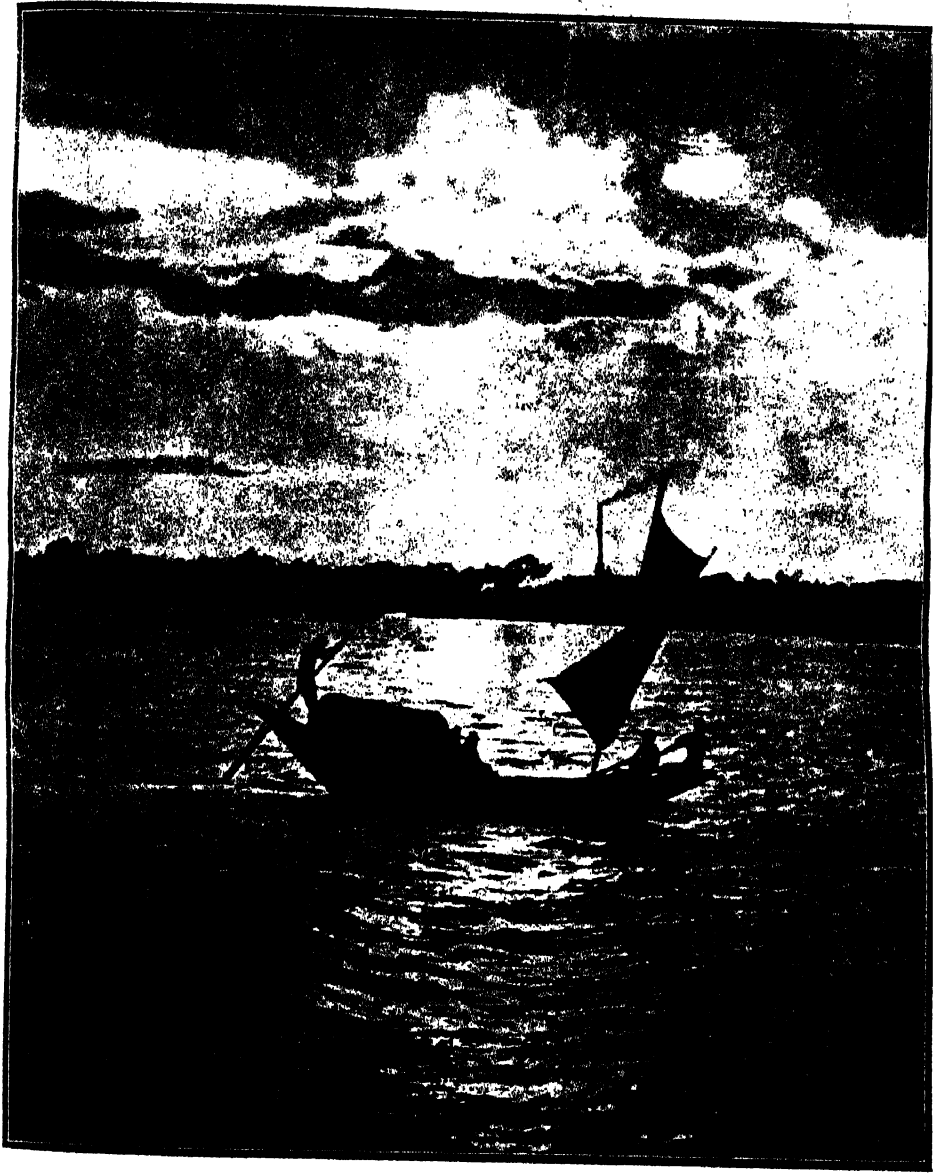
আকাশ আজি ভরিয়া গেছে সায়ন ঘন জলদে
চকিত চোখে চপলা চলে চমকি,
তরণী বেয়ে চলেছে নেয়ে অসীম স্রোতে ভাসিয়া
কূলের পানে ফিরিয়া চায় থমকি !

Lakshmibilas Press, Calcutta.

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩২৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নব-আগমনী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আজি ঝর ঝর ঝর ঝরে
উষ্ণ মাতৃ-বক্ষ-শোণিত মথিত ধরণী পরে।
তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র আঘাতে
আপন মুণ্ড ছেদি নিজ হাতে
পিপাসিনী মাতা ছিন্নমস্তা এ কোন্ সাধনা করে।
নাচিছে চণ্ডী তাথৈ তাথৈ
কোথা বরাভয় মাভৈঃ মাভৈঃ
জেগেছে দৈত্য এ মহাশ্মশানে সত্য বিনাশ তরে।
একি এ ধ্বংশ, একি এ সৃষ্টি
আকাশ করিছে রুধির বৃষ্টি
সূর্য্য ছড়ায় আগুণের ফুল প্রলয়-ঝঞ্ঝা ভরে।

আগমনী

(শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়)

বাংলার শারদোৎসবের দিনে বাঙ্গালীর মন দেশের দিকে ফিরে। প্রবাসী সহরবাসী বাঙ্গালীর ঘরের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালী আগমনী গান গাহে। এই আগমনীর গান একদিকে তাহার যেমন দেশে ফিরিবার ব্যাকুলতা অন্যদিকে তেমনি তাহার পরাভাবের উদ্বেগ জাগায়। আগমনী গান বাঙ্গালীর সাধনার গান। এই সাধনা বাঙ্গালীর নিজস্ব। তাই পরাধীন বাঙ্গালীরও প্রাণ ইহাতে এমন করিয়া সাড়া দেয়।

দুই দিক হইতে এই সাধনার বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালী দেবতাকে এতই ঘরের মানুষ করিয়াছে যে তাঁহাকে আপনার কন্যার মত জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত মিলন বিরহের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সে ব্যগ্র। তাই ধানশ্রাভ শস্য ক্ষেত্রের উপর যখন মেঘমুক্ত সূর্য্যের কিরণ জাল বিস্তৃত হয়, যখন প্রকৃতি চকিত সজীব হইয়া মাঠে, ঘাটে, সরোবরে, নূতন সম্ভারে উজ্জ্বল, তখন প্রকৃতির এই নবজাগরণকে উপভোগ করিবার জন্য বাঙ্গালী তাঁহাকে উমাসুন্দরীর রূপে বরণ করে। বসন্তের জাগরণ ও শরতের জাগরণে অনেক প্রভেদ। শরতের জাগরণে উদ্দামতা নাই, তৃষ্ণা নাই, আছে সফলতার আনন্দ ঐশ্বর্য্যের শান্তি। বসন্তের অধীর প্রেম প্রকৃতিকে বঙ্কিম কিশলয়ের আভায় সজ্জিত করিয়া বনে বনে রক্তপলাশের নিশান উড়াইয়া মানুষের মনকে উন্মত্ত হোলি খেলার দিকে প্রেরণ করে। শরতের আহ্বানও ব্যাকুল এবং মর্ম্ম স্পর্শী। কিন্তু এই আহ্বানের পশ্চাতে একটা গভীরতা একটা ধৈর্য্য, একটা অনাবিল আনন্দ ধারা লক্ষিত হয়। শরতের শিশিরের মত, শরতের প্রাতঃকালে ঝরা শেফালির মত, শরতের শুভ্র সরোবরে নব-প্রস্ফুটিত কুমুদের মত শরতের ক্ষেতের সোণালী ধানের মত মানুষের মন একটা স্বচ্ছ শুভ্র আনন্দে মাতোয়ারা হয়। যেন কোন অসীম বিরহ ব্যথার তখন অবসান। এক পরম ঐশ্বর্য্য লাভের যেন সার্থকতা। তাই তৃপ্তি ও মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া প্রকৃতি আসিতেছেন মানুষের অন্তরে হেমবরণী উমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া। কারণ বাংলার পরিবারে কিশোরী বালিকাই সকল মাধুর্য্য সকল শুভ্রতার আধার ও আশ্রয়। আর সেই প্রাণের পুত্তলী বালিকাকে প্রবাসে পাঠাইয়া তাহার সহিত মাত্র তিনদিনের মিলন আকাঙ্খা করা অপেক্ষা স্বজনপ্রিয় বাঙ্গালীর আর কি প্রাণোন্মাদক আছে। তাই আপনার কন্যার সহিত সুদীর্ঘ বিরহের পর মিলনকে আশ্রিত করিয়া যে রূপক আগমনী গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মাধুর্য্য বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ উপভোগ করিতে পারে না। ভারতের অন্য কোন জাতি এমন গান কখনও রচনা করে নাই, এই গানের মহিমাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা।

কিন্তু উমার প্রত্যাবর্ত্তন পারিবারিক জীবন হইতে সংগৃহীত একটা কেবল রূপক নয়। বাঙ্গালীর সাধনায় জগজ্জননী তাহার

দেহের অন্তরে রহিয়াছেন। মৃণালের সূক্ষ্ম সূত্রের মত তিনি দেহের অন্তরে ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যক্ত আবার দেহকে ছাড়িয়া, বিশ্বকে ছাড়িয়া বিশ্বাতীতকেও বেড়িয়াছেন। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, জগৎকে জানিতে হইলে এই দেহটাকেই জানিতে হয়। আবার জানিবার এক মাত্র উপায় জগজ্জননীর কৃপা। তাই বাঙ্গালীর একমাত্র উপাসনা,—জননী জাগৃহি। মা জাগ। তুমি জাগিলে আমার দেহ-জগৎ ব্রহ্ম সব জ্ঞানই আসিবে। এই জাগরণের, জননীর এই বোধনের ইঙ্গিত আগমনী গানের স্বদেহসম্ভূতা উমার কল্পনায় রহিয়াছে। ধীরে ধীরে কুলকুণ্ডলিনী যিনি এতদিন নিষ্ক্রিয় পুরুষের জড় দেহে জড়িত হইয়া সুপ্ত ছিলেন তিনি জাগিতেছেন। পূজার বোধন বসিয়াছে। জগজ্জননীর প্রথম উন্মেষ বালিকা রূপে। নব যৌবন সম্পন্না কিশোরীর তাই প্রথম পূজা নব পত্রিকাকে আশ্রয় করিয়া। অতসী, অপরাজিতা, জয়ন্তী, কদলী সবই কুমারীর যৌবন গরিমাকে ব্যঞ্জনা করে। কুলকুণ্ডলিনীর সম্যক জাগরণ হইলেই—পুরুষ প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পায়। এই সম্যক পরিচয়ই ব্রহ্মজ্ঞান ও অদ্বৈত বোধ আনয়ন করে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা একরকম স্থির করিয়াছে যে আকাশ ও কালের এবং জীবনকেও বেষ্টন করিয়া তাহাদের অনাদি কারণ হইয়া রহিয়াছে শক্তি। শক্তিকে জানিতে পারিলে আকাশ কাল ও জীবনের মূল তত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর তন্ত্র সাধনায় শুধু শক্তিকে জানিলে হয় না। তাহাকে জানিয়া তাহার আশ্রয়ে চিন্তা ক্ষেত্রে আকাশ ও কাল, দেহ ও জীবনকে অতিক্রম করা মহাবিদ্যা সাধনের উদ্দেশ্য। তন্ত্র মানব দেহকে ব্রহ্মপুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানও ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে জীবনের মূল হইতেছে জীবাণুর অন্তঃস্থিত বিদ্যুৎ-প্রবাহ। আমাদের তন্ত্র এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের নানা কেন্দ্র নিরূপণ করিয়াছেন এবং কেন্দ্রগুলিরও স্তরবিভাগ করিয়াছেন। এই এক একটি কেন্দ্রের নাম পদ্ম। এক এক পদ্মের প্রকাশ জ্ঞানের এক একটি ভাবদ্যোতনা করে। এক এক পথে এক এক ভাবের অভিব্যক্তি এক এক বিদ্যার অধিষ্ঠান। কিন্তু জগজ্জননীর পূজায় বাহিরের প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অন্তরের সব পদ্মকেই ফুটাইতে হয়। পূজার সাধন প্রণালীতে এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়।

স্তরে স্তরে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে উঠিতে উঠিতে নিগমাগম সম্মত তত্ত্বনিষ্ঠ সাধক অনুভব করেন যে ঘন আনন্দময় এক আত্মাই প্রকৃতি রূপ ধারী, তিনিই রসরূপী—সমস্ত দেহাসক্তির নির্গলিত মূর্ত্তি, আবার তিনিই পরমাত্মা। তন্ত্র আর এক দিক হইতে বলিয়াছেন, আত্মা প্রকৃতির দ্বারাই অভিব্যক্ত হন এবং তাঁহার দ্বারাই আবার অব্যক্তও হন—প্রকৃতির সংযোগ সেই জন্যই ব্রহ্ম লাভের উপায়। প্রকৃতি পুরুষের সম রস জ্ঞান অর্থাৎ তন্ত্রের ষট্‌চক্র বর্ণিত সহস্রারের ব্যাপার পরম পদ স্বরূপ।

প্রকৃতি রূপ ধারী আত্মা যিনি তাঁহাকে জ্ঞানের স্তরে স্তরে নানা রূপ কল্পনায় নানা ভাব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া লাভ করিয়া যখন জীব পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে তখন জীব, দেহ, ব্রহ্ম, কাল, আকাশ সব একাকার হইয়া যায়। থাকে কেবল এক আমি, সেই বিশ্বজননী।

"কালী কে জানে তোমায় গো।
যে জানে তোমায় অনন্ত রূপিনী।
তুমি মহাবিদ্যা, অনাদ্যা অবোধ্যা
ভব বন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী।
* * * *
শমন ভবন গমনবারিণী
সৃজন পালন নির্ব্বাণ কারিণী,
সাকারা, আকারা, তুমি নিরাকারা,

এই গান বর্দ্ধমান জেলার নবাই ময়রার তৈয়ারী। ভিয়ান করিতে করিতে নবাই গাহিত এবং তাহার ভিয়ান নষ্ট করিত। নবাইয়ের আর একটি গান খুব বিখ্যাত "হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হযে।" তন্ত্র সাধনা যে বাঙ্গলার জনচৈতন্যকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। এইটাই আশ্চর্য্য এমন সার্ব্বজনীন সাধন তত্ত্ব এত শীঘ্র অনাদৃত হইল কি করিয়া। কালী কৃষ্ণের অভেদাত্মক কল্পনা যে সমাজে নিম্নস্তরের মধ্যে আবেগান্তিশয্যের মধ্য দিয় প্রকাশিত হয় তাহার কি কম স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতি এমন শ্লাঘার বিষয় কি দেখাইতে পারে? বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত বাঙ্গালীর তন্ত্রের সাধনা সমাজের উচ্চনীচ জাতির মধ্যে একটা সাম্য আনিয়াছিল। যাগ যজ্ঞের কৃত্রিম উদ্‌যোগের উপর জোর না দিয়া সার্ব্বজনীন শক্তির জাগরণকে ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্য করাতে বাঙ্গালীর জীবনে একটা উদারত, একটা স্বাধীনতা, একটা সমুচ্চ—ভাব আসিয়াছিল।

কুলকুণ্ডলিনী যার জাগে,
যার না জাগে
কি করিবে তার, বল, জপ-তপ-যোগ-যাগে।

কুলকুণ্ডলিনী জাগিলে কি হয়? বিশ্বময়কে পাওয়া যায়। জগন্মাতা তখন দিবস রজনীর প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রাণের প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চঞ্চলতার মধ্যে ফুটিয়া উঠেন। তাঁহারি জন্য সব কর্ম্ম। সব কর্ম্ম সব চিন্তা তাঁহারি পূজা।

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতাস্তদেব তব পূজনম্॥

আর যিনি নিশ্চল, স্থানু হইয়া বসিয়া আছেন যিনি কর্ম্মবিমুখ, তাঁহার কি হয়? মহামায়া হন তাঁহার নিকট তখন যোগমায়া। গভীর নিদ্রায় বিভোর। আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর হইয়া কর্ম্মী হন কর্ম্মত্যাগী। সম্প্রসারিত কুলকুণ্ডলিনী তখন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া নিশ্চল পুরুষের মূলাধারে নিদ্রিত। জীবের নিস্ক্রিয় অবস্থায় তিনি নিগূঢ় অব্যক্ত

কুলকুণ্ডলিনীর ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম তন্ত্রতে নর নারীর, উচ্চ নীচের অধিকার ভেদ নাই। অথচ সাধনের দিক হইতে ব্রাহ্মণ হইতে সকলেরই যথাযোগ্য অধিকার বিচার আছে। তন্ত্র দিব্য, বীর ও পশু এই তিন ভাবের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দিব্যভাব অতি শ্রেয়স্কর, বীর ভাব মধ্যম, এবং পশুভাবে বহু জপানুষ্ঠানে কায়ক্লেশে সিদ্ধি লাভ হয়।

কুল কুণ্ডলিনীর ধর্ম্মকে ছাড়িয়া বাঙ্গালী তাহার ধর্ম্মের উদারতা, জ্ঞানের সার্ব্বজনীনতা সমাজের সাম্য ভাব ছাড়িয়াছে। নির্দ্ধনের স্বাধীনতা, নিম্ন জাতির দেহতত্ত্বের বল ঘুচাইয়াছে।

উমার গান কুল কুণ্ডলিনীর প্রথম স্ফুরণের গান। আগমনী গান বাঙ্গালী আবার বুঝিতে পারিলে, দেশে শক্তি ফিরিবে, ধর্ম্মে উদারতা ফিরিবে, সমাজে শান্তি ফিরিবে। আগমনী গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের অন্তরে, আমাদের অন্তরে, ফিরিয়া আসুন, তবেই আমরা পুরাতন শক্তি, অতীত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইব। জননী জাগৃহি।

উমার বিদায়

[শ্রীগোবিন্দলাল মৈত্রেয়]

"পশুপতি! উমা তোমার চরণ-পদ্মে বিদায় চায়।
পরাণ আকুল করে আজি বছর পরে দেখতে মায়॥
বিদায়-বিষাদ সাঁঝের বেলা আসি যে দিন তোমার ঘরে।
মায়ের কাতর আঁখির কোণে হেরি শোণিত নিঝর ঝরে॥
আকুল স্বরে বলেন কেঁদে 'পতির ঘরে চল্লি তো মা।
একটী বছর ছেড়ে তোরে কেমন করে বাঁচব উমা॥'
চরণ ছুঁয়ে বলেছিলাম 'এমনি কেঁদে হসনে ক্ষীণ!
আসছে শরৎ প্রাতে আবার আসবে হেথা আসার দিন॥'
বদন কমল হেরে তোমার ভুলে থাকি সেবার মাঝে।
গৃহের কাজে গেলে প্রভু মায়ের সে রব কাণে বাজে॥
আস্‌ল' ফিরে সোণার শরত নিয়ে গীতি গন্ধ ভার।
মোর বিরহে কেঁদে কেঁদে নয়ন বুঝি অন্ধ মার॥
ভূধর পানে চেয়ে চেয়ে ভাবছেন উমা আসছে অই
ছায়া হেরে চমকে বলেন 'নন্দী বুঝি? গৌরী কৈ?'
মেয়ের তরে মায়ের বুকে জাগে কি যে দারুণ ব্যথা।
মেয়ে ছাড়া জগৎ মাঝে বুঝবে কে আর মায়ের কথা॥
বারণ যদি কর প্রভু চাইব না আর দেখতে মায়।
জীবন মরণ ধরম করম সব সঁপেছি রাঙা পায়॥"
"হারিয়ে তোমা" শিব কহে "মোর হয়েছিল শ্মশান সার
ভস্ম মেখে ক্ষ্যাপার শিরে বেড়েছিল জটার ভার।
তোর মোহিনী মায়ায় সতি! ভিখারী সে দিগম্বর।
ঘরে ফিরে গৃহীর সাজে পরেছে যে বাঘাম্বর॥
সতী ধ্যান সতী জ্ঞান সতী যে তার নয়ন মণি।
সতী ছাড়া হ'লে যে তার কণ্ঠ রুধে ধরে ফণি॥
চাইনে তোমায় দিতে ব্যথা বিদায় দিনু তিনটী দিন।
মনে রেখো শক্তিময়ী রইনু হেথা শক্তি হীন॥
শিবের পায়ে বিশ্বমাতা বিদায় নিয়ে নয়নজলে।
হিমালয়ে ব্যাকুল প্রাণে মায়ের ঘরে ছুটে চলে।
তেমনি করে আবার ওরে আয়রে মা তুই ছুটে আয়!
শোকে তাপে বাঙ্গলা মা যে বছর পরে দেখতে চায়॥

পাগলের ডায়েরী

প্রতি মুহূর্ত্তের এই মৃত্যু হইতে কে রক্ষা করিবে? পলে পলে এই যে পতন, এই যে বিচ্যুতি, এই যে আত্মনাশ ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোনও উপায় নাই! সুখ দুঃখের মাপকাঠিতে জীবনের পরিমান করিয়া দেখি যে বেশী অংশই পরিমান চিহ্নে ধরা পড়েনা—শুধু অপ্রত্যাশিত দীনতা কিম্বা ক্ষুদ্রতা মনকে তিক্ত করিয়া তোলে—কর্ম্মের তৌলদণ্ডে যখন নিজেকে মাপ করিতে যাই তখন দেখি শুধু যোগ বিয়োগের ভুলে হিসাবের খাতা পরিপূর্ণ—জমার ঘর শুধু মেকীটাকায় পূর্ণ—খরচ মূলধন চেয়ে ঢের বেশী—ওয়াশীলে তিন শূন্য—ফাজিল হিসাবে শুধু নিজের মূর্খতা প্রকাশ পায়।

দেনার দায়ে মাথা বিকাইয়েছে তবু খরচের কমতি নাই—বুঝেও বুঝ নাই যখন হাতে কানা কড়িও নাই তখন রাজভোগের ক্ষুধা—নিজের আত্মসম্মানের বিনিময়ে—সাময়িক তৃপ্তি!

দেহ ও মন দুইই আমার নয়—দেহটা শুধু চায় আরাম—যা' তার ভাগ্যে খুব কম দিনই ঘটে থাকে!— যা সে লাভ করে সেটা বে-আরাম। অতি তুচ্ছ আঘাতে সে একেবারে নুয়ে পড়ে, ক্ষণিকের একটু অবসাদকে সে মৃত্যু মনে করে—সহ্য গুণটা তার কখনও ছিল কিনা জানি না—কাজেই কৃচ্ছতা এলে সে একেবারে শিউরে ওঠে—সর্ব্ব-দেহে শুধু রোগের ক্ষত—পর্য্যায় ক্রমে নিজেদের বিশিষ্ট আক্রমন-শক্তিকে প্রকাশ করে চলেছে—বাধা দিবার শক্তি নাই কারণ মনটাও যে বিরোধী।

জীবনী-শক্তি বলে একটা মানুষের পরম সম্পদ আছে—সেটা সমস্ত সংঘাত ও অভিঘাতের মধ্যে বজায় থাকে যদি মন আর দেহটার মিল থাকে—যখন দুটো জিনিসের মিল বিদ্রোহের দিকে তখন জীবনী-শক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসবার উপক্রম করে—ফলে দুর্ব্বল দেহ মনের বিরক্তি ও আত্মনাশ কামনা! দেহটাকে দোষী করে রাখলে অবিচারই করা হবে কারণ দেহের ধারণ-ক্ষমতার পরিণতির বহুপূর্ব্ব থেকেই তা'কে পীড়ন করে আসা হয়েছে—ক্ষুধায় খাদ্য তৃষ্ণায় পানীয় সে পায়নি—বাইরের এই অভাব প্রতিনিয়ত দেহকে পীড়া দান করে' বিফল করে ফেলেছে! দেহ এখন শুধু পঙ্গুর আস্ফালন করে' নিজের অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে!—

দুর্ব্বল দেহের সঙ্গে মনটা জাগ্রত থাক্‌লেও গড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধা পায়নি—দেহ এতদিন ধরে যে বিদ্রোহ-বাদ জীবনময় ছড়িয়ে এসেছে সে সংক্রামক প্রভাব থেকে মনটাও বাঁচেনি! মনটাই মনেমনে এতদিন বিক্ষোভ, ও ভ্রান্তিতে অশান্তও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে এসেছে—অভাবকেই সে জানে তাই সে অভাব মেনে নিতে পারে না, ব্যথায় ব্যথায় সে জরজর তাই সে ব্যথার আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত। অত্যাচার অবিচারের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে বস্তু বিচারের সামঞ্জস্য করে নিতে সে কোনও দিনই পায়নি!—শুধু ব্যর্থতা আর অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে সে আজ—ভীষণ বিদ্রোহী!

বুকের উপর আঘাতের পর আঘাত এসে এতদিন যে রক্ত জমিয়ে জমিয়ে দুষ্ট ব্যথার সৃজন করেছে—মনের বিচারে তার কোন 'বকুল জবাব' নাই।

আমার মনটী এখন পোড়-খেকো লোকের মত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে বটে কিন্তু তার মত সহিষ্ণু হতে পারিনি—দেখে শিখে, ঠেকে শিখেও শুধু সে অভিযোগের আর্ত্তস্বর তুলে জানাতে চায়—অবিচার। অত্যাচার॥

ব্যর্থতার আঘাতে তার বুক ভেঙ্গে গেছে, অত্যাচারে অবিচারে তার হৃদয় ছেয়ে গেছে তবু স ওই দুটোর আশঙ্কায় সর্ব্বদা শিউরে ওঠে—যার কিছু নেই—চোরের ভয় বুঝি তারি সব চেয়ে বেশী।

ব্যর্থ হ'বার আর কি নূতন আশঙ্কা আছে, অত্যাচার আর নূতন করে তা'র বুকে কি ছুরী হানবে তবু সে মূর্খ—সেই আশঙ্কাই তার জীবনের বেশী জায়গাটুকু নিয়ে জুড়ে আছে।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া 'যুক্তি' বলিতেছে "বাঁচো"—'মন' বলিতেছে "ইচ্ছা আছে, কিন্তু পারি কৈ ?"

জীবনে যা' সব চেয়ে আদরের সব চেয়ে প্রয়োজনের তাই হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা মানুষের সব চেয়ে বেশী—।

নিয়তির নিক্তিতে তার মূল্য যাচাই করতে যেয়ে দেখি শুধু দৈন্য আর অক্ষমতা—

প্রেমে যারা দীন তারা ত 'কৃপনঃ' বটেই কিন্তু যারা সব দিয়েও দেখে নিজের মনটা, তটের বুকে আঘাত লাগা ঢেউয়ের মত হতাশ হয়ে নিজের বুকের সমস্ত ব্যর্থতা নিয়ে আছড়ে পড়ছে, আহত হয়ে, সমস্ত বেদনার আবেগ নিয়ে, উছলে পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, যে মনটাকে ব্যাকুল আগ্রহে ধরতে চায় সে মনটা অনবরত এড়িয়ে চলেছে, তারা যে নিখিলের করুণার পাত্র।

তারা জীবনকাল পঙ্গুর মত পরের চলা দেখে, চল্‌তে পারে না। অন্ধের মত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য হ'তে বঞ্চিত হয়ে, সুন্দরকে হারায়, অনন্ত নাগের মত অনুভূতির কোমল লতাটী ব্যর্থতার উষ্ণ নিশ্বাসে শুকিয়ে কুঁকড়ে ওঠে,—পাঁজর ভেঙ্গে বিষ নিশ্বাস শুধু দেহ মনকে জরিয়ে দেয়।

—তাতে তারা মরে না,—কারণ এই যে তাদের শাস্তি।—কিন্তু অপরাধ কৈ ?

অপরাধ তা'দের তারা সহ্য করেও কিছু লাভ করতে পারেনা শুধু দিনে দিনে মরণ-টাকে তারা দুর্লভ করে—জগতের সব চেয়ে যা' সত্য তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

বিদ্রোহী প্রেম

[শ্রীদ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী]

দেশে দেশে কালে কালে কত শত নারী
[illegible]স গেছে সঁপি তনু প্রাণ মন,
[illegible]তী সাবিত্রী গান্ধারী
[illegible] করে গেছে পুণ্য-পরশন।
[illegible]যে রাখিয়া গেছে যে হোম-অনল
আজো তার পুণ্য প্রভা দেশে দেশান্তরে,
কত গৃহে জ্বলিতেছে পবিত্র নির্ম্মল
গায়ত্রীর মূর্ত্তিসম সতীর অন্তরে।

না জানি কে ছিল তার দেখিতে কেমন,
কেবা শ্যামা কে যে গৌরী। তবু লয় মনে
ফিরে যদি আসে তারা এ মর্ত্ত্য ভুবনে,
চকিতে তোমার পানে পড়িলে নয়ন,
নিমিষে চিনিয়া লয়ে আপনার জানি
ভগিনী বলিয়া তোমা বুকে লবে টানি!

ওই তব তনু খানি চির পুণ্য রাশি
নয়নে বয়নে ওই সকরুণ শোভা,
সুকোমল নিষ্কলঙ্ক কুন্দ শুভ্র হাসি,
উদাস আপনা ভোলা ভাব মনোলোভা,
উজ্জল অক্ষরে হোথা লেখা সমুদায়
শত জনমের তব প্রেম-ইতিহাস।
সাবিত্রীতে ছিল যাহা আছিল সীতায়
আছে আছে আছে তারি প্রস্ফুট আভাস।
অঙ্গে অঙ্গে উঠি তব যে আনন্দ ধ্বনি,
সুমঙ্গল পুণ্য গীতে পূরে শূন্যতল,
সে যে তব শত যুগ সাধনার ফল।
সেই বাণী দেয় বলি—এই সে রমণী
আপনা ভুলিয়ে যেবা শুধু ভালবাসে,
লেখা যার পুণ্য কথা কাব্য ইতিহাসে!

ওই যে অন্তর-দীপ্ত তনু সুকুমার,
ভেবোনা ও অন্ধ দৈব ঘটনা কেবল;
ভাবনা যেমন যার সিদ্ধি তথা তার
যে যা হয়, যে যা পায় সবি কর্ম্মফল!
দেহ শুধু দেহ নয়—জড়ের সংহতি
বাহিরেতে অভিব্যক্ত অন্তর গোপন;
একনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার দুনির্ব্বার গতি
পুঞ্জীভূত হয়ে গড়ে শরীর আপন।
বহুযুগ বহুযুগ প্রেমের বেদন
বহি বক্ষে বহু উগ্র রুদ্র তপস্যায়
পেয়েছ ও তনুখানি প্রেমের সাধন
কামনার কল্পলতা দীপ্ত মহিমায়!
তাই তব যাহা কিছু সব প্রেম মাখা,
জীবনের প্রতি পল প্রেম বর্ণে আঁকা।

———

আলোচনী

দেশের শুল্কপ্রথা

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়]

দেশের অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অবস্থা ভেদে মানুষের আর্থিক সম্বন্ধ ও সংঘটন কার্য্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই বিভিন্নতার ফলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়েও কমবেশী হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলে সংরক্ষণ শুল্ক প্রথার (Protective Tariff) আবির্ভাব। কখনও কখনও এই বিভেদ সমূহ দেশের ভূগোল, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় মনস্তত্বের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত থাকে যে তাহারা চিরদিন ধরিয়াই জাতীয় জীবনে ও গঠন প্রনালীতে এই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া চলে। যাঁহারা সংরক্ষণ নীতির সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন যে জগতের অর্থনৈতিক উন্নতিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য, তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে কিছুদিনের জন্য নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সেই সময়ে তাহাকে সংরক্ষণের মধ্যে থাকিতে হইবে। ইহার চেয়ে বেশী তাঁহারা কিছু বলেন নাই। সমাজের মেরু মজ্জায় এই পার্থক্যগুলি খুব বেশী জড়িত এবং তাহার ফলে শিল্পকর্ম্ম কুশলতার তারতম্য ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে ইহাতে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গঠন ও ধন বণ্টন প্রনালীরও উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাচ্যের দেশ সমূহ ও শিল্পবাণিজ্যের লীলাভূমি প্রতীচ্যজগৎ এই উভয়ের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান। কিন্তু এই পার্থক্য বর্ত্তমানে যে কতখানি তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিরূপিত হয় নাই। কারণ আধুনিক শিল্পবিপ্লব হইতে ইহার জন্ম। পূর্ব্বে চীন ও ভারতের শিল্প সম্ভারে জগতের শিল্প দ্রব্যের অভাব মোচন করিত। বর্ত্তমানে যে এই দুই দেশ তাহাদের নিজের শিল্প দ্রব্যের জন্য পরের মুখ চাহিয়া আছে তাহার একমাত্র কারণ, শিল্পজগতে বাষ্প ও বিদ্যুৎ চালিত কল কব্জার আবির্ভাব। গ্রাম্য বিধিব্যবস্থার ভিতরে থাকিয়া কিম্বা কোন দল বিশেষের নিয়মাধীন হইয়া ভারতবর্ষের ও চীনদেশের হস্তশিল্প ও বর্ণবিশেষের পরিচালিত কারখানা সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল নিয়ম প্রাচ্যের বিভিন্ন প্রদেশের সমব্যবসায়ী শিল্পীগণের দক্ষতার ও অবস্থার উন্নতি সাধনে একান্ত তৎপর ছিল। এই প্রথাসমূহ যে শিল্পোন্নতির আদিম অবস্থা তাহা কোন প্রকারেই বলা চলে না। বস্তুতঃ ইহারা বিভিন্ন ধরনের শিল্পগঠনের একটা ধারা। যৌথভাবে গঠন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত উপায়ে সংরক্ষণ নীতির প্রবর্ত্তন করিলে এখন এই সমস্ত গৃহশিল্পগুলিকে ও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় জাত দ্রব্য সমূহকে পুনরায় দেশের ও বিদেশের বাজারে দাঁড় করান যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে অর্থনৈতিক জীবনে ও বিশেষ

ভাবে বাণিজ্য নীতিতে নিয়মের বাধ্যবাধকতা আনয়ন করিলে সাম্প্রদায়িক শিল্প ও কারখানা সমূহের ক্রমোন্নতির সহায়তা করিবে।

বস্ত্র শিল্পে ল্যাঙ্কাসায়ারের কল কারখানার প্রতিযোগীতায় প্রাচ্য জগতের হস্ত চালিত তাঁত ও চরকা দাঁড়াইতে পারে নাই দেখিয়া গৃহশিল্পের উপর এদেশবাসী আস্থা হারাইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই যে ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পরিশ্রম হইতে এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাটো কল কব্জার আবিষ্কার হেতু যে সুবিধা লাভ করিয়াছে তাহা তাহার প্রাধান্য লাভের একটী বিশেষ হেতু। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে যাইয়া সকলেই কিছু এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে গৃহ শিল্পের প্রতি এই অনাস্থার আরও দুইটী প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ঘোষণা ও সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কল কারখানার প্রতিষ্ঠা তাহার প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশের লোক ক্রমাগতই একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। তাই ইউরোপের আদর্শ অনুসারে মহাজনী প্রথায় কল কারখানা গড়িয়া তোলাই আমাদের উন্নতির এক মাত্র উপায় [Industrialism] বলিয়া মনে করা হইতেছে। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা সমূহকে অবহেলা করা হইতেছে। তাহারা যে গ্যাস, তৈল কিম্বা বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিনের শক্তিতে পরিচালিত হইতে পারে এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তাহাদিগকে গঠন করা যাইতে পারে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখা হইতেছে না।

ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে অষ্ট্রীয়ার ন্যায় আমাদিগকেও সমিতি পরিচালিত কারখানা ও ও গৃহশিল্প গুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ইহাতে দেশের প্রতিষ্ঠান গুলির উপর লোকের বিশ্বাস ফিরিবে এবং ইউরোপীয় সামাজিক ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী প্রভূত উৎপাদন করিবার প্রথা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সংযত হইবে। শিশু শিল্প সংঘগুলির অর্থনৈতিক সংরক্ষণ প্রথা সর্ব্বতোভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। আর এই সংরক্ষণ নীতির পরিচালনা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তত্ত্বাবধানে হওয়াই সঙ্গত। ইহা যে শুধু জাতীয় শিল্পকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহা নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার তারতম্য হেতু সময়ে অসময়ে কতকগুলি আকস্মিক শক্তি আসিয়া যে সমাজের জীবন ধারায় ও অর্থনীতি জগতে বিপ্লব ঘটাইতে চেষ্টা করে এই রক্ষণ নীতির সহায়তায় তাহার হাত হইতেও জাতীয় শিল্প রক্ষা পাইতে পারিবে। কেন্দ্রী ভূত মহাজনী প্রথার (Concentrated Capitalism) বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য অনেক সময়েই তাহাদের গ্রাহ্য করা হয় না।

প্রায় একশত বৎসর গত হইল ইংলণ্ড বর্জ্জিত ইউরোপে ভূমি সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। সেখানকার ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী। ফ্রান্সের ন্যায় আমাদিগকে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বিজ্ঞান সম্মত কল কব্জা সমূহের

সংযোগ সাধন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজারে আমদানী করিবার যে পদ্ধতি ফরাসী দেশে আছে তাহাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড ও রোমানিয়েতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ব্যবসায়ীরা যৌথভাবে বৃহৎ কারবার সকল গড়িয়া তুলিয়াছে, ভারতবর্ষে আমরা এই প্রথারও অনুসরণ করিব। ইংলণ্ড ও আমেরিকা কেন্দ্রীভূত মহাজনী প্রথাদ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতেছে সত্য কিন্তু ভারতে আমাদের এবম্প্রকার প্রত্যেক চেষ্টাই বিফল হইবে। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, সম্মিলিত ভূসম্পত্তি, সামাজিক বিধান ও কৃষকজাতির প্রাচীন বদ্ধ সংস্কার সমূহ একত্রিত হইয়া এই ধরণের প্রত্যেক কার্য্যের সফলতায় বাধা দিতেছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে আমাদের দেশে এবম্প্রকার কোন প্রতিষ্ঠানই জাতির অনুকূল নহে।

গত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপে অনেক ছোট ছোট জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই জাতিগুলি ইউরোপের বর্ত্তমান শিল্পগঠন প্রথা হইতে বিভিন্ন ধরণের এক প্রকার কলকব্জা সংযুক্ত নূতন শিল্প ধারা গ্রামে গ্রামে গড়িয়া তুলিতেছে। এসিয়া খণ্ডেও এই ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেশে যে সমস্ত জলপ্রপাত আছে তাহাদের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া কিম্বা যৌথভাবে তৈল, গাস কিম্বা বাতাসের সাহায্যে অল্পব্যয়ে ইঞ্জিন বসাইয়া যদি আমরা আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি চালাইতে চেষ্টা করি তবে গৃহশিল্পকে ও সম্প্রদায় চালিত কারখানা সমূহকে শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত দেখিতে পাইব। এইরূপে গ্রামের বা কোন দলবিশেষের নিয়ম কানুনের সুশাসনে ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া শিল্পীগণ সমাজের হিতের জন্যই কার্য্য করিবে।

গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ঋণ ও কলকব্জার সাহায্যে যে কারখানাগুলি, গৃহ-শিল্প-গঠন ও মহাজন-চালিত কারখানা সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহারা দেশের অর্থ বিকেন্দ্রী করণের একটা নূতন উপায় দেখাইয়া দিবে। ফলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও স্বাধিকার পাইবে ও দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য যুদ্ধের পর যেসমস্ত জল্পনা কল্পনা চলিতেছে এই প্রথা তাহাদের অনুযায়ীও হইবে।

আন্তর্জাতিক অর্থ নীতির উপর জোর দেওয়ার জন্য প্রত্যেক দেশের মধ্যে কতক গুলি অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষিত বাণিজ্য এবং পরবর্ত্তী সময়ের কৃষি বনাম শিল্প লইয়া যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা এই অসামঞ্জস্যের সমাধানেই ব্যস্ত ছিল।

মহাজনী প্রথায় প্রচুর দ্রব্য সম্ভার উৎপন্ন করাই যে উন্নতির উপায় ভারতে এই মত লইয়া কোন দলাদলি ছিল না। সুতরাং দেশের শাসন পরিষদও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, ফলে গ্রামগুলিরও অধঃপতন হইয়াছে। আমি শুধু নূতন ধরনের বৃহৎ শিল্প ব্যাপার সমূহ রক্ষা করিতে বলিতেছি তা নয় গৃহশিল্প সমূহ বিশেষত জাতিগত শিল্প ব্যবসায় গুলিকেও এই রক্ষণ নীতির সহায়তায় রক্ষা করিতে হইবে। তাহাহইলে দশ কুড়ি বৎসরের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইব যে আমাদের শিল্পীগণের শিল্পকার্য্য ও কারখানা সমূহ পুরাতন সাম্প্রদায়িক ধারা অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা

যৌথ কারবার প্রথারই ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়াছে।

আমি সাধারণ ভাবে Maintainance Duty স্থাপনের পক্ষপাতী।

গ্রাম সমূহ একমাত্র কৃষিকার্যের উপরে নির্ভর করিতেছে বলিয়া ওই সকল স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। কৃষককুল ঋণ দায়ের নাগপাশে জড়াইয়া যাইতেছে, আর তাহার সঙ্গে জমাজমি শূন্য এক দল গরীব শ্রমজীবির সৃষ্টি হইতেছে। গ্রামসমূহকে এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে গম চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইতে হইবে। ইহার ফলে দেশের রপ্তানী যে কমিয়া যাইবে তাহার কোন হেতুই নাই। কারণ গত ত্রিশ বৎসরের ভিতর কম করিয়া ছয়বার খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ অন্যান্য সকল রপ্তানী দ্রব্য অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। পরন্তু শুল্ক কমাইলে লাভ হইবে এই যে বিদেশীয় বাজারে এই দ্রব্য সকল বেশী মূল্যে বিক্রীত হইবে। এবং তাহাতে এ দেশের কৃষিব্যবসায়ীরা লাভবান হইবে। আমরা যে একমাত্র কৃষিরই উপর নির্ভর করিতেছি শুধু ইহারই দোহাই দিয়া সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিতে পারি। মধ্যে মধ্যে দুঃভিক্ষের ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে সমস্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই কথা (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে আয়ের পন্থার কথা) পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যতদিন দেশ একমাত্র কৃষির উপরে নির্ভর করিতেছে এবং সেই কৃষিকার্য্য আবার অনুকূল প্রতিকূল বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতেছে ততদিন দেশের দুর্ভিক্ষ ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন মতেই হইতেছে না। শিল্প গঠন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবার মত ক্ষমতা দেশের আছে। (জাতীয়-সুখ সচ্ছন্দের কথা আসিতেই পারে না) এখন প্রাণের দায়ে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সেই সমস্ত শিল্পগুলিকে শৈশব অবস্থায় প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রক্ষণ প্রথার প্রবর্ত্তনও একান্ত আবশ্যক।

দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার প্রথা [Laissez faire] অনেক কাল হইতে ঘৃণিত হইয়া আসিতেছে। বেকার সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া ইংরেজ তাহার রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিয়াছিল সে সময়ে সে রক্ষণ নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারত বর্ষে এখনও এ নীতি প্রচলিত হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে ইহাতে দেশের রপ্তানী কমিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে দেশের কৃষি জীবিরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক মান দণ্ডের বিচার গুণ ও পরিমাণ Qualitative & quantitative উভয় দিক দিয়াই করিতে হয়। কারণ আমদানী ও রপ্তানী জিনিষের পরিমাণ ও মূল্যে দেশ যে লাভবান হইবেই তাহার অর্থ নাই। যে জিনিষ আমদানী বা রপ্তানী হইতেছে তাহার গুণের উপর অনেক নির্ভর করে। Commercial statistics দেশ হইতে পাট কিম্বা চামড়া রপ্তানী বাণিজ্য বিষয়ক বিবরণীতে রপ্তানী জিনিষের গুনাগুণ বিচার করিয়া তালিকা দেওয়া হয় না কিন্তু দেশের মঙ্গলামঙ্গলের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে দেশ যাহা রপ্তানী করে তাহা কাঁচা মাল, কি ব্যবহারোপযোগী তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এদেশের অর্থনৈতিক কোন পরীক্ষা

করিতে যাওয়ার পথে দুইটী প্রধান অন্তরায় দেখা যায় :—প্রথমতঃ এদেশের কৃষক কুলের দারিদ্র্য দ্বিতীয়তঃ স্বরাজের পথে দেশ অগ্রসর হইলেও দেশীয় ও বিলাতের মহাজন দিগের হস্তে প্রভুত ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের অনুকূল শিল্পগঠন প্রথা বাছিয়া লওয়ার সময় আমরা পূর্ব্বোক্ত নীতি অনুসারেই চলিব। প্রত্যেক প্রদেশে রক্ষনোপযোগী শিল্প বা ব্যবসার কোন্ গুলি তাহার অনুসন্ধানের জন্য ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল ব্যুরো স্থাপনের আমি পক্ষপাতী।

১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর (১৯১৩-১৪ খৃঃ) অপেক্ষা, ১১ কোটী টাকার তুলা ২০ কোটী টাকার পালিশ করা চামড়া ও ৫ কোটী টাকার গালা বেশী রপ্তানী হইয়াছিল। এ সমস্ত "কাঁচামাল" বিদেশে যাইয়া যখন শিল্পদ্রব্যে পরিণত হয়' তখন তাহাদের মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়। অবাধ বানিজ্য প্রথা সংযত করিতে পারিলে এই সকল দ্রব্য হইতে আমাদের জাতীয় ধনবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

কাজেই পাট, শন, রবার, মসলা, কাঠ, ধাতুদ্রব্য আকরধাতু, মাঙ্গানিজ, মালাপাট্টার অভ্র, চামড়া ও অন্যান্য প্রানিজ পদার্থের রপ্তানীর উপর শুল্ক বসান উচিৎ। চামড়ার উপর যে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে শুল্ক বসান হইয়াছিল তাহা বেশ ভালই ছিল।

ইহাদের কতকগুলি দ্রব্য ত একমাত্র ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়* কতক গুলি যাহাতে শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া না যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সেজন্যও রপ্তানী শুল্ক স্থাপন একান্ত আবশ্যক। কার্পাস, বস্ত্র, চিনি সাবান, কাঁচ, তামাক, রেশমী ও পশমী দ্রব্য সমূহের উপর আমদানী শুল্ক বসান আবশ্যক। আমদানী কার্পাস, চা, পেট্রোলিয়াম আর সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু লৌহ, ইস্পাত, কাগজ, পালিশ করা চামড়া, সাবান, কাঁচ, রেশমী ও পশমী দ্রব্য ও তামাক ইহারা এখনও রক্ষণনীতির আশ্রয় চায়। অনেকস্থলেই কিন্তু রক্ষণ শুল্ক স্থাপন অপেক্ষা সরকারের অর্থ সাহায্যই বেশী ফলপ্রসূ হইবে। এই প্রথা অবলম্বিত হইলে সমগ্র উৎপাদনকারী গনেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। অপর পক্ষে সমস্ত করদাতৃগণই এই ব্যয় ভার বহন করিবে। আবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা তুলিয়া দেওয়াও যাইতে পারিবে। কিন্তু ইহার ফলে ধনী সম্প্রদায়ের কতদুর জনসাধারণেরি বা কতদুর স্বার্থ হানি হইবে, তাহাও বিবেচ্য।

যে সমস্ত আমদানী জিনিষ নিজে দেশের সমসাময়িক বাজার দর অপেক্ষা কম দরে ভারতবর্ষে বিক্রয় করা হয় একটা বিশেষ কর স্থাপনদ্বারা সে সমস্ত জিনিষের আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কানাডায় এই প্রথা প্রচলিত হওয়ায় আমেরিকার শুল্ক আইনের এক নূতন ধারা প্রকাশ পাইয়াছে।

জাভা ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্বীপ সমূহ হইতে আমদানী চিনির উপর বিশেষ শুল্ক বসাইয়া বাঙ্গালা বিহার ও যুক্তপ্রদেশকে প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। যখন দেশে শিল্পোদ্যম দেখা দেয়, বিশেষতঃ যখন সে উদ্যম জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখনই বিদেশীয় উদ্যম ও অর্থের প্রভাবকে নষ্ট করিবার জন্য দেশের মধ্যে একটা চেষ্টা হইয়া থাকে। বিদেশী বণিক দিগকে রেল ওয়ে ও খনি সকলে যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লওয়া যায়। এই

উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বার্থের জন্য দেশের মধ্য হইতে চাঁদার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। ইহাতে শাসন পরিষদের সাহায্যেরই বেশী প্রয়োজন। আবার আমরা যাহাতে বৈদেশিক ব্যবসায় বুদ্ধি, অর্থ ও কলা কৌশলের সাহায্য লাভে বঞ্চিত না হই অথচ ক্রমে ক্রমে আমরাই এই সমস্ত কাজের যোগ্য হইয়া উঠি এরূপভাবে কাজ করা দরকার। সে জন্য প্রথমে যুক্ত চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য্য। যে সমস্ত কারবার ব্যক্তিগত ভাবে বিদেশীয়-দিগের অর্থে পরিচালিত তাহারা যাহাতে এই দেশের ধনি সম্প্রদায়ের অর্থে চালিত হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারত বহিস্কার-নীতি সম্প্রতি উৎকট ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা ভারত-বাসীর প্রতি একান্ত অবিচার। যতদিন অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গদিগেরই একমাত্র অধিকার এবং ভারতবাসীর সেখানে কুলি হওয়া ছাড়া অন্য অধিকার নাই এইরূপ বিবেচিত হইবে ততদিন উচ্চতর অধিকারগত শুল্ক প্রথার (Preferential tarrif) সমর্থন আমরা কিছুতেই করিব না। কারণ তাহাতে আমরা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইব। বরং যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদিগের মতানুযায়ী সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে সমান অধিকার পাই তাহা করার জন্য আমরা আমাদের দেশে আমাদের স্বার্থের অনুকূল শুল্কপ্রথা গড়িয়া তুলিব।

বিশ্ব কাব্য

[শ্রীগোবিন্দ লাল মৈত্র]

এমহা বিশ্ব জগত ধাতার বিরাট কাব্যখানি
স্পন্দন-ঘন লেখনি লিখিত সার্ব্বভৌম বাণী!
নক্তন্দিব প্রচ্ছদ পটে মিহির ইন্দু সাজে,
তরুণ দিবার অরুণ বর্ণে গ্রন্থ ভূমিকা রাজে।
উপসংহার শত তারকার স্বর্ণের অক্ষরে,
উষা গোধূলির কলা কৌশলে কাব্য সুষমা ঝরে।
জলপ্রপাতের জীমূত মন্দ্রে রচিত রৌদ্র রস।
অগ্নি গিরির রুদ্রোচ্ছ্বাসে কেঁপে উঠে দিক্‌দশ।
বীররসোচিত ভৈরব রব কাল বৈশাখী বায়ু,
শৃঙ্গার রস মলয়ে গন্ধে কুসুমের সুষমায়!
শীতের শিশির সিক্ত নিশায় করুণ প্রবাহ ঢালে।
শান্ত রসের কান্ত বিকাশ সুনিল গগন ভালে।
জনম-মরণ-মিলন-বিয়োগ কাব্য সর্গ শেষ।
সে আদি কবির এ মহাকাব্যে স্ফুট সে কল্প বেশ

প্রকৃতির রাজ্যে বিজ্ঞানের অধিকার

[শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দেব]

বহুকাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞান প্রকৃতির নিরুপদ্রব প্রজারূপে বাস করিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু আজকাল বিজ্ঞান প্রকৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রকৃতির সকল অধিকারই নিজের হাতে লইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান জগতকে এখন এমন এক অবস্থায় আনিয়াছে যে আজকাল পৃথিবীর যে জাতি যত অধিক পরিমানে প্রকৃতির অধিকার খর্ব্ব করিতে পারিয়াছেন সেই জাতই তত অধিক ক্ষমতাপন্ন এবং উন্নত বলিয়া বিবেচিত হন। এই বিষয়ে জার্ম্মানী পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। জার্ম্মানীর নীল, কর্পূর, নানা ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রকৃতি জাত জিনিষকে পৃথিবীর বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি কি উপায়ে বিজ্ঞানাগারে বসিয়া হীরক, কর্পূর ও নীল এই তিনটি জিনিষ প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হীরক প্রস্তুত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা এত অধিক শ্রমসাধ্য এবং ইহাতে খরচ এত অধিক যে এখনও বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত হীরক আমাদের দৈনিক জীবনে কোন কাজে লাগে নাই ; কালে হয়তঃ এমন দিন আসিতে পারে যখন সাধারণ লোকেও হীরকের হার গলায় দিয়া বেড়াইতে পারিবে। এত আদরের ধন হীরক কিরূপে সামান্য জিনিষ হইতে প্রস্তুত হইতেছে তাহা শুনিতে মন্দ লাগিবে না মনে করিয়াই ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নীল এবং কর্পূর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনাই করিব এবং কি ভাবে জার্ম্মেনী পৃথিবীর বাজার দখল করিয়াছে এ বিষয়েও যথাসাধ্য বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতি জাত হীরক দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, ভারতবর্ষ এবং বর্ণিয়ো এই চারি জায়গায়ই পাওয়া যায়। ১৭৭৫ খৃঃ লেভয়-সিয়ার নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এবং ১৮১৪ খৃঃ ডেভী (Davy) নামক ইংরেজ রাসায়নিক হীরক এবং সাধারণ অঙ্গার যে এক পদার্থ তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই দেখাইলেন যে হীরক জ্বালাইলে যে গ্যাস্ উৎপন্ন হয়, অঙ্গার জ্বালাইলে ঠিক সেই গ্যাস্ই উৎপন্ন হয়। তার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল অঙ্গার এবং হীরক এক জিনিষ হইলেও অঙ্গার হইতে হীরক বাহির করিবার প্রণালী আর কেহ বড় চিন্তা করিলেন না। ১৮৯৩ খৃঃ ময়সা (Moissan) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রথম অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে এই চিন্তা ছিল যে বোধ হয় অঙ্গার যখন খুব বেশী চাপের মধ্যে থাকিয়া স্ফটিকাকার ধারন করে তখনই ইহা হীরকে পরিণত হইয়া যায়। এই ভাবিয়া তিনি বিশুদ্ধ চিনি পোড়াইয়া তাহা হইতে বিশুদ্ধ অঙ্গার প্রস্তুত করিলেন। তার পর তিনি খুব বেশী তাপ দিবার জন্য এক প্রকার বৈদ্যুতিক চুল্লী (electric

furnace) প্রস্তুত করিলেন। একমাত্র অঙ্গার ব্যতীত আর সমস্ত জিনিষই এমন কি লোহা পর্য্যন্ত এই চুল্লীতে দিবা মাত্র বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এই বিষয় অনুধাবন করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে মঁসা দেখিয়াছিলেন যে লোহা গলিত অবস্থায় অনেক অঙ্গার দ্রব্য করিতে পারে। তাই তিনি একটি অঙ্গার নির্ম্মিত কৌটা (crucible) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ লোহা দিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাপ দিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই লোহা গলিয়া গেল; তখন তিনি ইহার মধ্যে চিনি হইতে প্রস্তুত অঙ্গার ফেলিয়া দিয়া খুব তাপ দিতে লাগিলেন। যখন তাপের পরিমান ৩০০০° (in centigrade scale) ছাড়াইয়া উঠিল তখন লোহা বাষ্পের মত উড়িয়া যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় তিনি কৌটা শুদ্ধ গলিত লৌহ ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। গলিত লৌহ ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে কঠিন হইতে আরম্ভ করিল; সর্ব্বপ্রথম বাহিরের চারিদিক কঠিন লোহে পরিণত হইল এবং ক্রমশঃ ভিতরের অংশও কঠিন হইতে লাগিল। এখন লৌহের একটি বিশেষ গুণ এই যে গলিত অবস্থায় ইহার আয়তন কঠিন অবস্থার আয়তন হইতে অনেক কম। ইহা হইতে স্বভাবতঃই বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বোক্ত লৌহখণ্ডের চারিদিক যখন প্রথমেই কঠিন হইয়া গেল এবং পরে যখন ভিতরের অংশ কঠিন হইতে আরম্ভ করিল তখন ভিতরের কঠিন লৌহ অত্যধিক চাপ পাইতে লাগিল। এই চাপের দরুণ ভিতরের গলিত লৌহের মধ্যে যে অঙ্গার দ্রব অবস্থায় ছিল তাহা স্ফটিকাকারে (crystal) পরিণত হইয়া যায়; তারপর গন্ধক দ্রাবক বা অন্য কোন রকম দ্রাবক দ্বারা লোহাকে দ্রব করিয়া ফেলিলেই স্ফটিকাকৃতি অঙ্গার দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ফটিকাকৃতি অঙ্গারের অধিকাংশই হীরক। ১৮৯৩ খৃঃ মঁসা এই উপায়ে যে হীরক প্রস্তুত করেন তাহা দুয়ের পাঁচ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা ছিল এবং ১৯০৫ খৃঃ তিনি যে সকল হীরক প্রস্তুত করেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলির ব্যাস তিনের পাঁচ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ছিল তিনি দেখাইয়াছেন যে জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করা অপেক্ষা তরল সীসার মধ্যে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করা অনেক ভাল; জলে ফেলিলে লৌহখণ্ডের চারিধার এক প্রকার বুদ্বুদে ঢাকিয়া ফেলে সুতরাং লৌহখণ্ড সমানানুপাতে ঠাণ্ডা হইতে পারে না কিন্তু গলিত সীসার মধ্যে ফেলিলে এই রকম কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

ভারতবর্ষ নীলের চাষের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছিল। এই নীলের বাণিজ্যে পুর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজগণের উন্নতি দেখিয়াই ইউরোপের অন্যান্য জাতিগণ ভারতে বাণিজ্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যদিও ইউরোপের সকল জাতিই বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিজাত জিনিষগুলি বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জার্ম্মানীর যে পরিমান আছে অন্য কোন জাতিরই সেই পরিমানে নাই। এই জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের প্রতাপে ইউরোপের মঞ্জিষ্ঠা (maddar) বৃক্ষ জাত রঙ্গের কারবার সর্ব্বপ্রথমেই বিনষ্ট হইয়াছে তার পর ইহার দ্বারা ভারতের লাক্ষাজাত এবং কুসুমফুল জাত রঙ্গের কারবার বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় আজকাল ভারতের নীলের ব্যবসায় নষ্ট হইবার পথে চলিয়াছে।

ত্রিশবৎসর ব্যাপী জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণের অক্লান্ত চেষ্টার পর ১৮৭০ খৃঃ এঙ্গ্লার এবং এমারলিঙ্গ্ (Engler & Emerling) সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানাগারে নীল উৎপাদন করেন। ইহারা অর্থ-নাইট্রোএসেট ফেনোন (O-nitroacetophenone) নামক জিনিষ চূর্ণ এবং দস্তাচূর্ণের (Zinc) সহিত জ্বাল দিয়া নীল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বেয়ার (Baeyer) নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান রসায়নবিৎ নীল প্রস্তুত করিবার অনেক রকম উপায় বাহির করেন। তাঁহার সমস্ত পেটেন্ট জার্ম্মানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানী কিনিয়া নিয়া খুব বেশী পরিমাণে নীল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষ সফলকাম হইতে পারিলেন না। বেয়ার যে সমস্ত জিনিষ হইতে নীল প্রস্তুত করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন তাহার দাম এত অধিক যে এই উপায়ে প্রস্তুত নীলের দাম আসল নীল অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িয়া যায় সুতরাং এই উপায়ে প্রস্তুত নীল বাজারে চালান দেওয়া যায় না। কৃত্রিম উপায়ে কোন জিনিষ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে কাঁচা (raw) জিনিষ হইতে আমরা আমাদের অভীষ্ট জিনিষ প্রস্তুত করিতে যাইতেছি তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিনা। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ মণ নীল ব্যবহার করা হয় সুতরাং নীলের কারবার ভালরূপে চালাইয়া পৃথিবীর বাজার দখল করিতে হইলে এমন জিনিষ হইতে নীল প্রস্তুত করা উচিত যাহা অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামও খুব অল্প। ১৮৯০ খৃঃ জার্ম্মানী যে সমস্ত জিনিষ হইতে নীল উৎপাদন করিত তাহার পরিমাণ খুবই অল্প ছিল সুতরাং তাহারা এই সময় পর্য্যন্ত আসল নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই। হিউমেন নামক একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ১৮৯০ খৃঃ এক নূতন নীল প্রস্তুত করিবার প্রণালী বাহির করেন। ১৮৯৭ খৃঃ তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়ম পূর্ণতা লাভ করে। আজকাল জার্ম্মানীতে প্রধাণতঃ এই উপায়েই নীল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই উপায়ে নীল প্রস্তুত করিতে হইলে নেপথেলিনের (Naptholene) বিশেষ দরকার। পৃথিবীতে প্রতিবৎসর প্রায় সাড়ে তের লক্ষ মণ নেপ্‌থেলিন আলকাতরা হইতে বাহির করা হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে প্রায় কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ মণ মাত্র কাজে লাগে; বাকী সমস্তই অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই উপায়ে নীল প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা মালের আর অভাব হইবে না নিশ্চিত।

১৮৯২ খৃঃ ভারতবর্ষে প্রায় ৬২,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৮৯৬ খৃঃ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯৩,০০০ মণ কিন্তু ১৯০৯ খৃঃ ভারতে নীল উৎপন্ন হইয়াছে ১৫,০০০ মণ এবং ১৯১০ খৃঃ ১১,০০০ মণ মাত্র। ভারতের প্রস্তুত নীলের শতকরা ৬০ অংশ মাত্র বিশুদ্ধ নীল।

১৯১০ খৃঃ ইংলণ্ড ৪৫০০ মণ আসল নীল আমদানী করে কিন্তু সেই বৎসরেই ইংলণ্ড ৩৯,০০০ মণ কৃত্রিম নীল আমদানী করে। ইহা হইতেই কৃত্রিম নীলের কাট্‌তি কিরূপ অধিক হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। ১৯০০ খৃঃ জার্ম্মানীর একটি কোম্পানী ১২,০০০ মণ কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করে; সেই কোম্পানীই

১৯০৭ খৃঃ ৫৪,০০০ মণ নীল (বিশুদ্ধ) প্রস্তুত করিয়াছে।

১৮৯৭ খৃঃ আসল নীলের দাম প্রতি সের প্রায় ১২৲ ছিল সেই সময় কৃত্রিম নীলের দাম প্রতি সের প্রায় ১৩৲ ছিল। এই দাম গুলি বিশুদ্ধ নীল হিসাবেই লিখিত। ১৯০০ খৃঃ কৃত্রিম নীলের দাম প্রতি সের ৯৲ দাঁড়ায় এবং ১৯০৫ খৃঃ কৃত্রিম নীল আসল নীলের অর্দ্ধেক দামে পাওয়া যাইত। সুতরাং কৃত্রিম নীল যে পৃথিবীর নীলের বাজার দখল করিয়া বসিবে তাহাতে আর কিছুই আশ্চর্য্য নাই।

কর্পূরের সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ না হইলেও কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত জাপানী কর্পূরের যে রকম কাট্‌তি ছিল এখন দিন দিনই তাহা অনেকটা কমিয়া যাইতেছে। আসল কর্পূর এক প্রকার বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। কর্পূর গাছ পূর্ব্বে জাপান, চীন ও ফরমোসা নামক দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও ছিলনা এখন ভারতবর্ষেও ইহার চাষ হইতেছে। কর্পূর গাছ ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের হইলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হয় কিছুক্ষণ পরে কর্পূর জলের উপর ভাসিয়া উঠে তখন ইহাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া বিশুদ্ধ করিলেই উত্তম কর্পূর প্রস্তুত হইল।

১৮৯৩ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মেনীর বিজ্ঞানাগারে কৃত্রিম কর্পূর প্রস্তুত হয়। তারপর ক্রমশঃ কর্পূর প্রস্তুত করিবার আরও অনেক নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে কিন্তু এই সকল উপায়েরই কিছু না কিছু দোষ আছে। প্রায় সকল উপায়েই তারপিন তৈল হইতে কর্পূর প্রস্তুত করা হইয়াছে কিন্তু তারপিন তৈলের দাম অত্যন্ত অধিক সুতরাং জাপানী জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে এমন জিনিষ হইতে কর্পূর প্রস্তুত করা চাই যাহার দাম খুব কম।

১৯০৭ খৃঃ জাপান প্রায় ১,১১,০০০ মণ কর্পূর উৎপাদন করে, ইহার মধ্যে ৫০,০০০ মণ বিদেশে রপ্তানী করে। আজ কাল সমস্ত পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১,৬০,০০০ মণ কর্পূর ব্যবহার করা হয়, ইহার প্রায় সমস্তই জাপান সরবরাহ করিয়া থাকে। চীন হইতে প্রায় ১০,০০০ মণ কর্পূর রপ্তানী হইয়া থাকে কিন্তু জাপান চীনের কর্পূরের ব্যবসায় হাত করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং চীনের কর্পূরও জাপানের হাত দিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে; বিশেষতঃ চীনে নূতন কোন কর্পূরের চাষ হইতেছে না কাজেই কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন হইতে কর্পূর রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবে।

পৃথিবীতে যত কর্পূর ব্যবহার করা হইয়া থাকে ইহার অধিকাংশই "সেলুলয়েড্" নামক এক প্রকার জিনিষ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেলুলয়েড্ হইতে প্রচুর পরিমানে খেলনা, চিরুনী, ছড়ির বাঁট, এবং বোতাম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কি পরিমান "সেলুলয়েড্ আজকাল পৃথিবীতে প্রস্তুত হইতেছে সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে একা জার্ম্মেনী বৎসরে দেড়লক্ষ মন 'সেলুলয়েডের' জিনিষ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এ বিষয় অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হইবে।

১৯০৩ খৃঃ জাপান কর্পূরের মণ প্রায় ৭৫৲ দরে বিক্রয় করিত। রুষ জাপান যুদ্ধের পর জাপান নিজকে কর্পূরের অধীশ্বর মনে করিয়া [illegible] ১৩০৲ মণ স্থির করিয়া দিল। [illegible] সুবিধা পাইয়া জার্ম্মানীতে কৃত্রিম কর্পূর প্রচুর পরিমাণে

প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং জাপানের কর্পূরের কাটতি কমিয়া গেল। কাজেই জাপান আবার কর্পূরের দাম কমাইয়া দিতে বাধ্য হইল এবং মণ প্রতি ৬০৲ দর স্থির করিল। ইহাতে আবার জাপানী কর্পূরের কাটতি বাড়িয়া গেল। জাপান কর্পূরের মণ ৫০৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলে উহার কোন লোকসান হয় না। কৃত্রিম কর্পূর আজ পর্য্যন্ত এত অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত খুব সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এমন কোন জিনিষ হইতে কর্পূর বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারা না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত জাপানের কর্পূরকে বাজার হইতে তাড়ান যাইবে না।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষে বেশ চমৎকার কর্পূরের চাষ হইতে পারে। কলিকাতা 'বোটানিকেল গার্ডেনে' সুন্দর কর্পূর গাছ আছে। দেরাদুন এবং নীলগিরি পাহাড়ে ইহা খুব সতেজ ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের জঙ্গলে কত জায়গা যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে যদি গভর্ণমেণ্টের এবং লোকের চেষ্টায় রবার বৃক্ষের মত কর্পূরেরও চাষ হয় তাহা হইলে কালে ভারতবর্ষ হয়ত জাপানের মত কর্পূর উৎপাদক দেশরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

গ্রামের পথ

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কখনো মোর ভুল হবে না
　পৌঁছোতে নিজ-গাঁয়ে,
থাকনা সেথা চৌমাথা পথ
　রাস্তা ডাঁয়ে-বাঁয়ে।
　　চোখ বেঁধে দাও, চল্‌ব সিধে
　　হাওয়ার ঘ্রাণে পাখীর গীতে
　　　পায়ের চলা চিনিয়ে দেবে
　　　　আমার প্রাণের ঠাঁয়ে!

মাঠের পথ ও ভাঁটের বন সে
　　　চিনব সতগুর,
জলের বাসে বল্‌ব এটা
　কাঁশাই নদীর চর।
　যখন প্রাণে পুলক জাগে
　জান্‌তে কি আর দেরি লাগে,—
　　মনের মাঝে বুঝ্‌তে পারি
　　　ডাকচে যখন মায়ে!

অনাদৃতা—

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

ভাদ্র মাসের প্রায় অবসান কাল অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে, সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। মেঘে ঢাকা আকাশের অন্তরাল হইতে নক্ষত্র গুলি দুটি একটি করিয়া ফুটিতেছে। গৃহে গৃহে সান্ধ্যদীপ জ্বলিয়াছে।

কলিকাতা নেবুতলা লেনে একখানি দ্বিতল বাড়ীর নীচের রান্না ঘরে বসিয়া একটি ১৬।১৭ বছরের মেয়ে কয়লার চুল্লিতে রান্না চড়াইয়া ময়দা মাখিতেছিল। মেয়েটির গায়ের বর্ণ চম্পক গৌর; অলকদামে সুশোভিত সুন্দর মুখখানি শৈবাল দলে বেষ্টিত বিকশিত পদ্ম ফুলের সহিত তুলনীয়। বসন্তে পুষ্পিতা লতার মত তরুণীর কুসুম পেলব তনু সৌন্দর্য্য প্রভায় হিল্লোলিত।

মেয়েটির নাম মৈথিলী, কিন্তু পিতা, মাতা পরিজনবর্গ তাহার মৈথিলী নামটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'মিলি' বলিয়াই ডাকিতেন। মিলি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। ভুবন মুখার্য্যে কয়লার কারবারে প্রভুত ধনের অধিকারী হইয়া প্রায় প্রৌঢ় বয়সে এই কন্যাটিকে লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং মিলির যে কিছু বেশী আদর তাহা বলাই বাহুল্য।

মেয়েটি মাখা ময়দার থালা খানা একপার্শ্বে সরাইয়া আলুরদমে ঘি, গরম মশলা দিতে দিতে মধুর স্বরে ডাকিল "ঝি, ও ঝি, রান্নাঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে যাও।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঝির পরিবর্ত্তে গৃহিণী দয়াময়ী কেরোসীনের ডিবাহস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন মেয়ের ন্যায় মা যে যৌবনে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন তাহার প্রমাণ এখনো তাঁহার শরীরে বিদ্যমান। প্রৌঢ়াদের স্নিগ্ধ লাবণ্যে ও মধুর গাম্ভীর্য্যে দয়াময়ীর চিন্তাশূন্য বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল। পিলসুজের উপর আলোটি রাখিয়া তিনি বলিলেন 'ঝি দোকানে গেছে, তোর আর কত দেরী মিলি?' "বেশী দেরী নেই মা, এই ডালনাটা হলেই পরোটা তৈরি করবো।" মা মেয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার ঘর্ম্মসিক্ত ললাট মুছাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "না তোর ঘেমে গেছে, এখন তুই বাইরে যা। মিলি' বাকী যা আছে সেরে ফেলছি।" "না, মা আমি তোমায় কিছু করতে দেবোনা। ঠাকুর বাড়ী থেকে না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায় হাঁড়ী ছুঁতেই দেবনা, বলে রাখছি। যত কাজ তুমিই চিরকাল করবে, আমি যেন কিছু জানি না।" বলিয়া মিলি অভিমানে রাঙ্গা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিল।

মা স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখে মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এত রাগে দরকার নেই বাপু, আমি তোর হাঁড়ী ছুঁতে চাই না। রান্না নিয়ে থাকলে লেখা পড়ার ক্ষতি হয় বলেই বলছিলাম।" "ক্ষতি না, ক্ষতি হয়! আর কিছু না জেনে কেবল বইয়ের বিদ্যে শিখলেই মেয়ে মানুষের চলে কি না।" মেয়ের বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী দেখিয়া গম্ভীর

কণ্ঠের কথা শুনিয়া মা হাস্যস্রোতঃ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন "তিনি ফিরে এলে আজ বল্‌বো ঝি, চাকর বামুন সব ছাড়িয়ে মিলিকে বইয়ের বিদ্যে ছাড়া অন্য বিদ্যে শিখিতে দাও।" মিলি কথা কহিল না, সাগ্রহ মুখে সিঙ্গারা বেলিয়া বেলিয়া তাহার মধ্যে আলুর পোর দিতে লাগিল। দয়াময়ী রান্নাঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া শুপারীর ডালাটি লইয়া শুপারী কাটিতে বসিলেন।

বাহিরে ধীরে ধীরে গোধূলীর ম্লান আভা মিলাইয়া গেল। প্রকৃতি দেবীর নির্ম্মল হাসির মত সুদূর দিগন্তে চন্দ্রমার শুভ্র কিরণ প্রতিফলিত হইল। কোথা হইতে রহিয়া রহিয়া শীতল বায়ু আসন্ন শীতের আগমন জানাইতেছিল।

খাবার তৈরি শেষ করিয়া উনুনের উপর দুধের কড়াটা চাপাইয়া মিলি বলিল "বাবা বুঝি এসেছেন মা; সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনলাম; তুমি গিয়ে শুনে এস তিনি কি এখন খাবেন; না একটু চা খাবেন?" ভুবন বাবু অতিরিক্ত চা-খোর ছিলেন। বাপের চায়ের ভার মেয়ের হাতে পড়িয়া মিলিও চা জিনিষটাকে অপছন্দ করিত না। বরং অনেক খাদ্য দ্রব্যের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই পছন্দ করিত। এটা ভুবন বাবু বুঝিতে পারিয়াই অনেক সময় নিজের চা পানের ইচ্ছা না থাকিলেও মিলির মুখের দিকে চাহিয়া চা তৈরির ফরমাস দিতেন। কারণ মিলি শুধু নিজের জন্য উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ভাল বাসিত না।

"তোরা সন্ধ্যের আগেই চা খেয়েচিস; এখনই আবার গলা শুখিয়ে গেচে; যেমন বাপ তেম্‌নি মেয়ে।"— বলিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহিণী স্বামীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতলে প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া অসময় স্বামীকে শয্যায় শয়ান দেখিয়া দয়াময়ী বিস্মিত হইলেন। মনে মনে উদ্বেলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এসেই তুমি শুয়ে পড়েছ যে,—শরীর তো খারাপ হয় নি?" ছোট একটি "না" বলিয়া ভুবন বাবু দুই হাতে পাশ বালিসটা জড়াইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "না বলচ, গলার সুরটাও ভারী ভারী লাগচে" বলিতে বলিতে দয়াময়ী খাটের নিকটে আসিয়া স্বামীর ললাটে ও বক্ষস্থলে হস্তদিয়া শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। ভুবন বাবু স্ত্রীকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া কিয়ৎকাল পর বলিলেন "মিলি কোথায়; এখন সে উপরে আস্‌বে কি?" "না সে রান্না করচে, তোমার চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছিল; এখনই খাবে—না চা খাবে?" "চা আর খাবনা; একটু বাদে একে বারেই খাব। একটা কথা—সুরেশ আজ বিলেত থেকে ফিরে এসেছে।" "আহা, ফিরে এসেছে; কৈ আমাদের তো একটা খবরও দিলেনা? তা না দিলে; বাছা যে আমার ভালয় ভালয় ফিরে এসেছে এই ভাগ্য বলতে হবে। তাহলে ফাল্গুন মাসেই বিয়ে ঠিক?" আনন্দের আবেশে দয়াময়ী অধীর হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীর আনন্দোচ্ছ্বাসে ভুবন বাবু একবার ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন "আমাদের আনন্দ করবার কিছুই নেই দয়া। আড়াই বছর আগে সুরেশের সঙ্গে মিলির বিয়ের কথা পাকা করে কতদূর যে অন্যায় কাজ হয়েছিল তা বলবার নয়। ফাল্গুন মাসে বিয়ের কথা বল্‌ছ; সুরেশ বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে এনেচে।" স্বামীর কথায়

দয়াময়ী স্তম্ভিত হইলেন, সহসা তাঁহার বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেই আনন্দময়ী হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিটি যেন বিষাদের কাল মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পর তিনি আর্ত্ত সকরুণস্বরে বলিলেন "আমি যে সবাইকে ফাল্গুন মাসে মিলির বিয়ের কথা বলেচি। তার আশা পথ চেয়ে কোথাও যে বিয়ের কথা পর্য্যন্ত তুল্‌তে দিই নাই। সে আমার তাকে বাগদত্ত স্বামী বলে নিজের সর্ব্বস্ব বিকিয়ে ভালবেসেছে। আজ আমি ওকে কেমন করে একথা বলি।" দয়াময়ী চক্ষে অঞ্চল দিলেন। 'শুনে মিলি ব্যথা পাবে; কিন্তু তাকে সব কথাই বল্‌তে হবে। দুঃখকে ফুলের কাঁটার মধ্যে লুকিয়ে না রেখে রুদ্র রূপেই বরণ করে নিতে হয়। মিলি এখন বড় হয়েচে; লেখা পড়া শিখেচে; তার ভালমন্দ সে সহজেই বুঝতে পারবে। শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ নেই দয়া; বিধির বিধান সবাইকে মাথা পেতে নিতে হয়।" স্বামীর সান্ত্বনা বাক্যে দয়াময়ী চক্ষুজল মুছিয়া কেমন করিয়া এবজ্র সদৃশ কথাটি মিলিকে বলিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

[২]

আহারাদির পর বারান্দায় মাদুরে বসিয়া দয়াময়ী ডাকিলেন "মিলি শুনে যা তো মা।" মিলি নিজের নিভৃত শয়ন কক্ষে প্রদীপের নিকটে বসিয়া একখানি পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লইয়াছিল। হঠাৎ মাতৃ-আহ্বানে হাতের বই খানা টেবিলের উপর রাখিয়া বারান্দায় যাইতেই মা হাত বাড়াইয়া মেয়েকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। মেয়ে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই একটু বিস্মিত হইল। একটি অজানিত আশঙ্কায় তাহার ক্ষুদ্র বক্ষস্থল আলোড়িত হইতেছিল। মার এ সহসা হৃদয় বেগের কারণ কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে সম্বন্ধে মাকে কোন প্রশ্ন করিতেও পারিল না। দয়াময়ীর প্রসারিত কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। মা স্নেহভরে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "সুরেশ আজ ফিরে এসেচে, কিন্তু একা নয়, সে মেম বিয়ে ক'রে এনেচে।" অশ্রুজলে দয়াময়ীর কণ্ঠরোধ হইল। আর অভাগিনী অনাদৃতা মিলির সর্ব্বশরীর বেতস পত্রের মত কাঁপিতে লাগিল, পদতল হইতে মৃত্তিকা যেন সরিয়া গেল। হাস্যময় জ্যোৎস্নালোকিত শোভাময়ী নীলাম্বর সহসা রূপান্তরিত হইয়া যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইল। কণ্টক শূণ্য বৃন্তচ্যুত কুসুম শয়নে সে যে এত দিন এক অনির্ব্বচনীয় মধুর স্বপ্নে বিভোর হইয়া ছিল। আজ কাহার আহ্বানে তাহার আশাময়, সৌন্দর্য্যময় সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহার সৌম্য, সুন্দর দেবমূর্ত্তি কুমারীর শুভ্র নির্ম্মল হৃদয়াকাশে চিরাঙ্কিত করিয়া—মিলি যাহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিল সেই কি আজ নিষ্ঠুর দস্যুর মত তাহার মুকুলিত জীবনের সমস্ত আনন্দ, উচ্ছ্বাস, আশা, উৎসাহ কাড়িয়া লইয়া অনাবৃত সংসারক্ষেত্রে নামাইয়া দিল। মিলি কাঁদিতে পারিলনা। তাহার নয়নে একবিন্দু অশ্রুও বহিল না। সে কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দয়াময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়ের ব্যথা যে কত গভীর, কত মর্ম্মান্তিক সেটা দয়াময়ী অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের সমস্ত ভাবোচ্ছ্বাস কষ্টে দমন করিয়া বলিলেন

"সে যা করবার করচে মা ; তা ফিরবে না। কিন্তু তুই এখন তাকে—অমন বিশ্বাস ঘাতককে ভুলে যা মিলি। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে রূপেগুণে তার চেয়েও কত ভাল ছেলে আছে ; আমাদেরও টাকার অভাব নেই।" মিলি একটি কথাও কহিলনা। মায়ের প্রচ্ছন্ন কথার আভাসে একটু বিষাদের হাসি হাসিল মাত্র। কিন্তু ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মেয়ের সেই ক্ষোভের হাসিটুকু মায়ের নিকটে গোপন রহিল না।

কিয়ৎকাল চিন্তার পর দয়াময়ী পুনরায় বলিলেন "এখন ঘুমুগে মিলি, ঢের রাত হয়ে গেচে। তাকে—সুরেশের স্মৃতি তুই মনের কোণেও আসতে দিস না। তোর সুখের জন্যে আমরা সাগর ছেঁচা রত্ন এবার খুঁজে আনব মা।" মুখখানা নিবিড়ভাবে মার কোলের মধ্যে লুকাইয়া মিলি আস্তে আস্তে বলিল "ও কথা আর বোলো না মা। তুমিই তো ছেলে বেলা থেকে আমায় শিখিয়েছিলে আমাদের দেশের আদর্শ নারী সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী আজ দুঃখে পড়ে তাদের কথা ভুলে যেতে বলচ মা ; আমি তো সেই দেশেরই মেয়ে। তুমিই গল্প করেছিলে মা, আমার দুই পিসীমার সমান ঘর না পেয়ে বিয়েই হয়েছিল না। ঠাকুর মা দুঃখ করলে তাঁরা নাকি সান্ত্বনা দিতেন, "আমরা কুলীনের মেয়ে এতে দুঃখ কি ? আমিই যে সেই কুলেরই মেয়ে। আমি তোমাদের পায়ের কাছেই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেব মা।" "পায়ের কাছে কেন মিলি, আমাদের বুকের মধ্যেই আমরা তোমায় লুকিয়ে রাখবো ; কিন্তু অযথা আমরা তোমায় সন্ন্যাসিনী হতে দেব কেন মা ? তুমিতো সুরেশের পরিত্যক্তা পত্নী নও। বিয়ের সম্বন্ধ অনেকের সঙ্গেই হয় ; আবার ভেঙ্গেও যায়। আজ তোমার মন খারাপ বলে এই সব ভাবচ ; ক'দিন পর এসব কথা আর মনে আসবে না।" "যা বলেছি সে মন খারাপের কথা নয় মা ; সত্যি কথাই বলেছি। তোমায় আমি কেমন ক'রে বলি মা বিয়ে আমাদের মনে—" মিলি আর অসম্পূর্ণ কথাটা সম্পূর্ণ করিতে পারিল না। দয়াময়ী মেয়ের দৃঢ় কণ্ঠের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি যে এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। হায়, কি অশুভ-ক্ষণে সুরেশের সহিত মিলির বিবাহের কথা স্থির করিয়া মা মেয়ের সুকুমার হৃদয়ে পতি প্রেমের অঙ্কুর বপন করিয়াছিলেন। সেই অঙ্কুর দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ যে, শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে। কি উপায়ে কোন উপাদানে তিনি ইহার মূলদেশ ছেদন করিবেন। তিনি যে বড় আশা করিয়া কন্যাকে হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজ কেমন করিয়া সেই আদর্শ সেই পবিত্রতা বিস্মৃত হইতে বলিবেন। মায়ের কণ্ঠে কোন কথাই ফুটিল না।

অনেকক্ষণ পর মিলি বলিল "মা, আমি তোমায় বড় ব্যথা দিলাম ; কিন্তু আমায় তুমি কি করতে বল, আমারও তো ধর্ম্ম আছেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো ; তিনি বলবেন আমি অন্যায় কথা কিছুই বলি নাই। বাবা আমার কথা ঠিক বুঝবেন। তিনি যে আমায় খুব ভালবাসেন।" "শুধু তিনিই তোমায় ভাল বাসেন মিলি,—আমি কি তোমায় ভালবাসি না ?" বলিয়া দয়াময়ী মিলির ললাট পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন।

[৩]

গৃহিনীর মুখে মিলির সব কথা শুনিয়া ভুবন

বাবু বলিলেন "গলি ঠিক কথাই বলেছে। মানুষের শরীরের চেয়ে মনই যে আসল। পাল্টা ঘর না পেয়ে কত কুলীনের মেয়ে চির কুমারী অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়। ও যা নিয়ে মনের শান্তিতে থাকে থাকুক। বাস্তবিক পক্ষে সুরেশই তো ওর প্রকৃত স্বামী। ধর্‌তে গেলে ও তো বিবাহিতা।" স্বামীর কথায় একটিও উত্তর না দিয়া গৃহিনী নীরবে উঠিয়া গেলেন।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মা ভাবিয়াছিলেন মিলি বুঝি রৌদ্রতাপিতা লতার মত শুষ্ক শীর্ণ হইয়া একদিন ধরা শয্যায় লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সে সব লক্ষণ না দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। মিলি কত চেষ্টায় কত আয়াসে যে আপনার অব্যক্ত হৃদয় ব্যথা পিতামাতার স্নেহদৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না।

সে দিন দ্বিপ্রহর বেলা, মায়ের পদতলে বসিয়া মিলি বলিল "বাবাকে আমাদের দেশে যাওয়ার কথা বল না মা, বাবার শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, আমারো ভাল লাগে না।" শেষের কথাটা বলিয়াই মিলি অপ্রতিভ হইয়া মুখ অবনত করিল। দয়াময়ী মনে মনে বলিলেন "সেটা আমার কাছে লুকোতে হবে না। আমি তোমার মেয়ে নয়; তুমিই আমার মেয়ে।" প্রকাশ্যে বলিলেন "ওঁর তো ইচ্ছে দেশে গিয়েই থাকেন। আমার ভয় হয় সেখানে তোর মন টিক্‌বে না।" "কে বল্লে মন টিক্‌বে না; খুব মন টিক্‌বে মা। আমি মনে করেছি দেশে গিয়ে বিদ্যারত্ন ঠাকুর্দার কাছে সংস্কৃত পড়্‌বো; আর শিশু চিকিৎসা শিখ্‌বো। মেয়ে মানুষ কব্‌রেজী শিখ্‌বে শুনে তুমি হেসোনা মা। আরো একটা কাজ করবো, আমাদের বাড়ীর পুজো দালানে মেয়েদের একটা ইস্কুল করবো। সেখানে সব জাতের মেয়েরাই লেখা পড়া শিখ্‌বে। তাদের সব শিখিয়ে আমার যে কত আনন্দ হবে মা তা তোমায় বল্‌তে পারচি না।" আশায় উৎসাহে মিলির বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই হর্ষোচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত নয়না মূর্ত্তিমতি আনন্দ প্রতিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া দয়াময়ী উত্তর দিলেন "যাতে তুমি আনন্দে থাক, শান্তি পাও তাই কোরো মিলি।"

বসন্তের প্রথম। তখনও বনলক্ষ্মী বসন্তের পুষ্প আভরণ নবীন পল্লবিত শ্যামল বসন অঙ্গ হইতে বিমোচন করেন নাই। তখনও পক্ষী কুল ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলিয়া বসন্তের আবাহন গীতি গাহিতেছিল। আকুল দাক্ষিণ বাতাস তখনো ফুল্ল কুসুমের সুগন্ধ লুটিবার আশায় ধীরে ধীরে বহিতেছিল। শুষ্ক শীর্ণ নদী জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

একটি স্নিগ্ধ প্রভাতে মুখুর্য্যেদের বাড়ীর সংলগ্ন বাঁধা ঘাটে একখানি বোঝাই নৌকা আসিয়া থামিল। নৌকার মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া মিলি মাকে বলিতে লাগিল সেই ছোট দেবদারু গাছগুলি দেখ মা কত বড় হয়ে গেচে। ওটা কি পাখী? গলা ফুলিয়ে নেচে নেচে ডাক্‌চে, ও গুলো বুঝি দয়েল না শ্যামা?"

বহুদিনের পর মেয়ের স্বাভাবিক সরল প্রশ্নে মার প্রাণে আনন্দ হইলে মা হাসিমুখে মেয়ের কথার উত্তর দিতে দিতে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

নন্দনপুর ছোট গ্রামখানার মধ্যে বসতি কম নয়। কিন্তু অবস্থা কাহারো স্বচ্ছল

ছিল না। স্বচ্ছল অবস্থা বুঝাইতে গ্রাম বাসীরা ভুবন বাবুকেই জানিত। তাঁহার বাঁধাঘাট, কোঠাবাড়ী, ফল ফুলের বৃহৎ বাগান সকলের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছিল। গ্রামের লোক ভুবন বাবুকে পল্লীর গৌরব রবি মনে করিত। কলিকাতার মত স্বর্গ বাস পরিত্যাগ করিয়া কতদিনের পর সেই উজ্জল তপনটি যখন সপরিবারে গ্রামে বাস করিতে আসিলেন, তখন পল্লীবাসীরা আনন্দ বিস্ময় গোপন করিতে পারিল না। ফলে ভুবন বাবুর আগমনে তাঁহার বাহির এবং অন্দর মহল ক্ষণকালের মধ্যেই স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ হইয়া উঠিল

দয়াময়ী স্মিত মুখে মহিলাদিগকে আদর যত্ন করিয়া বারান্দায় বসাইলেন। কাহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন, কাহারো পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সকলের চক্ষু কিন্তু মিলির খোঁজেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের আদেশে লজ্জা সঙ্কোচে রাঙ্গা হইয়া মিলি ঘরের কোন হইতে বাহিরে আসিল। গৃহিণী বলিলেন "ইনি তোমার ঠাকুরমা, ওই ওধারে বসে পিসীমা, এঁদের প্রণাম কর মিলি! ঠাকুরঝি, খুড়ীমা, তোমরা মিলিকে আশীর্ব্বাদ কর। এই আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন।" চারিদিক হইতে রমণীগণ সহানুভূতির স্বরে উত্তর করিলেন" আহা তা বৈ কি! থাক্ মা অত প্রণামে কাজ নেই; এমনি তোমায় আমরা আশীর্ব্বাদ করচি।" "হ্যাঁ ভাই বৌ, সেই ছেলেটির সঙ্গেই মিলির বিয়ে হয়েচে?" প্রশ্নকারিনী গ্রাম সম্পর্কে ভুবন বাবুর ভগিনী হন। দয়াময়ী তাঁহার কথা শুনিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মৌনে সম্মতি লক্ষণ বুঝিয়া বিরজা ঠাকুরঝি তেমন প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। শ্বশুর বাড়ী হইতে মেয়ে কোন কোন গহনা যৌতুক পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিলির সীমন্তের উপর নিপতিত হইল। তিনি শিহরিয়া বলিলেন 'হ্যাঁ বৌ, একি দেখচি মিলির সিঁথেয় সিন্দুর নেই, হাতে লোহা নেই—তবে কি—বাধা দিয়া বিপন্ন কণ্ঠে দয়াময়ী বলিলেন "ষাট, সুরেশ আমার চিরজীবী হোক।" "তবে মেয়ে ওসব পরে না কেন? আর তোমার কাছেই বা রয়েচে কেন?" "ওর অদৃষ্ট আমার কাছে ওকে রেখেছে ঠাকুরঝি, সে তোমরা বুঝ্‌বে না ভাই। সে আবার বিয়ে করেচে বলে—" ঠাকুরঝি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন "এইবার সব বুঝেছি বৌ, আর বল্‌তে হবে না। আদুরে মেয়ে রাগ করে সতীনের ঘর করে না। তোমরা আবার তাতে প্রশ্রয় দেও; সেকালে কুলীনের মেয়েরা স্বোয়ামীর যত বেশী বিয়ে হ'ত ততই গরব মনে করতো। এটা কলিকাল কি না সবই উল্টো। মেয়ে মানুষ সে আবার মুনিষ্যি; এ জাত তো পুরুষের জুতোর কাদা, দয়া করে পায়ে তুলে নেয় বিলক্ষণ, নইলে জুতোর সঙ্গেই লেগে থাকতে হয়।" এই মন্তব্যে এত দুঃখেও মিলি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

[৪]

গ্রামবাসিনিগণ সধবার হাতে লোহা এবং সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু না দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিলির কল্যাণে তাঁহাদের যে আর কতকি দেখিবার শুনিবার বাকী ছিল সেটা বেচারীরা কল্পনা করিতেও পারেন নাই।

নন্দনপুর আসিবার কয়েক দিন পরেই মিলি বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন ঠাকুর্দ্দার নিকটে সংস্কৃত

পড়া আরম্ভ করিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ চিকিৎসা প্রণালী আয়ত্ত করিতে যত্নবতী হইল। অল্পকালের মধ্যেই মুখুর্য্যেদের পূজার দালানে বালিকাদের স্কুল বসিল। ইতিপূর্ব্বে এ গ্রামে মেয়েদের শিক্ষালয় বলিয়া স্থান বালাই ছিল না। এই প্রথম সনাতন বিধির নিয়ম ভঙ্গে মাতব্বররা আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুবন বাবুর প্ররোচনায় মিলির চেষ্টা যত্নে সর্ব্বোপরি বিনা বেতনে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় সকলের অসম্মতির কারণ ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। বালিকাদের সহিত ছোট ছোট বালকরা তাহাদের মিষ্টভাষিনী দেবী প্রতিমার মত অপূর্ব্বরূপশালিনী 'মার' নিকটে পড়িতে লাগিল।

ভুবন বাবু স্কুলের সমবেত বালক বালিকা দিগকে মিলিকে 'মা' বলিয়া ডাকিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। এতগুলি কণ্ঠের মাতৃ সম্বোধনে প্রথমে মিলি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া উঠিত, চোখ তুলিয়া কাহারো কথার প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। কিন্তু কালে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, নূতন পুরাতন হয়, পুরাতন আবার নূতনের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নব আশায় নবীন আনন্দে শুষ্ক ধরণী বক্ষে নবীনতার উৎস ছুটাইয়া দেয়। এখন আর মিলির কর্ণে অমিয়বর্ষী কচি কণ্ঠের 'মা' বাণী বিসদৃশ বোধ হয় না। বরং ঐ সুধার ঝঙ্কারে তাহার অন্তঃকরণটি অমৃত প্রবাহে পূর্ণ হইয়া উঠে। জগতের দুঃখ, দৈন্য, অভাব, বেদনা তাহাকে স্পর্শ করিয়া বিচলিত করিতে পারে না।

সুরেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া রঙ্গিনীদের অবিরাম রসনা সম্প্রতি বিশ্রামলাভ করিয়াছে। এখন মিলির বিষয়ে কোন কথা কাহারো মনের মধ্যে একটিবারও উদয় হয় না। জ্ঞান, প্রতিভাশালিনী নারী দিনে দিনে সকলের হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসন খানি আপনার জন্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখন মিলি না হইলে একটি দিনও কাহার চলিবার উপায় নাই। নিরক্ষর জননীদের অবোধ সন্তানরা মিলির কৃপায় ধীরে ধীরে মানুষে পরিণত হইতেছিল; ভাত বাড়িতে দেরী হইলে এখন আর তাহারা মাকে প্রহার করে না ছিন্ন বস্ত্র সুন্দর রূপে রিপু করিয়া দরিদ্র বালিকারা মায়ের অনেক সহায়তা করে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য যত্নপূর্ব্বক চরকায় সূতা কাটে।

ভুবন বাবু মিলিকে উৎসাহ দিবার, জন্য বাড়ীতে দুই খানি তাঁত করিয়াছিলেন বালক, বালিকারা বৃদ্ধ তাঁতীদের নিকটে নিয়মিত রূপে কাপড় বুনাইবার প্রণালী শিখিয়া লয়।

মেয়ের হর্ষদীপ্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া দয়াময়ীর অন্তর হইতে বেদনার মেঘ মুছিয় গিয়াছিল। এখন সুকোমল মাতৃ হৃদয় খানি সন্তানের গৌরবে সমুজ্জ্বল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া মাসের পর মাস ফুরাইয়া বর্ষের পর বর্ষও অতীত হইতেছিল।

৫

সে দিন প্রভাতে একটি যুবক মুখুর্য্যেদের ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া ধীবর বালককে জিজ্ঞাসা করিল "ভুবন বাবুর বাড়ী কোন পথে যাবরে।" বালক অঙ্গুলি তুলিয়া উত্তর দিল "ওই সাম্‌নের বাড়ী সিধে চলে যান বাবু; যেখানে মেয়েনোক কেতাব নিয়ে বসেছে সেই

খানে থাম্‌বেন।” যুবক ধীরে ধীরে চিন্তা-কুলিত বদনে আকা বাঁকা পথ দিয়া ভুবন বাবুর বাহির মহলের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। কিন্তু সেখানে জন সমাগম না দেখিয়া দালানের দিকে অগ্রসর হইল। যুবকটির বয়স বোধহয় ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, গায়ের বর্ণ গৌর। চক্ষে সুবর্ণের চশমা; মাথার কেশগুলি বাঁকা সিঁথায় সুশোভিত। পরিপাটী বেশভূষা দুইদণ্ড কাল চাহিয়া দেখিবারই বস্তু।

মিলি কয়েকটি মেয়েকে পড়া বলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াই স্তম্ভিত হইল। এত দিনের পর এ সুদূর পল্লীতে অকস্মাৎ সুরেশ আসিল কেমন করিয়া! একি স্বপ্ন না ইন্দ্র জাল! নিমেষের মধ্যেই মিলি নিজেকে সংযত করিয়া লইল। বারান্দার কোণে এক খানা চৌকি ছিল সেখানা অঞ্চল দিয়া ঝাড়িয়া শান্ত স্বরে বলিল “আসুন, এই খানে বসুন, বাবা বাড়ী নেই, একটু বাদেই আসবেন।” সুরেশ মন্ত্রচালিতের মত মিলির নির্দ্দিষ্টস্থানে বসিয়া মিলির দিকে চক্ষু মেলিয়া বলিল “আমি এই পথেই যাচ্ছিলাম; তাই—তাই তোমার সাথে একবার দেখা করে গেলাম, ভুবন বাবুর কাছে আমার তেমন দরকার নেই।” সুরেশের গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পর সে পুনরায় বলিতে লাগিল “তোমায় আমি একটা কথা বলতে চাই তুমি কি শুনবে?” “শুনবো বৈ কি; বলুন।” “আমি যে তোমাদের কাছে কত অপরাধী তা এখন বুঝতে পারচি। ক্ষমা চাইবারও মুখ রাখিনি। তবুও এসেছি;—যার মোহে তোমার মত রত্নকেও উপেক্ষা করেছিলাম মিলি সে আমাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছে। যদি আমি তোমার মহৎ কাজের কিছু করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, সেই আশাতেই এসেছি। তোমার সুন্দর জীবনটি ব্যর্থ করে দেবার অনুতাপ যে আমার কত মর্ম্মান্তিক মিলি, তা কাউকে বোঝাবার নয়।” “কে বল্লে ব্যর্থ করে দিয়েচেন? কিসের অপরাধ, কিসের ক্ষমার কথা বলচেন? কোন বিলাসের পঙ্কে কোথায় আমি ডুবে পড়ে থাকতাম; আমাকে দিয়ে জগতের কতটুকু কাজ হ’ত? আজ আপনার দয়ায় আমার নারীত্বের, আমার মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। আনন্দের পথ—শান্তির পথ আমি খুঁজে নিয়েছি। ভগবান আপনাকে কল্যাণ পথ—উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবেন।” অনুচ্চ স্বরের মধুর কথা গুলি শুনিয়া সুরেশ বিস্মিত হইল। কি সুন্দর ক্ষমাভরা কণ্ঠস্বর ইহাতে ক্ষোভ নাই, ব্যথা নাই, দীনতা নাই। আছে কেবল স্বর্গীয় বীণা ঝঙ্কারের মূর্চ্ছনা। সেই অবাকপটু বালিকার কণ্ঠ সঙ্কোচ, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সুরেশ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া একদৃষ্টে দেবী প্রতিমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘরের মধ্য হইতে একটি বালিকা ডাকিল “মা আমাদের পড়া তৈরি হয়েচে”। আর একটি ডাকিয়া বলিল “মা, টেকোয় থেকে সুতো এখন তুলতে হবে।” কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র বালক আধ আধ কণ্ঠে বলিল “মা, এস, দেখে যাও আমাদের কত নেওা হয়েছে।” জন্ম অন্ধ সনাতন ভিক্ষান্নে আপনার উদর পূর্ণ করিতে না পারিয়া ভুবন বাবুর নিকট কাঁদিয়া পড়িয়াছিল মিলি তাহাকে চাটাই বুনাইবার কাজ দিয়া তাহার অন্ন বস্ত্রের উপায় করিয়া দিয়াছে।

সনাতন প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বসিয়া চাটাই বুনিতেছিল। সকলের মুখে ‘মা’

শুনিয়া সেও ডাকিয়া বলিল "দেখে যাও তো মা, এ চাটাই খানা আর বড় হবে কি ?" মিলি সহাস্য মুখে সকলের কথারই উত্তর দিয়া সুরেশকে বলিল "আপনি যার সাথে দেখা কোরবেন চলুন। বাবাও এখুনি আসবেন।" "আমি আর দেরী করবো না ; মাকে ভুবন বাবুকে আমার নমস্কার দিয়ো। আমি এখন যাই,—হয় তো এজীবনে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। পার যদি চেষ্টা করে আমার সব অপরাধ মাপ কোরো মিলি।" "বার বার ক্ষমার কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনার কোন অপরাধের কথাই আমি মনেকরে রাখিনি। এখানে আমাদের আর দেখা না হলেও সেখানে হতে পাবে আপনি পরলোক মানেন না—আমি কিন্তু মানি।" বলিয়া মিলি দূর হইতেই সুরেশকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।" স্বপ্নাবিষ্টের মত সুরেশ মুখুর্য্যে ভবন পরিত্যাগ করিয়া নদীর পথ ধরিল। তাহার কাণে এবং প্রাণে বারংবার সেই 'মা মা' শব্দ ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল।

তখন নীলাকাশের ঘোমটা খুলিয়া উষা রাণী প্রকাশিত হইয়াছিলেন। বসন্ত সমাগমে ফুলের বনে হিন্দোলা লাগিয়াছিল। কাননে বিহগের অফুরন্ত কাকলীতে বনপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন দূর্ব্বাদলে শিশির কণা ঝল মল করিতেছিল। কৃষক যুবকেরা লাঙ্গল কাঁধে হালের গরুর পশ্চাৎ হইতে গান ধরিয়া ছিল "আরসী দিছি ; চিরণ দিছি চুল বাধনের ফিতা দিছি, আর কি দেওন যায়। বাজার ধরে চাদে আনে দিছি তোমার পায়।"

প্রকৃতির মনোমোহন বেশে, কৃষকের গাম্য সঙ্গীতে সুরেশের জ্বালাময় চিত্ত জুড়াইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল যে জগতের মা তাহাকে আমি কি প্রলোভনে ভুলাইতে আসিয়াছিলাম। মহা মাতৃত্বের নিকটে মানুষের প্রেম তৃণদলে নিপতিত শিশির বিন্দুর মতই ক্ষণস্থায়ী। হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা মিলির উদ্দেশে অর্পণ করিয়া সুরেশ নৌকায় উঠিল।

"যে পশু শক্তির উপাসক সে কখনও মুক্তির অধিকারী নয়—জগতে—একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিযোগীতাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক—অন্যথা মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায় ?"

"জোঁকের গায়ে জোঁক"

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

(১)

একখানি সবুজ বর্ণের "মোটর" একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া বিখ্যাত মণিবিক্রেতা ইহুদি সওদাগর ফ্যাগিনের দোকানের সম্মুখে সশব্দে থামিয়া গেল।

মোটর হইতে একটী দীর্ঘাকৃতি, শ্যামবর্ণা, বহুমূল্যপরিচ্ছদপরিহিতা সুন্দরী রমণী নামিলেন। মোটরচালককে কিছুক্ষণ সেই-স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুন্দরী দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অতি ভদ্র অমায়িকস্বভাবসম্পন্ন ফ্যাগিন্ সসম্মানে রমণীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আদেশ পালনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ফ্যাগিন্ অতি চতুর ব্যবসায়ী—তাহার জাতি ও ব্যবসা হইতেই আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। এবং খ্যাতিও এ কথার পূর্ণ সমর্থন করিত।

ফ্যাগিন্ রমণীকে ভদ্র অভিবাদন জানাইয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানি চেয়ার প্রদান করিল। ফ্যাগিনের আদব কায়দা পূর্ণমাত্রায় দুরন্ত ছিল।

রমণী চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনিই ফ্যাগিন্?"

মণিবিক্রেতা নমস্কার জানাইয়া বলিল—"আমিই ফ্যাগিন্; আপনার কি চাই আদেশ করুন।"

"আপনিই সেই ফ্যাগিন্ যাঁর নাম সহরের চারিদিকে এত রাষ্ট্র?"

মণিবিক্রেতা এবার একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—"নাম জিনিষটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা; তবে যদি সাধু ব্যবহারের দ্বারা আমি সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রতে পারি, তবে সেটাকে আমি আমার সকল মণির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মণি মনে করি। কারণ তার জন্যই আপনার মত ক্রেতাকে আমি দোকানে পেয়েছি।"

"আপনার প্রশংসাবাক্য দেখছি আপনার মণিমাণিক্যের মতই উজ্জ্বল—ঝক্ ঝকে।"

"ভদ্রে, প্রশংসা ও মণি দুইই সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত উপহার। আমি সুন্দরীকে যেমন আনন্দের সহিত মণি বিক্রয় করি, ঠিক তেম্নি আনন্দের সহিত মুক্ত কণ্ঠে আমি সৌন্দর্য্যেরও প্রশংসা ক'রতে পারি।

এমন মধুর অমায়িকতার সহিত ফ্যাগিন্ এই কথা গুলি বলিল যে ইহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পরে তাহারা উপস্থিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রমণী একছড়া মুক্তার নেক্‌লেস্ চাহিলেন।

ফ্যাগিন্ রমণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে কল্পনা করিয়া লইল—শ্যামাঙ্গিনীর শ্যামশোভা মুক্তা অপেক্ষা হীরকে মানাইবে ভাল। রমণী মুক্তা পছন্দ করিয়া ভুল করিতেছেন।

ফ্যাগিন্ একটু চিন্তিত ভাবে বলিল—"হাঁ, অবশ্য আপনি যদি মুক্তাই পছন্দ করেন, তবে মুক্তার নেক্‌লেস্‌ই দিতে হবে।"

রমণী এ কথায় ব্যবসায়ীর মুক্তাদানে অনিচ্ছা অনুভব করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—"আমার স্বামী আমাকে মুক্তার নেক্‌লেস্‌টি উপহার দিতে চান।"

"ভদ্রে, আমি আপনার ও আপনার স্বামীর ইচ্ছা বেশ বুঝেছি"—এই বলিয়া ফ্যাগিন্‌ সুন্দরীর মন ভুলাইবার জন্য নানা রূপ সুন্দর সুন্দর মুক্তার নেক্‌লেসের বাক্স তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিতে লাগিল।

যে মণিব্যবসায়ী হয় তাহার অবশ্য মানব চরিত্র বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বহুদর্শিতার ফলে ফ্যাগিনের পরিদর্শন শক্তি অতিশয় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হইয়াছিল।

রমণী বাক্স গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—"আপনার এগুলির মধ্যে একটীও আমার পছন্দ নয়।"

"আচ্ছা, তাতে কি? আরো কত রকম মুক্তা আছে—আমার দোকানে মুক্তার কিছু কমি নেই—তবে দামও রকম রকম আছে।"

রমণী হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, তা জগতে স্বামীও রকম রকমের আছে। দামের জন্য আপনার ভাববার দরকার নেই।"

ফ্যাগিন্‌ বলিল—"অবশ্য, অবশ্য, তাতে আর সন্দেহ কি! এখন আমি সব বুঝে নিয়েছি। আপনি চান যে আপনার বহুমূল্য স্বামীর মত তাঁর দানটীও বহুমূল্য হবে। কেমন কি না?"

"হাঁ ঠিক তাই।"

ব্যবসায়ী, প্রদর্শিত বাক্স গুলি সশব্দে বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পর সে রমণীকে বলিল—"আপনি ক্ষমা ক'রবেন. কিন্তু অভিজ্ঞতা হ'তে মানব চরিত্রের সম্বন্ধে আমার যে অল্লাধিক জ্ঞান হ'য়েছে, তা হ'তে আমি ব'লছি—আপনি একটা মস্ত ভুল ক'রছেন।"

রমণী বিস্ময়ে ব্যবসায়ীর দিকে চাহিলেন। ফ্যাগিন্‌ বলিল—"আমার কথার কোন কু অর্থ ক'রবেন না। অবশ্য আমি যখন দোকানদার, তখন ক্রেতা যা চান তাই আমার দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিবেদন ক'রচি যে আমি শুধুই ব্যবসাদার নহি—কারণ চামারও তো ব্যবসাদার—কিন্তু আমার একটু শিল্পকলার জ্ঞান আছে—একটু সৌন্দর্য্যবোধ আছে। সে জ্ঞান হ'তে আমি বলি কি আপনি মুক্তা ছেড়ে হীরক পছন্দ করুন।"

রমণী বলিলেন—"কিন্তু আমার স্বামী যে—"

—"আপনার স্বামীরও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। আপনি ইতস্ততঃ ক'রছেন—কিন্তু দাঁড়ান্—" এই বলিয়া ফ্যাগিন্‌ একটী ড্রয়ার হইতে একগাছি বহুমূল্য হীরকের নেক্‌লেস্‌ বাহির করিয়া রমণীর সম্মুখে স্থাপন করিল।

ক্ষুদ্র বৃহৎ হীরকখণ্ডে খচিত উজ্জ্বল কণ্ঠহার—সূক্ষ্ম সুবর্ণ শৃঙ্খলে হীরক গুলি পরস্পর গাঁথা! উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে তাহাদের অপরূপ লাল ও হরিৎ আভা কমনীয় দীপ্তিতে চতুর্দ্দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

এমন রমণী কে আছেন যিনি হীরকের দীপ্তি দেখিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে না চান? ব্যবসায়ী নিপুণতার সহিত রমণীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফ্যাগিন্‌ চতুর ব্যবসায়ী—সে রমণীর মনোগত ভাব বুঝিয়া লইল। তখন সে বলিল—"ত্রুটী মার্জ্জনা ক'রবেন"

-এই বলিয়া সে রমণীর কণ্ঠে সেই অপরূপ কণ্ঠহার পরাইয়া দিল।

রমণী সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণে আপনার মুর্ত্তি দেখিলেন। আনন্দের আবেগে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রমণী বলিলেন —"কিন্তু আমার স্বামী যে—"

ফ্যাগিন্ বলিল—"আপনি ও কথা রাখুন। তিনি আপনাকে এই কণ্ঠহারে কেমন দেখায় তা তো আর দেখেন নি। তা ছাড়া, ব্যবসায়ীর জিনিষ বিক্রয় নিয়ে কথা। আমি এক মতলব ঠাউরেছি।"

রমণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু দাম কত?"

"পাঁচ হাজার টাকা—এর একটী পয়সাও কম নয়।"

"তা হ'লে এ আমার নেওয়া হবে না। অন্ততঃ আজ তো হবেই না—"

"আমিও ঠিক ঐ কথাই আপনাকে ব'লতে যাচ্ছিলুম। আমি কাল এ হার আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

রমণী ব্যবসায়ীর দিকে চাহিলেন। ফ্যাগিন্ মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। আনন্দের আতিশয্যে সে যে কিরূপ অব্যবসায়ীর মত আচরণ করিতেছিল তাহার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গেল। রমণীর মুখে কেমন একটা কোমল মাধুর্য্য ছিল। তা ছাড়া তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক; হৃদয়কে অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করে। ফ্যাগিন্ যেন চক্ষুর সম্মুখে রমণীর ধনবান স্বামী ও তাহাদের সুন্দর গৃহ খানির ছবি উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইল।

রমণী ব্যবসায়ীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

(২)

পরদিন বেলা ১২টার সময় ফ্যাগিন্ সহরের—নংস্থ ভবনের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিল। সম্মুখে সুদৃশ্য ভবন। ফ্যাগিন্ রাত্রে ডিরেক্টারি খুলিয়া রমণীর স্বামীর নাম ঠিকানা প্রভৃতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া লইয়াছিল। সে দেখিল রমণীর স্বামী সহরের একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার।

কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী এক ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভৃত্য ফ্যাগিন্‌কে প্রাসাদের বাম পার্শ্ববর্ত্তী একটী বৃহৎ কক্ষে লইয়া উপস্থিত করিল।

ফ্যাগিন্ দেখিল পূর্ব্বদিনের পরিচিতা রমণী তাহারই প্রত্যাশায় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন।

ফ্যাগিন্ গৃহে প্রবেশ করিলে রমণী চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি হীরকের নেকলেস্‌টী এনেছেন তো?"

ব্যবসায়ী হাসিয়া আপনার ব্যাগ হইতে সেই নেক্‌লেসের বাক্সটী বাহির করিল। তাহার পর সে বলিল—"আসুন, আপনার গলায় আমি এ গাছটী আগেই পরিয়ে দিই। আপনার স্বামী দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন"

"কিন্তু কথা এই—এত বেশী দাম শুনেই আমার ভয় হয়েছে। তাই কাল আমি তাঁকে এর দামের কথা বলতে সাহস করিনি।"

"আপানার কিছু ভাবনা নেই—এর ফল যা হবে তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আর এর দাম এমনই কি বেশী—আপনার স্বামী বড়লোকের বাড়ী দুটো 'ডাক' পেলেই এর দাম উঠে যাবে।"

"কিন্তু আসল ব্যাপারটা হ'চ্ছে এই—আমার স্বামী সংসারের বিলাসপ্রিয়তাকে বড় ঘৃণা করেন। তিনি এ সব বাজে খরচ কর্ত্তে চান না। তিনি বলেন এ সব পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"তা হলে তো এ জগতে আমারও স্থান নেই—তাঁরও স্থান নেই। কিন্তু আপনি তো এটা কেনবার একটা কিছু মতলব ঠাউরেছেন?"

রমণী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"হাঁ আমি একটা মতলব ঠিক করেছি। সামান্য একটু রহস্যের অভিনয়—সামান্য একটু প্রতারণা—তা সে এমন কিছু দোষের নয়।"

"আমি তা আগেই বুঝেছি—আপনারা স্ত্রী জাতি। এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।"

"আপনি তো বুঝেছেনই—আমি এই নেকলেসটা চাই; তা এর জন্যে যদি সামান্য—"

ফ্যাগিন্ রমণীর বাক্য পূর্ণ করিয়া বলিল—"যদি সামান্য চতুরালি কর্ত্তে হয়, তা'তেও আপনি পেছপাও নন।"

"আপনি ঠিক বুঝেছেন আমি তাও ক'রব। এখন হারছড়াটা গলায় দিয়ে আমার স্বামীর বাইরের ঘরে যাই—এ দেখলেই তাঁর এত ভাল লাগবে যে তখন আর তাঁর টাকার কথা মনে থাকবে না। তিনি দাম ফেলে দেবেন।"

ফ্যাগিন্ নিমেষেই এ মতলবের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। তখন সে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সসম্মানে হারগাছটী রমণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

রমণী ঘাড় বাঁকাইয়া দর্পণে একবার নিজের চেহারাটী দেখিয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন—"আমি ডাকলেই আপনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন।" তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে একটী দরজা খুলিয়া—আর একবার ব্যবসায়ীর দিকে আপনার মধুর হাস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া—স্বামী সন্দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেলেন।

(৩)

ফ্যাগিন্ রমণীর আহ্বানের প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিল। হারগাছটীর বিক্রয় সম্বন্ধে তাহার মনে কোনই দ্বিধা ছিল না। সম্মুখে হিমালয়ের একটী সুন্দর ছবি টাঙ্গান ছিল। সে নিবিষ্টমনে গিরিরাজের অতুল শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৫ মিনিট—৭ মিনিট—১০ মিনিট অতীত হইল—কিন্তু রমণীর আহ্বান আসিল না। ঠিক সেই সময়ে একখানি "মোটর" সশব্দে বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া তীর বেগে ছুটিয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী সেই ভৃত্য উপস্থিত হইয়া বলিল—"এই দিকে আসুন, প্রভু এইবার আপনাকে দেখবেন।"

ফ্যাগিন্ আপনার ব্যাগটী উঠাইয়া লইয়া ভৃত্যের অনুসরণ করিল।

এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে একটী খর্ব্বাকৃতি উজ্জ্বলচক্ষু চশমাপরিহিত ব্যক্তি নীরবে বসিয়া ছিলেন।

তিনি উঠিয়া ফ্যাগিন্‌কে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর তাহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিয়া তিনি বলিলেন—"আজ দিনটী বেশ পরিষ্কার।"

ফ্যাগিন্ সম্মতিসূচক শিরশ্চালন করিল।

"আমার ব্যবসায়ে দিন ভাল মন্দ হওয়ার উপরে অনেক ব্যাপার নির্ভর করে।" তাহার পর তিনি গল্পচ্ছলে বলিলেন—"ডাক্তারেরা অনেক সময় রোগের ক্ষুদ্র কারণ গুলি উপেক্ষা করেন। তার কারণ তাঁরা পাণ্ডিত্যবলে সূক্ষ্ম

তত্ত্বের জন্যই ব্যাকুল হন। সেই অতিরিক্ত ব্যাকুলতাতে তাঁরা রোগের স্থূল সহজ কারণগুলির কথা অবহেলা করেন।"

ফ্যাগিন্ এরূপ অপ্রাসঙ্গিক গল্পের অবতারণায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তথাপি সে প্রকাশ্যে ডাক্তারের কথাগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বলিল—"আমার ব্যবসায়েও সফলতা লাভ ক'রতে হলে সকল জিনিষ তন্ন তন্ন ক'রে লক্ষ্য ক'রতে হয়। মণি ব্যবসায়ে কোন জিনিষ বিনা পরীক্ষায় মেনে নিলে—ভয়ানক বিপদ।'

"তা হলে, আপনি হ'চ্ছেন একজন মণি-ব্যবসায়ী ?"

"সে বিষয়ে সন্দেহ ক'রছেন যে ?"

ফ্যাগিন্ এ প্রশ্নে মনে মনে বিস্মিত হইয়াছিল।

সে একটু দৃঢ়স্বরে বলিল "আমিই এ সহরের মণি-বিক্রেতা ফ্যাগিন্—আর আমি আজ আপনার কাছে আপনার স্ত্রীর মনোনীত সেই হীরক-হার বিক্রয় ক'রতে এসেছি।"

ডাক্তার শান্তভাবে উত্তর করিলেন— "হাঁ, হাঁ, তা ঠিক। হীরকহার!—ঠিক কথা! কিন্তু আমার স্ত্রীর জন্য—তাই না বল্লেন ?"—এই বলিয়া ডাক্তার ডেস্কের উপরিস্থ একটী খাতায় কি লিখিলেন।

ফ্যাগিন্ বিশেষ একটু থতমত খাইয়া রুমাল দিয়া কপাল মুছিল। তারপর বলিল— "আজ্ঞা হাঁ,—আপনারই স্ত্রীর জন্য। তিনি এক মুহূর্ত্ত আগেই তো এই ঘরে আপনার কাছে ছিলেন।"

ডাক্তার ধীরভাবে বলিলেন—"হাঁ ঠিক, ঠিক; আপনি একটী হীরক হার বিক্রয় কর্ত্তে চান। রমণী আমাকে যা বলেছিলেন ঠিক তাই তো দেখছি। কিন্তু মহাশয় বলুন তো, যে রমণীর কথা আপনি বলছেন—তিনি কবে হ'তে আমার স্ত্রী হলেন ?"

এইবার ফ্যাগিন্ উত্তেজিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল-'মহাশয়, ক্ষমা করবেন। আপনি কি আপনার রোগীদের মত পাগল হয়েছেন ? অথবা আমাকে নিয়ে তামাসা করছেন ? আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একগাছি হীরক হার বিক্রয় ক'রতে এসেছি। আপনার স্ত্রী কোথায় ? আপনার এই ঘর— না হ'লে আমি আপনাকে এই জিনিষ দিয়ে অভ্যর্থনা করতুম।" ফ্যাগিন পকেট হইতে একটী পিস্তল বাহির করিল।

ডাক্তার কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার ডেস্কের উপরিস্থ ঘণ্টাটী বাজাইলেন তৎক্ষণাৎ দুইজন সবলকায় ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিয়া ফ্যাগিন্‌কে একেবারে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ফ্যাগিনের হস্তস্থিত পিস্তল কাড়িয়া তাহারা টেবিলে স্থাপন করিল। ডাক্তার খাতায় আবার কি লিখিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফ্যাগিন্ বহুদর্শী লোক এরূপ বিপদ পূর্ব্বেও তাহার হইয়াছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। বিস্ময়ে সে আত্মহারা হইয়া গেল সুতরাং সে মুক্তির চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া এই অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবিতে লাগিল।

সহসা তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল সে তখন ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মহাশয়।"

ডাক্তার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন- "কি, এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে ?''

ফ্যাগিন্ ঢোঁক গিলিয়া বলিল—"হাঁ ডাক্তার মহাশয়, ঐ চেয়ারের পাশে আম

ব্যাগ রয়েছে—আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঐটী খুলুন। আর আপনার এক জন চাকরকে বলুন সে আমার কোটের পকেট হ'তে 'পকেট্ বুক্'টা বার ক'রে আপনার হাতে দিক্। আমি আপনাকে বোঝাতে চাই যে এ ক্ষেত্রে এক ভয়ানক ভুল হয়েছে। আপনি এবং আমি দুজনেই প্রতারিত হয়েছি।"

ফ্যাগিন্ এই কথাগুলি এরূপ আন্তরিকতার সহিত উচ্চারণ করিল যে ডাক্তার তদনুযায়ী কার্য্য না করিয়া পারিলেন না। তিনি ব্যাগটী খুলিয়া তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন। সেই বাক্সের উপর সোণার জলে লেখা ছিল :—

মেসার্স ফ্যাগিন্ এণ্ড কোং—
মণি-বিক্রেতা।

ডাক্তার ইহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কি ভয়ানক চালাকি!" তিনি যেন সহসা অন্ধকারে আলোক লাভ করিলেন। "এখন আমি সব বুঝতে পারলুম—এখন বুঝলুম কে মিঃ ফ্যাগিন্, আর কেই বা সেই রমণী।"

ফ্যাগিন্ বলিল—"বস্তুতঃ মহাশয়, আমরা দুজনেই এই অদ্ভুত জুয়াচুরি ব্যাপারের স্থূল ও সহজ লক্ষণগুলি উপেক্ষা ক'রেছি। আমার কাছে সেই রমণী দেখিয়েছিল যে সে আপনারই পত্নী, আর সে আপনাকে দিয়ে একগাছি বহুমূল্য হীরক হার ক্রয় করাবার জন্য একান্ত লালায়িত।"

ডাক্তার বলিলেন—"আর আমার কাছে এসে সে বলেছিল—মহাশয়, আমি বড় বিপদগ্রস্ত। আমার স্বামী একজন বিখ্যাত দালাল; সম্প্রতি কাগজের দর কমে যাওয়ায় আমার স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তাঁর বিকারের প্রধান লক্ষণ এই—তিনি আপনাকে একজন মণিবিক্রেতা মনে ক'রে সর্ব্বদা একগাছি বহুমূল্য হীরক হার বিক্রয় করতে ব্যাকুল। মহাশয়, আপনি যদি কৃপা ক'রে একবার আমার স্বামীকে পরীক্ষা ক'রে দেখেন তবে এ হতভাগিনীর বড়ই উপকার করা হয়।—কি ভয়ানক শঠতা! মিঃ ফ্যাগিন্ আপনার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। হার ছড়াটীর অনেক মূল্য ছিল, কেমন?"

"মহাশয় তার এমন মূল্য, যে যদি সে রমণী ঐ গাছটী আমার সহব্যবসায়ী অন্য কোন লোকের কাছ হ'তে নিয়ে পালাত তা হলে আমি মনে করতুম—হাঁ, এমন ধৈর্য্য এমন বুদ্ধিমত্তার উপযুক্ত পুরস্কার হয়েছে বটে! ডাক্তার মহাশয়, এখন যদি আপনি আমাকে মুক্তি দেন তা হলে আমি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বলি। যদি আর কিছুই না ক'রতে পারি, তা হলে অন্ততঃ এ লজ্জার ব্যাপার যাতে ছাপাখানার কানে না ওঠে সে বিষয়ে চেষ্টা ক'রতে পারি।"

ডাক্তার পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া মণিবিক্রেতাকে [illegible]
দি

[শ্রীঅমূল্য কুমার ভাদুড়ী]

...এবম সৃষ্টি হ'ল—সেইদিন ...কেই তাব দাবী হ'ল কতকগুলো অধিকারে—সে অধিকার ভগবান ছাড়া আর কা'রো 'হাত তোলা' দান নয়, তার জন্যে তাকে—কা'রো মুখ চেয়ে থাক্‌তে হয় নি,—রাজকীয় বিধানের অপেক্ষা রাখ্‌তে হয়নি,—সমাজের কাছে আব্দার আবেদন কর্ত্তে হয়নি—সে গুলো সদ্যজাত শিশুর কান্নার মত মানুষের জন্মগত অধিকার।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষের এ বৈষম্য ভাব ছিল না—তখন সবাই ছিল স্বাধীন,—সবাই ছিল সমান—। কেও কাকেও খর্ব্ব কর্ব্বার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্ত্ত না, বহুপ্রসূ বসুন্ধরা তখন সকলেরই সমান সম্পত্তি—কাঞ্চন কৌলীন্য তখন মজুরের রক্ত শুষে খেয়ে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ত না, মানুষের লাল রক্ত যে কখনো নীল (Blue) হয়ে উঠ্‌তে পারে তা কেউ তখন ভাবতে পারে নি,—কেউ কখনো মনেও করেনি যে এই অধিকার নিয়েই—একদিন সেই হাস্য মুখর পৃথিবীর উপর রক্ত স্রোত বইবে।

যাক! মানুষের এই নৈসর্গিক অধিকার কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? আমরা বল্‌তে চাই যে সবাই সমান—কিন্তু দেখ্‌তে পাই যে দুজনের ভেতর বিভিন্নতা যথেষ্ট—। তবে কি আমরা চখে কাপড় বেঁধে, উদ্দাম কল্পনায় ধরে আনা জিনিষটাকেই সত্য ব'লে গ্রহণ কর্ব্ব? যেটাকে সা... কর্ত্তে গেলে দেখা যায় যে সেটা গিল্টি করা—সেটাকে সোণা বলে নেবো কি ক'রে? কেন? এক রক্ত, এক অস্থি, এক মজ্জা মেধেই মানুষ তৈরী। বৈজ্ঞানিকের হিসাবে সকলের দামই প্রায় সমান—কেবল রোগা মোটা হিসাবে কিছু কম বেশী—? তবে তফাৎটা কিসে? তুমি বল্‌বে তার "বিষ্ণু পদার্থে" তার আত্মায়—। আমি বল্‌বো তাও নয়—সে আত্মা বিশ্বাত্মার অংশ—তার ক্ষমতা সর্ব্বত্রই সমান। তবে যদি বিকাশের কথা তোল—আমার উত্তর—ক্ষমতা যখন আছে তখন বিকাশ হতেও পারে—তাঁকে সমান সুবিধা দাও, দাবিয়ে রেখো না—দাবিয়ে রাখা তোমার অধিকারের বাইরে—তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা—। হিন্দুশাস্ত্রকার বলে গেছেন জীব মাত্রেই শিবের অধিষ্ঠান। জলত' মাটীর নীচে আছেই, খোঁড় পাবে—আর সব জলই এক উপাদানে তৈরী। এই সাম্যের উপরই—মানুষের স্বাভাবিক স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ সবাই সমান। সবাই একই ভগবানের সৃষ্ট জীব। তবে তোমাতে আমাতে এ প্রভেদ কেন? তুমি রাজা আমি প্রজা কেন, তুমি ধনী আমি দরিদ্র কেন, তুমি প্রভু আমি ভৃত্য কেন? এ কেন'র উত্তর দিতে গেলে বল্‌তে হয় আমার ন্যায্য

Prof. Jethro Brown অবলম্বনে

অধিকার থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করে রেখেছ—। অবশ্য বঞ্চনা কর্ব্বার ক্ষমতা তোমার আছে—তার জন্যে তোমার তাজার তারিফ—। কিন্তু বঞ্চনাই কি সনাতন সত্য? প্রথম মানুষের অধিকার হচ্ছে তার এই সত্তা যার জন্যে সে ভগবান ছাড়া আর কারো কাছে ঋণী নয়—এই জীবন জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠদান—এতে মানুষেরই চরম স্বত্ব। কেউ তার কাছ থেকে এ স্বত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে না—। রাজা পারেন কিনা সন্দেহ। তিনি যা দিতে পারেন না তা নিতে পারেন কি করে? দশের উপকারে একের অকল্যাণ কতটা যুক্তি যুক্ত, কতটা ন্যায্য তা বলা খুব শক্ত। ন্যায় যদি একের ওপরেও অন্যায় করে তবে তার নাম মিথ্যে। অন্যায় ন্যায়ের অধিকার নেই। ন্যায়ের প্রতিভূ রাজারো অধিকার নেই। তুমি রাজা, আমি নরঘাতক—তুমি হত্যার বিনি-ময়ে আমায় "হত্যা" দিতে চাও। তুমি আমায় শাস্তি দিচ্ছ কিসের? নরহত্যার—? কি উপায়ে? নরহত্যা ক'রে। তবে তোমায় আমায় প্রভেদ কি? তুমি বল্‌বে তুমি সমাজের মঙ্গলের জন্যে রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে আমায় দণ্ড দিচ্ছ আমায় হত্যা করে—আমি বল্‌বো আমার নিজের মঙ্গলের জন্যে আমার স্বরাজ-মঙ্গলের জন্যে আমিও দণ্ড দিইছি হত্যা ক'রে—। হত্যার উদ্দেশ্য দুজনেরই আছে তবে তোমারটা একটু বড়, আমারটা একটু ছোট। মোটের ওপর এইযে মানুষের প্রাণ এর ওপর দাবী তোমারো নেই আমারো নেই। কিন্তু অনধিকার চর্চ্চা মানুষের স্বভাবগত, জিঘাংসা বৃত্তি মানুষের খুবই প্রবল তাই এই বিংশ শতাব্দির সভ্যতার মাঝখানেও রক্তারক্তির অভাব দেখা যায় না—বরং কিছু আধিক্যই দেখা গিয়াছে।

প্রাণের পরই মানুষের স্বাধীনতা বা liberty একে সঙ্কোচ কর্ব্বার অধিকার তোমার কোথায়? সাধারণের শুভকামীরা বল্‌বেন সাধারণের মঙ্গলের জন্যে সে অধিকার সমাজের আছে; কিন্তু নৈসর্গিক স্বত্ববাদী বল্‌বেন কারো নেই—কোন সমাজের নেই, কোন সঙ্ঘের নেই। মতের দ্বন্দ্বের বিচার কর্ত্তে আমরা বসিনি—আমরা শুধু বল্‌তে চাই মানুষের নৈসর্গিক অধিকার কি কি। মত নিয়ে মতবাদীরা চিরকাল তর্ক করুন। আমরা কেবল বলে যাই "স্বাধীনতা"ও মানুষের স্বভাব-লব্ধ অধিকার। আর জগতের বিবেকের কাছেও সে খবর পৌছেছে তাই মানুষের নৈতিক বল তার পাশবিক উচ্ছ্বাস ব্যর্থ করে, দাস ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। আরো যা বাকী আছে তা মানুষের স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। তবে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন। জীবন আর স্বাধীনতার (Life and liberty) পরে প্রাণ বাঁচানর উপায়—এই জমিতে অধিকার। নৈসর্গিক স্বত্ববাদী বলেন পৃথিবীর প্রত্যেক অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে প্রত্যেকের সমান অধিকার—কোন তারতম্য ইতর বিশেষ নেই যেন দায়ভাগের একান্নবর্ত্তি হিন্দুপরিবারের সম্পত্তি। তবে অধিকার উপভোগ কর্ত্তে গিয়ে পরের ওপর অত্যাচার ক'রে বসো না— সেখানে তোমার দাবী দাওয়া নেই। অবশ্য প্রোফেসর হাক্সলির মতে এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। Prof. Bentham'ও বলেন, "What is every man's right is no man's right as every man's business is no man's business." মনিষীরা যাই বলুন জমিটা কারো পুরোপুরি একচেটে হওয়া বিশেষ সুবিধার কথা বলে বোধ হয়

না। যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাতেইত' বলসেভিক উৎপাৎ আরম্ভ হয়েছে। আমারই মত হাত পা বিশিষ্ট জীব দিব্যি প্রাসাদে ব'সে রাজভোগে পুষ্ট হবেন—আর নিরন্ন আমি তাঁরি দুয়োরে দাঁড়িয়ে শুকিয়ে মরে যাব—এই বা কেমন দেখায়। দেশে বিদেশে জমির বিলি বন্দোবস্ত দেখেও বোধ হয়—মানুষের এ অধিকারটা রকমারি ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

তারপর কথা হ'চ্চে আমায় কাজ দাও। আমায় বাঁচতে হ'বে, আমায় খেতে হ'বে,—কাজেই চাক্‌রী দরকার—চাক্‌রী পাওয়া আমার অধিকার। আমি যদি নিজে চাক্‌রী না জোটাতে পারি—রাজার উচিত আমায় চাক্‌রী দেওয়া—। আমার নিজের বিপুল প্রচেষ্টা যদি সফল না হয়—তখন আমি রাজদ্বারে জানাব রাজা আমায় কাজ দেবেন অবশ্য আমি সাধারণ বেতনেই কাজ কর্ব্ব। এর বিরুদ্ধে বল্‌বার অনেক কথাই আছে। কিন্তু সব বিরুদ্ধমত সামঞ্জস্য করলে দেখা যায় আমার দাবী কিছু থাকেই। ইংলণ্ডে Right to work বা নিয়োগাধিকার bill অবধি হয়েছিল—যাঁরা সেই bill এর পক্ষে ছিলেন তাঁরা নৈসর্গিক-অধিকারেরই দোহাই দিয়েছিলেন।

কর্ম্মফলের মামুলি সান্ত্বনাকে দূর করে দিয়ে আমায় সমান সুবিধা দাও। জীবনে উন্নতি শুধু তুমিই একচেটে ক'রে রাখ্‌বে আর আমি দুস্থ দুঃখী তোমার মুখ চেয়ে থাকবো—অথচ তোমায় আমায় তফাৎ বোধ হয় শুধু এইখানে—যে সুবিধা তুমি পেয়েছ আমার ভাগ্যে তা জোটেনি। সুবিধা দাও, আমায় বুঝিয়ে দিতে দাও আমার ক্ষমতা—। দেখ, আমি পারি কি না। কিন্তু তোমরা তা দেবে না—তোমরা আমার ন্যায্য স্বাভাবিক অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রে রাখবে—কারণ সেটা তোমাদের স্বার্থ। তোমরা চাও (Monopoly of careers)

নৈসর্গিক অধিকারের সব চেয়ে বড় দাবী হ'চ্চে—"স্বরাজের" দাবী বা The right to self-Government. আমি নিজেকে শাসন কর্ত্তে চাই, আমার সে শাসন কর্ব্বার ক্ষমতা আমাতে আছে, তোমরা কেন তা' আমায় কর্ত্তে দাও না—এটা অত্যাচার, এটা পাপ। তোমাদের "অ্যারিষ্ট্রক্রেসি" কে আমি অবিশ্বাস করি; তোমাদের শাস্তির শাসনের চোখ রাঙ্গানি খুব বেশী কার্য্যকরী বলে মনে কর্ত্তে পারিনে—। তাতে শুধু ভয়ই হয়, ভয়ে মানুষকে জড় ক'রে তোলে। তার বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হ'তে চায় না, সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে না। শেখে শুধু হুকুম তামিল কর্ত্তে—শেখে শুধু গোলামী—। তার একটা সুশ্রী সবল দিক কুঁক্‌ড়ে ভেঙে মুড়ে যায়—আর শত প্রচেষ্টাও তাকে খাড়া করে তুলে ধর্ত্তে পারে না। যে শাসন মানুষকে ভাঙে, গড়্‌তে পারে না সে শাসন নয় অত্যাচারের নামান্তর। তার পর তোমাদের "মাতৃক শাসন" "Maternal legislation" ত আমাদের শুধু অঞ্চলের ধন করিয়া তোলে। রাত দিন কোলে চ'ড়ে থাক্‌লে আচাড় খাইবার ক্ষমতা জন্মাবে কবে? চির কালই ত' কোলে চড়ে থাকা সম্ভব নয়. কঠিন মাটী যে পায়ে ঠেক্‌বেই। "পিশিমা-মার্কা" হ'লে কাজ হবে না "প্রহ্লাদ ব্র্যাণ্ড, হওয়া চাইই—নইলে জীবন যুদ্ধে টেঁকে থাকা সত্যিই শক্ত। নিট্‌জের মত দার্শনিক অনেক আছেন যাঁরা বল্‌বেন "ধোপে যারা

টেঁকে না তাদের ফেলে দাও। মোটের ওপর চাই এখন "স্বরাজ"। তোমাদের কোন শাসনের পক্ষপাতী যখন আমি নই তখন আমায় ছেড়ে দাও আমি নিজেকে নিজে শাসন করি। তোমরা বল্‌বে আমার এটা গণতন্ত্রবাদ, অনেক আশা করে অনেক ঘা খেয়েছে-- তা হোক তবু আমি এরই সাধক আর আমি জানি ।।কা। কিছু এক দিনে মেলে না। মানুষের আশা পুরোপুরি রকম পূর্ণ হ'তে অনেক দেরী লাগে—কিন্তু পূর্ণ হয় না এ কথা বলা যায় না। পাই আর নাই পাই পূর্ণ হোক আর নাই হোক এ স্বরাজে যখন আমার স্বাভাবিক অধিকার তখন এ স্বরাজ আমায় করে নিতে হবেই—আমার নৈসর্গিক অধিকার বজায় রাখ্‌তে হবেই।

হারাধন

[শ্রীসরসী কান্ত দত্ত]

।ন কঠিনের বাঁধন টুটি
হারানো সুর আপনি বাজে;
আকুল হিয়ার পরশখানি
পাগল করে সকল কাজে!

ছায়ায় ঢাকা দিঘির জলে
জাগায় কাঁপন কমল-দলে;
পাখীর মেলায় তমাল-শীরে
রঙ্‌ ধরে যায় সকাল সাঁঝে।

।ন্‌ সে পাগল বাজায় বাঁশী,
আধখানা সুর রইল মুখে;
আধখানা তার ছড়িয়ে দিল
দখিণ হাওয়ার উদাস বুকে।

পথের ধূলার বকুলগুলি
আঁচল ভরে নিলাম তুলি;
শেষ হলে মোর মালা-গাঁথা
পেলাম তারে বুকের মাঝে।

হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

সাহিত্যের একটী প্রধান কাজ রসসৃষ্টি। আমাদের দেশে আলঙ্কারিকেরা যখন করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস; অদ্ভুত প্রভৃতি মূলরস গুলির আলোচনা করিয়াছেন তখন হাস্যরসকেও একটী মূলরস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই হাস্যরসকে বাদ দিলে সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না; এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, সকল সাহিত্যেই হাস্যরস আছে, এবং আমাদের বঙ্গসাহিত্যেও ইহার অভাব নাই। আমাদের গদ্য সাহিত্য আলোচনা করিলে কালীপ্রসন্নের 'হুতোমে;' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'; রবীন্দ্রনাথের হাস্য কৌতুক ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'; দীনবন্ধুর নাটকে ও অমৃতবাবুর প্রহসনে এই হাস্যরসের বিকাশ দেখিতে পাই; এবং পদ্য সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখি যে সেকালের ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একালের হেমচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতার ও পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের সরস রচনায় এই হাস্য কৌতুকের রঙ্গরস প্রচুর পরিমানে বিরাজমান।

স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর রচনার মধ্যদিয়া এই হাস্যরস কিরূপভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সকল হাসির মূলেই আমরা দেখি যে, একটা কোনও না কোন প্রকার অসামঞ্জস্য, বিপরীতটা বা বৈসাদৃশ্য আছে। এই হাস্যকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি:—(১) রঙ্গ ও (২) ব্যঙ্গ। (১) রঙ্গ ইহার কাজ, কোন একটী ঘটনা, অবস্থা বা কোন মানব চরিত্রের মধ্যে যে টুকু হাস্যকর শুধু সেইটুকু ফুটাইয়া তোলা। ইহাতে কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধি নাই। ইংরাজী-সাহিত্যে ইহাকেই Humour বলে। ইংরাজ-সমালোচক Hazlitt লিখিয়াছেন—Humour as it is shown in books, is an imitation of the natural or acquired absurdities of mankind, or of the ludicrous in accident, situation & character...—(২) ব্যঙ্গ—ইহা একটু অম্লমধুর, এই হাসি ব্যঙ্গ, শ্লেষ, কখনও বা অশ্রুর রূপান্তর; ইহার উদ্দেশ্য, শ্লেষ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে সমাজের গলদ দেখান ও তাহার সংশোধনের চেষ্টা—ইংরাজীতে ইহাকেই Satire বলে—'A satire is directed to the correction of corruption, abuses or absurdities, in religion, politics law, society & letters."

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতা, 'আষাঢ়ে', হাসির গান ও হাস্য-রসাত্মক প্রহসন গুলিতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত হাস্যরসের দৃষ্টান্ত আমরা পাই।

আষাঢ়ের রচনা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখিয়াছেন "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালাভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব

পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে Ing ldsby Legends এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্য-রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া আষাঢ়ে নামে প্রকাশ করি।" এই প্রকার হাসির কবিতা আমাদের সাহিত্যে ছিল না, দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রবর্ত্তিত এই রহস্য কবিতা বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ইহার কবিতাগুলি অধিকাংশই গল্পাকারে লিখিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলিতে অবিমিশ্র প্রাণখোলা হাসি আছে, যেমন হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা ;—আবার গায়ে বাজে এমন ব্যঙ্গ কবিতাও আছে ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত—"কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনী"। গল্প-প্রসঙ্গে, কবি যেথানেই সামাজিক কপটতা দেখিয়াছেন সেই থানেই সুনিপুন হাস্যের সঙ্গে সুতীক্ষ বিদ্রূপ মিশাইয়াছেন। আষাঢ়ের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "কেবল মাত্র হাস্যরসের দ্বারা কেহ যথার্থ অমরতা লাভ করে না। হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের বিকাশ থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। সমালোচ্য-গ্রন্থে 'বাঙ্গালীমহিমা' 'ইংরাজস্তোত্র,' 'ডেপুটী কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য আছে, তাহা লঘু হাস্যমাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় আছে এবং তাহা হইতে জ্বালা ঘৃণা ও ধিক্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে।" আষাঢ়েতে হাস্য ও অশ্রু, কৌতুক ও কল্পনা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল কল্পনা ও বর্ণনার অদ্ভুতত্বের দ্বারা অনেকস্থলে হাসাইয়াছেন, আবার কোথাও কোথাও লঘু বিষয় লইয়া যে বাঙ্গালাতে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, তাহাতে জিনিষটা হাল্কা হইয়া গিয়া আরও হাসি জমাইয়াছে ;—যেমন "ব্যারিষ্টার—উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা"—এইখানে অনুষ্টুপ ছন্দের; ও কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনীতে পজ্ঝটিকা ছন্দের অনুকরণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন আমাদের দেশে ছিল কেবল কতকগুলো আস্ফালন,—নব্যহিন্দু করিতে-ছিলেন আর্য্যামির আস্ফালন ; শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল করিতে ছিলেন স্বেচ্ছাচারিতার আস্ফালন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সময়কার ব্রাহ্ম, বিলাত ফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ডদেশহিতৈষী, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী—প্রভৃতি বাঙ্গালীর সকল শ্রেণীর ভণ্ডদের ভণ্ডামী ও ন্যাকামিকে ব্যঙ্গ করিয়া 'হাসিরগান' রচনা করেন। We are reformed Hindoos, আমরা বিলাতে ফের্ত্তা ক'ভাই প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রেণীর। ইহাদের ব্যঙ্গের পশ্চাতে তীব্র ভর্ৎসনা, গভীর বেদনা ও লুক্কায়িত অশ্রু আছে। আবার 'হরাণ্ দেশের কাজি' 'পাঁচশ'বছর স'য়ে আছি' প্রভৃতি গানগুলিতে গভীর শ্লেষও আছে। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন দ্বিজেন্দ্রের মুখেই 'আজি এই শুভদিনে' 'পাঁচশ'বছর স'য়ে আছি' গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "একি হাসির গান? এযে Cruellest tragedy"। দ্বিজেন্দ্রের গানে, হাস্য ও অশ্রু এমনিভাবে মিশিয়া থাকিত। দ্বিজেন্দ্রের এই হাসির গানের ব্যঙ্গের কশাঘাতে কেহই রুষ্ট হন্ নাই। অথচ এই কশাঘাতে কাহারও কাহারও স্কন্ধ হইতে কু-অভ্যাসের ভূত নামিয়া গিয়াছিল। কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে সরিয়া যায় নাই ; কারণ তাঁহার কৌতুকের অন্তরালে, স্তরে স্তরে করুণা ও সমবেদনা সাজান আছে। তাঁহার

ব্যঙ্গের প্রধান গুণ এইযে যাঁহাদের লইয়া তিনি কৌতুক করিতেন, তাঁহাদের সহিত তিনি নিজেও মিশিয়া যাইতেন। 'আমরা সেজেছি বিলাতী বাঁদর'—এই এক 'আমরা' কথাতেই বুঝা যায়, বিলাতী আচার ব্যবহার অনুচিকীর্ষু বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার অনুকম্পা কত প্রগাঢ়। 'Reformed Hindoos,' 'পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে,' 'ব'দলে গেল মতটা,' প্রভৃতি প্রত্যেক গানে, প্রত্যেক ব্যঙ্গ—অন্যের প্রতি ঘৃণা দূরের কথা—নিজেকে কোথাও ছাড়েন নাই, প্রত্যেক স্থলেই নিজেকে জড়াইয়া কৌতুক করিয়াছেন। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের ব্যঙ্গ-কৌতুকের বিশেষত্ব, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী। Meredith তাঁহার Essay on comedy তে একস্থলে লিখিয়াছেন "You may estimate your capacity for comic perception by being able to detect the ridicule of them, you love, without loving them less" হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন, অমৃতলাল ততটা বুঝেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে যে শুধু এই প্রকার ব্যঙ্গই আছে, তাহা নহে, তাহাতে প্রাণ-খোলা হাসি, রঙ্গেরও অভাব নাই। 'তান্‌সেন্' 'বিক্রমাদিত্য 'পারত' জন্ম না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা' 'হতে পার্ত্তাম আমি কিন্তু মস্ত একটা বীর' 'তারেই বলে প্রেম', 'তোমারই বিরহে সইরে'—প্রভৃতি গানগুলি নিছক হাস্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতেও হাস্যরসের প্রাচুর্য্য আছে। তিনি প্রথমতঃ যে সব হাসির গান রচনা করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিতেন, সেই গুলিকে ভিত্তি করিয়াই প্রহসন রচনা করেন। এই প্রহসনগুলির মধ্যেও কতকগুলির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ, কতকগুলির উদ্দেশ্য রঙ্গ। 'কল্কি অবতারে' সামাজিক বিভ্রাটের অবতারণা আছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্য, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাত ফেরৎ এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।" প্রকৃতপক্ষে তিনি অপক্ষপাতিত্বের সহিতই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এই জন্যই বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠকও ইহা পাঠ করিয়া রাগ করিবেন কি হাসিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিবেন না। তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও বিলাতী সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী সমাজের উপর ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে বটে, কিন্তু সে পরিহাস সর্ব্বত্র উপভোগ্য ও সুরুচিসঙ্গত। কিন্তু তাঁহার 'ত্র্যহস্পর্শের' আখ্যান ভাগ বা হাস্যরসকে নির্দ্দোষ বা অনাবিল বলা যায় না, এই জন্যই তিনি এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু উক্ত ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনগুলি ছাড়া তিনি তাঁহার 'বিরহ' ও 'পুনর্জ্জন্মে' যে প্রাণ খোলা হাসির অবতারণা করিয়াছেন, সেরূপ হাসি আমাদের সাহিত্যে অতি বিরল। 'বিরহ'ই দ্বিজেন্দ্রলালের থিয়েটারে অভিনীত প্রথম পুস্তক, ইহাই তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চ হইতে জয়মাল্য পরাইয়া দেয়। এই পুস্তকখানি আমাদের সাহিত্যের অবিমিশ্র Humour এর একখানি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত; এই পুস্তকের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা 'inextinguishable laughter' অদম্য হাসি আছে।

'গোবিন্দ চরণের' আগাগোড়া ব্যবহারে, বিশেষতঃ তাহার ফটো তুলিবার সময়, 'প্রিয় বামবাস্ত' ভৃত্যের কথা ও ব্যবহারে, এবং গোবিন্দ চরণের 'অণ্ডার গ্রাজুয়েট' শ্যালিকা চপলার 'বুদ্ধির পরিচয়ে' অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার আছে, তাছাড়া 'ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের ঐ ডোবার ধার দিয়ে', 'তোমারই বিরহে সইবে দিবানিশি কত সই' প্রভৃতি হাসির গানগুলি ত আছেই।

আবার 'পুনর্জন্মে' যাদবচক্রবর্ত্তী যখন বাঁচিয়া থাকিয়াও গায়ে চিমটী কাটিয়া, নাকটা ঘুরাইয়াও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, যে সে জীবিত না মৃত, তখনও হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিড়িয়া যায়।

আমরা দেখিলাম যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস অধিকাংশ স্থলেই কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অমৃতলালের হাস্যকৌতুকের বিকাশ হইয়াছে একমাত্র তাঁহার সামজিক প্রহসনগুলির মধ্য দিয়া।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'আনন্দ-বিদায়' * খানির উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন,— বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গপ্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা রসিকপ্রবর কবি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের করকমলে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই অমৃতলালকে কত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি নিজেই অমৃতলালকে 'ব্যঙ্গপ্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা' ও 'রসিকপ্রবর' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। অমৃতলালের প্রহসনের উদ্দেশ্য তাঁহার 'বৌমা' নাটকের উপসংহারের গানটীতেই পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন

"সমাজে নানান সাজে, ঘুরি সব যে
যার কাজে,
কারুর ভুলচুকটী ধরে ফেলে, রঙ
রঙায়ে রঙে ভাসা।"

বস্তুতঃ, অমৃতলাল, সমাজের যেখানে অনাচার, অত্যাচার, কপটতা, ভান, দেখিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার নিপুনতুলিকা স্পর্শে তাহার চিত্র ফুটাইয়াছেন, এবং হাস্য কৌতুকের রশ্মিপাতে সেই সব গলদ ধরাইয়া দিয়াছেন ও সমাজের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রহসনে ভণ্ড সংস্কারক স্বার্থান্বেষণকারী স্বদেশসেবক নকলপ্রিয় বাবু, তথাকথিতশিক্ষিতা বা উল্টাশিক্ষিতা নারী প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত আছে এবং এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কৌতুক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অফুরন্ত হাসির ভাণ্ডার এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও মহৎ।

'বাবুর' ভণ্ড দেশহিতৈষী ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল, পরে মিষ্টার 'এস্, কে, ভ্যাটাভ্যাল' যখন বলিতেছে, "দেশহিতৈষীতার কি কি দরকার জাননা, তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব, ইণ্টারে গেলে আমায় কে চিনবে? ফাষ্ট ক্লাশে যাবার আসবার টিকিট কর, আর আমি কেল্‌নারের হোটেলে খাব...একজন ফিরিঙ্গি রিপোর্টার নিয়ে যেতে হবে। একদল কন্‌সার্ট নিয়ে যেতে পারলে ভালহয়—" তখন তাহার ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারি না।

বৌমা নাটকে সমাজ সংস্কারক (? বাবুরাম যখন নিজের বৃদ্ধা মায়ের কষ্টের প্রতি না তাকাইয়া, 'আসামের আলুলায়িতকেশা, কটাক্ষ লোচনা, সরলা অবলা কুলিরমণী দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বক্তৃতা দেয়, তখন যে ব্যঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন অমৃতলাল, তাহাও উপভোগ্য।

'বিবাহ বিভ্রাটে' শ্রীমতী বিলাসিনী

* আনন্দবিদায় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত আছে, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

কারফর্ম্মা যখন আমাদের এই 'পতিপরম-গুরুর' দেশে স্বামীকে ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, বাটনা বাটা, রন্ধনকরা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বলিতেছে "পতির প্রধানগুণ স্ত্রী ভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে ভক্তি না করে সে পুরুষবেশ্যা; আর, আমরা যদি স্বামীকে দমন করতে না পারব, তবে আমাদের 'হাই এজুকেশনে'র ফল কি ?" —তখন তাহার 'হাইএজুকেশনের' ফল দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

আবার যখন শ্রীমতী কিশোরী নিজের 'কিশোরী' নামটা পর্য্যন্ত ভাল না লাগায়, নিজেই নিজের নাম 'উলাঙ্গিনী' রাখিতে চায়; এবং শাশুড়ী একবার তাঁহার 'ঘরেরলক্ষ্মী বৌমাকে হেঁসেলে যাইতে বলিলে, সে যখন বলে "সমস্ত বই আপনার সামনে খুলে দিচ্ছি, দেখে বলুন, তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কে হেঁসেলে গিয়েছিল ? তিলোত্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, সূর্য্যমুখী, কুন্দ—ইহারা কে কবে হেঁসেলে গিয়েছিল ?"—তখন তাহার অতিরিক্ত নভেল পড়ার ফল দেখিয়া ভাবিতে ও হাসিতে হয়। গৃহকর্ম্মে অশিক্ষিতা, আজকালকার শিক্ষিতা, 'নভেলপড়া বৌমা ঘরে আনিয়া শাশুড়ীর 'ঘরেরলক্ষ্মী আনার সাধ কেমন করিয়া মিটে তাহা "বৌমা" নাটকে অমৃতলাল অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। এইরূপ তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি অমৃতলাল যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

আবার, এল, এ পাশকরা ছেলের বিবাহ দিয়া মেয়ের বাপের রক্ত শুষিয়া 'বাদশা ব'নে' যাবার আশায় পুত্রের বিবাহ দেওয়ার পর, যখন পুত্র সেই টাকা লইয়া বাবাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করে, তখন আমরা যে 'যেমন-কর্ম্ম-তেমনি-ফলের হাসি' হাসি তাহা 'বিবাহ বিভ্রাটে' অমৃতলাল বেশ জমাইয়াছেন।

এইরূপ অমৃতলাল সমাজের বিভিন্নদিকের চিত্র আঁকিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, সেই ব্যঙ্গে হাসাইয়াছেন ও ভাবাইয়াছেন।

অমৃতলালের প্রহসনে যে এইরূপ ব্যঙ্গই আছে তাহা নহে, উহাদের মধ্যে রঙ্গও আছে তাহা তাঁহার 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে,' 'কৃপণের ধন,' 'তাজ্জব ব্যাপারে' দেখিতে পাই।

'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' তে যখন বাঁড়ুয্যে ভাবিয়া স্থির করিতে পারেনা, "আমিও উপরে উঠি, সে নেবে যায়, আমিও নেবে যাই, আর সে উপরে উঠে"—তখন, এবং পরে, তাহাদের ঝগড়া ও মিলন দেখিয়া আমরা হাসি, খুব হাসি সত্য ; কিন্তু ইহার শেষটা অমৃতবাবু যাত্রাদলের 'সঙের মত করিয়া তুলিয়াছেন। আবার 'কৃপণের ধনে'ও অফুরন্ত হাসি আছে সত্য, কিন্তু তিনি হলধরকে অসম্ভব রকম কৃপণ করিতে গিয়া কতকটা অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন।

তাজ্জব ব্যাপারে' যখন পুরুষেরা বিবাহের স্ত্রী আচার করিতেছে ও বাসর জাগাইতেছে, এবং স্ত্রীরা বিবাহ সভায় অভ্যর্থনা করিতেছে, —তখন হাসিতে হাসিতে উল্টাইয়া যাইতে হয়, এমন হাসি বোধহয় অমৃতলালের কোন নাটকেই নাই। কিন্তু ইহাতে অশ্লীলতাও অতিমাত্রায় আছে। যেমন :—'মুক্ত' বলিতেছে, "মেয়ে আমার ক'মাস ধরে মেহন্নৎ ক'রে সারারা'ত জেগে পড়লে, তা অদৃষ্ট ক্রমে অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে পড়েছে।" আবার মেয়ে 'সরসী' বলিতেছে, "মা, আমার ভয় পাচ্ছেন কিন্তু আমার বিয়েনটা ভাল। ইত্যাদি। তাহা ছাড়া 'কে পোয়াতি রস

নতা খোলা নিবি আয়বে।' এই অশ্লীল গানটিও ইহাতে আছে। সুতরাং তাজ্জব ব্যাপার' এত হাস্যপূর্ণ হইলেও, এত অশ্লীল, যে সকলের সমক্ষে পাঠ করা যায় না।

অমৃতলালের সমস্ত প্রহসনগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান এখানে অসম্ভব। উপরে আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত অমৃতলালের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, দ্বিজেন্দ্র লালের মত অনাবিল হাসি অমৃতলালে নাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, সেখানে নিজেকেও জড়াইয়াছেন, এবং তাঁহার ব্যঙ্গে কোন বিষ নাই। পক্ষান্তরে অমৃতলালের ব্যঙ্গ অনেকস্থলেই বিষাক্ত দংশন। শ্রীমতী 'কিশোরী' যখন স্বামীর নাম ধরিয়া 'বাবুরাম' 'বাবুরাম' করিয়া চিৎকার করিতেছে, শ্রীমতী হিড়িম্বা' যখন স্বামীর নামের সহিত 'কাকা' যোগ করিয়া স্বামীকে 'বামাদাসকাকা' বলিতেছে, এবং 'কালিন্দী' যখন স্বামীকে 'স্বামীভ্রাতা' ও 'কালাচাঁদ যখন স্ত্রীকে 'স্ত্রীভগিনী' বলিতেছে,—তখন অমৃতলাল যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ব্যঙ্গের ব্যপদেশে সমাজবিশেষের উপর বিষাক্ত দংশন। তাঁহার 'খাসদখল' একখানি হাস্য পূর্ণ নাটক,—ইহা Wit, humour ও Satire এর ত্রিবেণী সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজের উপর যে আক্রমণ আছে, তাহা সুরুচিসঙ্গত নহে, যদিও ইহার অবিমিশ্র হাসির চাপে ইহার জ্বালা কতকটা চাপা পড়িয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল গান ও কবিতার মধ্য দিয়াই অধিকাংশস্থলে হাসাইয়াছেন, সুতরাং তিনি [illegible]না, কল্পনা, ছন্দ ও সুরের সাহায্য অনেকটা পাইয়াছেন, কিন্তু অমৃতলালকে হাসাইতে হইয়াছে প্রহসনের গল্পের মধ্য দিয়া, সুতরাং তাঁহাকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়া আঁকিতেই হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে তিনি এতটা অতিরঞ্জিত করিয়াছেন যে আসল জিনিষটার পরিবর্ত্তে একটা অস্বাভাবিক জিনিষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমৃতলাল তথাকথিত শিক্ষিতা রমনীদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়াও যে 'পাকাটে মেয়ে'দের প্রতি বিদ্রূপ করা যায়, এবং তাহা সুরুচিসঙ্গত হইতে পারে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলাল 'চপলা', 'বাঙ্গি' 'পিয়ারী' 'সুশীলা' প্রভৃতি চরিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্যগীত ও বিলাসের গৃহ। সেখানে অভিনয়োপযোগী নাটকগুলিও সেই জন্য অধিকাংশস্থলেই বিকৃত রুচির পরিচারক। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখিয়াছিলেন, প্রথমতঃ "প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই।" সেই জন্যই তিনি সুরুচি সঙ্গত প্রহসন লিখিয়াছিলেন। নাটকেও যেখানে যেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসাইয়াছেন, সেখানেও এক নূতন রকমের হাসি হাসাইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের নাট্যশালা গুলিকে বেল্লিকবাজার হইতে আনন্দবাজারে পরিণত হইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক Schlegel লিখিয়াছেন "The dramatic poet is, more than any other, obliged to court external favour and loud

applause But, of course, it is only in appearance that he thus lowers himself to his hearers, while in reality, he is elevating them to himself" (A. W. Schlege's Dramatic art and literature) দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তিনি হাসাইবার জন্য দর্শকবৃন্দের দলে নামেন নাই, বরং তাঁহাদিগকেই আপনার কাছে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অমৃতলাল অনেক সময় দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া তাঁহাদের আসরে নামিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই অনেকস্থলে তাঁহার হাস্যরস 'ভাঁড়ামি' ও caricature হইয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্যই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের, ধর্ম্মের, মানব চরিত্রের কোন কপটতা, কোন অনাচার অত্যাচার অমৃতলালের চক্ষু এড়ায় নাই এবং অপর কোন নাট্যকার অমৃতলালের মত হাসাইতে সমর্থ হন নাই, বস্তুতঃ তাঁহার প্রহসনগুলি 'হাস্য অমৃতের সিন্ধু'। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাবে ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও হাস্য বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ সুরুচিসঙ্গত রসিকতা ও নির্ম্মল পরিহাসরচনার ভঙ্গী অমৃতলালে নাই, এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহারই নূতন আমদানি। দ্বিজেন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন কবির রচনায় এরূপ সুমার্জ্জিত নির্ম্মল হাস্যরসের উদাহরণ নাই বলিলেই হয়। পরবর্ত্তীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রের শিষ্যস্থানীয় স্বর্গীয় রজনীকান্তের পরিহাস ও ব্যঙ্গগীতে আমরা দ্বিজেন্দ্র প্রবর্ত্তিত হাস্যরসের কতকটা আস্বাদ পাই।

আস্তানা

[মতিন উদ্দিন আহমদ]

[১]

সহরতলীতে ফকির এসেছেন।

[২]

সম্রাট শাহ-জাহান চারি শাহ-জাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফকিরের জিয়ারতে চলে গেলেন।

[৩]

ইমারতের লোককে আস্তানায় দেখে ফকির হেসে উঠলেন। বসবার জন্য এক খানা মাদুর এগিয়ে দিলেন। ফকিরের সামনে বসলে বেয়াদবী হবে বলে শাহ্‌জাহান বসলেন না নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পিতৃভক্ত দারাকে বসতে বলায় তিনি পিতার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুজা, মোরাদ আর আওরঙ্গজেব এক দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে ফকির বললেন "তোমরা বস।" সুজা আর মোরাদ ফকিরের সেতারের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে রয়েছেন—ফকিরের ডাক তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারল না। ফকিরের সামনে বসলে যে বেয়াদবী হবে, তাঁর আদেশ অমান্য করলে তার চেয়ে বেশী বেয়াদবী হ'বে মনে করে', আওরঙ্গজেব সুজা আর মোরাদকে দুইদিকে সরিয়ে দিয়ে মাদুরের উপর বসে পড়লেন।

[৪]

আস্তানার ফকির হেসে উঠলেন।

কি যেন কি বলতেছিলাম

[শ্রীকালিদাস রায়]

কি যেন কি বিশেষ কথা
বলতে যদু ভুলে গেলাম।
বলছি, —আরে কেহে চাচা
কেমন আছ? সেলাম সেলাম!
হঁ্যা, কথাটা হচ্চে কি এই
ওর নাম কি—ঠিক মনে নেই
ওরে হরে, তামাক দেরে
এক্ষনি কি—তামাক খেলাম?
কি বলছিলাম ভাবছি, রোসো
উঠছ কেন একটু বসো,
ওহে বিপিন শোন শোন
নিমাইয়ের আজ চিঠি পেলাম।
দাঁড়াও যদু আসছে ঠোঁটে
পড়ছে নাক মনেই মোটে;
নলিন ভায়া বসো বসো
তোমার দেশ যে ঘুরে এলাম।
কি বলছিলাম তাইত যদু,
চাচা খুব যে খাচ্ছ কদু
ভাল কথা চাচা তোমার
বাগান খানা হলো নিলাম?
হঁ্যা ভাই যদু কথাটা এই,—
নলিন তোমার কাল ছুটি নেই?
তাইত তাইত ভাই হে যদু
কি যেন কি বলতেছিলাম!

———

নারীর জীবন-সত্য

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

আমি নারীর কথা যখন বলি তখনই নারীর পূর্ণ রূপের কথাই বলি, যেখানে নারী একাধারে বিদ্যায় সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্মী, শক্তিতে অষ্টভূজা আর মহিমায় জগদ্ধাত্রী। দেশ বলতে—বঙ্গলক্ষ্মী বলতে যা' বুঝি আর ভারতের নারী বলতে যা' বুঝি তা' একই, একই ছবি ছোট করে আঁকা আর বড় করে আঁকা। আমাদের ঘরের মেয়ে দেশ-আত্মার শক্তিরই প্রতিমা—যদি সে তা' হতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র মেয়ের কথা বলবে, তার সুখ, দুঃখ, বাঁধন, বেদনা, তার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দায়িত্ব অধিকারের কথা বলবে—তা' বলবে বল, কিন্তু ক্ষুদ্র কাউকে কখন বড় করতে পারে না। কি নারী কি পুরুষ যে ক্ষুদ্র, সে কত কষ্টে বাঙাল বলেই ত ক্ষুদ্র। এ দেশের কোটি কোটি অসাড় পঙ্গু মূক ক্ষুদ্র মেয়ের এই যে জাতি এই পাষাণময়ী অহল্যা, একে জীবন দেবে কে? ক্ষুদ্র কি তা দিতে পারে? তোমার আমার মুখে শাঁখ বাজলে কি স্বর্গের গঙ্গা মর্ত্ত্যে নামে? তোমার আমার ক্ষুদ্র বাহুর আলোড়ন কি এত বড় সাগর তেমন করে মন্থন করা চলে যাতে সুধাভাণ্ড হাতে আপনি ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্মী উঠে আসে? যে কাজ বাঙলায় মাতাজী তপস্বিনী, নিবেদিতা করে গেছেন, তা, কি সাধারণ মেয়ে পারে? অথচ করবার কাজ যে তারও লক্ষগুণ বেশি।

ভারতের নারীকে বাঁচানো যে জগতের পাষাণীকে জীবন দেওয়া! ধূমকেতুতে বিরজা সুন্দরী সত্যিই বলেছেন, য়ুরোপের মুক্তা নারীও আজ সুখী নয়, সে কামনার ঝড়ের মুখে তৃণ মাত্র। ভারতের নারী বন্ধনের দুঃখে দুঃখিনী আর পাশ্চাত্যের নারী অসংযমের পঙ্কে মলীনা। কারণ শুধু বাইরের স্বাধীনতায় মানুষকে মুক্ত, সত্য, সুন্দর করতে পারে না।" সমাজের দাসী আর কামনার দাসী কে বেশি অকল্যাণের রূপ বলা কঠিন। কি নারী, কি পুরুষ, মানুষকে তুলতে হ'লে প্রাণমনচিত্ত মাতোনো বড় আদর্শ দেখাতে হয়, উঁচু থেকে ডাক দিতে হয়, স্বর্গের স্বর্ণ তোরণ খুলে ধরতে হয়; তবে তো অসাড়ে সাড় আসে, মূঢ়ের মুখে ভাষা ফোটে, পঙ্গু হেঁটে যায়। তাই বলি, নারীকে তুলতে চাও তার হীনতার দৈন্যের ক্ষুদ্রতার আঙ্গিনায় নেমে গিয়ে ডাক দিলে হবে না, তোমায় নিজেকে নারীত্বের শেষ পৈঠায় উঠে হাত বাড়িয়ে দীনা হৃতসর্ব্বস্বাকে উপরে তুলে নিতে হবে।

নারীকে জাগাবার মতন নারী চাই, নারীত্বের আকাশ জোড়া তুষার ধবল পূর্ণতাকে আগে বিগ্রহ ধারণ করানো চাই। যে আদর্শের টানে লাখ লাখ মরা মেয়ে বাঁচবে সেই আদর্শ আগে মানুষী হয়ে জন্মানো চাই। নারী শুধু মা নয়, স্ত্রী নয়, ভগ্নী নয়, সখী নয়, তাপসী নয়, নারী বহু বিচিত্রা নিখিল ভাবরূপা নবরসময়ী—শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের ত্রিবেণী সঙ্গম। সেই পূর্ণা অখণ্ডরূপা মহামায়াকে

বাঙালীর মেয়ের মাঝে আগে বাঁচাও, তার মন্ত্রপূত সঞ্জীবন স্পর্শে সব মেয়ে তা' হলে বেঁচে উঠবে।

পুরুষের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছে, বিবেকানন্দ হয়েছে, অরবিন্দ হয়েছে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন হয়েছে, সেই যুগ যুগান্তর থেকে কত মহিয়ান রূপ এসেছে গেছে, তবে ত লাখ লাখ মরা পুরুষের এই জগদ্দল পাথর এইটুকু নড়েছে। নারীকে বড় হয়ে নারীকে তুলতে হবে। নারীর জ্ঞান, শক্তি, অর্থ অধিকার, মুক্তি, সার্থকতা সব চাই, তার অগণ্য অভাবের মোচন হাজার বেদনার শান্তি কত শত অপূর্ণতার পরিণতি সবই চাই। যে মানুষের স্পর্শে, ডাকে, সৃজন আনন্দে এত হবে সে মানুষ কি সহজ মানুষ?

তাই বলি, নারী! সাধনায় বসো। তোমায় আজ নূতন করে জন্মাতে হবে, আপনার সমস্তটুকু সত্তা আনন্দশক্তি জ্ঞান খুঁজে পেতে হবে, অন্তরের পূর্ণ মুক্তি বাহিরে ফোটাতে হবে, অন্তরের কুবের ঐশ্বর্য্য বাহিরে ঢালতে হবে, অন্তরের অন্নপূর্ণা সারদা উমা চামুণ্ডাকে বাহিরে সার্থক করতে হবে। নারী সমাজের চাপে, পুরুষের চাপে, শাস্ত্রের চাপে মরেনি, নারী মরেচে তার নারীত্ব হারিয়ে। সমাজ, পুরুষ, শাস্ত্র, আচার সব তাকে সেই দিন পথ ভুলিয়েছে যে দিন থেকে সে আত্ম-বিস্মৃতা হয়েছে। নারীকে আপনার পূর্ণতায় সফল হয়ে পুরুষকে বাঁচাতে হবে, পুরুষকে আপনার অখণ্ড মহিমায় আরোহণ করে নারীকে বাঁচাতে হবে। নারী আর পুরুষ মিলে যা' তাই সত্য, তাই সুন্দর, তাই পূর্ণ। নারীকে ছেড়ে পুরুষের সিদ্ধি নাই, পুরুষকে ছেড়ে নারীরও চতুর্ব্বর্গ নাই। পুরুষ আর নারী বলে পৃথক পৃথক কিছু নাই, একই সত্যের এ হরগৌরী অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ; সত্য যা' তাতে বিরোধ নাই, সেখানে ভেদও সত্য এবং অভেদও সত্য।

আজ যদি নারীকে সকল দিক থেকে বাদ দিয়ে পুরুষ গড়তে বসি তা' হ'লে সে গঠন কি নিয়ম অংশহীন ব্যাপার হয়? আমাদের শৈশব দোলায়, আদরে, শিক্ষায়, উৎসবে, মিলনে মা হয়ে স্ত্রী সখী কত কি হয়ে নারী যদি না থাকতো, এই নারীর উপেক্ষাকারী জগৎ এক দিনও চলতো কি? তেমনি আজ নারীও একলা চলতে পারে না. রাজনীতি সমাজ যা কিছু বল, অমন একাঙ্গী একপেশো হয়ে এক দণ্ডও চলে না, তর্কবাজ মানুষ ভাবে চলে, কিন্তু ওটা সেরেফ বুদ্ধির গোঁজামিল।

তাই বলি, নারীকে আজ বাঁধন ছিঁড়তে হবে এ যেমন সত্য, নতুন মিলন রচতে হবে এও তেমনি সত্য। আজ পুরুষের নারীকে মুক্তি দিতে হবে এ যেমন সত্য, নতুন জীবনে তাকে সার্থক পাওয়ায় পেতে হবে এও তেমনি সত্য। কিন্তু মুক্তি মানে যথেচ্ছাচার নয়, কি পুরুষ কি নারী কারু পক্ষেই মুক্তি মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। অশিব রূপ পুরুষ নারী দুইয়েতেই আছে। আমরা চাই শিবতা, কল্যাণ, সত্য জীবন সুন্দর—জীবন সুসমঞ্জস জীবন। বাহিরের পশুর হাতে বিড়ম্বিতা আর নিজের অন্তরের পশুর হাতে বিড়ম্বিতা এ দুই নারীই সমান দুঃখী, সমান ব্যর্থ। পশুর স্থান নারীর পায়ের তলায়, কারণ পশুরাজই শক্তির বাহন এই পশুকে জয় করে বশ করে নারীর দেবীত্ব।

সখ্য

[শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়]

রক্তের দাগ কালো হ'য়ে উঠে কালের সাথে
চিত্তের ফাগ রাঙা হ'তে হ'তে
মঞ্জিম রাগে পরতে পরতে
ছড়ায়ে ফেলে যে প্রাণের পাতে!
আঘাতে যখন জর্জ্জর হিয়া ধূলায় লুটে
নিবিড় ব্যথায় নির্ব্বাক্ হয়ে
দুর্ব্বহ ভার জীবনেরে ল'য়ে
পরাণ যখন আকুলি উঠে।
স্নিগ্ধ তখন চিত্ত পরশ প্রিয়ের প্রিয়
বাঞ্ছিত সেই গোমুখী ধারায়
নাহিয়া চিত্ত কলুষ হারায়
সখার সখ্য এমনি কিও!
বিশ্বের যত সুমধুর যোগ অনাত্মীয়ে
প্রেম-পুরুভুজ অসীম করিয়া—
গড়িয়া তাহারে রেখেছে ধরিয়া—
বুকের মাঝারে আড়াল দিয়ে!
ওগো আড়ালের গোপন-বিশ্বে সুখ সবিতা
নিত্যানন্দ-উৎস কিশোর—
বেঁধেছ নিখিলে দিয়ে একি ডোর?
রচিয়াছ একি গীতি কবিতা?

———

তর্পণ

[শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার]

[১]

মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জোর করিয়া বলিলেন—এ রোগী তিনমাসের মধ্যে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। বাস্তবিকই সে রোগে কেহ বাঁচে না—তবে দুদিন আগে আর দুদিন পরে মরিয়া থাকে। শিশিরের বুকটা ছিল যেন হাঁসপাতাল—দুনিয়ায় এমন রোগ নাই যাহা তাহার বুকে হয় নাই। আবার দুনিয়ায় এমন রুগী ছিল না যে শিশিরের বুকে স্থান পায় নাই। এমন হৃদয়বান পরসেবা রত যুবক দেখা যাইত না। ব্রহ্মচারী থাকিয়া লোকের সেবায় জীবন কাটাইবে—শিশিরের এই বাসনা ছিল।

রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া সে নিজেই রোগা হইয়া পড়িল। অনাহার, অনিয়ম এবং রাত্রি জাগরণ একদিন নয় দুদিন নয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিলে শরীর আর কতদিন থাকে? লেখাপড়ায় মনোযোগ নাই—অমন বুদ্ধিমান ছেলের এক একটা পরীক্ষা পাশ করিতেই তিন চার বৎসর কাটিয়া যায়। বাপ মা, বন্ধু বান্ধব সময়ে সময়ে বিরক্ত হন, কিন্তু অমন দেবচরিত্র যুবকের মাহাত্ম্যের নিকট সকলেই মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

ডাক্তার বলিয়াছে আর বাঁচিবার আশা নাই সুতরাং উঠিবার সামর্থ্য থাকিলেই শিশির রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে পালাইত। রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে শ্মশানে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে। শিশিরকে ধরাধরি করিয়া সকলে লইয়া আসিতেছে। পথে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা,—

তিন মাস কেন ছয় মাস কাটিয়া গেল শিশির মরিল না। সে একবার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। প্রিন্সিপ্যাল তাহার মোটা সোটা সুন্দর চেহারাখানি দেখিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না—এই—সেই মানুষ। শিশিরের জীবনে নব বসন্ত দেখা দিল। স্বাস্থ্যের, সৌন্দর্য্যের, যৌবনের ভরা লইয়া আবার সে সেবা কার্য্যে ব্রতী হইল।

খবরের কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে বাহির হইয়াছে—জেলের ভিতর শিশিরের আত্মহত্যার কথা। জামার কাপড় ছিঁড়িয়া দরজার গায়ে বাঁধিয়া শিশির উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। মরিবার আগে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে শেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছে ঠিকানা অনুযায়ী যেন চিঠিখানা পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

"প্রিয়তমে,—

তুমি জানো যে অপবাধে অপরাধী সাব্যস্ত হ'য়ে আমি আজ নির্ব্বাসিত, আমার সে অপরাধ বিন্দুমাত্র ছিল না। তোমায় ভাল বাসাই আমার এ সর্ব্বনাশের মূল। তোমার

মাকে রোগে শুশ্রূষা করিতে যাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নরনারী-গণের সেবাই জীবনের ব্রত করেছিলাম—তাই যখন ডাক্তার বাবু অনুরোধ করলেন তোমাদের বাড়ী যেতে, তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিনি। তখন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর তেজ এবং উৎসাহে আমার হৃদয় ভরা ছিল। মায়ের অসুখ শুনে কয়েক দিন পরে তুমি স্বামীর কাছ থেকে এলে। তুমি, আমি পালা করে, শুশ্রূষা করতাম। তোমার মায়ের অসুখ সেরে গেল, কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ী যাওয়া ছাড়তে পারলাম না তুমি তোমার স্বামার কথা বলতে—সে যে কত বড় পাষণ্ড, তা আমি তোমার কথাতেই বুঝতে পারতাম। তুমি যে তাকে ভালবাসতে পারো নি তাও বুঝতে পেরে-ছিলাম। আমায় তুমি ভাইয়ের মত দেখতে, কিন্তু তোমার স্নেহ এমন একটা সীমায় এসে পৌ ছছিল যেখান থেকে প্রণয়ের সাগর আর খুব অল্পই দূরে ছিল। তুমি আমায় চাইলে, আমি নিমেষে তোমার হয়ে গেলাম। একদিন তোমার স্বামী এসে জোর ক'রে তোমায় নিয়ে গেল। যে ভালবাসা আমি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলাম তুমি রূপের জাল ফেলে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে দূরে চলে গেলে; আমার হৃদয় শূন্য হয়ে গেল। সে শূন্যতা এ সংসারের কোনও জিনিষে কি পূর্ণ করতে পারলো না? বিস্ফারিত নয়নে সংসারে ভোগের হাটে কত দিন ফিরেছি কিন্তু কই আমার তৃষ্ণা তো মিটলো না।

আমি ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরেছি অভাবে পড়ে লোককে ঠকিয়েছি, প্রিয়তম বন্ধু পরিজনকে প্রবঞ্চিত করেছি, আপন বলতে যারা ছিল সকলে আমায় ঘৃণা করে ত্যাগ করেছে—তবুও আমি তোমার কথা যে ভুলতে পারিনি। নেশার মধ্যে হৃদয়ের জ্বালা ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি নাম যশ চরিত্র সব হারিয়েছি। সকলে চক্ষু করে পাগল বলে আমায় পাগলা গারদে পাঠিয়েছে,—সেদিন তোমার মা আমায় দেখতে এসে বিদ্রূপের হাসি হেসে গেলেন—এ সংসারে আমার স্থান নাই এই মনে করে আজ নিতান্ত কাপুরুষের মত আমি বিদায় হ'লাম। জানিনা এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কিনা। জানি না এ চিঠি প'ড়ে হতভাগার জন্য তোমার এক কোঁটা চোখের জল পড়বে কিনা। আমার প্রেতাত্মার তর্পণ সেই এক কোঁটা জল না হলে যে হবেনা শুধু এই কথাটা মনে রেখ তাই এই পত্র।

উদাসী

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

জীবন পথে বেচাকেনার বিরাট হাটের ধারে
বরছে সবে কান্নাহাসির দায়,
মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে সকল গুরু ভার
আছি কোণে একলা নিরালায়।

নাইকো হেথা ঠেলাঠেলি বিপুল কোলাহল
নীরব অতি,অতি বিজন স্থান,
হেথায় শুধু পাগল করে পাখীর কলকল
মাতাল বায়ে আবেশ বিভল প্রাণ।
পথের বাঁকে চল্‌ছে নদী গেয়ে আপন গান
কল্‌কলে তার ছল্‌কে উঠে বুক,
চল্‌ছি আমি তার মাঝারে মিশিয়ে আমার তান
তাতেই আমার আনন্দ মোর সুখ।
রবির আলো আজকে আমায় পাগল করে দেয়
আমার পাশে কুসুম ফুটে ওঠে.
চাঁদের সুধা চকোর চিত কণ্ঠ পুরে নেয়
আমায় ঘেরি মন্দ মলয় ছোটে।
গভীর রাতে বিশ্ব যখন আবেশ অবনত
তারা গুলি আমার পানে চায়,
কোন সুদূরের পুলক ভরা গন্ধ এনে কত
জমিয়ে রাখে গোপন কিনারায়!
চাইনা ফুটে উঠ্‌তে আমি কোলাহলের মাঝে
এ জনমে না পাই নাহি ব্যথা.
নীরব প্রাণে আকুল করে যে সুর আমার বাজে
বল্‌ব আমি সেই সুরেতে কথা!
এমনি করে ভেসে ভেসে লাগ্‌বে গিয়ে কোথা
কোন ঘাটেতে ভিড়বে আমার তরী.
প্রাণের কোণে ক্ষুদ্র প্রয়াস লুট্‌বে সফলতা
বিপুল গানে উঠ্‌বে পরাণ ভরি'।
কবে আমার আস্‌বে সেদিন কোন সে শুভক্ষণে
থামবে আমার অচিন পথে ধাওয়া,
আপনা যবে হারিয়ে যাব পূজার আয়োজনে
হবে আমার সফল যত পাওয়া।

———

অপাংক্তেয়

[শ্রীসরোজনাথ ঘোষ]

(১)

দ্বিজেন্দ্রনাথ যথন দেশ ছাড়িয়া, ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে অনির্দ্দিষ্টভাবে, কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তথন তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব অথবা গ্রামবাসী কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য্য হইলেই যে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হয় এমন কি কথা? আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেও ত চলিতে পারিত? বিশেষতঃ সংসারে তাঁহার অর্থের এমন অনটন ছিল না যে, এখনই পড়া ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে, অপরিচিত স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!

কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে এ সকল আন্দোলন, আলোচনা, তাঁহার শ্রুতিপথে আত্মীয় স্বজনের মন্তব্যগুলি আদৌ পঁহুছিয়াছিল কি না কে জানে!

কয়েক বৎসর পরে একদা গ্রামবাসীরা জানিতে পারিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ পশ্চিমাঞ্চলের কোথায় যেন, কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়া তাহার মালিক হইয়াছেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী মুক্তহস্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন। পরম বিস্ময়ে তাহারা আরও সংবাদ পাইল যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্ম্মস্থলে পত্নীকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আসিতেছেন। এরূপ ঘটনা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসমাজে তথন একান্তই অভিনব।

সুতরাং পুনরায় নানাবিধ, তীব্র, মাঝারি ও মোলায়েম মন্তব্য পল্লী বৈঠকের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলাকে সরস করিয়া তুলিল। গ্রামের প্রবীণগণ আধুনিক যুবকগণের নির্লজ্জ আচরণের জন্য নানা প্রকার কদর্য্য ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলেন না। নবীনের দল পাল্টা জবাবে বলিতে লাগিল, কাজটা মন্দ কিসের? বৎসরের দীর্ঘকাল যাহাকে বিদেশে যাপন করিতে হইবে সে কেমন করিয়া তাহার পত্নীকে দেশে ফেলিয়া রাখিতে পারে? অতএব দ্বিজেন্দ্রনাথের কার্য্য সমর্থনযোগ্য।

প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাই যে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক মনের গতি একথা বলিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। লোকমত যেখানে যুক্তিপূর্ণ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেখানে নতশীর্ষ হইতেন। কিন্তু যুক্তিহীন লোকমতকে তিনি কোনও মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই অংশটি ক্রমেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা কেহ তাঁহাকে কার্য্যের অসঙ্গতি বুঝাইয়া দিতে পারিলে তিনি অম্লান বদনে নিজের ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেন। কিন্তু লোকমত চিরদিনই বিচারকের ন্যায় রায় দিতেই জানে—

আলোচনা করিয়া পথিভ্রান্তকে কোনওদিন পথ দেখাইয়া দেয় না।

পত্নীকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবার বিরুদ্ধে গ্রামের মধ্যে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বিশেষ ধুমধামের সহিত সহধর্ম্মিণীকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে গ্রামের উন্নতিকল্পে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য তিনি কয়েক সহস্র টাকাও ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। নবীনেরা এজন্য প্রকাশ্যে তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রবীণেরা দ্বিজেন্দ্রনাথের কৌলিক আচরণ ভঙ্গের জন্য দুঃখিত হইলেও লোকহিতকর অনুষ্ঠানে অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে মৃদু প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

(২)

ব্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন ও দীন দুঃখীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করার ফলে দেশে ও বিদেশে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হইয়া গেল। "ছাই মুঠা" ধরিলে যে তাহা "সোণা মুঠায়" পরিণত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, বক্তৃতা শক্তির গুণে তিনি বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জ্জনেও সমর্থ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও প্রাচ্য সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিশেষতঃ বঙ্গভাষার তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার বিলাসমোহ সাধারণতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ লক্ষিত হইত। তাঁহার গৃহ পাশ্চাত্য প্রণালীতে নির্ম্মিত হইলেও উহার সর্ব্বত্রই ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। ঘরে অথবা বাহিরে, কোন সময়েই তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন না। চটি জুতা, ধুতি চাদর এবং সেকালের মেরজাই ছাড়া কদাচিৎ তিনি মোজাজুতা, সার্ট কোট ব্যবহার করিতেন। গৃহিণী ও পুত্র কন্যাগণ তাঁহারই আদর্শে মোটাচালে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়ীর ছেলে মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি পুত্রকন্যার মধুর কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীত সুধা পান করিতেন। নিজে তিনি তাহাদিগকে গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করাইয়াছিলেন। শিবস্তোত্র, গঙ্গা মাহাত্ম্য, গণেশের স্তব, প্রভৃতি বালক বালিকারা যখন সমস্বরে আবৃত্তি করিত তখন তিনি নিমীলিত নেত্রে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন।

নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে অথবা "কলিমদ্দী মিয়ার" পক্কান্ন গ্রহণে তাঁহার বিশেষ আপত্তি কোনও দিন ছিল না, কিন্তু গৃহ দেবতার পূজা শেষ না হইলে কোনও দিন তিনি অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বিলাসিতা তাঁহার পরিবারে কোনও দিন প্রবেশ করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার গৃহে পদার্পণ মাত্রেই দর্শকের চিত্ত পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতার প্রভাবে স্বতই মুগ্ধ হইত। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহার জীবনের চরম আদর্শ ছিল। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় তাঁহার গৃহের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। কোনও গোলমাল নাই, অযথা চীৎকার নাই

পরিচারক, পরিচারিকারা পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন, কর্ম্ম কুশল এবং নিয়ম শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত।

প্রবাসে বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করিলেও পূজার সময় তিনি সপরিবারে দেশে যাইতেন। পিতৃপিতামহের জন্মভূমি তাঁহার কাছে বড় আদরের স্থান। তিনি স্বগ্রামকে পবিত্র তীর্থের ন্যায় দেখিতেন। বাড়ীতে পূজা হইত; কিন্তু জীব বলির তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। দেবতাকে, ভগবানকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য, তাঁহারই সৃষ্ট জীবকে উৎসর্গ করা তাঁহার মতে ঘোরতর অধর্ম্ম। কেহ তাঁহাকে এবিষয়ে বুঝাইতে গেলে, তিনি বলিতেন যে বৃথা তর্কে কোন লাভ নাই, তাঁহার হৃদয় যে কদর্য্য কার্য্যে সাড়া দেয় না, সে কার্য্য তিনি কখনই করিবেন না।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। কাঙ্গাল দুঃখী কয়দিন উদরপূর্ত্তি করিয়া বিবিধ প্রকার রসনা তৃপ্তিকর আহার্য্য পাইত। স্বদেশজাত বস্ত্রও প্রত্যেকের অঙ্গে সুশোভিত হইত। প্রার্থী কখনও তাঁহার কাছে আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইত না। অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

ব্যবসায় উপলক্ষে অধিকাংশ কাল বিদেশে থাকিতে হইলেও, গ্রামে কোনও ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে যোগ দিতেন। অসুবিধা যেমনই থাকনা কেন, তিনি সকল বাধা, সকল অসুবিধা জয় করিয়া দেশের অনুষ্ঠানে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া দিতেন।

সঙ্কীর্ণচেতা, পরশ্রীকাতর জ্ঞাতিগণ ব্যতীত দেশের জন সাধারণ এই সকল কারণে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিত। সে অঞ্চলের এমন কোনও ইতর বা ভদ্র ছিল না, যে ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট হইতে উপকার লাভ করে নাই।

(৩)

বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। চন্দ্রাতপতলে সহস্রাধিক ব্যক্তির আহারের জন্য পাত পড়িয়াছে। সামাজিক নিমন্ত্রণ। সমগ্র বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কুলীন কায়স্থগণ সমবেত।

ব্যবসায়স্থল হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ সপরিবারে এই বৃহৎ সামাজিক নিমন্ত্রণে যোগ দিবার জন্য দেশে আসিয়াছিলেন। এসকল বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ অনন্যসাধারণ। লৌকিক আচরণে বহুবিধ দোষ থাকিলেও সমাজধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল মত ছিল। তবে আগাছার ন্যায় যে সকল অন্ধকুসংস্কার দিন দিন সমাজক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইয়া ফল পুষ্পিত হইয়া বৃক্ষরাজির সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত, তিনি সেই সকল কুসংস্কারকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার দলে ছিলেন মাত্র।

নানাস্থান হইতে প্রসিদ্ধ কুলীনগণ সেই ভোজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতি সাধারণ ভাবে, এক জোড়া চটিজুতা পায় দিয়া সামান্য একখানা মোটা চাদর গায় দিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ সভায় আসিলেন। একটু অন্যমনস্ক ভাবেই চটিজুতা সহ তিনি চন্দ্রাতপতলে আসিয়া উহা খুলিয়া সেই খানে রাখিলেন এবং একটা আসনে উপবেশন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সহসা কয়েক জন বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বড় বেয়াদপি; লোক যেখানে খেতে বসেছে, সেখানে চামড়ার জুতা।

কাযটা অসঙ্গত বোধে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া অন্যত্র রাখিয়া আসিলেন। এবং বিনয় সহকারে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন। বৃদ্ধদিগের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কয়েকজন নবীন ও উদ্ধত স্বভাবের যুবক বলিয়া উঠিল "এ সব বাড়াবাড়ি! কত লোক মুরগী খেয়েও সমাজে চলে যাচ্ছে তাতে কোন কথাই ওঠে না আর জুতার জন্য এত!"

তখন সবে পাতার উপর পোলাও ও মাছভাজা যুগপৎ স্থান গ্রহণ করিতেছিল।

কথাটা অনেকের কানে গেল। কয়েকজন মাতব্বর বৃদ্ধ অমনই গর্জন করিয়া, "মিথ্যা কথা! যে মুরগী খায় তাদের সঙ্গে আমরা এক পংক্তিতে কখনও অন্নগ্রহণ করিনা। এমন ম্লেচ্ছ আচার যে করে, তাকে স্থগিত রাখা দরকার।"

একজন পরিহাসভরে বলিয়া উঠিল, "রেখে দিন মশাই। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, তা জানেন? এই খানে যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত 'বাবুজন বন্দিনী' পক্ষিনীর মাংস ও ডিম্বের অনেকবার সৎকার করেছেন। একবার যাচাই করেই দেখুন না।"

কথাটা আর তুচ্ছ করিলে চলেনা। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, নিতান্ত আচারপরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এমন অনেক কুলীনশ্রেষ্ঠ এবং সমাজপতি তখন প্রস্তাব করিলেন যে, যদি সত্যই এমন কোন কালাপাহাড় আজিকার এই নিমন্ত্রণ সভায়, পংক্তিভোজনে বসিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সত্বই নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে হিন্দুসমাজ আর কোনও মতেই রক্ষা পায় না।

আহার্য্য পরিবেশন করা তখনই স্থগিত রহিল। মহা গোলযোগ চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। অনেকেই বড় গলা করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, এমন অখাদ্যভোজী কেহই অন্তকার এই সভায় উপস্থিত নাই।

দলের প্রধানগণ তখন ব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হউক, ভদ্রসন্তানগণের কেহই অবশ্য মিথ্যা বলিবেন না, যিনি সত্যই ঐ প্রকার খাদ্য কখনই স্পর্শ করেন নাই, তিনি অবশ্যই তাহা অস্বীকার করিবেন।

সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কোনও ভদ্রমহোদয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট গিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে তিনি ঐ প্রকার কোন অখাদ্য কখনও ভোজন করিয়াছেন কি না। না, না শব্দে প্রত্যেক ভদ্রসন্তান আপন আপন নিষ্ঠার পরিচয় দিতে লাগিলেন। সহস্রাধিক ব্যক্তির কেহই স্বীকার করিলেন না যে, তিনি কোনও দিন হিন্দুর অস্পৃশ্য কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্ব্বশেষ পংক্তির সর্ব্বশেষ আসনে বসিয়াছিলেন। তিনি সকৌতুকে এই প্রহসনের অভিনয় দেখিতেছিলেন। যখন প্রশ্নকারী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন গম্ভীর ভাবে দৃঢ় কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মুর্গী আমিত নিশ্চয়ই খেয়েছি, একবার নয়, বহুবার। সংখ্যাগণনা করা যায় না।"

বোধ হয় সেখানে বজ্রপাত হইলেও লোক এত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইত না। অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ অখাদ্যভোজী! আবার আপনমুখে তাহা ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত নয়!

মুহূর্ত্তকাল সমবেত কুলীন সম্প্রদায় স্তব্ধ

হইয়া রহিলেন। তার পর একটা মহান কোলাহল উত্থিত হইল। "দূর করে দাও" "এখনই উঠে যাক," "ম্লেচ্ছের স্পর্দ্ধা দেখ," ইত্যাদি মন্তব্য চারিদিক হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল। সমাজপতি মহোদয় তখন কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া সকলকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তার পর দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "দ্বিজেন বাবু, আপনি নিজমুখেই যখন স্বীকার করিলেন, আপনি অপাংক্তভোজী, তখন আমরা আপনার সহিত পংক্তিভোজন করিতে পারি না; আপনার স্থান এখানে নয়।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দীর্ঘাকার, ঋজু দেহ দ্বিজেন্দ্রনাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে বিদ্রূপের হাস্য রেখা।

চন্দ্রাতপের বাহিরে দাঁড়াইয়া জলদগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি যাহাই করি না কেন, মিথ্যাবাদী নহি। কিন্তু এই হাজার ভদ্রসন্তানের মধ্যে যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন তাঁহাদের সৎ-সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। এখন একবার দেখা যাক দেশে সত্যই মানুষ আছে কি না। যিনি প্রকৃত পিতার সন্তান অথচ আমার মতই ঐ সব খেয়েছেন, তাঁরা একবার উঠে দাঁড়ান।"

কথাটা বড়ই গুরুতর। মনের অগোচর কোনও অনুষ্ঠানই থাকে না। চক্ষু লজ্জা অথবা মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ যাহারা ইতিপূর্ব্বে অস্বীকার করিয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রনাথের কঠোর গালাগালী তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। নবীনের দল দ্বিজেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা নিষিদ্ধ পক্ষী মাংস অথবা আনুষঙ্গিক ভোজ্য পদার্থ বহুবার উদর দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না। একে একে তাহারা আসন ত্যাগ করিয়া চন্দ্রাতপের বাহিরে গিয়া দ্বিজেন্দ্র নাথের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সংখ্যায় তাহারা শতাধিক হইবে।

সেই দলের মধ্যে যাহাদের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি ছিলেন এমন বৃদ্ধের দলও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সে অপমানত সকলেরই। তখন তাঁহারাও গিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের দল পুষ্ট করিলেন।

সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় যখন কুলীন সম্প্রদায়ে এই উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িল, তখন বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইল। দেখা গেল, দ্বিজেন্দ্রনাথের দলে প্রায় চারিশত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ধনশালী, গণ্য মান্য ব্যক্তির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

সামাজিক নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিয়া এই চারিশত ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্র নাথের সঙ্গে চলিলেন তিনি সকলকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া অভুক্ত অতিথিগণের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অর্থে কি না হয়? বহু অর্থব্যয় করিয়া চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে বিপুল ভোজের আয়োজন হইল। রাত্রি আটটার সময় সেই চারিশত ব্যক্তিকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রীতিলাভ করিলেন।

[৪]

সামাজিক দলাদলি ক্রমেই চরম সীমায় উপনীত হইল। দ্বিজেন্দ্র নাথের দল ক্রমে আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্বে নানাবিধ দুর্ব্বলতার জন্য আত্ম প্রকাশ করিতে পারে নাই, ক্রমে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বিদ্রূপ কশাঘাতে

সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীকার করিল যে তাহারাও ঐ কুকার্য্য করিয়াছিল। যখন করিয়াই ফেলিয়াছে তখন ত নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ে তাহাদের স্থান নাই। কাজেই ক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথের দল পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

রক্ষণশীল দল তখন প্রমাদ গণিলেন। এমনভাবে যদি দ্বিজেন্দ্র নাথের দল প্রবল হইতে থাকে তবে ত হিন্দুধর্ম্ম আর টিকিবে না কথাটা ভাল নয়। তখন তাঁহারা আপোসে একটা মীমাংসার জন্য দ্বিজেন্দ্র নাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি একটা প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবে

দ্বিজেন্দ্র নাথের চিত্ত এ প্রস্তাব শ্রবণমাত্র জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিতান্ত বিনীত-ভাবে জানাইলেন যে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ। অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তিনি দণ্ড গ্রহণে অনিচ্ছুক নহেন কিন্তু তিনি বিবেকের নিকট এ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার অপরাধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। যদি তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার কার্য্য অবৈধ, তাহা হইলে সেরূপ কার্য্য তিনি কখনই করিতেন না এবং করিলেও তাহার জন্য যে কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এরূপ কবুল জবাব শুনিবার পর রক্ষণশীল দল হতাশ হইলেন, কিন্তু দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে ছাড়িলেন না দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁহারা দাম্ভিকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সমাজ শাসনকে বিদ্রূপ করিয়া ক্ষান্ত নহেন। সজ্ঞানে স্পষ্টও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তিকে একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

তখন সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল যাঁহারা এতদিন এরূপ দলাদলিতে যোগদান করেন নাই, তাঁহাদেরও আসন টলিল। পরম্পরায় এমন কথাও রটিয়া গেল যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হিন্দুও নহেন। তিনি আপনাকে কখনও খৃষ্টান, কখনও মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিতেছেন, সুতরাং এরূপ ব্যক্তি দ্বারা সমাজের নানাবিধ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা

নানাস্থানে সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে এ বিষয় লইয়া তীব্রতম আন্দোলন চলিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার বিপুল আয়োজন হইল তাহাতে সমাজের বৃহত্তম অংশ একেবারে অকৃতকার্য্যও হইলেন না তবে দ্বিজেন্দ্রনাথের দলও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের পক্ষেও বহু সম্ভ্রান্ত কুলীন সন্তান ছিলেন এবং উভয় দলের বিরোধ এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহাতে সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজেও তাহার প্রভাব বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল

দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন সমাজ মধ্যে ধনশালী ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও অনেকস্থানে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। কিন্তু অভিমানী দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতেও হতোদ্যম হইলেন না তিনি কোনও মতেই বিবেকের বিরোধী কার্য্য করিতে রাজি নহেন।

[৫]

ঠিক এমনি সময়ে বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করিয়া

তুলিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" তখন জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী তখন ভাবের প্রেরণায় উন্মত্তবৎ। দেশে দেশে, নগরে নগরে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পবিত্রতম সঙ্গীত গান করিয়া বাঙ্গালী তখন আত্মবিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে

পূর্ব্ব বঙ্গের মসনদে তখন ফুলার সাহেবের অপ্রতিহত প্রভাব তাঁহার আদেশে স্বদেশী আন্দোলন পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হইতেছিল স্বদেশী বক্তৃতা অথবা মাতৃনাম গান শুনিলেই শান্তি রক্ষক তাহাতে বাধা দিত। কিন্তু বাঙ্গালী তখন ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহারা সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ধাবিত হইতেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যবসায় পরিচালনার ভার সুযোগ্য আত্মীয় স্বজন ও উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে ন্যস্ত করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতাশক্তি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন, তাঁহার অন্নভাণ্ডারের দ্বারও রুদ্ধ রহিল না স্বদেশী বস্ত্রভাণ্ডার স্থানে স্থানে স্থাপিত হইল। দেশের লোক শ্রদ্ধাভরে এই উৎসাহী প্রবীন কর্ম্মীর কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতে লাগিল।

প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ জনপদে আহূত হইল। দেশ বিদেশ হইতে মাতৃভূমির সন্তানগণ তাহার উদ্বোধনের জন্য যাত্রা করিলেন। নানাস্থান হইতে দেশ প্রসিদ্ধ কর্ম্মীগণ তথায় সমবেত হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনিও পুত্র পরিজনসহ সেই উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য কর্ম্মভূমি হইতে জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেলেন।

নগরের কোনও উন্মুক্ত ক্ষেত্রে জাতীয় সম্মেলনের মণ্ডপ সংস্থাপিত হইল। মহোৎসাহে স্বেচ্ছাসেবকগণ অতিথিবর্গের অভ্যর্থনা ও সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল

সভার উদ্বোধনের দিন প্রভাতে অকস্মাৎ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, জেলার হাকিম আদেশ করিয়াছেন, রাজপথে কেহ শোভাযাত্রা বা মিছিল বাহির হইতে পারিবেন না। আইন অমান্য করিলে আইনভঙ্গকারিগণ দণ্ডিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত নাগরিকগণ এরূপও আলোচনা করিতে লাগিল যে, "বন্দেমাতরম" ধ্বনি কাহারও মুখে উচ্চারিত হইলে গুর্খার লাঠির গুঁতায় তাহার শারীরিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

সমগ্র সহর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ এ সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন বটে, কিন্তু সভার কার্য্য বন্ধ রাখিতে চাহিলেন না সে দিন প্রভাতে ষ্টিমারে যে সকল দেশনায়ক আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা সহকারে আনিবার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ নদীতীরে সমবেত হইল

মাতৃনাম গানের সঙ্গে সঙ্গে অভ্রভেদী জয়ধ্বনি আকাশ বাতাসকে মুখরিত করিয়া তুলিল শত শত কণ্ঠ হইতে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

শোভাযাত্রা যখন রাজপথ বহিয়া সম্মেলন মণ্ডপের দিকে চলিয়াছে, তখন পুলিশ সদলবলে আসিয়া, শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া নীরবে সকলকে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিল।

কিন্তু জাতীয়দল সে কথায় কর্ণপাত করিল না। জনতা যেমন চলিতেছিল তেমনই লক্ষ্য স্থলের দিকে চলিতে লাগিল। বালক, প্রৌঢ়, যুবা—সকলের মুখে ঘন ঘন মাতৃবন্দনার স্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল।

পুলিস তখন শান্তি রক্ষার জন্য জেলার কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল। রেগুলেশন লাঠি লইয়া তাহারা জনতাকে সরাইয়া দিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেশ সেবকগণ সে বাধা গ্রাহ্য করিলেন না, তাঁহারা সমান ধৈর্য্য সহকারে মাতৃনাম গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রচারিত আদেশ মানিয়া না চলিলে তাহার ফলভোগ অনিবার্য্য। রেগুলেশন লাঠি শ্রাবণের ধারার ন্যায় প্রচণ্ড তেজে, জনসমুদ্রের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন বহুসংখ্যক তথাকথিত দেশনায়ক বাবর। ব্রাহ্মণের নীতির অনুসরণ করিলেন।

যুবক ও কিশোর সম্প্রদায় তখনও দ্বিগুণ উৎসাহে, দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া গাহিতেছিল,

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু রেগুলেসন লাঠি বড়ই উৎপাৎ বাধাইল। পৃষ্ঠ দেশ অথবা মস্তকে তাহার স্পর্শ কে নিতান্ত নবনীতবৎ কোমল বলিয়া অনুভূত হয় না। কাজেই সকলে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

একে? শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ গঠন কে ঐ বালক তখনও ওখানে দাঁড়াইয়া আত্মসমাহিত ভাবে বন্দনা গানে আকাশ ও প্রান্তর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে? শাসন শৃঙ্খলার প্রতি এই বালকের উপেক্ষা, কখনই মার্জ্জনীয় নহে। সতর্কবাণী সে শুনিতে পায় নাই? শাসন দণ্ডের প্রচণ্ড অনুভূতি তাহার সহজ জ্ঞানকে এখনও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই?

সেদিনের বালক সমগ্র শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তথাপি মাতৃবন্দনার গান গাহিবে? তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উপযুক্ত দণ্ড হউক।

রেগুলেশন লাঠি শ্রাবণের ধারার ন্যায় বালকের অঙ্গে বর্ষিত হইতে লাগিল। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া সে মস্তকের আঘাত নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্বিনীত বালক-কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হইতেছিল

"বন্দে মাতরম।"

সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। আহত বালক টলিতে টলিতে জলের মধ্যে নামিয়া গেল। মুখে মাতৃনাম গান সর্ব্বাঙ্গে প্রগাঢ় বেদনার ক্ষত, কিন্তু তবুও বালক তথাপি নাম গান ত্যাগ করিবে না? আবক্ষ জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া যুগল বাহু মস্তকের উপর রাখিয়া অশিষ্ট বালক তখনও বলিতেছিল—

"মাতরম্।"

রেগুলেশন লাঠি সেখানেও নামিয়া আসিল। যেখানের বালকের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিয়া তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুই হস্তে শোণিত রঞ্জিত মস্তক চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বালক গাহিয়া উঠিল,

"তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

কিন্তু কতক্ষণ? শোণিত স্রাবে ক্লান্ত দেহ বালক টলিতে টলিতে দীর্ঘিকার পাড়ের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিল, স্খলিত পদে সে তীরভূমির উপর গড়াইয়া পড়িল। সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া আসিতেছে তথাপি তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে তখনও ধ্বনিত হইতে ছিল মাতরম্।"

(৬)

চক্ষুর পীড়া বশতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ শোভা যাত্রায় যোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার কাছে সমস্ত বিবরণ অসংলগ্ন ভাবে আসিয়া পড়িল। যখন তিনি শুনিলেন একটি বালক বৃহৎ দীর্ঘিকার ধারে মাতৃনাম গান

করিতে করিতে প্রহারযন্ত্রনায় পড়িয়া আছে তখন তাঁহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। কয়েকজন সহকর্ম্মীসহ তিনি গৃহের বাহির হইলেন। সমগ্র পল্লী সহর তখন স্থির, কোলাহল বর্জ্জিত।

অতি কষ্টে একব্যক্তির হাতধরিয়া তিনি ভোজনাস্থল অভিমুখে দৃঢ় চরণে অগ্রসর হইলেন। কোথাও কেহ নাই। কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর সেবকেরা যথাস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। সভার অনুষ্ঠান হয় নাই—রাজপথ শোভাযাত্রার শোভা হইতে বঞ্চিত,—সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছিল।

* * * *

কয়েকজন যুবক দীঘিকার জলে নামিয়া বালকের অর্দ্ধ চেতন দেহ তুলিয়া আনিল। তাহার মুখ হইতে তখনও "মাতরম" শব্দ থামিয়া যায় নাই। অদ্ভুত এই বালক।

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সে বালক দ্বিজেন্দ্র নাথেরই অন্যতম পুত্র।

দীর্ঘাকার দ্বিজেন্দ্রনাথ পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া দৃঢ় চরণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলে দেখিল, আননে বিষাদের একটি রেখা মাত্র নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তর মধ্যে তখন যে ঝটিকা বহিতেছিল তাহার ভীষণতা অনুমান করিবার সামর্থ্য সাধারণ মানুষের থাকিতে পারে কি?

\- - -

আহত বালককে কেন্দ্র করিয়া লাঞ্ছিত দেশ সেবকগণের আলোকচিত্র তুলিয়া লওয়া হইল। পুত্রের পিতা, তাহার পার্শ্বে স্থান পাইলেন।

সহস্র কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

দেশের লোক চাঁদা তুলিয়া উল্লিখিত লাঞ্ছিত দেশ সেবকগণকে ভোজ দিবার ব্যবস্থা করিল। বৃহৎ চন্দ্রাতপ তলে আহারের স্থান হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ কুলীন সন্তানই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। যাহারা পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সমাজে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশমাতৃকার পূজা উপলক্ষে তাঁহাদের অনেকেই সেই সভাক্ষেত্রে যোগ দিয়াছিলেন।

কয়েকজন যুবক, আনন্দধ্বনির মধ্যে, সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের আহত পুত্রকে চন্দ্রাতপতলে লইয়া গেল। তাহার মস্তকের ক্ষত তখনও শুকায় নাই। তখনও পাগড়ীর আকারে তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আহত হইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথও মন্থর গমনে চলিলেন। প্রবল, বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে কোনও সামাজিক আপত্তি উঠা দূরে থাকুক, যাঁহারা ঘোট করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হর্ষানন্দে তাঁহার আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ বাহুদ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথের বাম বাহু বেষ্টন করিয়া ভোজনস্থলের অভিমুখে তিনি যখন অগ্রসর হইলেন তখন সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মাতৃযজ্ঞের পবিত্র হোমানল-শিখা আজ তথাকথিত সামাজিক সমস্যার পুঞ্জীভূত জঞ্জালকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল কি?

মানুষের গান

[শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী]

যুগে যুগে তিল তিল করি
জীব হতে জীবে উন্নয়ন—
ক্রমিক বিকাশ,
জন্মে জন্মে কৃচ্ছ্র আলোড়ন
কত তাপ অভাব দুর্ভোগ,
সুতীব্র দহন,
সাধনায় কত অত্যাচার,
পলে পলে সর্ব্ব-অঙ্গ দিয়ে
সে কিরে রোদন,—
ফলে তার—এ মানব দেহ
জীব গর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধিকার
বিধাতার দান!
ইন্দ্রিয়ের নাহি অনটন,
খুলে গেছে হৃদয়-কবাট
জেগেছে শকতি
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম বিচারের।
জাগে বুদ্ধি ভুবন বিজয়ী,
কে আঁটিবে তায়?
ইচ্ছা আজ লীলায় চঞ্চল,
ভাঙা-গড়া পলকে পলকে
নিত্য খেলা তার।
ধরণীর অরণ্য পর্ব্বতে
নদ নদী সাগরে সরিতে
প্রপাতে মরুতে,
নভস্থলে বিদ্যুতে সমীরে,
সূর্য্য শশি-গ্রহ তারকায়।
নিত্য নবরূপে
জেগে ওঠে ছন্দ সে লীলার!
নিত্য নব তৃপ্তি-আয়োজন,—
নিষ্ফল প্রয়াস!
তৃপ্তি-কই? মুহূর্ত্ত না যেতে
তৃপ্তি-ভূমি তিক্ত যে বিষম!

আবার আবার
দৃষ্টি পথে তৃপ্তি মরীচিকা
বিহ্বলিয়া করে আকর্ষণ,—
ধেয়ে চলে যায়
অন্ধ বেগে লীলার উল্লাস!
নিত্য হাসি—নিত্য হাহাকার
জাগে পাশা পাশি,
জন্ম লভে জটিল সভ্যতা;
বিশ্বপরে জয়ধ্বজা তুলি
নাচে অহঙ্কার!
নাচে বুদ্ধি—করালিনী কালী,
লোল জিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনী,
চ্যুত লজ্জাবাস,
জগতের চিরশুভ্র শিরে
পদতলে বিদলিত করি
অট্টহাসি হাসে!
নরজন্ম-পরিণাম এই?
ক্ষণেকের লোভ-উন্মাদনা
বিকাইবে তারে!
পলে পলে ব্যর্থ সাধনার
লিখে দিবে দাস খত
নির্লজ্জ সমান?
কেন বুদ্ধি? কেন এ বিচার?
কেন হিয়া রক্ত শতদল
মাধুর্য্য-আধার?
আপনার মঙ্গল খুঁজিয়া
চাঞ্চল্যের অমঙ্গল-মাঝে
কেন দিবে ঝাঁপ?
পশু নহ—জেনো জেনো সার
মন তব প্রভু নহে আর
তুমি প্রভু তার।

ঝঞ্ঝা *

[শ্রীঅশোক কুমার চন্দ]

(ভবঘুরের কথা)

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন ছোট্ট এক রেলওয়ে ষ্টেশনের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ষ্টেশনের পনর মাইলের মধ্যে জনমানবের বসতি নেই। সামনে রেলওয়ে লাইন, পেছনে সবুজের বুকে লালের রং। ট্রেনে পথ চলেছে কোন সুদূরের অভিসারে—আমার মনটা উতল হ'য়ে সুদূরের অন্বেষণে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে। শব্দহীন নিরস দিনগুলো। উদ্দাম যৌবন, বুকভরা সাহস আর মিথ্যা-গর্ব্ব এরা ছিল আমার সাথী। আমার সান্ত্বনা আর তৃপ্তি ছিল দু'টো জিনিষ—ট্রেনের উন্মুক্ত বাতায়নে আর ভডকার ফেণিল উচ্ছ্বাস। কখনও হয়ত প্যাসেঞ্জার ট্রেণের জানালায় কোন নারীর হাসিভরা মুখ দেখা দিত আর আমি অবাক বিস্ময়ে, নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বুকের ভিতর একটা ব্যথার তুফান তুলে ট্রেণখানি সুদূরের পথে আপনাকে হারিয়ে ফেলত। কখনও হয়ত ভডকার নেশায় বিভোর হ'য়ে দীর্ঘ ঘটনাহীন দিনগুলো অবসান ক'রে দিতুম। পাশেই ছিল আপন ভুলানো সবুজ মাঠ। বসন্তে চাঁদনী রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে রব আমার মনে কেমন একটা অজানা ব্যথা জাগিয়ে তুলত আর শীতের দিনে তার অবিচ্ছিন্ন শাদা পোষাক আর নেকড়ে বাঘের গর্জ্জন নিশার স্বপ্নের মতো আমার মনটাকে ভীত চকিত করে তুলত। ষ্টেশনে আমি ছাড়া আর থাকত আমার স্ত্রী, এক টেলিগ্রাফিষ্ট আর তিন জন চৌকিদার।

আমি আর আমার স্ত্রী সেবার নববর্ষের উৎসব করছিলুম। আমরা দুজনে ব'সে গল্প করতে করতে খাচ্ছিলুম। পাশের ঘর থেকে টেলিগ্রাফিষ্টের অবিশ্রান্ত এক ঘেয়ে ঠক ঠক শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমি ইতিমধ্যে পাঁচ গেলাস ভডকা উজাড় ক'রে দিয়েছিলুম। টেবিলের উপর মাথা রেখে আমার বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের আশাহীন ছবি আঁকছিলুম আর আমার মনটা তাতে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছিল। আমার স্ত্রী আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল। সুন্দর স্বামীই যে তার সব। তার ভালবাসার মধ্যে একটা উদ্দামতা আর উচ্ছ্বাস ছিল। সে শুধু, আমায় ভাল বাসতনা—আমার দোষ গুণ সবই ছিল তার প্রিয়—আমার নিষ্ঠুরতার মধ্যেও একটা হাসি তার মুখে ফুটে উঠত। যে একটা বিরাট শূন্যতা আমার প্রাণকে আঁধার ক'রে তুলেছিল আজ তাকে দূরে ফেলে দিয়ে নব-বর্ষের প্রতীক্ষায় আমরা ব'সে। দু'বোতল দামী সাম্পেন—আমি

* রুষীয় লেখক এন্টন চেকফ হইতে অনুদিত।

গত বছর বাজী জিতেছিলুম। ঐ দুই বোতল সাম্পেনের গোলাপী নেশায় রঙ্গিন হ'য়ে উঠবার জন্য আমার প্রাণটা আকুল হ'য়ে উঠল। অঙ্কের ক্লাসের টাকা আনা পাই-এর হিসাব যখন ভাল লাগেনা তখন একটা প্রজাপতি তার রঙ্গিন পাখা উড়িয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে প'ড়ে ছেলেদের ক্লান্ত মনে যেমন একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে তেমনি ঐ সাম্পেনের বোতল দুটো শ্রান্ত ক্লান্ত আমাদের আজ জাগিয়ে তুলেছিল ঘড়ির কাঁটাটা ধীরে অতি ধীরে বারোটার দিকে এগিয়ে চলল। আমি সাম্পেনের বোতলের কর্কটা খুল্‌তে চেষ্টা করতেই সে ছিটকে পড়ল আর বদ্ধ ক্ষীণ ফেণীল সাম্পেনধারা ছুটে বেরুল, বোতলটা আমার হাত থেকে ফস্কে গেল আমি চট ক'রে তাকে ধরে ফেল্লুম। তার পর দুটো গেলাসে খানিকটা ঢেলে আমার স্ত্রীর হাতে একটা গেলাস তুলে দিয়ে বল্লুম "নূতন বৎসর তোমার জীবনে আনন্দ আর শান্তি নিয়ে আসুক- প্রাণ।" গেলাস হাতে ক'রে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে একটা অজানা ভয় জেগে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল "বোতলটা কি তোমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল?"

"হ্যা, তাতে কি হয়েছে?"

সে গেলাসটা নামিয়ে রাখল তার মুখ-খানি আরও ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল, সে বল্লে "কি দুর্ভাগ্যই জানি আমাদের কপালে লেখা, এটা বড় অলক্ষুণে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লুম "ওসব কুসংস্কার তোমার শোভা পায়না—নেহাইৎ বাজে।"

"ভগবান তাই করুন...কিন্তু কিছু না কিছু একটা ঘটবেই ঘট্‌বে। তুমি দেখো।" সে আর গ্লাস ছুঁলেও না—কোণে গিয়ে সরে বসে কি ভাবতে লাগল তার মুখে ব্যথা ফুটে উঠেছিল। আমি সান্ত্বনার স্বরে দু একটি কথা বলে বেরিয়ে পড়লুম।

বাহিরে নির্জ্জন অন্ধকার স্নেহময়ী মায়ের মত পৃথিবীকে আঁচলে ঢেকে ঘুম পাড়িয়েছে.. তুষারের শুভ্রতা সে আঁধারে তারায় আলোয় ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌চে। বাইরের এই সৌন্দর্য্য আজ আমায় আহ্বান করলে। চাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে শাদা দু টুকরো মেঘ তার আঁচলে আঁচলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদের অস্ফুট আলো ধীরে ধীরে লজ্জাশীলা পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছে আর আলোয় আঁধারে মিশে এক বিচিত্রতার সৃষ্টি করেছে...রাত্রি নির্জ্জন আমি লাইনের পাশে পাশে চল্লুম।

তারায় উজ্জ্বলে স্তব্ধ আকাশ। সামনে মস্ত একটা তালগাছ শাদার টোপর পরে আঁধারের বুকে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টিতে একটা হতাশা বোঝা যাচ্ছিল সেও যে আমার মত তার নির্জ্জনতা অনুভব করচে। আমি মুগ্ধ হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম।

আমি ভাবতে লাগলুম "দগ্ধ সিগারেট" বশিষ্টের মত আমার যৌবনটা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেবেলায় আমার মা বাবা যান মারা বড় ঘরের ছেলে—শিক্ষা বা আভিজাত্যের গর্ব্ব করবার কিছুই নেই আজ। বন্ধু নেই, সাথী নেই, ব্যথার ব্যথী কেউ নাই। এই বিরাট বিশ্বে বুক ফাটা দুঃখ নিয়ে আমি আজ একা। আমার বিদ্যা এমনি যে আজ এই হতচ্ছাড়া ষ্টেশনেই আবদ্ধ থাকবার আমি উপযুক্ত। অসহ্য কষ্ট আর নিষ্ফলতা আমার পদানুসরণ করছে। আবার কি দুর্ভাগ্য আসবে? নির্ব্বোধ স্ত্রী আমার।"

দূরে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল।

একটা ট্রেণ আসছে। লুপ্ত পৃথিবীর বুকে প্রতিধ্বনি তুলে ট্রেণটা আসছে ঐ প্রতিধ্বনি টেলিগ্রাফের তারের ঐ শব্দ সবই যে আজ আমার হৃদয়ে ব্যথার সুরে বাজছে।

"আবার কি দুর্ভাগ্য আসবে? আমার স্ত্রীর মৃত্যু? সেওত ভীষণ নয়। আজ আমার বিবেককে আমি বঞ্চনা করতে চাইনে; তাকেত আমি ভালবাসিনে। ছেলেবেলায় যাকে বরণমালা পরিয়েছিলুম আজত তার জন্যে আমার ভালবাসার রেখাও নেই। আমার উদ্দাম যৌবন—তার জ্যোতিহীন আঁখি—তার একটানা ভালবাসা। আমার যৌবন আজ শরতের শুকনো পাতার মত উড়ে যাচ্ছে ব্যর্থ নিষ্ফল। গাড়ীর উন্মুক্ত বাতায়নে স্ত্রীমূর্ত্তি আমার সামনে দিয়ে একটা ঝঞ্ঝার মত চলে যায়।—

ভালবাসা আজ আমার নেই। আমার যৌবন, আমার সাহস আমার অনুভূতি সব যে ঘৃণিত কুকুর শাবকের মত বিলিয়ে দিচ্ছি —ধূলোর মত সব ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি।"...

ট্রেণটা মহাশব্দে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ষ্টেশনে এক মুহূর্ত্তের জন্য থেমে আবার তার অনন্ত যাত্রায় চলল। বুকভরা ব্যথা নিয়ে ধীরে ঘরের দিকে ফিরে চল্লুম। আমার হৃদয়ে শুধু ঐ একটি প্রশ্ন থেকে থেকে জেগে উঠল "কি দুর্ভাগ্য আসবে? দুঃখের ভরা আজ আমার পূর্ণ। দুঃখ আমায় পাগল করে তুলেছে। অপমান আজ আমার মাথার তিলক—দুঃখ আজ আমার প্রেয়সী—ক্ষুধা আজ আমার আনন্দ।"

চাঁদের পাশের মেঘদুটো দূরে সরে গিয়ে কাণাকানি করতে লাগল। উতল হাওয়া কি এক অজানা বাণী নিয়ে এল।...

বাড়ীর দোরে আমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। চোখে তার হাসি, মুখে তার আনন্দ। সে বল্লে "শোনো, তুমি তোমার নূতন কোট্‌টা গায়ে দিয়ে এসো। আজ আমাদের বাড়ী যে অতিথি এসেছেন।"

"অতিথি?"

"হ্যাঁ, অতিথি, আমার খুড়ি নাটালা এই ট্রেণে এসেছেন।"

আমার মুখে হয়ত বিরক্তিই ফুটে উঠেছিল, আমার স্ত্রী তা লক্ষ্য করে বল্লে "যখন এসে পড়েছেন তা আর কি করা। আমার বুড়ো কাকা যা বদ মেজাজী আর ওঁর সঙ্গে যা করে কথা বলেন—তুমি ভালো করে কথা বলো কিন্তু লক্ষ্মীটি। আমাদের এখানে দিন দুই থেকে তিনি তাঁর ভাইয়ের বাড়ী যাবেন।"

আমার স্ত্রী আরও কি মেলাই বাজে বকছিল। আমার সে সব শোনবার মত মনের অবস্থা ছিলনা। নূতন কোট্‌টা চাপিয়ে ঘরে ঢুকলুম।

"চমৎকার এক সুন্দরী ব'সে। আমার টেবিল—সহুদিনের শীর্ণ চেয়ারগুলো—সব আজ যেন কেন হেসে উঠল। যৌবনের ছোঁয়াচ লেগে আজ যে তাদের বুকেও আনন্দের তুফান উঠেছে। তার হাসি, তার কথাবার্ত্তা সব তাতেই যেন কেমন একটা সৌন্দর্য্য আর বুদ্ধি উঁকি মারছিল। সে কেন তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম।

সে হেসে বল্লে "আমার যে এত মস্ত এক ভাইপো রয়েছে সেতো আমি জানতুম না।

আমি বল্লুম "আমার এম্নি সুন্দরী এক খুড়ী রয়েছেন এও যে ছিল আমার অজানা।"

সাম্পেনের দু'নম্বর বোতল খোলা হ'ল। সেও সাম্পেনের নেশায় মদির হ'য়ে উঠল।

আর আমি সাম্পেন আর তার সৌন্দর্য্য এ দু'য়ের নেশায় মাতোয়ারা হ'য়ে গেলুম।

আমার মনে পড়ল,—

এতদিন পরে প্রভাত এসেছে
কি জানি কি ভাবি মনে
ঝড় হ'য়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।"

তারপরে কি হ'ল সে আমার জানা নাই। ভালবাসার কথা জানতে চাওত উপন্যাস পড়, আমি শুধু বলব—

একটু যে চাওয়া
দিল একটু হাওয়া
কোথা তোমার ওপার থেকে
আমার এপার পরে।'

কি একটা উন্মত্ত ঝঞ্ঝা এসে আমায় পর্ণপুটের মত উড়িয়ে নিয়ে চলল—দীর্ঘ সে যাত্রা। সে ঝঞ্ঝা পৃথিবীর বুক থেকে আমার স্ত্রী, খুড়ী আর আমার শক্তি হরণ করে নিয়ে গেল—আমায় ফেলে গেল সেই সুদূর ষ্টেশন থেকে এই আঁধার পথে।

'আজ আঁধার রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা।'

বল আমায়, আর কি দুর্ভাগ্য আমার আসবে?

বাদল-বেদন

[শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু]

বাদলের বেদন বাজে কানের কাছে, প্রাণের মাঝে!
সে ধ্বনি শুনিস্ নিকি? ব্যাকুল সুরে বিপুল বাজে
অবিরাম আত্মহারা ক্ষুব্ধ গীতি
নিশিদিন মর্ম্মরিয়া পুষ্প-বীথি!
নিশিদিন গুঞ্জরিয়া আকাশ বায়ু ধূলির মাঝে?
বরষার মর্ম্মব্যথা হৃদয় যাচে হৃদয় যাচে।

সে কাঁদন বেদন-ব্যথা ঝিঁঝিয়ে উঠে নদীর কূলে!
মরালীর কণ্ঠে পশি' বেদন-মধু কণ্ঠ খুলে!
শিখি বুক নিংড়ে তুলে মুক্ত কেকা!
শ্যামলার চক্ষে আঁকে স্নিগ্ধলেখা!
দাঁদুরির রুদ্ধ মুখে শব্দময়ী তুফান তুলে!
খঞ্জন খোস্-খেয়ালী খেলায় মাতে আপন ভুলে!

হতাশায় ব্যাকুল বায়ু বকুল বনে লুটিয়ে পড়ে !
কেতকী-কুন্দ-নীপের বুকের মাঝে পরাণ নড়ে !
　　রজনী গন্ধা মেলে অশ্রু আঁখি !
　　সরমী সন্ধ্যামণি সান্ধ্য-সাকি
বেদনায় রাতকাটিয়ে ভোরের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে !
শেফালী সাঁঝ-পরাণী শুভ্রহাসি সাঁঝেই ঝরে !

ওরে কেও শুনিস্‌নি সে বেদন-বাণী কাঁদন-ভরা !
বিরহীর ব্যথা- বিধুর বুকের বাঁশী আকুল-করা !
　　পরাণের দুকূল-ছাপি' কল-রোদন।
　　মরমে সুপ্ত-ব্যথার সদ্য-বোধন !
মিলনের ক্ষুৎ পিয়াসে প্রিয়ার লাগি পাগল-পারা
বিরহীর মর্ম্মবাণী তিন্‌ ভুবনে লুটিয়ে-পড়া !

চারিদিক কাঁদন বাজে অশ্রুজল চঞ্চলিয়া !
মুখে নীল বসন্‌ ঝাঁপি' প্রভাত কাঁদে গুঞ্জরিয়া !
　　কাঁদেরে দোয়েল শ্যামা অন্তরেতে !
　　সন্ধ্যার আঁধার-ঘন বন্দে রেতে
বসি সেই বিরহিনী মুক্ত-বেণী ক্ষুব্ধ-হিয়া
প্রিয়েরই বাহুপাশের কাঙাল হয়ে ক্রন্দনীয়া !

কাঁদনের ঢেউ এসেছে নিখিল-ধরা উদ্বেলিত !
বুকেরই গঙ্গা-হৃদি বেদন-বানে উচ্ছ্বলিত !
　　শিহরণ হানছে বুকে তীব্র ব্যথা !
　　কত যুগ যুগান্তরী কল্পকথা
কত গান মিলন হাসি মূক-পরাণী উল্লসিত
বাদলের বেদন আনি বক্ষে বহি' উচ্ছ্বসিত !

মুক্তি পথে

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

মুক্তি বিশ্বের, আমার একার নয়। এই চরম সত্যকে মানিয়া লইলে দেশকাল পাত্র ভেদেও কোনও বিরোধ থাকে না। সমস্ত দেশ, সমগ্র জাতি, সমস্ত সময় ব্যাপিয়া যদি একই লক্ষ্যে আমাদের এব সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে তবে শাসন যন্ত্র কর্ম্মহীনতায় বিকল হইয়া পড়িবে, শোষক সম্প্রদায় আপনার স্বার্থ, মুক্তি লাভকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া পররক্ত লোলুপতা ত্যাগ করিবে। মুক্তি সেত নিখিল বিশ্ব মানবের অন্তরের সম্পদ তাহা কেহ দিতে পারে না—রক্ত চক্ষুর ভয় ও "আবেদন নিবেদনের থালা'র প্রত্যাশা তিরোহিত হইবে। কিন্তু মুক্তি চায় কে? মুক্তি চাও না—তুমি চাও তুমি যদি মনে কর যে আমার জীবনের সমস্ত ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য অপরের সম্পদ লাভে আমাকে অপ্রতিহতশক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে তাহা হইলে তাহাই কর—আপনার রক্ত আপনি পান কর—কিন্তু মুক্তিকামী বলিয়া বিশ্বের দরবারে আপনাকে কদাচ জাহির করিও না। কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বাধিনতার নামে যে সব অমানুষিক নির্ম্মমতার দানবী লীলা হইয়া গেল—তাহার ফল এখন পর্য্যন্ত জীবিত মানব মাত্রেই ভোগ করিতেছে মুক্তি চাও [illegible] এক সঙ্গে দাঁড়াইতে হইবে।—"এ ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" —অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না—অসহায় মানুষ বলিয়া অবহেলা করিলে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। আজ তুমি যদি অতি বর্ব্বর অসভ্যদেরও মানুষ বলিয়া বুকে স্থান দাও তবেই তুমি প্রকৃত মুক্তিকামী নতুবা স্বাধিনতার দাগাবাজী করিয়া নিজের রক্ত মাংসের বল দেখাইও না—আজ সমগ্র বিশ্ব-বাসীর চোখ খুলিয়াছে—তাহারা মেকীতে ভুলিবে না—আসল চায়!

স্বাধীন ত সেই, যে আপনাকে চিনিয়াছে পরকে জানিয়াছে।

দেশ সেবার অজুহাতে আত্মনাশ করিও না—তোমার জীবনের যে দায়ীত্ব তাহা উপলব্ধি কর—তাহা হইলে তোমার কর্ম্ম সাধনার পথও সুনির্দ্দিষ্ট হইবে। যে আত্মভুলী জ্ঞান লইয়া দেশমাতৃকার পূজায় বসিয়াছ তাহা মিথ্যা। যে আত্মভোলা আপনাকে ভুলে শুধু আদর্শে পাগল সেইত মুক্তিকামী। মুক্তির পথে সে চলেছে অথচ সেটা তার কামনা রহিত। দেশসেবার সঙ্গে, অকারণ মর্য্যাদাবুদ্ধিকে বড় করিয়া মনুষ্যত্বের সর্ব্বনাশ করিও না। যাহা মুখে চাও তাহা প্রাণে চাও কিনা দেখ, তাহা হইলে তোমার ভাবের [illegible] চুরি থাকিবে না তোমার মেকী পুড়ে যেটুকু আসলে দাঁড়াবে তা খাঁটি সোনা।
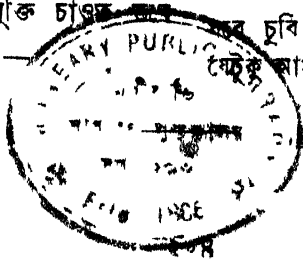
বীর সন্ন্যাসী উন্নত শির
ঝঞ্ঝাবাদলে দাঁড়াইয়া থির

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার,
অকূল হতে এসো গো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধো গো পারাবার,
লক্ষ যুগ পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

৮ম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩২৯ | ৪র্থ সংখ্যা

শরৎ দুর্য্যোগ

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

রাক্ষসী মাগো ছিন্নমস্তা
কেন এসেছিলি বঙ্গে?
তাণ্ডব নাচ তাথিয়া তাথিয়া
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
নেচে গেলি তুই দয়া কি হল না
শ্মশানে নৃত্য একি এ ছলনা?
প্রলয়োল্লাসে আগমনী তোর
বিজয়া মৃত্যু-রঙ্গে।

দুর্গতিহরা দুর্গা মা তুই
দুর্গমে তোর আস্তি
অসহায় বুকে যুগে যুগে মাগো
জাগায়ে এসেছ স্বস্তি।
বিস্তারি তব দশ প্রহরণ
এনেছ অভয় শঙ্কাহরণ,
পদতলে দলি' হীন দম্ভোলী
দৈত্য দানব দলিত'।

দুঃখ-সাগর-ক্ষুব্ধ হৃদয়
মন্থনে মহালক্ষ্মী
উঠিবেন এই আশা নিয়ে ছিল
প্রত্যাশী শত অক্ষি ;
ঐশ্বর্য্যের লুট হবে বলে
নর নারী সব এল দলে দলে,
সহসা ঘনাল দুর্য্যোগ রাত
দেখিল উর্দ্ধে লক্ষি'—

শরৎ আকাশে ঘনাইয়া আসে
কালবৈশাখী তূণ
ভীম গর্জ্জন বজ্র আঘাতে
করে বুঝি সব চূর্ণ,
বিদ্যুৎ-অসি চলে চিরে চিরে
মেঘের বক্ষ, প্রলয় তিমিরে
জীর্ণ কুটীর অঙ্গন তল
বর্ষার জলে পূর্ণ।

ঈশান কোণের ঝঞ্ঝা আজিকে
মত্ত পাগল হন্যা
পিঙ্গল জটা এলাইয়া ছোটে
পশ্চাতে ধায় বন্যা।—
কূল ভেঙ্গে পড়ে মাঝ দরিয়ায়
তীর সম স্রোত ছুটে ভেসে যায় ;
পথে দাঁড়াইয়া গৃহহীন বধূ
কাঁদিছে পুত্র কন্যা।

বন্যার জল থৈ থৈ করে
যতদূর চলে দৃষ্টি,
এতটুকু নাই দাঁড়াবার ঠাঁই
মাথায় প্রলয় বৃষ্টি।

গরজে মত্ত মরণ-সিন্ধু
পলকে গ্রাসিছে জীবন বিন্দু
তব আগমনে আনন্দময়ী
হল একি অনাসৃষ্টি !

বিজ্ঞানময়ী বাণী সাথে ছিল
লাগে তাই মনে সন্ধ,
আজিকে মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তবু আঁধারের ধন্ধ ?
সে কি তবে মিছে মাটির পুতুল
জীবন ভরিয়া দিয়ে গেল ভুল
অর্চ্চনা-ধূপ দহনের সাথে
নিয়ে গেল মধু গন্ধ ?

গণপতি জনগণের দেবতা
গণপালকের গর্ব্ব
একক দণ্ড আঘাতের ঘায
যদি হয়ে গেল খর্ব্ব,
নিপীড়িত যারা নিগ্রহ গ্লানি
সহিযা এসেছে জুড়ি দুই পাণি,
বুকের রক্ত বিনিময়ে তারা
লভিবে মরণ-পর্ব্ব ?

কুমারের হাতে শর কার্ম্মুক
সে কি বাসরের সজ্জা ?
হীনবলী আজ দলিছে সত্য
একি দেবতার লজ্জা !
মিথ্যা আজিকে মেলিয়াছে ডানা
অন্যায় বুকে দিয়েছেরে হানা,
নিষ্ঠুর নখ দন্ত মেলিয়া
শুষিছে অস্থি মজ্জা !

সিংহবাহিনী, সিংহ যে আজ
শক্তির মদে ক্ষিপ্ত,
রক্ত নয়ন তল যে গো তার
হিংসার রোষে দীপ্ত;

কেমন কলায়ে দাঁড়াইল পথে
নাহিকি শক্তি বর্শা'র মুখে ?
শত্রু নাশিতে সন্তান দেহ
করিলে রুধির লিপ্ত ?

অসুর যদি মা শূর বিক্রমে
তোমারও শক্তি লঙ্ঘে,
শক্তিময়ীর পূজা আরাধনা
কেন তবে এই বঙ্গে ?

এযে পাপাচার মিথ্যা ছলনা
শক্তিময়ীর পূজা ক'ত ছলনা,
পুতুলে করেছে পুতুলের পূজা
লেপি রং মাটি অঙ্গে।

ভারতের সাধনা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

এসিয়ার বাণী।

জাপানী ভাবুক ওকাকুরার কথায় বলিঃ—"এসিয়ার গুপ্তগর্ব, প্রত্যেক হৃদয়ে যে শান্তির স্পন্দন হচ্ছে, সেই স্পন্দনে, সেই প্রাণ বায়ুতে। এসিয়ার গৌরব সেই সাম্যের মহিমাময় একতায় যার জন্য সম্রাট ও কৃষক একপ্রাণ। এসিয়ার বিমল অহঙ্কার সেই সুমহান্ একত্ব বিশ্বাসে, প্রেম ও বিশ্বজনীন সাচ্ছন্দ্য যার ফল, যার ফলে জাপান সম্রাট তাকাকুরা তুষার শীতল রজনী অনাবৃত বস্ত্রে যাপন করতেন, কেন না তাঁর দরিদ্র প্রজা শীতে জড়ীভূত, অথবা তাই তিনি আহার পরিত্যাগ করেছিলেন কেন না প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে পীড়িত। বিশ্বের শেষ পরমাণু পর্য্যন্ত যতক্ষণ আনন্দের রাজ্যে যেতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ লাভ করতে না দিয়ে যে ত্যাগের স্বপ্ন বোধিসত্বকে বিচিত্র করে

তুলেছে তাতেই সেই গৌরব। যে স্বাধীনতা কালিমাময়ী মূর্ত্তি অছ্যে 'ক্ষুব্ধ প্রস্তামণ্ডলা' করে তোলে, ভারতীয় রাজাকে যোগীর ন্যায় বেশভূষার কঠোরত শিখিয়ে দেয়, চীনদেশে এমন রাজ-সিংহাসন গ'ড়ে তোলে যার অধিপতিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিপতিকে, কখন শুংবারি ব্যবহার করতে হয় না, সেই স্বাধীনতার উপাসনাতেই ত এসিয়ার গৌরব।

"এই সবই হচ্ছে এসিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্যকলার গুপ্ত আত্মশক্তি। প্রাক্তন সংস্কার থেকে বিচ্যুত হ'য়ে, ভারতবর্ষ আজ জাতীয়তার সারভূত ধর্মজীবন বিসর্জন করলে যা নীচ বা মিথ্যা ও যা নতুন তারই উপাসক হ'য়ে পড়বে। চীন, নৈতিক সভ্যতার বদলে নাকক সভ্যতার মত্ত হ'য়ে উঠে' প্রাচীন আত্মসম্মান ও নীতিকে বিসর্জন দেবে—যে নীতি অনেক কাল আগেই দেশীয় বণিকদের মুখের কথাকেই পশ্চিমের লিখিত দলিলের মত প্রামাণ্য ক'রে তুলেছিল এবং কৃষি ও সম্পদকে একার্থবোধক শব্দের মত ক'রে দিয়েছিল।

"চিরদিন অন্তর্মুখী হওয়াটাই জীবন। কত ভগবদ্ভক্তই না এ সত্যের প্রতিধ্বনি করেছেন। Delphic oracles এর সব চাইতে বড় কথা 'নিজেকেই জান'; 'তোমাতেই সব' এই হচ্ছে কনফুসিয়সের শান্তির বাণী, 'আত্মানং বিদ্ধি,' 'তত্ত্বমসি' এই একই সত্যের আহ্বান নিয়ে ভারতে যে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, তা আরও প্রাণস্পর্শী।

"ইউরোপ আজ বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির বলে তোলপাড় হ'য়ে রয়েছে। ......সেই বাষ্পীয় যন্ত্রের তাণ্ডব আনন্দ এসিয়া এখনও জানে না; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকের ভিতর দিয়ে প্রকৃত ভ্রমণের নিগূঢ় সার পদার্থটিকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে, যিনি গ্রাম্য গৃহস্থীগণের নিকটে ভিক্ষা ক'রে, অথবা সন্ধ্যাসমাগমে গাছের তলে ব'সে স্থানীয় যুবকদলের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রকৃত ভ্রমণকারী।

..এই রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিণত ও আবদ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে, শান্ত বীর্য্যবান মানবতার ভাব ও চিন্তাকে একতানে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। প্রাচ্যে এই রকম আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই মনুষ্যের পরস্পর সংশ্রবের অভিব্যক্তি; মুদ্রিত পুস্তকই এখানে সভ্যতার চিহ্ন নয়।

"আমরা স্বভাবতই জানি যে, আমাদের ভবিষ্যতের পথের খোঁজ আমাদের ইতিহাসেই আছে এবং আমরা অন্ধের মত সেটাকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি ভাব সত্য হয়, যদি অতীতেই নবজীবনের অমৃতউৎস লুকানো থাকে, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই মুহূর্ত্তে একটা মহান্ নবশক্তির প্রেরণার বিশেষ দরকার, কেন না বর্ত্তমানের নীচতার ও ক্ষুদ্রতার জ্বালা জীবন ও সৌন্দর্য্যকে শুষ্ককণ্ঠ করে ফেলেছে।

"সৌদামিনীর যে প্রভাময় তরবারি খানা আজ অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে তারই অপেক্ষায় বসে আছি। এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভাঙ্তে হবে নববলের বারি সম্পাতে ধরণীর শুষ্ক হৃদয় সরস হয়ে উঠবে তবেই তো তার হৃদয় নবীন কুসুমের পেলব কান্তিতে শোভাময় হ'তে পারবে। কিন্তু সত্যের মহান্ আহ্বান শুনতে পাওয়া যাবে এখান থেকেই, জাতীয়তার প্রাচীন রাজপথে চলেই।

"চাই ভিতর হতে জয়, অথবা বাহির থেকে এক মহান্ মৃত্যু।"

প্রাচ্য ও প্রতীচীর সাধন ধারা (Culture)

সভ্যতার সকল অঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রাচী ও প্রতীচীর বিভিন্নমুখী সাধন-ধারা ব'য়ে চলেছে। প্রাচ্য সাধনার মূলমন্ত্র সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য। অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধ এক সত্যের বিভিন্ন বিকাশরূপে সমস্ত সৃষ্টিকে দেখাই তার পদ্ধতি। ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা সব তাতেই সে অখণ্ড অরূপকে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটা নিরবয়ব অনন্তের সমাগমে পৌঁছে দিয়েছে।

ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আর্টের ভিতর ইউরোপের বিশ্লেষাত্মক সাধন (analytic culture) ফুটে উঠেছে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে একত্বধারা রয়েছে প্রতীচ্য মন ক্রমে তা ধরতে পেরেছে। এইরূপ ক্রমশ ব্যাপক একত্বের উপলব্ধির পথে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ছুটেছে। কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ ছাড়িয়ে অন্তর্জগতের রহস্য সন্ধানে সে এখনও তেমন অগ্রসর হ'তে পারেনি।

প্রাচীন গ্রীস যেমন ইউরোপীয় সভ্যতার জননী, ভারত তেমন এসিয়ার সভ্যতার মাতৃরূপিনী। এই দুই দেশের সভ্যতার ধারা তুলনা করলেই আমাদের কথিত সত্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। গ্রীসের সাহিত্য, কলাবিদ্যায় আদর্শবাদ আছে, কিন্তু সে বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের সাহিত্যকলায় যেটুকু বাস্তববাদ আছে, তাহা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের মিলনাত্মক সাধন (synthetic culture) তার জাতীয় জীবনেও প্রতিভাত হয়েছে। কতরকম আদর্শের সমাগমে ভারতের চিন্তাধারা ভরে উঠেছে। কত জাতি কত সভ্যতা ভারতে যুগ যুগ ধরে এসেছে—ভারত স্নেহময়ী জননীর মত সকলকে বুকে টেনে নিয়েছে তাদের একটিও বিনষ্ট হয় নি পরের দেওয়া আঘাতের শোণিতপাত ভারতের হৃদয়ে ফুল হয়েই ফুটে উঠেছে—অপরকে ব্যথা দিয়ে নিজের সুখসাধন কোনও দিন ভারতের লক্ষ্য হয় নি। এই সাধনার প্রভাব তার কুটীরে কুটীরে প্রবেশ করেছে এবং সমগ্র জাতির জীবনকে দুঃখময় সংসারে এক করুণ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার করে রেখেছে।"

লক্ষ্মী পূজা

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

কোজাগরের রাত্রে আজি করব মোরা তোমায় পূজা
তোমার পূজা করব মোরা হে জননী রত্নভূজা!
রত্ন দিয়ে করব পূজা, করব পূজা যত্নভরে,
প্রাণের রঙে রাঙিয়ে ফুলে ধরব দুটি পায়ের পরে।
সাগর সেঁচা ধনের দেবী, এইটি শুধু চাইছি বর,
সেইটি আজি দিতেই হবে মানব নাকো কোন ওজর।
হীরের ঝোরা জ্যোৎস্না আজি ঝরছে পাগলঝোরার মত,
অম্‌নি করে দিতে হবে ভাঁড়ার ভরি রত্ন যত।
অভাব মোদের মুছ্‌তে হবে—মুছ্‌তে হবে মনের ব্যথা,
শুন্‌ব নাকো কোনও মানা—মান্‌ব নাকো কোনও কথা।

রূপের সাগর রাত্রে আজি তোমার পূজা করব মোরা,
তোমার পূজা করব মোরা হে জননী, জগৎ জোড়া।
শ্রদ্ধা দিয়ে করব পূজা, করব পূজা অশ্রুজলে,
বক্ষ চেরা রক্ত আনি ঢালব দুটী পায়ের তলে।
ধনের দেবী ধানের দেবী একটি বর চাইছি আজি,
সেইটি মোদের দিতেই হবে—দিতেই হবে স্বর্গ রাজি।
সোনার পারা ধানের শিচায় মাঠ্‌টা ভরে দিতেই হবে,
উপবাসী একটি লোকও রয়না যেন তোমার ভবে।
নিজের ক্ষুধার খোঁজটি নিয়ে পরের ক্ষুধা খুঁজ্‌তে পারি,
এম্‌নি ধারায় ধান দিও মা বরটা আজি চাইছি তারি।

তোমার পূজা করব আজি—শরতের এই পূর্ণিমা,
পূজা তোমার করব মোরা অয়ি জগদ্ধাত্রী মা।
ভক্তি দিয়ে করব পূজা—করব পূজা হৃদয় দিয়ে,
পরাণ দিয়ে করব পূজা হৃদয় হ'তে চুঁইয়ে নিয়ে।

ধানের দেবী প্রাণের দেবী একটি বর আজকে চাই,
একটি বর দিতেই হবে—না দিলে মা রেয়াৎ নাই।
রত্ন দিলেও মানব নাকো, শুধু ধানেও মান্‌বনা
সোনার সাথে হৃদয়টাকেও করে দিতে হবেই সোনা।
ধানের সাথে দরাজ করে দিতে হবে হৃদয় খানি,
এমনি করে দিতে হবে হীরায় ধূলায় ভেদ না মানি।

কর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

ক্রিয়া স্পন্দনাত্মিকা। স্পন্দনই ক্রিয়া। ক্রিয়ার মূল-প্রকৃতি। প্রকৃতি সম। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতর স্পন্দন হইতেই ক্রিয়ার বিকাশ। ক্রিয়া, শক্তি, মায়া, লীলা প্রভৃতি একই পদার্থ। শক্তিই ক্রিয়া। পরিস্পন্দন বলিতে, শক্তি বলিতে কি বুঝি? বাস্তবিক শক্তিকে নির্দ্দেশ করা চলে না। ইহা অনির্ব্বচনীয়া। একমাত্র কার্য্য দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে। শক্তি অতীব সূক্ষ্ম। এবং সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি হয় না। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিনা-ভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধে"। শক্তি বস্তুর অভাব নহে। অভাব বলিয়াই যে ইহার প্রত্যক্ষ হয় না, এমন নহে। পরন্তু সূক্ষ্ম বলিয়াই উপলব্ধি হয় না। কারণ, কার্য্য দ্বারাই ইহার অনুমান সিদ্ধ হয়—ক্রিয়া বা শক্তির অভিব্যক্তি আমাদের গোচরীভূত হয়। শক্তিকে অনুমানে বুঝিতে হয়। কার্য্য হইতেই কারণের জ্ঞান হয়। "কার্য্যাৎ কারণমাত্রং গম্যতে।" শক্তি অনাদি, ব্যাপক, ক্রিয়াবিহীন, এক, অলিঙ্গ, অনবয়ব, কিন্তু কার্য্যরূপে পরিণত হইলেই, অনিত্য, অব্যাপক, পরিস্পন্দন-ক্রিয়া-যুক্ত, অনেক, শক্তির অনুমাপক, সংযোগবিশিষ্ট ও পরাধীন, অর্থাৎ পরিণামের জন্য শক্তির সাহায্য অপেক্ষা করে। শক্তির আদি খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, আদি খুঁজিতে গেলে আদির আদি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। এরূপ অনবচ্ছিন্ন ধারা চলিতে থাকিবে। শক্তি অতএব অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সকল কার্য্যতেই শক্তি আছে। অতএব শক্তি ব্যাপক, শক্তি কারণ, কারণ দ্বারাই কার্য্য পরিব্যাপ্ত হয়; কিন্তু কার্য্য দ্বারা কারণ ব্যাপ্ত হয় না। যেমন ঘটটি মৃত্তিকা ব্যাপ্ত, মৃত্তিকা ঘট ব্যাপ্ত নহে। কেবল কারণ অবস্থায় কার্য্য অবর্ত্তমান। শক্তি নিষ্ক্রিয়, শক্তির পরিণাম আছে, কিন্তু পরিস্পন্দন নাই। পরমাণুতে [monad বা atom]—কি সূক্ষ্মাণুতে বা বিদ্যুৎকণার (electron) পরিস্পন্দন আছে। কিন্তু সূক্ষ্মাণুর বৈদ্যুতিক শক্তি যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়,

তাহা পরিস্পন্দনশীল বলা যায় কি না সন্দেহ। শক্তি বহু হইতে পারে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের Conservation of Energy [শক্তির সংরক্ষণ, অবিনশ্বরত্ব] দ্বারাই একত্ব প্রতিপাদিত হয়। পরিস্পন্দন নাই বলিয়াই শক্তি এক, পরিস্পন্দন থাকিলেই বহু। কিন্তু শক্তির একত্ব সম্বন্ধে একটু বলিবার আছে। এক অর্থে অনাশ্রিত ইহা বুঝাইতে পারে। কিন্তু শক্তিকে আমরা অনাশ্রিত বলিতে পারি না। কারণ শক্তি শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়া থাকে শক্তি ভগবানের। শক্তিকে এক বলিলে শক্তি স্বতন্ত্রা হয়। বাস্তবিক শক্তি স্বতন্ত্রা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিতেছেন—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং"। মায়াকেই প্রকৃতি ও মহেশ্বরকে মায়ী বা মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। ভগবান্‌ও গীতায় বলিতেছেন "মম মায়া," "প্রকৃতিং স্বাং" "ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। শক্তি জড়। চৈতন্যের আশ্রয় না হইলে জড়ের প্রকাশ হইতে পারে না। শক্তির জ্ঞানাংশ চিতের বা ঈশ্বরের। চৈতন্যের আভাসেই শক্তির প্রকাশ। 'অহংই' "অহং মা ইদং" এর প্রকাশ করে। সম্বন্ধের প্রকাশও করে অহং। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রা ও অনাশ্রিতা বলিয়াছে। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। কারণ প্রকৃতি জড়। পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি তাহার নাই। "Intelligent first causes" কখনই জড় বস্তু হইতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" পঞ্চম সূত্র, "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" ষষ্ঠ সূত্র, "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" সপ্তম, "হেয়ত্বাবচনাচ্চ" অষ্টম, "স্বাপ্যয়াৎ" নবম, "গতিসামান্যাৎ" দশম, "শ্রুতত্বাচ্চ" একাদশ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য। এই সকল সূত্র প্রধান-কারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২য় পাদে প্রথম সূত্র হইতে [রচনানুপপত্তেশ্চনানুমানম] দশম সূত্র [বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্] দ্বারাও প্রধান-কারণ-বাদ নিরাকৃত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে প্রপঞ্চিত করিলাম না। যাহা হউক, প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলেই শক্তি। শক্তির আশ্রয় ভগবান্—চৈতন্য স্বরূপ সাংখ্য-দর্শনে যে শক্তির সাম্যাবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার বিক্ষোভের কারণ কে? সাম্যাবস্থা হইতে বিষম অবস্থায় আসিবার জন্য বিক্ষোভ আবশ্যক। শক্তির পরিণাম হয়, ইহা স্বীকার করাতেই ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতি-সত্ত্বরজস্তমঃ গুণময়ী। সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রকাশ। প্রকৃতি সত্ত্বের প্রকাশ-ধর্ম্মে পর্য্যালোচনা করিতে পারে, ইহা বলা চলে না। কারণ সাম্যাবস্থায় সত্ত্বরজস্তমঃ লয় পাইয়াছে। অতএব ঈশ্বরাধিষ্ঠিত শক্তিই কর্ম্মের মূল। প্রত্যেক কর্ম্মের মূলে প্রকাশ ও চেষ্টা। প্রকাশ ঈশ্বরের, চেষ্টা শক্তির। কার্য্য ও কারণের অভেদত্ব লইয়াই ক্রিয়াকে শক্তি বলা হইয়াছে। শক্তি অন্তরে, ক্রিয়া বাহিরে। শক্তি উৎস, ক্রিয়া ধারা। শক্তি প্রচ্ছন্ন বা গূঢ়, ক্রিয়া অভিব্যক্ত। তিলে তৈলের মত, দধিতে ঘৃতের মত, সকল কর্ম্মের অন্তরে শক্তি নিহিত। শক্তির উদ্বোধনই কর্ম্মের তাৎপর্য্য।

নৈয়ায়িক কর্ম্মকে একটি পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং ইত্যাদি" [বৈশেষিক দর্শন ১ম অঃ ১ম আঃ ৪র্থ সূত্র] এবং কর্ম্ম বলিতে উৎক্ষেপণ প্রভৃতিকে কর্ম্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, "উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি

কর্ম্মাণি" [বৈশেষিক দর্শন ১ম অধ্যায় ১ম আঃ ৭ম সূঃ]। বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "গমনগ্রহণাদ্ ভ্রমণরেচনস্যন্দনোর্দ্ধ্বজ্বলন তির্য্যকপতননমনোন্নমনাদয়ো গমনবিশেষা এব নতু জাত্যন্তরাণি"। "গমন" গ্রহণ করাতেই ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধে প্রজ্জ্বলিত হওয়া, তির্য্যক্ দিকে পতন, নমন, উন্নমন প্রভৃতি সকলই গমন বিশেষ মাত্র। অন্য জাতীয় নহে। কর্ম্ম পাঁচ প্রকার। কর্ম্মের প্রকার ভেদ মাত্র বলা হইল। কিন্তু এই পাঁচপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচেষ্টা মাত্র, শক্তির বহির্বিকাশ মাত্র। উর্দ্ধে ক্ষেপণ কি নিম্নে ক্ষেপণ সর্ব্বত্রই শক্তির বিকাশ। অতএব কর্ম্মে শক্তির বিকাশ মাত্র।

শক্তি এক, কিন্তু কর্ম্ম বহু। এ বহুত্বের মূলে কি? শক্তি সত্ত্ব রজস্তমো গুণময়ী। কর্ম্মও তাই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কর্ম্মগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই—কোনও কর্ম্ম অতীব জড়ভাবাপন্ন, কোনও কর্ম্ম চঞ্চল, আর কোনও কর্ম্ম প্রকাশশীল। কোনও কর্ম্মে চিত্তের প্রসন্নতা, কোনও কর্ম্মে চিত্তের চাঞ্চল্য, আর কোনও কর্ম্মে চিত্তের জাড্য পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিলে কর্ম্ম চিত্তের বৃত্তি। পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তের বৃত্তিকে পাঁচ প্রকার বলা হইয়াছে। "বৃত্তয়ঃ—পঞ্চতর্য্যঃ।" সেই পাঁচ প্রকার বৃত্তি—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পাঁচ প্রকার বৃত্তিই কর্ম্ম। এই পাঁচ প্রকার আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকার। ক্লিষ্ট বৃত্তি ক্লেশের কারণ, কর্ম্মাশয় বৃদ্ধির ক্ষেত্র। আর অক্লিষ্ট বৃত্তি প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক উৎপাদনকারিণী ও গুণাধিকারের বিরোধিনী। ব্যাসদেব ভাষ্যে লিখিয়াছেন "ক্লেশহেতুকঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়-ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ। খ্যাতিবিষয়াগুণাধিকার-বিরোধিন্যোহক্লিষ্টাঃ। কতগুলি বৃত্তি বা কর্ম্ম ক্লেশের সৃষ্টি করে ও ভবিষ্যৎ জন্মাদির মূলীভূত কারণ হয়। কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ না করিতে পারিলেই, কর্ম্মের অনন্ত প্রবাহ রুদ্ধ হয়না। কর্ম্ম কেবল বন্ধনের হেতুই হয়। ইচ্ছার স্বভাবই এই যে ইন্ধন পাইলেই বাড়িতে থাকে, তৃপ্তি নাই, অবিশ্রান্ত অবিরত চলিতে থাকিবে। শক্তি কর্ম্মের ভিতরে তিন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। এক জ্ঞানে না বোধে, দ্বিতীয় ইচ্ছায় এবং তৃতীয় ভাবে এই তিন মিলিয়াই কর্ম্ম। এক অন্তঃকরণই বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি বুদ্ধিতে, ইচ্ছাবৃত্তি মনে, ও ভাব বৃত্তি চিত্তে প্রকটিত। এই তিনের উপরেই কর্ম্মের ভিত্তি। জ্ঞানবৃত্তির কর্ম্ম--বিচার, অধ্যবসায়। উহা নিশ্চয়াত্মিকা। ইচ্ছাবৃত্তি—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। আর ভাববৃত্তি—অনুসন্ধানাত্মিকা, ইচ্ছাবৃত্তির কর্ম্ম ঐন্দ্রিয়িক সুখে নিহিত। স্বর্গাদিসুখহ তাহার লক্ষ্য। অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির কর্ম্ম—উপাসনায় অভিব্যক্ত। উৎকৃষ্ট গতিলাভেই ইহার পরিসমাপ্তি। অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিতে স্বরূপ খুঁজিবার একটু চেষ্টা থাকে। তাই স্বর্গের ঐন্দ্রিয়িক সুখে তাহার তৃপ্তি হয় না। তাহা হইতে মহত্তর ও চিরস্থায়ী কিছু পাইবার আকাঙ্খা স্বভাবতঃই হয়। আর বিচারের কর্ম্ম—অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তির কর্ম্ম—স্বরূপ উপলব্ধিতে পর্য্যবসিত। ইহাই অক্লিষ্ট বৃত্তি। গুণাধিকার অতিক্রম করিবার জন্য—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ম্মই বিচারের বা বুদ্ধির কর্ম্ম। প্রমাণ বিপর্য্যয় (মিথ্যা জ্ঞান) প্রভৃতি ক্লিষ্ট বৃত্তি। ইহার বিপরীতই

অক্লিষ্ট বৃত্তি। প্রমাণের ফল প্রমা—বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলেই জ্ঞানোদয় হয় ইহাই প্রমা। অসন্দিগ্ধ, অবিপর্য্যস্ত জ্ঞানই প্রমা। ভ্রমপ্রমাদরহিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। বিকল্পরহিত জ্ঞান প্রমা। বিকল্পে বস্তু নাই। কিন্তু শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যে ব্যবহার হয়। ইহাই Ens imaginarium বা Empty intuition without object (Kant)। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধি পাদ ৯ম সূত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ। ইহাতে কোনওরূপ কোনও প্রকারে ব্যপদেশ সম্ভব নাই। কিন্তু ব্যবহারে চৈত্রের গরু, আমার বাড়ী প্রভৃতি সকল ব্যপদেশ চলিতেছে। বস্তু নাই, ব্যবহার চলিতেছে। শব্দের শক্তি বলে একটা বোধ উৎপন্ন হইতেছে। নিদ্রাও চিত্তের বৃত্তি। নিদ্রায় জ্ঞান লোপ হয়। কিন্তু প্রত্যয় থাকে। কারণ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে পারে। অনুভূতি না থাকিলে স্মরণ হয় না। অনুভূতি থাকিলেই প্রত্যয় আছে। অতএব সকল বৃত্তির অভাব নিদ্রা নহে। নৈয়ায়িক সকল বৃত্তির অভাবকেই নিদ্রা বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা সমীচীন নহে। প্রত্যয় থাকাতে সকল বৃত্তির অভাব হইতে পারে না। নিদ্রার পরে জাগরিত অবস্থায় তিন প্রকারের অবস্থার স্মরণ হয়। 'সুখে ঘুমাইয়াছি, আমার মন প্রসন্ন, বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সাত্ত্বিক বৃত্তি।' 'দুঃখে ঘুমাইয়াছি, মন অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া ঘুরিতেছে।' ইহা রাজসিক বৃত্তি। গাঢ় মূঢ় ভাবে ঘুমাইয়াছি, সমস্ত শরীর ভার বোধ হইতেছে, চিত্ত ক্লান্ত হইয়াছে, অলস হইয়া পড়িয়াছি, নিজের যেন বল নাই, কেহ যেন আমাকে অপহরণ করিয়া নিয়াছে।" ইহা তামসিক বৃত্তি। সকল কর্ম্মই এই তিন গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কর্ম্ম করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা হয়, আনন্দ লাভ হয়, বুদ্ধির নির্ম্মলতা সম্পাদিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম। যে কর্ম্মে দুঃখ আছে, অবসন্নতা আছে, মনের চাঞ্চল্য হয়, কর্ম্মের অমানুষিক পিপাসা কিছুতেই মিটে না, তাহা রাজসিক কর্ম্ম। যে কর্ম্মে মূঢ়তা আসে, ক্লান্তি হয়, শরীর মন অলস হইয়া পড়ে, উৎসাহ থাকে না, চিত্তের ক্লান্তি যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা তামসিক কর্ম্ম। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজস্তমো গুণময়ী। চিত্ত-প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত। চিত্তও ত্রিগুণ-ময়। চিত্তের বৃত্তিই কর্ম্ম। অতএব, বৃত্তি বা কর্ম্ম ত্রিগুণান্বিত। শক্তি এক হইলেও ক্রিয়া বিভিন্নতার কারণ ত্রিগুণ। স্মৃতিও একটি বৃত্তি। সকল বৃত্তির স্মরণ স্মৃতিতে হয়। প্রমাণ, মিথ্যা জ্ঞান, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মরণ প্রভৃতির স্মৃতি হয়। অনুভূত বিষয়ের অচৌর্য্যই স্মৃতি। পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা চুরি না হইলে অর্থাৎ ভুলিয়া না গেলে, চিত্তের যে বৃত্তি প্রবাহ, তাহাই স্মৃতি। সকল বৃত্তিগুলি সুখ দুঃখ মোহাত্মক। সুখ, দুঃখ, মোহই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই সকল বৃত্তির রোধেই সমাধি। কর্ম্মের নিরোধই জ্ঞান। জ্ঞানে মুক্তি। কর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলনে পাইলাম, কর্ম্মের লক্ষ্য জ্ঞান। পাতঞ্জলের ভাষ্যকার ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "সর্ব্বাবৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ; আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি"। সকল বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে। ইহাদের নিরোধে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে। সমাধির ফল কৈবল্য বা মুক্তি। বৃত্তির বা কর্ম্মের

পরিসমাপ্তি জ্ঞানে বা মুক্তিতে। "সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। কর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। যাহার সহিত মিত্রতা করিতে হয়, তাহার স্বরূপ ও স্বভাব জানা একান্ত আবশ্যক। যাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ ও স্বভাব না জানিলে প্রকৃতরূপে গ্রহণ হইতে পারে না। "তাকে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি," আর বাঁশী "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" এবং তাহাতেই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি ইহাতেও বাঁশী শোনা আছে, মর্ম্মে—অন্তরে ঝঙ্কার দেওয়া আছে। বোধের অবসর আছে। আঘাতের প্রতিঘাত আছে। একটা অব্যক্ত স্ফুরণ আছে। তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। জ্ঞানের ভিতর দিয়াই তাহাকে ভালবাসি। প্রকাশে বা বুদ্ধিতেই চিত্তের (emotion, feeling) অবস্থিতি, বুদ্ধিই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে, বুদ্ধিই মনের উপাদান। আর নৈয়ায়িকের ভাষায় সমবায়িকারণ বুদ্ধিই সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টিতে তৈজস। কর্ম্ম, মিত্র কি শত্রু তাহা বিবেচনা করিবার দরকার নাই। শত্রু হইলেও তাহার অবস্থান, শক্তি, বল, অর্থাৎ স্বরূপ ও স্বভাব—(অবস্থানই স্বরূপ এবং শক্তি বলই স্বভাব)—জানা একান্ত আবশ্যক। শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে হইলেও তাহার অবস্থান, শক্তি প্রভৃতির পরিচয় লইতে হয়। অবস্থান না জানিয়া শতবার আক্রমণ করিলেও আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। শক্তি না জানিয়া আক্রমণ করিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা। কর্ম্ম শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক, ইহার তত্ত্বানুশীলন একান্ত আবশ্যক। শত্রু হইলে পরাভূত করিতে হইবে। আর মিত্র হইলে সাদরে বরণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ম্ম আমাদের শত্রু নহে। কারণ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী। এখন কোন্ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী তাহাই বিবেচনার বিষয়। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কর্ম্মের মানদণ্ড নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিব)।

(ক্রমশঃ)

"তোমরা ও আমরা"

[শ্রীকালিদাস রায়]

তোমরা মোটর হাঁকায়ে চলিয়া যাও
আমরা হোঁচট খাই।
চাকার কাদার ছিটেয় সাজিয়া ভূত
আফিসের পানে ধাই।
চলি হাঁটু জলে রাস্তা খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কোঁচার কাপড় কোমরে তুলিয়া গুঁজিয়া
দেরী হলে পাছে রুজিমারা যায় বুঝিবা
চলি তাই ছুটিয়াই।

গরমের দিনে তোমাদের ঘরে ঘরে
ফ্যান্ ঘুরে ফন্ ফন্ ।
আমরা দুপুর রৌদ্রে পেটের দায়ে
ঘুরে মরি বন্ বন্ ।
শালদোশালায় তোমরা বেড়াও সাজিয়া
পরি ছেঁড়া জামা গায় তেলে মোরা ভাজিয়া
করিয়াছি ধোপা নাপিতের সাথে কাজিয়া
মিটাতে ইচ্ছা নাই ।

তোমরা পোলাও দেখায়ে দেখায়ে খাও
মোরা খাই নিম সিম ।
তোমরা মোরগ হংস ডিম্ব খাও
আমরা ঘোড়ার ডিম ।
চপকাট্‌লেট্ হোটেলে যাইয়া ঠাসিয়া
থিয়েটারে যাও পেটের গেঞ্জি ফাঁসিয়া
আমরা যেন গো বানে আসিযাছি ভাসিয়া
খালিপেটে তুলি হাঁই ।

দুগ্ধফেন গদিতে তোমরা ডাকাও নাক
সিংহ নিনাদ ছাড়ি ।
আমরা কুঁড়েয় অথবা আস্তাকুড়ে
সারারাত মশা মারি ।
তোমরা বিশাল তোমরা সবাই হস্তী
আমরা ফড়িং দেহে প্রাণটুকু অস্তি
তোমাদের সাথে কেমনে হইবে দোস্তী
আচ্ছা বলত ভাই ।

(২)

ফাঁকিজুকী দিয়ে আমরা করেছি টাকা
তার ভাগ বুঝি চাও ?
দুপুর বেলায় একটু ঘুমুই তাই
হিংসেয় মরে যাও ।

চপকাট্‌লেট্‌ কোপ্তা কাবাব খাই
হজমের ঠেলা আমরাই সামলাই
পেট ছেড়ে দিবে করিবে যে আইটাই
একদিন যদি খাও।

জান না ত চাঁদ গালে ক্ষুর ঘসে নিতি
কামান'র কত ঠেলা।
সাবান ঘসিতে জান না ত গায়ে জোর
লাগে কত দুই বেলা!
হিংসেয় মর আমরা বোতল টানি
খাও দেখি চাঁদ আমাদের লালপানি
ভারি ত মরদ থাক্‌ থাক্‌ জানি জানি
হও কেন পিছপাও।

ফ্যাসান মাফিক পোষাক করিতে হয়
পেটেখুটে সাবধানে
গলদঘর্ম্ম হতে হয় কত বয়ে
ধোপার গাধাই জানে।
সাহেবসুবোর সাথে উঠা বসা চলা
বাংলা নয় গো!—ইংরাজি কথা বলা,
কতঠেলা জানো মাঝে মাঝে কাণ মলা
চুপ কোরে সই তাও।

সোজা নয় চাঁদ ভাল খাওয়া ভাল পরা
মটর গাড়িতে চড়া
দেনার খবর যদি শোন তবে হবে
চোখদুটা ছানাবড়া;
ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ ত দেখনি তার
দোকানের বিল দেখ যদি একবার
হয়ে যাবে তবে আধ হাত জিভ বার
বকায়োনা নাও নাও।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রলোভন

প্রথমেই ফিতা দিয়া বাঁধা কতকগুলি চিঠি মার্সির চোখে পড়িল। সেগুলি বহু কালের পত্র। কর্ণেল রোজবেরী যখন যুদ্ধ কার্য্যে বিদেশে ছিলেন তখন তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল এ গুলি সেই পত্র। মার্সি সে গুলিকে বাঁধিয়া অন্যান্য কাগজ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সে দেখিল কতকগুলি কাগজ পিন দিয়া গাঁথা। স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে তাহাদের উপর লেখা আছে—"রোমের দৈনিক বিবরণ"। মার্সি বুঝিল গ্রেস্ ইহার লেখিকা। সে উহাতে তাহার পিতার জীবনের শেষ কয়দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

এ গুলি ছাড়া আর এক খানি কাগজ টেবিলে ছিল সেটী একখানি চিঠি। খাম খোলা ঠিকানা লেখা আছে—"মাননীয়া জ্যানেট্ রয়্; মেবল্‌থরপ্ হাউস্, কেন্‌সিঙটন, লণ্ডন।" মার্সি খাম হইতে চিঠি বাহির করিল। চিঠি প্রথম কএক ছত্র পড়িয়াই সে বুঝিল এখানি কর্ণেল তাঁহার কন্যা গ্রেসকে ইংল্যাণ্ডের সেই ভদ্র মহিলার নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন।

মার্সি চিঠি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। ইহাতে কর্ণেল নিজ কন্যার গুণাবলীর কথা লিখিয়াছেন—কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে অর্থাভাব প্রযুক্ত তিনি কন্যাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারেন নাই। এই অর্থাভাব বশতঃই তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে কানাডায় দুঃস্থ পরিবারের ন্যায় বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আপনার জন্যই আমি কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিতে মরিতে পারিতেছি। পৃথিবীতে আমার একমাত্র রত্ন এই কন্যাটির ভার আপনার উপর দিয়া যাইতেছি। সমস্ত জীবন ধরিয়া আপনার অর্থ ও প্রভুত্ব আপনি দীন দুঃখীদের অভাব মোচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে একটি বৃদ্ধ সৈনিকের নিরাশ্রয় কন্যাকে আপনার স্নেহের আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তিম মুহূর্ত্তকে যে শান্তিময় করিলেন—ইহাও আপনার দয়ার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রূপে জগতে ঘোষিত হইবে। আপনি গৃহহীনকে গৃহ দিলেন, নিরাশ্রয়কে স্নেহের ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

মার্সি বিষণ্ণ হৃদয়ে পত্র খানি রাখিয়া দিল। সে ভাবিল আহা! দুঃখিনী কি মহৎ আশ্রয়ই না হারাইল! এমন একটি সহৃদয় ধনবতী মহিলা তাহাকে আপনার পরিবারের মধ্যে আশ্রয় দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—আর এখানে অভাগিনী মৃত্যুর কঠোর অঙ্কে চির নিদ্রায় নিমগ্ন; আর তাহার জ্যানেটের দয়ার কোন প্রয়োজন নাই—আর তাহার কাছে জ্যানেটের গৃহের কোনই মূল্য নাই!

ক্যাপ্টেনের লিখিবার সরঞ্জাম টেবিলের উপরেই ছিল। সেই চিঠির অলিখিত অংশে গ্রেসের মৃত্যু সংবাদ লিখিবার জন্য মার্সি কলম লইল। কি ভাবে সে সংবাদ প্রকাশ করিবে ভাবিতেছে—এমন সময় আহত ব্যক্তিদিগের কাতর কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে কলম ফেলিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্র যন্ত্রণা কাতর আহত ব্যক্তিদিগের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল—মার্সির আগমনেই যেন তাহাদের যন্ত্রণা দূরিভূত হইল—তাহারা শান্ত হইল। মার্সি সকলের নিকট গিয়া সান্ত্বনা সূচক বাক্যে সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে তাহাদের বিছানার উপর মস্তক নত করিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইল—সকলকেই মধুর বাক্যে প্রীত করিল। আহত ব্যক্তিগণ বুঝি এই জন্যই তাহাকে "দুঃখহারিণী দেবী" বলিয়া ডাকিত।

চলিয়া যাইবার সময় মার্সি কিঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া বলিল—"জর্ম্মানগণ এখানে এলে আমি তোমাদের কাছেই থাকব। তোমরা কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো'না; তোমাদের শুশ্রূষাকারিণী তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

আহত ব্যক্তিরা সমস্বরে বলিল—"আপনি যদি কাছে থাকেন তবে আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এই মুহূর্ত্তে যদি শত্রুর কামান গর্জ্জিয়া উঠিত, যদি একটী গোলা আসিয়া মার্সিকে সেই দণ্ডে নিহত করিত তবে জগতে কে এমন ধার্ম্মিক আছে যে বলিত না—"যাও মার্সি অমরলোকে, স্বর্গে বিধাতা তোমার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন"? কিন্তু যদি এই যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিয়োগ না হয়—তবে পৃথিবীতে তাহার স্থান কোথায়? জীবনে তাহার আশা কি? এই বিশাল বিশ্বে তাহার আশ্রয়ভূমি কোথায়?

সে চিঠির নিকট ফিরিয়া আসিল। কিন্তু লিখিতে না বসিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে সেই চিঠির দিকে চাহিয়া রহিল।

যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চিন্তা জাগিয়া উঠিল। এই চিন্তার অপূর্ব্বতার কথা ভাবিয়া সে নিজে নিজেই একটু হাসিল। "আচ্ছা, সে যদি জ্যানেট রয়্কে বলে—"আপনি গ্রেসের পরিবর্ত্তে আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন"—তাহা হইলে কি হয়? সে তো গ্রেসের বিপদের সময় তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার সেবা করিয়াছে। একথা জানিলে জ্যানেট্ কেন তাহাকে গ্রহণ করতে অসম্মত হবেন? কিন্তু যদি সে এই কথা তাঁহাকে পত্র লিখে তাহা হইলে সেই ভদ্র মহিলা কি করিবেন? তিনি পত্র দিয়া জানাইবেন—"তুমি তোমার পরিচয় পত্র পাঠাও। আমি তাহা দেখিয়া তোমার কথা বিচার করিব।" হা! হা! পরিচয় পত্র! আমার চরিত্রের নিদর্শন!!

মার্সি স্বল্প কথায় গ্রেসের মৃত্যুর বিবরণ লিখিতে বসিল।

না, একটী ছত্রও যে সে লিখিতে পারিল না! জোর করিলেও সেই অপূর্ব্ব চিন্তা যে কিছুতেই মন হইতে দূর হইতে চায় না! "না জানি কি সুন্দর সেই মেবল্‌থরপের

বাসভবন। সেখানে কতই না সুখ ও আরামের আয়োজন। একখানি সুন্দর রঙীন ছবি তাহার কল্পনার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। হায়! মৃত্যু গ্রেসকে কি সৌভাগ্য হইতেই না বঞ্চিত করিয়াছে।

মার্সি চিঠিখানি দূরে ঠেলিয়া ফেলিল। সে অধীর ভাবে গৃহের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তাহাতেও সে দুর্ব্বার চিন্তা দমিত হয় না। একটী চিন্তাকে থামাইলে পরক্ষণেই স্রোতের মত আরও কত চিন্তা তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া তোলে। মার্সি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল যুদ্ধ শেষ হইলে তাহার আশা কি? অতীতের অভিজ্ঞতা মসীবর্ণে তাহার ভবিষ্যতের [illegible] আঁকিতে লাগিল। সে যেখানে যা'ক না কেন, যত ভাল কার্য্য করুক না কেন—তাহার পরিণাম সেই একই তাহার রূপের [illegible] প্রশংসা, তাহার পর তাহার পরিচয়ের অনুসন্ধান, অতীতের কাহিনীর আবিষ্কার, তাহার দুঃখে সমাজের দুঃখ প্রকাশ, —কিন্তু এ সকলের সেই একই মন ভুবনের কলঙ্কের অন্ধকার ছায়ায় তাহার জীবন সমাচ্ছন্ন। অন্য স্ত্রীলোকের সহিত তাহার মিশিবার উপায় নেই। ভগবানের নিকট সে ক্ষমা লাভ করিলেও মানুষের নিকট সে চির অপরাধিনী—মানুষের কাছে তাহার কলঙ্কের কোন ক্ষমা নাই।—এই তাহার ভবিষ্যতের আশা—এই তাহার ভাবী জীবনের নিখুঁৎ চিত্র!! আর এখন সবে তাহার বয়স ২২ বৎসর। আরও তাহাকে জগতে হয়ত ৫০ বৎসর বাঁচিতে হইবে!!

সে বিছানার পার্শ্বে গিয়া আর একবার সেই মৃতা নারীর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

নিয়তির কি নিদারুণ পরিহাস! কামানের গোলায় প্রাণ হারাইল সে যাহার জীবনে আশা ছিল—যাহার ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন ছিল,—আর বাঁচিল সে, যাহার অদৃষ্টাকাশ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন —যাহার জীবন পথে আলোক বিতরণ করিতে একটী ক্ষুদ্র তারার ক্ষীণ রশ্মিও দেখা যায় না!! গ্রেসকে যে কথাগুলি সে বলিয়াছিল সেই কথা গুলি তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল—"যদি তোমার মত আমার জীবনে আশা থাকিত—যদি তোমার মত সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইবার আমার কোন সম্ভাবনা থাকিত! হায়! যদি তোমার মত আমার সুনাম থাকিত!" কিন্তু গ্রেসের সকল আশা সকল সম্ভাবনা বৃথা হইল! অথচ তাহার নিজের জীবনে কোনও আশা নাই! মার্সির হৃদয় নিরাশার তীব্র পীড়নে পীড়িত হইয়া উঠিল। সে গ্রেসের প্রাণহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিরাশার বিদ্রূপ সহকারে বলিল "হায়! এখন যদি তুমি মার্সি মেরিক হইতে—আর আমি গ্রেস রোজবেরি হইতাম।"

এই কথা গুলি যেমন তাহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল—অমনি মার্সি যেন তীরবৎ ঋজু হইয়া দাঁড়াইল। পাগলের ন্যায় শূন্যে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ—তাহার মস্তকের ভিতরে যেন প্রবল অগ্নি শিখার দাহ—বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত। "এখন যদি তুমি মার্সি হইতে আর আমি গ্রেস্ হইতে পারিতাম!" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই চিন্তা তাহার মনে এক অভিনব আকার ধারণ করিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনে বিদ্যুত চমকের ন্যায় এই ধারণা জন্মিল—"যদি আমি সাহস করতে পারি, তবে এখন আমি গ্রেস রোজবেরি হতে

পারি! আমি যদি জ্যানেট্ রয়ের কাছে আপনাকে গ্রেস বলে পরিচয় দিই তাহলে কে আমাকে নিবারণ করতে পারে?"

এরূপ করিলে ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা কি? এই অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে অন্তরায় কি?

গ্রেস নিজেই বলিয়াছিল যে তাহার সহিত জ্যানেটের কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে ক্যানাডায় আছেন ইংল্যাণ্ডে তাহার আত্মীয় কেহই জীবিত নাই। ক্যানাডার পোর্ট-লোগানে তাহারা বাস করিত—মার্সিও এককালে সেখানে বাস করিয়াছিল—সে সেই স্থান সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানে। যদি রোম ও কর্নেল রোজাবেরির সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে মার্সি সেসকলের উত্তর দিতে পারিবে—কারণ গ্রেস লিখিত দৈনিক লিপিতে সকল কথাই লিপিবদ্ধ করা আছে। আর সে তো আপনাকে কোন সুশিক্ষিতা নারী বলিয়াও পরিচিত করিতে যাইতেছে না—সে শুধু গ্রেসের ছদ্মবেশ ধারণ করিবে। আর গ্রেসের যে উত্তম শিক্ষা হয় নাই—সে কথা গ্রেস নিজেও বলিয়াছিল এবং কর্নেলের পত্রেও লিখিত আছে। সকল ঘটনাই তো তাহার —অনুকূলে! যুদ্ধক্ষেত্রের সেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের সহিত সে কার্য্য করিয়াছে—তাহারা আর কেহই ফিরিবে না সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার স্বনামাঙ্কিত পরিচ্ছদ গ্রেসের গাত্রে বিরাজ করিতেছে। গ্রেসের নামাঙ্কিত পরিচ্ছদ—মার্সির নিকট রহিয়াছে। মার্সি দেখিল তাহার ঘৃণ্য জীবনের সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ লাভের সহজ পথ তাহার সম্মুখে বিরাজমান। কি আশাজনক ভবিষ্যৎ। পাপিনী মার্সির জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করিয়া সে একটী নূতন জীবনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। তাহার এমন একটী নাম হইবে—যে নামের সহিত কলঙ্কের আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহার গত জীবন তখন এরূপ আকার ধারণ করিবে যে তাহার বিরুদ্ধে সমাজের আর কোন জিহ্বাই গরল উদ্গিরণ করিতে পারিবে না! এই চিন্তায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল—তাহার চক্ষু যেন ভাবী আনন্দের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নূতন আশার আলোকে সমুজ্জ্বল ভাবীজীবনের মাধুর্য্য যেন তাহার স্বাভাবিক সুন্দর দেহখানির উপর নববসন্তের বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়া দিল। মার্সিকে এমন সুন্দর ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখায় নাই।

সে ক্ষণকাল নীরব থাকিল। তাহার পর সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এই অভিপ্রায়ের পথে অন্তরায় কি? তাহার বিবেক এ বিষয়ে কি বলে?

প্রথমে গ্রেসের কথা ভাবা যাক, সে স্ত্রীলোক এখন মৃত—এরূপ করিলে তাহার প্রতি আর সে কি অনিষ্ট করিতেছে? গ্রেসের ইহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জগতে তাহার—কেহ আত্মীয়ও নাই—।

দ্বিতীয়তঃ জ্যানেটের কথা। যদি মার্সি প্রাণপণে তাহার নূতন কর্ত্রীর সেবা করে—তাঁহার সকল আদেশ প্রসন্ন মুখে বহন করিয়া সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে—তাহা হইলে জ্যানেটের ইহাতে অনিষ্ট কি? হয়তো এমন হইতে পারে—যে গ্রেস তাঁহার যেরূপ সেবা করিতে পারিত, মার্সি তাহা অপেক্ষাও ভালরূপে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবে।

মার্সি কর্নেলের পত্র খানি লইয়া অন্যান্য

কাগজের সহিত উহাকে ব্যাগের ভিতরে রক্ষা করিল। মুক্তির পথ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত—ঘটনাবলি তাহার একান্ত অনুকূল। ধর্ম্মবুদ্ধি ইহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতেছে না—এই অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে অন্তরায় কোথায়? মার্সি মন স্থির করিল—"আমি এ কাজ করিব"।

কিন্তু যখন সে ব্যাগটীকে নিজের পরিচ্ছদের পকেটে স্থাপন করিল—তখন তাহার হৃদয়ের মধ্যে সে কি যেন এক অব্যক্ত অশান্তির ব্যথা অনুভব করিল। সে বুঝি বিবেকের মুখ চাপা দিয়াছে—এখনও তাহার সকল কথা শুনা হয় নাই। সে ভাবিল—চিঠি খানি টেবেলের উপরেই থাকুক্—হৃদয়ে আবেগ এবং উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলে তখন সে ধর্ম্মবুদ্ধির উপদেশ লইবে। এ অভিপ্রায়ে বুঝি কোন ত্রুটী আছে—নচেৎ হৃদয়ের এ ব্যথা কেন?

সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় কথা ভাবিবার পূর্ব্বেই দূরে সৈনিক এবং অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। জর্ম্মান সৈন্য পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আর অল্পক্ষণ পরেই তাহারা কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এখনি তাহারা তাহাকে ডাকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে। আর স্থির ভাবে ভাবিবার অবসর নাই। এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে স্থির করিতে হইবে সে কি চায়?—গ্রেসের ছদ্মবেশে নূতন জীবন? না—মার্সির নামে তাহার সেই প্রাচীন ঘৃণ্য অস্তিত্ব?

সে শেষ বারের জন্য সেই মৃতার শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল। গ্রেস তো এখন এ ধরণীর সুখ দুঃখের অতীত হইয়া গিয়াছে—অথচ গ্রেসের শান্তিময় ভবিষ্যত, মার্সির উপরে প্রতীক্ষা করিতেছে। সে কি করিবে? মার্সি সঙ্কল্প স্থির করিল—সে জগতে গ্রেসের স্থান অধিকার করিবে।

জর্ম্মান সৈন্যের পদধ্বনি ক্রমেই নিকটতর হইতে লাগিল। কর্ম্মচারিদিগের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল।

মার্সি ভাবী ঘটনার প্রতীক্ষায় স্থির ভাবে টেবিলের উপর বসিয়া রহিল। নারী-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে জর্ম্মানদের গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে সে একবার আপনার পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি গুছাইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এই কার্য্য করিতে গিয়া তাহার দৃষ্টি তাহার বাম স্কন্ধের উপর নিবদ্ধ রক্তবর্ণ ক্রশ চিহ্নের উপর পতিত হইল। শুশ্রূষাকারিণীর এই চিহ্নে ভবিষ্যতে তাহার বিপদ ঘটিতে পারে—এ বিষয়ে ভবিষ্যতে অনুসন্ধান হইলে তাহার প্রকৃত ইতিহাস বাহির হইয়া পড়িতে পারে।

সে একবার গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। গ্রেসকে যে দীর্ঘ-কোট মার্সি পরিতে দিয়াছিল সেটী এখন গৃহের অঙ্গনে পড়িয়াছিল—মার্সি সেইটী উঠাইয়া লইয়া উহা দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া বসিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরের দরজা খুলিয়া গেল—বিদেশীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—এবং অস্ত্রের ঝনঝনা চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। মার্সি ভাবিল—আমি এই খানে বসিয়া প্রতীক্ষা করিব, না নিজেই অগ্রসর হইয়া জর্ম্মানদের সম্মুখে দাঁড়াইব? সে প্রতীক্ষা করিতে পারিল না—সে উঠিয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল—পর্দ্দা খুলিবার জন্য যেমন হাত উঠাইয়াছে—এমন সময় অপর পার্শ্ব হইতে পর্দ্দা সরাইয়া সেই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল তিনজন লোক।

ক্রমশঃ

শিকল বিকল

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়]

ও তুই, শিকল দিয়ে বাঁধবি কারে বল্।
কারে তুই, করবি রে বিকল ॥

বাঁধলি যারে বন্দীশালায়,
আসন তাহার অযুত হিয়ায়,
লক্ষ প্রাণের আলো সে যে
হচ্ছে সমুজ্জ্বল।
কারে, করবি রে বিকল ॥

রাখ্‌লি বটে দেহটারে
কারাগারের কপাট চেপে ;
প্রাণ যে তাহার গান যে তাহার
ছড়িয়ে আকাশ বাতাস ব্যেপে !

তার, উদার প্রাণের সবল গানে,
মুক্ত সে যে লক্ষ প্রাণে ;
বাঁধ্‌তে বিরাট আত্মাকে তার
হবিনে সফল।
কারে করবি রে বিকল ॥

'অরু-বৌদি'

প্রথম স্তবক

[শ্রীসত্যরঞ্জন বসু]

কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও ওবাড়ীর সঙ্গে সুরথদের আত্মীয়তা ছিল খুব বেশী। এই হিসাবে অরুণার মা ছিলেন সুরথের মৈঠামা।

সময়ে অসময়ে সুরথের অত্যাচারের চোটে যখন তাহার মাও অস্থির হইয়া পড়িতেন তখন অরুণার মা'র ক্রোড়ই ছিল সুরথের আশ্রয় স্থান। ইহাতে সুরথের মা যে খুব

হইতেন তাহা নহে, তবে বিদেশে আপন মূর্ত্তি সকল সময় প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় সুরথের মা—লাবণ্যঠাকুরাণী একটু সাবধান হইয়া চলিতেন। কিন্তু তাঁহার এই সাবধানতা সত্বেও যে কোন্ ফাঁকে তাঁহাকে পাড়ার সকলেই জানিয়াছিল তাহা বলা বড় কঠিন। তাই পাড়ার বর্ষীয়সীরা তাহাকে ঘাঁটাইতে বড় সাহস করিতেন না!

অপরপক্ষেও অরুণার মাতা একমাত্র সন্তান অরুণাকে লইয়া এতদিন কাটাইতে-ছিলেন—এর মধ্যে সুরথকে পাইয়া যেন তাঁহার পুত্রের অভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। অরুণাও সুরথকে ছোট ভাইটির মত স্নেহ ও ভালবাসায় জড়াইয়া রাখিতে চাহিত। অরুণার সুকোমল মৃণাল দেহলতা ও আবেশময় চক্ষুদুটীতে মুখখানি বড়ই করুণ প্রতিভাত হইত। সুরথের ইহা বড়ই ভাল লাগিত; এবং তাহাকেই সে একান্ত আপন বলিয়া মনে করিত। তাহার বালক সুলভ চপলতার মধ্যেও নিতান্ত গোপনীয় যা কিছু সে তার অরুদি' ছাড়া আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিত না, কিম্বা অন্য কাহারও কাছে বলিয়া বিশ্বাস পাইত না। অরুণাও এই সমস্ত গোপন ধনের ভাণ্ডারী হইয়া সুরথ যখনই তাহাকে বড় বেশী অন্যায় রকম আব্দার কিম্বা জ্বালাতন করিতে থাকিত তখনই তাহার গোপন কথাগুলি সকলকে বলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া শান্ত করিত। অরুণা ইহাতে নিজে যেমন আমোদ পাইত অন্যদিকে তেমনি দুর্দ্দান্ত বালকের হাত হইতে রক্ষা পাইবারও প্রকৃষ্ট উপায় ছিল।

কিন্তু এই বালকের চলাফেরার মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী বস্তু ছিল যাহাতে অরুণা কিম্বা তাহার মা একদণ্ড বালককে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না!

অরুণা সেদিন দুপুরবেলা মা'কে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল—সুরথ তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া খুব শান্ত ছেলেটির মত হাঁ করিয়া অরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কথা গিলিতেছিল। তাহার মন যে কোথায় ছিল ভগবানই জানেন। হঠাৎ কুম্ভকর্ণের ছয়মাস নিদ্রা ও খাওয়ার বহর শুনিতে পাইয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া লাফাইয়া উঠিল এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অরুণার পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য করিল।

হঠাৎ সে বলিয়া বসিল 'অরুদি ভাল পেয়ারা খাবে?' উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভোলাদের বাড়ীর পেছনের বাগানে একটা গাছে পেয়ারা দেখিয়া আসিয়া অবধি সুরথের মনে কেবল ঐ কথাই তোলপাড় করিতেছিল এবং এতক্ষণ পরে অরুণার কাছে বলিয়া ফেলিয়া যেন সে একটু স্বস্তি বোধ করিল।

অরুণা 'কোথায় পাবি?' বলিয়া মুখ উঁচু করিতেই সুরথ দৌড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরুণা এই বালকের এমনই আপন করা স্নেহমাখা কোমল প্রাণটির অনুভূতি সামান্য সামান্য কাজকর্ম্মের মধ্যে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকিত। কিন্তু সে বুঝিত না সুরথ কেন তাহাকে এইভাবে স্নেহ ও ভালবাসায় আবদ্ধ করিতেছে!

অল্পক্ষণ মধ্যেই এক কোছ ভরিয়া পেয়ারা লইয়া সুরথচন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে অরু-ণাকে ডাকিল। 'আয়না এখানে'—বলিয়া অরুণা অন্য মনে রামায়ণ খানা উলটাইতে-

ছিল। ততক্ষণে তাহার মা'র 'একটু গড়া-গড়ি' দেওয়া গাঢ় ঘুমে পরিণত হইয়াছে।

সুরথ অরুণার আহ্বানে আসিতেছে না দেখিয়া অগত্যা অরুণাকেই যাইতে হইল। বাহিরে যাইয়াই অরুণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরথের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। গায়ের জামাটায় প্রকাণ্ড একটা ফালা দিয়াছে; কিন্তু এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটি পুর ভাল পেয়ারা বাছিয়া অরুণাকে দিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অরুণার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। শ্রীমান যে গাছ হইতে পড়িয়া এমন কাণ্ড করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। কেমন করিয়া এ অবস্থা হইল জিজ্ঞাসা করায় সুরথ যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে বলিল—"তোমার জন্য এই পেয়ারাটা পাড়্‌তে গিয়েই ডাল—তা'র মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। লাবণ্যঠাকুরাণী যে কোন্ সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারা তাহার কিছুই জানে না।

সুরথ মা'কে দেখিয়াই আশু বিপদাশঙ্কায় পেয়ারাগুলি কোঁচ হইতে ফেলিয়া দিয়াই অরুণাদের বাড়ী হইতে দৌড় দিল।

[খ]

আজ তিনদিনের মধ্যেও সুরথের মুখখানা না দেখিতে পাইয়া অরুণা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মাতার সহিত লাবণ্য ঠাকুরাণীর পেয়ারা ব্যাপার লইয়া যে সেদিন কথা কাটাকাটি হইয়াছিল ইহা যে তাহারই ফল তাহা অরুণা চিন্তা করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইল। সেদিন সে একটু অন্যমনস্ক না থাকিলে আর এ রকম হইতে পারিত না। সেই দুপুর-বেলা অশান্ত বালককে একলা বাগানে যাইতে দেওয়া যে কোন মতেই ভাল হয় নাই এই কথাই থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে উদয় হইয়া বড়ই যন্ত্রণা দিতেছিল। সেই যে সমস্ত দোষের মূল ইহাই মন বারবার বলিতেছিল।

এই বালকটি যে তাহার সমস্ত দিনের দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কেমন অলক্ষ্যে অরুণার প্রাণের গোপনতম প্রদেশে স্থান করিয়া লইয়াছে ইহা ভাবিয়া সে নিজেই আশ্চর্য্য হইত। এবং সেও যে কেমন আবশ্যভাবে এই বালককে আপন অঙ্কে স্থান দিয়া এখন অভাব অনুভব করিতেছে তাহারই বিষয় চিন্তা করিয়া আকুল। তাহার অনুপস্থিতিতে কতই না অব্যক্ত আশঙ্কার বেদনায় সে আজ পীড়িত। অরুণা আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। মা'কে গিয়া অনুনয় করিল—"চল একবার ওবাড়ী যাই। সুরথের হয়ত বা খুব অসুখ করেছে।" মাতা একটু বিরক্ত হইয়াই উত্তর করিলেন—"যে ভাল বাসেনা তার ছেলের জন্য অত দরদ কেন লা?" মুখখানা ফিরাইয়া অরুণা চলিয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

সারাটা দুপুর মুখ গুঁজিয়া পড়ার ঘরে এ বই সে বই নাড়িয়া চাড়িয়া কাটাইয়া দিল। কিছুতেই মন বসাইতে পারিতেছিল না। জানালায় রোদের শেষ রেখা লুপ্ত হইয়া গেল। গোধূলির আলো তাহাদের বাগানখানাকে বড়ই মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। অদূরে ছোট্ট নদীটি—তীরে ধানের ক্ষেত এবং তার পাশেই একখানি ছোট্ট গ্রাম। দু'একজন কৃষক গাড়ী লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছে। সন্ধ্যার আগমনের নিস্তব্ধতার মধ্যে অরুণা

নীরবে দিগন্তের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

আজ তাহার বড় বেশী মনে পড়িতে লাগিল—কতদিন এই যে বাগান হইতে রাস্তাটি বাহির হইয়াছে এইটি বাহিয়া সুরথকে সঙ্গে করিয়া মাঠের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছে। একদিন ঠিক এমনি সময় ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া আসিবার সময় কোথায় যে সুরথ লুকাইয়া রহিল—সে আর বাহির করিতে পারিল না। কত সন্তর্পনে, কত ভয়ে ভয়ে, কত অজানা আশঙ্কায় মা'কে আসিয়া বলিয়াছিল; কিন্তু তার পরই যখন পাশের ঘর হইতে "কেমন জব্দ" বলিয়া সুরথকে বাহির হইতে দেখিল—ইত্যাদি, মনে মনে আলোচনা করিয়া তাহার আজ এমনই অবস্থা হইয়াছে যে মনে করিতেছিল একটু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলেই বুঝি মনটা একটু পাতলা হইবে। কিন্তু মা'র কাছে দুপুরবেলা যে প্রকার কথা শুনিয়াছে তা'তে তা'র সমস্ত বেদনা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিল!

পিছন হইতে একটা ঢিল আসিয়া গায় পড়িতেই অরুণা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পেছন ফিরিল। ততক্ষণ সন্ধ্যার কালোআবছায়া সমস্ত বাগানকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঝোপ্‌ড়া ফুলের গাছগুলি মাঝে মাঝে অন্ধকারকে একটু একটু জমাট করিয়া নির্ব্বাক শান্ত্রির মত দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই একটা গাছের তলায়, অন্ধকারে চুপি চুপি বাসা হইতে পলাইয়া আসিয়া সুরথচন্দ্র আশ্রয় লইয়াছে। ভয়—পাছে কাহারও নজরে পড়িয়া যায়। অরুণা একটু আগাই-তেই 'ভয় পেয়েছ ?'—বলিয়াই ঝোপ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

অরুণা কথা বলিতে পারিল না। সুরথকে জোরে বক্ষে চাপিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার নড়িবার শক্তি ছিল না। দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। এক ফোঁটা সুরথের গায়ে পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল "তুমি কাঁদ্‌ছো—অরুদি ?"—"কেন ? তুমি কি আমাদের নও ?" অরুণাকে নিরুত্তর দেখিয়া বালক একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার মুখখানা ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বার বার বলিতেছিল "তুমি কেঁদোনা—অরুদি, আমি আর দুষ্টুমি করবোনা! আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো!"—অরুণার প্রাণের অব্যক্ত বেদনায় কে যেন শলাকা বিধাইতেছিল। তাহার প্রশমিত ক্রন্দন আবার ছুট করিয়া দুই গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

যখন বুকের কম্পন শান্ত হইল—তখন সন্ধ্যা বহিয়া গিয়াছে। অরুণার পড়ার ঘরে আলো দিয়া লখীয়া বলিয়া গেল "দিদি ঘরে এস মা বক্‌ছেন।" অরুণার চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরথেরও "মা বক্‌ছেন" কথাটায় চৈতন্য হইল। সে ও 'অরুদি 'যাই' বলিয়াই অন্ধ-কারের মধ্যে দৌড়াইল। তাহাকে যেমনই পাইয়াছিল ঠিক তেমনই হারাইল।

(গ)

বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুরথরা গিরিডি আসিয়াছিল। তাহার পিতার ছিল অসুখ। কিন্তু তাঁহার কোনও উন্নতি না হওয়ায় প্রায় এক বছর পর পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

মানুষে স্বভাবতই কোন একটা বিষয়ে অভাব অনুভব করিলে হাতের কাছে অন্য যা' কিছু পায় ত'ার মধ্যেই আপনার মনটাকে বসাইতে

চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা সকল সময় সম্ভবপর হইয়া না উঠিলেও মানুষ চেষ্টার ত্রুটি করে না। ফলে এত দাঁড়ায় যে সে যাহা হারা হয়াছে তাহার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অভাব আসিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। কোনওটাকে ত্যাগ করা তখন হইয়া উঠে না। নিত্যই অভাবের মাত্রা বাড়িতে থাকে।

অরুণার অবস্থাও ঠিক ঐ রকম দাঁড়াইয়াছে। সুরথরা চলিয়া যাওয়ার পর ঐ বাড়ীতে অন্য একটি পরিবার ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যেই আপনাকে মিশাইয়া দিয়া নিজের মনের অভাবটাকে পূরণ করিতে চাহিতেছিল। কিন্তু অরুণার অবস্থাটা এই হইল যে ও বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর দরজা দেখিলেই যেন সুরথের স্মৃতিটা তাহার অন্তরের মধ্যে বড় বেশী বাজিত; কোন ক্রমেই তাহার হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিত না।

বিভা ছিল অরুণার সম বয়সী। তন্বী, বড় বড় চোখ দু'টিতে সর্ব্বদাই একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার ভাব। তাহার কোঁকড়ান চুলগুলি সর্ব্বদাই পিঠের উপর দিয়া ছড়ান কদাচিৎ একটি বেণী বাঁধিয়া রাখিত। সব রকম কাজে চটপটে—পরকে আপন করিয়া লইতে সে বড়ই ওস্তাদ! দু'এক দিন আসা যাওয়া করিয়াই বিভা বুঝিয়া ফেলিল অরুণার কোমল প্রাণের অনুভূতিগুলিকে। তাই সে সর্ব্বদাই অরুণার প্রতি সহানুভূতি প্রবণ— নানা প্রকার কাজে, গল্পে, গানে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা পাইত! কিন্তু অরুণা বিভার এই প্রচেষ্টাতে এক এক সময় এমনই অসম্বদ্ধ ভাবে আঘাত করিত যে বিভার তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইত।

সংসারে এই বিভার শ্রেণীর লোককে দেখা যায় যে কিছুতেই তাহারা দমে না। একটা নষ্ট হয় তখনই আর একটা তৈরী করিয়া লয়। তাহারা ভাঙ্গিতেও যেমন পটু গড়িতেও ঠিক তেমনই ওস্তাদ। তাই বিভাও এটা সেটা বলিয়া অরুণার মনটাকে অনেকটা দখল করিয়া লইয়াছে। এখন রোজই সন্ধ্যার সময় বিভার গান না শুনিলে যেন অরুণার দৈনন্দিন কাজের কি একটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সেদিন ডাকে অরুণার মা'র কাছে লাবণ্য ঠাকুরাণীর কি যেন একখানা চিঠি আসিয়াছে। তিনি সারাটাদিন মুখখানা বড়ই বেজার করিয়া রহিয়াছেন। অন্য দিনের মত আর সুরথের খবর লইয়া অরুণাকে শোনাইতে আসেন নাই।

অরুণ অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পায় নাই। তাই দুপুরের সময় বিভা আসিলে তাহাকে দিয়া মা'কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে কেবল এইটুকু জানিল যে লা ণ্য ঠাকুরাণী ছেলে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছেন। তাই আর কবে দেখা হইবে না হইবে এই ভাবিয়া দুঃখ করিয়াছেন। এই উত্তরে অরুণার মন লাগিল না। তাহার মনে কত প্রকার অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা আসিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। বিভার সঙ্গে আর মন খুলিয়া আলাপ করিতে পারিল না। বিভা একখানা চাটের আসন তৈরী করিতেছিল। তাহার মধ্যে কয়েকটা নূতন রকম ফুল তুলিয়া দেওয়ার অর্ডার অরুণার উপর ছিল! সে অনেক করিয়া তাহার প্রতিশ্রুতি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা দেখিল কিন্তু বিভা তাহাকে মুক্তি দিল না!

বন্যা এল হন্যা দিয়ে মরা দেশের বুকে
মৃত্যু যেন স্রোতের আগায় উঠছে ফুলে কোপে

(ঘ)

অনেক দিন পরের কথা। সুরথের জীবনে এই সময়েই যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করা সহজ নয়। অরুণা তাহার মামা বাড়ী বৌ হইয়া আসিয়াছে, সুরথের জীবনে যাহা সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্খা ছিল তাহাই তার পূর্ণ হইয়াছে। মা বাবাকে হারাইয়া অবধি সে অনেক কাল বিদেশে বিদেশে কাটাইয়া সামান্য কিছু বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছিল, ঠিক এমনই সময়ে অরুণার বিবাহ হইল তাহার মামাতো ভাই সুব্রতের সঙ্গে। সুরথের এই ভবঘুরে জীবনের মধ্যে এমন কিছুই আকাঙ্খা ছিল না, যার জন্য সে এক জনার কাছেও ঋণী। কিন্তু অরুণা আসিয়া যে দিন তাহার নূতন ঘর আসন পাতিল, সেদিন হইতেই সুরথের জীবনে একটা নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল।

অরুণাই তাহাকে মনে করাইয়া দিল তাহার সেই ছেলেবেলাকার কথা—"অরুদি বৌ হবে?" এই আকাঙ্খাটুকু লইয়াই এতকাল সে জীবন বহন করিয়াছে এবং তাহারই পরিসমাপ্তিতে অরুণা আজ ধন্য।

মাতৃ বিয়োগের পর হইতে সংসারে যখন আর কোনও বন্ধন রহিল না, সুরথ তখন হইতেই ঠিক করিয়াছিল—নিজের জীবনটাকে ধোঁয়ার মত উড়াইয়া দিবে। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া মাঝে মাঝে ধোঁয়া যেমন জমাট বাঁধে, সুরথ কিন্তু তেমনটি হইতেও স্বীকৃত ছিল না। তাই সুব্রতের নিতান্ত আদরের, এবং অনুগত হইয়াও তাহার বিবাহের সময় ইচ্ছা করিয়াই কলেজ কামাই করিয়া গয়া গেল, বাপ মায়ের শেষ কাজ করিয়া আসিতে। ইহাতে সুব্রত যেমন কষ্ট পাইয়াছিল, সুরথও সেই রকম অনুভব করিয়াছিল। কিছুতেই সে আর স্নেহ মমতায় ধরা দিবে না বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল।

কিন্তু কোথা হইতে অরুণা আসিয়া এই দ্বন্দের মধ্যে আশ্রয় লইল। সুরথ কিম্বা অরুণা উভয়ের কেহই জানিত না যে এক-জনার স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত স্নেহ-ভালবাসা ঠিক এমনই করিয়া অসম্ভব ভাবে দুইজনাকে পুনর্বার এক করিবে। তাই বিবাহের অনেক দিন পরে যখন নূতন বৌ দেখিতে সুরথ মামা-বাড়ী হাজির হইল—তখন তাহার বিদ্রোহী মন একেবারে নুইয়া অরুণার পায়ে পড়িল। অরুণারও গুপ্ত অনুভূতিগুলি চঞ্চল হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া হারানো মাণিকটিকে বুকে তুলিয়া লইল।

সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া অরুণা যেন অনেক কিছু পাইল। কারণ ছোটবেলা হইতে প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া হঠাৎ অভাবের প্রাচুর্য্যের মধ্যে পড়িয়া অরুণার মন এক এক সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এবং কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে সহ্য করিতে হইত বেচারা সুব্রতকে। ইহাতে এই দাঁড়াইত যে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিনই তাহাদের কথা বন্ধ থাকিত। দোষ যে কাহার তাহার বিচার হইত কেবল সুরথ কাছে থাকিলে, এবং ভাঙাও জোড়া লাগাইতে পারিত কেবল সেই!

ছুটির পর কলেজ খুলিয়াছে। সুরথ সেদিন রওয়ানা হইবে। সারাদিন সে অরুণার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে নাই। সেই গিরিডি ছাড়িয়াছে পর আর এতগুলি দিন অরুণার কাছে থাকে নাই। তাই এবার তাহার মন যাইতে

চাহিতেছিল না—কেমন একটা অভাব সে মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

ছেলেবেলা হইতেই তাহার কোমল অনাবিল প্রাণটা বড়ই স্নেহপ্রবণ। কিন্তু বাপমা'র স্নেহ এবং ভালবাসা ঠিক যে বয়সে সকলে লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়—সেই সময়েই তাঁহাদেব হাবাইয়া সুরথ ইহার অভাবটা খুব বেশী রকমই অনুভব কারতেছিল। তাই যখনই কোন সজীব কাছ হইতে একটু সহৃদয়তা পাইত—সে তাহার কাছে একেবারে নিজকে বিলাইয়া দিয়া মুক্তি পাইত। এই জন্যই আজ সুব্রত ও অরুণার নিকট হইতে বিদায় লইতে তাহার মন কাঁদিতেছিল।

কি একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া সুব্রত ও অরুণার মধ্যে সেদিন ঝগড়াটা একটু বিশেষ রকমই হইয়াছিল। সুরথ অনেক কবিয়াও মিটাইতে পারে নাই। এমন কি রাত্রিবেলা সুব্রত ও অরুণার পায় ধরিয়া অনেক ক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াও যখন কোন ফলোদয় হইল না—তখন সে আস্তে আস্তে মধ্য রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের মত নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বাহিব হইয়া পড়িল। সে অভিমানের মোহে, যে গাড়ি পাইল তাহাতেই চড়িয়া বসিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোহও কাটিয়া গেল। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার সমস্ত দেহ ও মন ভরিয়া উঠিল। সে মাতালের মত গাড়ির জানালার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা পাইল।

(৬)

(অরুণার চিঠি)

স্নেহের সুরথ—

* * * *—সেদিন সকালবেলা উঠিয়া মনে করিয়াছিলাম—তুমি হয়ত যাও নাই। আমাকে না বলিয়া যে যাইতে পারিবে তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম যে সত্যই চলিয়া গিয়াছ—তখন মনে বড়ই অনু-শোচনা হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। সারাটা দিন কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলি নাই! সকল কথায় সকল কাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার কথাই শুধু মনে হইয়াছে। তুমি যে আমাদের মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছ তাহা হয়ত তুমি নিজেই জান না।...

কত পুরানো কথা—নিজের কত অন্যায় ত্রুটির কথা, ভাবিয়া চোখে জল আসিতেছে।

জানই আমাব ভাই নাই। ছোটবেলায় তোমাকে যখন নিজের ভাই বলে মনে করি, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিবার অবসর ছিল না। আবার যখন তোমাকে হারাইয়াও পাইলাম—তখন ভগবানের আশীর্ব্বাদের কথা ভাবিয়া আমার বুক ভরিয়া উঠিল!

ভাইটি, লক্ষ্মীটি! একবার আসিয়া তোমাব অভিমানের চূড়ান্ত করিয়া যাও। তারপর যত পার শাস্তি দিও। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

'তোমার অরুবৌদি'

(ক্রমশঃ)

নীরব দান

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

শাখার আগায় উঠ্‌ল যে ফুল মঞ্জরি,
গন্ধে রূপে বেড়ায় সদা সঞ্চরি'
ভ্রমর এল' গুঞ্জরি তার সৌরভে—
করলে পূজা শাখায় তারই গৌরবে!
মাটীর নীচে সবার আঁখির আবডালে,
মূল যে তৃষার বিন্দুটা তার সব ঢালে;
বিলিয়ে দিয়ে সকল পরাণ মন তারে,
কুঁড়ির মাঝে জীবন খানি সঞ্চারে।
—সে কথা কই বাজল এসে কার কাণে
ডুবে গেল সে দান চির-নীরবতার
মাঝখানে!

নদীর বুকে ছুট্‌ল' যে জল উচ্ছ্বাসে,
স্নেহধারায় ভাঙ্গল তৃষার মূর্চ্ছা সে।
কবি এল বীণ লয়ে তার সামগানে,—
করলে পূজা নদীরে সে সম্মানে!
শৈল গুহার আঁধার কারার দ্বার ঠেলে,
ঝরণা যে তার বুকের শোণিত দেয় ঢেলে,
আপন হারা নিবিড় স্নেহের চুম্বনে,
সলিল ধারা ভরল তড়িত কম্পনে।
—সে কথা কই বাজল এসে কার কাণে?
ডুবে গেল সে দান চির-নীরবতার
মাঝখানে!

বিবাহে পণ প্রথা

[শ্রীসুবোধগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাতীয় জীবনের এই মহা দুর্দ্দিনে জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আজ আমাদের প্রত্যেকেরই একবার স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া সকল দিক সম্যক রূপে বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জীবন মরণের এই সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া আজ যদি আমরা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যথাযথ রূপে বিচার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না পারি, শুধু খেয়ালের ঝোঁকে বা প্রকৃতির তাড়নায় একই পথ সকলে অনুসরণ করি, জীবনের অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করাও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করি, তাহা হইলে এই অধঃপতিত জাতির উন্নতির আশা তো পরের কথা, অদূর ভবিষ্যতে ইহা একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকার লাভের জন্য ভারতমাতার বহু সুসন্তান, বহু ত্যাগী মহাপুরুষ আজ কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন, সে অধিকারকে আয়ত্ত করিবার জন্য দেশের জনসাধারণের যে শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন তাহার বিস্তারে তাঁহারা তাহাদিগের প্রাণের উচ্চতর মহত্বের আদর্শ ও ত্যাগ দ্বারা জীবনসর্ব্বস্ব পণ করিয়া অকাতরে অকুণ্ঠিত চিত্তে যে পরিশ্রম করিতেছেন তাহার বিরাম নাই, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। কর্ত্তব্য পালনের এই মহাচেষ্টা যে সাধু মহাত্মাদের একমাত্র আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তেই সাফল্য লাভ করিবে, ভগবানের আশীর্ব্বাদবারি তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হইয়া তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদের জন্য ও যাঁহাদের লইয়া এই রাষ্ট্রীয় জীবনে অধিকার লাভের চেষ্টা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সামাজিক জীবনের অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখাও একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক জীবনেই যদি অস্তিত্ব না থাকিল তবে এ রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকার ভোগ করিবে কাহারা? বর্ত্তমান সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, ঔষধ প্রলেপেরও স্থান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সমাজের বীভৎস বিকৃত চেহারা মনে হইলেই প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। সামাজিক জীবনে সমাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুর্গতির সীমা নাই। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বিপুল বেদনা লইয়া জীবন সংগ্রামের পথে বাহিরের শত অত্যাচার অপমান মস্তকে বহন করিয়া আবার নিজের ঘরে সমাজের এই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া তাহার অস্তিত্ব সে যে একেবারেই হারাইতে চলিল। অত্যাচারের বেদনায় তাহার প্রাণ যে কণ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে! রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের কথা তাহার নিকট স্বপ্ন বিশেষ, আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় হাসির কথা হইয়া পড়িয়াছে। ভোগ যে করিবে

আগে তাহাকে বাঁচিতে দাও তবে তো সে ভোগ করিবে—ত্যাগ যে করিবে আগে তাহাকে ত্যাগ করিবার শক্তি প্রাণের মধ্যে জাগাইতে দাও। তাহার বাঁচিবার শক্তি নাই, ত্যাগ করিবার শক্তি সে পাইবে কোথায়? জীবনকে যে আনন্দময় বুঝিয়াছে সেই সে আনন্দের জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া দুঃখকে বরণ করিতে পারে, তাহারই ত্যাগের শক্তি আসে—সেই নিরানন্দের আঁধারে আনন্দের আলোক খুঁজিয়া পায়। যাহার জীবন দুঃখময় বলিয়াই চিরদিন ধারণা হইয়া রহিল, জীবনটা একটা বিড়ম্বনা একটা অশান্তির ক্ষেত্র বলিয়া যাহার প্রাণে সংস্কারের ছাপ দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল, তাহার আর জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা হওয়া কোনও মতেই তো স্বাভাবিক নয়। দারিদ্র্যতা মানবের চির সহচর হইতে পারে কিন্তু প্রাণের অশান্তি তো তাই বলিয়া জীবনের চির সঙ্গী হইতে পারে না। শান্তি ও আনন্দ ধনী ও গরিবের সমানই অধিকার। শান্তি দাও—সমাজের অত্যাচারে আর মানুষকে জর্জ্জরিত করিও না। অনেক অশান্তি, অনেক অপমান তো দু'মুঠা ভাতের জন্য চির দিনই বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে সহিতে হইতেছে, তবে ঘরের ভিতর আবার আগুন জ্বালাইয়া এ যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া কেন? এ অশান্তির আগুন নিভাইয়া ঘরে শান্তি আনিবার চেষ্টা কর ভাই!! প্রাণে আনন্দ ফিরিয়া আসুক, জীবনে শান্তি বলিয়া একটা জিনিষ আছে সেটা উপলব্ধি হউক, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা—বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা তখন স্বতঃই প্রাণে ফুটিয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সবই পরস্পর সাপেক্ষ। এক পথে এক স্রোতে সকলেই গা ভাসাইলে চলিবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকারের যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে চলুক তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ সামাজিক জীবনের দিকেও লক্ষ্য রাখা এখন হইতে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সমাজ আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা একবার ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রত্যেকেরই প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার না হইয়া যায় না। অনেক ভাঙ্গা গড়ার প্রয়োজন, অনেক চেষ্টা, অনেক অধ্যবসায় ও বহু যত্নে তবে এ সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিতে পারে। অনেক সহ্য করিতে হইবে, অনেক অপমান ও তিরস্কারকে পুরস্কার স্বরূপ গণনা করিয়া তবে এ কাজে নামিতে হইবে। সকল দোষ ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বপ্রথমে সমাজের অঙ্গে বিবাহে পণ প্রথারূপ এই যে মহা পাপ প্রবেশ করিয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এ মহাপাপকে যে রূপেই হউক তাড়াইতেই হইবে। এই পাপের তাড়নায় মানুষের নৈতিক উন্নতি, মনুষ্যত্ব ও চরিত্র পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল! সাধারণ মধ্যশ্রেণীর ভদ্রগৃহস্থের যে সামান্য আয় তাহাতে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচ পত্র চালাইয়া সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দ্বারা তাহারা যে মানুষ এ কথাও বুঝাইবার জন্য যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন তাহাও জুটিয়া উঠে না। অর্থাভাবে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অচিকিৎসায় নানা রোগে ভুগিয়া, খাওয়া পরার নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া শতকরা ৯৫ জন বালক বালিকা আমাদের এই অদ্ভুত দেশে এক একটা কিম্ভুত কিমাকার জীব হইয়া উঠে। না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সুশিক্ষা এই ভাবে যে সমস্ত বালক বালিকা কোনও রূপে বাঁচিয়া

উঠে, ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনে তাহাদের নিকটই বা কি আশা করিতে পারা যায় এবং তাহাদের জনক জননীর নিকটেই বা দেশ কি আশা করিতে পারে? অনাহারে, অনিদ্রায় নিজেরা না খাইয়া প্রাণের পুত্তলিসম নিজের সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া, সে দুঃখ কষ্ট মোচন করিবার নিজেদের কোনও ক্ষমতা নাই বুঝিয়া পিতা মাতার প্রাণের আকুল বেদনা, নীরব কাতর ক্রন্দন কয়জনে শুনিতে পায়, কয়জনই বা তাহা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে। অন্ন-বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শান্তি ও আনন্দের এই মহা দুর্ভিক্ষ বঙ্গের শতকরা ৯৫ জন গৃহস্থের ঘরে নিত্য বিরাজ করিতেছে। ইহার উপর সমাজের পাশবিক অত্যাচার রাক্ষসের ন্যায় লোল জিহ্বা বাহির করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক পিতা মাতার নিকট উভয়ই পরম শান্তির, পরম আহ্লাদের জিনিষ। দুঃখ, কষ্ট, অপমান, সব ভুলিয়া যায় পিতামাতা তাহাদের সন্তানের হাসি-মুখ দেখিয়া। কিন্তু সমাজের এই পাশবিক অত্যাচারের ফলে কন্যা পিতামাতার নিকট আনন্দের পাত্রী হওয়া দূরে থাকুক একটা গলগ্রহ, একটা অভিসম্পাত স্বরূপ বিবেচিত হয়। জন্ম গ্রহণের পরদিন হইতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মুখপানে চাহিয়া পিতামাতার গায়ের রক্ত শুকাইয়া জল হইয়া যায়। কি যে এক মহা দুশ্চিন্তা তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে বহিতে থাকে এক ভুক্ত-ভোগীই তাহা জানেন। যাঁহাদের ২।৩টী কন্যা আছে তাঁহাদের তো কথাই নাই, বিশ্বের সমস্ত আনন্দ শান্তি হইতে চির-দিনের-মত নির্ব্বাসিত। কোথায় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের অধিকার-ভোগের চিন্তা ও চেষ্টা, কোথায় বা বাঁচিবার আকাঙ্খা—লোক চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারিলেই তাঁহারা যেন নিশ্বাস ফেলিয়া একটু সুস্থ হন। বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণটাই তাঁহাদের যেন বেশী সুখের মনে হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের গড় আয় বোধ হয় মাসিক ৪০।৫০৲ টাকার উপর কিছুতেই যায় না। এই সামান্য আয় হইতে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া এক-একটী কন্যার বিবাহের পণের টাকা অন্ততঃ ১৫০০৲।১৬০০৲ রাখা চাই-ই, নতুবা সমাজে তাঁহাদের স্থান নাই! কি ভীষণ কলঙ্কের কথা!! কি উপায়ে যে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহাতো কল্পনায়ও আনা যায় না। জাতীয় জীবনের ইহা কি ভয়ঙ্কর অধঃপতনের লক্ষণ। এ মহা পাপের প্রতিকারের চেষ্টা সকলেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য নয় কি? এ জাতীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? আমাদের বর্ত্তমান সমাজকেই ইহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে!! পাপের সঙ্গত্যাগ—যে পাপ আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের অন্তরায় স্বরূপ তাহার সমূলে বিনাশের চেষ্টা করা কি সহযোগী, কি অসহযোগী; জাতীয় জীবনের উন্নতি যাঁহাদের কামনার বস্তু, সাধনার ধন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এ পাপের চিহ্ন যাহাতে সমাজের অঙ্গ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় তাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন করা সকলেরই উচিত। বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায় যথেষ্ট আছে স্বীকার করি, তবে সাধনায় সিদ্ধি আছে এ কথাও ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

মহাত্মার আদেশে অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অনেক যুবককে স্কুল কলেজ ছাড়িতে দেখিলাম, অনেকের অদম্য উৎসাহ, কর্ত্তব্য-

পরায়ণতা, বিপদে ধৈর্য্য ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার অদ্ভুত শক্তিও দেখিলাম, আত্ম-ত্যাগের আদর্শেও অনেকে চমৎকৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার মধ্যে যাহাদের ২।১ জনের বিবাহ হইতে দেখিলাম এ পাপ পণ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহাদের একটি কথাও বলিতে শুনিলাম না। শান্ত শিষ্ট বালকটীর মত, পিতামাতার ধীর আজ্ঞাবাহী সুবোধ সন্তানের ন্যায় স্বীয় ভাবী আত্মীয়ের যথাসর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্য তাঁহাদের প্রাণের শান্তি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদের কন্যাটীকে নিজের সহধর্ম্মিণীরূপে বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!! শিক্ষিত মার্জ্জিত বুদ্ধি দেশের গৌরবস্বরূপ যুবকগণের পক্ষে ইহা কি কম লজ্জার কথা!! তাঁহাদেরও কি এ বিষয়ে চৈতন্য হইবে না? তাঁহারাও কি স্বার্থের মোহে জড়িত হইয়া দেশকে চিরশৃঙ্খলপাশে বাঁধিয়া রাখিতে সাহায্য করিয়াই যাইবেন। তবে কোথায় রহিল তাঁহাদের এই পুণ্য অসহযোগ ব্রত গ্রহণ? যে পাপ আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া ঘরে আনিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। পিতা, পিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের আশা ভরসা, দেশের গৌরব স্বরূপ হে যুবকগণ! তোমাদিগকেই করিতে হইবে। ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মরণোন্মুখ তোমার এই মাতৃভূমিকে আবার তোমাদিগকেই বাঁচাইতে হইবে। যদি এ পাপের স্রোত সমাজে সম ভাবেই বহিয়া চলে জানিও তোমরাই তাহার জন্য দায়ী—জাতীয় অবনতির সাহায্যকারীরূপে তোমরাই ভগবানের নিকট অপরাধিরূপে দাঁড়াইবে। বাক্যের সময় গিয়াছে, এখন প্রকৃত কাজের সময় আসিয়াছে। সময় থাকিতে এখনও সাবধান হও নতুবা বিলম্বে সব নষ্ট হইবে।

অভাগিনী

[৺মোক্ষদা কুমার বসু]

"ওলো সই, ওলো সই!
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের
কথা কই!

* * * * *

তোদের আছে মনের কথা, আমার
আছে কই!
আমি কি বলিব কার কথা, কোন্ সুখ,
কোন্ ব্যথা,
নাই কথা তবু সাধ শত কথা কই!

বেচারী একটু হাসাহাসি করিয়াছিল—সমবয়স্কাদের সঙ্গে একটু জল ছিটাছিটি করিয়াছিল মাত্র—চতুর্দ্দিক হইতে গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। পুরুষ আত্মীয়েরা (তাঁহারা যুবক, হাসি আমোদের বয়স উত্তীর্ণ বৃদ্ধ নহেন,) ননদ ও শাশুড়ী শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়া এমন করিয়া কটু উক্তি

করিতে লাগিল—ভগবান্ যাহাকে নিজেই বাণবিদ্ধ করিয়াছেন তাহাকে আবার তাহার মন্দভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এমন করিয়া পোড়াইতে লাগিল যে, একটু যাহার সহৃদয়তা আছে তাহারই এ দৃশ্যে কষ্ট না হইয়া পারে না। সে কুলবধূ, তাহার কথাটি বলিবার সাধ্য নাই—সৌভাগ্য, মুখে অবগুণ্ঠনের সৃষ্টি হইয়াছিল—সে বিষাদ-ক্লিষ্ট দুঃখ-জর্জ্জরিত মুখ কাহাকেও দেখাইতে হয় না। সে নীরবে ছোটবড় সকলের তিরস্কার সহ্য করিবে, একদিন নয়, দুইদিন নয়, যতদিন বাঁচিবে ততদিন—ইহাই তাহার নিয়তি! তাহার সমপ্রাণা সমবয়স্কাদের মুখে শুনিয়াছি, সময়ে অসময়ে তাহার মুখের উপরেই বলে "আমার ভাইকেত খাইয়া বসিয়াছিস্ ইত্যাদি"—তাহারই ভাই, আর হতভাগিনীর যে যথাসর্ব্বস্ব তাহা আর জ্ঞান নাই। সুন্দরী যুবতী সবে মাত্র ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষীয়া—ইহার মধ্যেইত সে সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছে।

হিন্দু বিধবার প্রাণের জ্বালাত আছেই, তাহার উপরে আহার বিহার পরিধান সামাজিকতা আদর অভ্যর্থনা সকল বিষয়েই তাহার সুখের কপালে ছাই পড়িয়াছে। সরু পাড়ের একখানা কাপড় পরণে, হাতে দু'গাছা মাত্র স্বর্ণ বলয়— ইহাও কত অনিচ্ছায়, কত কষ্টে, কেবল মাত্র আত্মীয়দের চক্ষুর জলের খাতিরে ধারণ করিয়া আছে— নীরবে সকল গৃহকার্য্য করিতেছে, হাসি মুখে সকল কাজে যোগ দিতেছে, মুখে মৃদুহাসি লাগিয়াই রহিয়াছে, সংসারের কাহারও সহানুভূতি আকর্ষিত হইবার অবসরও দিতেছে না, নিজের দুঃখ অন্যকে বুঝিবার একটুও সুবিধা দিতেছে না, নীরবে একাকী নিজ দুঃখ বহন করিতেছে। কতদিন দেখা গিয়াছে বর্ষীয়সী কোন আত্মীয়া ঘুমাইয়াছেন, হতভাগিনী নিকটে বসিয়া বাতাস করিতেছে, এদিকে দরদরধারে অশ্রু গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে—যখন নিতান্ত অসহনীয় হইল, হঠাৎ উঠিয়া যাইয়া ছাদে বসিয়া অনেকক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মনের বোঝা কিছু পাতলা করিয়া আসিল। একজন প্রিয় সখী ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল সেও সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বসিয়া সমবেদনার অশ্রু ত্যাগ করিল।—এ সমবেদনা কোমল নারী হৃদয়েই সম্ভব। কোন অভিভাবিকার সঙ্গে দুঃখিনী রাত্রিতে শয়ন করে—তিনি একদিন রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া দেখেন সরলহৃদয়া বালিকা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে, সকলের নিদ্রার আড়ালে, নিজের নির্জ্জনতা—নিজের আপনারজনবিহীনতা, গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়া বুক ভাসিয়া অশ্রু প্রবাহ ছুটিতেছে। দুই চারি দিন মাত্র এরূপ ধরা পড়িয়াছে—কিন্তু কতদিন যে এরূপ বিনিদ্র রজনী সে যাপন করে, চক্ষুর জলে নিজ অঞ্চল এবং উপাধান ভিজাইয়া ফেলে তাহা কে জানে—আর কেহ বা জানিতে চায়? বালিকার বক্ষে যে বজ্র পাত হইয়াছে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইলেও ভালই ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া শেল-বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় চিরজীবন ছটফট্ করিতে হইবে। নির্ম্মম সংসার—এমন দুঃখীর উপরও বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না! বেচারী দুরন্ত ননদিনীর দুরন্ত শিশু পুত্রকেই কোলে করিয়া, দ্বিপ্রহরের রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য,

শুইয়া রহিয়াছে—অথচ ঘরের অপর পার্শ্বেই শুনিতে পাইতেছে সেই ননদিনীই শ্লেষপূর্ণ ভাষায় বিষমাখা স্বরে বলিতেছে, "ও কোথায় রোজ রোজ দুইপ্রহরে যায় কিছুই বুঝি না, একদিনও দেখিতে পাই না," ইত্যাদি। এসব স্বকর্ণে শুনিয়া তাহার হৃদয় কি হইয়া যায় কে বুঝিবে? বিদগ্ধ শেলের উপর আবার নির্ম্মমতার নিদারুণ বাণ। আর সবে মাত্র জীবন আরম্ভ—আহা, এই বালিকা কেমন করিয়া এই বিষম দুঃখের বোঝা লইয়া একেবারে একাকী কাহারও সহানুভূতি না পাইয়া, এ সংসারের প্রতিকূল স্রোতে বাহিয়া যাইবে? ভগবান, তুমিই একমাত্র সহায়। ইচ্ছা করে, সকলে মমতা ও স্নেহধারায় হতভাগিনীকে অভিষিক্ত করিয়া রাখুক। সকলে তাহাকে অত্যধিক আদর যত্ন করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করুক। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? উত্তাল-তরঙ্গ বেগ কি বালির বাঁধে আটকাইতে পারে? তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দোষ কি?

হিন্দু রমণীদিগকে আমরা অবলা বলি—কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে যে বলের পরিচয় পাই তাহার নিকটে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরেরও মাথা হেঁট হইতে হয়। আমরা পুরুষ, সামান্য একটু প্রিয়জন বিচ্ছেদে অধীর হইয়া যাই, কত বই লিখি, কত প্রকারে লোকের সহানুভূতি লাভ করি, ভিক্ষা করি—কিন্তু এই এক একটি কচি প্রাণের আমরণ নীরব আত্মবিসর্জ্জন ও বুকে পাষাণের বোঝা লইয়া অম্লান বদনে সংসারে চলিয়া বেড়াইবার কথা ভাবত? বাস্তবিক হিন্দুরমণীর আদর্শ লইয়া যদি জীবন গঠন করিতে পারিতাম তবে জীবন ধন্য হইয়া যাইত। অথবা কষ্টসহিষ্ণুতা, অথবা বর্ত্তমান অবস্থায় নিজেকে নামাইয়া লওয়া—কত লক্ষপতির কন্যা দরিদ্রের গৃহে বিবাহিত হইয়া সচ্ছন্দে ও সানন্দে দিন কাটাইতেছে, গরিবের বধূর মতই দিবা রাত্রি সংসারের জন্য খাটিতেছে—এবং সুখে দুঃখে প্রায় সমভাব, এই সকল যদি জীবনে পাইতাম তবেত বহু তপস্যার ফল ফলিত। সাধারণ একটি হিন্দুরমণীর জীবনে যে ত্যাগ স্বীকার, নিঃস্বার্থতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা আছে তাহা কয়জন সাধনশীল সন্ন্যাসী তপস্যার অন্তে লাভ করিতে পারে, জানিনা। আহা এই হতভাগিনীর গণ্ড বাহিয়া দুঃখাশ্রুর পরিবর্ত্তে যেদিন ভক্তি পরিপ্লুত হৃদয়ের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইবে, সেদিন তাহার পক্ষে কি শুভ দিন।

গৃহকার্য্য উপলক্ষে নিকটে চলাফিরা করিতে দেখিতে পাই—সাধ হয় নিকটে বসাইয়া তাহার দুঃখদীর্ণ হৃদয়ের দুটী কথা শুনি—নিজের সমস্ত প্রাণের সমবেদনা ঢালিয়া দিয়া তাহার দুঃখ কথঞ্চিৎ লাঘব করি, অন্তত. তাহার দুঃখে দুঃখ পায় এমন জনও পৃথিবীতে আছে ইহা জানাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু সামাজিক নিয়ম অনুসারে ইহা নিষিদ্ধ ব্যাপার—কাজেই হইতে পারে না। তাহার সহিত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ, অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ খানা দেখাও নিয়ম বিরুদ্ধ—কেবল দেখিতে পাওয়া যায়, বাষ্পভারাক্রান্ত একখানা মেঘের ন্যায়, শিশিরভারনম্র একটি পুষ্পের ন্যায় সংসারের একটি গৃহ কোণে মৃদুপাদ-বিক্ষেপে বালিকা বিচরণ করিতেছে অথবা জানালা খুলিয়া ঊর্দ্ধে শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনা বর্ষীয়সীরা বিধবাদের শরীরে কতই দুর্লক্ষণ

দেখিতে পায় এবং সেই জন্যই অকালে স্বামীকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করে—কিন্তু এমন দোষদর্শনশীলারাও এ তরুণী অভাগিনীর সুন্দর মন্থর গমনে, মৃদুমিষ্টভাষণে, গৃহকর্ম্মের শৃঙ্খলায় এবং হস্ত-পদাদির ও মুখখানার লাবণ্যপূর্ণ-শ্রীতে কোনই দুর্লক্ষণ দেখিতে পায় না। তবুও ত বেচারীর জীবনের সুকোমল যাহা কিছু তাহা সব পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। এই সব মনে করিয়া তোমরা আর কেহ তাহাকে বাক্যবাণে দগ্ধ করিও না—যতদূর সম্ভব স্নেহরসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া রাখ। সমবয়স্কারা যখন বাড়ীতে থাকে তাহাকে চেষ্টা করিয়া সমস্ত আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে হয়। কিন্তু তাহারা যখন চলিয়া যায় তখন আর তাহার অসুস্থ শরীরেও সাবধান হইতে বলিতে কেহ থাকে না। বালিকা ত মনে করে এ জীবন যত শীঘ্র যায় ততই ভাল।

তাহাকে কখনও নিজের দুঃখের কথা খুব প্রিয় সখীদের কাছেও উল্লেখ করিতে শোনা যায় নাই। কদাচিৎ কখনও বা সমদুঃখসম্পন্না কোন বালিকাকে দেখিয়া একটু দুঃখ প্রকাশ করে—কিম্বা প্রিয় বয়স্যারা যদি কখনও কটুকথা দ্বারা প্রাণে আঘাত দেয় তাহার উত্তরে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা একটু উল্লেখ করে মাত্র—আর কিছুই নহে। কোন দুঃখ কষ্টের কথা যদি কেহ তোলে তবে সে বলে, "দুঃখ সহ্য করা আর কঠিন কি? করিলেই হইল।"—

বিজয়ার দিন বাড়ীর সকলেই ঘরে ঘরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড়—কেহ বারানসী, কেহ গরদ, কেহ পার্শী-সাড়ি, কেহ ভাল ঢাকাই, অন্তত একখানা নূতন কাপড় পরিয়া—সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মা দশভুজার নিকট বিদায় লইতে যায়—তাঁহার চরণ বন্দনা করে, নানা রকম করিয়া প্রাণের ভক্তি ও মমতা জানাইয়া এক বৎসরের জন্য এই দেবী অতিথিকে বিদায় দেয়, পায় সিঁদুর দেয় আরও কত কিছু স্ত্রী আচার করে। স্বামী বিয়োগের পর এই দুঃখিনীর এই প্রথম পূজা এবং প্রথম বিজয়া। সাধারণতঃ দেখা যায় এই সব পর্ব্বের সময় শোকার্ত্তাদের শোক উথলিয়া উঠে এবং তাহারা খুব কাঁদা কাটি করে—কিন্তু তাহাকে কিছুই করিতে দেখা যায় নাই অর্থাৎ তাহার অশ্রু বিসর্জ্জন লোকচক্ষু গোচর হয় নাই—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার লঘুহৃদয়া স্বামীগৃহের আত্মীয়ারা যদি তাহাকে হৃদয়হীনা বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তবে বড়ই ভুল করিয়াছে—গভীর শোকের অন্তঃস্তলবাহিনী দুঃখস্রোতের প্রবাহ কয়জন বুঝিতে পারে—এমন সহৃদয় কয়জন পাওয়া যায়। সেই বিজয়ার দিন যখন সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী ভগবতীর পদধূলি লইয়া একবৎসরের জন্য মাকে পিতৃগৃহ হইতে বিদায় দিতে চলিলেন তখন এই দুঃখিনীকেও সঙ্গে যাইতে বলা হইল, অনুরোধ করা হইল, টানাটানি করা হইল—কিন্তু কিছুতেই সে যাইবে না। সে সংক্ষেপ প্রত্যহ সকল নিয়মিত আমোদ আহ্লাদের কাজে সকলের সঙ্গে যোগ দেয়—তাহার নিকট আজ অভিভাবকেরা, বয়স্যারা সকলেই হার মানিল; সে কোন্ মুখে যাইবে, এই মঙ্গল ব্যাপারে কেমন করিয়া একখানা কালো মেঘের মত সে সঙ্গে সঙ্গে যাইবে? গতবৎসর বিজয়ার দিন তাহার মনে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত গর্ব ছিল—আর আজ? সবে মাত্র মুকুলিত লতিকা—এই দু'দিনেই একেবারে মূলচ্ছেদ হইয়া

ধূল্যবলুণ্ঠিতা—শুকাইয়া মলিন! আজ হৃদয়ে কোন্ কথা লইয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? শোকদগ্ধ ভস্মরাশি লইয়া দেবীর শ্রীচরণে উপস্থিত হইবে? এরূপ জ্বলন্ত অঙ্গার হৃদয়ে বহন করিয়া কি মঙ্গলালয়া ভগবতীর পদপ্রান্তে যাইতে ইচ্ছা হয়? বেচারাকে ফেলিয়া তাহার একজন অতিপ্রিয় সমবয়স্কাও গেল না—উভয়েরই চক্ষু আর্দ্র—জলভারে অবনত। এবার বেচারাকে হারিতে হইল। বয়স্যা তাহার জন্য এই বৎসরকার দিনে মঙ্গল কাজ হইতে বিরতা থাকিল দেখিয়া, নিজেও যাইতে প্রস্তুত হইল। নিজের দুঃখ নিজেই বহিবে, তাহার জন্য অন্যের সুখ অনুমাত্রও কমিবে, ইহা সে সহ্য করিতে পারে না। একখানা সূক্ষ্মপাড়বিশিষ্ট সাদা গরদ পরিধান করিল,—হাতে যে স্বর্ণবলয়রূপ বিলাসের চিহ্ন এখনও সে কত কষ্টে, কত হৃদয়বেদনা চাপিয়া, কেবল আত্মীয়দের মনের দিকে চাহিয়া ধারণ করিতেছে, যাহা কণ্টকের মত তাহার শরীরে বিঁধে তাহা প্রকোষ্ঠ হইতে যতদূর সম্ভব উপরে টানিয়া তুলিল, তাহা পরিধেয় বসন দ্বারা ভাল করিয়া ঢাকিল—সম্পূর্ণ বিধবার বেশে দেবীচরণে উপস্থিত হইল।

তাহার ত জীবন ভরাই দুঃখ—সামান্য দুই একটি দৈনন্দিন ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার দুঃখরাশির কতটুকুই বা বুঝাইতে পারিব?

কেমন করিয়া সমস্ত জীবন ভরিয়া প্রিয়জন হীনতার কষ্ট সহ্য করিবে? সংসারের মধ্যে থাকিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রিয়জন সম্ভাষণ ইত্যাদি দেখিয়া—দিবারাত্রি এ তুষানল লইয়া কেমন করিয়া দিন গণিবে? কখনও কখনও মনে যখন বড়ই উদাস ভাব আসে তখন মানুষ কল্পনা করে কত কি। দূরে কোন প্রকৃতির শোভাপূর্ণ স্থানে অথবা গঙ্গার তীরে বাস করিবে। এই কল্পনাতেও মন কেমন করিয়া উঠে। মানুষ মনে করে, নিজের তো তেমন সম্পূর্ণ অধিকার কাহারও উপর নাই—তথাপিও ঐ যে ছিটা ফোঁটা এখানে ওখানে সে পায়—সেইটুকু হইতে দূরে চলিয়া যাইবে—ইহা ভাবিতেই মনটা কেমন করে। অথচ আমরা পুরুষ, আমাদের কত কাজ, কত ভ্রমণের স্থান কত চিত্তবিনোদের উপায় আছে। কিন্তু, গৃহকোণ-আবদ্ধা বালবিধবার জীবনব্যাপী কি ভীষণ যন্ত্রণা। জীবনপ্রারম্ভেই, আকাশের বিজলীর ন্যায় সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতেই সকল চুকিয়া গেল! এখন ঐ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া—সুখের মোহনদৃশ্যের ছবি মনে লইয়া চিরকাল জ্বলিতে পুড়িতে থাকুক। এ দুঃখ কে বুঝিবে?

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

(১)

এস, মানব, তোমার দেবতা এই আবাস নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দেখ পাখীদের জাগিয়ে দিয়ে, কুসুম কলিকে ফুটিয়ে দিয়ে, সমস্ত প্রকৃতিকে রমণীয় করে সুহাসিনী উষাসুন্দরী তোমাকে ডাকছেন। ফল-ভারাবনত গাছগুলি সুন্দর সুমধুর ফল নিয়ে, নদী স্বচ্ছ নির্ম্মল জল নিয়ে তোমাকে উপহার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সৃষ্টির প্রত্যূষে দেবদূত এই বলে নবসৃষ্ট আদিম মানবকে প্রকৃতির রাজ্যে স্থাপন করলেন। কিন্তু দিনের সৌন্দর্য্য রাত্রে মলিন হয়ে যায়; রাত্রির শোভা দিনে বিলীন হয়ে যায়। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অসম্পূর্ণতা পূরণ করে, প্রতিক্ষণ তার নবতা বিধান করে, সুন্দরকে সুন্দরতর করে, সেই নব মানবকে প্রীতি দেবার জন্যে একটি প্রেমসরসহৃদয়া নারী তাঁর আবাসে এলেন।

(২)

একদিন দেবদূত এসে ডাকলেন, "আদম" আদম কুটীরের বাইরে এলেন না। দূত ডাকলেন, "হবা"। হবা লজ্জায় জড়সড় হয়ে বাইরে এসে দূতের সম্মুখে দাঁড়ালেন। দূত দেখলেন হবা দিগ্‌বসন ত্যাগ করে পত্রবসন পরিধান করেছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন আদমও পত্রবসনে লজ্জা নিবারণ করছেন এবং সাহস করে তাঁহার সম্মুখে আসতে পারছেন না। দূতের আদেশে হবা আদমকে বাইরে আসতে বললেন। আদম লজ্জায় ভয়ে অতি কুণ্ঠিত হয়ে দূতের সম্মুখীন হলেন। দূত সব দেখলেন, শুনলেন বুঝলেন যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটেছে—শয়তান এই মানবদম্পতীকে প্রলুব্ধ করে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়েছে। দেবদূত বললেন "যে ফল কেবল দেবভোগ্য যা মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ, সেই ফল তোমরা খেয়েছ, তার জন্যে তোমরা সবংশে পাপতাপ মৃত্যুর অধীন হবে।"

(৩)

কত সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে। মানব সন্ততি কত দেশ দেশান্তরে বাস করছে। তাদের মধ্যে কত বর্ণভেদ হয়েছে, শ্রেণী বিভাগ হয়েছে। এক শ্রেণী ইন্দ্রিয় পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করছে আর এক শ্রেণী পরান্নপুষ্ট। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যারা বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে বা উভয়বলে বলবান তারা দেশকালের সুবিধা বুঝে বসুন্ধরাকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করে অধিকার করে নিয়েছে এবং সেই অধিকারে প্রমত্ত হয়ে বলহীনের ওপর প্রভুত্ব করছে। পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন, সমস্ত সুখ সাচ্ছন্দ্য, সমস্ত আনন্দ তাহাদেরই। আর যারা এই সকলের উপকরণ উৎপাদন করছে তারা নিজের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত, তারা দরিদ্র, দীন, দুঃখী নিরানন্দ।

[৪]

এই দীন দরিদ্রের দুঃখে বিগলিতহৃদয় এক সন্ন্যাসী পশ্চিমদেশে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করলেন ধন ঐশ্বর্য্য কিছু নয়। ওরা ইহ কালে অনিত্য, পরকালে স্বর্গের দ্বার-রোধক। তিনি বললেন সূচের ছিদ্রে উটের প্রবেশের চেয়েও স্বর্গদ্বারে ধনীর প্রবেশ কঠিন। তিনি উপদেশ দিলেন "তোমরা প্রতিবেশীকে আপনার মত ভাল বাস।" কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না। যারা ধন সম্পত্তি প্রভুত্বশালী, যারা আভিজাত্যা-ভিমানী, তারা যীশুর এ উপদেশ কর্ণপাত করলে না। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হল না। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, বর্ণে বর্ণে, মানুষে মানুষে বিদ্বেষের আগুণ শান্তিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে।

[৫]

অভিজাতবর্গ অতি বিজ্ঞতার সহিত বলেন এ সমস্ত অনিষ্টের মূল হচ্ছে দীন দরিদ্রগুলার দুর্ব্বুদ্ধি। তারা বুঝতে পারছে না যে ধনীরা কৃপাপরবশ হয়ে তাদেকে প্রতিপালন করছেন, কারণ ইচ্ছা করলে তাঁরা তাদেকে প্রতিপালন নাও করতে পারেন। দরিদ্রেরা বলে তাদেরই শ্রমোৎপন্ন ধনে প্রভুর প্রভুত্ব, ধনীর ধনীত্ব, অভিজাতের আভিজাত্য। তাঁরা বলেন সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে প্রথম মানবদম্পতী পৃথিবীতে পাপতাপ মৃত্যু এনেছে। এখন তাদের সন্ততি যে তাদের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগটা যথাযথরূপে করছে, তাই দেখবার জন্যে দেবতা অভিজাতবর্গকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তাঁরা সুখের হর্ম্ম্যে বসে দুঃখের কুটীরের ক্রন্দন শোনেন এবং বলেন দরিদ্রের দুঃখ অপরিহার্য্য ও অপ্রতি-কার্য্য। আর এই অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধতম করে দেবার জন্যে সেই ধনসম্পত্তিপ্রভুত্ব পরায়ণ স্বাধিকারপ্রমত্ত অভিজাতবর্গ বিধি নিষেধের শাসনমন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। এই শাসনপীড়িত দরিদ্র এখন আবার কাতর হৃদয়ে তাদের দুঃখ নিবেদন করছে তাঁরই কাছে যিনি একবার পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন এবং যাঁর প্রথম শিষ্যেরা গণতন্ত্রবাদের অগ্রদূত ছিলেন। বুভুক্ষিত শ্রমজীবী বলছে "ধনী আমাদেকে ক্রীতদাস করে রাখতে চান, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনটাও পূর্ণমাত্রায় দিতে চান না।" অনেকে বলছে "প্রভুর কাছে আমাদের ক্রন্দন বোধ হয় পৌঁছায় না, পৌঁছুলে কি আর প্রতিকার হয় না?" [১]

[৬]

বলা বাহুল্য দরিদ্রাবাসকে অবিদ্যাচ্ছন্ন অচলায়তন করে রাখাই এই অহংকৃত অভিজাতদের উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিব্যক্তি-শীল প্রকৃতির নিয়মে কোন আয়তনই অচল থাকে না। অভিজাতবর্গনির্দ্দিষ্ট দরিদ্রের অবিদ্যার আয়তনও চিরকাল অচল থাকল না। কালের প্রভাবে তা জীর্ণ,

---

Some have been "fair wonderin' whether Jesus Christ been Bolshie, were 'e 'ere the noo"

"for all of us are fair un'appy. tis the capitalists that own us workin clawses, but they do nae feed us"—ওয়েলসের কয়লা খনির শ্রমজীবীদের কথা, ওয়েলস ভাষায়।—full up and fed up by Whiling Williams.

দীর্ণ হয়ে গেল। অতি ক্ষীণভাবে হলেও এখন তাতে বিদ্যার আলো প্রবেশ করছে। দরিদ্র এখন বুঝতে আরম্ভ করছে যে সে মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে সমানাধিকার-বিশিষ্ট এবং সর্ব্ব বিষয়ে সেই সমানাধিকার স্থাপন করবার জন্যে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করেছে। সে বুঝতে পারছে যে তার মনুষ্যত্ব বিলোপী দৈন্যের মূল তার দারিদ্র্যদুঃখ। এই দারিদ্র্যদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ। তাই দেশজাতি-ধর্ম্মনির্বিশেষে পৃথিবীর দীনদরিদ্র এই অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্জ্জন করবার জন্যে সম্মিলিত হচ্ছে।

[৭]

অবস্থা দেখে শুনে অভিজাতবর্গ বলছেন শয়তান আবার আজিতেতর [agitator] রূপে অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রকে সেই নিষিদ্ধ জ্ঞান বৃক্ষের ফলে প্রলুব্ধ করেছে। দরিদ্র জানতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে "জ্ঞানান্মুক্তিঃ।"

[৮]

যে সন্ন্যাসী পৃথিবীতে শান্তি এবং মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করবার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হয়ে মর্ত্ত্য লোক থেকে অন্তর্দ্ধান করেছিলেন সেই সন্ন্যাসী আবার অভিজাতদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে দৈববাণী করছেন "অনুতাপ কর, নতুবা তোমাদের ধ্বংস অবধারিত [Repent ye or ye shall perish]"

প্রেম

[শ্রীবিষ্ণুরাত সেন]

তোমার আমার প্রেম কি ক্ষণিক, নহে কি মরণ হীন.
এই প্রাণভরা অনুরাগ বুঝি রবে নাগো চিরদিন!
আয়ু যদি তার এক পল হয়,
তবু সেই পল বড় মধুময়;
তারে প্রাণপন করিবরে ভোগ;
হোক সে ক্ষণিক ক্ষীণ!

অস্থায়ী এই ফুলের গন্ধ, অস্থায়ী এই গান,
ক্ষণিক ক্ষণিক সব সুখ দুখ, ক্ষণিক ক্ষণিক প্রাণ;
এই যে দু'দিন কাছে কাছে আসা;
এই যে মিলন এই ভাল বাসা,
হয় যদি হোক মোহের স্বপন,
স্বপনে রহিব লীন।

অবন্তি

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়]

মধ্য ভারতকে বিভক্ত করিয়া বিন্ধ্যগিরি যে অসমান ও বিচিত্র ভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে তাহার মধ্যে মধ্যে অনেক সমতল ভূমি ও উপত্যকা আছে। ইহার মধ্যে একটি উপত্যকার নাম মালওয়া। ইহার আয়তন ৩৫,০০০ বর্গ মাইল। মালওয়া নামেরই অর্থ উপত্যকা। নীচে নীমার অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্র। মালওয়া উপত্যকা নাতিশীতোষ্ণ, গ্রীষ্মের সময়ও ইহার রাত্রি সুশীতল। এই উপত্যকাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে নর্ম্মদা। মালওয়ার ভিতর নর্ম্মদা অত্যন্ত ক্ষীণগতি। দুই পার্শ্বের উচ্চ গিরি, কানন অতিক্রম করিয়া সে মনোরম দৃশ্য ও পবিত্র তীর্থ সৃজন করিয়া চলিয়াছে অতি লঘু অতি বঙ্কিম গতিতে। নর্ম্মদা তীরে যেখানে ঋষিরা পর্ব্বত গুহায় তপস্যা করিতেন সেখানে পুরাতন অবন্তি রাজ্য। যেখানে রেলপথ বিন্ধ্য গিরি লঙ্ঘন করিতে করিতে নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছে সেই খানে মর্ত্তকা ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে অমরেশ্বর। অমরেশ্বরের পবিত্র তীর্থ ওঙ্কার নাথ অবন্তির সর্ব্বপুরাতন স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া আজও তীর্থযাত্রীকে আহ্বান করিতেছে। সে স্মৃতি পুরাণের। পুরাণে আছে ঐ দেশের রাজা ছিলেন কার্ত্তবীর্য্য, দেশের নাম ছিল হৈহয় অথবা অনুপদেশ। পরশুরামের হস্তে তিনি নিপতিত হ'ন। বৌদ্ধেরা ইহাকে মাহিষ্মতী বলিতেন। দীঘনিকায়ে আছে মাহিষ্মতী অবন্তির রাজধানী। অর্থ শাস্ত্রে ঐ দেশকে মহীশ বলা হইয়াছে। ইতিহাসের আরম্ভে ওঁকার নাথকে সাক্ষী করিয়া মহীশ-ক্ষেত্রে নর্ম্মদার গিরি উপকূলে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের কত যে উত্থান পতনের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে তাহা কে জানে। আজও ঐখানে এক স্বাধীন জঙ্গলী রাজা অধিষ্ঠিত। লিঙ্গপুরাণে আছে,—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমরেশ্বরে॥

ওঙ্কারনাথ যে পর্ব্বতে বিরাজ করিতেছেন, সে পর্ব্বতের নাম মান্ধাতা। উহাকে চারিদিকেই নদী রেবা অথবা নর্ম্মদা এবং কাবেরী ঘিরিয়া রহিয়াছে। নর্ম্মদা সেখানে অতি গভীর। হঠাৎ নদীতীর হইতে বিন্ধ্যগিরি মাথা তুলিয়াছে বলিয়া এবং নদী ঋজুপথ-বাহিনী বলিয়া সেখানকার দৃশ্য অতি মনোরম। একটি অফুরন্ত জলপ্রবাহ শিব-লিঙ্গকে চির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মানুষের অপেক্ষা না করিয়া মহাদেব সেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেম বারির অঞ্জলি পাইতেছেন। মন্দিরের শিবলিঙ্গের সম্মুখে মান্ধাতার একটি মূর্ত্তি দেখা যায়। বিষ্ণু মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। ঐ দ্বীপের পূর্ব্ব সীমায় কালভৈরবের মন্দির। সেখানে পূর্ব্বে মনুষ্য বলি প্রদত্ত হইত। অনেকে মনে করেন এই মন্দির গুলি সর্ব্ব পুরাতন শৈব মন্দির।

রেল পথে মর্ত্তকায় উঠিয়া উজ্জয়নী যাইতে হয়। উজ্জয়িনী নিম্নভূমির অন্তর্গত। সেখানকার বর্ণনা কালিদাস যাহা করিয়াছেন তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ যে কালিদাসকে উজ্জয়িনীবাসী না বিশ্বাস করিয়া থাকা যায় না। নগরের মধ্য থানে মহাকালের মন্দির। নাটকে যাহাকে কালপ্রিয়নাথ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস মহাকালের উল্লেখ করিয়াছেন।

অসো মহাকাল নিকেতনস্থ।
বসন্ন দূরে কিল চন্দ্র মৌলেঃ॥

মেঘদূতে চণ্ডেশ্বরের বর্ণনা করিতে যাইয়া কালিদাস সন্ধ্যারতির ডম্বরুর মেঘ-গর্জ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন। চারিদিকে প্রাচীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়, তাহার নাম কোটীতীর্থ। সেই কোটীতীর্থে স্নান করিয়া রক্তজবা ও বিল্বপত্র হস্তে লইয়া একটি সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। সেই সুরঙ্গের নীচে মহাকাল বিরাজ করিতেছেন। উজ্জয়িনীতে জৈন দিগের প্রভাব বহু শতাব্দী ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র যেমন পাটলী-পুত্র সেইরূপ জৈনধর্ম্মের উজ্জয়নী ছিল। জৈনেরা বলেন মহাকালের মন্দির অবন্তীসুকুমাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধের সময় অবন্তির বিদ্যার খ্যাতি দেশ বিস্তৃত ছিল। অশোকের সময় উজ্জয়িনীর জ্যোতিষ বিদ্যা বহু দেশ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে আকর্ষণ করিত। যে নগর অবন্তিনাথের লীলা ভূমি ছিল, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বিদ্যার আধার ও আশ্রয় যাহার পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন তক্ষশীলার ন্যায় ছিল ভেষজ বিদ্যা, ভারতবর্ষের সপ্তপুরের মধ্যে যাহার প্রাধান্য, ভারতবর্ষের গ্রীনউইচ্ উজ্জয়িনী নগরীর এখন অতি হীন অবস্থা। প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সবই এখন ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। সিপ্রা মন্থর ও ঋজুগতিতে চলিয়াছে কিন্তু বিলাসের লীলা অথবা ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের চিহ্ন মাত্র নাই। রাজপথ সমূহ ধূলি ধূসর গ্রাম্য পথ অপেক্ষাও অনাদৃত। সিপ্রার প্রধান ঘাট রামঘাট। সেইখানে কুম্ভ মেলা বসে। অনতিদূরে সন্দিপনী মুনির আশ্রম যেখানে কৃষ্ণ-বলরাম ঋষির নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। ঋষির মূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত। সহর হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে ভর্ত্তৃহরির গুম্ফা। ভর্ত্তৃহরি এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ভর্ত্তৃহরি শাস্ত্র এবং বৈরাগ্যশতক প্রণেতা। তিনি সাতবার বৌদ্ধ শ্রমণ হইয়াছিলেন এবং সাতবার সংসারে ফিরিয়াছিলেন। সিপ্রা তটের শস্য ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া এই গুহার নিকট আসিতে হয়। গুহার নীচে দুইতলায় অনেকগুলি ঘর। পাথরের থামে নিম্নের প্রকোষ্ঠগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি গুহার সহিত চুনারের গুহার সম্বন্ধ আছে, এই আখ্যায়িকা চলিত। ভর্ত্তৃহরি চুনারেও অনেককাল ছিলেন। সেইখানেই তাঁহার রাজধানী। তিনি ৬৫১—৬৩২ পূঃ জীবন কাটাইয়াছিলেন।

হরগুদ্ধির মন্দির অতি বিখ্যাত। বেতাল পঞ্চবিংশতি বলেন বিক্রমাদিত্য এইখানে প্রত্যহ তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড দেবীর নিকট বলি প্রদান করিতেন। দেবীর প্রসাদে প্রত্যহই আবার তিনি তাহা ফিরিয়া পাইতেন। নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে রাজা জয় সিংহের মানমন্দির। ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্বে হিন্দুদিগের জ্যোতিষ গণনা হইত। উজ্জয়িনীর ইতিহাস অতি পুরাতন ও বিচিত্র ইতিহাস।

খ্রীঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে অশোক এখানে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার পিতা রাজা বিন্দুসারের প্রতিনিধি। এইখানেই তাঁহার পুত্র মহীন্দ্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই স্থানকে তাঁহার রাজধানী করেন ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, এখানকার শক রাজা রুদ্রসিংহকে পরাজিত করিয়া। তাঁহার মুদ্রাতে একদিকে তিনি সিংহকে পরাজিত করিতেছেন মহারাজাধিরাজ শ্রী) লিখিত রহিয়াছে অপরদিকে সিংহবাহিনী। এই সিংহবাহিনী দেবী মূর্ত্তি উজ্জয়িনীর মন্দিরাভ্যন্তরেও দেখিয়া আসিলাম।

বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ধর্ম্মের উত্থান পতনের সহিত নগর লক্ষ্মীর কত রক্ত প্রবাহের অলক্ত-রাগ রঞ্জিত চরণের রেখা মুছিয়া গিয়াছে অথচ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সকলের কথন যে কে উজ্জয়িনীকে উজ্জ্বল করিয়াছিল তাহারও স্থির সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। শুধু আছে কেবল একটা পুরাতন কাব্য নাটকের বিলাস লীলার মোহ। প্রাচীন বিদ্যা ও বীর্য্যের লুপ্ত গরিমা অনাদৃত ঐশ্বর্য্যসম্ভারের ধ্বংসাবশেষ।

কালিদাসের লীলাকৌতুকময়ী বিলাসী-দিগের নগরে আজ আবার বিলাতি দ্রব্যের বাজার বসিয়াছে। কাপড়ের কলও বসিয়াছে। মোটর গাড়ী প্রত্যহ যাত্রী লইয়া রথঘর্ঘর শব্দে গোয়ালিয়রের দিকে ছুটে। তবুও কালিদাস বর্ণিত সিপ্রার অকলঙ্কিত জলে এখনও সেই অতীতের মায়া প্রতিবিম্বিত। সেই শীতল শীকরসংপৃক্ত সিপ্রার বাতাস এখনও সুশীতল বহিয়া মেঘদূতের মেঘের মত কত আধুনিক পর্য্যটকের ক্লান্তি বিনোদন করে। এখনও নগরের প্রাচীরবেষ্টিত বহু সরোবরে কালিদাস বর্ণিত রক্তপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া সুন্দরীর হস্তে চন্দ্রশেখরের নিকট অঞ্জলি দানের জন্য অপেক্ষা করে।

উজ্জয়িনীর অবস্থা হীন হইলে ধারা নগরী প্রসিদ্ধিলাভ করে। রাজা ভোজ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারই বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারই অসিধারা ধারা নগরীর নাম ও গৌরব দান করিয়াছিল। তাঁহার সভায় বিদ্বানের প্রভূত সম্মান ছিল। তিনি নিজে জ্যোতিষ, স্থপত-বিদ্যা, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের বুকের উপর এখন একটী মসজিদ দণ্ডায়মান। মুসলমানগণ ভোজের তৈয়ারী ব্যাকরণ নিয়ম অঙ্কিত শিলার উপর দিয়া নমাজ পড়িতে যায়। কাফেরের বিদ্যার উপর জেতার পদাঘাতের পরাকাষ্ঠা! অদূরে পীরের আস্তানা। এই ভোজ যেমন বিদ্যার গৌরবে প্রসিদ্ধ, তেমনি তিনি বাহু-বলেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবো-দয়ের প্রণেতা কালিদাস এবং প্রসন্নরাঘব প্রণেতা জয়দেব তাঁহার সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আবার তিনি কৃষকেরও সুখ দুঃখ বুঝিতেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি ভোজপুর হ্রদ। উপত্যকার জল রোধ করিয়া একটা প্রকাণ্ড ২৫০ বর্গ মাইল বিস্তৃত হ্রদ তিনি তাঁহার পূর্ত্ত বিভাগের দ্বারা খনন করাইয়াছিলেন। উহার ভিতর দিয়া এখন ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে রেলগাড়ী সজোরে ছুটিতেছে।

তখনও কিন্তু উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয় নাই। ভোজ মুঞ্জার ভাগিনেয় ছিলেন। মুঞ্জ। অবন্তীরাজকুল, পরামরদিগের সপ্তম রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ও উজ্জয়-নীর বিদ্যার গরিমা ভারতবিশ্রুত হইয়াছিল।

ভোজের সময় মুসলমানদিগের উপদ্রব খুব আরম্ভ হইয়াছে। গজনীর মাহমুদের সৈন্যের সহিত ভোজকেও লড়িতে হইয়াছে। এজন্যই বোধ হয় ভোজ ধারা নগরীতে রাজধানী লইয়া গিয়াছিলেন। ধারা নগরী উজ্জয়িনীর মত নিম্নভূমিতে নয়। বিন্ধ্যগিরিনিতম্বের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বসিয়া ভোজ বিদ্যাচর্চ্চার অবসর পাইতেন। তবুও তাঁহাকে ১০৬০ খৃষ্টাব্দে গুজরাট এবং চেদী রাজগণের নিকট আত্মসমর্পন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ ১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মুসলমানগণের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর যুগ-যুগান্তরের বিদ্যা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত পরামর কুলের রাজসভায় জ্বলিয়া আবার ধারা নগরীর বেষ্টনী পর্ব্বত বনকে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল করিয়া একেবারে অন্তরিত হইল। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে আলতামাস মালওয়া জয় করেন। তিনি উজ্জয়িনী নির্জ্জিত করিয়া মহাকালের মন্দির ভাঙ্গিয়া ১৩১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের করতলগত করেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লী হইতে নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক মালওয়া শাসিত হইত। ১৪০১ সালে দিলওয়ার আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ধারা নগরীতে তাঁহার রাজধানী আনেন। তাহার পরবর্ত্তী সুলতান হুসেন সা গুজরাট রাজ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া মাণ্ডুতে রাজধানী লইয়া যান। মাণ্ডু ধারা নগরী হইতে ২০ ক্রোশ মাত্র। চারিদিকে তাহার অতি গভীর খাদ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত। সেখানকার উচ্চ প্রাসাদে উঠিয়া উহার স্বাভাবিক আবেষ্টনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বহুদূরে নর্ম্মদার স্বচ্ছ প্রবাহ শুভ্র মালতী মালার মত দেখা যায়। সেখানে আর এক ইতিহাস গঠিত হইয়াছে তাহা বীর্য্যের, বিলাসিতার, কল্পনার মোহের ইতিহাস। সে ইতিহাস অবন্তীর পুরাতন রাজধানী মান্ধাতা সম্বন্ধে, উজ্জয়িনী বা ধারার ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবন্তির রাজলক্ষ্মী যুগ পরম্পরার মান্ধাতা, উজ্জয়িনী, ধারা, ও মাণ্ডু নগরীর অঙ্ক আশ্রয় করিয়া নর্ম্মদার জলে আপনার অতীত জীবন প্রতিবিম্বিত দেখিয়া আজ সেখানে বিজন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের আর্ত্তনাদের সহিত আপনার আর্ত্তনাদ মিশাইতেছে।

হে তেজঃস্বরূপ, আমায় তেজঃ দাও; হে বলস্বরূপ, আমায় বল দাও; হে বীর্য্য স্বরূপ, আমায় বীর্য্য দাও; হে ওজঃ স্বরূপ, আমায় ওজঃ দাও।

মাতিও ফাল্‌কনি

(*Prosper Merimee*'র ফরাসী গল্প হইতে)

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

পোর্টো ভেচিয়ো পার হইলে উত্তর-পশ্চিমদিকে একটী ছোট দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। জমিটা সেখানে খাড়াই। তিন ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিলে পাহাড় পর্ব্বত ও পরিখাসমাচ্ছন্ন প্রস্তরীভূত একটা যায়গায় পৌঁছানো যায়। সেই জঙ্গলাবৃত স্থানটী আইনবিদ্রোহীদের লুকাইবার পক্ষে বেশ মনোরম স্থান। কর্সিকার চাষারা জমিতে সার না দিয়া মাঝে মাঝে এইসব জঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অগ্নিসাৎ হইলে অবশ্য বিপদ, কিন্তু এই উপায়ে যে চাষ হইত তাহা সামান্য নয়। চাষ হইলে শস্য কাটা হইত; শস্য কাটা হইলে তাহার মূল হইতে পর বসন্তে আবার নূতন গাছ হইত। এই সাত আট ফিট উঁচু গাছে যে অনতিউচ্চ জঙ্গল হইত, তাহার মধ্যে পথ করিয়া লওয়া বড়ই শক্ত, সেই ঘন বনের অস্ত্রাঘাতেও মূলোচ্ছেদ হইত না, এই নিবিড় অরণ্যে গরু বাছুরও প্রবেশ করিতে পারিত না।

খুনী খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে এই বনের মধ্যে গোলাগুলি লইয়া আত্মগোপন করিতে পারিত। একটা বাদামী রংয়ের জামা ও শিরস্ত্রাণ পরিয়া গেলে আরও ভাল হইত। রাখালেরা আসামীকে ক্ষীর ও দুধ দিত, আইনের হাত হইতে বা হত-ব্যক্তির আত্মীয়গণের প্রতিহিংসার জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া খুনী ব্যক্তি সেই বনের ভিতর বেশ থাকিতে পারিত, কেবল রসদ ফুরাইয়া গেলে তাহাকে মাঝে মাঝে শহরে আসিয়া নূতন রসদ সংগ্রহ করিতে হইত।

১৮—সালে আমি যখন কর্সিকায় ছিলাম, তখন সেখানে মাতিও ফাল্‌কনি নামে একব্যক্তি এইরূপ একটী বনের নিকট বাস করিত। পাড়াগাঁয়ের পক্ষে তাহাকে একরূপ ধনীই বলিতে হইবে, কারণ তার কাজকর্ম্ম না থাকা সত্ত্বেও সে গরুবাছুর ও রাখালের দল লইয়া বেশ সুখেই দিন কাটাইত। বর্ণিত ঘটনার দুবছর পরে আমি যখন তাকে দেখলাম, তখন তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খর্ব্বাকৃতি অথচ দৃঢ় দেহ, কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, বঙ্কিম নাসা, পাতলা ঠোঁট, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ—এই সব মিশিয়া তাহার দেহটী গঠিত করিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে অনেক ভাল ভাল তীরন্দাজ থাকিলেও তাহাকে লোকে অপূর্ব্ব প্রতিভা-সম্পন্ন বলিত। বুনো ভেড়াকে সে কখনো গুলি করিতে পারিত না। কিন্তু একশত কুড়িগজ দূরের একটা মানুষকে সে অতি সহজেই একটী গুলির দ্বারা ধরাশায়ী করিতে পারিত। দিনরাত্রি তার অস্ত্রশস্ত্র সমানই চলিত, কর্সিকাবাসী ছাড়া অন্য লোকের নিকট এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই

অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে। ২৪ গজ দূরে প্লেটের মত বড় একখানা কাগজের পাশে একটী বাতি জ্বালিয়া রাত্রির দারুণ আঁধারে সে বাতিটাকে গুলির আঘাতে নিভাইয়া আবার গোটা তিনেক অব্যর্থ গুলির দ্বারা সেই কাগজখানাকেও আঘাত করিতে পারিত।

এই অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী-মহাশয় বেশ যশস্বী। বন্ধুহিসাবে যে যেমন সত্যসন্ধ, শত্রুতাতেও তাই। লোককে তুষ্ট করিতে, দরিদ্রের সাহায্য করিতে ভেচিও বন্দরে তার আর সমকক্ষ ছিল না। তার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে বিবাহের পর সে তাহার এক জন প্রতি-দ্বন্দ্বীর প্রাণ লইয়াছিল .. ... এই ঘটনার পর মাত্তিও জিউসেপাকে বিয়ে করল। এই বিয়ের ফল—তার তিনটী মেয়ে ও একটী ছেলে। মেয়ে কয়টির সবই ভাল পাত্রের সহিত বিয়ে হয়েছে; ছেলেটীর নাম ফর্চুনাটো ও তার বয়স দশ বছর মাত্র।

একদিন শরৎকালে মাত্তিও সস্ত্রীক জঙ্গলকাটা দেখিতে বাহির হইল। ফর্চুনাটোরওর তাদের সঙ্গে যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু জঙ্গলটাও একটু দূরে, আর বাড়ীতেও একজনকে থাকিতে হইবে। সেজন্য মাত্তিও তাকে লইয়া যায় নাই।

বাপ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ফর্চুনাটো রৌদ্রে শুইয়া দূরের নীল পাহাড় গুলি দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে আগামী রবিবারে শহরে তার খুড়ার বাড়ী নিমন্ত্রণ যাইবে,—এমন সময় দূরে সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। সে উঠিয়া যে দিকে শব্দ হইয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। আরও কয়েকবার আওয়াজ হইল,—ক্রমশঃ শব্দ নিকটতর হইল। অবশেষে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখের পথে পার্ব্বতীয়দের মত সূচ্যগ্রটুপীপরা, লম্বা দাড়ি, ছিন্নবাস একটা লোক অতিকষ্টে বন্দুকটীর উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহার জানুমূলে গুলির আঘাত লাগিয়াছে।

লোকটা বড় একটা ডাকাত, সে এইরূপ একটা ঝোপের ভিতর হইতে গুপ্ত ভাবে বাহির হইয়া শহরে গোলাগুলি সংগ্রহে যাইতেছে—এমন সময় পুলিশের হাতে পড়ে। কিছুক্ষণ তাহাদের সঙ্গে যুঝিয়া পাহাড়ে গুলি চালাইয়া সে ছুটিয়া পালাইতেছে। সে নিজেও আহত, পিছানেই পুলিশের দল, এমন সময় ফর্চুনাটোর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

'তুমি না মাত্তিও ফালকনির ছেলে?'

'হাঁ।'

'আমি জিয়ানেটো সাঁপিয়েরো। আমাকে পুলিশে তাড়া করেছে। আমায় একটু লুকোবার যায়গা দাও দেখি। আরত চলতে পারি না।

'বাবাকে না জিজ্ঞেস করে তোমায় আশ্রয় দিলে তিনি আমায় কি বলবেন?'

'তিনি বলবেন যে তুমি ভাল কাজই করেছ।'

'কে বললে?'

'শীঘ্র আমায় লুকাতে দাও। তারা এল বলে!'

'আচ্ছা, আমার বাপ না আসা পর্য্যন্ত দাঁড়াও।'

'দাঁড়াবো?—সর্ব্বনাশ! তারা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে পড়বে। এসো,

আমায় লুকোতে দাও, নইলে তোমার মেরে ফেলবো।'

ফর্চুনাটো বেশ শান্তভাবে কহিল, তোমার বন্দুকে গুলি নেই, তোমার থলিও খালি। মারবে কি রকম?'

'আমার কাছে ছোরা আছে।'

'কিন্তু আমার মত তুমি দৌড়তে পারবে?

সে একলম্ফে অনেকদূরে সরিয়া গেল।

'তুমি তা'হলে, দেখছি, মাত্তিও ফালকনির বেটা নও! তোমার বাড়ীর কাছ থেকে আমায় পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে?'

ছেলেটী বিচলিত হইল। সে নিকটে আসিয়া কহিল, 'আচ্ছা', তোমায় লুকোতে দিলে আমায় কি দেবে, বল দেখি?'

কোমরবন্ধ হইতে যে চামড়ার ব্যাগ ঝুলিতেছিল, তাহা হইতে বারুদ কিনিবার জন্য যে রৌপ্যমুদ্রাটী ছিল তাহা সে বাহির করিল। ফর্চুনাটো রৌপ্যমুদ্রা দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সেটী লইয়া জিয়ানেট্টোকে কহিল, 'আচ্ছা তোমার ভয় নেই।'

বাড়ীর কাছে খড়ের স্তূপের মধ্যে সে একটা খুব বড় গর্ত্ত করিল। জিয়ানেট্টো তাহার ভিতর লাফাইয়া পড়িল, ছেলেটী নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য একটু ছিদ্র রাখিয়া এমন ভাবে তাকে আবৃত করিয়া রাখিল যে খাতের মধ্যে মানুষ লুকাইয়া আছে এ কথা কেহই বুঝিতে পারিবে না। সে আর একটা মতলব বাহির করিল, তাহা কেবল বনের বর্ব্বরগণেই পারে। একটা মেনী বিড়াল ও কতকগুলি ছানাকে সে খড়ের গাদার উপর তুলিয়া দিল, যেন সে স্থানটী সম্প্রতি মোটেই কোনোরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। বাড়ীর নিকটে পথে রক্তচিহ্নের উপর সে সযত্নে ধুলি ছড়াইয়া দিল। তার পর বিপুল শান্তিতে সে আবার রৌদ্রে শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরেই ছয়জন পুলিশের লোক তাহাদের কর্ত্তাকে সঙ্গে লইয়া মাত্তিও'র ঘরের নিকট উপস্থিত হইল। কর্ত্তাটীর সঙ্গে ফাল্‌কনিদের একটু সম্বন্ধ ছিল। তার নাম তিওদোরা গাম্বা। ডাকাতের দল তাহাকে বড়ই ভয় করিত, কারণ ইতিমধ্যে তাহার হাতে কয়েকজন প্রাণ দিয়াছে।

সে ফর্চুনাটোর নিকটে আসিয়া কহিল, 'সুপ্রভাত, ভাই! ওঃ! খুব বড় হয়েছ দেখছি যে! এখান দিয়ে একটা লোক দেখেছ এইমাত্র?'

সে বোকার মত ভাব লইয়া কহিল, 'ওঃ! তোমার মত অত বড় এখনো হতে পারিনি দাদা!'

'হবে—হবে। আচ্ছা, বল দেখি, এখান দিয়ে একটা লোক যেতে দেখেছ, ভায়া?'

'একটা লোক—যেতে—দেখেছ—ভায়া!'

'হাঁ, কালো মখমলের ছুঁচালো টুপি মাথায়, রাঙা পাটকিলে রংএর ডোরা দেওয়া উর্দ্দি পরা একটা লোক?'

'কালো মখমলের—ছুঁচালো টুপি মাথায়—ডোরাকাটা উর্দ্দিপরা—একটা লোক!'

"হাঁ, হাঁ, বলে ফেলনা, কেন আর আমার কথাগুলি আওড়ে মরছ?'

'পুরুত মশাই গেছলেন বটে সকালে এখান দিয়ে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে। বাবা কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললুম—'

'আঃ! ভারি চ্যাংড়া! কেন চালাকি করছ? শীগগির বলো—জিয়ানেট্টো কোন পথে

গেছে তাকে আমরা খুঁজে মরছি, সে নিশ্চয়ই এই পথে গেছে।'

'কে জানে, বাপু?'

'কে জানে বাপু? তুমি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছ।'

'ঘুমুলে বুঝি দেখতে পাওয়া যায়?'

'তুমি কখখনো ঘুমোওনি, বন্দুকের আওয়াজে নিশ্চয়ই জেগেছিলে!'

'দাদা, তোমার বন্দুকের এত আওয়াজ? আমার বাবার বন্দুকের আওয়াজ আরও বেশী।'

'নিপাত যাও ছুঁচো ছোকরা! নিশ্চয়ই তুমি জিয়ানেট্টোকে দেখেছ। তাকে বোধহয় লুকিয়েও রেখেছ। এস ত হে, বাড়ীব ভিতরটা একবার খুঁজে এসো ত লোকটা সেখানে আছে কি না। সে এক পায়ে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই কাছেই লুকিয়েছে। তা ছাড়া, রক্তের দাগও এখানে এসে শেষ হয়েছে।

ফর্চুনাটো কহিল, 'বাবা কি বলবেন? যখন তিনি শুনবেন যে তিনি চলে গেলে তোমরা সব বাড়ীর ভিতর ঢুকেছিলে?

তাহার কানটা ধরিয়া গাম্বা কহিল, 'আচ্ছা ছোকরা ত! জানো তুমি—এখনি তোমার সুর বদলে দিতে পারি? আমার তরোয়ালের ধা কুড়ি তুমি খেলে এখুনি সিধে হয়ে যাবে।'

কিন্তু ফর্চুনাটো ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিতে লাগিল। সে জোর করিয়া বলিল 'আমার বাবার নাম মাতিও ফালুকনি!'

'চ্যাংড়া ছোকরা, তুমি জানো—তোমাকে রাজার বাড়ী বা জেলখানায় নিয়ে যেতে পারি? জেলখানার খড়ের বিছানায় শিকলি পায়ে তোমায় ঘুমুতে হবে, তারপর তোমায় ফাঁসি দেওয়াবো। ভাল চাও ত বল—জিয়ানেট্টো সাঁপিয়েছো কোথায়!'

এই রকম ভয় দেখাইতে ছেলেটী হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

সে আবার কহিল, 'আমার বাবাব নাম মাতিও ফালুকনি!'

পু.লশের মধ্যে এক জন চুপি চুপি কহিল, 'কর্ত্তা মাতিওর সঙ্গে গোলমাল করে কাজ নেই।'

গাম্বাও একটু গোলযোগে পড়িল। সে পুলিশের সঙ্গে ধীরস্বরে কথা কহিতে লাগিল, তাহাদের বাড়ী খোঁজা শেষ হইয়া গিয়াছিল। খুঁজিতেও বেশীক্ষণ লাগে নাই, কারণ কর্সিকানদের একখানি মাত্র ঘর। জিনিষপত্রের মধ্যে টেবিল, বেঞ্চ, সিন্দুক, ঘরের সামগ্রী ও শিকাবের অস্ত্রশস্ত্র। ইতিমধ্যে ফর্চুনাটো বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতেছিল, মনে হইল যে পুলিশদের এই হতবুদ্ধিভাব হইতে সে যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

একজন পুলিশ খড়ের গাদার কাছে আসিল। সে বিড়ালটা দেখিল ও অবজ্ঞা ভরে খড়ের ভিতর বর্ষাফলকটা বিদ্ধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া এমনি ভাব দেখাইল যেন সে সব বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু কিছুই নড়িল না, বালকের মুখেও কিছুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল না।

পুলিশের কর্ত্তাটী সদলবলে মহা ফাঁপরে পড়িল। তাহারা যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথটার পানে তারা ফিরিয়া চাহিতেছিল। পুলিশের কর্ত্তা দেখিল যে ফালুকনিব ছেলেকে ভয় দেখাইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই—আদর করিয়া ও

কোনও রূপ উপহার দ্রব্য প্রদান করিয়া যদি তাহাকে বশীভূত করা যায়।

সে বলিল, তুমিত দেখছি বেশ চালাক ছোকরা—কিন্তু আমার সঙ্গে চালাকি করছো কেন, ভায়া! তোমার বাবার মনে কষ্ট না হলে তোমায় নিশ্চয়ই সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম।'

'বাঃ!'

'কিন্তু তোমার বাবা এসে যখন সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে শুনবেন, তখন মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমায় ঘা কতক চাবুক লাগাবেন নিশ্চয়!'

'তারপর?'

'আচ্ছা, দেখো'খন। কিন্তু আমি বলছি ভালো ছেলের মত কথাটা আমায় বলে ফেললে তোমায় কিছু কি আর না দিতুম?'

'আর আমিও তোমায় বলছি, দাদা, তুমি যদি এখানে বেশীক্ষণ থাকো ত জিয়ানেট্টো নিশ্চয়ই জঙ্গলে গিয়ে লুকোবে তখন তোমার মত একগণ্ডা চালাক লোক এলেও তাকে ধরতে পারবে না কিন্তু!'

পুলিশের দারোগাটী পকেট হইতে দামী রূপার ঘড়িটী টানিয়া বাহির করিল। সেটী দেখিবা মাত্র শিশু ফর্চুনাটোর চক্ষু আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। ইহা অনুভব করিয়া সে চক্‌চকে ইস্পাতের চেনটী ধরিয়া ঘড়িটী ঝুলাইয়া ধরিয়া বলিল, 'পাজি! তোমার বুকে এই রকম সুন্দর ঘড়ি ঝুলিয়ে ভেচিয়ো শহরের রাস্তায় বুক ফুলিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা, তা আমি বেশ বুঝিতে পেরেছি। লোকে তোমায় জিগ্যেস করবে—কটা বেজেছে হে? আর তুমি বলবে—এই দেখনা আমার ঘড়ি।'

'আমি বড় হলে আমার খুড়ো মশাই আমায় একটা ঘড়ি দেবে বলেছে।'

'হাঁ—তোমার খুড়তুতো ভাই ত একটা ঘড়ি পেয়েছে—এত ভাল নয়। সে ত তোমার চেয়েও ছোট।'

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

'আচ্ছা, ভায়া, এ ঘড়িটা কি তোমার পছন্দ হয়?'

বিড়ালের সমক্ষে একটা মুরগির বাচ্ছা ধরিলে যেমন হয়, ফর্চুনাটোও তেমনি লোলুপ দৃষ্টিতে ঘড়ির পানে চাহিয়া রহিল। বিড়ালেও তার নখর দ্বারা সেটা ধরিতে পারে না—মনে করে যে তাহাকে বোকা বানাইবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র, আর প্রলোভনে পড়িবার দুর্নিবার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে তার দৃষ্টি মাঝে মাঝে সরাইয়া লয় কিন্তু সৃক্কণী পরিলেহন করিয়া তার প্রভুকে বলিতে চায়—'এ আবার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!'

গাম্বা সত্যই ঘড়িটা দিতে উদ্যত হইল। ফর্চুনাটো কিন্তু হাত বাড়াইয়া দিলনা; সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'আমার সঙ্গে আবার ঠাট্টা করছো কেন?

'মাইরি, ভায়া, ঠাট্টা করিনি। আমাকে শুধু বলো জিয়ানেট্টো কোথায়—তাহলেই ঘড়িটা তোমার।"

ফর্চুনাটো অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তার কৃষ্ণতার চোখ দুটী গাম্বার চোখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সে শুধু সেখানে জানিতে চাহিল—তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না।

গাম্বা কহিল, 'ঐ সর্ত্তে যদি তোমায় ঘড়িটা না দিই, তাহলে আমি আর পুলিশের কাজ করব না। আমি ত আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবো না?'

এই বলিতে বলিতে সে ঘাড়টা এত কাছে লইয়া আসিল যে উহা প্রায় বালকটীর ম্লান গণ্ডস্থল স্পর্শ করিল। লোভ ও আতিথ্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সংগ্রাম চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডলে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তাহার নগ্ন বক্ষঃস্থল গভীর ভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহার যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে ঘাড়টা ইতস্ততঃ দুলিতে লাগিল, কখনো বা সেটা তাহার নাসাগ্রভাগ স্পর্শ করিল। অবশেষে ক্রমে ক্রমে তাহার দক্ষিণ হস্তটা ঘড়ির কাছে উঠিল, তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ উহা স্পর্শ করিল, সে উহার সম্পূর্ণ ভারটা তালুর মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল কিন্তু তবুও গাম্বা চেনের শেষাংশটা তখনো ধরিয়া আছে। ঘড়ির উপরটা আকাশের মতই নীল, ডালাটা খুবই উজ্জ্বল—রৌদ্রের উজ্জ্বলতায় উহা যেন আগুনের মতই জ্বলিতে লাগিল। প্রলোভনটা বড়ই বেশী।

ফর্চুনাটো তাহার বামহস্তটাও তুলিল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সে বামস্কন্ধের পশ্চাতে খড়ের গাদার দিকে দেখাইয়া দিল। গাম্বা তাহার ইঙ্গিত তখনি বুঝিতে পারিল। সে চেন্ ছাড়িয়া দিল,—ফর্চুনাটোও বুঝিল যে সেই এখন ঘড়ির একা মালিক। সে হরিণের মত ক্ষিপ্রলম্ফে খড়ের গাদার নিকট হইতে সরিয়া গেল,—পুলিশেরাও উহা ভাঙ্গিতে সুরু করিল।

তাহারা শীঘ্রই দেখিল যে শুষ্ক ঘাসের স্তূপটা নড়িতেছে; রক্তাক্তদেহে ছুরিকাহস্তে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবামাত্রই কঠিন আঘাতের অসহ্য বেদনায় সে পড়িয়া গেল। গাম্বা তাহার উপর পড়িয়া ছুরিকাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তাহার প্রতিরোধ সত্ত্বেও একমুহূর্ত্তে সে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

জিয়ানেট্টো দড়িবাঁধা এক বোঝা কাঠের মত মাটীতে পড়িয়া ফর্চুনাটোর পানে ফিরিয়া চাহিল। ক্রোধের অপেক্ষা ঘৃণার স্বরেই সে কহিল, 'কার ছেলে তুমি।'

তাহার প্রদত্ত রৌপ্যমুদ্রাটী আর রাখা উচিত নয় জানিয়া বালকটি উহা জিয়ানেট্টোর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু ডাকাতটা সে দিকে নজরও দিলনা। সে গাম্বাকে শান্তভাবে কহিল, 'গাম্বা ভাই, আমিত আর চলতে পারচিনি—আমাকে দেখচি তোমাদের শহরে বয়েই নিয়ে যেতে হবে।'

তাহার নিষ্ঠুর বিজেতা উত্তর দিল, 'কেন এই মাত্র ত বেশ ছাগলছানাটার মত ছুটে আসিলে! আচ্ছা, তোমার ভয় নেই, তোমাকে ধরে' আমার এত আনন্দ হয়েছে যে সারা পথটা তোমায় আমার কাঁধে করে নিয়ে যেতেও একটু কষ্ট হবেনা। কতকগুলো ডাল পালা আর তোমার কোর্ট্টা দিয়ে একটা ডুলিকরে' নোয়া যাবে, তার পর একটু এগিয়ে গেলেই ঘোড়া যোগাড় করা যাবে।'

বন্দী কহিল, বেশ, ডুলির ভিতর কিছু খড় দিয়ে দিও, তাহলে আমার একটু আরাম হবে।'

পুলিশেরা যখন সকলেই ব্যস্ত,—কেউ তালপাতা দিয়ে ডুলি করিতেছে, কেউ বা জিয়ানেট্টোর ক্ষতের পরিচর্য্যা করিতেছে—তখন মাত্তিও ফাল্কনি পথের বাঁকের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নারীটি এক বোঝা চেষ্টনাটের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার স্বামী আলস্য-মন্থরচরণে আসিতেছে, দুইহাতে দুটা বন্দুক—কারণ

অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কোনও ভার বহন করা পুরুষের পক্ষে উচিত নয়।

পুলিশের দল দেখিয়া মাতিও'র প্রথম চিন্তা হইল—বোধ হয় তাহারা তাহাকে গেরেপ্তার করিতে আসিতেছে। কিন্তু সে চিন্তার প্রয়োজন কি? সরকারের সঙ্গে তাহার কোনও গোলযোগ হইল না কি? না—তা ত নয়। তার ত খুবই সম্মান প্রতিপত্তি আছে। তবে সে পর্ব্বতবাসী কর্সিকান্ : আর কর্সিকানদের ভিতর এমন খুব কম লোকই আছে, যাহারা স্মরণ করিলে নিজের চরিত্রে কোনরূপ দোষ না দেখিতে পায়—হয়ত বা একটা গুলি ছোঁড়া, এক ঘা ছোরার আঘাত, বা আর কোন রূপ দস্যুতা। মাতিও'র বিবেক বুদ্ধি অন্য পাঁচজনের চেয়ে ঢের পরিষ্কার ছিল, কারণ সে গত দশ বছরের মধ্যে তাহার বন্দুক কোনও লোকের বিরুদ্ধে উত্তোলন করে নাই। তার বুদ্ধিও বেশ খেলে ভাল, কারণ যদি সে কোনরূপ গোলযোগে পড়ে, তাহা হইলে তার সাফাইও যথেষ্ট আছে।

সে জিউসেপাকে কহিল, 'বউ, তোমার ব্যাগ রেখে তৈরি হও। সে তখনি শুনিল। মাতিও'র স্কন্ধে যে বন্দুকটা ছিল, সেটা তার পত্নীর হস্তে দিয়া অন্যটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিল,—এমনি ভাব যেন শত্রু সম্ভাবনা হইলে সে তূর্ণ গতিতে কোনও উচ্চতম বৃক্ষের উপর উঠিয়া নিজেকে অক্ষত রাখিয়া শত্রুগণের সহিত লড়িতে পারে। তাহার গুলির বাক্‌স ও অন্য বন্দুকটা লইয়া তাহার পত্নী পশ্চাতে যাইতে লাগিল। যুদ্ধের সময় স্বামীর অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া দেওয়াই সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

উদ্যত বন্দুকের ঘোড়াটা টিপিয়া মাতিয়োকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাম্বার মনে বড় ভয় হইল। সে ভাবিল, যদি হঠাৎ জানা যায় যে মাতিও জিয়ানেট্টোর আত্মীয় বা বন্ধু, তাহা হইলে সে তাহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে—চিঠি যেমন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছায় আমাদের মৃত্যুও তেমনি নিশ্চিত।

হতবুদ্ধি হইয়া সে একটা সাহসের কাজ করিল—সে একাকী মাতিও'র নিকট অগ্রসর হইল ও তাহাকে পূর্ব্ব বন্ধু মনে করিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিল।

নিরুত্তর মাতিও বন্দুকটা উঁচু করিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

গাম্বা কহিল, 'নমস্কার ভাই, অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো।'

'নমস্কার, ভায়া।'

'...আজ জিয়ানেট্টো সাঁপিয়েরোকে ধরা গেছে।'

'বেশ করেছ। সেদিন সে আমাদের একটা ছাগল চুরি করেছিল।' একথা শুনিয়া গাম্বার আনন্দ হইল।

মাতিয়ো বলিল, 'আহা, বেচারার ক্ষুধা পেয়েছিল।'

গাম্বা একটু দুঃখিত হইয়া কহিল, 'বেটা সিংহের মত লড়ছিল, সে আমার একটা লোককে মেরে ফেলে, আবার তাতেও শান্ত না হয়ে সে আর একজনের হাত ভেঙ্গে দেয়! তবে সে জাতিতে ফরাসী, তাই বেশী কিছু ক্ষতি হয়নি। তার পর জিয়ানেট্টো এমনি গা ঢাকা দিলে যে শয়তানেও তাকে খুঁজে পায়নি,—আজ আমার ফর্চুনাটো ভায়া না থাকলে তাকে ধরতেই পারতুম না'

মাতিয়ো উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—'ফর্চুনাটো!'

জিউসেপাও প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, ফর্চুনাটো।'

'হাঁ, জিয়ানেট্টো ঐ ঘাসের গাদার ভিতর লুকিয়েছিল, কিন্তু আমার ছোট ভায়াটী তার চালাকি ধরে দিলে। আমি তার খুড়োকে বলবো—তার জন্যে একটা ভাল উপহার পাঠাতে। আর কাগজেও তোমাদের দুজনের নাম ছেপে বেরোবে।'

মাতিও অস্ফুটস্বরে কহিল, ছি। ছি।

যাত্রার পূর্ব্বেই জিয়ানেট্টো ডুলিতে শুইয়াছিল। মাতিওকে গাম্বার সহিত দেখিয়া সে একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। তারপর তার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া দ্বারের উপর থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া সে কহিল—

'বিশ্বাসঘাতকের বাড়ী।'

যে ব্যক্তি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সেই কেবল ফালুকনিকে বিশ্বাসঘাতক বলিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। ছোরার একটী আঘাতেই সে এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইত। কিন্তু মাতিয়ো নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে কপালে হাত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলনা।

বাপাকে আসিতে দেখিয়া ফর্চুনাটো বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। সে শীঘ্রই একপাত্র দুগ্ধ আনিয়া নতবক্ষে জিয়ানেট্টোকে প্রদান করিল।

জিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিল, 'আমার কাছ থেকে দূর হও।' তার পর একজন পুলিশের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দাও ত ভাই একটু জল।'

সৈনিক তাহার হস্তে জল প্রদান করিলে সে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহার বিরুদ্ধে গোলা ছুড়িয়াছিল, তাহারই প্রদত্ত জল পান করিল। তার পর সে বলিল, পিছনদিকে না বাঁধিয়া তাহার হাতদুখানি বুকের উপর বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

সে কহিল, 'আমি একটু সুস্থভাবে শুতে চাই।'

এ আবেদন তাহারা সহজেই পূর্ণ করিল গাম্বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার ইঙ্গিত করিয়া ও নিরুত্তর মাতিয়োকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া সমতলভূমির দিকে তূর্ণচরণে চলিল।

প্রায় দশমিনিট অতীত হইবার পর মাতিয়ো কথা কহিল। শিশুটী অস্থিরভাবে একবার মাতার দিকে অন্যবার পিতার দিকে চাহিতে লাগিল,—তাহার পিতা তখন সোজা বন্দুকটীর উপর ভর করিয়া ক্রুদ্ধভাবে তাহার পানে চাহিল।

'আরম্ভটা খুব ভালই করেছিলে'—মাতিয়ো বেশ প্রশান্ত ভাবে এ কথাগুলি বলিলেও তাহাকে যে চিনিত সে তখন তাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ভয় পাইত।

অশ্রুপূর্ণনেত্রে শিশুটী তাহার পায়ের কাছে পড়িবার ভাবে অগ্রসর হইয়া কহিল, —"বাবা।"

কিন্তু মাতিয়ো হাঁকিল—'দূর হও।'

বালকটী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাহার পিতার নিকট হইতে একটু সরিয়া গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

জিউসেপা অগ্রসর হইয়া ঘড়ির চেনটী ফর্চুনাটোর শার্টের ভিতর হইতে একটু বাহির হইয়া পড়িয়াছে দেখিল।

সে কর্কশকণ্ঠে কহিল, 'কে ও ঘড়ি দিলে তোকে? পুলিশের কর্ত্তা।'

ফালুকনি ঘড়িটা ধরিয়া পাথরের উপর আছাড় মারিল, ঘড়িটা শতচূর্ণ হইয়া গেল।

সে বলিল, 'নারী, এ ছেলে কি আমার?

জিউসেপার পীতবর্ণাভ গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইল।

'কি বলছো, মাতিয়ো? কার সঙ্গে কথা কইচো জানো?

'আমাদের সন্তানদের মধ্যে এই-ই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করলে।'

ফর্চুনাটোর হাঁচি ও কাশি বাড়িতে লাগিল, ফাল্‌কনি তখনো তার দিকে শ্যেন-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অবশেষে বন্দুক দিয়া ভূমিতলে আঘাত করিয়া আবার বন্দুকটা কাঁধে তুলিয়া ফর্চুনাটোকে তার সঙ্গে বনের ভিতর যাইতে আদেশ করিল। বালক সে আদেশ পালন করিল।

চোখের কালো তারা দুটী স্বামীর চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, 'এ তোমার ছেলে ত।'

মাতিয়ো উত্তর দিল, 'হাঁ, আমিও তার পিতা।'

জিউসেপা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের ভিতর ঢুকিল। সে জানু পাতিয়া কুমারী মেরীর মূর্ত্তির নিকট গভীর প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফাল্‌কনি সেই পথ বাহিয়া দূরে একটী গিরি গুহার নিকট উপস্থিত হইল। বন্দুকটা মাটিতে ঠুকিয়া দেখিল যে সেখানকার মাটীটা খুব নরম আছে, খনন কার্য্যও সহজ। ইহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বেশ উপযোগী।

'ফর্চুনাটো! যাও—ঐ বড় পাথরের কাছে গিয়া দাঁড়াও।'

ফর্চুনাটো সেইরূপ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

'তোমার প্রার্থনা বলে যাও।'

'বাবা, বাবা, আমায় মেরোনা।'

'বল তোমার প্রার্থনা।'—মাতিয়োর কণ্ঠস্বর তখন ভীষণ।

বালক উপাসনা করিতে লাগিল, পিতা প্রতি প্রার্থনার শেষে বলিতে লাগিল—'তথাস্তু।'

'এইগুলিই কি তোমার সব?'

'আর একটী বাকী আছে, বাবা,—সেই সেটা খুড়ীমার কাছে শিখেছিলুম।'

'সেটা যে মস্ত বড়—। আচ্ছা, বলে যাও।'

ক্ষীণকণ্ঠে শিশু তার সুদীর্ঘ প্রার্থনা শেষ করিল।

'শেষ হয়েছে?'

'বাবা আমায় ক্ষমা কর। আর এরকম করবো না। আমি আমার খুড়ার কাছে প্রার্থনা করবো, যাতে জিয়ানেট্টো মুক্তি পায়।'

সে বলিতে লাগিল—মাতিয়ো বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া বলিল, 'ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন।'

শিশু আর একবার উঠিতে চেষ্টা করিল ও পিতার পা জড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু আর সময় ছিল না। মাতিয়ো বন্দুক ছুড়িল, ফর্চুনাটো নিশ্চল হইয়া পড়িয়া গেল।

মৃতদেহের দিকে না চাহিয়া তাহাকে কবরস্থ করিবার জন্য মাতিয়ো বাড়ীতে একটা কোদাল আনিতে গেল। কিছুদূর যাইতেই জিউসেপার সঙ্গে দেখা হইল, সে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল।

'করেছ কি?'

'ন্যায়ধর্ম্ম।'

'সে কোথায়?'

'গিরিসঙ্কটে। আমি তাকে গোর দিতে যাচ্ছি। সে খ্রীষ্টানের মতই মরেছে; তার জন্য গির্জ্জায় আমি প্রার্থনা করবো। আমাদের জামাই তিওডোরো বিয়াঁচিকে খবর পাঠাও—সে আমাদের কাছে এসে থাকবে।'

ঘুমরাণী

[শ্রীপার্ব্বতীমোহন রায়]

ওই যে জননী সম
বুকে স্নেহ অনুপম
ঘুমরাণী আসে ধীরে
নিঝুম নিশায় ;
রজনীর প্রিয় মেয়ে
গিরি নদী বন ছেয়ে,
আমার শিয়রে বসে
বলে 'ঘুম আয় ;'
প্রীতিমাখা মুখে হাসি
আদরে উঠেছে ভাসি
অপলক আঁখি দুটি
ভরা করুণায় ;
মাথায় কল্যাণ রাখি
বচনে অমিয় মাখি'
শিয়রে বসিয়া বলে'
ললিত ভাষায়—
'আয় ঘুম যাদুটির
আঁখির পাতায়।'

অলস ঘুমের ঘোরে
অবশ করিতে মোরে
নিশীথ বেহাগ সম
গায় কত গান ;
কতনা মমতা ভরে
কুসুম কোমল করে
চোখে মুখে সোহাগের
পরশ বুলায় ;
গালে দিয়ে মিঠে চুমা
ধীরে বালা বলে ঘুমা
বিভোর করিয়া ক্রমে
কোন মদিরায় ;
আঁচল তুলিয়া ধীরে
বাতাস করিল শিরে ;
লুটায়ে পড়িনু ঢুলে
ঘুমের নেশায়,
শেষ গান গেয়ে গেল
'আয় ঘু-ম-আ—য়।'

বিজয়া

—মৃন্ময়ীর পূজা শেষ হয়ে গেছে। মৃন্ময়ীর বিসর্জ্জন শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু পড়ে আছে—এই জড় দেশে জড় দেহের আলিঙ্গন; বিজয়ার নামে ছেলে খেলা।

—পরাধীন দেশে মহাশক্তির পূজা হয় না। দাসের মধ্যে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হয় না। মৃত্যুভয়কাতর যারা তাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়-সোহাগিনীর প্রকাশ অসম্ভব।

—অতীতের অনুসন্ধান না করে, ভবিষ্যতের বিচার না করে, যারা মহাশক্তির কাছে নিজের সবটুকু উৎসর্গ করে দিতে পারে তারাই পূজার অধিকারী। অট্টহাস্যে মৃত্যুকে লজ্জিত করে যারা আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এ মরণোৎসব তাদেরই জন্যে।

—সে পূজার মন্ত্র আজ বাঙ্গালী ভুলে গেছে, তাই বাঙ্গালা আজ নিরানন্দ, বাঙ্গালী আজ পরপদাবনত। মায়ের কোল ভুলে গেছে, তাই আজ সে ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত। আজ আত্মবলির সাধক নেই, তাই মায়ের আবির্ভাব আর হয় না। আজ নিজের নিজের ক্ষুদ্র অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে অন্ধকারে পড়ে আছি, তাই বিজয়া-নন্দের অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত।

—কিন্তু এমন দিন থাকবে না। মায়ের করুণার ধারা ক্ষুদ্র মূর্ত্তির আবরণ নিয়ে আমাদের অহংকারের গণ্ডি ভেদ করবেই করবে। শতবাধা সত্ত্বেও মহাশক্তির বিপুল আনন্দ আমাদের বুদ্ধি, মন, প্রাণকে অভিভূত করে ফেলবে।

—বুদ্ধির চাঞ্চল্য আমাদের ঘুচে যাবে; মনের আবিলতা দূর হবে, প্রাণের উদ্দামতা শান্ত হবে। সমস্ত আধার শুধু মায়ের শক্তিতে পূর্ণ হবে।

—সেই দিনের জন্যে এস আজ সবাই প্রস্তুত হই! সেই দিনের আশায় উন্মুখ হয়ে এস আজ সবাই দেহের সঙ্গে দেহ, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, মনের সঙ্গে মন বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধি মিলিয়ে নিজেদের একত্ব অনুভব করি।

—এস আজ ধ্যান করি যে বাংলা দেশ সেই মায়ের কোল; বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা সেই মহাজ্যোতিরই খণ্ড প্রকাশ।

আত্মশক্তি

ভাগবত বিধান

ইংরেজরা যদি পাঠান মোগলের মত এদেশের বাসিন্দা হইয়া যাইত তাহা হইলে আজ স্বরাজের কথা এদেশে উঠিত কি না সন্দেহ। এই জাতিভেদভরা দেশে মুসলমান যেমন একটা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া আছে, ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা মিলিয়া তেমনি একটি জাতি সৃষ্টি করিয়া বসিত মাত্র। সেটা আমাদের বড় একটা গায়ে লাগিত না; কেননা জাতিভেদটা আমাদের ধাতে সহিয়া গিয়াছে। বাদসাহী আমলে বড়

ঘরের হিন্দুরা যেমন দুই দশটা বড় বড় পদ লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, ইংরেজ আমলেও তাহাই হইত; মোগল বা পাঠানেরা যেখানে যেখানে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন সেই থানেই হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপনের কথা উঠিয়াছে। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর সাহায্য লইয়াই রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র জাতি গঠনের সময় স্বামী রামদাস মারাঠীদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; গুরু গোবিন্দসিংহও পাঞ্জাবের জাঠদিগকে লইয়া একটী নূতন ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না হইত তাহা হইলে এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা হইত কি না সন্দেহ।

ইংরেজ যে আমাদের সহিত জবরদস্তি করিয়া একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে, কেহ কেহ সেটাকে ভক্তিভরে ভাগবত বিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক হিসাবে দেখিতে গেলে কথাটার ভিতর অনেক খানি সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। কবি যে বলিয়াছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

ইংরেজ এদেশে আসিয়া ঠিক ঐ কাজটুকু করিয়া দিয়াছে। আজ চোখে আঙুল দিয়ে সকলকে সে বুঝাইয়া দিয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সৈয়দ, মোগল, পাঠান হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল, পারিয়া, মাঢ় পর্য্যন্ত আমরা সবাই সমান পতিত। আজ বাধ্য হইয়া সকলকে এক ঘাটে জল খাইতে হইয়াছে, আর বুঝিতে হইয়াছে যে আবার ঘরে গিয়া জল খাইতে হইলে সকলেই এক সঙ্গে ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর তা না হইলে আজ যাহারা ঘরে ঢুকিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের ঘরের বাহির করিবার উপায় নাই। আরও একটা সুখের কথা এই ভারতবর্ষ স্পানিয়ার্ড, পর্ত্তুগিজ বা ফরাসীর হাতে না পড়িয়া ইংরেজের হাতে পড়িয়াছে। লাতিন জাতিদিগের মানসিক প্রকৃতি কতকটা মুসলমানদের মত। তাহারা অপরের জাতি মারিয়া তাহাকে আপনার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে চেষ্টা করে। পর্ত্তুগিজেরা গোয়ায় তাহাই করিয়াছে; গোয়ার লোকে নিজেদের আচার, ধর্ম্ম, সমাজ সব ছাড়িয়া নকল পর্ত্তুগিজ সাজিয়াছে। ফিলিপাইনের লোকেরাও স্পানিয়ার্ডদের হাতে পড়িয়া আপনাদের ভাষা ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ছাড়িয়া আধাআধি স্পানিয়ার্ড হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা পণ্ডিচারীতে বা কোচিন চীনে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে ফরাসীদের মতিগতিও ঐ দিকে। এই সকল জাতি আপন আপন অধিকৃত রাজ্যের লোকদিগকে আচারে ও সভ্যতায় নিজের মত করিয়া লইয়া অনেকটা রাজনৈতিক অধিকার তাহাদের হাতে তুলিয়া দেয়।

কিন্তু ইংরেজের প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের। সে যাহাকে নিজের ধর্ম্ম বা আচারে ভূষিত করে তাহাকেও বেশ একটু দূরে ঠেলিয়া রাখে। আমাদের দেশে সখ করিয়া অনেকেই সাহেব সাজিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ কাহাকেও আপনার সমান অধিকার দেয় নাই। জগতের আর কোন জাতি সাজিয়া গুজিয়া যে ইংরেজ বনিতে পারে না,

এ কথাটা ইংরেজ বেশ ভাল করিয়াই বোঝে। তাই ইংরেজ রাজত্বে লর্ড সিংহের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু একটাও মুরসিদ কুলি খাঁ জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের মত হতভাগ্য জাতকে ইংরেজ যদি একটু টানিয়া লইবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে দেশ এতদিন 'স্বদেশী ফিরিঙ্গি'তে ভরিয়া যাইত, স্বরাজের কথা অনেকের হয়ত মনে উঠিত না।

আরও একটা কথা এই যে রাজত্ব করার অপেক্ষা ব্যবসা চালানর দিকেই ইংরেজের লোভটা একটু বেশী। যেখানে যেখানে সে রাজদণ্ড খাড়া করিয়াছে, সেখানে ব্যবসাই তাহার গোড়ার কথা। ক্ষমতা, প্রভুত্ব যে সে ভালবাসে তাহার কারণ ওগুলা থাকিলে পকেটে টাকা কড়ি আসিয়া পড়ে; আর এই অসার সংসারে টাকাই যে একমাত্র সারবস্তু সে বিষয়ে ইংরেজের মনে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে আসিয়া এই ব্যবসার খাতিরে ইংরেজকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান ভাবে আঘাত করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ইংরেজের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা বেশ প্রীতিকর নয়। দেশটা যদি এত দরিদ্র না হইয়া পড়িত, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের দুইবেলা উদরান্নের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে আজ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এতটা চাঞ্চল্য বোধ হয় দেখা দিত না। ইংরেজের চাপে পড়িয়া যদি শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতকটা দরিদ্র হইয়া পড়িত তাহা হইলে হয়ত একটু চেঁচাচেঁচি বা একটু আধটু মারামারি করিয়া তাহারা ইংরেজের সহিত কতকটা রফা করিয়া লইত। দেশকে স্বাধীন করিবার সংকল্প যদি বা দুই চারিজনের মাথায় আসিত তবুও তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত না।

কিন্তু এখন ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, ইংরেজ এদেশের কেহ নয়, এদেশে বাস করিতেও আসে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ রাজত্বের ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর স্বার্থ অনেকটা এক রকমের হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে।

জমিদার, বড় বড় কলওয়ালা বা মাড়ওয়ারীদের মত সওদাগরের স্বার্থ ইংরেজ রাজত্বে রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এ সমস্ত সম্প্রদায় যে আন্তরিক ভাবে স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিবে তাহা মনে হয় না। ইংরেজের হাতে একটু খাতির যত্ন পাইলেই তাহারা ভুলিয়া যাইবে আজ যে Indianisation of Services এর কথা লইয়া এত আন্দোলন চলিতেছে তাহা যদি সফল হয়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিয়দংশ যে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষপাতী হইয়া পড়িবে তাহাও অসম্ভব নয়! কিন্তু কৃষক, শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেই থাকিবে। সুতরাং স্বরাজের জন্য আন্দোলন এই সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই যে প্রসার লাভ করিবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহাদের স্বার্থ ইংরেজের স্বার্থের সহিত জড়িত তাহারা দিন দিন স্বরাজের আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

ইংরেজ রাজত্বের স্বরূপবোধের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্য-

প্রণালী দেখিয়া মনে হয় না যে ইংরেজ রাজত্বের সহিত এদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জড়িত, এ গোড়ার কথাটা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সকলকার মন সমভাবে জাগাইতে গিয়া কংগ্রেসের শক্তিহানি হইয়াছে মাত্র। হিন্দুস্থান ও রাজপুতনার উৎপীড়িত কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম যখন কৃষাণ সভা করিল, কুলি মজুরেরা কলওয়ালাদের হাতে নিপীড়িত হইয়া যখন ধর্ম্মঘট করিল, তখন তাহাদের সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়া কংগ্রেস কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। কংগ্রেস তখন অহিংসা পরম ধর্ম্ম কিনা এই আধ্যাত্মিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। ফলে পুলিশের সাহায্য লইয়া তালুকদারেরা কৃষকদিগের আন্দোলন দাবাইয়া দিল। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে ভাব-বিলাসিতা যতটা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কার্য্য-কুশলতা ততটা পায় নাই।

কিন্তু দেশ যদি স্বাধীন করিতে হয় তাহা হইলে জনকতক স্বার্থান্ধ জমিদার, কলওয়ালা বা উচ্চ পদলোভী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় তাহা হইবে না। দেশের মধ্যে যাহারা পতিত তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টাই আগে করিতে হইবে। তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কংগ্রেসের সমস্ত আয়োজনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যাহাদের পেটে দুইবেলা ভাত জুটে না, কুঁড়ে ঘরের ভিতর যাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া শিয়াল কুকুরের মত পড়িয়া থাকে, সময়ে অসময়ে যাহারা জমিদারের নায়েব ও পুলিশের পেয়াদার হাতে লাঞ্ছিত, তাহাদিগকে দেবতা বানাইবার আগে মানুষ বানাইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। যাহারা মাটির সহিত দিন দিন মিশিয়া যাইতেছে তাহাদিগকে তিতিক্ষা সাধন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার প্রলোভন সংযত করাই ভাল।

এই কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিয়া, কি করিয়া তাহাদিগের অবস্থা ভাল করা যাইতে পারে, কি করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে খাড়া করান যাইতে পারে তাহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ করা ভিন্ন আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে ইহাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া ভিন্ন স্বরাজ লাভের অন্ত উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। বাহির হইতে যাহারা আমাদের ঘাড়ে চড়িয়া আছে তাহাদিগকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে আগে এই দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। হিংসা বা অহিংসার কথা পরে ভাবিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবার ভয় নাই। এরূপ ব্যবস্থা করিলে দেশের স্বাধীনতার ফল শুধু শ্রেণীবিশেষ মাত্র ভোগ করিবে না; সকলেই স্বাধীনতার সমান ভাগী হইবে।

অল্পচেষ্টায় যদি স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুই দশ জন মিলিয়াই সে কাজটুকু করিয়া ফেলিতাম; দেশের নিম্ন-শ্রেণী নিম্ন স্থানেই পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ইংরেজের হাতে যখন আমরা পড়িয়াছি তখন সে ভয় নাই। ইংরেজ কথায় ভুলিবার ছেলে নয়; বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সে ধরাশায়ী হইবে না। এতদিন যাহারা সমাজের পায়ের তলায় পড়িয়া আছে তাহাদের সকলকেই খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে; সকলকে লইয়া ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্নে তুষ্ট

হইয়া বর দিবার মত দেবতা ইংরেজ নয়। এ হিসাবে ইংরেজ রাজ্য যে ভাগবত বিধান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নব্যভারত

সাহিত্যে স্বাধীনতা

সেই সাহিত্যই সৎসাহিত্য যাহা সাহিত্যিকের চিত্তের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যেখানে এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তির স্বাধীনতা নাই সেখানে সৎসাহিত্য থাকিতে পারে না।

সাহিত্য একটা আর্ট। শিল্পীর নিষ্ঠার সহিত ইহার সেবা করিতে হয়, দীর্ঘ সাধনার দ্বারা ইহাতে সফলতা অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু এই সাধনা, এই শিক্ষা, এই অর্জ্জিত শিল্পকুশলতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান নয়। ভাষার বিন্যাস যতই কেন সুললিত হউক না, অলঙ্কারের প্রয়োগ যতই যথেষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সাহিত্য হয় না, যদি তাহার ভিতর সাহিত্যের প্রকৃত প্রাণ না থাকে, যদি তাহাতে লেখকের দৃষ্ট সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন প্রকাশ না পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

সাহিত্য সত্য শিব ও সুন্দরের অনুশীলন। প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পীর চোখে এই সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ ফুটিয়া ওঠে—তাহাই প্রচার করিয়া সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রত্যেক সাহিত্যিক কেবল সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক বা পুরোহিত নন—তাঁহারা ঋষি বা Prophet. ঋষির চক্ষে যেমন সত্যের আলোক ভাসিয়া উঠে, মুগ্ধ ঋষি তন্ময় হইয়া তাহাকে মন্ত্রে গাঁথিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তেমনি সত্য শিব সুন্দরের নিত্য নূতন রূপ সাহিত্য-ঋষির চক্ষে ফুটিয়া উঠে—তাহারই প্রকাশে চেষ্টার ফল সাহিত্য।

এটা বড় স্পর্দ্ধার কথা কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। প্রকৃতির কোনও নূতন ছন্দে বা জীবনের কোনও নূতন প্রকাশে সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ—কোনও নূতন সত্য যদি আমার চক্ষে ফুটিয়া না উঠিয়া থাকে, আমি যদি বেদের ঋষির মতই স্পর্দ্ধা করিয়া জগৎকে না বলিতে পারি যে "বেদাহং"—জানিয়াছি আমি এই নূতন সত্য চিররহস্যময়ী প্রকৃতির এক নূতন রহস্য, বৈচিত্র্যময় জীবনের এক নূতন কাহিনী, তবে আমার সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা নিষ্ফল। নূতন করিয়া কিছু বলিবার যদি আমার না থাকে তবে কথা গাঁথিয়া আমি যতই বাহাদুরী লই না কেন, আমি সাহিত্য সৃষ্টির স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। তবে প্রভেদ এই যে বেদের ঋষির দৃষ্টি নিবদ্ধ "তমসঃ পরস্তাৎ", সমস্ত জীবের, সমস্ত জগতের অন্ধ তমসের অন্তরালে যে অদৃষ্ট আলোক তাহার উপর, কিন্তু সাহিত্য-ঋষি এই মর-জগতের হাসি-কান্নার ভিতর, এখানকার ভাবনা চিন্তা, খেলা ধূলার ভিতর, মানব জীবনের ভিতর, এই নশ্বর প্রকৃতির ভিতর চক্ষু ডুবাইয়া তাহার ভিতর যুগপৎ গুপ্ত ও প্রকাশিত সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ ধ্যান করেন।

যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, বা যাহা কিছু জগতে কোনও না কোনও সময়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এবং যাহা কিছু সমাজের উপকারী তাই যে সৎসাহিত্য তাও নয়। এই হিসাবে যদি সাহিত্যের পরিমাণ করা চলিত তবে শিশু-শিক্ষা ও কথামালা বঙ্গ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত।

সমাজের উপকার অপকারের মানদণ্ড লইয়া সাহিত্যের গুণ বিচার করিলে প্রকৃত সাহিত্য রসের অবমাননা করা হয়। "বিষবৃক্ষ" পড়িয়া কতগুলি মেয়ে বিষ খাইয়াছে, "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িয়া কত হিন্দু কুলবধূ স্বামী ত্যাগ করিয়াছে আর বিধবা উন্মার্গ-গামিনী হইয়াছে, "আনন্দ মঠ" পড়িয়া কতগুলি যুবক ডাকাতি করিতে নামিয়াছে, এ হিসাব সাহিত্যের হিসাব নয়, ইহাতে সাহিত্যের ভালমন্দ যাচাই করা চলে না। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর সামাজিক আদর্শ কতখানি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, যে সব অনুষ্ঠানের উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তুমি বা আমি বিশ্বাস করি তার কতটা তিনি ভাঙ্গচুর করিয়াছেন এ সব কথা সাহিত্য সমালোচনায় নিতান্ত অবান্তর।

ভ্রমর গোবিন্দলালের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত কি না এ কথার আলোচনা শুনিয়াছি। ইহা হিন্দু কুলনারীর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া নিন্দা শুনিয়াছি। এ সব সমালোচনা যে অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা জানি, জানি যে বঙ্কিম-চন্দ্র আমাদের প্রাচীন সমাজেই একটা লুপ্ত আদর্শ মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাই ভ্রমরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, জানি যে মহাপাতকী স্বামীর সহবাস পত্নীর পক্ষে শাস্ত্রানুসারে অকর্ত্তব্য। কিন্তু এসব সমালোচনা সত্য হইলেও ইহাতে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" গৌরবের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। ভ্রমর চরিত্র শাস্ত্রীয় হউক বা অশাস্ত্রীয় হউক, ইহা সত্য কিনা, ভ্রমরের প্রত্যেকটি কথা ও কার্য্য তার চরিত্রের ও অবস্থার সঙ্গে সুসঙ্গত কি না ইহাই বিবেচ্য। যদি সমস্তটা ভ্রমর চরিত্র সত্য ও সুশোভন হয়—এবং ইহার ভিতরকার সত্যটা যদি একটা নূতন দৃষ্ট সত্য হয় তবেই এ চরিত্র সাহিত্যে উচ্চপদ লাভের যোগ্য,—তাহাতে হিন্দু সমাজ থাক বা ভাসিয়া যাক।

সমাজ ভাসিয়া যাক এমন ইচ্ছা যে আমি করি না তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সমাজে যদি এমন কিছু থাকে যাহাকে বাঁচাইবার জন্য সত্যকে ঠেলিয়া তফাৎ করিতে হইবে তবে সে জিনিষটা রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। সমাজের ভিতর তাই স্থায়ী ও হিতকর, যাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সমাজ রক্ষার খাতিরে সত্যকে ভয় করিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। কোনও সাহিত্যিক কোনও সত্যকে উলঙ্গ করিয়া সমাজের সামনে উপস্থিত করিলে যদি ভয় পাইতে হয় তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের সমাজের ভিতর কোথাও এমন একটা অসত্য আছে যাহা সত্যের ভয়ে কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে এমন গ্রন্থ থাকিতে পারে যাহাতে সমাজের ভয় পাইবার যথেষ্ট হেতু আছে কিন্তু সে ভয়ের কারণ এই যে এই জাতীয় গ্রন্থ একটা অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইতে চায়। Anatole France, Zola র উপন্যাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর সমালোচ-নার মূল সূত্র ইহা নয় যে Zola র গ্রন্থ সমাজের পক্ষে অহিতকর—তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে Zola ফরাসী নরনারীর জীবন যে ভাবে দেখিয়াছেন ও চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অসত্য এবং অসত্য বলিয়াই তাহা দুষ্য। Zola সম্বন্ধে এ অভিযোগের সত্য মিথ্যা আমি বিচার করিতে চাই না, Zola র ভিতর তিনি যে দোষ দেখিয়াছেন France এর নিজের লেখা কি পরিমাণে

সেই দোষে কলুষিত তাহাও আলোচনা করিতে চাই না—আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে সাহিত্যের বিচারে এই মানদণ্ডই একমাত্র মানদণ্ড—সাহিত্য সত্য কিনা তাহাই বিচার্য্য। যদি সত্য হয় তবে তাহাতে সমাজের ভয় পাইবার কিছু নাই।

উপন্যাস ও কাব্যকে সত্য বলিলে বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষ হইতে ঘোরতর আপত্তির সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদের মতে সত্য সেইটা যাহাকে পরীক্ষাগারের যন্ত্রের ভিতর দিয়া চুয়াইয়া লওয়া যায় বা লজিকের বাটখারায় মাপিয়া লওয়া যায়। কাব্য ও উপন্যাস কল্পনা। কিন্তু সত্য ও কল্পনার ভিতর এই যে বিরোধ ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সাহিত্যের কল্পনা সত্যের বাহন মাত্র, ইহা অসত্য নয়। কবি যখন ফুলের হাসি দেখিয়া আত্মহারা হন বা নীরব নিশীথে চন্দ্র তারকার নিভৃত প্রেমসম্ভাষণের কথা গান তখন তিনি যাহা বলেন তাহা নিছক কল্পনা। কিন্তু এ কথা সেই উপভোগ করিতে পারে যে ইহার ভিতর সত্যের সন্ধান পাইয়াছে—যে নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও একদিন এই ভাবে ভাবিত হইয়াছে এবং এই কবির ভাষায় সেই ভাবের স্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছে। ইহার ভিতর যে সত্য তাহা Botany র সত্য নয়, Astronomyতে ইহা অগ্রাহ্য, Physicsএ ইহার স্থান নাই, কিন্তু ইহা সত্য মানবের অন্তরে। প্রকৃতি মানবের প্রাণে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে এ সব কল্পনা সেই সত্য অনুভূতির একটা অসম্পূর্ণ প্রকাশ মাত্র। এই সত্য যে কাব্যে আছে তাহাই কাব্য, আর যেখানে ইহা নাই তাহা যতই অলঙ্কৃত হউক না কেন তাহা কেবলি পদ্য। তেমনি ঔপন্যাসিকেরও প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য সত্য। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী, তাহার ঘটনা বিন্যাস সবই কাল্পনিক, কিন্তু এ সব কল্পনার সৃষ্টি হয় হৃদয়ের তপ্ত রক্তধারায়, জীবন্ত সত্যের ইহা প্রকাশ।

* * *

Jerome K. Jerome বলিয়াছেন "We write with our heart's blood". ঔপন্যাসিক নিজের কল্পনা-প্রসূত পাত্রীর মুখে আপনার অন্তরে প্রকাশিত সত্য ফুটাইয়া তুলেন, নিজের অনুভূত বেদনা তাহাদের ভাষার মধ্য দিয়া ধ্বনিত করেন। যেখানে আপনার ভিতর এই অনুভূতি নাই সেখানে ঔপন্যাসিকের লেখা অসার ও প্রাণশূন্য হয়। লেখককে আপনার সৃষ্ট নরনারীর অন্তরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাদের অন্তরের কথা আয়ত্ত করিতে হয় এবং এমনি করিয়া লিখিলেই উপন্যাস সার্থক হয়।

* * *

ঔপন্যাসিক যে নিজের সৃষ্ট পাত্র পাত্রী ও ঘটনাবলীর কাছে কতটা পরাধীন তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। যে সত্য আর্টিষ্টের ঋষির দৃষ্টি লইয়া জন্মিয়াছে সে যেমন ছবি আঁকিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে না, ঔপন্যাসিকও লেখায় তেমনি অস্বাতন্ত্র্য অনুভব করিয়া থাকেন। নিপুণ চিত্রকরের ভাবাবেশে তার চোখের সামনে একটা ছবি ভাসিয়া ওঠে—সেই ছবিকে তিনি পটের উপর ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া যে সব রেখাপাত করেন সেগুলি তাঁর নিজের স্বেচ্ছাচারের ফল নয়। তাঁর তুলিকার প্রত্যেকটি স্পর্শ তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট এই ছবির দিকে চাহিয়া নিয়মিত করিতে হয়, প্রত্যেকটি রেখা প্রত্যেকটি বিন্দু এমন ভাবে পরখ করিয়া দিতে হয় যাহাতে সে চিত্রটী সেই ভাবের

ছবির অনুরূপ হইতে পারে, তার ভিতর যে রেখাশূন্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই যথাসম্ভব সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। তাই চিত্রকর অনেক সময় এক একটা হাত, এক একটী অঙ্গুলী, একটী রেখা, কি মুখের কোণের একটা রেখা দশবার দশরকম করিয়া আঁকিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করেন, দশবার মুছিয়া শেষে একটী রূপ তাঁর ধ্যানদৃষ্ট মূর্ত্তির সঙ্গে মিলাইয়া তাহাই আঁকিয়া ফেলেন।

ঔপন্যাসিকের মনেও অনেক সময় সত্যের আভাস এমনি অস্পষ্ট আলোকের মত জ্বলিয়া উঠে, ক্রমে তাহা একটি কাল্পনিক চিত্রে আকারিত হইয়া উঠে। এই চিত্রকে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া অসংখ্য খুটিনাটির ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ রূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় উপন্যাস রচনা হয়। এই যে অসংখ্য খুটিনাটি ইহার কল্পনা ও নির্ব্বাচনে ঔপন্যাসিককেও চিত্রকরেরই মত দশরকম পরিকল্পনা লইয়া তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট সেই চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হয়, অনেক সময় গড়িয়া ভাঙ্গিতে হয়, লিখিয়া মুছিতে হয়। কতটা ভাঙ্গিতে চুরিতে হয় তাহার সামান্য ইঙ্গিত মাত্র কখনও কখনও বাহিরের জগতে প্রকাশ হইয়া পড়ে কিন্তু অনেক সময় ঔপন্যাসিকের প্রাণের সে গোপন কথাটা প্রাণের নিভৃত কন্দরেই থাকিয়া যায়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

নব জাগরণ

উদ্বুদ্ধ জনশক্তি আজ আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়। কিন্তু আজও উহা সকাতরে ও সসম্মানে সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষকে এই প্রতিষ্ঠা যজ্ঞের পৌরহিত্যে অভিষিক্ত করিতে আমন্ত্রণ করিতেছে। যদি এই আহ্বানের কোন সাড়া না পৌঁছায় তবে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি বলে এই জনশক্তি আপন প্রতিষ্ঠা আপনি সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া লইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। এবং ইহাই বিধাতার অলঙ্ঘ্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।

প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হয় না আদৌ, বিলম্ব হয় জাগরণে এবং যত সাধনা এই জাগরণের জন্যই; একবার কোন প্রকারে জাগ্রত হইতে পারিলে এই আত্মশক্তি পর্ব্বতগৃহত্যাগিনী বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত সকল বাধা বিপত্তি আপন অপ্রতিহত গতিতে চূর্ণ করিয়া দিয়া আদর্শের দিকে ছুটিতে থাকে এবং আদর্শে পৌঁছিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম।

সমগ্র পৃথিবীময় আজ এই জাগরণের কি এক সজীব প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে আত্মবিস্মৃতির মোহে আচ্ছন্ন এই ভারতবর্ষে সেই প্রতিধ্বনির সাড়া পৌঁছিয়াছে। পৌঁছিয়া কাল নিদ্রায় নিদ্রিত জাতির জাগরণে বিলম্ব হেতু ধিক্কার দিয়া বলিতেছে "হম উত্তিষ্ঠ" "ময় ভূঁখা হু!" তাই মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে, যমুনা উজান চলিয়াছে।

পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ যখন বল্কল পরিয়া লজ্জা নিবারণ ও বন্য পশু হনন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত, ঠিক সেই সময় যে দেশ ওঁকার ধ্বনি দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অসীমকে সসীমের করতলগত করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছিল, সমগ্র পৃথিবীকে জাগ্রত রাখিতেই তার উদ্ভব ও বহু উপদ্রবের মধ্যেও তাহার এই অমর স্থিতি। কিন্তু তাহার এই দীর্ঘকালব্যাপী গভীর নিদ্রা কেন? কে বলিবে কেন? কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার এ এক নির্ম্মম পরিহাস। তাই জগতময় এই বিদ্রূপের করতালি!

যে দেশের ও যে জাতীর জাগরণে জগতের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা, যে জাগরণের জন্য পৃথিবী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া অন্ধ হয়ে গেল, যদি তার নিদ্রা সহজে না ভাঙ্গে তা হ'লে তার নিদ্রা ভাঙ্গিতে তীব্র ঔষধ চাই। এই নিষ্পীড়ন, নিষ্পেষণ শোষণ, প্রভৃতি অত্যাচার সেই তীব্র ঔষধ এবং এই সকল নিত্য দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ঝঞ্ঝা তাহার উৎকট অনুপান। কি সনাতন বিধান। কারণ জাগিতে যে হবেই, গত্যন্তর নাই।

শুধু কি তাই? সমাজ-জননী আজ ছিন্নমস্তারূপিনী! আপনি আপন ছিন্ন মস্তিস্কের রুধির পানে নিমগ্না, বিভোরা। তাই ভাই ভাই হিন্দু মুসলমানের এত দিনের নিষ্প্রয়োজনীয় অকারণ বিরোধ, তাই নীরব নিম্ন শ্রেণীর প্রতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর এই নিদারুণ অত্যাচার, নির্য্যাতন, অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের এই উদাসীনতা পুত্র স্থানীয় প্রজার রক্তে পুষ্ট ভূম্যধিকারীর এই নিষ্ঠুর অবাধ শোষণ! মার কি ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী রূপ গো!

কিন্তু কোন খানেই আত্মবিস্মৃতি চিরস্থায়ী হয় নাই। বেদ বেদান্তের প্রসূতি ভারতবর্ষের কা কথা। যার অতীত এত উজ্জ্বল, এত গৌরবময়, যার অসংখ্য মহীয়ান আদর্শ তার সুপ্তি ভঙ্গ ক্ষণেকের ঘটনা। সে সুপ্তি ভাঙ্গিয়াছে; এখন সেই জাগ্রত অপরাজেয় শক্তি আপন স্বর্ণ সিংহাসনে লুপ্ত অধিকার লাভ করিয়া রাজছত্রতলে বসিবে। তাহার যে বিরাট আয়োজন স্বতঃই চলিয়াছে তাহা যে দেখে না সে অন্ধ, ভ্রান্ত।

'বড় সুখের স্বপন বুঝি ভাঙ্গিতে চলিল? কি করিবে উপায় নাই। প্রতিকুলাচরণ করিতে যাও, বায়ু তাড়িত শুষ্ক পত্রের মত উড়িয়া যাইবে। সে নিষ্ফল উদ্যমে সর্ব্বস্ব হারাইবে। অতএব হে ভারতবাসী, উদ্বুদ্ধ জনশক্তির অনিবার্য্য গতির পথ ছাড়িয়া দাও, তাহাকে প্রণাম কর, বরণ কর। আর যদি অমৃতের অধিকারী হইতে চাও তবে সার্ব্বজনীন প্রেম ও শান্তির শ্বেত বিজয় বৈজয়ন্তীর নিম্নে সমবেত হও। আত্মত্যাগ তোমার ব্রত হউক।

জাগরণ। কুষ্টিয়া

মাসিক কাব্য-সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

ভারতবর্ষ। আশ্বিন—

নবদাম্পত্য আলাপ। শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। কবি বলেছেন' 'চাপিয়া রাখিতে পারিনে আরতো হৃদয়ে উঠিছে বাজি'— কবির সংযমের বড় অভাব। সংযম অভ্যাস করিলে ভাল হয়। কবিতায় রস জমে নাই উপরন্তু সুরুচিরও বড়ই অভাব।

"ঢেকুরের সাথে বৌডাক শুনে বধূ কলতলায় গিয়ে হাঁচির সঙ্গে 'যাচ্ছি' বলিল মাকে অঞ্চল দিয়ে।" ব্যাপারটা ত্রিপদী ছন্দে বড় বিশ্রী শোনাচ্ছে।

"কুকুর রদ"—কবি কুমুদ রঞ্জন। রাজবংশের উপর ব্রহ্মশাপ—এক পুত্র অবশিষ্ট তাও মৃতকল্প—ডাক্তার বৈদ্য হলো হদ্দ। একজন

ক্ষেপা ক্ষুদের বদলে একমুঠো ছাই দিয়ে গেল। সেই "বিভুতি অমিয়া পান করি" পুত্র সুস্থ হলো। কবিতার বিষয়টা এই—আখ্যানবস্তুতেও বৈশিষ্ট্য নাই রচনাতেও কোনো সৌষ্ঠব নাই—বরং স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক।

"সার্ব্বভৌম স্বপ্নমাঝ শুনিতে পেলেন আজ"—স্বপ্নমাঝকে স্বপ্নমাঝে করিলেও ভাল শোনায় না।

"জ্যোতিষী নির্ব্বোধবৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত" অর্থ স্পষ্ট নহে—পংক্তিটি জড়তায় পঙ্গু। কবি শেষে আবার অসত্যকে একটু বেত্রাঘাত করেছেন—কবিতার moral টা গদ্যে আর বল্‌তে হবে না।

মোহময় হোকধরা ভক্তহৃদি সত্যেগড়া
তার কথা ব্যর্থ করে কে ?
তাহার সার্থক সব কিছু নাহি অসম্ভব
সত্য তাই, যা বলিবে সে।

কবিতাটি কুমুদ বাবুর ইস্কুলের ১ম শ্রেণীর কোনো বালকে রচনা করলে আমরা প্রশংসা করতাম।

মেঘ। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। ভারতবর্ষে মেঘ দর্শনে কবিতা লেখার প্রথা সনাতন। কবিযশঃপ্রার্থী শৈলেন্দ্র কৃষ্ণও ছাড়বেন কেন ? কিন্তু মেঘের প্রতি এত অবিচার বজ্রও করেন না। কবিতার একটি পংক্তিও নির্দ্দোষ বা সুন্দর হয় নাই। ডম্বরুধ্বনি বুঝি, কিন্তু কবি "ধ্বনিডম্বরু" শুনায়েছেন। "অশ্বত্থের আর্ত্তনিনাদ তীব্র বিলাপ তটিনীর ছাপি সমস্ত, এস বাজাইয়া তব ডম্বরু গম্ভীর" টেনেবুনে কোনোরূপে মিলানো। তৃতীয় শ্লোকের ১মে আবার অক্ষর কমে গেছে। "পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে সারা মাথাইয়া দাও মায়াঘোর" অক্ষমতার চরম নিদর্শন।

"স্মরণে।" শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব, মিলন বিরহ বিদায় বাদল ইত্যাদি এবং বনানী মুখানি, কম' নিলীন ইত্যাদি শব্দবিন্যাসেও কবি কবিতাটিকে জমিয়ে তুল্‌তে পারেন নাই। গুছিয়ে লিখতে পারলে তিনটি সনেটের বক্তব্য একটিতেই সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। কবি উদাস করুণ ঢঙ্গে লিখে ভালই করেছেন নতুবা অসারতাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত।

বিয়ের পদ্য। শ্রীকালিদাস রায়।—আজকাল বিয়ে হলেই তাতে কবিতা ছাপা চাই—"কারণ,—বর না হলে চলে কিন্তু বিয়ের পদ্য চাই।"—কিন্তু সে পদ্য কে যে পড়ে তার খোঁজ নেই অথচ যারা একটু লিখ্‌তে পারে তাদের মহা বিপদ,—আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব (শালা শালী বিশেষতঃ) বিয়ের পদ্যের জন্য তাকে অস্থির করে' তোলে। সাধারণতঃ এসকল কবিতা ভালও হয় না—সেই একঘেয়ে মামুলী বাগ্‌-বিন্যাস—সেই বসন্ত বর্ণনা (শীত গ্রীষ্মে ও)—সেই নববধূর রূপ বর্ণনা—সেই একরাত্রেই গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার কথা—শেষে আশীর্ব্বাদ শুভবাসনা ও একবার ভগবানকে স্মরণ করা। কবি এই শ্রেণীর কবিতা লেখাকে ব্যঙ্গ করে' এই গানটি লিখেছেন কবি—ঠিকই লিখেছেন—

সবাই তবু দিতে গেলে একএক খানা লয়
কুশাসনের অভাব হলে বসাও তাতে হয়।
কেউবা তাতে জুতা পোঁছে রুমাল করে'
মুখও মোছে
আমিও ভাই ব্যাভার করি যখনই কামাই।"

পরিতাপের বিষয়, সেদিন একজন সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েট কবির বিয়েতে দেখলাম শিক্ষিত সাহিত্যিক বন্ধুগণ একখানা বই লিখে-ছেন। বইখানা ছাপতে বেশ খরচ হয়েছে

বলে' মনে হলো কিন্তু প্রায় সকল লেখা-গুলিতেই বৈশিষ্ট্য নাই এবং সেগুলির কোনো স্থায়ী মূল্যও নাই। বিবাহের পরদিনই তাহা বিবাহরজনীর মালাগুলির মত শুকনো ও অকেজো হয়ে গেল। বিয়ের কবিতায় আর কারো লাভ থাক আর নেই থাক্ ছাপাখানাওয়ালাদের বেশ দু'পয়সা হয়। শুনেছি অনেক ছাপাখানা বিয়ের প্রীতি-উপহার ছেপেই বেঁচে আছে।

পল্লীপ্রান্তে। শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—এত বিশ্রী যে সমালোচনারও যোগ্য নয় হেমবাবু যদি দশমবর্ষীয় বালক হতেন তা হলে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারত।

উন্মনা। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।—রচনায় মাধুর্য্য আছে আন্তরিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাসী। ভাদ্র।—

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ২টী সঙ্গীত।

(১)

জলে-ডোবা চিকন শ্যামল
কচি ধানের পাশে পাশে,
ভরা নদীর ধারে ধারে
হাঁসগুলি আজ সারে সারে
দুলে দুলে ঐযে ভাসে।
অম্‌নি করেই বনের শিরে
মৃদু হাওয়ার ধীরে ধীরে
দিক্-রেখাটির তীরে তীরে
মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে॥
অম্‌নি করেই অলস মনে
একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল
যায় ভেসে আজ অকারণে।
অম্‌নি করেই কেন জানি
দূর মাধুরীর আভাস আনি'
ভাসে কাহার ছায়াখানি
আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে॥

(২)

কান পেতে রই আমার আপন
আঁধার হৃদয়-গহন-দ্বারে,
গোপন-বাসীর কান্না-হাসির
গোপন কথা শুনিবারে॥
ভ্রমর সেথায় হয় বিরাগী
কোন নিভৃত পদ্ম লাগি',
রাতের পাখী গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে॥
কে যে সে মোর কেই বা জানে,
কভু তাহার দেখি আভা,
কিছু বা পাই অনুমানে,
কিছু তাহার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাবায় পায় কি কথা?
সে যে জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তারে॥

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর ছয়লাইনের 'প্রেম'—ব্যর্থ।

শ্রীপ্রবোধ বসুর "সন্ধ্যাছায়া" ও তথৈবচ।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরীর "চিরন্তনী"—রচনা ভঙ্গি অপরিণত—কিন্তু—কবিতায় কিশোর কবির ভাবুকতার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। গেঁথে+বেঁধে, জাগে+তাকে, মাকে +আছে, ইত্যাদির মিলগুলি ভাল নয়। বার বার সে+গো+যে ইত্যাদি তুবৈচছি লাগাতে হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ে' কবিতা লিখ্‌তে বসেন—রবীন্দ্রনাথের এক এক টুকরো ভাব নিয়ে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তাকে একএকটা কবিতার আকার দেন। কবিতাগুলির যা কিছু ভাল তা সেই রবীন্দ্র নাথের ভাবের প্রতিবিম্বটুকু, এঁদের অভিজ্ঞতা শিক্ষাদীক্ষা যা কিছু রবীন্দ্রনাথের কাব্য হতেই। নিজের চোখ দুটো দিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখেন ও না—তাই স্বাধীন দৃষ্টির বা স্বাধীন চিন্তার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। এ সংসারে, এ সমাজে বা বিশ্ব-প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসিনী দৃষ্টি

এড়ায়েছে এমন অল্প জিনিসই আছে যা দু'একটা এড়িয়ে গেছে সেইগুলোকে সন্ধান করে' বার করে ছন্দে রূপ দিলে সে কবিতা পড়তে আগ্রহ জন্মে। রবীন্দ্রনাথ যা দেখেছেন যা ভেবেছেন বা যা যা অনুভব করেছেন তা নিয়ে যে কবিতা লেখা চলে না এ কথা বলছি না কিন্তু ছন্দে তাকে অভিনব ভঙ্গি দিতে না পারলে চর্ব্বিতচর্ব্বন করে' লাভ কি ?

রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যগণ কেহই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিশ্চিহ্ন ভাবে ডুবে যান নাই। কেহ নব নব ছন্দে ও নব প্রবর্ত্তিত ভঙ্গিতে রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথকেও চমৎকৃত করেন—কারো কারো ভঙ্গিতে লালিত্য মাধুর্য্য ও সরসতা এতই অপূর্ব্ব যে তা রবীন্দ্রশিষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

কেহবা প্রাচীন কবির ভাব নিচয় রবীন্দ্রনাথের ছন্দে গুম্ফিত করে' যশস্বী হয়েছেন—কেহবা বাংলার দূর পল্লীর অন্তঃস্থলে (যেখানে কবিগুরু প্রবেশ করিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই) দীনদুঃখীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে নব নব ছন্দে ফুটায়ে তুলেছেন। আবার কেহবা সমগ্রজাতির আত্মমর্য্যাদাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য সম্পূর্ণ নিজস্বশক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করছেন।

কিন্তু এই উদীয়মান কবিগণ বিশিষ্ট কোনো শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন না। অনেকে আবার রবীন্দ্র শিষ্যগণেরই অনুকরণ করছেন। মনে হয় ইঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও তৎশিষ্যগণের কবিতা পড়িয়াই কবি হয়েছেন,—স্বাধীন দৃষ্টি, ভাবুকতা বা বিশ্বপ্রকৃতির রূপরস গন্ধস্পর্শের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় এঁদের সামান্যই আছে।

"সেয়ানা বোকা"—শ্রীনরেন্দ্র দেব। অযথা দীর্ঘ সে জন্য কতকটা রসশূন্য।

"সঙ্গীত"—শ্রীদিনেন্দ্র কুমার ঠাকুর—চলনসই।

রাধাচরণের "খোকার হাসি" তেমন ফোটেনাই। এক একটি পংক্তির কোনো পরিষ্কার অর্থ হয় না এবং আবোল তাবোল প্রলাপ বলে' মনে হয়।

যেমন—

ডালিম ভাঙা রাঙা ফুলের প্রথম বিকাশ বাণী
কৃষ্ণচূড়ার আঁচল যেন আনন্দে উদাসী
আবীর বাগের গুলাব যেন স্বপন দেখায় আসি।
সংসারেরি কাঁটায় কেনয় কোমল অভিলাষী

এগুলি আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখালাম না—পাঠকই বিচার করিবেন। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় কবিতায় এইরূপ আবোল তাবোলেরই পক্ষপাতী বেশী বলে' মনে হয়। যে সকল কবিতায় একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয় এবং যে সকল কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাবভঙ্গিতে রচিত প্রবাসী তা—ভালবাসেন না বলে' মনে হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর "শিবানী" কবিতার ভাবটি মন্দ নয়—কিন্তু বড় ঔদাসীন্যের সহিত রচিত।

'বনফুলের'—'পাখীটি' যদিও বুলবুলি কিন্তু বুলি বেশ মধুর।

লক্ষ্মী। মন্দ নয়।

কালোমেঘ। কবিতা সুরচিত।

শোকসংবাদ

উপাসনার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক উদ্ভ্রান্তপ্রেম রচয়িতা আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন। তিনি কীর্ত্তিমান পুরুষ, বাঙলার ঘরে ঘরে আজ তাই তাঁহার অভাব অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমযুগের প্রবীণ সাহিত্যিক চন্দ্রশেখরের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

নিউইয়র্কের বিরাট গ্রন্থশালা
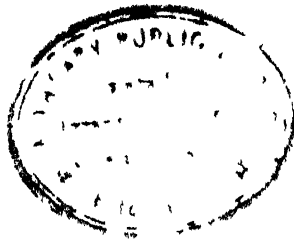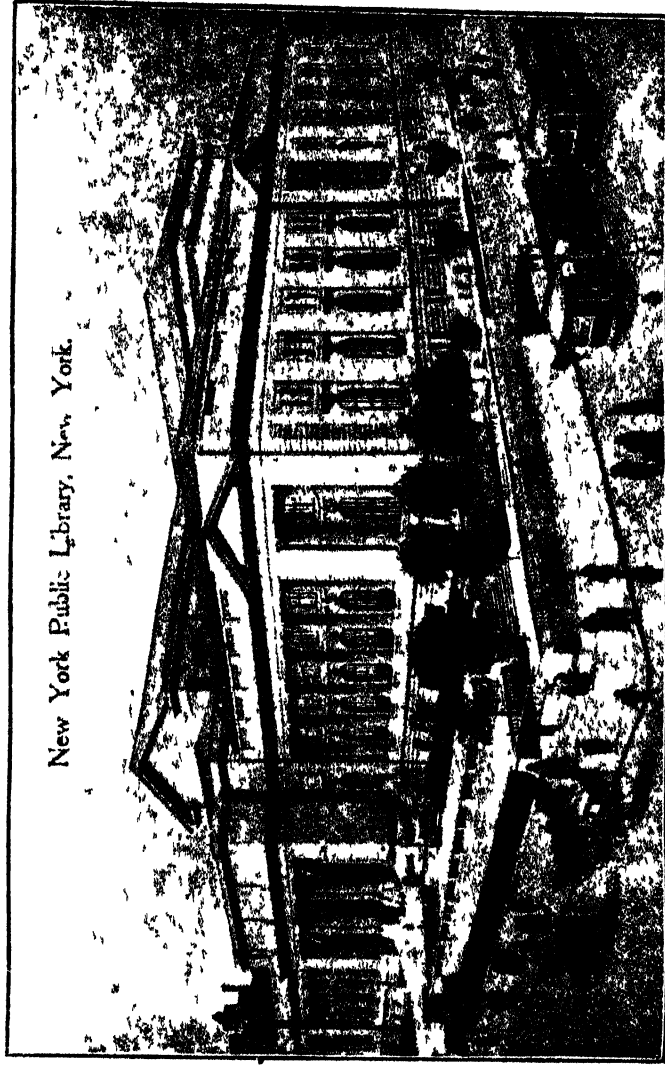
সাত কোটি টাকায় এই গ্রন্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার ৩০টি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী একত্র করিলে এই গ্রন্থশালার ধারণা করা যায়।

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩২৯ { ৫ম সংখ্যা

তরুণের আহ্বান

[শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু]

শ্রদ্ধাস্পদ ভদ্রমণ্ডলী, প্রীতিভাজন সদ্ধার্গ—আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আমি আপনাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এত সৌভাগ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে সেটা এই যে—আমি আপনাদের আহ্বান করছি—বাংলার আনন্দ উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, বিত্ত মানের মধ্যে নয়, শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে নয় ;—আমি আপনাদের আহ্বান করছি—দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমানের মধ্যে,—অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে,—অত্যাচার, অবিচার অনাচারের মধ্যে,—সবার উপর মনুষ্যত্বের পদে পদে নির্য্যাতনের মধ্যে।—এই ত আমাদের সাধনার ক্ষেত্র ; সেখানে মাধুর্য্য কিছু নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য আছে। সেইখানে নিষ্ঠুর দুঃসহ আবির্ভাবের মধ্যে আমাদের যোগ-সাধনার জন্য দাঁড়াতে হবে। আনন্দ এই যে সেখানে ভোলাবার কিছু নেই—অপরিসীম রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে—পশু শক্তির সাধনায় নয়, কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়, কু-অভিসন্ধির গোপন সন্ধানে নয় ;—সেখানে সমাহিত আত্ম-সাধনার দ্বারা, সর্ব্বস্পৃহা-শূন্য পুণ্য-প্রচেষ্টার দ্বারা, নর-নারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মুহ্যমানজাতির উদ্বোধন করতে হবে।

তাই বলছিলাম—এত বড় দুশ্চর্য্য সাধনায় আপনাদের আহ্বান করবার সুযোগ যে আমি পেয়েছি—এ আমার চরম সৌভাগ্য ; আর আমার পরমানন্দের কথা এই যে—যাদের আমি এই কঠিন তপস্যা করবার জন্য সত্যের পথে আহ্বান করছি—তারা বাংলার তরুণ সম্প্রদায়। আমি আজ দেহে, মনে, আদর্শে, উদ্দেশ্যে

এক হয়ে তাদের কাছে আমার প্রীতিঅর্ঘ্য উপহার দিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলি,—"হে আমার তরুণ-জীবনের দল, তোমরাইত যুগে যুগে, দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে এসেছ; মুক্তি পথের নিশান ধারী তোমরাইত চিরদিন অগ্রগামী হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ। তোমরা যে জেগেছ, অলস বিলাস পরিহার করে তোমরা যে আত্ম-ভোলা হয়ে পথে চলবার জন্য দাঁড়িয়েছ—তা' আমি জানি—জানি বলেইত তোমাদের আহ্বান করার সাহস আমার হয়েছে।

প্রলয়ের ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল; বর্ষার দুর্য্যোগকে মাথায় করেও আমরা সমান দাঁড়িয়ে আছি। সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ্য-বিধাতা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন ত আর বসে বসে তর্কযুদ্ধ ক'রে জাতির লজ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের অপমানকে দিন দিন বাড়ালে চল্‌বে না।

চেয়ে দেখ যেখানে আমাদের সত্যকার দেশ, যেখানে আমাদের জীবনের আশা, ভরসা উৎসাহ, মান, সম্পদ, সমাদর—সেখানে আমরা নাই। সেখানে

"গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার
নিঝুম দিবস রাতি।
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে
তৈল বিহীন বাতি।
দম ধরে আছে পাতাটী কাঁপে না,
ছম্ ছম্ করে দেহ।
দেবতা-বিহীন দেবালয় আজ,
জন-হীন সব গেহ!
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য,
রণ-তাণ্ডব সম।
আপন রক্ত আপনি শুষিছে,
নিষ্ঠুর নির্ম্মম।"

তাই আমাদের দেশের বেদনাময় মাতৃমূর্ত্তি, নয়নজলে ছিন্ন অঞ্চল ভিজিয়ে আমাদেরই আশায় বসে আছেন।

যেখানে জীবনের লীলা-খেলায় আনন্দের লুঠ হ'ত, যেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দের উৎসগুলি প্রাচুর্য্যে আমাদের ভাণ্ডারে উপচে প'ড়ত; "যেখানে জলে সুধা, ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণপ্রদায়িনী শক্তি" ছিল; যেখানে গোলাভরা ধান, গাল-ভরা হাসি ছিল,—সেখানে আজ বিরাট শ্মশান খাঁ খাঁ করছে—প্রেতের ছায়া দেখে অর্দ্ধমৃত প্রাণ শিউরে উঠছে; লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে—এক বিন্দু জল নাই, এতটুকু জীবন নাই। তোমরা জাগো ভাই, মায়ের পূজার শঙ্খ বেজেছে, আর তোমরা তুচ্ছ দীনতা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না।

এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ—আজ মা সত্যই বুঝি ডেকেছেন। ভাই একবার ধ্যান নেত্রে চেয়ে দেখ—চারি দিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! কি বিরাট, কি মহিমাময়! শ্যামায়মান-বন-শ্রীতে নিবিড় কুন্তলা, নদী-মেখলা, নীলাম্বর পরিধানা, বরাভয়-সংবিধায়িনী সর্ব্বাণী সদা-হাস্যময়ী, সেইত আমার জননী! শারদ-জ্যোৎস্না-মৌলি-মালিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অসুর-দর্প-খর্ব্ব-কারিণী, মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী—আজ আমাদের হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তক-রাগরঞ্জিত পা দু'খানি রেখে বল্‌ছেন—"মা ভৈঃ জাগৃহি।"

জাগো, মায়ের সন্তান, দূর কর তোমাদের বৃথা তর্ক, ধার-করা কথার মালা,

ধূলায় ছুড়ে ফেলে দাও তোমাদের বিলাস ব্যসন; মুছে ফেল তোমাদের ললাট হ'তে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ঐ দাসত্ব—কালিমার রেখা।

নবীন সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টিশক্তির অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সমস্ত উন্মাদনা সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা যেন আজ এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ছোট নই—আমরা বড়, নইলে সমস্ত ম্রিয়মান গত প্রাণ উপাদানের উপর এই নব-সৃষ্টির দুরূহ ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন কেন? মনুষ্য-জীবনের পরম সার্থকতা—সৃষ্টির আনন্দে। আমরা আজ সেই সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব। —পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহঙ্কারের জন্য নয়, কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের আত্মম্ভরী জ্ঞান হইতে নয়—আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা, যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করব, তা' শুধু নিজেদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য—আত্মবিস্মৃত পুরুষ সিংহের জাগরণের জন্য—মথিত নর-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য। অনাদি কাল হ'তে ভারতবর্ষের যে মহান্ আদর্শ পর-সেবা-ব্রতে প্রাবদ্ধ হয়েছে, তা এই সেবা-ব্রতই উদ্‌যাপিত হ'য়ে আমাদের সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে।

আমি জানি এই দুর্দ্দিনে আমাদের এ সাধনা অতি কঠোর, অতি ভয়ঙ্কর—

"পিছনে উঠিছে ঝড়,
সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নামমাত্র পথ-রেখা,
তাও আজ হয়েছে নির্জ্জন;
চরণ চলে না আর,
দেহ-লতা কাঁপে থর থর;
কণ্টকে সঙ্কট পথ,
চোখ দু'টি জলে ভর ভর।
তবু যে গো যেতে হবে.
থেমে থাকা মরণের দায়,
কেন মিছে থেমে যাও, হে পথিক!
ঘরের মায়ায়?
সর্ব্বহারা মহাপ্রাণ,
তাহারে কে রাখে বদ্ধ করে,
আলোর ইসারা আসে,
প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে।
মৃতদেহ আগুলিয়া,
সেই আছে নিশি-দিনমান
কে জানে আসিবে কবে,
এক বিন্দু অমৃতের দান।"

এই অমৃতের দানের আশায় আমরা থাকব—নিশ্চেষ্ট হয়ে নয়, অদৃষ্টবাদীর মত নয়, দুর্ব্বল পরমুখাপেক্ষীর মত নয়—আমরা আমাদের স্বাধীন আত্ম-স্বতন্ত্র কর্ম্মঠ শত শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদাজাগ্রত থাকব। সমগ্র বাংলার এইরূপ অসংখ্য কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেখানে কোনও কর্ম্মকেন্দ্র নাই, সেখানে উৎসাহী কর্ম্মী দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নূতন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যে সকল স্থানে কর্ম্মকেন্দ্র পূর্ব্ব হতে জাগ্রত অথবা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে, সেসবগুলিকে বর্ত্তমান কর্ম্মোপযোগী করে, নূতন প্রেরণা দিয়ে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত করে, একটা বিরাট কর্ম্মকেন্দ্রের অঙ্গীভূত করতে

হবে। আমাদের আদর্শ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে নানাভাবে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত সকল কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে একই দুর্লঙ্ঘ্য, অনিবার্য্য শক্তি আমাদের সমস্ত কর্ম্মসাধনাকে সেই একই পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এইরূপে আমরা "এক" হইতে "বহুতে" এবং "বহু" হইতে "একের" মধ্যে একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের সৃষ্টি করে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্রকে আন্তরিক ঔদার্য্যের দ্বারা সর্ব্বজনগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষে সুলভ করে, আমাদের কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও সম্প্রীতি ও ঐক্য বিধান করতে পারব। সেখানে রাজনীতির মতদ্বৈধের কোনও স্থান থাকবে না, সমাজপদ্ধতির কোনও বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠানকে গোঁড়ামীর দ্বারা বড় করে দেখা হবে না, বিভিন্ন ধর্ম্মের পার্থক্য কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না—সেখানে সমস্ত দেশবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, একই লক্ষ্যে, একই পথে আপন আপন মনুষ্যত্বকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করে আমরণ চলতে থাকবে।

জনশিক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্য্যাদা-বুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে। নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করে আত্মকর্তৃত্বহীন দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসোন্মুখ পল্লীসমূহের সংস্কার দ্বারা দেশের লুপ্ত সৌন্দর্য্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই সব বিভিন্ন কর্ম্মের ভার আমাদের কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের কর্ম্মকেন্দ্র ক্ষুদ্রই হউক আর বিরাটই হউক, যেখানে সহকর্ম্মীর সহায়তা, সহানুভূতি ও কর্ম্মকুশলতার অভাব, সেখানে কোনও কাজে সাফল্য লাভ করা যায় না। যেখানে সুখ দুঃখের ভাগাভাগি আছে, হাসি-কান্নার অংশ হিসাব আছে—সেখানে সাহচর্য্য আযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল কর্ম সফলতার গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কাজে সাধারণের হৃদয়-বিনিয়োগ হয়, তা' অসাধ্য হলেও সমবেত ইচ্ছা শক্তি ও প্রেরণার বলে সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। আন্তরিকতা-বিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভিশাপে দুষ্ট—কাজেই আত্মনাম ঘোষণার চেষ্টার মধ্যে কর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের মধ্যে সার্থকতা নাই। তাই বলি, আমাদের হৃদয় দিয়ে কাজ করতে হবে, "ছুঁৎমার্গ" পরিহার করে অস্পৃশ্যতা ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার বলে আলিঙ্গন করতে হবে। মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, বিবেকের গলা টিপে ধরলে কুকর্ম্ম আরও জোর গলায় প্রচারিত হবে। অন্তর থেকে যে কর্ম্ম-শক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে, যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে—সেই শক্তি, সেই বলকে আহুতির অগ্নির মত চিরন্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে।—আশা চাই উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই অনুকম্পা চাই—সবার উপরে মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের সাধনা—জীবন-ব্যাপী এই সাধনার মধ্যে আমাদের মুক্তি—নান্যঃপন্থা।

মিলনের এই পুণ্য দিনে, এই কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কল্পে, প্রারম্ভেই আমি আপনাদের আহ্বান করছি। এ আহ্বান তাঁর,—যিনি আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী, বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন আহ্বান করেছেন—ভোগ হতে বিরত হয়ে ত্যাগ করবার জন্য, অবসাদ থেকে জেগে উঠে কর্ম্ম

করবার জন্য, বিস্মৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমাদের জাতির ইতিহাসলব্ধ আত্মাকে অনুভব করবার জন্য। নারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করবার নয়। রোগে যে অবসন্ন, দারিদ্র্যে, নির্য্যাতনে যে কাতর তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—সে আদেশ আজ দেশের কাণে পৌচেছে, তাই আজ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন—বিলাস সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নয়—যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে নির্য্যাতন, যেখানে অপমান—সেখানে গিয়ে আজ তাঁকে পূজা করতে হবে। পুরাতন পুঁথি পড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে না, গান গেয়ে তাঁকে শুনাতে হবে—যে প্রেমের গানে রোগী বিছানা হতে বল পেয়ে উঠে দাঁড়াবে,ঋণ-ভার জর্জ্জরিত কৃষক সাহস করে কাঁধে লাঙ্গল তুলবে, অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবর্ষ সঞ্চিত দুঃখের গুরুভার লাঘব করবে।

আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো সমস্ত বাতাস হতে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সঙ্গীতের আনন্দধ্বনি আসছে—আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস-নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। এ কি উৎসাহ। এ কি আনন্দ। আমার মনে হয়—এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোন্ অপারের পার হ'তে আনন্দ এক সোণার সূতার কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হ'য়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিকিয়ে উঠছে- ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দ-স্রোতে ভেসে চলেছে;—আবার সেই সোণার সূতাই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙ্গা রাখী হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে—ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে, কর্ম্মীর সঙ্গে ভাবুককে।—এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পুণ্যদিনের ভরসার কিরণ সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন যিনি ওপারে, দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোক বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন—এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণ সূত্রের সৃষ্টি করছেন—তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়—জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে স্মরণ করব।

তর্পণ

[শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী]

বক্ষ আলোড়ি যে শোণিত জমে
চক্ষের কোলে আজ,
আর কি কখন রুধিবারে পারে
তুচ্ছ এ লোকলাজ ?
সুধু ফোঁটা দুই জল
নয়নের পুটে জমায়ে এনেছি
নিঙাড়ি হৃদয়-দল ;
সে সুধু তোমারি লাগি
অভাগার তুমি ছিলে যে গো প্রিয়া
সব দুঃখেরি ভাগী।

বুক ফাটা হা হা সর্ব্বনাশী যে
তবু হাসি আসে মুখে,
নুয়ে পড়ি তবু শুয়েত পড়িনে
সরস মাটীর বুকে।
রিক্ততার এ জ্বালা
তাহারি ফসলে সাজায়ে এনেছি
আজিকে আমার ডালা।

এই যে আগুন শিখা
এই দিয়ে দেখ মন্ত্র যে তোর
মর্ম্মে হয়েছে লিখা।
বসা মজ্জায় যে আগুণ জ্বলে
পুড়িয়া ক্ষার অস্থি
লোকের কথায় নেভে কি কখনও
দহনের জ্বালা তার ?

পাগলের মত ছুটি—
ভিতরে বাহিরে শত পরিহাস
হেসে করে লুটোপুটি।
তাতে কিবা আসে যায়
গেল ফাগুয়ার কুসুমের রাগ
পাষাণ পরাণে ভায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-জীবন

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

প্রাচ্য সমাজ বন্ধনের মূল কথা পরস্পর সহযোগীতা (co-operation),— আর পাশ্চাত্যের মূল কথা পরস্পর প্রতিযোগীতা (competition)। এই বিভিন্নতার আদি কারণ বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব। প্রাকৃতিক অভাবের তাড়নাতেই পাশ্চাত্য মানব আত্মরক্ষার দিকে আগে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচ্য মানবকে প্রকৃতির দানের প্রাচুর্য্য স্বভাবত উদার করেছে। এমন কি সে উদারতা নিজের প্রতি উদাসীনতা পর্য্যন্ত এনেছে।

ইউরোপীয়েরা যখন নগ্নগাত্রে বন্যজন্তু শীকার করে বর্ব্বর জীবন যাপন করছিল— প্রাচ্যের সভ্যতা-সূর্য্য তখন অস্তপ্রায়। গ্রীস

রোমের সভ্যতা তখনও জন্মগ্রহণ করে নি। কালক্রমে ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সভ্যতার পত্তন করে। গ্রীসের নগর-রাজ্য (City-state) হ'তে আরম্ভ ক'রে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের গঠনে মানুষের মনের বহু রকম বিচিত্র বিকাশ ধারা প্রদর্শিত হয়েছে। নানা সাহিত্য, আর্ট, দর্শন বিজ্ঞানের ফলফুলে প্রাচীন ইউরোপ সুসমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তখন এক জাতীর সহিত আর এক জাতির জীবন এতটা জড়িত ছিল না।

মধ্য যুগের ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তারের সহিত এক প্রকার Spiritual Hierarchy গ'ড়ে ওঠে,—একজনের উপর আর একজন ধর্ম্মযাজক, এই রূপে স্তরে স্তরে সংবদ্ধ এক ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় গঠিত হয় যারা পারলৌকিক বিষয়ে জন সাধারণের উপর স্বেচ্ছাচারী দেবতার আসন বিস্তার ক'রেছিল। পার্থিব সম্পত্তি বিষয়েও একজন দলপতির উপর আর একজন—এইরূপে ক্রমানবদ্ধ এক সম্প্রদায় (feudal system) দেশের শাসন ক্ষমতা আত্মসাৎ ক'রেছিল। প্রজাগণ ভূমির বিনিময়ে বিপদকালে সৈন্য হ'য়ে সাহায্য করবে—এই সর্ত্তে দলপতির অধীনে থা'কতো।

ধর্ম্মযাজকগণ বিভিন্ন দেশের হ'লেও তাদের মধ্যে একতা ছিল —সকলে নিজেকে এক শ্রেণীর লোক মনে করত। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক এবং রোমের পোপের মধ্যেও যেন একটা আত্মীয়তার সূত্র ছিল। জার্ম্মাণির নাইট্ (Knight) এবং ফ্রান্সের নাইটের মধ্যে যতটা একত্ব ভাব ছিল—জার্ম্মাণির নাইট্ ও একজন কৃষকের মধ্যে ততটা একত্ব ভাব ছিল না।

ক্রমে এই স্তর ভাঙ্গিয়া জাতীয় ভাব (Nationalism) সৃষ্টি হয়। আধুনিক ইউরোপের ইহাই বিশেষত্ব। ইংরেজ ধর্ম্মযাজক নাইট্ সাধারণ কৃষক —যখন জাতিগত স্বার্থের একত্ব বোধে একদিকে হয়। তখন জার্ম্মানি বা অন্য দেশের সমশ্রেণীর সঙ্গে মিতালি থাকে না। এই "জাতীয়তা" ইউরোপের সর্বনাশ সাধন করেছে। তাই "শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি" তে ইউরোপ আজ মুখর হ'য়ে উঠেছে। স্বার্থের সংঘর্ষে, প্রতিযোগিতার রোষে ইউরোপের এত বড় সভ্যতা যেন ব্যর্থতার বেদনায় অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে।

গত মহাসমরের ফলে ইউরোপের চোখ ফুটতে আরম্ভ হয়েছে। বলশেভিজ্‌ম্ (Bolshevism) যত অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছে বলা হোক না কেন—ইহা যে পৃথিবীতে এক নতুন যুগের উদ্বোধন করেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতীয়তার বাঁধ ভেঙে বিভিন্ন দেশের নির্য্যাতিত কৃষক, মজুর নিজের চরম স্বার্থ বুঝে এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে শিখ্ছে। 'workers of the world unite'—কার্ল মার্কসের এই ভুবন ব্যাপী ডাকে নির্য্যাতিত শ্রেণী সাড়া দিয়েছে।

সমাজের মাথায় যাঁরা এতদিন কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতেন, তাঁদের সুখের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। ভূমি এবং বড় বড় কলকারখানা প্রভৃতিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রবল আন্দোলন (Nationalisation of land and big industries) দেশে দেশে দেখা দিচ্ছে। কার্ল মার্কস ও মাইকেল বাকুনিন (Karl Marx and Michæl Bakunin) আজকার ইউরোপকে যে নতুন মন্ত্র দিয়েছেন তার প্রভাবে চারিদিকে ভাঙাগড়া আরম্ভ হয়েছে।

লেনিন, ট্রোট্স্কি, (Lenin, Trotsky) প্রভৃতি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ পৃথিবীতে এক নতুন সমাজের পত্তনে লেগে গেছেন। কৃষিপ্রধান সমাজে কি ক'রে সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে তার উপায় পরীক্ষিত হচ্ছে। রুশিয়ায় এক প্রলয়ঙ্কর সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয় এসে পড়েছে। রুশিয়া জয় করতে গিয়ে জার্ম্মানি সে আগুন নিজের ঘরে এনে ফেলেছে। ক্রমশ সমস্ত ইউরোপে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। নতুনের প্রসব বেদনায় ধরিত্রী অধীর হ'য়ে উঠেছে। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াবে কে জানে? অমৃত উদ্ধার করতে গিয়ে এর মধ্যেই গো হলাহল উঠেছে—Dictatorship of the Proletariat রূপে আর এক স্বেচ্ছাচারীর মাথা গজিয়েছে।

প্রাচ্য সমাজের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আমাদের সমাজের ভিত্তি সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃষি জীবন এবং গৃহশিল্পের সরল পদ্ধতি মানুষকে অভাবের জন্য এমন পাগল ক'রে তোলে নি। সামাজিক জীবনের পবিত্রতার সঙ্গে, আর্ট প্রভৃতিরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আদিতে বোধ হয় যে কৃষক সেই ধর্ম্মযাজক শিল্পী এবং যোদ্ধা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সমাজদেহ পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এবং সভ্যতার ক্রম বিকাশের জটিলতা হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য' শূদ্রের বিভাগ হ'ল,। এক এক দল এক কাজের ভার নেওয়াকে বংশানুক্রমে জীবনের ব্রত করলো। এই বর্ণ-বিভাগের মধ্যেও একটা চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। এক এক জাতি যেমন বংশানুক্রম বিস্তৃতি লাভ করতো, সমাজের আয়তন বৃদ্ধি সমপরিমাণে হওয়াতে তাদের প্রয়োজনীয়তার কমতি হ'ত না—সুতরাং প্রতিযোগিতার কথাই ছিল না। আবার এক জাতির বিশিষ্ট মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে অপর জাতিভুক্ত হইতে পারিত।

এই গুণগত জাতি বিভাগ—আজ রুদ্ধ অবস্থায় সমাজের নানা অমঙ্গল এনেছে। সমাজ শরীরে সে প্রাণ নাই—এখন তাই বাঁধন ভেঙে গেছে—নানা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। সেকালের হিসাবে ধরতে গেলে—এখন ইংরাজি-ভাবাপন্ন একটা নূতন জাতি হয়েছে তার মধ্যে উকিল ডাক্তার, মাষ্টার—এই রকম এক একটা ছোট ছোট জাতি দাঁড়িয়াছে। বিবাহাদি বিষয়ে কতকটা পুরানো নিয়ম বজায় থাকলেও অন্যান্য হিসাবে আমাদের জাতিভেদটা এই রকম হ'য়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের সমাজ গঠনে 'জাতীয়তা"র ধারণা ছিল না। ইউরোপের ভালমন্দ আর দশটা জিনিষের সঙ্গে এই "জাতীয়তার অনুভূতি" নামক অপূর্ব্ব পদার্থটিও এসেছে। অবশ্য ভারতের বিরাট একত্বের ধারণা আমাদের সভ্যতার ভিতর নানাদিক দিয়ে ফুটে উঠেছে। এই মহাদেশের বিচিত্র বিভিন্নখণ্ডের মধ্যে কেমন একটা সাধনার যোগাযোগ ছিল। সে সাধনার মধ্যে আত্মার মুক্তি কামনা মানুষের চরম লক্ষ্য ছিল এবং আর সমস্তই তার অনুবর্ত্তী বলে মনে করে নেওয়া হত। রাজনীতি ক্ষেত্রেও রাজপুতের রাজ্য শিখের রাজ্য বৌদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু "ভারতীয়" জাতি সংঘের রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেহ করেনি। কেবল বাহির হ'তে ইংরেজ এসে পরাধীনতার একটি শৃঙ্খলে আমাদের সকলকে বেঁধেছে তাই আজ

"জাতীয়তা"র অনুভূতি আমাদিগের ভিতর এমন করে এসেছে।

ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ গ্রাম্য সাধারণ তন্ত্র। আত্ম অভাব পূরণক্ষম পরিবার এবং তদনুরূপ গ্রাম (self-contained homes and self-contained villages) মানবের জীবনের রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিল। That Government is best which governs the least—এই কথার সত্যতা এই গ্রাম্য সাধারণ তন্ত্রে পরিপূরিত হয়েছিল। বৈচিত্র্যেই সমগ্রের সামঞ্জস্য এবং সমগ্রের সামঞ্জস্যেই সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। আমাদের সমাজ-জীবনে এই আদর্শ কাজে পরিণত হ'য়েছিল। সকলের সকল রকম স্বাধীনতা অটুট থাকাতে স্বরাজের আদর্শ অক্ষুন্নরূপে ফুটে উঠেছিল। তাই কৃষিপ্রধান ভারতে পল্লী জীবন সভ্যতার কেন্দ্র হ'য়ে ছিল।

এখন সকল দেশেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধার জন্য যে রাষ্ট্র রাক্ষসী সমাজের বুকে বসে রক্তপান করছে—তাকে বধ করবার জন্য ভারতের শ্রীকৃষ্ণের ডাক পড়েছে। ইউরোপের সভ্যতা আজ দেউলে হয়ে পড়েছে। ভারতের যুগ যুগান্তরের সাধনালব্ধ জ্ঞানের আজ এক সার্থকতার সুযোগ এসেছে। এই নতুন আদর্শকে রূপ দিতে ভারতীয় সাধকের ডাক পড়েছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই সাধনার পূর্ব্ববর্ত্তী নিজের আত্মশুদ্ধি করণের চেষ্টা মাত্র। এই সিদ্ধিলাভেই ভারতীয় সাধনার সফলতা।

দেড় বছরের খোকা

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

দুধে দাঁতের নিখুঁত হাসি
তার সনে ঐ একটু মান,
লুকোয় এসে আঁচল-আড়ে—
খোকার জানা অনেক ভান্।
ঝাঁপিয়ে উঠে' কোলে চড়ে,
কাকাতুয়ার মতন পড়ে,
নিজে মেতে' মাতিয়ে সবায়
কি অমৃতই করচে দান!

কান্নাহাসির রৌদ্র ছায়া
পাশাপাশি সুনির্ম্মল!
আলাপ জুড়ে, প্রলাপ বকে,
বিলাপটা ওর অশ্রু জল।
চলন বলন সবটা মিঠে,
শিশু মদন তুনীর পিঠে—
জয় কোরে নেয় মনটা তখন
ছাড়েন যখন বরুণ-বান!

কল্পনা

(রূষরূপকথা)

[শ্রীঅশোক চন্দ্র]

রুষিগার এক জার তাঁর রাজত্বের সমস্ত কবি আর পণ্ডিতদের এক মজলিস ডাকালেন। বৈঠকে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন "আনন্দের উৎপত্তি কিসে?"

জারের প্রশংসাদৃষ্টির আশায় ব্যগ্র হয়ে একজন পণ্ডিত বলে উঠ্‌ল "আপনার ঐ দিব্য জ্যোঃতি-দীপ্ত মুখে হাসির রেখা দেখা অন্তরে .. ..

অবিচলিত জার হুকুম দিলেন "ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেল।"

আর এক জন পণ্ডিত সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।—বল্লে "ক্ষমতাতেই আনন্দ। আর আপনিই সুখী"

জার বিরক্ত হয়ে বল্লেন "আমার মন বেদনায় ভরে ওঠে, শরীর ক্লান্তিতে শ্রান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তার কোন প্রতীকারত আমার হাতে নেই। এ হতভাগার কাণ কেটে দাও।"

তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিধার সুরে বল্লে "অর্থই আনন্দ দান করে"

"টাকার অভাব আমার মোটেই নেই অথচ এই প্রশ্নটাই আমার মনে জাগছে। এই লোকটার গলায় সোনার থলে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দাও।"

জার এবার অধীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "চতুর্থ?"

ছেঁড়া কাপড় পরা শীর্ণ দেহ এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। চোখে তার অভাব ফুটে উঠেছে। ক্লান্ত সুরে সে বল্লে "হে প্রাজ্ঞ, আমার অভাব মোচন করুন। আমার ক্ষুধার অন্ন দিন—আমাকে তৃপ্তি দান করুন আনন্দ আপনিই আস্‌বে।"

জার চটে গিয়ে বল্লেন "একে খাবারের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। তারপর খেয়ে খেয়ে মরে গেলে সে খবরটা আমায় দিও কিন্তু।"

তারপর যে জন উঠে দাঁড়াল তার দেহ সুস্থ, সবল সে বল্লে "সৃষ্টিতেই আনন্দ।"

তার কথা ফুরুতেই, শীর্ণ দেহ আর এক মাথা চুল নিয়ে এক কবি উঠে বল্লে "স্বাস্থ্যই আনন্দের আকর।"

জার এবার করুণার হাসি হেসে বল্লেন "যদি তোমাদের ভবিষ্যতের ওপর আমার কোন হাত থাকত তবে তুমি কবি বসন্তের মুঞ্জরিত সবুজের প্রতীক্ষায় থাকতে......আর তুমি তোমার ঐ বিরাট ভীম দেহ নিয়ে যেতে বৈষ্ণিবাড়ী দেহের ভার কমাবার জন্যে—তোমরা মানে মানে বাড়ী ফিরে যাও।"

আরও অনেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল আর নিস্ফলতার অপমানে মাথা নীচু করে বসে পড়েছিল।

ওদেরই একজন প্রশ্নের উত্তরে শুধু দুটী কথা বলেছিল, "নারীর ভালবাসা।"

জার বলেছিলেন "বেশ কথা। আমার রাজত্বের সুন্দরীদের সেরা একশো জন একে দাও। আর তারি সঙ্গে উপহার দাও এক পেয়ালা বিষ। ওর প্রেমক্লিষ্ট মৃতদেহ দেখতে আমায় ডেকো কিন্তু।"

তারপর সভাস্থল নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অপমানের মুকুট পরে বাড়ী ফিরবার ইচ্ছা আর প্রায় কা'রোরই ছিল না।

তবু একজন অশান্ত বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল। সে বল্লে আমার জীবনের প্রত্যেকটা আশা যদি পূর্ণ হয়ে যায় তবেই আমার আনন্দ।"

জার জিজ্ঞেস করলেন 'আচ্ছা এখন তোমার প্রাণ কি চায়?"

'আমার?"

হাঁ তোমার।"

"জার ... ... প্রশ্নটা বড় অপ্রত্যাশিত হ'য়ে পড়েছে।"

'ওর আরম্ভ মুখ দেখল। বাঃ—আর একজন কে, এসহে পণ্ডিতমশায়, কাছে এসে তুমি হয়ত আনন্দের বাণী আমায় শোনাতে পারবে।"

কবি সে উত্তর কর্লে "মানুষের কল্পনাতেই আনন্দ।"

জারের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল তিনি বল্লেন "মানুষের কল্পনা সে আবার কি?"

কবির হাসিতে শুধু অনুকম্পাই দেখা দিল। কিন্তু কথার প্রত্যুত্তরে জার ঠোঁট কেঁপে উঠলনা।

ক্রুদ্ধ জার তাকে মাটীর তলায় নির্জ্জন এক ঘরে বন্ধকরে রাখবার হুকুম করলেন।

* * * *

বর্ষশেষে অন্ধকবি জারের সামনে এসে দাঁড়াল। জার প্রশ্ন করলেন "এখনও তুমি সুখী?"

শান্ত কণ্ঠে কথা ফুটল "হাঁ সুখী। কল্পনা ঐ নির্জ্জন কারাগৃহে আমায় রাজ মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল—আমার কানে প্রেম গুঞ্জন ধ্বনিত করে তুলেছিল—তৃপ্তি এসে বাসনাকে আমার ডুবিয়ে দিয়েছিল। আমার কল্পনাই যে সব।"

জার এবার অধীর হ'য়ে উঠলেন "কল্পনা কি জিনিষ? পার্চমেন্টের মধ্যে আমি এর উত্তর চাই। তোমার মাথা নইলে আমার চরণ ধূলায় লুটবে। কবি, তোমরা চির-বাঞ্ছিত কল্পনা তখন থাকবে কোথায়? তখনও কি সে তোমায় তৃপ্তির সুধা পান করাবে?'

কবি শুধু বল্লে "মূর্খ, কল্পনা যে অমর।"

বৃন্দাবনে

[শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ]

কোথা সে বসন্ত শোভা নিখিল-দুর্লভ,
মঞ্জরা মধুপ মেলা রসালে তমালে?
পলাশ অশোকে হাসি—বনফুল জালে
কুঞ্জে কুঞ্জে হোলি খেলা—কুঙ্কুমবিভব?

নিস্তব্ধ কানন-সভা, নীরব কোকিল,
শীর্ণ শস্প পুষ্পে ম্লান মৌনবনবীথি,
বন কপোতেরা গায় সকরুণ গীতি,
দূরে ঝাবলার বনে শিহরে অনিল।
চন্দ্রকে চিত্রিত পুচ্ছ নীলকণ্ঠ শিখী,
জাগায় মনের মাঝে মাধবের স্মৃতি,
কিশোরীর প্রেম স্বপ্ন, মধুর আরতি,
ইন্দু-ইন্দ্রধনু জালে প্রেম মন্ত্র লিখি'।
শুভ্র বালুতটতলে—দূরে যায় দেখা
নীল যমুনার ধারা, দীর্ঘ অশ্রু রেখা।

ইউরোপ শান্তির পথে

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

"চর দখল করে নেওয়া চাই-ই, টাকা যত লাগে দেওয়া যাবে।" জমিদারের এই হুকুম পেয়ে নায়েব মহাশয় লাঠির জোরে চর দখল করে নিলেন। খুন জখম অবশ্য অনেক হল, টাকাও অগণিত লাগল। যথা-সময়ে ঋণদাতারা টাকার জন্য তাগাদা করলেন। তখন জমিদার মহাশয়ের লুপ্ত চৈতন্যের পুনঃ সঞ্চার হল এবং চোখের আলো অন্ধকারে পরিণত হতে লাগল।

ছোট ঘটনার সঙ্গে বড় ঘটনার তুলনা যদি অমার্জ্জনীয় না হয়, তা হলে বলা যেতে পারে যে বিগত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ইউরোপের অবস্থাও এইরূপ। ইংলণ্ড আমেরিকার কাছে ধারেন ১২৭৫,০০,০০,০০০৲ টাকা এবং মিত্র শক্তিদের কাছে পাবেন ১২৮১,০০,০০,০০০৲ টাকা। আবার এর ওপর ক্ষতিপূরণ বাবদ জারমানির কাছে পাবেন ৭৮ ৯,০০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ইংলণ্ড ৭১০০ কোটি টাকা উত্তমর্ণ, আর ১০৭৫ কোটি টাকার অধমর্ণ। কাগজে কলমে এ হিসাব দেখলে দেখা যাবে, দেনার চেয়ে পাওনা চতুর্গুণ। কিন্তু ডলার উপাসক আমেরিকা সাদার ওপর কালো অঙ্কমাত্র দেখে ভোলবার পাত্র নন। সুতরাং তাঁর পাওনাটার জন্য একবার তাগাদা করে দেখছেন ইংলণ্ডের প্রকৃত অবস্থাটা কেমন। ইংলণ্ড এত দিন ঘর সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শিল্পের অবস্থাও ভাল নয়, বাণিজ্যের অবস্থাও তথৈবচ। ধনীরা অসন্তুষ্ট, শ্রমজীবীদের মধ্যে যাদের কায আছে তারা মজুরী কম বলে কেবলই ধর্ম্মঘট করছে আর যাদের কাযকর্ম্ম নেই তারা বলছে "কায দাও।" ঘরে এই অবস্থা, বাইরে রুশিয়া আছেন, জারমানি

আছেন তুরুক আছেন, ফ্রান্স ইটালীর ত কথাই নাই। এঁরাও যা বলছেন তা সত্য হলেও বড় প্রিয় নয়। তাতে মনের শান্তিও অক্ষুণ্ণ থাকছে না, উদ্বেগও জন্মাচ্ছে। এবং সে উদ্বেগে যে একটু ভয়ের ছায়া নেই তা কেউ শপথ করে বলতে পারে না। এ সকলের ওপরে অশান্ত ঈজিপ্ট আছেন এবং এবং অসন্তুষ্ট ভারতবর্ষও আছেন।

আমেরিকার তাগাদা পেয়ে ইংলণ্ডের অন্যমনস্কতা দূর হল। ইংলণ্ড দেখলেন জারমানির কাছে ক্ষতিপূরণ বাবদ অনেক টাকা প্রাপ্য থাকলেও সেটা "পরহস্তং গতং ধনম্।" আর সে পরহস্তটি প্রায় রিক্ত। বাইরে থেকে দেখতে জারমানির অবস্থা ইউরোপের অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভাল। তাঁর হোটেলের টেবিলগুলি এখনও সব রকম খাবার জিনিষে বেশ সাজান। মনিহারীর দোকানের কাচের জানালাগুলি চোখ-ভোলান মনভোলান নানা জিনিষে পরিপূর্ণ। শ্রমজীবারাও কর্ম্মশূন্য হয়ে আলস্যে দিন কাটাচ্ছে না। ধর্ম্মঘটের কথাও বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। কৃষির অবস্থাও মন্দ নয়।

কিন্তু জারমানির "মার্ক"টা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। এক মাসের মধ্যে ডলারের বিনিময়ে মার্ক নেমেছে ২০০ থেকে ৫০০ এয়ে। পাউণ্ডের হিসাবে আগে ছিল এক পাউণ্ডে ৮০০ মার্ক। তারপর গত অগষ্ট মাসে ২৩০০ থেকে প্রথমে ৩০০০, তারপর ৩৪৫০, তারপর ৪০০০, শেষে ৮৫০০ এ নেমেছে। জড় জগতে পতনশীল পদার্থের গতির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, আর্থিক জগতেও তার ব্যভিচার নেই। কিন্তু এই বিবৃদ্ধ বেগে মার্কের পতনে জারমানির দেশের ভিতরকার কারবারের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে যে সকল আদান প্রদান তা এক রকম বেশই চলছে। যত গোল ঐ বিদেশের সঙ্গে কারবারে "ফ্রাঁ"র (Franc) সঙ্গে বিনিময়ে আগের চেয়ে অনেক বেশী দিতে হচ্ছে, ডলারের বিনিময়েও তাই, পাউণ্ডের বিনিময়ে ততোধিক। অর্থ-শাস্ত্রীরা বলছেন মার্কের মূল্যের পতন যদি নিবারণ করা যায়, তা হলে বিদেশে রপ্তানীর জন্য যে সকল শিল্পপণ্য দেশে প্রস্তুত হচ্ছে, তার প্রস্তুত করবার ব্যয় অন্যান্য দেশে সেই সকল পণ্য প্রস্তুত করতে যে ব্যয় হয় তার সমান হয়ে যাবে। তাতে ঘরে অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত পণ্য বাইরে বেশী দামে বিক্রী করে জারমানি যে বিপুল লাভ করতেন, সেটি আর হবে না। কাজেই এখন যত শিল্পপণ্য প্রস্তুত হচ্ছে, তা আর হবে না। ফলে অনেক শ্রম-জীবী কর্ম্মহীন হয়ে পড়বে। কর্ম্মহীনতার অর্থ অশান্তি, বিশৃংখলতা, দারিদ্র্য এবং তার অনুগামী সর্ব্ববিধ পাপ। আর যদি মার্কের মূল্য ক্রমেই নামতে থাকে তা হলে বিদেশে জারমানির আর্থিক প্রতিপত্তি বিপন্ন হয়ে পড়বে। জারমানির সঙ্গে আর কেউ ধারে কারবার করবে না। জারমানির মনে এ আশঙ্কা খুব প্রবল ভাবেই বিদ্যমান আছে।

এর ওপর জারমানির পাশে আর একটি শেল বিঁধে আছে। সেটি হচ্ছে জারমানির রাইন প্রদেশের বুকের ওপর ফ্রান্সের জেতৃ-ভাবে সশরীরে চেপে বসে থাকা। নামতঃ যদিও এটা অস্থায়ী ভাবে থাকা মাত্র, কার্য্যতঃ কিন্তু তাতে স্থায়ী অধিকারেরই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সৈনিকেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক মতামত প্রচারের জন্য সংবাদপত্র এবং

সাময়িক পত্র স্থাপন করা হয়েছে. ইস্কুল থেকে জারমন ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়ে ফরাসী ছেলেদেব ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছে, মিউনিসিপালিটি তাদের বাসের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে, পছন্দ না হলে তারা তা ছেড়ে দিয়ে নগরের উৎকৃষ্ট বাড়ীগুলিতে অতিথি হয়ে প্রবেশ করে গৃহস্থকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন কি সম্ভ্রান্ত জারমান মহিলারা সন্ধ্যার পর বাড়ীর বার হতে পারেন না। আর এই সকল অত্যাচারকে সমর্থন করে ফরাসীরা বিজ্ঞাপিত করছে যে জারমান সভ্যতার (kultur) চেয়ে ফরাসী সভ্যতা অনেক উচ্চতর এবং সেই জন্যেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে তারা তাকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যখনই কোন প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতির দেশ অধিকার করে তাদেকে পরাধীনতার শৃংখলে বেঁধে, তাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করেছে, তখনই এই নীতির দোহাই দেওয়া হয়েছে। জেতা কথায় এবং কাযে বিজিতকে বুঝিয়েছেন "দেখ, আমরা বিদ্বান্, কর্ম্মকুশল, সভ্য। তোমরা মূর্খ, অকর্ম্মণ্য, অসভ্য। সেই জন্যে আমরা তোমাদেকে শিক্ষা দিতে, কর্ম্মঠ করতে, সভ্য করতে তোমাদের দেশে এসেছি। তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর।" কথাটা সত্যই হত যদি এর অন্তরালে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য না থাকত। এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রভুত্ব স্থাপনের সমর্থনকারী অন্য নীতি বোধ হয় নেই। ফরাসীরা এই ভাবেই রাইন প্রদেশে অধিষ্ঠান করছেন। ইংরেজ অবশ্য এটা প্রীতির চক্ষে দেখছেন না। ইংরেজ দেখছেন যে জারমানির কাছে তাঁর নিজের যা প্রাপ্য তা আদায় হচ্ছে না, অপর পক্ষে ফরাসী তার পুনরধিকৃত আলসেস লোরেন থেকে এবং নূতন অধিকৃত রাইন প্রদেশ থেকে য আদায় করে নিচ্ছেন তা নিতান্ত নগণ্য নয়।

অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়িয়েছে তখন আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডের ওপর তাগাদা এল যে আমেরিকার ঋণ শোধ করতে হবে। ইংলণ্ড আগেই হিসেব করে বসে ছিলেন যে তাঁর দেনার চেয়ে পাওনা বেশী এবং সেই পাওনার মধ্যে ফ্রান্সের কাছেও "কিছু" আছে এবং সেই "কিছু"টা নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং ইংলণ্ড তার জন্যে ফ্রান্সের ওপর তাগিদ দিলেন, ফ্রান্স ছাড়বেন কেন? তিনিও জারমানিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ক্ষতিপূরণের বাবদ তাঁর ফ্রান্সকে যা দিতে হবে সেটা "পত্রপাঠই" দিতে হবে। ফ্রান্সের অভিপ্রায়টা এই যে জারমানি যদি স্বেচ্ছায় তাঁর দেয় না দেন ত ফ্রান্স জারমানিকে তা দিতে বলপূর্ব্বক বাধ্য করবেন, মিত্রশক্তিদের পক্ষ থেকে জারমানির রাজস্বের ওপর কর্তৃত্ব করবেন, পণ্যশুল্ক আদায়ের ভার নিজ হাতে নেবেন, রুড় (Rurh) প্রদেশের কয়লার ওপর একটা বিশেষ টেক্স্ বসাবেন (সকল কয়লার ওপরই এখন শতকরা ৪০৲ টেক্স আছে) যত কল কারখানার ব্যবসা আছে তার এক-চতুর্থাংশ তাঁদের হবে। আর বন বিভাগের ও খনিবিভাগের ওপরও কর্তৃত্ব থাকবে। ফ্রান্স এ অভিপ্রায়ও অপ্রকাশ রাখেন নি যে মিত্রশক্তি এই সকল কাযে তাঁর সহায়ক না হলে, ফ্রান্স একাই তা করবেন। নমুনাস্বরূপ আলসেস থেকে ৮০ হাজার এবং রাইন প্রদেশের এক হাজার ধনী জারমাণ অধিবাসীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সম্পত্তি বাজেআপ্ত করে নেবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন এবং কেবল ভয় দেখিয়ে

নিরস্ত না হয়ে কাযেও তা আরম্ভ করেছেন। এর ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে নামমাত্র একটা সন্ধি (আঁতাত) আছে, তাও আর থাকে কি না সন্দেহ।

এই সকল অবস্থা দেখে ইংলণ্ডের ইচ্ছা হয়েছিল যে মিত্রশক্তিদের কাছে ইংলণ্ডের যা পাওনা আছে সে সমস্ত রেহাই করে দেন। এমন কি জারমানির কাছে ক্ষতি পূরণের দরুণ যা পাবেন তাও ছেড়ে দেন। এ পাওনাটার পরিমাণ হচ্ছে, অনেক ছেড়ে ছুড়ে দিয়েও, ২৫০ ক্রোড় পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫০ ক্রোড় টাকা। এর শতকরা ৮৯৲ টাকা নিতে চান ফ্রান্স, আর ইংলণ্ড পাবেন কিছুই নয়। আবার ফ্রান্স এই টাকাটা পাবার ভরসায় ধার করে যুদ্ধের সাজসজ্জা করছেন—এরোপ্লেন করছেন, সবমেরিণ করছেন, আরও কত কি করছেন। এতে অবশ্য ইংরেজের ফরাসীপ্রীতি বাড়চে না। ইংরেজ শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী-সংঘ (Federation of British Industries) বলছেন "আমেরিকাকে যদি আমাদের দেনা দিতে হয় তা হলে আমরাও কারো কাছে আমাদের পাওনার একটি পয়সাও ছাড়ব না। ধারটা ত আমরা নিজের জন্যে করিনি, মিত্রশক্তিদের জন্যেই করেছি।" তবে, ইংলণ্ড বলছেন, ফ্রান্স যদি জারমানির কাছে ক্ষতিপূরণের টাকার আর দাবী না করেন, অন্ততঃ কিছু দিনের সময় দেন, আর রাইন প্রদেশ ছেড়ে দেন, তা হলে তাঁরাও ফ্রান্সকে রেহাই দিতে পারেন। লর্ড বালফোর যুদ্ধ-ঋণ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তারও তাৎপর্য্য ঐ, তবে কথাগুলো এত স্পষ্ট নয়। আর কথাগুলি সাক্ষাৎ ভাবে ফ্রান্সকে বা জারমানিকে বলেন নি, মিত্রশক্তি সকলেরই উদ্দেশে বলেছেন। ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি ইংলণ্ড প্যারীয় সন্ধির সময়েই বুঝেছিলেন যে জারমাণির কাছে ক্ষতি পূরণের টাকা আদায় হবার কোন সম্ভাবনা নেই; আরও বুঝেছিলেন যে ইউরোপ পুনর্গঠিত না হলে ইংলণ্ডের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হবে। আবার ইউরোপের পুনর্গঠনের সঙ্গে রাজনীতিও পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী আর পুনর্গঠিত জারমানি ফ্রান্সের যে পরম মিত্র হবে এমন আশা করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য্য। ইংলণ্ড এই সকল ভেবে চিন্তে জারমানির সঙ্গে সদ্ভাব করাই বিজ্ঞতার কায মনে কচ্ছেন অথচ ফ্রান্সের সঙ্গেও বিরোধ করতে প্রস্তুত নন। এ অবস্থায় মন্ত্রীরা মনে করলেন একটা পরামর্শ সভা করে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করলে হয়ত একটা সুফল ফলতে পারে। কিন্তু সে সভায় কার কার নিমন্ত্রণ হবে তা নিয়ে আবার মত ভেদ হল। জারমাণির বক্তব্যটা শোনা নিতান্তই আবশ্যক, সুতরাং তাঁকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। জারমাণি আবার রুসিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। তিনি রুসিয়ার নিমন্ত্রণ না হলে নিজেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। এ দিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সে প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন না। কাযেই পরামর্শ সভা সমিতি করে কেবল বাগ্‌বিতণ্ডা বেড়ে যাচ্ছে, ফল কিছু হচ্ছে না।

এমন সময় ইউরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে আকাশ বিদীর্ণ করে তুমুল শব্দে মুস্তাফা কামাল পাশার জয় বিঘোষিত সংবাদ এল কামাল পাশা একবারে দার্দ্দেনেলিসের তীরে এসে উপস্থিত! ফ্রান্স ও ইটালী পূর্ব্ব থেকেই সেখানে সৈন্য

রেখেছিলেন। ইংলণ্ড তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দার্দ্দেনেলিসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্তে তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু তাঁর সৈন্য সেখানে পৌছে দেখলে ফ্রান্স ও ইটালীর সৈন্য সে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে! দার্দ্দেনেলিসের নিকটবর্ত্তী যে স্থানটা বিবদমান শক্তিদের কারো অধিকার-ভুক্ত নয়, কামাল পাশার সৈন্য অপ্রতিহত গতিতে সেথানে উপস্থিত হয়েছে। ইংলণ্ড এতে আপত্তি করছেন। গ্রীক সৈন্য স্মির্ণা থেকে পলায়ন করছে, গ্রীসরাজ হঠাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। গ্রীসের রাজধানীতে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। তুর্কীর সুলতানেরও হঠাৎ সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। তিনিও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

ইউরোপকে এই রকম বিব্রত দেখে রুষিয়ার বলশি জুজু এসিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। চীন দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বলসেবিকারা গণতন্ত্র বাদ প্রচার করছেন এবং চীনেরা তা খুব আগ্রহের সহিত শুনছে। এ দিকে তিব্বতের দালাই লামার সঙ্গেও কথা বার্ত্তা চলছে। কামাল পাশার সঙ্গেও যে তাঁরা মিত্রতা করেছেন সে কথাও আর অপ্রকাশ নেই। দেখে শুনে পৃথিবীর লোক উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছে এ সকল কি শান্তির লক্ষণ?

চির-প্রিয়া

[শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার]

প্রেয়সি আমার,
জনমে জনমে মম কতরূপে কত বার
তোমা সাথে মোর পরিচয়;
মনে হয়
বহুদিন হ'তে চিনি যেন ওই মুখখানি,
পশিয়াছে শ্রুতিমূলে তব মধুবাণী,
চিহ্ন রেখে গেছে তব চঞ্চল চরণ,
শত ফুলে করে গেছে রঙিন বরণ।
সে দিনের কথা সম
জাগে স্মৃতি পথে মম।

ক্ষণিক মরণ,
সে ত শুধু মোর কাছে নব জাগরণ,—
নিত্যনব রূপরাশি করিছে বিকাশ,
নূতন বিচিত্র প্রকাশ।

বহু ভুলে-যাওয়া কথা স্মৃতি হ'য়ে জাগে,
যুগান্তর হ'তে আসে নব অনুরাগে
সৌরভের পথে
কল্পনার রথে।

হে আমার প্রিয়া,
মনে আছে সেইদিন যবে মোর হিয়া
সুরভি গোলাপ সম উঠিল উলসি,
হে মোর রূপসি,
যবে মম-বিরল বিপিনে
বসন্ত-উৎসব দিনে
সন্ধ্যাতারা সম তুমি উদিলে সমুখে,
হাসিমুকুলিত মুখে, প্রথম-প্রণয় সুখে,
গোধূলির কালে,
তরু অন্তরালে।

তা'র পর হারায়েছি হায়,
প্রেমের গরিমা যত হ'ল লুপ্তপ্রায় ;
সহসা জাগিলে তুমি
রাজার দুলালী,
সহসা জাগিনু আমি,
তোমার আসন খালি
কতকাল থাকে ?
স্নানের পথের বাঁকে,
ছিন্ন পরদার ফাঁকে
সহসা দেখিনু তোমা ; রক্তিম গগনে
নির্নিমেষ নেত্রে চাই তোমার নয়নে ;
সর্ব্বদেহে লুটে পড়ে শারদ পূর্ণিমা,
জাগরণ সম এল মূর্ত্ত সে গরিমা।
চিনিলে আমায়
সে দিনও ত গত হায়।

একবার দেখ, সখি,
ভুবন নিরখি',
কালের ঘর্ঘর-নেমি ছুটে' চলে' যায়
ফিরে' না তাকায় ;
পড়ে' থাকে সৌধ-স্মৃতি, পড়ে থাকে তাজ,
শুধু নাই আজ
সখা সখি, মৃদু হাসি, করুণ নিশ্বাস,
প্রাণ ঢালা অসীম বিশ্বাস।
মনে হয় সব যেন ক্ষণিকের খেলা
শুধু দু'দিনের মেলা।
আমার অন্তর মাঝে তবু, সখি, জানি,
ধ্বনিতেছে অহরহ সান্ত্বনার বাণী,
"চিরন্তনী নারী তুমি, চিরন্তন নর
তোমার প্রেমের বলে হয়েছি অমর।"

কতবার কত জন্মে স্বপন পরশে
চকিতে হরষে,
বিরহ শয়নে যবে ছিনু তোমা হারা !
বারবার চিত্তমাঝে দিয়ে গেছে সাড়া,
তোমার নূপর ধ্বনি,
হে মোর রমণি,
উদিলে স্বপন পুরে সঙ্গীতের তালে,
হাতে তব স্বর্ণবীণা, তারা-টিপ্ ভালে।
পূর্ব্বজন্মে সখি ছিলে,
তারপর,—অপ্সরীর রূপে এলে,
হে মোর রূপসি,
স্বর্গের উর্ব্বশি !

সুন্দরি আমার,
কতবার
প্রচণ্ড ঝড়ের দোলে ঘূর্ণিত সাগর
গর্জ্জে যেন শত অজগর।
ক্ষণ পরে দেখি চেয়ে
আসে ঊর্ম্মিরাশি ধেয়ে,
তুফানে নিমগ্ন তরী খান
তোমা সাথে হল ব্যবধান।
ক্ষণিক মরণ-রাতে থেমে গেল খেলা,
নূতন জনম প্রাতে ভাসে পুনঃ ভেলা।

হে মোর মোহিনি,
জন্মে জন্মে ছিলে মোর মর্ম্মের গেহিনী,
আজি কি নূতন সাজে,
আবার নূতন ব্যাজে,
পশিলে হৃদয়ে মোর ; সর্ব্ব দেহ প্রাণ
পুলকে অজ্ঞান,
ঘন আলিঙ্গনে চায় বাঁধিতে তোমায়,

পরক্ষণে হায়,
দেখিবারে পায়
তোমার নয়ন মাঝে বিস্মৃতির লেখা,
তোমার মুখের পরে বিরক্তির রেখা !
অতীতের কথা
পুরাতন ব্যথা,
সব কি ডুবিয়া গেল তুফানের জলে,
সাগরের তলে ?

অয়ি বর অঙ্গনে,
ঘূর্ণ্য চক্রে ঘুরে' ঘুরে' কালের অঙ্গনে,
আসিয়াছি তব দ্বারে
ঘুরে'ফিরে বারে বারে,
চিনেও চিননা তুমি এ কেমন ধারা ?
পথশ্রান্ত আমি,—ক্ষিন্ন, গতিহারা।
পূর্ব্বকালে দুষ্মন্তের প্রায়
তোমারে যে ভুলেছিনু হায়,
তারি প্রতিশোধ, সখি, নিতেছ এবার ?
এ যে তব নির্দ্দয় বিচার।

চিরকাল একি লীলা খেলা
জীবনের সারা বেলা,
কাছে এসে দূরে চলে' গেছ বারবার
যখনি লভিনু তোমা হারানু আবার।
চলেছি তোমার সঙ্গে,
কত রঙ্গে,
যুগে যুগে, সুখে দুখে,
প্রেমের তরণীপরে কালসিন্ধু বুকে।
মধুর মাধবী রাতে
সুন্দর শারদ প্রাতে,
বৈশাখের গৈরিকের সাজে,
শ্রাবণ প্লাবন মাঝে,
হেমন্তের অশ্রুধারা ব্যাকুলতা মাঝে,
ঝরে-পড়া-পাতা-সাথী শিশিরের সাঁঝে,
তোমা সাথে হয়ে গেছে প্রাণ বিনিময়
অটুট' অক্ষয়।

নন্দিতা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সেদিন সত্যিই ক্ষ্যাপা শ্রাবণ আশ্বিনের আঙ্গিণায় ছুটে এসেছিল। সকাল বেলা থেকে ঝর ঝর অবিরল ঝরুছেই, কিন্তু গৃহিনীর আমার তা' দেখে 'দর দর চোখে বহে বারি' গোছের কোনো কিছু অবস্থা ত ঘটেই নি বরং বাল্য সখীর ক'লকাতা আগমন সংবাদে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সখি-সম্ভাষণে জোড়াসাঁকো চলে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্ধ্যানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর সখী সংবাদের কোনো পাত্তাই পাইনি। পূজোর ছুটীতে আফিস বন্ধ, কাজেই একটু দেরীতেই খেয়ে দেয়ে বারান্দায় বসে পান চিবুচ্ছি এমন সময় দেখি পুরাণো চাকর ভজহরি এক ফিটন এনে বাড়ীর দুয়ারে হাজির করলে। জিজ্ঞাসা করলুম "গাড়ী কেন রে?" "মা জোড়াসাঁকো যাবেন বল্লেন" 'কখন' ?—'এখনই'—একবার ভাবলুম বাড়ীর ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি কেন এবং কোথায় যাওয়া হচ্ছে—আবার ভাবলুম কাজ কি ছাই অত গায়ে পড়ে হিসেব নিকেশের—নিজেই তো যাবার বেলা বলেই যাবেন এখন, সে সময় একটু টিপ্পনি কাটবার সুযোগটুকু হারাই

কেন। যথাসম্ভব মুখখানাকে আকাশভরা মেঘের মতই গম্ভীর করে গোঁজ হয়ে ইজি চেয়ারটায় বসে রইলুম। আধঘণ্টাখানেক পরে গিন্নি লঘুপদে বকুল ছড়ানো দক্ষিণা বাতাসের মতো কেশ বেশের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে কালো মেঘে বিজলী চমকের মত বাণারসী শাড়ীর জরির আঁচলখানি পেছনে উড়িয়ে টেনে নিতে নিতে বলে গেলেন "শোবার ঘরে টিপয়ের ওপরে তোমার জলখাবার রেখে এসেছি—খেয়ো। আমি সন্ধ্যে নাগাত ফিরবো, একবার সুরুচির ওখানে যাচ্ছি,—ও আজ সাত আট দিন হোলো এসেছে, এর আগেই আমায় যাওয়া উচিত ছিল।—তা বুঝলে, তুমি যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ো না ভজকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি জবাবের অপেক্ষা না রেখেই গাড়ীতে উঠ্‌লেন। আমি একটু টীকা-টিপ্পনীর জল্পনা কল্পনা করে রেখেছিলুম, তার নেহাতই সদ্ব্যবহার হোলো না দেখে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একটু পরে চট্ করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ফুঁদিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে ফের ঠিক হয়ে বসতেই দেখি বৃষ্টি ধোঁয়াটে ধারা ভেদ করে কে একজনা রাস্তায় সদর দরজা খুলে আমার পানে আস্‌ছে। মাথায় একটা তার জীর্ণ ছাতা, পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল, গায়ে একটা আধময়লা পাঞ্জাবী। টিপে টিপে পা ফেলে কাদা থেকে গা বাঁচিয়ে সে আস্‌ছিল, ঘর থেকে হাত কুড়ি দূরে থাকতেই আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম "কি হে সুপ্রিয় বাঃ তুমি কোত্থেকে?"—ততক্ষণে সে বারান্দায় উঠে পড়েছে। আমি আধভেজা কাপড় চোপড়েই তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লুম "উঃ কতদিন তোমায় দেখিনি,—পাঁচ-বছর! বল বল শীগ্‌গির বল বিশ্বের ঝড় বাদল মাথায় করে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ার মতো কোত্থেকে এলে?"—

"ছাড়্ ছাড়্ ষ্টুপীড্, দম্ আট্‌কে মেরেই ফেল্‌বি তুই দেখ্‌ছি। আধমরা হয়েই তো প্রায় এসেছি।" আমি তাকে ধপ্ করে পাশের চেয়ারটাতে বসিয়ে দিলুম। তার পর দৌড়ে আন্‌লার ওপর থেকে কাপড় জামা চটি নিয়ে এসে তাকে দিলুম।

"কাপড় জামাগুলো ছাড়,—তার পরে বল"—সে ধীরে ধীরে কাপড় চোপড় ছাড়তে লাগ্‌ল, সেই ফাঁকে সকৌতুক দৃষ্টিতে আমি তার চেহারা পরীক্ষা করে নিচ্ছিলুম। সুপ্রিয় মিত্র ছিল আমার কলেজের সহাধ্যায়ী বন্ধু। ক্লাসের সেরা ছেলে ছিল সে,—সে ছিল যেম্‌নি সেরা আমি ছিলুম তেম্‌নি ওঁছা। তবু আমাদের দুজনের বড্ড ভাব ছিল; কেন তা হোলো, কেমন করে তা হোলো তা জানিনে, বোধ হয় এটা Two dissimilar poles attract কথার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। চেহারাতেও আমরা দুজনা সম্পূর্ণ তফাৎ ছিলুম। সে ছিল ক্ষীণদেহ, খর্ব্ব, ফর্সা. আমার Surname ছিল ক্লাসে Black Apollo. আমি কোন বার ফেল না করলেও ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি-এ পর্য্যন্ত ইউনিভার্সিটিকে নির্ম্মমভাবে ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় ইউনিভার্সিটির ভুলেই ক্যালকাটা গেজেটে বরাবর তৃতীয় বিভাগে,—বি-এতে পাশ কোর্সে নামটা উঠ্‌তে দেখে এসেছি,—এবং সেই একই গেজেটে সুপ্রিয়ের নাম বরাবর সর্ব্বোচ্চ স্থানে দেখে এসেছি। তার পর বি-এতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম হয়ে সুপ্রিয় এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়, আমি বিলেত চলে যাই। ফিরে এসে আমি এই

দুবছর চাকরী করছি,—কিন্তু সুপ্রিয়ের খবর এর মধ্যে বড় আর পাইনি। প্রথমে দু'চার খানা পত্র ব্যবহার হয়েছিল,—কিন্তু তার তরফ থেকেই শেষে বন্ধ হয়ে যায়। দেশে ফিরেও,—বিশেষত আমার বিয়ের আগে তার অনেক খোঁজ করেছিলুম কিন্তু কোনো পাত্তা পাইনি। এতদিন পরে সেই প্রিয় বন্ধুকে দেখে কি এক অব্যক্ত আনন্দই না হচ্ছিল! সে কাপড় ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে তাকে দেখলুম তার শুক্‌নো শরীর আরো শুকিয়েছে, হাত পায়ের শিরাগুলা স্পষ্ট হয়ে ফুলে উঠেছে, গাল দুটা আরো বেশী ভেঙ্গে গিয়েছে তার ওপর তার স্বভাবতঃই চোখা নাকটা মোগলাই খাঁড়ার মতো দেখাচ্ছে, প্রতিভাদীপ্ত চোখ দুটী তার আ গর চাইতে বসে গিয়ে থাকলেও কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা তাতে ফুটে উঠেছে, চুলগুলা রুক্ষ, কতকাল যেন তেল পড়েনি, দু একটা গুচ্ছ তার শুভ্র প্রশস্ত ললাটের ওপর এসে পড়েছে।

কাপড় চোপড় ছেড়ে পকেটের খুচরা জিনিষ পত্রগুলা গায়ে দেওয়া জামার পকেটে পুরে সে চেয়ারে বসে দুহাতে চিবুকটা রেখে বল্লে—"তারপর?"—

ধাঁ করে আর একটা নূতন বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়্‌ল—তার একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য,—যা তার আগে মোটেই ছিল না। আর মুখে কি একটা বিষণ্ণতার ছাপ, যেন তরুণ ঝাউ গাছের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুর্ণী বায়ু বয়ে গিয়েছে। আমি কি যেন একটা বিদ্রূপের কথা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, ঠোঁটের আগে এসে পড়া কথাটাকে কোনো মতো রাসটানা ঘোড়ার মতো সংযত করে শুধু বল্লুম "কেমন আছ, কি কচ্ছ?"

"সম্প্রতি বাড়ী থেকে তোর খবর নিয়ে দেখা কর্‌তে আস্‌ছি, আছি একরকম।"

"এত শুকিয়ে গিয়েছ কেন?"—আর একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলুম্ "আর যে-তোমার জ্বালায় প্রফেসাররা সব সন্ত্রস্ত থাক্‌তেন, আর আমরা সব মসগুল থাকতুম সে ঠিকরে পড়া হীরের আলোর মতো অবাধ বাক্যভঙ্গীমাটুকু কৈ? ঠোঁটের আগে লেগে-থাকা সহজ হাসিটুকুই বা কোথা হারিয়ে এসেছো ভাই?'

সে ফিক্ করে একটু হাস্‌লে। তার পর কেস থেকে একটা চুরুট নিয়ে ধরিয়ে মিনিট তিনচার চুপ চাপ বসে টান্‌লে, তার পর হঠাৎ অর্দ্ধ দগ্ধ চুরুটটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পানে চোখ তুলে বল্লে—"দ্যাখো ভাই আমি আর পারি নে,—এ বোঝা নিয়ে আর বেড়াতে পারি নে, সমদুঃখী হিসাবে তোমাকে আজ আমায় বল্‌তেই হবে। তুমি এর দুর্ব্বিসহতা কিছু এমন কমাতে পারবে না জানি,—কিন্তু তোমায় এই নিছক বলাতেই একটা আনন্দের আভাস আমি পাচ্ছি, সেই জন্যেই আমায় বলতে হবে।

'তুমি তো সেই বি-এ পাশ করে বিলেত চলে গেলে, আমি এম্-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হলুম। কিন্তু fifth yearএর মাঝামাঝি আমার হোলো কালাজ্বর। তাতে বছর দেড়েক ভুগে যখন দুটী সেসন মাটি করে ফের গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হলুম তখন Scholershipটাও গেছে। আমাদের অবস্থা এমন স্বচ্ছল ছিল না তা তুমি জানো। এমন সময় আমার ছোট বোন্‌টির বিয়ে দিয়ে বাবা হাজার তিনেক টাকা দেনা করে ফেল্লেন। তার ওপরে আমার কল্‌কাতার এম্-এ পড়ার খরচ জুগিয়ে এই দেনা শোধ করা তাঁর পক্ষে

অসম্ভব ছিল। আমি ভাবলুম একটা টুইশনি কোরবো তাতে যদি টাকা পঞ্চাশেক পাই তবে আমাকে তো তাঁর খরচ দিতেই হবে না বরং বাবাকে তা থেকে অন্ততঃ গোটা পনেরো টাকা মাসে পাঠাতে পারবো তাতে তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতারও কিছু আসান হবে। ভেবে ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন দিলুম। কিন্তু ভালো চাকুরী একটাও জুট্‌লো না,—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশী কেউ দিতে রাজী নয়—। হঠাৎ একদিন আমার মামাতো ভাই সেই ফক্কড় সুরেশটা বল্লে তার এক বন্ধুর বোন্‌কে আমি যদি পড়াই তো তারা পঞ্চাশ টাকা করে দিতে পারে। তার পরে চোখের কোণায় একটু বাঁকা হাসি টেনে সে বল্লে যে 'সাহস থাক্‌লে এ চাক্‌রি নিও'। যদি বা মেয়ে পড়াতে হবে বলে এ চাকুরী না নিতুম, ওর টিপ্পনি শুনে সেই দিনই সেই মেয়েটীর ভাইকে কথা দিয়ে এলুম। তারা ভাই বোনে এক রায় বাহাদুরের ছেলেমেয়ে।

যতীনসিংহের 'ধ্রুবতারা' আমার না পড়া ছিল তা নয়, এবং ভালোবাসা জিনিষটা সম্বন্ধে আমি কিরকম ভয়ানক স্কেপটিক ছিলুম তাও তুমি জানো,—তবু ঠিক করলুম বিশেষ সমীহের সঙ্গে আমায় ছাত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, একটা বিরাট গুরুজনোচিত গাম্ভীর্য্যে নিজকে সব সময় মুড়ে রাখাই শ্রেয়ঃ তা ছাড়া তার থেকে একটা বিশেষ দূরত্ব রক্ষা করে চলাই সর্ব্ব প্রকারে সমীচীন।

পড়াতে তো লাগলুম, কিন্তু তখন যদি জানতুম হাজার উপন্যাস পঠনজাত অভিজ্ঞতা, মজ্জাগত স্কেপ্‌টিসিজম্ যোগীর মতো গাম্ভীর্য্য সব এক লহমায় দুটী পাৎলা রাঙা ঠোঁটের হাসির নিশ্বাসে উড়ে যেতে পারে তবে, না খেয়ে মরে গেলেও আমি সে চাকুরীতে যেতুম না, সে সর্ব্বনাশীর সে হৃদয়হীনার,—না না সে পূণ্যার ফুলটির সান্নিধ্যে যেতুম না। না না,—বুঝলে সে সত্যিই ভালো ছিল—হয়তো বড্ড ভালো ছিল।" এই বলে কিছু-ক্ষণ সে যেন বুকের মধ্যে কি খুঁজে নিলে তার পরে আরম্ভ করলে,—

"প্রথম যেদিন তাকে দেখি এমনি বর্ষা, বেলা বারোটা থেকে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। কালো কালো জমাট মেঘের রাশ চলন্ত পাহাড়ের মতো আকাশে ভেসে এসে ক'লকাতার মাঠে বাটে ইমারতে সশব্দে নিজেদের বুকের বেদনা উজাড় করে দিচ্ছিল। যখন কলেজ ছুটি হোলো তখনো মুষলধারে জল পড়ছে। সুরেশের বন্ধুকে সঙ্গে করে তো ক্লাস থেকে বেরুলাম, সিঁড়িতে পা দিতেই কড়্ কড়্ করে একটা বাজ পড়লো। পেছন থেকে সুরেশটা বিশ্রীরকমের হেসে চেঁচিয়ে বল্লে "যাস্‌নে সুপ্রিয়, বাধা পড়েছে আজ যাস্‌নে" আমি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি তার পানে ফেলে এগিয়ে চল্লুম। কালি-তলায় গিয়ে—দেখি ক'লকাতা জিনিস্ এ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সারি সারি ট্রাম মোটরের সার দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলো কোনো মতে ছপ্ ছপাং ছপ করতে করতে মৃদুগতিতে [illegible]গুলাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কতকগুলো [illegible]র ছেলে খোলা জলে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আমরা জুতা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে কোনো মতে কাপড় বাঁচিয়ে এগিয়ে চল্লুম। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অন্য মনস্ক এবং বিব্রত হয়ে থাক্‌বার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও আমার বুকের ভেতরে কেমন যেন টিপ্ টিপ্ কচ্ছিল। ভাবী ছাত্রীর একটা আবছায়া কল্পনামূর্ত্তি মাঝে মাঝে নানা

দৃশ্য ও চিন্তাজাত হিজিবিজি ভাবতরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি ঝুঁকি মারছিল।

তাদের বাড়ী গিয়ে যখন হাজির হলুম তখন বেশ বিচিত্রতার চরমসীমায় উঠেছে। হাতে জুতো, মাথায় ভেজা ছাতা গায়ে ভেজা সার্ট, পরণের কাপড়ের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়, চাদরটাতে বৈ গুলা জড়ান! যাহোক্, জানোই তো বেশভূষার দিকে তেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার কখনই ছিল না।

প্রথমদিন পড়া শুনা হোলো না। ছাত্রী এলো। পরিচয় হোলো। দু' চারটা এ-ও-তা কথা বার্ত্তার পরে বিদায় নিলুম। সেদিন-কার মতো লাভ হোলো এক প্লেট খাবার আর আস্বার সময় ভক্ত পূজারিণীর মতো ভূমিতে ললাট স্পৃষ্ট-করা একটী নম্রসুন্দর প্রণাম।

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। এ পর্য্যন্ত তাহলে কোনো ভয়ের কারণ নেই। নেহাৎ সাধারণ চেহারার মেয়ে। ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা, ফর্সা রং হলেও তা চপলার মতো তীব্র চমকে চোখ ঝল্‌সায় না, মামুলী চোখ, হীরের ছুরির মতো তা বুকে তো বেঁধেই না বরং একটু করুণারই উদ্রেক করে। স্বাস্থ্য খুব ভালো নয় বলে, উনিশ বছর বয়েস হলেও কৈশোরের স্বচ্ছ সৌকুমার্য্য টুকু অপসৃত হয়ে এখনও যৌবনের কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বলতার উৎস ফোটে নি। একটি শান্ত নম্রতা দেহের প্রত্যঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা যুগপৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, পাগল করে না। মনটা ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌ল। এতক্ষণের বুকের মাঝে দপ্‌দপানির কথা মনে করে একটু লজ্জাই হচ্ছিল।

সে সেবার আই-এ, দেবে। পরীক্ষা সাম্‌নে, অথচ ইংরিজীটা তার মোটেই তৈরী হয় নি, সেই জন্যেই বিশেষ করে আমায় রাখা। ওদের নানান্ ইংরেজ কবিদের একটা সিলেক্শন ছিল সেইটা আগে সুরু হোলো পড়া। পড়াশুনা বাড়ীতে বেশী না করলেও আমি যে সময় পড়াতুম তার তাতে মনোযোগ ছিল। তুমি জানো রোমাণ্টিক পিরিয়ড্ এর কবিদের কাব্য কলায় আমার একটা বিশেষ মোহ ছিল। সেগুলা পড়্‌তেও যেমন তন্ময় হয়ে যেতুম, পড়াতে পড়াতেও তেম্‌নি আমি আমাকে হারিয়ে ফেল্‌তুম। যখন হঠাৎ মোহাচ্ছন্নতার জাল থেকে আংশিক ছাড়া পেতুম তখন শুধু খেয়াল হোতো, ছাত্রীর যুগ্ম আঁখি যেন শেলির মতো অজানার সন্ধানেই সন্ধ্যাতারার মতো জ্বল্‌ছে। অ্যাডিসনের রচনা পড়বার দিন পড়া ভালো জম্‌তো না, এ-ও-তা পাঁচ কথা হোতো।

সেদিনও তেম্‌নি গদ্য পুস্তকে ছাত্রী শিক্ষক কারু মন বস্‌ছিল না। নানান সাত পাঁচ কথার পরে হঠাৎ আমায় সে জিজ্ঞেসা করলে "বড়দিনের ছুটীর তো মাত্র দিন ছ' সাত বাকী আছে, ছুটীতে কোথায় যাচ্ছেন?"

'বাড়ী যাবো বোধ হয়।"

"বাবাগো বাবা, ফি ছুটীতে বাড়ী গিয়েও আপনাদের সখ মেটেনা,—তবু তো আপনার বাবা-মা এখানেই থাকেন।"

জানেনই তো বাড়ীমুখো বাঙ্গাল ধায়,—তা ছাড়া—"

"বাড়ীতে আপনার খুব বিশেষ কোনো কাজ আছে নাকি?"

"হ্যাঁ—তা না—এমন কাজ আর একটা কি?" উত্তরে শিপ্রা হাতের কাছে সাদা খাতাটার ওপরে লাল পেন্সিলটা দিয়ে অনর্থক একটা অক্ষর লিখে তার ওপর বার বার

সেটা মন্থ করতে করতে বল্লে "একটা কথা হচ্ছে—"

'কি বলুন না—"

'যদি আপনার কাজের কোনো ব্যাঘাত না হয়,—বাবাও! একথা বলছিলেন—তবে আপনি ছুটী ত আমাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আস্‌তেও তো পারেন। আমরা সবাই সেখানে যাচ্ছি কিনা,—তা ছাড়া Stopford Brooke এর বইটা আমার এখনো ধরাই হয়নি,—সেটাও শেষ হয়ে যেতো"—এই বল্‌তে বল্‌তে তার কানে কপালে গালে কে যেন একরাশ ফাগ ছড়িয়ে দিলে। আমি শুধু বল্লুম "আচ্ছা দেখি।"

সেই দিন তাকে কি যেন এক নতুন রকম করে দেখলুম। মাথার ভেতরে কেমন একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তার পর আর কিছুতেই সেদিন অ্যাডিসনের আত্মার অবিনশ্বরত্বের প্রমান মস্তিষ্কে প্রবেশ করল না। তাড়াতাড়ি একটা কাজের কথা বলে বেরিয়ে পড়লুম। আস্‌বার সময় পুঁথির দিকে মুখ করে সে আবার বল্লে ওকথাটা ভুলবেন না, ভালো করে ভেবে দেখ্‌বেন।"

রাস্তায় বেরিয়ে কতকটা আত্মস্থ হলুম। তখন মনে হোলো, এতে আর আপত্তি কি হতে পারে। ফাঁক তালে পুরীও ঘুরে আসা হবে! ক্ষণকাল পূর্ব্বে ছাত্রীর সাম্‌নে নিজের অস্বাভাবিক জড়িমায় ভারী বিরক্ত হলুম। কিন্তু,—আবার মনে পড়লো সন্ধ্যারুণরক্ত সেই লালিমাটুকু, যা কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করে তার সারামুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। কি এ কেন এ নিঃশব্দ চরণে পা ফেলে অচেনা অনুভূতির ভেতর অবশেষে কি তাই এলো—দূর ছাই! যে সুঠাম দেহখানি আমার! তা ছাড়া আমি তার শিক্ষাগুরু,—আমি কী লক্ষীছাড়া!

পরদিন পড়াতে যেতেই সহাস্যমুখে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে সে যখন আমায় জিজ্ঞেসা করলে আমি পুরী যাওয়া সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করে ফেলেছি কিনা তখন আমার সমস্ত সঙ্কোচ প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মতো উড়ে গেল। ছাত্রীর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনখানি ভরে উঠ্‌ল। খুসী হয়ে বল্লুম "হ্যাঁ যেতে পারি হয়তো।"—

"আবার হয়তো কি,—যাবেন, নিশ্চয় কেমন?"—বলেই সে "যাই মামাকে বলে আসিগে" বলে ছুটে বেরিয়ে গেল। এর পূর্ব্বে তার ব্যবহারে এমন উচ্ছ্বাস আর কখনো দেখিনি।

চোখে মুখে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে সে ঘরে ফিরে এসে বল্লে "মাষ্টার মশাই আজ পড়া থাক, যাবার বিষয়েই গল্প হোক হ্যাঁ ভাল কথা কি কি বই নেবো,—ছুটী তো মোটে বারো দিন"—"Stopford brook নিন্‌ Addison খানা নিয়ে নিন আর পরীক্ষার প্রশ্নমালা" 'হ্যাঁ তাই ভালো হবে, কাঠখোট্টা বই গুলোকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নেশায় যদি কিছু Soften করে নেওয়া যায়। জানেন মাষ্টার মশাই, পুরীর এ বাড়ীটাতে আমি একবারও যাইনি, এই নতুন তৈরী হয়েছে কি না। তা দাদারা একবার তৈয়ারী হবার পরেই কলেজ কামাই করে flying visit দিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি সেবার কত মাথা খুঁড়লুম আমায় কিছুতেই সঙ্গে নিলে না। আর মেজদা কবি মানুষ কি না এসেই সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দিরের যে বর্ণনাটা করলে তার অর্দ্ধেকও যদি সত্যি হয় তবে আমি—"

আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম "তবে আপনিও কবি হয়ে যাবেন"—"দূর, তাই বৈকি,—আমার মাথায় কবিতা আসেই না,—আচ্ছা মাষ্টার মশাই আপনি কবিতা লেখেন—"

"না"

"সত্যি না? আপনি কেন লেখন না,—লিখ্‌লে আপনি খুব ভালো লিখ্‌তে পারবেন" বলে সে রঙিয়ে ওঠ্‌ল।

"এঃ এত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা আপনি কবে থেকে হলেন?"

"তাই বৈকি,—আমার অম্‌নি মনে হয়। আচ্ছা সমুদ্র আপনি আর কখনো দেখেছেন?"

"চাটগাঁয়ে দেখেছি"—

"মেজ দা বলেন যে সমুদ্রের শোভা এমন যে বলে বোঝান যায় না,—Breakers গুলার কথা বলেন যে তা যেন রূপা জরিপাড় নীলাম্বরার হাওয়ায় ওড়া আঁচল,—সত্যি?"

"কতকটা বটে"—এম্‌নি আরো কত কি কথা হোলো, বলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না,—কিন্তু শুধু এই টুকু জেনে রেখো সেদিন যখন বাড়ী ফির্‌লুম তখন আমার শিরায় শিরায় রিরি করে রক্ত বইছে। এও শোনো—হেসো না,—রাস্তায় একবার গরুর গাড়ী চাপা পড়বার যোগাড় হয়েছিল, তখন গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচক্যাঁচানি ছাপিয়ে তার মুখের তরল হাসির মিষ্টি আওয়াজ আমার কাণে বাজছিল। কে যেন আমায় গাড়ীর সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

তার দু' দিন পরে পুরী রওনা হবার কথা। কাজেই পরদিন নিজের হাতের ঘরোয়া কাজ কর্ম্মগুলা গুছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা নিজের বাক্সটা গুছাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সাতটা বেজে গিয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় পড়াতে যাই, ভাবলুম আজ না হয় কিছু দেরী হবে। হঠাৎ মনে পড়লো কি একটা অসহ্য পুলকে আজ সারাটা দিন আমার কেটেছে! বজ্জাত্‌টা ঘোড়ার মতো মনটা অম্‌নি ঘাড় বাঁকিয়ে বস্‌লো,—কেন,—এ উন্মত্ত আগ্রহ আমার কেন হবে, এ অপরাধ, অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—নন্দিতার সঙ্গে না যাওয়ায় অস্বস্তিই আমার শাস্তি। আমি যাবো না।

বাক্স তেম্‌নি পড়ে রইল। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লুম—যাবো না, যাবো না, নিশ্চয়ই যাবো না।

গিয়ে দেখি নন্দিতা আমার দেরী হওয়াতে সেদিন পড়ার ঘরেই অপেক্ষা করছে।

"আসুন" বলে সে উঠে দাঁড়িয়েই আমার পানে তাকিয়ে বল্লে "এ কি আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?"

আরো বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লুম,—আমি এত অপদার্থ যে মুখে চোখে অস্থিরতা ধরা পড়ছে।

ঠোঁটের কোণে একটু শুক্‌নো হাসি টেনে বল্লুম "না ও অম্‌নি আজ একটু রোদে ঘুরে অম্‌নি হয়েছে"

"তবু ভালো,—দেখ্‌বেন এ চারদিনের মধ্যে আবার অসুখ বিসুখ করে বস্‌বেন না। আমাদের পুরীযাত্রা তিনদিন পেছিয়ে গেল কিনা,—মাসীমাও পরশু এখানে আস্‌বেন সেই জন্য—"

আমি বল্লুম "আমি পুরী যেতে পার্‌বো না" অত্যন্ত বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করলে "কেন?" "হঠাৎ কাজ পড়েছে তাই" একটু থেমে ফের বল্লুম "দেখুন আমার আজ রাত্তে বাসায়

একটু বিশেষ কাজ আছে, আজ পড়াতে পারবো না—"

"আচ্ছা"—বাসায় ফিরে এলুম।

পরদিন পড়িয়ে ফেরবার সময় নন্দিতা বল্লে "আমি পুরী যাবো না" আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে মুখ না তুলে জবাব দিলে যে সমুদ্রের শোভা দেখ্‌বার আগ্রহের চাইতে তার পরীক্ষায় ফেল না হবার আগ্রহটা বেশী, তাই এখানে থেকে সে পড়াশুনা করবে,—কারণ পুরী গেলে সেটা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার মাথায় কত ওলট পালট ভাবনা এলো।

তারপর দুদিন আর সে সম্বন্ধে কোনো কথা হয় নি। আমি কর্ত্তব্যের খাতিরে পাড়িয়ে গেছি, সে কর্ত্তব্যের খাতিরেই শুধু শুনে গিয়েছে কি না বল্‌তে পারিনে, কিন্তু মুখের শ্রী ছিল জল ভরা শ্রাবণের মেঘের মতো। যাবার দিন ষ্টেশনে তাকেও দেখলুম। আমাকে দেখে নন্দিতার বাবা বলে উঠলেন "এই যে মাষ্টার মশাই Very many thanks to you,—আশ্চর্য্য যে আপনার শিষ্যা নন্দিতার এতটা পড়ার লোভ হয়েছে যে সে পুরী পর্য্যন্ত যেতে চায় নি, অথচ সেবার আজও ওকে নিয়ে সেখানে যায়নি বলে শুধু কাঁদতেই বাকী রেখেছিল।" আমি নিঃশব্দে একটু হাস্‌লুম। তিনি আবার বল্লেন "কিন্তু মাষ্টার মশাই আমাদের next tripএ আপনার নিশ্চয়ই যেতে হচ্ছে।"

বড় দিনের ছুটী গেল। তারপর যে দিন তাকে পড়াতে যাই সেদিন নিশ্চয় ভাবে বুঝলুম আমি মজেছি। আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, মাকড়সা যেমন কাঁচ পোকাকে নিঃশব্দে জালে গুটিয়ে নেয় আমিও তেমনি তার শ্রীতে, চাহনিতে, কৈশোর সুলভ কমনীয়তায় ও নম্রতায় অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছি। তার যে গায়ের রংয়ে চপলার চমক খেলে না বলে আশ্বস্ত হয়ে ছিলুম সেখানে আমার চোখে আজ শরৎ প্রভাতের তরুণ অরুণের রঙ্‌ ধরে উঠেছে, যে চোখের দৃষ্টি একদিন শুদ্ধ করুণাই উদ্রেক করে বলে বলেছিলুম, সে চোখ আমার হৃদয়াকাশে ম্লান সন্ধ্যায় উজ্জ্বল শুকতারা হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, সেই কিশোরীর ফোটে-ফোটে-ফোটে-না সৌন্দর্য্য নব বসন্ত সমাগমে কোন্‌ অপূর্ব্ব লালিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌বে এই কল্পনায় আমি বিভোর হয়ে গেলুম, তার যে শান্ত নম্রতাটুকু প্রথম দর্শনে শুধু শ্রদ্ধা ও স্নেহের অর্ঘ্যই পেয়েছিল মাত্র, তা আমার হৃদমন্দিরে আজ ধূপসুরভিমিশ্রিত চন্দন পুষ্প সম্ভারের গন্ধ ছড়াতে লাগলো। দিনরাত শুধু ভাবতুম এ আমার হোলো কি? ঐ যে ছেলেবেলায় একচক্ষু হরিণের রূপকথায় পড়েছিলুম যে যে-দিক নিরাপদ জ্ঞানে মূর্খ মৃগ অন্ধ আঁখি সারাদিন পেতে রাখ্‌ত, মৃত্যুর দূত সেই দিক থেকেই তার নিষ্ঠুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়েছিল,—তেমনি যা আমায় পাগল করবে না ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলুম,—কোন্‌ যাদুদণ্ড স্পর্শে তাই-ই আমায় পাগলের চেয়ে পাগল করে তুল্‌ল!

ভাবলুম চাক্‌রী ছাড়্‌ব। এর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নন্দিতা একথা ক্ষুণাক্ষরে জান্‌তে পারার চাইতে যেন আমার মরণ আগে হয়। কিন্তু,—মনে পড়্‌তো—তার বিগত কয়েকদিনের ব্যবহার কি একেবারে নিরর্থক?

একদিন বলে ফেল্লুম আর চাক্‌রী করব না। সে বিস্ময়ে যেন বেদনাহত দৃষ্টি আমার পানে পেতে বল্লে "কেন?"—"ইচ্ছে নেই"—

"কেন?" "এত 'কেন'র জবাব দেওয়া যায় না" "দেবেন বেশ ছেড়ে দেবেন,—কিন্তু আমাদের কি ত্রুটি হয়েছে শুনতে পাই কি?" তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌ল, বোধ হয় নিজেদের অজানিত ত্রুটির পরিকল্পনায়।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লুম "না-না—আপনাদের আবার ত্রুটি,—আপনাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি, নিতান্ত আত্মীয়ের নিকট থেকেও তা আশা করা যায় না।"

"সত্যি?" বলে সে আমার মুখের পানে চাইলে, পরে মুখ নামিয়ে বল্লে "তবে?"—জবাবে শুধু বল্লুম "ভালো লাগে না।"

"ভালো লাগে না? আমার মতো বোকা মেয়ে পড়িয়ে আপনার ভালো লাগে না তাই বুঝি—"

আমি ব্যাকুলভাবে বাধা দিয়ে বল্লুম "আপনি কি যে বলেন ঠিক নেই" "তবে?" —"তবে?"—আমার বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল শুধু বল্লুম "আর কৈফিয়ৎ টানতে পারি না, এখন পড়ুন" স্বরটা যেন অস্বাভাবিক রকমের কড়া শোনাল।

নন্দিতা বল্লে "আপনি এখন পড়ান ছেড়ে দিলে আমি ফেল করব,—তাতে আমার মতো বোকা মেয়ের দুর্নামের চাইতে আপনার দুর্নামটা লোকের কানে বাজবে বেশী জানেন"—একবার ফিক্‌ করে সে হাসলে। "আপনি ফেল হবেন না"—

"আপনার Assurance পেয়ে সুখী হলুম, কিন্তু পরীক্ষাটা পর্য্যন্তও কি আপনার সুবিধা হবে না—আপনার পুরানো ছাত্রীর জন্যে এটুকুও"—বলে সে ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে তার নিবটা পরীক্ষা করতে লাগ্‌লো। তার সুগৌর মুখে মাঝে মাঝে রক্তের ঝলক খেলে যাচ্ছিল, মুখখানি তোলা, চোখ দুটি নিম্নসম্বদ্ধ,—শান্তশ্রীটুকু মুখের ওপর টল্‌ টল্‌ কচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম একি,—এর মানে কি?

মিনিট খানেক পরে বল্লুম "আচ্ছা পরীক্ষা পর্য্যন্ত থাক্‌বো", তারপর যে কয়দিন ছিলুম রোজই একটা না একটা নতুন অনুভূতি মনের পাতে নিয়ে বাড়ী ফিরতুম। আমার কথায় সে চা ছাড়্‌লে, জুতো ছাড়্‌লে, বিলেতী সুতোর কাপড় পরা ছাড়্‌লে,—হঠাৎ একদিন শুনলুম হাতভরা যে জড়োয়া গয়না আর গলায় নেক্‌লেস্‌ ছিল তা-ও সে তিলক-স্বরাজ্যভাণ্ডারে দান করেছে। অথচ এসব বিষয়ে মুখ ফুটে কোন কথা তাকে কোনো দিন বলিনি যে তাকে তা' করতে হবে,—শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম হয়তো যে আমার বাংলার মেয়েদের এম্‌নি হলেই ভালো লাগে। কথা উঠ্‌তেই সে সব কথার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি,—কিন্তু তার পর দিনই দেখ্‌তুম তার দেহ থেকে সভ্যতার আবর্জ্জনা একে একে খ'সে যাচ্ছে যার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তার আগের দিনই সে আমার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ তর্কজাল সৃষ্টি করেছে। একে তুমি কি বল্‌তে চাও?—এই যে কোথাকার কে আমার ইচ্ছামাত্র আজন্মসুখবিলাসলালিতা ধনী দুলালী নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছিল, এর এমন কিছু মানে যদি আমি ঠাউরিয়েই থাকি তবে কি তুমি আমাকে পাগল বল্‌তে চাও?" এই বলে সুপ্রিয় একবার চুপ করলে। তখন জলের জোর বেড়েছে, বারান্দায় ঝাপ্টা আসছিল। আমি তার আপ্‌নাহারা ভাবটাকে সম্বিৎ করে বল্লুম "ভেতরে গিয়ে বসি

ভাই চল, জলের ছাট আস্‌ছে”—ভেতরে গিয়ে বসে সে কিছুক্ষণ পরে আবার সুরু করলে। “অত সব বলে আর কি হবে। এবার শেষ সাক্ষাতের পালাটা বলি। সে দিন সে শেষ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, কথা ছিল সেই দিন থেকে আমার কর্ম্মে ইস্তফা। কিন্তু এ চাকরী ছাড়ার কল্পনায় কী যে মর্ম্মন্তুদ মুক্তির বেদনা—যাক্। সে দিনও ঢুকে দেখি নন্দিতা পড়ার ঘরে আগেই এসেছে। ‘বসুন’ বলে সে চেয়ারখানা সরিয়ে দিলে। আমি আওয়াজে যথাসাধ্য সবলতা টেনে এনে “আজকের পরীক্ষা কেমন দিলেন? পাশের খাওয়াটা করে?”

“ভালো নয়—পাশ হলে খাওয়া অবশ্যই পাবেন”—

“আপনি রোজই পরীক্ষা দিয়ে এসে বল্‌ছেন ভালো নয়।—কাল বল্লুম প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে একটু discuss করি, তাও আপনি করতে নারাজ”—“পরীক্ষায় যে ফেল হবো তা’তো জানাই, যদিও বা উৎরে যায়, কোনো মতে তো তৃতীয় বিভাগে, তার আবার discussion করবো কি?” “কেন?” —“এ ‘কেন’র একটাই মাত্র জবাব হতে পারে, পরীক্ষার পড়া না হলে লোকে পাশ করে কি করে?”

“পরীক্ষার পড়া করেন নি মানে?” মৃদুকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলুম।

‘মানে,—করিনি, পরীক্ষার বাবদ পড়া করতে আমার ভারী বিরক্ত লাগে”—একটু থেমে আবার সে বল্লে “আমিও বুঝিনে পরীক্ষা পাশ করে দুটো চারটে ডিগ্রী নিয়ে কি লাভ আছে বিশেষতঃ আমাদের—মেয়ে-মনুষের, যাদের অন্তঃপুরই বিশেষ কর্ম্মস্থল। শিক্ষা?—তা পরীক্ষার নোট মুখস্থ করার চাইতে কোনো সুযোগ্য শিক্ষকের কাছে,—যেমন আপনি—যদি সারাজীবনও পড়তে পারি তাতেই অতি উপভোগ্য শিক্ষা হয় আমার বিশ্বাস” আমি ভাবছিলুম—একি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? আমি বল্লুম “তা আপনা-দের তো পয়সা আছে সুযোগ্য শিক্ষক রাখতে আপনার বাধা কি?”

“আপনি পড়াবেন?—বলে সে যেন নেহাৎ জোর করে আমার মুখের দিকে এক-বার চাইলে,—তার পর মাথা নামিয়ে আবার বল্লে “ না তা আপনি তো আজই ছেড়ে যাচ্ছেন,—তা ছাড়া আজ থাকলেও চিরদিন পড়াতেন বা কি করে?”

আমি চুপ করে রইলুম। আমার বুকের ভেতরে তখন কি হচ্ছে মুখে বলা চলে না; খানিকক্ষণ পরে সেই আবার বল্লে ‘বাবা যদি না রাগতেন তবে non-cooperate করে কলেজ ছেড়ে দিতুম”—আমি আমার তরফ থেকে এই বিষম নীরবতাটাকে অবসান করবার একটা ছুতো পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম “আপনি সেদিনই না non-cooper-ation এর কথা উঠতে এর বিরুদ্ধে বিষম লড়ছিলেন এবং বাবার নিষ্কাতিশয্যে আমি কলেজ ছাড়তে পারিনি বলে কলেজ না-ছাড়তে পারাটা আমার পক্ষে দৈবের অনু-গ্রহ বলে বলেছিলেন?”

“যা বলেছিলুম তাই যে আমার মত আপনাকে কে বল্ল?” “আপনি কি ঝগড়া করেন নিজের মতের বিপক্ষে?”

“অর্থাৎ?”— “অর্থাৎ সেদিন যেমন হিন্দুসমাজের কথা উঠতেই ভয়ানকভাবে জাতিভেদের সমর্থন কচ্ছিলেন?” নন্দিতা আমার গূঢ় অর্থটুকু বুঝল কি না জানিনে. সে বল্লে “হতেও পারে; তর্কে তর্ক করি-

বার জন্য একটা দিক নিলেই সেটা যে তার ব্যক্তিগত মত তা নিঃসংশয়ে বলা চলে না”

“Non-cooperate করলে কি বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দেবেন?—ছেলেকে বরং পাসেন মেয়েকে আর কোনো বাপ তেমনি বাড়ীর বের করে দিতে পারে না, তা তিনি হাজার রায় বাহাদুরই হন—”

তা বাবা পারেন তিনি কি রকম কড়া-লোক আপনি জানেন না; আমার একমাত্র পিশিমা,—বি-এ, পাশ করার পর এক কায়স্থ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন বলে তাঁর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত তিনি করেন না,—সেদিন আমি এই বিয়ের আলোচনায় তাঁর দিকে টেনে কি একটা কথা বল্‌ছিলুম, তিনি এমন এক ধমক দিলেন যে কি বোল্‌বো।” একটু থেমে সে চোখ দুটী আমার পানে পেতে বল্লে “জানেন আমি তো মা-মরা মেয়ে, তার পর বাবা আবার বিয়ে করেছেন,—আমাকে তাড়ানো বিশেষ একটা শক্ত কথা কিছুই নয়, আর তাড়ালে যে আমি চল্‌তে না পারি তাও নয়,—দরিদ্রভাবে চলা আমার মোটেই শক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস নয়—পঞ্চাশ টাকায় আমি একটা সংসার চালিয়ে নিতে পারি—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই এ কথা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে আমি মেয়েমানুষ, পুরুষের আশ্রয় আমাদের নেহাতই দরকার,—কে আমায় আশ্রয় দেবে?”—একটু মুচ্‌কি হেসে সে বল্লে “আপনি দেবেন?” সে যেন সে দিন মরিয়া হয়ে কথা বলে যাচ্ছিল। তখন দ্বিধা সংশয় আমার সব চলে গিয়েছে, বুঝলুম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ কথার মাত্র একই অর্থ হতে পারে। অননুভূত একটা আনন্দের বন্যায় যেন আমার সর্ব্বদেহ অবশ করে আনছিল। কি করে যে তখন সংযত হয়েছিলুম, কি করে যে তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে পাগল করে দিই নি সেটা আমার সময়ে সময়ে আশ্চর্য্যই বোধ হয়। কিন্তু এই অভূতপূর্ব্ব উন্মাদ উদ্বেলতার সঙ্গে ছিল মিশ্রিত একটা বিজয়ের অপূর্ব্ব গর্ব্ব। পরোক্ষভাবে সঙ্কোচের খাতিরে আর এই অহঙ্কারের জোরেই বোধ হয় আমি নিথর প্রতিমার মতো বসেছিলুম। কি বইতে যেন পড়েছি একশ্রেণীর প্রেমিক আছে যারা প্রেমপাত্রীকে বেদনা দিয়ে একটা উৎকট আনন্দ পায়,—কথাটা সত্যি, বুঝ্‌লে সতীশ,—কথাটা অতি সত্যি। আমি হঠাৎ নিথর দেহখানাকে আরো শক্ত কাঠ করে মুখে পাথরের দৃঢ়তা এনে বিদ্রূপের স্বরে বলে ফেল্লুম “দেখুন আপনার একথার Solution আমি দিতে পারিনে,—কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার, যে আপনি অনেকগুলো কথা বলেন—হয়তো না বুঝে—যার অর্থ অনেক সময় সন্দেহজনক হতে পারে, এবং তার অসদর্থ যদি কেউ করে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।”

পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ওপরে কালো একটা মেঘের খণ্ড দমকা হাওয়ায় উড়ে এলে আকাশ বাতাস যেমন থমথমে শঙ্কাকুল অন্ধকারে ভরে আসে, তার চোখে মুখে এই কথা শুনে মুহূর্ত্তে তেমনি একটা আঁধার ঘিরে এলো। সে অভিভূতের মতো একটু পরে বল্লে “দেখুন, আমি সব জানি, সব বুঝি, কিন্তু আমি বড় বোকা,—আমার সাহস নেই, আমার—”সে থেমে গেল। মিনিট তিনচার দু'জনেই স্তব্ধ বসে রইলাম, শুধু দেয়ালে ঘড়িটার টক্‌টক্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কত কথাই মনের মাঝ থেকে আকুলি বিকুলি

কচ্ছিল ছাড়া পাবার জন্যে, কিন্তু কে যেন আমার গলা চেপে ধরেছিল। কিছুই বলা হোলো না। অবশেষে অতি কষ্টে বল্‌তে পাল্লুম শুধু "আসি তবে"—"আসুন"—সে মাথা আর তুল্‌লে না। আমি মিনিট খানেক আরো ছাতাটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে অসহায়ের মতো ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলুম।

রাস্তায় যেতে যেতে আমার মনে হোলো প্রথমদিন তার কাছ থেকে একটা প্রণাম পেয়েছিলুম,—আজ পাইনি। প্রণামের যোগ্যতাটা তার কাছ থেকে কি হারিয়েছি? নন্দিতা একদিন বলেছিল যে অপূর্ব্ববেশে বর্ষাসিক্ত হয়ে অপরিচিত তাদের সাম্‌নে প্রথমদিন গিয়ে, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলুম তাই নাকি তার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সে কথাটা মনে পড়্‌ল। আজ খতিয়ে দেখ্‌লুম বেশের পারিপাট্য আমার অজ্ঞাতভাবেই যেন কোন দিক দিয়ে বতখানি বেড়ে উঠেছে,—আর এও মনে পড়্‌ল নন্দিতার বেশই বা পারিপাট্যের কোন শিখর থেকে সাদা-সিধার কোন ধাপে এসে নেমেছে! মনে মনে একবার প্রশ্ন কর্‌লুম হঠাৎ এ কথাটা আমার মনে যেমন জাগ্‌ল নন্দিতার মনেও তা' জেগেছে কিনা এবং মনে পড়ে' ওষ্ঠে বিদ্রূপের রেখা ফুটিয়ে তুলেছে কি না। কিন্তু তখনই সুপ্ত অহঙ্কার মাথা তুলে বল্লে কেন—আখেরীর শক্তিশেলটা তো তাচ্ছিল্যভরে আমিই মেরে এলুম। দেখুক সে চরিত্রের দৃঢ়তাটা আমার কত বড়। কিন্তু হায়রে অন্ধ অহঙ্কার?—এ তুচ্ছ আত্মাভিমান কতক্ষণ ছিল? তারপর দিনের পর দিন যখন একঘেয়ে মুহূর্ত্তগুলো নিরানন্দের পসরা নিয়ে আমার অন্তরের দুর্ব্বহ ভারকে আরও নিবিড় করে তুল্‌ত, নিজের জ্বালা আগুনে নিজেই পুড়ে খাক হতুম তখন এক একদিন মনে হোতো ছুটে তাদের বাড়ীতে গিয়ে একটীবার মাপ চেয়ে আসি। কতদিন যাবো ব'লে বেরিয়েওছি, কিন্তু বড় জোর তাদের বাড়ীর রাস্তার মোড় থেকে অবাধ্য পা কতদিন আর এক নতুন রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে গেছে।

অবশেষে এক চিঠি তাকে দিলুম নিজের মনকে অনেক চোখ ঠেরে নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে যে কেন—আমি কোন্ সাহসে কোন্ ন্যায়ে তাকে এম্‌নি বিষম আঘাত করে মাপ না চেয়ে থাক্‌তে পারি। আর এখানে মাপ চাওয়াই উদারতা, যদিও এটাকে পরাজয়ের একটা অধ্যায় বলেই আপাততঃ মনে হয়। তার প্রতি যেন করুণা করেই চিঠিতে এই শুধু লিখ্‌লুম সে যেন কোনো দোষ হয়ে থাকলে আমায় মাপ করে, আর পরীক্ষার ফল বেরুলে যেন নিমন্ত্রণটার কথা তার স্মরণ থাকে। কিন্তু তাকে করুণা কর্‌তে গিয়ে নিজেকে যে কতখানি করুণা করে ফেল্লুম, তা জান্‌তে পার্‌লুম তখন যখন চিঠিটা ডাকবাক্সে ছেড়ে দিইছি। পরাজয়েও এমন অপার আনন্দ আছে তা আগে জান্‌তুম না।

চিঠির জবাব এলো না।

আরো একমাস গেল, শুন্‌লুম তারা শিলং চলে গিয়েছে চেঞ্জে। বুকে যে তুষের আগুণ জ্বল্‌ছিল তা নেবাবার কোনো উপায় ঠাওরাতে না পেরে আর একখানা চিঠি তাকে দেবো ভাব্‌লুম। কিন্তু কোন্ অজুহাতে? অনেক ভেবে চিন্তে মনে পোলো তার কাছে আমার নিজের অনেকগুলি বৈ ও নোট আছে, তারই একখানা দরকার

বলে চেয়ে পাঠাই। মাত্র একখানা বৈ চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জানালুম তার এপর্য্যন্ত একখানা চিঠিও না পেয়ে নেহাত মর্ম্মাহত হয়েছি। হয়তো চিঠিখানা একটু অনাবশ্যক লম্বা হয়ে গেল। আমার বুভুক্ষু আগ্রহের জবাবে এল এই দুটী লাইন—বলে সুপ্রিয় পকেট থেকে একটা রূপার চওড়া কেস্ বের করে রেশমের রুমাল দিয়ে মোড়া একখানা সাদা খামে পোরা চিঠি বের করে আমার হাতে বাড়িয়ে দিলে। তাতে লেখা আছে—

শিলং,
আটাশে মে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার বৈ এতদিন পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু আমার স্মরণ ছিল না। আশা করি অসতর্কতাজাত এ ত্রুটী মাপ করবেন। ইতি—

বিনীতা শ্রীনন্দিতা সেনগুপ্তা।

চিঠিটা রুমালে জড়িয়ে বাক্সে বন্ধ করতে করতে আবার সুপ্রিয় বলতে লাগল "এই-ই তাহার প্রথম এবং শেষ চিঠি। এখানি আমার আঁধার হৃদয়ে ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার আকাশে বিদ্যুৎরেখার মতো মাঝে মাঝে আলোর খেলা দেখায়। যাক্। এর তিন চার দিন পরে একটা পার্শ্বেল এলো, তাতে সবগুলা বৈ-ই সে পাঠিয়েছে,—মায় আমার হাতের লেখা নোটগুলি পর্য্যন্ত,—কোনো চিঠি পত্র তাতে নেই। সেদিন যে কিরকম রাগ হয়েছিল বলতে পারি নে ভাবতে ভাবতে শেষে শুধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে এই-ই আমার উপযুক্ত শাস্তি।

তার পর ফল বেরুল। প্রথম বিভাগে সে পাশ করেছিল। আনন্দে শিলঙে একটা telegram করে দিলুম—একটা চিঠিও দিলুম আগ্রহ অভিনন্দনের। জবাব এলো না।

এমন সময় বাবা একদিন বল্লেন আমার বিয়ে হওয়া আবশ্যক, একটী পাত্রী নাকি দেখে এসেছেন তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, শুধু এখন আমার মতের অপেক্ষা। উত্তরে স্পষ্ট জবাব দিলুম উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করা আমার অসাধ্য। বাবা একটু দুঃখিত হলেন—মা চোখের জল ফেল্লেন, কিন্তু আমার উপায় ছিল না।

কিছু দিন পরে একদিন কলেজে নন্দিতার ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "সুপ্রিয়বাবু,—বিয়ের নেমন্তন্নটা থেকে বাদ পড়িনে যেন"—আমি স্বরের বিরক্তিটা যথা সাধ্য চেপে জিজ্ঞাসা করলুম "এ সুসংবাদটী কোত্থেকে পেলেন ?"

"এই যে সুরেশ বল্লে—" "ও সব বাজে কথায় কান দেবেন না"—বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। ভাবতে লাগলুম নন্দিতার কানেও এ কথাটা পৌঁছেচে কিনা!

সপ্তাহ তিনেক পরে—শুনলুম নন্দিতা বি-এ, ক্লাশে বেথুনে ভর্ত্তি হয়েছে। মনে সেদিন বড্ড লাগ্‌লো নেমন্তন্ন করা দূরে থাকুক পুরানো শিক্ষকের সঙ্গে পরীক্ষায় সফলতার পরেও কি শুধু একবার দেখা করার মতো ঔৎসুক্যও তার হোলো না!—না এ নিক্তির মাপে প্রতিশোধ! তার তো কম হয় নি, রক্তমাংসের বুকে শুধু দগ্ধ অঙ্গারের কৃষ্ণতাই ফুটে উঠ্‌তে বাকী আছে।

আর একখানা চিঠি তাকে দিলুম, প্রত্যেক অক্ষরের পর বুক নিংড়ান ভালবাসা দিয়ে, ছত্রে ছত্রে তার রক্তরাঙা উন্মত্ততার প্রক্ষেপ দিয়ে। আগরের ভিতর দিয়ে কি তার প্রাণে গিয়ে তার রেশ পৌঁছাবে না?

লিখলুম তাকে একবার দেখতে আমার ভারী সাধ যায়, শুধু এই কথা আর কিছু না, —পত্র পাঠ যেন সে জবাব দেয়।

জবাব এলো না। এক দিন গেল দু'দিন গেল তিনদিন গেল।

আমি ক্ষেপে উঠলুম। এই বুঝি সে আমাকে ভালোবাসতো? আমার এত আকুল আহ্বান সে উপেক্ষা তা হলে করে কি করে। সব ভুয়ো সব ছায়া বাজি। আমার সে কোনদিন ভালোবাসে নি। আমার চিঠি গুলো হয়তো তার বিদ্রূপের খোরাক যোগাচ্ছে! ওঃ অসহ্য!

সেই দিন গিয়ে মাকে বল্লুম আমি বিয়ে কোরবো। দেখুক সে,—তাকে ছাড়াও আমার দিন কাটতে পারে।

আত্মীয় স্বজনেরা হাস্‌লে এই বুঝি আমার উপার্জ্জনক্ষম হয়ে বিয়ে করা!

দিন পনেরো পরে বিয়ের তারিখ ঠিক হোলো। দুশ্চরিত্র মদ্যপ পুত্র নির্দ্দয় প্রহারে বুড়ো বাপকে জখম করে নেশা ভাঙ্গলে আহত পিতার পানে চাইলে তার যেমন অবস্থা হয়, বিয়ের আগের দিন রাতে আমার সেই অবস্থা হোলো। দেখলুম এ বিয়ে করা আমার অসাধ্য, মহাপাপ। প্রতিশোধ গ্রহণচ্ছলে অদ্ভুত খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে এ আমি কী করিতে যাচ্ছি? বৌকে ভালবাসা আমার অসম্ভব,—তবে তার তরুণী জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যটুকুকে এম্‌নি করে দলে পিশে মারবার আমার কি অধিকার আছে? ভোর বেলা পালালুম।............তার পর কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো এই চার বছর ঘুরেছি —কিন্তু বুঝলে সতীশ কোথাও শান্তি পাই নে। সুদূর বিদেশে, সমুদ্রের বক্ষে; পর্ব্বতের শিখরে দগ্ধ মরুভূমিতে শুধু এক মর্ম্মদাহী স্মৃতি, এক পোড়াণি এক জ্বালা।

দিন কুড়ি হোলো বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা কিন্তু আশীর্ব্বাদই করলেন। মা বাবা দেবতা তাই হয়তো এমন লক্ষ্মীছাড়াকেও তাঁরা আশীর্ব্বাদ করতে পারলেন। বাড়ীতে শুনলুম যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল সে বিয়ের রাত্তে বাপের মনস্তাপ সইতে না পেরে বিষ খেয়ে মরে। মেয়েটীর নাকি বাপের পয়সা নাই বলে বিয়ে হচ্ছিল না। অবশেষে বাবা মেয়েটীর চেহারা দেখেই তার পর বাপের দুর্দ্দশা দেখে দয়া করে তাঁর সতেরো বছরের মেয়েকেই পুত্রবধূ করতে মনস্থ করেছিলেন। তোমাকে তো আগেই বলেছি বাবা মা দেবতা। কি দাগা পেয়ে বাপ মার কোল ছেড়ে পালিয়েছিলুম তা তাঁদের আভাসে বলেছি। তাঁরা বল্লেন কি জানো? আমি তাকেই কেন বিয়ে বল্লুম না, তাঁদের তাতে কোন আপত্তি ছিল না—আর এখনও যদি সম্ভব হয়...............আমি বললুম তা হয় না।.........এম্‌নি ভবিতব্যতা!

কেমন শুনলে বন্ধু আমার গল্প,—পরিসমাপ্তি হোলো যার নির্দ্দোষ বালিকার রক্ততর্পণে? তার মৃত্যুর জন্য সাক্ষাৎ ভাবে আমি দায়ী না' হলেও ওর স্মৃতির বিভীষিকার হাত থেকে এড়াতে পারি কৈ? আচ্ছা বলতে পারো আমাকে কেন্দ্র করে বিধাতা পুরুষ এমন একটা নিষ্ঠুর খেলা খেললেন কেন?" সে চুপ করলে। আমি বল্লুম তাই যদি পারবো ভাই তবে এ বিধাতা পুরুষের আর এক নাম অদৃষ্ট হবে কেন? সে চুপ করেই রইল। কিছু ক্ষণ পরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম "জানো বোধহয়

নন্দিতা সেনগুপ্তা নারী শিক্ষা সমিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, লোকের মুখে তাঁর সুনাম ধরে না, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে স্ত্রীলোকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যেমন অদম্য চেষ্টা করে বেড়াচ্ছেন তাতে আশ্চর্য্য হতে হয়। তিনি নাকি চিরকুমারী থেকে দেশ সেবাতেই আত্মনিয়োগ করবেন"

"জানি"—

"একবার দেখা করলে পারো না"—"কে—আমি?—অসম্ভব। যে আমি আত্মাভিমানের চরম শিখরে দাঁড়িয়ে সগৌরবে তাকে হারিয়েছি,—এ অর্দ্ধমৃত অপদার্থ অস্তিত্ব বয়ে নিয়ে আর তার সামনে যেতে চাই নে। আমার এ ব্যর্থ জীবনটা তার জীবনে যদি কিছু রং ধরিয়েও দিয়ে থাকে, তবে তার কর্ম্ম প্রাণতার ভেতর দিয়েই এর যতটুকু সার্থকতা হয় হোক্। আমি দুনিয়ার পক্ষে এখন অনাবশ্যকের মধ্যে,—আমার মনে হয় আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা লোপ পেয়েছে। যাক্ গে—কটা বাজলো?"

সে দেয়ালের ঘড়িটার পানে চাহিল, পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খোলা জানলা দিয়ে বাহিরের পানে তাকিয়ে রইল। তার শুষ্ক শীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার বুক ব্যথায় ভরে উঠল।

ঋতু-উৎসব

[শ্রীবিষ্ণুরাত সেন]

আজি প্রকৃতির ঋতু-উৎসব মধুর মাধবী রাতি
কুঞ্জ দুয়ারে গুঞ্জরে অলি আলোকে পুলকে মাতি;
অঙ্গ লতিকা শোভে শ্যাম বাসে
বাসক শয়ন অশোক পলাশে,
চামর ব্যজন মলয় বাতাসে
চন্দ্রে প্রদীপ ভাতি!

বিরহের হিম পরশে যে ম্লান প্রাণ মরণ মাগে
অগুরু গন্ধে ব্যাকুল ছন্দে মিলন মন্ত্রে জাগে
সঙ্গীত ঝরে দ্যুলোকে ভূলোকে
প্রকৃতি শিহরে অসহ পুলকে
মুরছে চেতনা পলকে পলকে
মিলিল মানস সাথী!

সাহিত্যে স্বাধীনতা

প্রকৃত সাহিত্যিক মাত্রেই যদি নূতন সত্যের ঋষি হন, যদি সত্য-শিব-সুন্দরের কোনও নূতন রূপ অনুভূতি মুখে লাভ করিয়া জগতে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হয় তবে তাঁহার স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। সত্য যাহার নিকট যেমন ভাবে প্রকাশ হইয়াছে, যে রূপ যাহার চোখে যেমন হইয়া ফুটিয়াছে সেটা তেমনি করিয়া প্রকাশ করিলেই না সাহিত্য হইবে। তবেই না তাঁর জীবনের ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। অলঙ্কারের অষ্টবন্ধন বা সমাজের বজ্রশাসন দিয়া তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করা নিষ্ফল। যে গড়িবার শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, সত্যকে যে নূতন করিয়া পাইবার অধিকার পাইয়াছে, এ শাসনে তাহাকে বাঁধিতে পারিবে না। তাকে জীবন সার্থক করিতে হইলে তার দৃষ্টি আলোক মাত্র শরণ করিয়া অক্ষুণ্ণ নূতন পথে ছুটিতেহ হইবে।

উপন্যাস সম্বন্ধে একটা প্রচলিত সংস্কার আছে যে ইহার আগা ও গোড়া একসঙ্গে কল্পনা করিয়া তাহার ভিতর একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, সমাপ্তিতে গল্পটার একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ দরকার। Bernard Shaw তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে এই সংস্কারের নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এমন দুই একখানা বই লিখিয়া ফেলিলেন যাহার সমাপ্তিটা এ হিসাবে সমাপ্তিই নয়, গল্পটা যেন জীবনের মধ্যপথে থামিয়া গেল। কিন্তু এ উপন্যাসগুলি জীবনের নানা রহস্য নিপুণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, জীবনের সত্যস্বরূপ আর্টিষ্টের তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছে। গত বৎসর যিনি Nobel Prize পাইয়াছেন সেই Knut Hamsunএর উপন্যাসগুলি এমনি সমালোচকের সংস্কার বিরোধী। চলিত আদর্শের মাপজোখ দিয়া পরিমাণ করিলে এ গুলির ঝুড়ি ঝুড়ি দোষ ধরা পড়ে! কিন্তু তবু Hamsunএর বইগুলি আদৃত হইয়াছে। কেন না ইহা জীবনকে জীবন্ত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে, অনাড়ম্বর সরল ভাষায় ও সামান্য সহজ ঘটনার স্বাভাবিক বিন্যাসের দ্বারা Hamsun নিজের জীবনে উপলব্ধ ভাব ও বেদনা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া তাঁর Growth of the Soil, Mothwise প্রভৃতি গ্রন্থ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সাহিত্য ঋষির এই স্বাধীনতা স্বীকার না করিলে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। সাহিত্যকে যদি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইতে হয় তবে তাকে যথেষ্ট হাত পা খেলাইবার অবসর দিতে হইবে। সাহিত্যিকের অন্তর মন্দিরের সবগুলি দুয়ার জানালা খুলিয়া দিয়া তার ভাবকে খেলিতে দিতে হইবে। সৎসাহিত্যের নামে ঝুড়ি ঝুড়ি বিধি নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া, নানা কঠোর শাসনের বাঁধাবাঁধির ভিতর একটা ফরমায়েসী সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা জীবন্ত সাহিত্য হইবে না। বাড়ীর ভিতর আটঘাট বাঁধিয়া দরোয়ান ও মাষ্টার মহাশয়ের চোখের তলায়

বদ্ধ ঘরে যে ভালো ছেলে গড়িয়া উঠে, জীবন সাগরের উর্ম্মি সংঘাতে সে কোথায় তলাইয়া যায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। মাঠে মাঠে ছুটিয়া খেলিয়া, লড়াই করিয়া, আছাড় খাইয়া যে মানুষ গড়িয়া উঠে সে পরম আনন্দে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়িয়া যুঝিয়া তাহার চূড়ায় চূড়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। সৎসাহিত্যই আমরা চাই, কিন্তু তাকেই বলি সৎসাহিত্য যাহার ভিতর সত্য প্রাণ আছে, যাহা খোলামাঠের আলো-হাওয়ায় স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে ঝঞ্ঝার ভিতর মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে, সত্যের আলোকে আগাগোড়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। এমন সৎসাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে সমাজকে চোখ রাঙ্গাইয়া গুরু মহাশয় সাজিয়া বসিলে চলিবে না. সর্ব্বদাই সনাতন, অতএব পুরাতন আদর্শে নূতনের ভালমন্দ যাচাই করিয়া কল্পিত অসৎ সাহিত্যকে পিষিয়া মারিবার আয়োজন করিলে চলিবে না। পুরাণো বেমানান পোষাক যদি নূতন লোককে পরাইতে হয় তবে সে মানুষকে ছাটিয়া পোষাকের সমান করিবার কল্পনা উন্টারাজার দেশেই সম্ভব।

সাহিত্যের গৌরব বিচারে যদি প্রধান কথা এই হয় যে সাহিত্যের প্রাণ আছে কিনা, তাহার ভিতর কোনও নূতন সত্য সজীব হইয়া উঠিয়াছে কিনা, তবে আমাদের পুরাতন সংস্কারের উদ্ধত রোষ দমন করিয়া রাখিয়া প্রথমে বিচার করিতে হইবে এই গোড়ার কথা। পিতামহের আমলে তৈয়ারী গহনা যদি নবজাত শিশুর হাতে না ঢোকে, তবে শিশুর পক্ষে সেটা বিশেষ নিন্দার কথা নয়। এবং যে পিতামহী সেই আক্রোশে শিশুকে কোলে তুলিতে অস্বীকার করে তাহার স্থান পাগলা গারদে। বুদ্ধিমান লোকে প্রাণপূর্ণ সুপুষ্ট শিশুটিকে কোলে করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেক্‌রা ডাকিয়া গহনা ভাঙ্গিয়া গড়াইতে দেয়।

স্বাধীনতা সাহিত্যপুষ্টির জন্য কতটা দরকার তাহা একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অনেক স্কুল কলেজে ছেলেদের লেখায় সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। সেই সমস্ত সাময়িক পত্রের লেখার ভিতর এমন একটা আড়ষ্টতা ও প্রাণশূন্যতা দেখা যায় যাহা সেই সব লেখকেরই অন্য লেখায় দেখা যায় না। তা ছাড়া যাও বা লেখা থাকে তাহাও ছেলেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা সুকঠিন হয়। ঢাকা কলেজে এমনি একটি সাময়িক পত্র পরিচালকদের নিকট শুনিয়াছি যে ঐ কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা আপনা আপনির ভিতর বেশ নিয়মিত রূপে একখানা হাতের লেখা মাসিকপত্র চালাইত, এবং তাহাতে যে সব লেখা বাহির হইত তাহা অনেক সময়ই বেশ সরস ও প্রাণপূর্ণ। এই প্রভেদের হেতু এই যে কলেজের কাগজের জন্য লিখিতে গেলেই একটা অস্বাভাবিক আড়ষ্টতা ছেলেদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। লেখকের সর্ব্বদাই মনে থাকে যে সে লেখা তার একজন শিক্ষকের হাতে পড়িবে, সুতরাং শিক্ষকের মনের দিকে চাহিয়া নিজকে সে এমন অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর ও প্রাজ্ঞ করিয়া ফেলে যে তার লেখার আশে পাশে তার সহজ প্রাণটা খেলিতে পায় না। এমন অবস্থায় ফসল যে কেবল খুব উঁচুদরের হয় না তাই নহে, ফলনও কম হয়।

সাহিত্যের সেবা করিতে গিয়া যদি কেবলি চলিত সংস্কারের দাসত্ব করিতে হয়, পথ

চলিতে পায় পায় যদি সনাতন শাস্ত্রের নেতি নেতি শুনিয়া চলিতে হয় তবে প্রতিভার অন্তরাত্মা ভয় পাইয়া বিদায় হয়। কাজেই সৎসাহিত্য যদি আমরা পাইতে চাই তবে অসৎ সাহিত্য বা অসাহিত্যের ভয়ে অধীর হইয়া সাহিত্যের সকল পথে কাঁটা ছড়াইয়া রাখিলে চলিবে না। আগাছার ভয়ে জমী কাটিয়া পুকুর করিলে চলিবে না। আগাছার সঙ্গে সঙ্গে যে অমৃত ফলের গাছ বাড়িয়া উঠিবে তাহার আশায় জমিতে সার ছড়াইতে হইবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে আগাছ কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, কেন না তাহার ভিতর জীবনের বীজ যে সত্য তাহা নাই, সুতরাং আগাছা নিড়াইবার ভার কালের উপর দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে অমৃত ফলের রস সম্ভোগ করিতে পারি।

সাহিত্যে স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি করিতেছি বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না যে সাহিত্য কোনও দিনই নিজের রাজ্যে কোনও সীমা স্বীকার করিয়াছে। সাহিত্যিকের স্বাধীনতা প্রসাদলব্ধ নয় ইহা তাহার ঈশ্বরদত্ত অধিকার। সাহিত্য কোনও দিন কাহারও কাছে ভিক্ষা করিয়া ইহা লাভ করে নাই কোনও দিন এ বিষয়ে বিচার করিবার কোনও জুরিস্‌ডিকসন স্বীকার করে নাই। সে তাহার নিজের অধিকারে চিরদিনই নিজের রাজ্যে তত্ত্বের তুঙ্গতম শিখর হইতে রস সাগরের অতল গভীরতা পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরকে আপনার ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সমালোচক চিরদিনই ইহার পিছু পিছু ছুটিয়া কখনও বা রসের প্রসাদে তৃপ্ত হইয়াছে কখনও বা ইহার উপর আপনার মায়ার জাল ছড়াইয়া মনে করিয়াছে সাহিত্যকে এবার শাসনে আনিয়াছি, কিন্তু প্রতিভা চিরদিনই সকল গণ্ডী অস্বীকার করিয়াছে, এ মায়ার বন্ধন তার সম্মুখে চিরদিনই লূতাতন্তুর মত অলক্ষ্যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

শাসনের রক্ত চক্ষুতে সাহিত্য কোনও দিন ভয় পায় নাই, পাইবে না, নিগড়ের ঝঞ্ঝনা সে চিরদিন হাসিয়া উড়াইয়াছে। এ যে বিধাতার প্রসাদপুষ্ট গরুড় পক্ষী, স্বর্গ হইতে রসাতল পর্য্যন্ত ইহার স্বচ্ছন্দ বিচরণ, ইহাকে বাঁধিবে কে? সত্যের স্নিগ্ধ তীব্র জ্যোতি যার চক্ষে জ্বলিতেছে, আঁধার তাহাকে অন্ধ করিতে পারে না। সুন্দরের রসের অমৃতে যে অক্ষয় অমর, অনাদরের মূর্চ্ছা যে তাহাকে মারিবে কে? শিবের অক্ষয় কবচ তার, হিংসার ক্ষীণ শায়কে বিঁধিবে কে? যে সাহিত্য জগতে বিধাতার আহ্বান পাইয়া অগ্রসর হইয়াছে ঋষির দৃষ্টিতে সে শিবসুন্দরকে দেখিতে শিখিয়াছে, সত্যের অভ্রান্ত আলোক যাহার হৃদয়ে নিরন্তর জ্বলিতেছে সে বাণীর দুলাল, সে বজ্র লইয়া হাসিয়া খেলিতে পারে, আগুনের ভিতর নাচিয়া বেড়াইতে পারে। গ্লানি তাহাকে স্পর্শ করে না, ক্লেদ তাহার অন্তর কলঙ্কিত করে না। সে স্বরাট! আপনার অবিসম্বাদী রাজ্যে সে সম্রাট, বাণীর সর্ব্বেষ্টীযজ্ঞে সে হোতা, সে সর্ব্বজিৎ।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

ছোটলোক

গোড়াতেই স্বীকার করছি যে আমারই দোষ। ছোটলোক এবং ভদ্রলোককে একাকার করবার চেষ্টা করলে যে এমন হবে তা আমি জানতুম। তবে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কংগ্রেসের কর্ত্তারা যা বলেন তাই

করতে হয়—আপত্তি করে কোন ফল নেই তাই তখন ওসম্বন্ধে কিছু উচ্চবাচ্য করি নি। কিন্তু ৩০শে ডিসেম্বরের পর থেকে ছোট-লোকদের আস্পর্দ্ধা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যাদের আমরা বক্তৃতা করতুম এখন উলটে তারাই আমাদের বক্তৃতা শোনাচ্ছে।

কথাটা এই যে রহিম সেখ যে কত বড় শয়তান—তাকে দেখতে নির্ব্বোধের মত কিন্তু তার পেটে যে কি রকম শয়তানি বুদ্ধি তা প্রকাশ না করলে আর চলল না। তখন যদি জানতুম যে তাকে নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে তা হলে সত্যি বলছি তাকে কখনও কংগ্রেসের সভ্য করতুম না।—সে ব্যাটা চাঁদা দিয়েছে চার আনা কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে চারশো। সে চাঁদাও প্রথম দিতে দ্বিধা করেছিল কিন্তু তার ভিটেমাটি আমার কাছে বাঁধা তাই আমার অনুরোধ না রেখে তার উপায় ছিল না। রহিমের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার দরকার নেই তবে নীচে যেটুকু দিলাম তাতেই বুঝতে পারবেন লোকটা কি পাজী এবং স্বার্থপর।

রহিম আমায় জিজ্ঞেস করল—"বাবু, স্বরাজের কি হল?"

আমি বললুম—"কেন? দেশময় এই যে দেশাত্মবোধ জাগল—সেকি তুই চোখে দেখচিস্ না?

সে বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ কিন্তু ট্যাক্স যে বাড়ল তার কি করলেন? এই ত চৌকী-দারি ট্যাকস আগে দিতাম চার আনা এখন দিতে হয় বারো আনা। এদিকে পেট ভরে খেতে পাই না—এই ত সেদিন আপনার সুদ দিলাম, কাপড় নুন তেল সবের দাম বাড়ছে। এর উপর জমীদার জমা বৃদ্ধির নালিশ করল। জমীদারের উকীল বলল—জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সেই জন্যে খাজনা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আমি কাঁদাকাটি করে বললুম হুজুর, দাম বাড়াতেই ত এই খাজনা দিয়ে উঠতে পারি না, এর উপর খাজনা বাড়ালে ধনে প্রাণে মারা যাব। হাকিম বলল—কান্নাকাটি করলে ত আইন বদলাবে না। খাজনা বৃদ্ধি হল এখন আমরা করি কি?

আমি বললুম—"শোন্, চরকা কাটিস?"

রহিম অম্লান বদনে জবাব দিল—"না —আমরা ক্ষেতের কাজ করে সময় পাই না তা চরকা কাটব কখন?"

"—কেন তোর বাড়ীর মেয়ে ছেলে?"

"—তারা ধান ভানে; ছেলে পেলে মানুষ করে; সংসারে কাজ করতে হয়; তার উপর ক্ষেতের কাজ বেশী হলে অনেক সময়ে আমাদের সাহায্য করতে হয় সময় পাবে কোথায়!"

এবার রহিমকে উপদেশ দিলুম। বললুম —ভাই রহিম এই যে আলসেমি—এই আলসেমিই আমাদের কাল। আমরা যে কতবড় অপদার্থ তা এর থেকেই বোঝা যায়। ধর যে সময় তোমরা গল্প কর কি তামাক খাও। ধর, দিনে চার ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টা অর্থাৎ সপ্তাহে আটাশ ঘণ্টা অর্থাৎ সাতদিনে একদিন শুধু তামাক খেয়ে কাটাও। ভেবে দেখ দেখি বছরে কতদিন তোমার এই নশ্বর জীবনের কতদিন শুধু তামাক খেয়ে কাটাও!—না—না আপত্তি করলে চলবে না। বাপু যদি Statistics বুঝতে তবে আপত্তি করতে না। তা এই আলসেমি আমাদের অর্থাৎ তোমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

বেচারা রহিম যেন ভেবড়ে গেল—সে

যে তার মহমূল্য জন্মের এত অধিক সময় তামাক খেয়ে নষ্ট করে তা সে ইতিপূর্ব্বে উপলব্ধি করে নি। আজ আমার কথায় তার চৈতন্য হল এবং বোধ করি সে অনুতাপ বোধ করছিল। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলুম—"আচ্ছা, রহিম হিন্দু মুসলমানের একতায় বিশ্বাস করিস ত ?" হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলুম—সেটার উল্লেখ করে কাজ নেই।

রহিম অনেকক্ষণ শুনে শুনে হঠাৎ জিজ্ঞাসা—করল—"বাবু আপনারা আমাদের ঘরের দাওয়ায় উঠতে দেন না কেন ?"

"..আরে ব্যাটা তুই হলি মুসলমান যাকে বলে ম্লেচ্ছ, তোকে দাওয়ায়...!! ব্যাটা কংগ্রেসের মেম্বর হয়েছে তবে আর কি আমার মাথা কিনে ফেলেছে...কোন দিন ব্যাটারা বলবে 'তোমার মেয়ের বিয়ের পংক্তি ভোজনে আমাকে বসিয়ে দাও।' ছোটলোক-দের একটু আস্কারা দিয়েছ আর কি তারা মাথায় উঠতে চায়।'

আমার চেঁচামেচিতে বাড়ীর দু তিনজন লোক ছুটে এসে যখন শুনল যে রহিম আমার সঙ্গে এরূপ স্পর্দ্ধা করেছে তখন সকলে মিলে তাকে ভর্ৎসনা করল। রহিমও অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগল ; বলল—"ভট্টাচার্য্য মশায়, আমরা ছোটলোক আমাদের কথায় দোষ নেবেন না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথঞ্চিত শান্ত হয়ে আসন পরিগ্রহ, করলুম এবং বললুম—"তুই ব্যাটা চরকাও কাটিস না, মুখে যাই বলিস হিন্দুমুসলমানের একতাতেও বিশ্বাস করিস না দেখতে পাচ্ছি। অহিংসাতে বিশ্বাস করিস ত ? মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে কি বলেছেন—জানিস ত অহিংসা মন্ত্র গ্রহণ না করলে আমাদের আন্দোলন সফল হবে না। জানিস এই অহিংসা পন্থাটা পৃথিবীতে একটা নূতন পথ—তোকে যদি কেউ মারে, কি গালাগালি করে, তুই চুপ করে থাকবি ; তর্ক করবি না, প্রতিবাদ করবি না ; চুপ করে সহ্য করবি, কেমন বুঝলি ত ?"

রহিমের এক দোষ সে প্রথমে সব কথা মেনে নেয় তারপর সে যখন দুই একটা প্রশ্ন করে তখন বেশ বোঝা যায় যে কথাগুলি ওর এক কান দিয়ে ঢোকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবারও প্রথমেই অহিংসাবাদ সে মেনে নিলো বিশেষত ইতিপূর্ব্বে ভর্ৎসনাতে সে অনেকটা কাবু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তবু ওর দেহের আয়তন ওর হাতের গুলের দিকে তাকিয়ে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হোলো না যে ওকে মারলে ও চুপ করে সহ্য করবে।

রহিম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করল—"কর্ত্তা খেতে যে পাই না বাঁচি কি করে ?"

এদের ভিতর প্রচার করতে গিয়ে দেখেছি ওদের ঐ এক কথা—খেতে পাই না, ট্যাক্স দিতে পারি না, মহাজনের সুদ দিতে পারি না, খাজনা দিতে পারি না, যেন ব্যাটারা এক এক নবাবপুত্তুর। তাদের কতদিন বলেছি যে দেখ্, এই সব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের নেই। তা তারা শোনে না—ঐ এক কথা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে। রহিমকে বললুম—দেখ রহিম, বিলেতে শ্রমজীবিদের এক ধুয়া উঠেছে তারা চায় Standard of living ভাল করতে অর্থাৎ কিনা যেমন ভদ্রলোকেদের দেখে সেই রকম হতে তারা চায়। ভগবান করুন যেন আমাদের এই ভারতবর্ষে আমরা এই সব স্বার্থপরতার

অনুসন্ধান না করি। জানিস ভোগে মুক্তি নেই ত্যাগেই মুক্তি; আর যাই হোস্ স্বার্থপর হোস না। আমাদের এই যে যুদ্ধ এটা ধর্ম্মযুদ্ধ—যেটা দিতে প্রতিজ্ঞা করেছ সেটা দিও নচেৎ ধর্ম্মরক্ষা হবে না জানবি যে ধর্ম্ম যদি নষ্ট করস ত তুইও নষ্ট হবি। জমীদারের খাজনা ধর্ম্মতঃ দেয় অতএব ওটা দিও। আমার সুদটাও ধর্ম্মতঃ আমার প্রাপ্য সেটাও দিতে ভুলো না। জানত আমাদের দেশে একটা আধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিক বোঝনা?—এই কিনা Spiritual অর্থাৎ—দেখ বাপু তোমরা না বোঝ ইংরাজী না বোঝ সংস্কৃত; তোমাদের কিছু বোঝানই দায়। যাই হোক এর ভিতর খাওয়া দাওয়া টেক্সের কথা তুলে জিনিসটাকে নেহাৎ পার্থিব করে তুলো না। জানত গার্গী নাকি মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন যে যা নিয়ে অমর না হব তা নিয়ে আমাদের কি হবে? বাপু হে খেয়ে দেয়ে কাকেও কখন অমর হতে দেখছ, না শুনেছ? একজন মেয়েমানুষ যা বুঝেছে তা তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে বোঝ না একি কম লজ্জার কথা। এঁ্যা—তোমার স্ত্রী বলে ঘরে চাল নাই—রহিম তোমার স্ত্রী কি গার্গী, মৈত্রেয়ীর চেয়ে বেশী জানে না বেশী বোঝে...?"

রহিম চিরাভ্যাস মত সব কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল; তারপর সেলাম করে প্রস্থান দিল। সেই থেকে তার আর দেখা নেই—আসলে এ আন্দোলনের আসল সুরটা ওরা ধরতে পারে নি।

"আত্মশক্তি" শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়

পুস্তক সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

জাগরণী।—বাঙলার কাব্য গগনের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড রবীন্দ্র নাথের পর কবি বলিয়া মনে করিতে যাঁহাদের নাম মনে পড়ে—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

যতীন্দ্র মোহন ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্র-শিষ্যের উপযুক্তই হইয়াছে! অপরূপ শব্দ আহরণে, ভাবব্যঞ্জনায়, ভাষালালিত্যে এবং হৃদয়ী কবির আন্তরিকতায় তাঁহার স্থান রবীন্দ্রনাথের পর, সকলের উপরে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভাবের Comprehensiveness ব্যাপকতা আছে বলিয়াই যতীন্দ্র মোহন কোনও একটী বিশিষ্টভাবকে আপন মনের রসানুভূতির দ্বারা সুন্দর করিয়া হৃদয়গ্রাহী করিতে পারেন। আপনার প্রাণের প্রাচুর্য্য দ্বারা কবি যদি পাঠকের মনকে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভূতিতে অভিভূত করিতে পারেন তবে তাঁহার কবিতা শ্রেষ্ঠ। কবি যতীন্দ্রমোহনের সেই প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, অনুভূতির প্রাবল্য আছে।

যে Lyrical element যতীন্দ্র মোহনের খণ্ড কবিতার প্রাণ, সর্ব্বস্থানে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও ভাষা ভাব ও ছন্দের সংযোগে পাঠকের মনকে তাহা স্পর্শ না করিয়া যায় না। লেখার মধ্যে একটা এমন সাবলীল গতি, এবং

একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি, এমন সুমধুর ভাব আছে যাহাতে শুধু মুগ্ধ হই না—যথেষ্ট আনন্দও পাই।

যতীন্দ্র মোহন যে বিষয়টি নির্ব্বাচন করেন—তিনি সমস্ত অন্তর দিয়া তাহার মধ্যে এমনভাবে নিমগ্ন হন, অতি তুচ্ছ বস্তুর প্রতিও তাহার এমন সহানুভূতি যে শুধু সেই গুণে তাঁহার লেখা সকলের প্রিয় হইতে পারে। আমার মনে হয় যতীন্দ্র মোহন তাঁহার আন্তরিকতা, সমবেদনা ও ব্যাপকতার সাহায্যে যে কবি-প্রশস্তি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার যোগ্যই হইয়াছে।

এ যাবৎ তিনি তাঁহার "রেখা" "লেখা", "অপরাজিতা", "নাগকেশর", "বন্ধুর দান" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে যে সব খণ্ড কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের বিশেষ কোনও বাণী Message পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।—সে সব কবিতা কবি প্রাণের কোন বিশেষ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইতে যে কবিতার উৎপত্তি তাহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের বাণী প্রচার করে না।

এতদিন পরে কবির যথার্থ বাণী আমরা আলোচ্য গ্রন্থ "জাগরণী"তে পাইয়াছি। এই পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশ কবিতা তাঁহার প্রাণ দিয়া লেখা তাই সেগুলি এমন প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

একদিকে যেমন তিনি তাঁহার কবিতার মধ্যে একটী পৌরুষভাব, বীরোচিত, তেজ, অসাধারণ ঋজুতার পরিচয় দিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি করুণ রসের অবতারণায় তিনি আপনার কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যে "দিদিহারা"র মত করুণ কবিতা বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার "লক্ষ্মীপূর্ণিমা" ও "চাই কেয়াফুল" প্রভৃতি কবিতায় যেমন চারুশিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি জাগরণীর বিজয় চণ্ডী, পাশার বাজি, বৈশাখ, নন্দীর অনুশাসন, বিপন্না, দেশের লোক, প্রভৃতি কবিতা কয়টী এবং শেষের কয়টি গানে তিনি আপনার সুগভীর দেশাত্মবোধ, এবং অনাদৃত নিপীড়িত দেশবাসীর প্রতি যে অসীম মমত্ব বোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এতদিন পরে সত্য সত্যই তাঁহার কোথায় বৈশিষ্ট্য তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। এসব কবিতার মধ্যে তাঁহার মর্ম্মের বাণী সমবেদনায় অনন্ত কাতরতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইবার কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার কবি প্রতিভার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিব।

"বিজয়চণ্ডী" কবিতায় কবি যে বিদ্রোহবাদের অবতারণা করিয়াছেন বাঙলা সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও, ইহার তেজ এবং ঋজুতায় সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই।

আত্মার লাগি অন্ন যে চাহি
সে অন্ন আজ ছড়ায়ে ভূমে
জানেন জননী মর্ত্ত্য জীবের
জঠর ভরে না যজ্ঞ ধূমে
চাই আলো বায়ু চাই পরমায়ু
চাই যে সরল স্বাধীন চিত
সে প্রাণের পূজা লন না জননী
যে প্রাণ সতত শঙ্কাভীত।

* * *

বিরাট বিশ্বমাতারে বরিয়া
কেমনে সে মূঢ় বাঁধিবে কাছে
রক্তের নীচে শূন্য জঠর
হাঁ করিয়া যার পড়িয়া আছে।

চির সুধাময় এই সে শরৎ
এই ত দিগ্বিজয়ের দিন
মহেশ্বরের মহাকাশমণ্ডলে
মহাশ্বেতারা বাজায় বীণ ;
শুভ্র সূর্য্য কিরণের তারে
সুরের চামর পড়িছে ঝরি'
বরষা-অন্তে মেঘান্ধকার
আশার আলোকে উঠিছে ভরি,'
হাঁসের পাখার ঐ শোনা যায়
সুরের লহরী গগন ছেয়ে
চল্ চল্ চল্ চল-চঞ্চল
তটিনী চলেছে ধরণী বেয়ে ;
দিগ্বিজয়ের এইত সময়
কর্ম্মযোগের লগ্ন এই
বিজয়ার পায়ে বিজয় বিদায়ে
আজ আর কোন বিঘ্ন নেই ;
লঙ্ঘি ভূধর, মথি সাগর
পার হয়ে মরু, খুঁড়িয়া খনি,
দুঃখ সহিয়া আনুক বহিয়া
মায়ের পায়ের যোগ্য মণি ;
আর্য্যের পূজা করিবে সে আজি
আর্য্যের মত মন্ত্র বলে ;
অশ্বমেধের বিজয়ী অশ্ব
ছুটুক আজিকে বিশ্বতলে।
ছুটুক সে আজি বিজয়মত্ত
টুটুক মিথ্যা মোহের জাল,
লুটুক আকাশে শিব-তাণ্ডবে
কটিতটে-বেড়া বাঘের ছাল :
উঠুক ফুলিয়া প্রলয়োচ্ছ্বাস
মহাভীম জটা জগৎ ঘিরে',
পড়ুক টুটিয়া কঙ্কালমালা
নীলকণ্ঠের কণ্ঠি ছিঁড়ে,
শৈলে শৈলে উঠুক গর্জ্জি
বন্ধনহারা ভুজগদল,
রুদ্র ত্রিশূল ঝন্‌ঝনানিতে
মথি উঠুক সাগর জল ;
ডিণ্ডিমি-ডি-মি ডমরুর ডাকে
ব্রহ্মাণ্ডেতে পড়ুক সাড়া,
চরণের চাপে ক্ষুদ্র বাসুকি
উঠুক সে দিয়া অঙ্গ নাড়া।

প্রভৃতি অতি সুন্দর। 'পাশার বাজি' শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলিবার নাই.—আগাগোড়া সুন্দর। ঘটনার বৈচিত্র্য, ভাষার সৌন্দর্য্য, মিলের বাহাদুরী ত আছেই, সবার উপর এমন একটা তেজ, ওজঃ এবং কারুণ্য এই কবিতায় ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান যে একদিকে নিজের অন্তরের পুরুষকে অনুভব করিয়া পাঠক যেমন শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে তেমনি করুণার আতিশয্যে দু'ফোটা চোখের জল তাহাকে ফেলিতেই হইবে।

বৈশাখ কবিতার নামরূপটি দেখিয়া প্রথমত মনে হইবে যে এ বুঝি "হে বৈশাখ হে রুদ্র বৈশাখের" অনুকরণ—কিন্তু পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন—ইহার বিষয় বিন্যাস এবং অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। কবি কালকে বা প্রকৃতির ঋতু-পর্য্যায়কে "মহাকাল কুণ্ডলী" রূপে কল্পনা করিয়াছেন—ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের নূতন সম্পদ। তার পর তিনি বৈশাখের মধ্যে শিবের যে মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর—

প্রশান্ত অথচ ভয়ঙ্কর
হে বৈশাখ, পশুপতি শিব তুমি—পিনাকী
শঙ্কর !

রৌদ্র শুভ্র সমুদেহ তব
সৃষ্টির আনন্দে ভরা রুদ্রতার মূর্ত্তি অভিনব।
ঝক ঝক দীপ্ত নেত্র রয়,
অতীতে করিয়া ধ্বংস বিশ্বেরে বাঁচাও
মৃত্যুঞ্জয়!
স্কন্ধে মৃত কালকন্ম সতী,
ভবিষ্যৎ আজি আগে গৌরীরূপে করিছ প্রণতি
মহাকাল চরণের পরে;
প্রসন্ন হাসিতে তুমি তাহারে বরিছ সমাদরে।
তারপর—
শিখাও নবীন কর্ম্মগীতা,
কি হ'বে করিয়া শোক, নির্ব্বাপিত আজি
চৈত্র-চিতা
পুরাতন বর্ষে করি গত;
*   *   *
ঘরে ঘরে হোক খোলা নূতন কর্ম্মের
হালখাতা!

যতীন্দ্র মোহনের এই সব কবিতায় তিনি "কর্ম্মের" মধ্যে কর্ম্ম-দেবতাকে আহ্বান করিয়াছেন—কর্ম্ম প্রেরণার জন্য, কর্ম্ম সূচনার জন্য, কর্ম্মবিমূঢ় অবসাদগ্রস্ত দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন—সেই উদ্‌যাপিত কর্ম্ম-সাধনার বিপুলক্ষেত্রে।

'প্রেমের কথায়' তিনি সত্য কথা শুনাইয়াছেন—"প্রেমের কথা মোদের তরে নয়।"

পায়ের তলার গর্ত্তে যাহার বাস
সবক্ত তার থাকতে অন্ধ পারে,
প্রেমের কথা সে যেন না বলে,
প্রেম নাহি আর চতুঃসীমার ধারে!
*   *   *
আপন মাকে মা বলতে যে নারে,
আপন তারে ডাকতে সাহস নাই,
বোনের লজ্জা দাঁড়িয়ে যেজন দেখে,
আপন ঘরে পর সে সর্ব্বদাই;
*
ধর্ম্ম যাহার পরের পায়ে ধরা,
কর্ম্ম যাহার পয়সা দিয়ে কেনা,
মৃত্যুকে সে বাসুক ভাল শুধু
চুকিয়ে দিয়ে বিশ্বদেবের দেনা—

'মাকোর মেয়ের' ছন্দটি নূতন, রচনা ভঙ্গীটিও চমৎকার।

কষ্টি-কালো কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের
রাশ
ঝাঁকিয়ে মাথার পরে,
জল্‌দি পায়ে এগিয়ে সেদিক চল্‌ল বলাই দাস,
চোক্ তার চক্ চক্ করে।

'পাগল' কবিতাটির রচনাভঙ্গি নূতন না হইলেও সুমধুর। বলিবার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না তবু রচনা ভঙ্গির গুণে কবি তাঁহার কবিতাটিকে সরল সুন্দর করিয়াছেন। কবিতাটির সরল মাধুর্য্য হৃদয় স্পর্শ করে। কবির বহুদিনের কল্পনার ফল, অনেক গভীর চিন্তার ফলে প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটা সহজ ও অনাবিল ধারা আসিয়াছে যাহা কলাকৌশলের পরিণতি বলিয়া বোধ হয়।

শিল্পের উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশও বটে—আত্মগোপনও বটে। শিল্পে শুধু আত্মপ্রকাশই বাঞ্ছনীয় যতটুকু সরল করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং যতক্ষণ উপাদান ও উপকরণের রূঢ়তা, গ্রন্থিলতা ও কার্কশ্য আচ্ছন্ন না হয় ততক্ষণ আত্মগোপন করিতেই হইবে। কবি যতীন্দ্র মোহন শিল্পসৃষ্টির মূল মন্ত্রটি বেশ বুঝেন। যে নূতন সৃষ্টি করিতে পারে সে শক্তিমান শিল্পী ও স্রষ্টা—যে পুরাতনকে নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে পারে তাহাকেও আমরা গুণীশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি। সাধারণ পাঠক শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের গুণ উপলব্ধি করিতে চায় না—

তাহারা খোঁজে "নূতন তথ্য কি পাইলাম ?" ভঙ্গির নবীনত্ব বা রচনার কারু সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার চোখ যাহাদের নাই— তাঁহাদের নিকট যতীন্দ্র মোহন ও তাঁহার সতীর্থ কবিগণের বিশেষ সমাদর হইবে না।

'নন্দীর অনুশাসনে' কবি ব্যঙ্গের সুরে দেশের দুর্দ্দশার প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। যে অভিমান ও বিক্ষোভের বিষ এই কবিতায় ছড়ানো আছে তাহাই সমস্ত দেশের বিক্ষোভ অভিমান! পরাধীন জাতীর ভাগ্যে নন্দীর অনুশাসন জারি হইল—

চিৎ হয়ে শুধু পড়ে রবি তোরা মোদের খেলার কালে,—
সব চেয়ে মান লিখিয়া দিলাম খাস্-গোলামের ভালে!

'বিপন্না' কবিতার মধ্যে একান্ত নির্ভরতার ফল-সিদ্ধির আভাস দিয়া কবি বলিয়াছেন— কৌরবের সভাতলে বিপন্না দ্রৌপদী, 'দুটি চক্ষু অশ্রুজলে' ভাসিয়া "বামহস্তে বসন সম্বরি' অন্যবাহু উর্দ্ধে তুলি' বারম্বার শ্রীহরিকে ডাকিয়া, মৃত্যু চাহিয়াছিল কিন্তু—

শ্রীকৃষ্ণ তথনো সেই অপূর্ণ নির্ভর হেরি তার
আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিস্তারি।
কিন্তু যবে নিরুপায় দুই বাহু মেলিয়া উদার,
চাহিল শরণ শেষে—নিমেষে আসিলা আমি হরি।

তেমনি আজ ভারতের ঘরে ঘরে বিপন্না দ্রৌপদী দুই বাহু মেলিয়া লজ্জানিবারণ ভগবানকে ডাকিতেছে—

......ব্যর্থ করি দুঃশাসন পাহু—এস তুমি
আজ—এ দুর্দ্দিনে, এস নারায়ণ!

"কর্ম্মের" মধ্যে কর্ম্মের জয়গান—"Life is action, march onward to that untravelled land'. 'অকর্ম্মের মধ্যে Epicurean theoryর 'Present is ours, future is uncertain, let us enjoy today, the to-morrow may or may not come' মনে পড়ে।

শেষের সাতটি গান সাতটি মাণিকের মত জল জল করছে—ইচ্ছা হয় সবগুলিই উদ্ধৃত করি।

"প্রলয়ের মেঘ যে বাজে
পোড়া এই বুকের মাঝে,"

"অম্বরে আজ অম্বরন্তে দীপক রাগিণী
পাথার জলে তুলছে ফণা অযুত নাগিনী"

"দেহটা টান্‌ছে ঘানি, মনটা মুক্তি খোঁজে,
প্রাণটা মায়ের ব্যথায় কাঁদিয়া চক্ষু বোঁজে ;
কারা ওই শিকল পায়ে,
পউবের প্রবল বায়ে
রয়েছে আদুল গায়ে—আমারি ভাই ওরা যে।"

"হাহাকার! এইখানে আজ বাঁধরে বাসা,
সাহারায় আগুন ছড়া সর্ব্বনাশা"

ইত্যাদি। যতীন্দ্র মোহনের কবি-প্রতিভার পরিচয় এখনও আমরা সাময়িকপত্রে পাইতেছি। দারিদ্র্যদুঃখ ভয় ... সাদের মধ্যে "জাগরণীর" বাণী কি আমাদের কর্ম্মের পথে, সত্যের পথে আহ্বান করিবে না?

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

অর্চ্চনা। শ্রাবণ—

ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা প্রবন্ধটি আমরা মনোযোগের সহিত পড়ে যাচ্ছি—প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হচ্ছে—অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই এ প্রবন্ধটি পড়া উচিত।

অনুরোধ।—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কবিতাটির অঙ্গ বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কবিতাটি পড়ে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় আশুবাবুর রচনাভঙ্গির ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। তবে কবি বলেছেন—"আজ দাঁড়িয়েছি শেষ যৌবনের তীরে"। কবির এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ। রচনাভঙ্গির যতটুকু উন্নতি যৌবনের প্রারম্ভেই হওয়া উচিত ছিল তাই যদি এই পরিণত বয়সেই হয়, তা'হলে কবির নিকট বিশেষ কিছু আশা করা যায় না।

বেদনার সম্বল।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। লেখক একটিমাত্র শিশুপুত্রের উপর নির্ভর করিয়া দীন দরিদ্রা জননীর আশার কথা বলেছেন। বিষয়টি বেশ সংকবিতার উপযোগী—কিন্তু লেখক ইহাকে রস-মধুর ক'রে বলতে পারেন নাই। কবির কল্পনা বড়ই ভীরু—অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস বা সামর্থ্য তাঁর নাই।

স্মৃতির মর্ম্ম।—শ্রীমতী প্রতিভা বালা বিশ্বাস। 'স্মৃতির মর্ম্ম' শুধু মর্ম্মই রয়েছে—মর্ম্মের মধ্যে কাই আছে সেই বড় কি চিনি।

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীর "পরিচয়" পেয়ে সুখী হলাম। কাব্যে তাঁর বীণার ঝঙ্কার কবে শুনব?

সার্থক যৌবন।—শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়। রচনা আশাপ্রদ—২।১ পংক্তিতে বেশ নিপুণ হস্তের তুলিকাস্পর্শ আছে।

অর্চ্চনা। ভাদ্র—

প্রণাম করি। মল্লিক কবি। কবিতাটী মন্দ হয় নাই—কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"খেলার এ শিব প্রেমের বলে হর যেন হয় রামেশ্বরই" বেশ কথা।

এসো।—শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়—রচনায় সারল্য আছে।

সফল সন্ধ্যা।—শ্রীতাপস রঞ্জন রায়। লেখক কিশোর হ'লে উৎসাহ পেতে পারেন। —বাদল+বাজল+রইল এসকল মিল নয় পংক্তির শেষের 'রে' এর পুনরাবৃত্তিও মিলের কাজ করেনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের "খেদ"এ আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। 'খেদ'টা একটু বিনিয়ে বিনিয়ে করলেও না হয় দুমিনিট শোনা যেত। লেখক লিখেছেন "শিখ্‌তুম না ছাই লেখা পড়া থাকতুম ওগো নিরেট মূর্খ" জানি না—লেখককে কে স্তোকবাক্যে মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছে। লেখক রীতিমত লেখা পড়া শিখেছেন ব'লে বিশ্বাস করেন এবং লেখাপড়ার অহমিকাও ছাড়তে পারেন নাই

—তাই নামের সঙ্গে তাঁর "বিদ্যারত্ন" কথাটা যোগ কর্‌তে তাঁর ভুল হয় না।

কবি বল্‌ছেন—

"শিখেছি ছাই লেখাপড়া গো
ভিটে মাটী বন্ধক দিয়ে
নিজের পেটের ভাত জুটে না
সংসার চালাই কি আর নিয়ে ?"

বড়ই দুঃখের বিষয়,—কিন্তু ইহা লেখাপড়ার দোষে—না—পৌরুষ উদ্যম ও প্রযত্নের অভাবে ?

কবি শেষে "লেখাপড়ার মুণ্ডপাত" বলে প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করেছেন। পেট ভরে না বলে' কাব্যলক্ষ্মীর মুণ্ডপাত করলে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে, ঐরাবতের শুণ্ডাঘাতও বিনিময়ে লাভ হতে পারে।

মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ—

মানসবধূ !—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কাজী নজরুলের নিজস্ব শক্তি আছে সাহিত্য-সমাজে এখন তাঁর প্রতিষ্ঠাও যথেষ্ট হয়েছে—তিনি এখন যাই লিখুন না সাদরে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হবে। অতিরিক্ত হাততালি তাঁকে অতিরিক্ত সাহসীও করে' তুলেছে।

আলোচ্য কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ সারল্য নাই—তবে তারল্য আছে। কবিতাটি 'যেন দূরের সে কোন্ সবুজ ধোঁয়ায়' ভরা। সব যেন ভাসা-ভাসা-আবছায়া। ভাবটিকে ধরি-ধরি ধর্‌তে পারি নে—

"নিশীথ রাতের স্বপন হেন
পেয়েও তারে পাইনে যেন।"

ভাষার মোহে কবি মুহ্যমান—ভাষার মোহে তিনি ভাবকে বিসর্জ্জন ত দিয়াছেনই ভঙ্গিকেও মাজা ভাঙ্গা সাপের মতন কষ্টগতি করে' তুলেছেন।

আগাগোড়া চিত্রটি ধূসরায়িত—দেখে চিন্‌বার যো নেই—মানসবধূ, না—মানস-প্রেতিনী। কবির অলঙ্কারের প্রতি লোভ আছে—কিন্তু অলঙ্কারগুলিকে জড়োয়া বলে' মনে হলেও ষোলআনা ঝুঁটো।

ছাঁচি পানের কচি পাতার মত ঠোঁট, নাচ ভোলা নাকের নোলক, সন্ধ্যের মুখমোছা চুল, পথিক পাখীর পারা ভূল ছল্ ছল্ উড়ু উড়ু চঞ্চল আঁখির তারা, দীঘলশ্বাসের বাউলবাজা নাসার বাঁশী, টোল খাওয়া গালের কুয়ায় ডোবা ব্যথার গাগরী, বোঁ‍টা ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি, ক্ষীরের ভিতর হিরের ছুরির মত বোল ভোলা কাকন চুড়ি এসব হঠাৎ শুন্‌লে মনে হয় অপূর্ব্ব ও মৌলিক কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে সবাই বুঝ্‌তে পারবেন সব ফাঁকি সব ভুয়ো সব ঝুটো সব ঠুঁটো। কবির উদ্দেশ্যই নয় তাহাকে প্রকাশ করা—সর্ব্বত্রই ভাবকে গোপন করার দিকেই ঝোঁক। আধমগ্ন—আধমগ্ন' মাধুর্য্য আমরা চির দিনই ভাল বাসি, কিন্তু এযে আগাগোড়ায় বোরখা পরা।

কবির মিলে তিল মাত্র খুঁত নাই কিন্তু অনুপ্রাস গুলি রীতিমত অনুপ্রয়াস। কবি অজস্র বিশেষণ ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা অর্থকে বিশেষিত করবার জন্য নয়, শুধু বিশেষ্যের সঙ্গে তার আনুপ্রাসিক মিল হবে বলে'—কাজেই বিশেষণ গুলো স্বেচ্ছাচারী। বাংলার অনেক সমাস তৈরী করে লাগিয়েছেন, তাও অনুপ্রাসের খাতিরে—শব্দগুলির 'সমস্ত' হবার সামর্থ্য আছে কি না তা ভেবেও দেখেন নাই। কবির মনে রাখা উচিত ভাব প্রকাশের জন্য এবং ভাবের ইঙ্গিতের জন্য শব্দ—শব্দের নিজস্ব ঝঙ্কারই শুধু তাহাকে জীবন্ত করে না। কবির যে লক্ষণা ব্যঞ্জনার জ্ঞান নেই তা নয় তবে কেন যে তিনি ন্যাকামি ও ছলনা করেন তিনিই জানেন।

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হতে নিজেকে স্বতন্ত্র করবার জন্য শব্দের জাল বুনছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য কতকটা বিসর্জ্জন বরং ভাল কিন্তু স্বতন্ত্র হবার জন্য সঙ সাজা ঠিক নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ হতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেন তাঁর তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও পৌরুষ দ্রোহিতায়—কিন্তু প্রেমের সংসারে এখনো তাঁকে প্রেমের প্রজাপতি ঐ মহাকবির—ইঙ্গিত অনুসরণ করতেই হবে।

"পথিক পাখীর পারা'—"মলিন চাওয়া ছাওয়া যেন সবুজ ধোঁয়ায়"—'বিধুর অধর সীধু' "দীঘল শ্বাসের বাউল বাজা"—"বোদ পাকা অথচ আধভাঁশা ডালিম"—"আধ কোঁটা বৌ মউল বউল"—"বোলতা ব্যাকুল বকুল কুড়ি" "কাঁদন মাখা বাহুর বাঁধন" "নিচোল বুকের আঁচল কাঁচল'' "বুকপোরা আর মুখভরা ব্যথার মধু" এইরূপ সব mannerism এক সঙ্গে সহ্য করা বড়ই কঠিন। এক আধটা থাক্‌লে চলে' যেত। কিন্তু এ যেন চেষ্টা করে' আসন গেড়ে বসে' উৎকটতার তালিকা নিয়ে লেখা।

যাদের অলঙ্কার, ভাষার ও বাগর্থসম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই তাদের কাছে এই প্রকার mannerism conciet নিয়ে এবং এলো মেলো ধানাই পানাই ছন্দোঝঙ্কারে প্রকাশ করে হাততালি নেওয়া সোজা। কিন্তু যাদের সাহিত্যের রসায়নে একটুও জ্ঞান আছে তারা এই অসারতা ও কোমলতা পাঠমাত্র ধরে' ফেলবে। কবিতার একটী Stanza তুলে দিচ্ছি—পাঠক কতটুকু রসের আস্বাদ পান বিচার করে দেখবেন—

বুকের কাঁপন হুতাশভরা,
বাহুর বাঁধন কাঁদন মাখা
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল
স্বপনপারের পরীর পাখা
খেয়া পারের ভেসে আসা
গীতির মতন পায়ের ভাষা
চরণ চুমায় শিউরে পুলক
হিম ভেজা দুধ ঘাসের বোঁয়ায়

কবির শক্তি অপরিমিত এবং ভবিষ্যত উজ্জ্বল এই ভরসাতেই এত কথা বল্‌লাম এ কবিতায় প্রশংসা করলাম না—বরং নিন্দাই করলাম—কিন্তু উপেক্ষা করতে পারলাম না—কবির অনেক কবিতাই আমাদের ভালো লেগেছে—বহু পংক্তি আমাদের মুখস্থও হয়ে গেছে—কিন্তু ট্রামভরা ট্রেন ভরা পার্কভরা লোক এক বাক্যে প্রশংসা করলেও তাঁর "বিদ্রোহীর" মত কবিতার প্রশংসা করতে পারব না। সাহিত্য জগতের প্রজাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিয়াছেন ও দিতেছেন—আমাদের উৎসাহে তার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—কিন্তু আমাদের সমালোচনায় কবি উপকৃত হবেন বলে' আমাদের বিশ্বাস আছে। হাততালির চট্‌পটানির শব্দে হয়ত আমাদের নিবেদন কোথা ডুবে যাবে কিন্তু সাহিত্যগত বিবেক বুদ্ধি আমাদিগকে মুখর করে' রাখবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ৺সত্যেন্দ্রনাথের মত কাজী নজরুল খাঁটী বাংলা ভাষাকে খুব জোরালো করে' তুলছেন—বাংলা ভাষাকে ইহারা যেরূপ বাড়িয়েছেন তাতে এঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়। শ্রীমান কাজীনজরুল পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ পারস্য দেশে কিছু কাল বাস করে' এসেছেন এবং রাঢ়ের পল্লী তার জন্ম ভূমি সেজন্য ভাষার সমৃদ্ধি তাঁর প্রচুর। বর্ত্তমান বাংলা হিন্দু ও মুসলমানের—একা

হিন্দুর নয়—বাংলা সাহিত্যও আর শুধু হিন্দুর একচেটিয়া নয় বাংলা ভাষা এই উভয় ভ্রাতৃ জাতিবহ। নগরের ভাষায় অধিকাংশ শব্দ ইংরাজী হয়ে দাঁড়িয়েছে—পল্লীর ভাষাই খাটী বাংলা। এ সকল কথা ভেবে দেখতে গেলে কাজীনজরুলের নিকট বাংলা ভাষা শব্দশক্তি হিসাবে যথেষ্ট প্রত্যাশা করে। যে সকল বাংলা শব্দ (দেশজ ও পারস্যজ) পূর্ব্বে সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো না এবং যে সকল শব্দের ব্যবহার না থাকায় সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম সুকুমার ও সরল ভাব ও অনুভূতির সম্যক প্রকাশ হ'ত না আজ কাজীনজরুলের ন্যায় সাহিত্যিকের কল্যাণে তাহা সাহিত্যে আসরে স্থান পেয়ে বাগ্মী হয়ে উঠেছে। এ জন্য আমরা গদ্য সাহিত্যে বীরবলের নিকট এবং কাব্য সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট পূর্ব্ব হতেই ঋণী আছি। বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ আজ নূতন অতিথি তাদের সহিত আমাদের তেমন পরিচয় ঘটে নাই বলে' একটু বাধ'—বাধ' ঠেক্‌ছে—ক্রমে পরিচয় ঘনীভূত হলে আদরের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌বে।

তীব্র সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রনাথ বরাবর প্রস্তুত ছিলেন। —প্রমথবাবু আজো প্রস্তুত আছেন। অনেক তীব্র সমালোচনায় উঁহারা অটল ছিলেন বলে' আজ বাংলার অধিকাংশ লোক শব্দসৃষ্টিতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁদের অনুকরণ করছেন। শ্রীমান কাজী নজরুলকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে পূর্ব্বোক্ত দুইজন সাহিত্য-রথীর সহিত শ্রীমানের একটু প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ বয়ঃক্রমে অভিজ্ঞতায় ও পাণ্ডিত্যে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ও ৺সত্যেন্দ্রনাথকে যদি সাহিত্যে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত বলি তা' হলে বোধহয় শ্রীমানের কোনো আপত্তি হবে না। উক্ত দুই মহামনীষীর মধ্যে একজন সাহিত্য দর্শন ইতিহাসে—অন্য জন সাহিত্য অলঙ্কার শাস্ত্র ছন্দ শাস্ত্র দিক্‌পাল স্বরূপ বলে' বাগ বিন্যাসে, শব্দ প্রয়োগে ও রচনা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে এত কুশলী এবং রচনা ভঙ্গিতে এত ধীর, সাবধান সংযত ও সুবিবেচক। একজনের Logical Sequence এ অন্য জনের Emotional Sequence এ ঠিক রবীন্দ্র নাথের পরেই আসন। আমরা ভরসা করি বয়োবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও জ্ঞানসাধনার ফলে একদিন শ্রীমানেরও ধীরতা, সংযম, বিবেচনা ও কৌশল আস্‌বে।

মারাঠা বীর—শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

এ সংখ্যায় এই কবিতাটি সুন্দর ও সুরচিত। লেখক নবীন, লেখককে আমরা কবি সমাজে সাদরে বরণ করি। 'কথা ও কাহিনী'র কবির দেশে সরল Ballad কবিতায় এতই দৈন্য উপস্থিত হয়েছে যে এরূপ ১টা কবিতা পেলে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠি। নবীন কবি অন্য শ্রেণীর কবিতা কেমন লেখেন জানি না তবে এ শ্রেণীতে তিনি যে সফলকাম হবেন তা' সাহস করে বলা যায়। প্রবাসী, ভারতীর বালক কবিদের ন্যাকা ন্যাকা ঢঙ যদি কবিকে পেয়ে না বসে—আর পক্ষান্তরে হাত তালির চোটে যদি তার কানে তালা না ধরে তবে রবীন্দ্র শিষ্যগণের মধ্যে কবি স্থান পাবেন বলে' মনে হয়।

সম্পদ—বিশেষত্ব নাই কিন্তু পারিপাট্য আছে।

ব্যাকরণ (হায়েন) বাবু + তাঁহার দুর্বল মিলটি বাদ দিলে অনুবাদ সুখপাঠ্য।

ইলিশ। শ্রীঅমৃত লাল বসু।

৺ঈশ্বর গুপ্তের "খয়রা তোপসে পেটে

মনোময় বালা" পড়েছিলাম বহুদিন আগে —আজ আবার ঈশ্বরী চঙের ইলিশ পড়লাম অমৃতবাবুর। বেশ রসময় রচনা। দেশের লোকের রুচি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়েছে—সাহিত্য ক্রমে aristocratic হয়ে উঠ্ছে—কাব্যে abstraction এরই এখন প্রাদুর্ভাব। এরূপ concrete ইলিশমাছ যার সঙ্গে স্থূল দপোদরের সম্পর্ক—তা নিয়ে যে আবার কবিতা লেখা যায় তা অনেকে হয়ত স্বীকারই করবেন না। নব নব পদ্ধতি ও ভঙ্গির প্রবর্ত্তনে দিন দিন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে বড়ই আনন্দের কথা—কিন্তু কোনো প্রাচীন ভঙ্গি বা পদ্ধতি একেবারে লোপ পায় তাহার আদৌ আমরা পক্ষপাতী নই। সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখ্তে পাই—সাহিত্যের রুচি পদ্ধতি অনেক সময় ঘুরে প্রাচীনকেই অবলম্বন করে তাকে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করে নেয়।

অমৃতবাবুর 'আম' 'কাঁঠাল' ও 'ইলিশ' প্রাচীন ঢঙে লিখিত—তবু ইহাতে সরলতা ও হাস্যতার অভাব নাই—বর্ত্তমান যুগোপযোগী সংযম ও কারুকৌশলও এগুলিতে যথেষ্ট আছে।

কবি ইলিশের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ৩০।৪০ বৎসর আগেকার বাঙালী স্ত্রীলোকের শারীরিক পরিশ্রম ও অটুট স্বাস্থ্যের কথা যা লিখেছেন তা পড়ে আজ কালকার নভেল পড়া চশমাচোখে নিষ্কর্ম্মা বিলাসিনী পুটের বিবিদের স্বাস্থ্যের কথা ভাব্‌লে সত্যই দুঃখ হয়। বাবুদের বিশ্বাস পরিশ্রম করলে লাবণ্য নষ্ট হয়—কিন্তু স্বাস্থ্যই যে লাবণ্যের প্রধান উপাদান একথা বাবুদের ও বিবিদের কে বোঝাবে? শুন্‌তে পাই আজ কাল আমরা নারী জাতীকে মর্য্যাদা করতে শিখেছি—নারীর জীবনের মূল্য বুঝেছি—নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি মনে করি না। কিন্তু বুঝিনা নারীর স্বাস্থ্য চেয়ে যদি তার লাবণ্যকে (?) তার জীবন চেয়ে তার বিলাস চাতুর্য্যকে আর তার বলিষ্ঠতা অপেক্ষা তার জড়তাকে বেশী প্রশ্রয় দি তা' হলে তার প্রতি কর্ত্তব্য অধিক প্রতিপালন করি কিনা।

অমর প্রয়াণ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। বোধহয় ৺সত্যেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে। দুটী পংক্তি বড় সুন্দর হয়েছে—

"বিশ্ববীণাযন্ত্রতন্ত্রে ঝঙ্কৃত প্লাবন"

ও

"নৃত্যশ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত আষাঢ়ান্ত বেলা।"

ভাঙ্গানো বাগান। শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক।

ভাবটি সুন্দর—রচনাও মন্দ নয়—এই সকল কবিতায় কবি কুমুদ রঞ্জনের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

"কাল বুলাল রঙের তুলি ধরল যখন পাক
গাছে গাছে শোভার থাকে নিমন্ত্রণের ডাক"
শাখায় শাখায় রঙের মেলা
ছায়ায় ছায়ায় ছেলের খেলা
ভুলচুকনা পথ ভ্রমর এবং প্রজাপতির ঝাঁক।"

আমপাকার বর্ণনাটী বেশ। এই প্রকার কবিদৃষ্টি কুমুদরঞ্জনের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

কল্পলক্ষ্মী। শ্রীকালিদাস রায়।

চিত্র, কাব্য, সঙ্গীত, বয়নবিদ্যা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এই ছয়টি চারুকলার সমবায়ে কবির কল্পলক্ষ্মীর সৃষ্টি।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পংক্তি দুটি একটু গদ্যাত্মক হয়েছে।

কবিতাটী অষ্টপদী নাহয়ে অন্ততঃ চতুর্দ্দশপদী হলে ভাল হতো।

সত্যপ্রয়ান গীতি। কাজী নজরুল

হসেলাম। চলনসই রচনা। "চল-চঞ্চল"—চল ও চঞ্চল দুটো একার্থ বোধক। ঝাঁপে ঝঙ্কার চলে—বেণুতে ঝঙ্কার সৃষ্ট নয়।

ঝাঁখিব সলিলে ঝলসানো ঝাঁখি"

'সলিলে ঝলসানো' ভাল লাগিল না।

"আহত এ পাখী মৃত্যু আফিম ফুলে" তথৈবচ।

"শাস্তি মাগিল ব্যথাবিদ্রোহী চিতার অগ্নি শূলে' 'শূলে' এখানে কেবল মিলাবার জন্য। শূলে কেহ শাস্তি মাগে না।

বসুমতী পত্রিকা ভারতবর্ষের মতই ব্যবসা করতে বসেছেন—লোকরঞ্জনই এ ব্যবসার মূলমন্ত্র। কবিতা লোকে চায় না—অবশ্য কতকটা বোঝেনা বলে, কতকটা সাহিত্যানুশীলন ও রসবোধের অভাবে। সেজন্য কবিতার ঠাঁই প্রবন্ধের পাদপীঠে—স্থলপূরণে তু, বৈ, চহির মত। তাও এবার গল্প প্রবন্ধের নীচের জায়গা আর একটা লোকপ্রিয় সামগ্রী, (Cartoon) অনেকটা অধিকার করে' বসেছে। বসুমতীর কবিতাগুলি মন্দ নয়—কিন্তু তাদের কোনো মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষে কবিতার কতকটা মর্য্যাদা বেড়েছে—কিন্তু ভাল কবিতার বড়ই অভাব।

ক্রটি স্বীকার ঃ—

যে সব লেখা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল—অনিবার্য্য কারণে সেগুলি সময়মত আমাদের হস্তগত না হওয়ায় পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হইল। পৌষ সংখ্যা পৌষের মধ্যেই বাহির হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—উপাসনা।
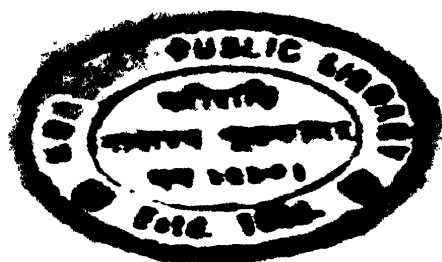
উপাসনার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক উদভ্রান্ত প্রেম প্রণেতা
স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
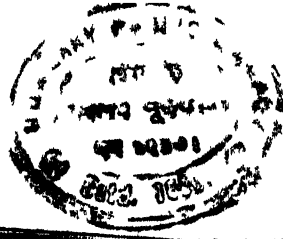
"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ | পৌষ ১৩২৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম্মে যুগ-সমস্যা *

[শ্রীশরদিন্দু নাথ রায]

"ধর্ম্ম" শব্দের অর্থ "যাহা ধারণ করে।" সুতরাং যাহা সমাজ বিশেষকে ধারণ করে, স্খলিত হইতে দেয না, অর্থাৎ তাহাকে স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত রাখে, তাহাই সে সমাজ বিশেষের ধর্ম্ম। এই প্রতিষ্ঠায় বুঝায় নানা অবস্থা ভেদের মধ্যেও তাহার বিশিষ্টতার রক্ষা, সুতরাং ইহা এক প্রকার স্থিতি—ইহাই তাহার সনাতনত্ব। তবুও "হিন্দুধর্ম্ম সনাতন" বলিলে যুগে যুগে তাহার অবস্থা ভেদ ও প্রকার ভেদ অস্বীকার করা হয় না। ইহাই তাহার ক্রমবিবর্ত্তন—ইহাই তাহার গতি। সুতরাং স্থিতি এবং গতি, দুই পরস্পর বিরোধী ভাবের সমন্বয় ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমন্বয় অসম্ভাব্যও নহে, অদ্ভুতও নহে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলেও এই সমন্বয় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এক হইতেই "বহুর" উৎপত্তি, কাজে কাজেই 'বহু'র নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও "একই" স্বপ্রকাশ।

সংক্ষেপে ইহা সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতরেও ক্ষুদ্র উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। আম্রের কোন একটি মুকুল বিশেষ তাহার প্রথম অবস্থা হইতে সুপরিপুষ্ট ও সুপক্ক অবস্থায় পরিণত হইবার জন্য নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। তবুও সেই সমস্ত কাল ধরিয়া সে আম্র বই অন্য কিছু নহে—ইহাই তাহার আম্রত্বে অথবা আম্রত্বরূপ বিশিষ্টতায় স্থিতি। আবার তাহার আকার ও অবস্থা বৈচিত্র্যই তাহার অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গতি, সন্দেহ নাই। ভ্রূণ অবস্থা হইতে পলিত গলিত বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহের ক্রমবিকাশের মধ্যেও ইহাই দেখিতে

* কাশিমবাজার হিন্দুসম্মিলনীর চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ভাদ্র ১৩২৯।

পাওয়া যায়। এই নিখিল জগৎ এক হিসাবে স্থির, কোনও কালে কোনও অবস্থা বিশেষে 'জগৎ' ব্যতীত সে অন্য কিছু নহে, অন্য হিসাবে গতিশীল—গচ্ছতীতি জগৎ। কি অন্তঃ প্রকৃতি, কি বহিঃ প্রকৃতি, কি জড়, কি চেতন—জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই এই রূপ। গতিসম্পর্কশূন্য ঐকান্তিক স্থিতি কল্পনাতীত। যদি তাহার কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা ধ্বংশ—আমূল বিলোপ। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জাগ্রত, জীবন্ত—সুতরাং গতিশীল। বিশ্বের ক্রমবিবর্তন নীতির বহির্ভূত ইহা কথনই নহে—হইতেও পারে না। কোন না কোন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইহা চিরদিনই চলিয়াছে।

কিন্তু এই আদর্শ কি স্থির, এই গন্তব্যস্থান কি নির্দ্দিষ্ট? না তাহা নহে। গন্তব্যস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে একদিন তাহার যাত্রা ফুরাইত—সকল চেষ্টার শেষ হইত, সুতরাং তাহারও শেষ হইত। কিন্তু চিরগতিশীল জগতের ন্যায় ইহার সকল ব্যাপারই চিরদিন গতিশীল আছে ও থাকিবে। অনন্তের স্বরূপ এই জগতের অন্ত কোনও দিনই মিলিবে না। অনন্ত বিশ্বরূপের যে অনন্ত বিকাশ তাহার কোন দিন শেষ নাই। তাই বলিতেছি সময় ও অবস্থার ভেদে, আদর্শের ও গন্তব্যস্থানের ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রতি যুগের চিন্তার ধারা সেই যুগের আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে। জগৎ সেই পথে অগ্রসর হয়; আবার, জগৎ যেমন অগ্রসর হইতে থাকে, আদর্শ তেমনি অগ্রসর হইতে থাকে। এই আদর্শ যখন ভাবময়, তখন আদর্শের এই ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, ভাবেরই ক্রমিক বিকাশ সূচনা করে। জগৎ আজ যাহা চায় কাল ঠিক তাহা চায় না।

হিন্দুধর্ম্ম 'সনাতন' হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কালে, তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এই ভিন্ন ভিন্ন 'চাওয়া'কে—এই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের প্রতি আগ্রহকে কোনও দিনই সে অস্বীকার করে নাই—আজিও সে পারিবে না। ধর্ম্মজগতে যুগ পরিবর্ত্তনের ইহাই মূল। বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্যের যুগ—এগুলি চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্তের ন্যায় বাহ্য প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তনের দ্বারা চিহ্নিত নহে। কাল বিশেষে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার যে বিশেষরূপ সমাজের প্রাণকে আকুল এবং চালিত করে সেই রূপ-বিশেষ বা বৈচিত্র্য বিশেষ যুগ বিশেষের প্রবর্ত্তক। যুগের পরিবর্ত্তনের ফলে আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন—ইহা তত সত্য নহে, যত সত্য নূতন আকাঙ্ক্ষার ফলে নব যুগের আবির্ভাব। সুতরাং কালধর্ম্মের জন্য কেবল কালকে দায়ী করা ভ্রান্তিমূলক, আর, তাহা করিলেও কাল ভীত ও পশ্চাৎপদ হইবার নহে, সে আপন বৈচিত্র্য লইয়া আসিবেই আসিবে।

এখন দেখা যাউক বর্ত্তমানকালে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মে ও সমাজে কোনও বিশেষ বৈচিত্র্য আসিয়াছে কিনা। এই বৈচিত্র্যের মাত্রাধিক্যকেই সাধারণতঃ "বিপ্লব" কহে। বিপ্লবে ধ্বংসের সূচনা বুঝায়; সুতরাং আমি তাহা বলিব না। যাহা ধ্বংস পাইবার নহে—সেই হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রকার পরিবর্ত্তনকে আমি বিকাশ বা বিবর্ত্তনের একটি নূতন 'ক্রম' অথবা নূতন বৈচিত্র্য মাত্র বলিব। বর্ত্তমান যুগের সম্পর্কে সেই বৈচিত্র্যের আলোচনা করিতে হইলে মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাসের আরম্ভ হইতেই লক্ষ্য করিতে হয়

আদি ও অসভ্য মানবের ধর্ম্ম ভীতিমূলক। আদি মানব দেখিল তাহার নিজ শক্তির বাহিরে একটা বিরাট শক্তি আছে, যাহা তাহাকে পদে পদে ব্যাহত ও অভিভূত করে। তাহাকে সে ভয়ের চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহার সে উচ্ছৃঙ্খল, অমিত বল ঈশ্বরকে তুষ্ট রাখিবার জন্য সে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইয়া বলি প্রভৃতি আহরণ করিতে লাগিল—এবং সর্ব্বদা ভীত হইয়া রহিল, পাছে কোন ক্রটিতে কোন্ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। তাহার ঈশ্বর সর্ব্বদা বলি গ্রহণ করিতে এবং তদভাবে নির্ম্মমভাবে দণ্ড দিতেই ব্যস্ত। ভূত পূজা অর্থাৎ fetishism ইহারই একটা দৃষ্টান্ত।

মানবের কতকগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি সভ্যতার চরম অবস্থাতেও লোপ পায় না। তাই বর্ত্তমান কালেও সুসভ্য ও উন্নত হিন্দু সমাজেও এই ভীতিমূলক ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই—শীতলা দেবী পূজা—এবং ব্যাধির আক্রমণকে 'মা'র অনুগ্রহ বলিয়া অভিহিত করাতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। মানবের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই ভীতি হইতে, কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া, প্রেমের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। খৃষ্টের ধর্ম্মই হউক আর চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মই হউক—মূলে এই প্রেম বিদ্যমান্। এই প্রেমমূলক ধর্ম্ম বলিল, "ঈশ্বর—প্রেমময়। তিনি ভীতির পাত্রও নহেন, শুষ্ক কর্ত্তব্যের জন্য কঠোর আত্ম-বলিদানের মন্ত্রদাতাও নহেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসেন ও প্রাণভরা ভালবাসা তাঁহাকে দিলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়" ইহাতেই প্রেমমূলক ধর্ম্মের সূচনা—এবং মুখ্যভাবে ভগবৎ প্রেম ও গৌণভাবে বিশ্ব প্রেমের সৃষ্টির কারণ; যথার্থ ভগবৎ প্রেম বিশ্বপ্রেমকে টানিয়া আনিবেই আনিবে।

কিন্তু ভগবৎ প্রেমকে মুখ্য করিয়া যাহারা জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই ভগবৎ প্রেমকে যথার্থ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাই তাহাদের ভগবৎ প্রেমের ভ্রান্ত সাধনোপায়ের সহিত বিশ্বপ্রেমের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহার ফলে ভগবৎ প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং পরিশেষে দাঁড়াইল এই যে, বিশ্বের সেবাই বিশ্বরূপের সেবা—জীব নারায়ণের পূজাই নারায়ণের পূজা—ইহার ফলে প্রেমিক ভক্ত নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইল। ভগবৎ পূজার উপকরণ স্বরূপে নামাবলি, পঞ্চপাত্র প্রভৃতির আবশ্যকতা বোধ ক্রমশঃই কমিতে লাগিল। বিগ্রহ মন্দিরের পরিবর্ত্তে আতুরাশ্রম, মাতৃমন্দির প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহাই এই বর্ত্তমান যুগের হিন্দুধর্ম্মভাবের নূতন বৈচিত্র্য।

কিন্তু এই বিশ্বপ্রেম, জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ পরোপকার প্রভৃতি লক্ষণগুলি এমনই বিশ্ব-জনীন, যে এই নূতন বৈচিত্র্যে বিশেষ ভাবে হিন্দুধর্ম্মের কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। ঐরূপ বৈশিষ্ট্য শূন্য হওয়ায় ইহা হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা বরং বিশ্বমানবের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবারই যোগ্য। 'রামকৃষ্ণ আশ্রম', 'সেবক সঙ্ঘ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আদর্শেই গঠিত।

বিশ্বপ্রেমের সাধক ও প্রবর্ত্তক বুদ্ধ, চৈতন্য দূরে থাক্, অদূর অতীতের পরমহংস-দেব হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া, মহাত্মা গান্ধীতেও এই বিশ্বপ্রেম সাধন পন্থার প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত সাধন পন্থায় হিন্দু ধর্ম্মের যতটুকু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, ক্রমেই তাহা নিরুপাধি বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

এই বিশ্বপ্রেমের বন্যা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল ক্রমশঃই শিথিল করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে।

সুতরাং একদিকে ইহা যেমন এক গুরু অমঙ্গলের নিবারণ করিয়াছে তেমনি অন্যদিকে অন্য এক ঘোর অশুভের সূচনা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। যে হিন্দুধর্ম্মের মূল ত্যাগ ও বিশ্বপ্রীতি, যে ধর্ম্ম যাগ যজ্ঞে, দেব দেবীর পূজায়, আচার অনুষ্ঠানে সমাজের নিম্নতম স্তরকেও, কোনও দিন ভুলে নাই; তাহারই প্রীতিমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—যাহা চুক্তিমূলে কথনই হইতে পারিত না—যাহা সমগ্র সমাজের কল্যাণের উপর স্থাপিত—সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যখন "ছুঁৎমার্গ" ও পরস্পর বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হইল, যখন সম্প্রদায়সমূহের বিভিন্নতার মধ্যে যে ঐক্যের ও প্রীতির বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল, তখন দেশের সে দুর্দ্দিনে একীকরণের পুনঃ চেষ্টা এক ঘোর অমঙ্গল নিবারণ করিয়াছে—সন্দেহ নাই। কিন্তু তেমনি বর্ণ বিভাগের আবশ্যকতার সম্পূর্ণ অস্বীকারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্পূর্ণ উন্মূলন চেষ্টায়, হিন্দু জাতির ধর্ম্ম ও সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার উপর হিন্দুর উপাসনা পদ্ধতি, হিন্দুর আচার পদ্ধতি, বিশ্বহিত ব্রতের নামে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ আজ দেবদেবীতে আস্থাশূন্য, এমন কি প্রায় নিরীশ্বর। বর্ত্তমানে ঈশ্বর তাহার জনহিত, উপাস্য তাহার বিশ্ববাসী জীবমাত্র। কিন্তু, এই হিত সাধনের পথ কে প্রদর্শন করিবে, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কে হৃদয়ে বল দিবে, নৈরাশ্যের অন্ধকার, কে আশার আলোকে উদ্ভাসিত করিবে? এক মাত্র পরমেশ্বরে বিশ্বাস এই অসাধ্যসাধনে সমর্থ। এবং একমাত্র তাঁহারই আরাধনা সকল অধ্যাত্মবল ও প্রেরণার মূল। সেই আরাধনার হিন্দুজনোচিত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিলে তবে হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড বজায় থাকিবে। হিন্দুর সমাজ ও তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস ওতঃপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট—ইহা বিস্মৃত হইলে ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। এই সর্ব্বনাশ এই নিঃশেষ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, হিন্দুত্বের অনুকূল মনন ও চিন্তন, হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী ভগবৎ আরাধনা হিন্দুজনোচিত সামাজিক আচার পদ্ধতি, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিশ্বহিত ব্রত সাধন করিতে হইবে, জীবের কল্যাণ অনুষ্ঠান করিতে হইবে; নতুবা 'হিন্দু' 'হিন্দুত্ব'—প্রভৃতি শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, হিন্দুত্বের স্রোতস্বতী যদি বিশ্বমানবত্বের সাগরে আপনাকে ঢালিয়া নিঃশেষ করে, হিন্দু ধর্ম্ম যদি বিশ্বমানবের ধর্ম্মে মিলিয়া মিশিয়া হারাইয়া যায়, ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে। যে বিশ্বমানবত্বের ধূয়া উঠিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট কল্পনাতেও সম্ভব কি না জানি না। দেশ, কাল ও জাতির বৈশিষ্ট্যশূন্য ভাবে সামান্য এই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নর দেহটারই কল্পনা সম্ভব নহে—চক্ষুতে তো কথনই দেখি নাই। দেখিয়াছি বাঙ্গালী, নয় পশ্চিম দেশীয়; কাবুলী নয় ব্রহ্মদেশবাসী; শিখ, নয় গুর্খা, নয় ইংরাজ; চীন দেশীয় অথবা আফ্রিকার কাফ্রি প্রত্যেকেরই জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে, এমনকি, এই মনুষ্য দেহটারই আকার এবং প্রকারে—দেশ, কাল প্রভৃতির ফলে, যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়াও এই বৈশিষ্ট্য মূলতঃ বজায় আছে ও থাকিবে। জাতি-

গত বৈশিষ্ট্যশূন্য বিশ্বমানব কেহই যদি দেখিতে পাইলাম না, তবে বিশ্বমানব মন কোথায় পাইব ? দেশ কাল জাতি বিশেষ শুধু যে বর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, কেশ, দৈর্ঘ্য অস্থিসংস্থান, এমন কি মস্তিষ্কের অস্থি আবরণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন হইয়া যায়, এমন নহে ; মাংস, শ্রমশীলতা, রুচি, আচার, আহার বিহার, কল্পনা ও ভাব সমস্তই বিভিন্ন দেখা যায়—এবং তাহা স্বভাবজ, তাহাই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। জল যেমন আকার শূন্য হইলেও কখনও তাহা আকার শূন্য অবস্থায় দেখি নাই, যে পাত্রে বা আশয়ে তাহা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণ ও আকার সে ধারণ করিয়াছে : বিশ্বমানবত্বও তেমনি কোনও না কোনও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আকারেই ফুটিয়া উঠে। পুত্রের মৃত্যুতে জননীর ক্রন্দন তো দূরে থাক্, তাহার দুঃখ পর্য্যন্ত বোধ হয়, সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতিতে এবং সকল অবস্থায় ঠিক্ এক নহে। এমন কি, যে দেবতা যে জাতির উপাস্য, তাহাকেও সে নিজেই সৃষ্টি করে। তাহার সে চিন্তার ধারাও তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য। এরূপ ক্ষেত্রে নিতান্ত বিশ্বজনীন ভাবের অনুবর্ত্তন করিতে, তাহার সহিত কোনও না কোনও জাতিগত বৈশিষ্ট্য মিশিয়া যাইবেই। এখন যদি হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন হই, এবং তাহা যত্নতঃ পরিহার করি, তবে অন্য জাতির বা অন্য কতিপয় জাতির নিকট হইতে এই নীতি পদ্ধতির ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত। ফলে বঙ্গবাসী আজ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যেমন জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে না পারিয়া উচ্ছৃঙ্খল—তাহার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, আচার ও পদ্ধতি সম্বন্ধেও তেমনই হইবে। ইহার ফলে, হিন্দুর জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের লোপ—সুতরাং হিন্দুত্বের লোপ —তখন আর 'হিন্দু' নামেরই বা কি প্রয়োজন থাকিবে ?

কেহ বলিতে পারে :—

"নামে কি হইবে ? এই সমাজের অন্তর্গত জীবগুলি তো কোথাও যাইবে না, স্বাতন্ত্র্যের অথবা বৈশিষ্ট্যের লোপ হইলেও তাহারা থাকিবেই : সুতরাং তাহাদের সমাজও থাকিবে। ইহা সত্য নহে, কতকগুলি জীবের সমষ্টি মাত্রই সমাজ নহে—মনুষ্যের সমষ্টিও নহে—তাহা হইলে নানা দিগ্‌দেশ হইতে একত্রিত, নানা জাতি হইতে সংগৃহীত, আফ্রিকা প্রবাসী কুলীর দল অথবা রেডিংএ অবস্থিত, হান্ট্‌লি পামার্সের বিস্কুট কারখানার অসংখ্য শ্রম-জীবির সমষ্টি প্রকৃষ্ট সমাজ বলিয়া গণ্য হইত। তাহা যখন নহে, তখন হিন্দুর সকল স্বাতন্ত্র্য হারাইলে শুধু নাম নহে, সমাজও থাকিবে না।

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বপ্রীতিই যদি বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয় এবং উপাস্য হইয়া থাকে, তবে যে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের মূল চিরদিন বিশ্বপ্রীতি এবং যে ধর্ম্ম ও সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে এতকাল তাহার ভগবৎ আরাধনা ও সামাজিক আচার পদ্ধতির সহিত বিশ্বহিত ব্রত সাধন সম্ভবপর হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম ও সমাজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এখন আর তাহা হইতে পারিবে না কেন ? কতিপয় ভ্রান্ত জীব যদি ভগবৎ-ভক্তি বা আচার নিষ্ঠার দোহাই দিয়া তাহার সকল কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা দেখাইয়া থাকে তাহার জন্য দায়ী একমাত্র তাহারা নিজে—সমাজও নহে, ধর্ম্মও নহে।

ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, সমস্ত দেহটার ধ্বংশ

করিয়া ব্যাধিদূর করিতে যাওয়া সুচিকিৎসা নহে। সমাজদেহে যদি ব্যাধি প্রবেশ করিয়াই থাকে, এবং তাহাকে ব্যাধি নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য যদি তাহার সংস্কারই আবশ্যক হয়, তবে পরিবর্ত্তন ও সংরক্ষণ—উভয় পন্থাই এক সময়ে গ্রহণ করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তার ফল লক্ষ লক্ষ সেবক ও ভক্তের ভক্তি-অশ্রু সিঞ্চনে পরিপুষ্ট ত্রিকালজ্ঞ ঋষিকুল কর্ত্তৃক সেবিত এই হিন্দুধর্ম্ম যদি অবস্থা বিপর্য্যয়ে এবং অজ্ঞানতার মোহে কলঙ্কিতই হইয়া থাকে, তবে যেটুকু তাহর কলঙ্ক—অতি সাবধানে তাহারই মোচন করিতে হইবে। হিন্দুর সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির যে অংশ, অতীত যুগ-বিশেষেরই অনুকূল, বর্ত্তমান যুগের নহে—বরং ইহার প্রতিকূল বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে, আবশ্যক হইলে, সেইটুকুর পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়াও যাহা সে ধর্ম্মের ও সমাজের প্রাণ—তাহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংরক্ষণ চিরদিনই চলিয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে শ্রীচৈতন্যের, এমন কি, পরমহংসদেবের যুগ পর্য্যন্ত—সকল যুগ একই দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ক্ষীর, ননী, ছানার মত এক হইয়াও পৃথক। যেস্থানে ছানার আবশ্যক, সেই স্থানে ননীর দ্বারা সে অভাব দূর হইবার নহে। অবস্থা বিশেষে যাহা ভেষজ, অবস্থা ভেদে তাহাই বিষ। যে বর্ণ বিভাগের এককালে খুবই প্রয়োজন ছিল—সমাজেরই কল্যাণের জন্য,—অন্যকালে সেই সমাজের হিতের জন্যই তাহার সম্বন্ধে শৈথিল্য দেখিতে পাই। চৈতন্যের যুগে মুসলমান নেড়া হরিদাস পর্য্যন্ত হিন্দু হইয়া গেল, তথাপি তাহার আধ্যাত্মিক চিন্তন, মনন ও ধ্যান ধারণায় অথবা ভগবৎ আরাধনার প্রণালীতে তথা আহার বিহার আচার পদ্ধতিতে তিনি হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন "নেড়া হরিদাস"কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লইলেও, প্রথমতঃ তাহারা ত্যাগী সন্ন্যাসী তাহাদের আবার জাতি কি? দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য গৃহীদের বর্ণাশ্রমভেদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, সন্ন্যাসীদের জাতি নাই অর্থে বর্ণভেদ নাই; নতুবা তাহারা যে হিন্দু ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্য গৃহীদের কখনও বর্ণাশ্রম ভেদ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উপদেশ না দিলেও বর্ণভেদ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমান প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই আর তথাকথিত বর্ণাশ্রম ভেদ ভাঙ্গিবারও প্রয়োজন নাই—'তথাকথিত' এই জন্য বলিতেছি যে, গুণ-কর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত বর্ণবিভাগ অনেক দিনই ঘুচিয়া গিয়াছে। আর এক কথা, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য জীবের চিত্তের ব্যাধির চিকিৎসাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন—দেহের ব্যাধির জন্য ব্যস্ত হইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন হয় নাই। তিনি কিম্বা তাঁহার "ছয় গোস্বামী" আতুরাশ্রম বা সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন নাই বলিয়া তাঁহার জীবের প্রতি দয়া বা প্রীতি যে কিছু কম ছিল, এমন নহে। তবুও বর্ত্তমানকালে যদি সে সকলের প্রয়োজনই হয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ও অনুষ্ঠান সমূহে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে কি করিয়া প্রাচ্য সমাজের দয়া প্রীতি, ধ্যান ধারণা, পাশ্চাত্য জগতের কর্ম্মের সহিত মিলিত

হইয়াছে—কেমন করিয়া প্রাচ্য সমাজের আচার, নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াও সমগ্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত প্রীতি ও প্রাণের নিগূঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারা একেবারেই অসম্ভব নহে।

সুতরাং সহস্র বিশ্ব-হিত চেষ্টার মধ্যেও হিন্দু সন্তান হিন্দুজনোচিত ভাবে তাহার ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার সমূহ পালন করিবে—যাহার অধিকার আছে, সে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে; যাহার নাই, সে হিন্দুর আরাধনা ও ধ্যানের যে মূর্ত্তি তাহার স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুকূল, তাহার ধ্যান ও পূজা করিবে, তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইবে—ইহাতেই সে তাহার বিশ্ব-হিত ব্রত উৎযাপন করিবার জন্য প্রাণে নূতন উৎসাহ ও হৃদয়ে নূতন বল পাইবে, আর, তাহার সহিত পাইবে তাহার দেবতার আশীর্ব্বাদ, সর্ব্বকামনার সিদ্ধি।

চির-আদরিণী

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ওগো মোর আদরিণী!
তোমারে যে আদর করিনি—
সেকি মোর অবহেলা
অবজ্ঞায় দূরে পায়ে ঠেলা—?
দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ দিনমান
বিস্তারিয়া আপনার উন্মুখ পরাণ
আমার সম্মুখে,
সুখে দুখে
আমারে ঘেরিয়া তুমি আছ নিরন্তর!
তোমার অন্তর
নিঙাড়িয়া দিলে ঢালি' অমৃতের ধারা;
তুমি আত্মহারা
বিলাইলে দেহ মন, সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত খনি;
চিরোজ্জ্বল মণি,
আপন দীপ্তিতে তুমি হৃদয়ের অন্ধকার হরি'
আছ মোর তনু মন ভরি'!

তবু যে পারিনি কেন করিতে আদর
প্রতিদানে সমাদর
দিইনি যে সহস্র সম্ভারে,
বসাইয়া দ্বারে
কখন চলিয়া গেছি সংসারের কাজে
সেই ব্যথা আজ বুকে বাজে !

জানি তুমি আমা লাগি হায়,
কুসুমিত বাসর সজ্জায়,
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
বিস্ফারিত আঁখিপাতে
সাজাইয়া বেদনার রক্ত আঁখিজল
একান্ত বিহ্বল,
আমারে পাওনি কাছে লো মোর সজনি !
কত ব্যর্থ বিনিদ্র রজনী
যাপিযাছ নিরালায় ; বাহিরের এতটুকু ধ্বনি
কম্প্রবক্ষে উঠি' রণরণি
তখনি শুনালে
আমার পায়েব তালে
তোমারে যে রুদ্ধশ্বাসে করিয়া উৎসুক,
এই বড় দুখ
তখনি ভাঙ্গিয়া গেছে প্রতীক্ষার কল্পনার ভুল !
তোমার মালার ফুল
প্রভাতের আলো ও বাতাসে
ঝরে গেছে নিতান্ত নিরাশে !—
সে কি শুধু তোমারি বেদনা ?
আমার কি নহে আরাধনা
দেবতার পায়
আমার বুকের মাঝে নিত্যকাল রাখিব তোমায় ?

ওগো মোর প্রেমভিখারিণী
তুমি যে গো চিরপূজারিণী
আমার মন্দির তলে ;
নিতান্ত বিরলে
সারাক্ষণ বেড়াও সঞ্চরি'
পুষ্পপাত্রে অর্ঘ্য তব বসন্তের আনন্দ মঞ্জরী !
তব প্রেমচন্দনের মধুগন্ধে করি ভরপূর
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দিয়ে ধরণীরে করেছ মধুর
আমার আঁখির আগে.
এই মনে লাগে
ওগো মোর সেবারতা প্রফুল্ল প্রতিমা
তোমার ত নাহি সীমা,
ছড়ায়ে পড়েছ তুমি অন্তর হইতে দিগন্তরে ;
থরে থরে
সাজাইয়া আপনারে বস্তু-বিশ্বে কল্পনার দেশে,
শেষে কি দাঁড়ালে এসে
মম আঙ্গিনায়
একদিন উৎসব-সন্ধ্যায়
হাতে লয়ে বরমাল্যখানি ?
হৃদয়ের রাণী,
তোমারে চেয়েছি আমি জন্মে জন্মে লক্ষ শতবার
তাইত লজ্জার নাহি পার !
প্রাণমন পরিপূর্ণ করি
অণুপরমাণু ভরি'
ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আজ
তাহারে এড়ায়ে আমি সাধিয়াছি কোন শুভ কাজ ?

আমারে যে ভাল বাসিয়াছ
স্বর্গের আনন্দধ্বনি মোর তরে কণ্ঠে আনিয়াছ,
রচিয়াছ মোর তরে
সুখচ্ছায়াসুপ্ত নীড় দরিদ্রের জীর্ণ খেলাঘরে,

আমার সে নন্দন ভবন
উষার আলোকে দীপ্ত, বসন্তের দখিনা পবন,
আমার ঘরের আঙ্গিনায়,
পাপিয়া দোয়েল শ্যামা আমারে যে ডাক দিয়ে যায় ;
অতি পরিপাটি
গরবী করবী ফোটে' রক্ত রাঙ্গা, অতসী দোপাটি,
ভুঁইচাঁপা ফোটে ভুঁয়ে,
মাধবী যে নুয়ে নুয়ে
পুলকে অধীর করে প্রাণ,
হে কল্যাণী, সেত সব তোমারি হাতের পুণ্যদান !
তবু আমি হই যে বিমুখ
সে ত নয় মোর সুখ !
আমি ভাল জানি
তোমা হতে এ সংসার আমারে যখন লয় টানি'
বজ্রমুঠি প্রসারিয়া,
পরাণের প্রিয়া
তুমিত জাননা প্রাণ কেঁদে ওঠে কি করুণ সুরে !
তোমা হতে যত দূরে
সরে যাই,
ততই য়ে আপনার সর্ব্বস্ব হারাই !
তোমাময় হয় যত প্রাণ
সংসারের অক্ষমতা ততই সে করে অপমান !

কোনও দিন হয়ত ডেকেছ মোরে ;
নিদ্রালস ঘোরে
হয়ত কইনি কথা,
নিদারুণ ব্যথা
লেগেছে তোমার মনে,
কোনও দিন শুধু অকারণে
বাড়ায়েছি তোমার লাঞ্ছনা,
সে যে প্রিয় কি নির্ম্মম আমারে বঞ্চনা

আমি তাহা ভাল জানি—;
ক্ষণিকের অসম্মান তব, মোর চিরজীবনের গ্লানি!
সফলিয়া জীবন যৌবন
সেই যে মিলন-রাতে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন
আমারে করিল জয়,
সেত কভু ভুলিবার নয়!
তোমার প্রথম দৃষ্টি গোপন সুন্দর
দেখে নিল' হৃদয়-কন্দর;
তোমার নয়ন পাতে
দেখিনু তোমারে মূর্ত্ত মেঘমুক্ত নির্ম্মল প্রভাতে।
মন্থিয়া হৃদয়-সিন্ধু লভিলে যে কৌস্তুভ রতন
করিয়া যতন
পরাইলে আমার গলায়
সেকি প্রিয়ে ভোলা যায়?
আজো যে বুকের মাঝে
আমার সকল কাজে
তোমার প্রথম স্পর্শ জেগে আছে করি অনুভব
বিপুল বৈভব।

মাঝে মাঝে শোনা যায় কাণে
তোমার প্রথম কথা হৃদয় বাখানে।
বাগ্রবাহু অ লিঙ্গন পাশে
বক্ষের ত্বরিৎ কম্প এখনও যে ফিরে ফিরে আসে।
সেকি প্রিয়ে অবহেলা করে'
অনাদর ভরে?
সে যে মিথ্যা একান্ত অলীক
তোমাপানে চাহি নির্ণিমিখ
তোমা হ'তে দূরে যাই সরি'—
তোমারি সম্মুখে ধরি
অন্তর-প্রদীপ খানি মোর,
ওগো মনোচোর
বাহিরে তোমায় যত করেছি বর্জ্জন
অন্তরে তোমারে তত করেছি অর্জ্জন!

তীর্থ-প্রভা

[শ্রীসরোজবাসিনী দেবী]

সেখানে সহস্র উৎক্ষিপ্ত বাসনাকে এক-সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া শ্রীক্ষেত্র দর্শনে বাহির হইয়াছিলাম—মনে এক কল্পতরুর সহস্র শাখায় সহস্র ফলের প্রত্যাশা লুকান ছিল; কিন্তু যখন ফিরিলাম, বুঝিলাম এক ফলেই সমস্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি-ফল প্রাপ্ত হয়ে এসেছি।

আমরা যখন পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন আষাঢ়ের সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। গোধূলির অঞ্চলাবৃত দিনের আলোকে আসন্নাবজনীর অন্ধকারের আবছায়ায় স্তব্ধতার মন্দিরে প্রকৃতি তখন ধ্যানাসনে বসিতেছেন! সারাদিনের উপবাস ও পথশ্রমে শরীর যথেষ্টই ক্লান্ত ছিল কিন্তু আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা ও অধীর উল্লাসে জড় প্রায় পা দুখানা প্রায় নাচিতে নাচিতেই প্লাটফরমের বাহিরে আসিয়া পড়িল। ষ্টেশন হইতে পুরী পর্যন্ত রাস্তার বক্ষে ঝাউগাছ শ্রেণী। অমিয়ভরা সান্ধ্য বায়ু স্পর্শে প্রাণ মন দেহ-আত্মা জুড়াইয়া গেল। অন্তরের যেখানে যে বেদনা, নৈরাশ্য শোক তাপের মেঘভার ছিল মুহূর্তের মধ্যে যেন তাহা কোথায় উড়িয়া গেল;—ঘটাকাশের ঘট ভাঙ্গিয়া যেন মহাকাশের মুক্তিপ্রান্ত নিয়তিবদ্ধ জীবন পূর্ণ হইয়া গেল। অদূরে উচ্ছ্বসিত বারিধীর হুহু হুহু কুলু কুলু কুলু শব্দ প্রবাহে শ্রবণেন্দ্রিয় বিহ্বল হইয়া উঠিল—প্রাণ ও তেমনি হুহুহু কুলু কুলু মনোময়ী ভাষায় সে অভ্যর্থনার উত্তর দিল—"এসেছি, এসেছি, তোমারি ওই আকুল আহ্বানে অন্তরের টানে বহুদূর হইতে বহু শোক তাপ ক্ষত যাতনা মোহ মলিনতা নিয়ে এসেছি ওই অসীম প্রেমে অমল জীবনে ধৌত করিয়া যাইব জুড়াইয়া যাইব বলিয়া!"

আনন্দের উত্তেজনায় হাঁটা পথে পুরী প্রবেশ করিতে একটু রাত্রি হইল; পূর্ব্ব হইতেই রাধারমণের মঠ হইতে বাসা ঠিক করা ছিল; নূতন আশ্রয়ে নূতন আনন্দে নূতন জীবন লইয়া প্রবেশ করা গেল! সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন "ধূলো পায়ে" দেব-দর্শনে চলিয়া গেলেন; আমরা কিন্তু পা হাত ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক 'ভদ্রভাবে' দর্শনে গেলাম, অতবড় রাজ-সন্দর্শনে কি অমন পথের পাগলের বেশে যেতে আছে?—অমনি বেশেই গিয়েছিলেন বলে বুঝি শ্রীমাতা ও শ্রীঅতীর কাছে প্রত্যাসবজ্ঞাগারের দ্বারী দ্বার খুলিতে চাহে নাই! কিন্তু হায় তখন মনে হয় নাই একদিন একজায়গার পথে-পথের ধূলিরাশিই তাঁর লীলারজঃ ছিল; অমনি পথের পাগলিনী অভিসারিকার দিকেই তাঁর আকুল আঁখি তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু মনে না হউক এবং যেমনি করেই যাই পেয়েছিলাম সে আঁখির দৃষ্টি—আঁখিতে আঁখিতে পেয়েছিলাম! কি প্রাণ-মনহরা ভুবন-ভুলান বিস্ময় দৃষ্টি! জানি না সে দৃষ্টি কেন এত মধুর লাগিল, বুঝি নিখিলের যত বাঞ্ছিত হারা যত প্রিয়-

তৃষিতের আঁখির আবেগ আসিয়া, যুগ-যুগান্তরেও, এক শুভক্ষণে সম্মিলিত হইবার জন্য সে চির-জাগ্রত হইয়া লুকাইয়া থাকে, তাই সে দৃষ্টি এত মধুর! হায় নাথ! সর্ব্বপ্রসারি তোমার দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিও রক্ষা করিয়া আমার আত্ম সমর্পণও সার্থক করিও।

মন্দিরে বিপুল জনতা; জগন্নাথের সম্মুখে যেন জগতের যত অনাথ যত শরণাগত আসিয়া জমিয়াছে—সে ঠেলিয়া দর্শন করে কার সাধ্য? অনেক কষ্টে সঙ্গীদের বাহুতে ভর দিয়া উড্ডীনভাবে 'দর্শন' করা গেল! রত্ন-বেদী হইতে তখন নামান হইয়া গিয়াছিল, পরদিন রথযাত্রা, আমরা "ঝাঁকি" দর্শন করিলাম। ঠাকুরের সম্মুখ হইতে একজন প্রসাদদাতা বার চৌদ্দটী অন্ন প্রসাদ দিলেন, সে কি সুমধুর আস্বাদযুক্ত প্রসাদ! সেই প্রসাদের মধ্যে যে ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তির অনুপ্রাণতা অনুভবে পাওয়া যায়!

দর্শনের পর বাসায় ফিরিয়া মুটেবাহী প্রসাদান্নে সকলে মিলিয়া (এ মিলনটায় অবশ্য মানব প্রকৃতির সাদৃশ্য ছাড়া, জাতি, বর্ণ, বয়স ও বিদ্যা বুদ্ধির "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েতের" কোন লক্ষণ ছিল না; কিন্তু তবুও জানি না কার প্রেমের বলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলেই নিজ নিজ অহমিকার ধূলিজাল ছিন্ন করিয়া স্ব স্বরূপে, সে মহা-মিলনে ধরা দিয়া সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে ক্ষণেকের জন্যও কৃতার্থতা দিয়াছিলেন!) এক পংক্তি ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক, মহাযাত্রীকের মত, জীবনের সমস্তচিন্তা ও আরব্ধ সংস্কারকে নিতান্ত অসার বস্তুর মত পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রিত হওয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দর্শনের উত্তাল উদ্যোগ! কিন্তু শোনা গেল উদরে ক্ষুধা লইয়া গেলে সে রূপণ দর্শন মিলেন না! হা নাথ, একি ছলনা! তোমার কাছেও যদি কোন অভাব নিয়ে আসিব না তৈল-কোমল কেশে, ক্ষার শুভ্র বস্ত্রে ও অশ্রু-ধোয়া চোখের দৃষ্টিতে যদি তোমার কাছেও প্রাণের সমস্ত অভাব ক্ষোভ ঢাকিয়া রাখিব তবে দীননাথ তুমি বিনা এ দীনতমের অভাব কে পূর্ণ করিবে প্রভু! কিন্তু সর্ব্বজয়ী শক্তি যাঁর তাঁর ইঙ্গিতে চিত্ত নত হইল; বাঙ্গালীর সহজাত সংস্কারগত নিষ্ঠাকে ইষ্ট আশার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া রাধারমণের মঠে পূর্ণ প্রসাদ পাওয়া গেল। তারপর রাস্তার পাশে একটী প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া রথাগমনের প্রতীক্ষা! সম্মুখে লোকের সমুদ্র, পরস্পর হৃদয় নিহিত কি এক অনন্ত উচ্ছ্বাসে আত্ম ডুবাইয়া স্থির তরঙ্গে নিথর নিশ্চল! এই অগণ্য লোকের অসংখ্য প্রকার চিন্তা-সূত্র আজ ক্ষণেকের জন্য এক হইয়া ওই রথের 'কাছী'রূপে অনন্তময়কে টানিয়া সান্তের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছে—এ বন্ধন ছাড়াইতে পারেন সে শক্তি তাঁর নাই!

ক্রমে থামিতে থামিতে আসিয়া রথ 'গুণ্ডিবাড়ী' চলিয়া গেল! এই সময় মনে যেমন এক অপূর্ব্ব ভাব আসে তেমনি এক অপূর্ব্ব উপসর্গও আসে, রথের উপরকার সেই 'কিষ্কিন্ধ্যার ছাওয়াল' দলের নৃত্য গীত ও কলা কাঁঠালটার জন্য লম্ফ ঝম্প দেখিয়া নিমেষের মধ্যে সমস্ত গাম্ভীর্য্যভাব টলিয়া যায়! পরদিন সমুদ্র দর্শন, কিন্তু শুষ্ক অক্ষরে সে ভাবের আভাস আনা যায় না! দর্শনাদির জন্য আমাদের গো-যান লওয়া হইয়াছিল কিন্তু খানিক দূর থাকিতে আমি ও আমার সঙ্গিনী, সন্তোষ অনুরোধে বলিতে হয়, ছি ছি লজ্জাই, এক হাঁটু বালু ভাঙ্গিয়া ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত ছুটিয়া ছিলাম!

তীরে অনেক ঝিনুক এবং লোক ছিল কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই ; আমার লক্ষ্য, সেই নীল তরল অসীম আবেগময় বক্ষের মুক্ত আলিঙ্গন! নিমেষের মধ্যে সে হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, সে সোহাগে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া গেলাম, সে প্রেমে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-ভোগ ক্ষুদ্র জীব-শক্তির কাজ নহে, ক্ষণেকের মধ্যেই শ্রান্তি আসিল, শত শত তরঙ্গের উপরে নাচে পড়িয়া জীবন-কুম্ভ আমার প্রায় অতলোন্মুখ; দুইজন লোক তখন আমায় ধরিয়া তীরে তুলিলেন—তখনো সমুদ্র সেই মদীর লীলায় আত্মোন্মত্ত। তীরে উঠিতেই একটী লোকের মৃদু-মন্তব্য শুনিলাম "একেবারে গেলেই হত।" সে বাণী আমারি উদ্দেশে, কারণ আমার মত বালুময় জীবনের সিন্ধুই একমাত্র অমৃতাকর। তীরে দাঁড়াইয়া সিন্ধুর উপর বিষণ্ণ মুখে 'আড়ি' দিলাম—আর খেলিব না, কিন্তু সে কি ছাড়ে? সেই অচল প্রীতির আত্মহারা ক্রীড়ায় কি যে নিগূঢ় আহ্বান তার উথলিয়া উথলিয়া উঠিতেছিল, মুগ্ধ প্রাণ আবার তাহার সে অসীম রহস্যে মরিতে চাহিল। কিন্তু এবার আর ধরা দিলাম না—ধরিতে চাহিলাম। চঞ্চল লীলাভরে যখন সে আমার দিকে অবহেলা করিয়া পিছন দিয়া চলিয়া যায় আমি অমনি পিছনে ছুটিয়া তাকে ধরিতে চাই কিন্তু কি চতুর, অমনি যেন স্বপ্নে জাগিয়া সহস্র করে আমায় বেষ্টন করিতে আসে! এইরূপে সমুদ্র ক্রীড়া সারা করিয়া আমরা যেখানে যা দর্শনের জন্য গোশকটে আরোহণ করিলাম। পথপার্শ্ববর্ত্তি—মরিচা পড়া প্রেকের দোলনায় দোদুল্যমান নীরব দুলাল-দলকে তখন চোখে পড়িতে লাগিল এবং কানে আসিতে লাগিল, একটা আবছা বাৎসল্য কল্প জগন্নাথদেবের পোষ্য নাতি নাত্‌নিদিগের "এ দিদিমাণী এ মাসীমায়ী এ মায়ী" ইত্যাদি নানাবিধ সম্বোধনে সরল প্রাণের সেই স্নিগ্ধ আত্মীয়তা। সমুদ্রের তীরে তীরে গাড়ী থামাইয়া সব দেখা শোনা হইতে লাগিল। হরিদাস ঠাকুরের সমাজ বাড়ী, কাঁচের বাক্সে রক্ষিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গাত্র বস্ত্র, সিদ্ধ বকুল এমনি এমনি অনেক দেখা গেল, সমস্ত খানি আমার মনে নাই। কিন্তু পুরীর বাহিরে এ সব যা হউক পুরীর ভিতরে কত যে দেবালয়—কত যে দেব বিগ্রহ তার সংখ্যা জানিয়া নোট বুকে নোট করিয়া কেহ রাখিতে পারেন—স্মরণ রাখা কিন্তু সকলেরই সাধ্যের বাহিরে—সেই সাহসে আমি একটি ঠাকুরের নামও স্মরণে আনিতে চেষ্টা করিলাম না। মন্দিরের পৃষ্ঠ ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা সিঁড়ি বাহিয়া ছাদের সামান্য অংশে কলি অবতারের এক মূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তির মাথায় স্ত্রী এবং হস্ত দুটী তাড়িত মাতার গলধৃত,—এই টুকু মনে ধরে প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্যই বোধহয়, মনে পড়ে। এখানে দাঁড়াইলে সমুদ্রের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়; যেন একটি বিশাল অটবী অসীমের কোলে ঘুমাইয়া রহিয়াছে—সাড়া শব্দ ও শ্বাস কম্পন মহা স্তব্ধতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। এক জায়গায় সমুদ্রের সঙ্গে বিশ পচিশহাত ব্যবধানে চক্রতীর্থ; লবণাম্বুনীর এত নিকটস্থ থাকিয়াও সে স্বচ্ছ সলিল খাবার কি মিষ্ট আস্বাদ, সে আস্বাদ চক্র-ধারীর চক্র মহিমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমার মনে হয় তাই তার নাম 'চক্র তীর্থ'।

তারপর প্রত্যাগমন পথে ভুবনেশ্বরে নামা গিয়াছিল; সে আমার এক মহান দৃশ্য! ভুবনেশ্বরে যেন সমস্ত সগুণ ঐশ্বর্য্য ত্রিগুণাত্মক

বিভূতি ত্রিভুবনময় ছড়াইয়া দিয়া সেখানে নিগুর্ণ মহিমায় আত্মসমাহিত! সেখানকার প্রতি দৃশ্য প্রত্যেক রেণু কণা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে নির্গুণ সত্তার অনুভূতি দান করিয়াছিল। সেখানেই অনন্তের স্পর্শে যেন আমার মোহরুদ্ধ প্রাণ প্রথম উন্মুক্ত হইয়া যায়। 'বিন্দু সরোবর' অনন্ত বিন্দু সরোবরই বটে; কি গভীর স্নিগ্ধ শীতল-শান্ত বারি! স্পর্শে দেহ পবিত্র হয় অবগাহনে মনের রম্যতা কমল দলের মত ফুটিয়া উঠে! হায়! সমুদ্র সঙ্গমে গিয়া যেমন ব্যাকুল উচ্ছাসে জীবন ভরিয়া আসিয়াছে, ভুবন নাথের চরণে তাহা সমর্পন করিয়া তেমনি অনন্ত পূর্ণতায় তাহা ভরিয়া উঠিবে।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি—"আনন্দ বাজারের" কথা! এমন সর্ব্বসমাশ্রয়ী আনন্দ ক্ষেত্র জগতে বুঝি আর কোথাও নাই! আনন্দ বাজারে আচণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, ধনী দরিদ্র মূর্খ পণ্ডিত আস্তিক নাস্তিক সমপ্রেমে "কুকুর" হইতে মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্মারূপী ভগবানকে 'অন্ন' কুসুমাঞ্জলী প্রদান করতঃ 'প্রসাদ' কণা গ্রহণকরিয়া আনন্দামৃত পানে জীবনে যেন অমরত্ব লাভ করিতেছেন—দেবত্ব লাভ করিতেছেন! সে সর্ব্বত্মা সন্তৃপ্ত কারী "প্রসাদ"—

হরে দুঃখ হরে দৈন্য হরে রোগ শোক
হরে পাপ হরে তাপ হরে ব্যর্থ ভোগ!

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জার্ম্মান ডাক্তার।

এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি একজন ইংরাজ। মস্তকে তাঁহার সামরিক টুপি, পদে সামরিক পাদুকা—কিন্তু তিনি সৈনিক নহেন। তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একজন জার্ম্মান সৈনিক কর্ম্মচারী—এবং এই কর্ম্মচারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি। তাহার অঙ্গে সৈনিকের বেশ থাকিলেও তিনি যে সৈনিক নহেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তিনি এক পায়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিলেন—তাঁহার স্কন্ধ দুইটী অযথা অবনত—এবং হাতে তিনি একগাছি যষ্টি ধারণ করিয়াছিলেন। বৃহদাবর্ত্তন চসমার ভিতর দিয়া তিনি প্রথমে মার্সির দিকে তাকাইলেন—তাহার পর সেই মৃতা নারীর শয্যার দিকে চাহিলেন—তাহার পর ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর সৈনিক কর্ম্মচারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"একজন স্ত্রীলোক বিছানার উপরে পীড়িত; আর একজন স্ত্রীলোক তাহার সেবায় নিযুক্ত; গৃহে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই—এখানে কোন প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন আছে কি?"

কর্ম্মচারী বলিলেন—"না, কোন প্রয়োজন নাই।" তৎপরে তিনি রন্ধনশালার দিকে চলিয়া গেলেন। চসমাধারী প্রবীন ব্যক্তি শয্যার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ যুবক তখন মার্সির নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ফরাসী নারী?"

মার্সি বলিল—"আমি একজন ইংরাজ রমণী"।

চসমাধারী ডাক্তার এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি হঠাৎ থামিলেন এবং শয্যাস্থিতা নারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মার্সিকে ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার দ্বারা ঐ স্ত্রীলোকটীর কোন উপকার হইতে পারে?"

মার্সি প্রথম হইতেই এই কদাকার খঞ্জ ডাক্তারকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিল—ডাক্তার চসমার ভিতর দিয়া অভদ্রভাবে তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে দেখিয়া সে তাহার প্রতি আরোও অধিক বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"মহাশয়, এখন আপনার দ্বারা উহার কোন সাহায্য হইবে না। যখন আপনাদের সৈন্যগণ এই পল্লীর উপর গোলা বর্ষণ করিতেছিল তখন এই নারী গোলার আঘাতে নিহত হইয়াছে।"

ডাক্তার স্থির ভাবে এক টিপ্ নস্ত গ্রহণ করিয়া মার্সিকে আর একটী প্রশ্ন করিলেন-

"কোনও ডাক্তার ঐ নারীর দেহ পরীক্ষা করিয়াছে কি?" মার্সি বিরক্তির সহিত বলিল—"হঁ।"।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করিলেন—

"কে ইহার দেহ পরীক্ষা করিয়াছে?"

মার্সি বলিল—"ফরাসী সেবাসম্প্রদায়ের ডাক্তার।" জার্ম্মান্ ডাক্তার এই উত্তরে মুখে একটী বিরক্তিসূচক ধ্বনি করিলেন। তাঁহার ভাব এই— ফরাসী ডাক্তার আবার ডাক্তার!!

এই সময়ে ইংরাজ যুবক মার্সিকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ স্ত্রীলোকটী আমাদের স্বদেশী?"

মার্সি উত্তর দিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিল। তাহার অন্তরে যে অভিপ্রায় জাগিয়াছে তাহা সিদ্ধ করিতে হইলে অতি সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে—বেফাঁস কথায় সকলই পণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

সে বলিল— আমার তাই মনে হয়।, তবে হঠাৎ আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি উহাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনা।'

জার্ম্মান ডাক্তার যেন একটু বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন—' নাম পর্য্যন্ত জানা নাই না কি?"—তিনি তীব্র দৃষ্টিতে আরও অধিক রূঢ়ভাবে মার্সির দিকে চাহিলেন। তাহার পর তিনি টেবিল হইতে বাতি লইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে শয্যার পার্শ্বে গিয়া স্ত্রীলোকটীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ যুবক মার্সিকে বলিল—"এই অল্পবয়সে ভীষণ যুদ্ধের সময় একাকিনী আপনি কিরূপে এরূপ ভীষণ স্থলে আসিয়া পড়িলেন?"

এমন সময় রন্ধনশালার দিকে আহতদিগের কাতর চীৎকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। তাহারা চীৎকার করিতেছে—আর জার্ম্মান কর্ম্মচারিগণ তীব্র আদেশে তাহাদিগকে চুপ করিতে বলিতেছে। মার্সির

সুপ্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ কুপ্রবৃত্তির উপরে জয়ী হইয়া নীচ স্বার্থসুখের কথা তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। তাহার মনে হইল যে সে আহতদিগকে বলিয়াছে -"আর কেহ না থাকুক, তোমাদের শুশ্রূষাকারিণী তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেনা।"—হৃদয় গড়িতে মার্সিকে চিরজীবন সংসারের নিদারুণ আঘাত বহিতে-তাহার হৃদয় বলিল— "দুঃস্থদের ফেলিয়া তোমার কোথাও যাওয়া হবে না"। সে পর্দা সরাইয়া বন্দনশালার দিকে অগ্রসর হইল।

কিন্তু একজন জার্ম্মান প্রহরী সেই দাওয়ায় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"জার্ম্মান ভিন্ন কেহ ওখানে যাইবার কাহারও অধিকার নাই।"

ইংরাজ যুবক মার্সিকে জিজ্ঞাসা করিল— 'আপনার ও ঘরে যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে কি ?"

মার্সি বলিল—"আহা! দুর্ভাগ্য ফরাসী আহত ব্যক্তিগণ! তাহারা না জানি কত কষ্ট পাইতেছে।"

জার্ম্মান ডাক্তার শয্যা পার্শ্ব হইতে মার্সির দিকে অগ্রসর হইয়া দৃঢ় ও কঠোর স্বরে বলিলেন—

"আহত ফরাসীদিগের সম্বন্ধে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তাহাদের দেখা শুনার ভার আমার— তাহাদের সহিত তোমার সম্পর্ক কি? ফরাসীরা আমাদের বন্দী; আমরা তাহাদিগকে আমাদের শুশ্রূষালয়ে লইয়া যাইতেছি। আমার নাম—ইগ্‌নেশিয়াস্ উইজেল্। আমি চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী—আমি তোমাকে এই কথা বলিয়া রাখিলাম। তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।" ইহার পর তিনি প্রহরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"পর্দা টানিয়া দাও, যদি এই স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার ঐ দিকে যাইতে চেষ্টা করে তবে বলপূর্ব্বক তাহাকে এই ঘরে নিক্ষেপ করিবে।"

মার্সি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। ইংরাজ যুবক তাহাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া বলিল -"আপনার প্রতিবাদ করা বৃথা, জার্ম্মান শাসন কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবে না। আহতদিগের জন্য আপনার কোন উদ্বেগের কারণ নাই। জার্ম্মানদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা অতি চমৎকার— আহতদিগের রীতিমত শুশ্রূষা হইবে—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চশমার ভিতর দিয়া মার্সির দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ইগ্‌নেশিয়াস্ বলিলেন— "কেমন, এই বার পাগলামি দূর হইয়াছে তো? এখন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে তো?"

মার্সি নীরব থাকিল।

নিয়তির কি বিচিত্র গতি! যদি জার্ম্মান ডাক্তার এই ভাবে বাধা না দিতেন তাহা হইলে মার্সি পাপের কূপে নিমগ্ন হইবার সুযোগ পাইত না। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি পাপের উপর জয়লাভ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল—এমন সময় এই প্রবল বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। জার্ম্মান শাসনের কঠোরতা তাহার পুণ্যপথে প্রত্যাবর্ত্তনের শেষ সম্ভাবনা টুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল! সে পাপ সঙ্কল্পে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একখানি চেয়ারে গিয়া বসিল।

ইংরাজ যুবক বলিল—"দেখুন, আহতদিগের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার আপনার কোন কারণ নাই, কিন্তু আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। প্রভাতে পুনরায়

যুদ্ধ আরম্ভ হইবে—আপনার কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়া আবশ্যক। আমি ইংরাজ সৈন্যদলের একজন। আমার নাম হোরেস্ হোমক্রফ্ট্। আমার দ্বারা আপনার উপকার হইতে পারে। আপনি যদি আমার কোন সাহায্য চান, আমি সে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কি কোথাও যাইতেছিলেন ?"

মার্সি পূর্ব্বেই আপনার শুশ্রূষাকারিণীর পরিচ্ছদ দীর্ঘ কোটের দ্বারা আবৃত করিয়াছিল—এক্ষণে সেই কোটটার দ্বারা আরও ভাল করিয়া সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া সে প্রথম প্রতারণার কার্য্য সম্পন্ন করিল। সে উত্তর করিল—"হাঁ।"

"ইংল্যাণ্ডে যাইবেন ?"

"হাঁ।"

"তাহা হইলে আমি আপনাকে জার্ম্মান শিবিরসীমা পার করিয়া দিতে পারি।"

"আপনি জার্ম্মানদের শিবির পার হইবার বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন ? তাহা হইলে আপনার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বুঝিতেছি।"

হোরেস্ হাসিয়া বলিল—"আমি একখানি বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রের সংবাদদাতা রূপে এখানে কার্য্য করিতেছি—সুতরাং সত্যই আমার যে ক্ষমতা আছে অন্য কাহারও তাহা নাই। আমি বলিলে সেনাপতি আপনাকে যাইবার অনুমতি পত্র দিবেন। আমি সে বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিব ?"

"যদি করেন আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

ইংরাজ যুবক চলিয়া গেল।

মার্সি ডাক্তারের দিকে চাহিয়া দেখিল। ডাক্তার তখন শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শয্যাশায়িতা রমণীর ক্ষত পরীক্ষা করিতেছিলেন। ডাক্তারের প্রতি মার্সির বিরক্তির ভাব আরও যেন বর্দ্ধিত হইল—সে জানালায় মুখ বাড়াইয়া বাহিরের চন্দ্রালোক দর্শন করিতে লাগিল।

মার্সি কি তবে পাপের পঙ্কেই ডুবিতে চলিল ? না, এখনও তো সে বিশেষ কোন পাপের কার্য্য করে নাই। সে কেবল ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ করিয়া লইতেছে। মেবলথর্প্ প্রাসাদে আপনাকে গ্রেস্ বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে—এমন তো কোন কথা নাই। এখনও সে গ্রেসের মৃত্যু বিবরণ লিখিয়া জ্যানেট্‌কে জানাইতে পারে। মনে কর সে যদি তাহাই করে—তবে তাহার পরিণাম কি ? পরিণাম—পতিতাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার মাতৃস্বরূপা সেই আশ্রম কর্ত্রীর আশ্রয় লওয়া।

আশ্রম!—আশ্রমকর্ত্রী!! মার্সির হৃদয়ে কত না পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল! জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সেই নির্জ্জন গৃহে বসিয়া কাহার কথা মার্সির স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া উঠিল ?

সে ভাবিতে লাগিল সেই সহৃদয় প্রচারকের কথা—যাঁহার মধুময়ী বাণী একদা তাহার লৌহময় হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাহাকে সোণার রঙে রঞ্জিত করিয়াছিল—যাঁহার বাক্যাবলী তাহার অন্ধকারময় নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোকের উন্মেষ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার উপদেশের একস্থানে বলিয়াছিলেন—"শত দুঃখ ও নির্য্যাতনেও তোমরা কখনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইও না।" সেই কথার ধ্বনি এখনও যেন মার্সির কর্ণ-কুহর পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে! এই কথাগুলি স্মরণ হওয়াতে মার্সি যেন

বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বারম্বার আপনার মনে বলিতে লাগিল—"হায়! আমি কি করিলাম! হায়! আমি এ কি করিলাম!"

মার্সি মনে করিল—"হোরেস্‌কে ফিরাইয়া আনি। আমি এখান হইতে যাইব না।" সেই সময়েই বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ডাক্তারের মুখ দেখিতে পাইল। ডাক্তার একখানি শুভ্র রুমাল হস্তে তাহারই দিকে আসিতেছিলেন। এ রুমাল মার্সি গ্রেস্‌কে ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল।

ডাক্তার বলিলেন—"আমি ঐ স্ত্রীলোকের পকেটে এই রুমাল পাইলাম। ইহাতে তাহার নাম লেখা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি তোমারই স্বদেশবাসিনী দেখিতেছি। উহার নাম—মার্সি মেরিক্।"

ডাক্তারের জিহ্বা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল—মার্সির জিহ্বা নহে। তিনিই গ্রেস্‌কে এই নাম অর্পণ করিলেন।

"মার্সি মেরিক্—ইংরাজী নাম; নয় কি?"

প্রচারকের সুধাময় স্মৃতি মার্সির মনে ম্লান হইয়া আসিল। একটি প্রশ্ন এখন তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল—'সে ডাক্তারের এই ভ্রম সংশোধন করিবে কি না?' এখন সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত—যখন, হয় তাহাকে সত্যের আশ্রয়ে নিজের স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা মিথ্যার আশ্রয়ে তাহাকে প্রবঞ্চনার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হইবে।

এমন সময় হোরেস্ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দেখুন, আমার ক্ষমতা আমি বাড়াইয়া বলি নাই।" তাহার পর নিজ হস্তস্থিত একটুকরা কাগজ দেখাইয়া বলিল—"এই আপনার ছাড়্‌পত্র। এখানে কালি কলম আছে? আমি 'ফরম' পূরণ করিয়া দিই।"

মার্সি টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। হোরেস্ লিখিতে বসিয়া বলিল—

"আমার দুএকটী প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। আপনার নাম কি?"

মার্সির সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাহার সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সে কিছুই বলিতে পারিল না।

ডাক্তার মার্সিকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি ঠিক এই সময়েই মার্সির মুখের নিকট রুমালখানি ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মার্সি মেরিক, ইংরাজী নাম নয় কি?"

হোরেস্ বলিল—"মার্সি মেরিক্? মার্সি-মেরিক্ কে?"

ডাক্তার মৃতা নারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"আমি উহার রুমালে ঐ নাম লেখা পাইয়াছি।" তৎপরে বিদ্রূপ সহকারে তিনি মার্সির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই স্ত্রীলোকটী একজন স্বদেশবাসিনীর নামটুকু পর্য্যন্ত জানিবার কষ্ট স্বীকার করিতে পারে নাই।"

ডাক্তারের এই কথায় সন্দেহ ও ঘৃণা উভয়ই জড়িত ছিল। মার্সি এই বিদ্রূপ ও সন্দেহের আভাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই উত্তেজনাই তাহাকে পাপের পথে পরিচালিত করিল। হায়! সংসারে এমনি ক্ষুদ্র ঘটনাই মানুষের নিয়তিকে এমনি অনিবার্য্য রূপে পরিচালিত করিয়া থাকে! মার্সি অবজ্ঞাভরে ডাক্তারের দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া

দাঁড়াইল। তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্ত আর তাহার প্রবৃত্তি রহিল না।

হোরেস্ বলিল—"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। জার্ম্মান শাসন কি কঠোর বস্তু তাহার কতকটা আভাস তো পাইয়াছেন। আপনার নাম কি বলুন।"

মার্সি আর অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া যেন ভূতগ্রস্তের স্থায় উত্তর করিল—

"আমার নাম গ্রেস্ রোজবেরি"।

সাংঘাতিক কথাগুলি উচ্চারিত হইয়া গেল। কিন্তু এই কথাগুলি মুখ হইতে বাহির হইবার পরমুহূর্ত্তেই মার্সির মনে হইতে লাগিল—"হায়! জগতের সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি এগুলিকে প্রত্যাহার করিতে পারা যাইত!"

"কুমারী ?"

মার্সি ইহার উত্তরে তাহার মস্তক নত করিল।

হোরেস্ লিখিল—"কুমারী গ্রেস্ রোজ-বেরি"—তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ইংল্যাণ্ডে আপনার আত্মীয়ের নিকট যাইতেছেন ; না ?"—

মার্সি ভাবিল—আমার আত্মীয়! জগতে যাহার কেহই নাই—তাঁহার আবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব!

এ প্রশ্নের উত্তরেও সে শুধু মস্তক নত করিল।

হোরেস্ লিখিল—"ইংল্যাণ্ডে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরিয়া যাইতে-ছেন।" তাহার পর কাগজখানি মার্সির হস্তে দিয়া বলিল—"ইহাতেই যথেষ্ট হইবে—আপনার এখান হইতে চলিয়া যাইবার বিরুদ্ধে আর কেহ বাধা দিবে না। আমি নিজে গিয়া আপনাকে জার্ম্মান শিবিরসীমা পার করিয়া দিয়া আসিব। আপনার জিনিষ পত্র কোথায় ?"

মার্সি বলিল—"কুটীরের বাহিরে একটা চালার মধ্যে আছে। বেশী কিছুই নাই। যদি প্রহরী আমাকে রন্ধনশালার মধ্য দিয়া যাইতে দেয়—তবে আমি নিজেই সব গুছাইয়া লইতে পারিব।"

"ঐ কাগজ দেখাইয়া এখন আপনি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবেন। আমি এইখানেই আপনার জন্ম অপেক্ষা করিব কি ?"

মার্সি একবার ডাক্তারের দিকে চাহিল। তিনি তখন নানাপ্রকারে শবদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন। মার্সি ভাবিল যদি হোরেস্ ডাক্তারের সঙ্গে এই ঘরে থাকেন তবে ডাক্তার না জানি 'মার্সি'র সম্বন্ধে আরো কত অপ্রিয় কথা বলিয়া বসিবে। মার্সি সেইজন্ত বলিল—"আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বাহিরেই অপেক্ষা করুন।"

ছাড়পত্র দেখিয়া প্রহরী অবনত মস্তকে পথ ছাড়িয়া দিল। তখন ফরাসী কয়েদী-দিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রন্ধনশালার ৫।৬জন মাত্র জার্ম্মান আছেন—তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রিত। মার্সি গ্রেসের বস্ত্রাদি গ্রহণ করিল।—তাহার পর সে চালার দিকে অগ্রসর হইল। সেদিকে আর একজন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। ছাড়পত্র দেখাইবামাত্র সেও পথ ছাড়িল। তখন মার্সি তাহার হস্তে একটি মুদ্রা দিয়া ফরাসী ভাষায় বলিল—"আমি ঐ চালায় আমার জিনিষ পত্র লইতে যাইতেছি দেখিও আর যেন কেহ ওখানে না যায়।" প্রহরী নমস্কার করিল। মার্সি চালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

যখন হোরেস্ গৃহে ছিল, তখন সে

দেখিল ডাক্তার একান্ত আগ্রহ সহকারে সেই মৃতা নারীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু-ব্যাপারে কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছেন কি ?"

"না, সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য কোন বিশেষত্ব নাই।" এই বলিয়া ডাক্তার পূর্ব্বের ন্যায় দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হোরেস্ বলিল—"ডাক্তারদের কৌতুহলোদ্দীপক কিছু আছে নাকি ?"

"হাঁ; ডাক্তারদের কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার যথেষ্ট আছে।"

হোরেস্ আর কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিল। বাহিরে সে মার্সির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন ডাক্তার একাকী সেই নির্জ্জন গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর তিনি গ্রেসের বক্ষস্থলের পরিচ্ছদ সরাইয়া ফেলিয়া তাহার হৃদপিণ্ডের উপর বাম হস্ত স্থাপন করিলেন। অতঃপর হস্তের সাহায্যে ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে একটি লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র বাহির করিয়া তিনি সাবধানে সেই যন্ত্র ক্ষতের মুখে প্রয়োগ করিলেন —এবং ইহার সাহায্যে করোটীর এক টুকরা ভগ্ন অস্থি সরাইয়া—এই কার্য্যের ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি শয্যাশায়িতা নারীকে সম্বোধন করিয়া উৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন— "আহা! ফরাসী ডাক্তার না ব'লে গেছে— তুমি মারা গেছ ? সে এই কথা বলেছে না ? ফরাসী ডাক্তার একটা আস্ত গোবৈদ্য! সে একটা প্রকাণ্ড গর্দ্দভ!" তারপর ডাক্তার রন্ধনশালার দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন— "ম্যাক্স্"। একটি নিদ্রাতুর জার্ম্মান যুবক পর্দ্দা সরাইয়া ডাক্তারের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার বলিলেন— "আমার কালো চামড়ার ব্যাগ্‌টা আন তো"। এই আদেশ দিয়া ডাক্তার ফূর্ত্তির সহিত তাঁহার হস্ত দুইটি মর্দ্দন করিতে লাগিলেন—এবং কুকুরের ন্যায় একবার নিজের সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়া দিয়া লইলেন। শয্যার উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন—"এইবার আমি পরম আহ্লাদিত হয়েছি। প্রিয় ইংরাজরমণি,—তোমার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের জন্য যদি আমাকে সর্ব্বস্ব দিতে হ'ত তাতেও আমি কুণ্ঠিত হ'তাম না। হা! হা! অকালকুষ্মাণ্ড—গোমূর্খ ফরাসী ভূত!—তুই বলিস্ একে মৃত্যু ? তোর বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। আমি একে কি বলি জানিস্ ?—আমি বলি এটা মস্তিষ্কের উপর চাপ বশতঃ সাময়িক সংজ্ঞালোপ।"

কালো ব্যাগ্ লইয়া ম্যাক্স্ গৃহে প্রবেশ করিল।

ইগ্‌নেশিয়াস্ উইজেল্ ব্যাগ হইতে দুইটী নূতন উজ্জ্বল ভীমদর্শন অস্ত্র বাছিয়া লইয়া—সে দুটীকে নিজের বক্ষে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। মনে হইল সে দুটী যেন তাঁহার ঔরসজাত দুইটী প্রিয় সন্তান। তৎপরে অস্ত্র দুইটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "প্রিয় বৎসগণ, এস এখন একবার তোমাদের কাজে নিযুক্ত হও তো।" সহকারী ম্যাক্সের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ম্যাক্স্, সলফারিনো যুদ্ধের কথা তোমার মনে পড়ে কি ? সেই যুদ্ধে আহত একটী অষ্ট্রীয় সৈনিকের মস্তকের ক্ষত আমি অস্ত্র চিকিৎসা করেছিলাম—সে কথা মনে আছে ?"

সহকারী নিদ্রাভারাক্রান্ত চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"সে কথা খুব মনে

আছে। আমিই তো আলো ধ'রে ছিলাম।"

ডাক্তার সহকারীকে শয্যার পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন—"আমি সে অস্ত্র চিকিৎসার ফলে সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি। তখন হ'তেই আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল—আবার যদি কখনও ঐরূপ কোন অস্ত্র চিকিৎসা ক'রতে পাই তা হ'লে ফলাফল বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হ'তে পারি। আমি সেই সৈনিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আমি প্রাণের সঙ্গে তার বুদ্ধি ও বিবেচনা ফিরিয়ে দিতে পারি নি। হয়তো অস্ত্র চিকিৎসায় কোন দোষ ঘটে ছিল—কিম্বা সেই লোকটারই এমন কোন দোষ ছিল যাতে আমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। যে কারণই হোক—সেই লোকটা পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবে সে পাগলই থেকে যাবে। কিন্তু আজ ম্যাক্স, এই শয্যার উপরে শায়িতা এই স্ত্রীলোকটীর দিকে চেয়ে দেখ। যা আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম—এই স্ত্রীলোক আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে—সল্‌ফারিনোতে যা ঘটেছিল—এ ক্ষেত্রেও অবিকল সেইরূপ ঘটেছে। সে দিন তুমি আলো ধরেছিলে—আজ আর একবার তোমাকে আলো ধরতে হবে। এইখানে স্থির হয়ে দাঁড়াও—খুব সতর্কতার সহিত এইদিকে লক্ষ্য রাখবে। আমি আজ একবার চেষ্টা করে দেখব—এইবার প্রাণ ও বুদ্ধি দুই-ই বাঁচাতে পারি কি না।"

তিনি কোটের আস্তিন গুটাইয়া লইয়া অস্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অস্ত্র গ্রেসের মস্তক স্পর্শ করিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিকটস্থ জার্ম্মান শিবিরে প্রহরীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"ইংরাজ রমণীকে পথ ছাড়িয়া দাও।"

অস্ত্রকার্য্য অগ্রসর হইয়া চলিল। দূরবর্ত্তী দ্বিতীয় শিবিরে প্রহরীর কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণস্বরে ধ্বনিত হইল—

"ইংরাজ রমণীকে পথ ছাড়িয়া দাও।"

অস্ত্রকার্য্য শেষ হইয়া গেল। ডাক্তার কোনরূপ শব্দ নিবারণের জন্য হস্ত উঠাইলেন। তাহার পর তিনি রমণীর মুখের নিকট কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ জীবনের ক্ষীণ নিঃশ্বাস গ্রেসের ওষ্ঠাধরের মধ্যে কম্পিত হইয়া উঠিল; সেই নিশ্বাস ডাক্তারের গোলগণ্ড স্পর্শ করিল। ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন—

—"আহা! প্রিয় বালিকা, তোমার এই যে নিশ্বাস বইছে। তুমি বেঁচে উঠেছ!"

ডাক্তার যে মুহূর্ত্তে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেই মুহূর্ত্তে জার্ম্মান শিবিরের প্রান্ত সীমার প্রহরীর কণ্ঠ অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে শেষবারের জন্য ধ্বনিত হইল—

"ইংরাজ রমণীকে পথ ছাড়িয়া দাও।"

(প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত *

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

যাঁহার ললিত-কণ্ঠ, দেশবাসীর হৃদয়কে আশা-আনন্দে সঞ্জীবিত করিয়া, অসীম অনুরাগে গাহিয়া উঠিয়াছিল,—

"কোন্ দেশের তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হবে দুর্ব্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোণার ফসল,
সোণার কমল ফোটেরে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে।"—সে

মধুরকণ্ঠ আজ নীরব। নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন বরষার দুর্য্যোগ রাত্রির উন্মাদ পবনের নির্ম্মম আঘাতে বাঙ্গালীর একটী আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিভিয়া গিয়াছে। "বেণু ও বীণার"র সুরের রেশ বহুদিন হৃদয়ের তারে বিচিত্র রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইবে, কিন্তু সেই বীণকার আজ—

"নিখিল অবদান
সমাধান
যেথানে"—

সেই অভাবলেশ শূন্য মহারাজ্যে, অশ্রু-হাসির পরপারে, বিরহ-বেদনা-হীন মিলনের স্নিগ্ধ-দেশে, সঙ্গীত মুখরিত আনন্দ লোকে, সত্যশিব সুন্দরের স্নেহচ্ছায়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। কবি, সাধনাচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন,—তবে শোক কেন? আত্মা অবিনশ্বর,—মৃত্যু ধ্বংস নয়, নব-জীবনের বোধন; তবে এ অশ্রুজল কেন? বৈদান্তিক বলিবেন, ইহা মানবের দুর্ব্বলতা। মমতার অশ্রুজল যদি দুর্ব্বলতার নামান্তর হয়, তাহা হইলে এ দুর্ব্বলতা নিন্দনীয় নয়,—প্রশংসনীয়। সংসারের অসংখ্য দুঃখ-দৈন্যে নিষ্পেষিত হইয়াও মানুষ এই সহানুভূতির রসেই বাঁচিয়া রহিয়াছে। শোকবিগলিত অশ্রুজল, তাহার পক্ষে ক্ষতনিবারক শান্তি-প্রলেপ। 'অতি-মানুষ' শোক না করিতে পারে, কিন্তু হাসিমুখে বন্ধু বিরহ সহ্য করিবার শক্তি মানুষের নাই। তাই,—"যাহা যায় তাহা খুব বেশী যায়, হাহাকার করে মরে সে।"

বিশ্বপ্রীতি কবিধর্ম্ম; আর দেশপ্রীতি তিনি জন্মসূত্রেই অধিকার করিয়াছেন। এই দেশ-প্রীতির অপূর্ব্ব প্রবাহ, সত্যেন্দ্রনাথের অন্তর খানিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার নিকটে "বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা", বাঙালী গানের রাজা", এ দেশের মাটী মধুর চেয়েও মধুর", 'এ দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোণার চাইতে খাঁটি।" দেশবাসীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় যেমন সহানুভূতিতে ভরিয়া

---

* কবি সত্যেন্দ্রনাথের পরলোক-গমনে ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ কর্তৃক আহূত শোকসভায় পঠিত।

দেশমাতৃকার এ 'মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তি' পরিকল্পনা করিতেও হৃদয়খানি অনির্ব্বচনীয় পুলকানন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে এবং যে কবির তুলিকা-সম্পাতে এ অপরূপ চিত্র প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশ্যে চিত্ত সম্ভ্রমে বিনত হয়।

অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে কবির চিত্ত সর্ব্বদাই সজাগ। যখন 'বেআইনী' ও 'বেইজ্জতে' আ ফ্রিকায়—'রঙের দায়ে ভারতপ্রজা নিগৃহীত নিগ্রো সাথে'—যখন সাগর পারে, 'সুরু হ'ল নূতন নাট্য সুবনের নূতন নাট', তখন "ইজ্জতের জন্য" কবির সেই আকুল আহ্বান—

"দাও গো আমীর! দাও গো ফকির!
মুক্ত তোমার রিক্ত হাতে,
দাও মহাজন! দাও দোকানী!
দাও কিছু ইজ্জতের খাতে।"—

আজিও বিজয় দুন্দুভির মত প্রাণের পরতে পরতে অপূর্ব্ব রাগিণীতে ধ্বনিত হইতেছে।

জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কল্যাণ-কর্ম্মীকে সম্মান ও মহৎ ঘটনার জয়গান করা কবির সহজজাত ও স্বভাবজাত বিশেষত্ব। সত্যেন্দ্র-নাথের ভিতরেও এ বিশেষত্ব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। "টলষ্টয়ের গৃহত্যাগ", "টাইটানিকের সমুদ্র সমাধি", "গান্ধীজীর আত্মদান" প্রভৃতি অনন্যসাধারণ মহৎ ঘটনায় তাঁহার হৃদয় পুলকে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল অতুলনীয় ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিতে কবি যে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জাতীয় ইতিহাসে আবহমান কাল অক্ষয় গৌরবের সহিত বিরাজ করিবে। "ডেভিড হেয়ার", "গোখেল", "রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অঞ্জলি কবির গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার "দাবীর চিঠি" নির্জ্জীবকে নূতন বল প্রদান করিয়া গিয়াছে, আবার দেশের গৌরব বাণী কীর্ত্তিত করিতেও তাঁহার কণ্ঠ কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। তিনি ধ্যানমগ্ন সাধকের ন্যায় জন্মভূমির অপূর্ব্ব শ্রী নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-ব্যাকুল চিত্তে উদাত্ত গম্ভীরস্বরে গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

"তুমি জগৎ-ধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষদানে,
মমতা তোর মেদুর হ'ল, মধুর হ'ল নবীন ধানে।

* * *

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছপা নহিস্ বৈরীকে,
গৌরী তুমি—তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরীকে।
লক্ষ্মী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাগরমন্থনে,
পারিজাতের ফুল তুমি গো, ফুটলে ভারত-নন্দনে।

* * *

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তা ঝুরির শতেক ডোর,
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,—
তোর কোহিনূর কাড়বে কে বল? নাগাল না পায় কেউ হাতে।
বিশ্ববাণীর মৌচাকে তোর চুয়ায় যশের মাক্ষি গো,—
দূর অতীতের কবির গীতি তোর সুদিনের সাক্ষী গো।
নানান ভাষা পূর্ণ আজও, বঙ্গ! তোমার গৌরবে,
ভার্জ্জিল এবং শ্রীকালিদাস যোগ দিয়েছেন জয় রবে।
কহ্লনে তোর শৌর্য্য-বাখান্, বীর্য্য মহা-বংশময়,
দেশ বিদেশের কাব্যে জাগে মূর্ত্তি তোমার মৃত্যুঞ্জয়।"

উদ্দীপিত করিয়া তুলিবে। তাঁহার "চরকার গান" 'চরকার সুরে-সুরে বাঙ্গালীর প্রাণে আশার হিল্লোল জাগাইয়া তুলিবে। আজ নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণে শক্তির সাধক, বাঙ্গলার চারণ-কবির অকাল-বিয়োগ—দেশবাসীর দুর্ভাগ্য। দেশপ্রীতির প্রবল আকর্ষণে তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ধন বিরাট পুস্তকাগারও সাহিত্য-পরিষদের মধ্যবর্ত্তিতায় সাহিত্য-রসপিপাসু সুধিমণ্ডলীকে দান করিয়া গিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সাম্যমন্ত্রের প্রচারক। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন।—

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
একই পৃথিবীর স্তন্যে পালিত,
একই রবি শশী মোদের সাথী।
* * *
বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতী, তিলি, মালী সমান ভালো।
বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে'
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।"

শূদ্রও তাঁহার নিকট হেয় নয়,—বরং অশেষ সম্মানী।

"শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
শূদ্র অতুল এ তিনলোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার ও গো
শূদ্র দেখোনা বক্র চোখে।"

ইহা কবিজনোচিত আন্তরিকতার পরিচায়ক। তিনি সাম্যের মঙ্গল-যজ্ঞে "হোমশিখা" প্রজ্জ্বলিত করিয়া যে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়া জগৎকে জয়শ্রী মণ্ডিত করুক।

"ভাই সে আবার আসুক ফিরিয়া ভাইয়ের
আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাসনে।
সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত্, মানুষের পথ, এক হোক
পুনরায়।
সমান হউক আশা অভিলাষ, সাধনা সমান
হোক্,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্তলোক।"

যদি কখনও জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে সাম্যযজ্ঞের এই নবীন পুরোহিতকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতে হইবে।

কবি, সত্যশিবসুন্দরের উপাসক। যাহা মিথ্যা ওন্ছ ছলনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিরুদ্ধে তিনি চিরদিনই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। কবি, সমাজ-শিক্ষক ;—সমাজের ত্রুটি সংশোধন করিতে তিনি স্বায়তঃ বাধ্য। সত্যেন্দ্রনাথ কখনও ভণ্ডামী সহ্য করিতে বা সমাজের ত্রুটিগুলিকে মার্জ্জনার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। অন্যায় দেখিলেই তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

"উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি
আম সহ
একাদশীর বিধানদাতা, করেন
একাদশী",—

আর ক্ষীণকায়া, নিত্য একাহারী, বৈধব্য-যন্ত্রণাদগ্ধ কচি মেয়ের তৃষ্ণায় প্রাণ বিদীর্ণ হইলেও তাহার জন্য এক ফোঁটা জলের ব্যবস্থা নাই, ধর্ম্মের নামে এ অধর্ম্ম অসহনীয়। তাই গভীর দুঃখে তিনি বলিয়াছেন,—

সুজলা এই বাংলাতে হায় কে করেছে
সৃষ্টি রে—
নির্জ্জলা ওই একাদশী কোন্ দানবের দৃষ্টি রে!
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল
বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ
ভষ্মশেষ।

* * *

কচি মেয়ের একাদশী—জল চেয়েছে
মার কাছে,
বাপ এসে তা' করবে আটক-ধর্ম্ম খসে
যায় পাছে।"

তিনি নির্ভয়ে স্মার্ত্তরঘুর ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা তাঁহার দৃঢ়তার ও অসীম সাহসীকতার পরিচায়ক।

স্মার্ত্ত রঘু! স্মার্ত্ত রঘু! শুনছ না কি
আর্ত্তরব?
দেখ্ছনাকি বাংলা জুড়ে বাড়ছে তোমার
অগৌরব?
শাস্ত্রগড়ার শক্তি নিয়ে হয়নি তোমার
জন্ম হায়,
পরের উঞ্ছে পেট ভরেছ পরের অন্নে
পুষ্ট কায়,
তোমার উঞ্ছ-সংহিতাতে নিজের মৌলিকত্ব
কই?
মাথায় তোমার পড়ছে ভেঙে ঊনিশ মুনির
মন্যু ওই!"

নৈরাশ্যে যখন স্নেহলতা এই সমাজের বুকে মৃত্যু-সয়ম্বরা হইলেন, তখন কুমারীদের মর্ম্মন্তুদ বেদনায় সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষুব্ধ-হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া জানাইয়াছিল,—

"মানুষ যখন হয় অমানুষ, আগুণ তখন
শরণ ঠাঁই,
মৃত্যু তখন স্নিগ্ধ পরম, তাহার বাড়া বন্ধু নাই।
মানুষ যখন দারুণ কঠোর আগুণ তখন
শীতল হয়,
ব্যথায় অরুণ তরুণ হিয়া মৃত্যু মাগে
শান্তিময়।"

সামাজিক কতকগুলি কদর্য্য প্রথার প্রতিকার চেষ্টায় তিনি তাঁহার শাণিত অস্ত্র নৈতিক অধঃপতনের বিপক্ষে চালিত করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। তিনি বিদ্রূপের হলাহল ঢালিয়া লজ্জা-সম্ভ্রমহীন, তথা-কথিত শিক্ষিত নামধারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে দেখাইলেন,—

"বিয়ে করে কিনবে মাথা তাতেও হবে
ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ শ্বশুরকে চায়
'পুশ্' দিতে।
খুদ খেয়ে সব আছে শুয়ে দাঁতের ফাঁকে
খুদ সাঁধিয়ে,
আসবে শ্বশুর সোণাপাখী সোণায় দিবে
দাঁত বাঁধিয়ে।
চাই শ্বশুরের সোণার কাঠি সুপ্তভাগ্য
চিয়াতে,
চাই মানুষের বুকের রুধির জোঁকের ছানা
জিয়াতে।"

তিনি শুধু মক্ষিকার মত ক্ষত স্থান দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত নহেন,—ব্যাধির আরোগ্যের জন্য বিধি-ব্যবস্থাও করিয়াছেন!—

"বাঙ্গলাদেশের আশার জিনিষ! ওগো
তরুণ সম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের
পানে চায়;
নূতন আশা, নূতন বয়স, সবল দেহ,
সতেজ মন,
তোমরা কর শুভকাজে অশুভ পণ
বিসর্জ্জন।

তোমাদেরি দোহাই দিয়ে নিঃস্বজনে
দিচ্ছে চাপ,
পিতার সত্য পালন—পুণ্য, পিতার মিথ্যা
পোষণ—পাপ।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যাগ্রাহী—অন্যায়ের নির্ম্মম সমালোচক। "হসন্তিকার" পরিহাস কোন কোন স্থলে তীব্রতার মাত্রা অতিক্রম করিলেও, অনেক স্থলে এরূপ কশাঘাতের যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। তিনি হিন্দু সমাজের ত্রুটি-প্রদর্শক ছিলেন বলিয়া কেহ ভুল করিবেন না যে, তিনি অহিন্দু বা নাস্তিক ছিলেন। কবির "হোম-শিখার" অনেক কবিতায় বৈদিক ঋষির আচার-নিষ্ঠা আমাদের জীবনে জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভগবানের প্রতি তাঁহার অসীম নির্ভরতার ভাব "অভ্র আবীরের" "বৈকালী" কবিতায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি
তাই হোক ও গো
কিছুই রে'খনা বাকী,
উদ্বেল চিত্তে ডাকি।
দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু'নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন,
জীবন সাধন-ধন।"

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। এ মর্ত্ত-লোক তাঁহার নিকট রূপরসগন্ধময় আনন্দ নিকেতন। অনুরাগের "তুলির লিখনে" তিনি নন্দনবনবিলাসিনী 'বিদ্যুৎপর্ণা'র যে বিশ্ব-প্রীতির মধুর রূপ জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে শুধু ভাব-সম্পদেই অনবদ্য শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, উহাতে কবির গভীর বিশ্বপ্রেমদ্যোতনার আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

"আমি পরী অপ্সরী,
বিদ্যুৎপর্ণা—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন বর্ণা।
মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনমতে বই বধু,
স্বর্গের বর্গে।
চির চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের পজ্ঞো।"

এই বিশ্ব-প্রীতিই কবিকে কল্পনার পাখায় বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশের অধিকার ও গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার অমিত শক্তি প্রদান করিয়াছে। তাই তিনি দেখিতে পাইয়াছেন,—

"কালো মেঘের কোলটী জুড়ে আলো
আবার চোখ চেয়েছে!
শিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান
খেয়েছে।"

আবার "ফুলের ফসলে" অসংখ্য ফুলের সাথে বান্ধবতা করিয়া কবিকে সৌরভে বিভোর হইতে দেখিয়াছি। তিনি গুলে-স্তানের রূপবতী গুলাবকে সোহাগে বরণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া, কিন্তু নিরুকুলকে

আদরের সহিত বুকে টানিয়া লইতে কুণ্ঠা-বোধ করেন নাই। দরদী কবির নিকট সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় আকন্দফুলও দুঃখ জানাইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহার জীবন কাহিনী বলিয়াছে —

"স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ আলিঙ্গনে।"

লাজ-কুণ্ঠিতা কুমুদও মরমী কবিকে একান্ত আপনার জন মনে করিয়া হৃদয়-বাণী জানাইয়াছেন—

"অন্ধ ভ্রমর বন্ধ রয়েছে
মুদিত কমল বক্ষে,
জোনাকী আমার বন্ধু এসেছে
জ্যোছনা আহরি পক্ষে।"

যে পারিজাত ফুলকে বিশ্বের ফুলবনে না দেখিয়া কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, আজ ফুলের কবি সেই পারিজাতের দেশেই চলিয়া গিয়াছেন।

কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি কবি সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার মধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই, তাঁহার বাস্তবজীবনেও উহা প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার আচরণ, তাঁহার আলাপন, তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গন, তাঁহার কণ্ঠস্বর সবই সুন্দর ছিল। সুন্দর আলমারীকে সুন্দর সংস্করণের পুস্তক দ্বারা সুসজ্জিত করিতেও তিনি সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দের কবি। কোথাও আনন্দের সাড়া পাইলে বসন্তের নব-বিকশিত কুসুমের মত তাঁহার স্নিগ্ধ পেলব হৃদয়খানি উল্লসিত হইয়া উঠিত। তিনি ইরানী নওরোজের মহোৎসবে, উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রবাহে নিজকে স্রোতের ফুলের মত বিলাইয়া দিতে যেমন ইচ্ছুক, তেমনি স্বদেশের বারো মাসের তেরো পার্ব্বন-উপলক্ষে আনন্দোৎসবের সন্ধান করিতেও ব্যাকুল।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন যৌবনের বা তারুণ্যের কবি। অকুণ্ঠিত চিত্তে তরুণের জয়গান করা, তাঁহার কাব্য-জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল।

"আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—
আলো-ছায়ার আলিঙ্গন
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের
প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা! গানের প্রাণের
মাতৃকা!

এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও
রাজটীকা।"

সাধনা দ্বারা কবি হওয়া যায় না। কবি-প্রতিভা বিধাতার দান, কিন্তু সাধনা ব্যতীত কোন প্রতিভাই সম্যক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি সাধনা দ্বারাও সে প্রতিভাকে বিকশিত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি বহু সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভাব ছিল প্রচুর, ভাষা সম্পদ্ ছিল অনন্ত। অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। বৈদেশিক সাহিত্যের ভাব-রাজির মূল সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশীয় পরিচ্ছদে প্রকাশ করা, শক্তিশালী লেখক ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতযুগে বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক অক্ষয়কুমার দত্ত, অনুবাদ-সাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে তাঁহারই পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ,

উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতামহের সেই যশঃ-সৌরভলাভে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। কবির অনুবাদের সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—'অনুবাদ গুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি, আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্প' কার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য।" যিনি—

"বিশ্বাণীর বারতা বহিয়া বঙ্গের
সভাতলে,
ভরিয়া রেখেছে সোণার কলস নানা
তীর্থের জলে"—

তাঁহার সোণার কলস মঙ্গল-চিহ্ন স্বরূপ শান্তি-বারি বহন করিয়া ভারতীর দেউলে জাগিয়া রহিয়াছে, শুধু সেই একনিষ্ঠ সাধকের প্রীতি-প্রফুল্ল মুখচ্ছবির সন্ধান সেখানে পাই না। বাণীর নানা পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সত্যেন্দ্র নাথ যে বেণু বহন করিয়া আনিয়াছেন, বঙ্গ-বাণীর অঙ্গণ খানিকে তাহা চিরদিনই পবিত্র করিয়া রাখিবে; "চীনের ধূপ" বহুকাল মন্দিরে স্মৃতির সৌরভ বিতরণ করিবে; কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্দ্দৃষ্ট, সেই তীর্থব্রজক আজ অকালে বঙ্গবাণীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী, তাই দেশ বিদেশের বহু মূল্যবান্ মণি সংগ্রহ করিয়া ভারতীর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণির মালা পরাইয়া দিয়াছেন। সেই মণিমুক্তার দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া রহিবে, কেবল "মণিমঞ্জুষা"র সেই পাকা জহুরী আজ নিদ্রিত,—রত্নশালায় তাঁহার নিকষ পাথর খানি গুমরিয়া মরিতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতীর বুকের মাণিক। তিনি বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া কাব্য-সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ছন্দ তাঁহার হাতে আসিয়া, শতস্রোতা জাহ্নবীর ন্যায় শত ধারায় প্রবাহিত হইলেও, সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া গিয়াছে;—কোথাও প্রতিহত হইয়া পঙ্গু হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার অনাবিল ছন্দে বাঁধা পড়িতে আকাশের বিদ্যুৎপর্ণাও কবিকে সাধিয়া বলিয়াছে,—

গাও কবি! গাও গান
হে কিশোর চিত্ত!
কিশলয়ে কর দান
চুম্বন বিত্ত।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো,
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা ঘিরি ফিরি ফিরি
ফের করি নৃত্য।"

কোথাও তাঁহার নাচাড়ীছন্দ দুল্‌কী চালে পাল্কীর তালে তালে নৃত্য করিয়া ছুটিয়াছে,—

"পাল্কী চলে
পাল্কী চলে
দুল্‌কী চালে
নৃত্য তালে!

পাল্কী চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরী কত?
আর কত দূর?
আর দূর কি গো?
বুড়ো শিবপুর।"

এ ছন্দই আবার "দূরের পাল্লায়" তিন দাঁড়, তিন মাল্লার সাথে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। এ নাচাড়ী ছন্দ আবার তুষার বিগলিত পাগ্‌লাঝোরার উন্মাদ ভীষণ রুদ্রছন্দের

মত্ততার সহিত নিজকে গ্রথিত করিয়া বলিতেছে,—

"পিছল পথে নাইকো বাধা পিছনে টান
নাইকো মোটে,
পাগ্‌লাঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন
সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে ঝাঁপিয়ে পড়ে
উচ্চ হ'তে,
চড়বড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য করে
মত্ত স্রোতে।"

কোথাও "পিয়ানোর গানে" তাঁহার অসম চটুল ছন্দ সুর ধরিয়াছে,—

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
কোন্ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্ ফুল?"

কোথাও কবির নিপুন ছন্দ "জর্দ্দাপরীর" নূপুর নিক্কণের সাথে প্রাণ মিশাইয়া গান ধরিয়াছে,—

"জর্দ্দাপরী! জর্দ্দাপরী! হিরণ জরির্
ওড়না গায়
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে পাখ্‌না মেলে
যাও কোথায়?
যাই কোথায়?
হায় রে হায়!
সূর্য্যমুখী ফুলের বনে সূর্য্যকান্ত মণির
ভায়।"

কোথাও ছন্দ কাজরী সুরে রাগিণী ধরিয়াছে,—

"দোল্ দিল মোর মনে, ও গো!
তাই দোলে ভুবন!
শ্রাবণ দোলে পবন দোলে
দোলে সকল বন!
হৃদয়-দোলায় চল্‌ছে গো কার
আনন্দ-ঝুলন!
ঝুলন-মাতাল রাগ-রাগিণী
কাজরী নিমগন!"

কোথাও বা ছন্দ ফাল্গুন-মদিরায় বিভোর হইয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া ঢল ঢল সোহাগে গান গাহিতেছে,—

"ওই নিশান তুলে এল নতুন! তাজা!
এল ফাগুন বাজা ও রে বাজন বাজা!
এল মোহন রূপে
এল কখন্ চুপে
এই নবীন ভূপে তোরা রাখাল সাজা।"

কোথাও মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দ রাগিণী ধরিয়াছে—

"সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ,
দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চ'লে যাও—
অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।"

কোথাও বা মালিনী ছন্দে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি,—

"রাগিণী সে আজি মন্থর
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর,
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।"

কোথাও বা কবির ছন্দ প্রাণের আবেগে "কবর-ই-নূরজাহানে" মমতার অশ্রুজল ঢালিয়া স্নিগ্ধকরুণ সুরে গান ধরিয়াছে—

"হে সুল্‌তানা! লিখেছ এ কী আফশোষে
সুন্দরী!
লিখ্‌ছ তুমি 'গরীব আমি' পড়তে যে চোখ
যায় ভরি!—
গরীব-গোরে দীপ জেলনা ফুল দিওনা
কেউ ভুলে—

শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না
পায় বুলবুলে।"

কোথাও বা ছন্দ ধ্যানমগ্ন সাধকের ন্যায় উদাত্ত গম্ভীর সুরে মহাসরস্বতীর বন্দনা করিতেছে,—

"বিশ্ব-মহাপদ্মলীনা ! চিত্তময়ি ! অয়ি
জ্যোতির্ময়ি !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !"—

কিন্তু সর্ব্বত্রই কবির ছন্দ অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব ভাব ও ভাষার সম্প্রীতি। সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব তাঁহার মৌলিকত্বে। তাঁহার শব্দ ক্রীড়ার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। ইংরেজীতে যেমন দেখা যায়,

"Here it comes sparkling,
And there it lies darkling,
Rising and leaping,
Sinking and creeping",—

তেমনি বাঙ্গালায় সত্যেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন,—

ঝড় রুষিয়ে
ধায় দুষিয়ে
ফোঁসফুঁসিয়ে
খুব হুঁসিয়ার।

গাছ মট্‌কায়,
ডাল পট্‌কায়,
এই দুনিয়ার।"

ভবিষ্যৎযুগের আলোকপন্থীদের মধ্যে কেহ হয়ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দসরস্বতীর প্রিয় দুলাল, কেহ বা তাঁহাকে মানবতার কবি, কেহ বিদ্রোহের কবি, কেহ ফুলের কবি, কেহ তারুণ্যের কবি, কেহ আনন্দের কবি, কেহ সৌন্দর্য্যের কবি, কেহ স্বাধীনতার কবি, কেহ চারণ কবি বলিবেন; কেহ বা শুধু 'কবি' বলিয়াই সন্তুষ্ট রহিবেন। ভবিষ্যৎযুগের আলোকপন্থীরা তাঁহাকে কি সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিবেন, সে সম্পর্কে আজ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না।

সত্যেন্দ্রনাথ, রূপক কাব্যদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, ভাষার প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে গিয়া অনেক সময় ভাবের প্রতি সুবিচার দেখাইতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার রচনায় বৈদেশিক শব্দের অত্যধিক প্রয়োগ কবির পক্ষে সমীচীন হইয়াছে কি না, এ সকল আলোচনা করিবার সময় বা স্থান এ নয়।

আপনারা দেখুন, সত্যেন্দ্রনাথের দান সত্যশিবসুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেই তাঁহার কবি-জীবন সার্থক হইয়াছে। আর তাঁহার দান যদি আপনারা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ শোকসভার আয়োজন সার্থক হইবে।

চন্দ্রশেখর স্মৃতি-তর্পণ*

[শ্রীহেমাঙ্গ পদ বরাট]

বাঙ্গালার একটা স্তিমিতপ্রায় প্রতিভা নিভিয়া গিয়াছে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার মূক বাঙ্গালার মুখে যে কয়টি শক্তিমান পুরুষ ভাষা দিয়া চেতন হারা বঙ্গবাসীকে জাগ্রত করিয়াছিলেন, ভূ-লুণ্ঠিতা ভারতী অনন্যব্রত যাঁহাদের সেবা ও সাধনায় আজি মহিমময়ী বিশ্বভারতী রূপে জগৎ-বরেণ্যা, যাঁহাদের পূজোপচার মাত্র লইয়া কাঙ্গালের দল ধরায় জ্ঞানসত্র খুলিবার দুঃসাহসে উৎকণ্ঠিত তাঁহাদের অন্যতম চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়।— গত কার্ত্তিকের অমার আঁধারে নিখিলের অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। কাহারও নয়ন কোনে এক ফোঁটা জল আসিবেনা কাহারও বুকে আলোড়ন উঠিবেনা—চন্দ্রশেখর অমর!

বহরমপুরের একটি অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ব-দরবার সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ আসিলেও চন্দ্রশেখর-মনীষার বিকাশ, তাহার পুষ্টি, তাহার সাফল্য এই বহরমপুরে। চন্দ্রশেখর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া বহরমপুর 'বারে' প্র্যাকটিস্ সুরু করেন। ধাতে সয় নাই তাই ও কারবার তাঁহাকে তুলিতে হইয়াছিল নতুবা বাঙ্গালায় ত্রয়ী মিলন ঘটিত—রাসবিহারী ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এই তিনজনে। চন্দ্রশেখরের পাণ্ডিত্য ছিল—অগাধ এবং সর্ব্বতোমুখী! তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল— অসাধারণ—; বাল্যে পঠিত সীতার বনবাস বিয়াল্লিশ বৎসর বয়ক্রম কালে অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন।

তিনি সাচ্চা হিন্দু ছিলেন— বলিতেন 'আমি পরম হিন্দু কিন্তু ও ধর্ম্মের বথামি আমাতে নাই।' আর তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস? "ঈশ্বরে অবিশ্বাস, সে কি সুখের জীবন?" (উঃ প্রেঃ পৃষ্ঠা ৬) ইহার উপর অন্য কথা বাহুল্য মাত্র। জীবন তাঁহার বৈচিত্র্যময় না হইলেও তাহাতে ঘাত প্রতিঘাতের অভাব দেখি না তবে সে ঘাত ও প্রতিঘাত ছিল অনেকটা নীরব।

চন্দ্রশেখর বিবাহ করিয়া যাহাকে পান সে অপার্থিব নিধির অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদে মাথা তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়ে, সে মাথা তুলি তুলি করিয়াও আর তুলিতে পারেন নাই। স্ত্রী বলিয়া যে শতদল বুকে ধরিয়া আনন্দের অভূতপূর্ব্ব আস্বাদে উল্লাসস্ফীত হইয়া সারা-জগতে ইন্দ্রধনুচ্ছটা প্রতিফলিত দেখিয়াছিলেন সেই অমল শতদল ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাহারই রূপান্তরে বঙ্গবাণীর গলে দুলিতেছে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম! জগতে অতুল ও অভিনব এই গদ্য কাব্য—শব্দের ব্যঞ্জনা ও অলঙ্কারে ঝঙ্কৃত ও উচ্ছাসিত। এক অপূর্ব্ব ছন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে তার ভাব— নূতন হইতে নূতন-

* বহরমপুর চন্দ্রশেখর-স্মৃতি-সভায় পঠিত

তব ভাব লহরী ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিযাছে—। জীবন-সর্ব্বস্বহারা সংসারে বীতরাগ মলিন জনে আলিঙ্গনদানে, তাহার অবসন্ন প্রাণে সহানুভূতির প্রলেপ দিয়া সযতনে তাহার অবশ করে রাখী বাঁধিয়া এই শ্রীহীন সংসার তাহার কাছে নূতন করিয়া ধরে। রসিকের শিরায় শিরায়, কম্পন তুলিয়া দোলা দিয়া যায়, চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম চন্দ্রশেখরের দেহাবসানেই তাঁহার সমাপ্তি নহে। দেশে দেশে তাঁহার জন্যে উপাসনার মালা বিরচিয়া কাব্যমুগ্ধ নরনারী গাহিবে না কি?—

'তোমায় না দেখিতে ভালবেসেছি' তাই বলিতেছিলাম চন্দ্রশেখর অমর।

তিনি হারাইযাছিলেন, আমরা পাইয়াছি, ওগো কি সে পাইয়াছি? হায়! চোখের জলেও মানিক জ্বলে!! বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজে ইঁহার জীবন-কথার ঠাঁই না হইলেও একটা কথা বলিতেই হইবে যে চন্দ্রশেখরকেও 'নূতন সন্ন্যাসে'র 'আবর্ত্ত হইবার' ভ্রাতৃর বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আকাশে চাঁদ আর উঠে নাই, অন্ধকারে দীপ জ্বলে নাই— নদীতে নক্ষত্র নাচে নাই মরুভূমে কুসুম ফুটে নাই, মনুষ্যমুখে দেবজ্যোতি দেখিয়াছিলেন কিনা জানিনা, আর দেহত্যাগে হাসেন নাই চন্দ্রশেখরের হৃদয়-বীণা আর বাজে নাই —বাজিতে পারে নাই।

তাঁহার বৈচিত্র্যহীনজীবনে যে গরিমাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই খুঁজিয়া পাইতে আজ অনেকেই ব্যগ্র হইবেন। তিনি আপন জীবনী কোন দিন কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যে আজিকার বিস্মৃতপ্রায় চন্দ্রশেখরের অমূল্য অবদান সমালোচনার অতীত না হইলেও সে যে অপূর্ব্ব তাহা অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা কেহ রাখেন না ইহা সুনিশ্চিত। বাঙ্গালী লজ্জিত হইবে—লজ্জিত হইবে যে সে কণায় পরিস্ফুট মাত্র বিরাট প্রতিভার ন্যায্য সম্মান দিতে পারে নাই।

আভিজাত্য গর্ব্বোন্নত চন্দ্রশেখর অভাবের তাড়নায় কাহারও দ্বারে কোনও দিন অর্থী হইতে না পারিলেও মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু করা অবশ্য কর্ত্তব্য—, বাঙ্গালী চন্দ্রশেখরের প্রতি সে অবশ্যকর্ত্তব্যটুকু করিয়াও ধন্য হইতে পারেন নাই।

কাশিমবাজারাধিপতিকে ধন্যবাদ—একমাত্র তিনিই জরাজীর্ণ চন্দ্রশেখরের অনটনের দিনে একটা মাসিক বৃত্তি পাঠাইতেন।

চন্দ্রশেখরের মত মহাজন যে কোন জীবিত দেশে জন্মগ্রহণ করিলে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন—আর এ পোড়া দেশে তাহার বিপরীত। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যদি বলি—তাঁহার নিকট বাঙ্গালীর ঋণ বিপুল হইলেও বাঙ্গালী কিন্তু তাঁহার জীবন কালে তাহার কোন প্রতিদান দেয় নাই। আজি তাঁহার নিঃশব্দ তিরোধানের পর তাঁহার চিকিৎসা ও তাঁহার শুশ্রূষার ত্রুটি বেদনা দিতেছে, সে ত্রুটির লজ্জা হইতে বাঙ্গালা নিস্কৃতি পাইবে কেমন করিয়া? বাঙ্গালায় প্রতিবৎসর সাহিত্য সম্মেলন হইতেছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অনুষ্ঠান আছে—কিন্তু চন্দ্রশেখরকে বাণীদেউল হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে—অজ্ঞাত ও অনেকটা অপরিজ্ঞাত ভাবেই। বরণীয় বাণী-পুরোহিতগণের প্রতি এ ঔদাসিন্য ও তাচ্ছিল্য চন্দ্রশেখরেই শেষ হইবে না কি?

কবি নিজে সাহিত্য রসিকগণের বিস্মৃতির যবনিকার আড়ালে পড়িলেও তাঁহার একটা

মহিমান্বিত স্মৃতি আছে ; 'কেমন করিয়া বলিব' বলিতে বলিতে যাহা বলিয়াছেন,—'জগৎশরীরে হৃদয় আছে কিনা পরখ করিতে গিয়া যে আর্ত্তনাদের ঝঙ্কার মোহন ছন্দে বাজিয়াছে—মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দানে—, তাহার মোহ, রূপের মোহ, ধনের মোহ তাহার জ্ঞানের মোহ—তাহার সাফল মোহকে তীব্র ভর্ৎসনায় যে অট্টকলহাস্য উঠিয়াছে— জগৎকারণের নিষ্ঠুরতা ঘোষণা করিতে গিয়া যে নব নব অধ্যাত্ম প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জাহ্নবীর কুল্ কুল্ তানে কণ্ঠ মিলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে না বল খল খল নিনাদে যে উচ্ছ্বসিত রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে এই সবগুলি লইয়াই সেই স্মৃতি।

আবার বলি—অমর চন্দ্রশেখর। পিছনে তাঁহার যে অভ্রভেদী কীর্ত্তি মিনার।—

বিরহী বুকের ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত রচিত—বিয়োগ-বিধুর হিয়ার একটা গৌ রক্ত-স্রাব—যুগে যুগে বিশ্বের সকল কান্তাহারার প্রাণ স্পর্শ করিবে। তাহাদের বেদনাতুর প্রাণে সুধা বর্ষিয়া যাইবে—মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক শিহরণ সৃষ্টি করিতে থাকিবে—ভাগীরথী সৈকত বায়ুর সঙ্গে মিশান প্রেম তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—অদ্ধোন্মত্ত চন্দ্রশেখরের বিস্ময় বেদন—তাঁহার উদভ্রান্ত প্রেম।

পদ্মানশিলা

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

সকাল বেলা বেশ পরিষ্কার রোদ উঠেছে দেখে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। রেল লাইনের ওপারে শাল বনের মাঝখানে সুন্দর একটি ঝর্ণা আছে শুনেছি, তাই লক্ষ্য করে যাওয়া গেল।

অনেক দূর অবধি সর্ষের ক্ষেত সূর্য্যের আলোয় সোনার মতন চক চক করছে। আকাশের কোলে সাদা সাদা মেঘের গায়ে নীল রংয়ের তুলিতে কেউ পাহাড়ের ঢেউ এঁকে গেছে।

মধুপুরের এ অঞ্চলে লোক জনের বসতি একেবারেই নেই। 'সঙ্গ' [illegible] [illegible] ডেতালী মেয়েরা কাঠ্‌ন বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে। শালবনের আড়ালে ঝর্ণার কলধ্বনি শোনা গেল। ক্রমে বড় বড় পাথরের স্তূপ নজরে পড়ল।

ছোট একটি নদী ছোট একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলেছে, রাশি রাশি ভাঙা পাথরের ফাঁক দিয়ে বয়ে এসে শেষে একটা জায়গায় দু'হাত নীচে মাটির উপর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে—তারই নাম ঝর্ণা। [illegible] নর্ম্মদা কিম্বা উস্ত্রী কিম্বা [illegible] দেখেছে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনখানে-না আসে। [illegible]

জায়গাটার বেশ [illegible] স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে। একটা উঁচু জায়গায় উঠে গিয়ে ফোকাস্ করতে লাগলুম। ক্যামেরার ভিতর দেখা যাচ্ছিল,—পাহাড়ের খানিকটা, নদীর খানিকটা উঁচু পাড়ের ওপরে ধান ক্ষেতের খানিকটা, নীল আকাশের খানিকটা। সামনে একটা ছাগল ছানা গাছের পাতা চিবুচ্ছিল, ওপারে গাছের ডালে একটা সবুজ রঙের পাখী শিষ দিচ্ছিল।

ক্যাপ খুলে দিলুম। এক দুই তিন— ছবি উঠে গেল।

হঠাৎ দুটি মেয়ের গলা পাওয়া গেল— ওমা, এখানে ফটো তোলা হচ্ছে। [illegible] সঙ্গে আরও অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে [illegible] এগিয়ে এসে মজা দেখতে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে যে বড় তার বয়স বোধ হয় এগারো কি বারো।

তাকে জিগেস করলুম—তোমরা কি [illegible] দেখতে এসেছ?

হাতের ফুলের গোছা নাড়তে নাড়তে মেয়েটা জবাব দিলে—হ্যাঁ চলুন না, ঐ দিকে আমাদের চড়ুইভাতি হচ্ছে, দেখবেন।

ক্যামেরার সরঞ্জাম সব ব্যাগের মধ্যে রাখতে রাখতে আমি জিগেস্ করলুম—শুধু দেখব, কিছু খেতে দেবেনা?

মেয়েটি হাসলে, কিছু বল্লে না। কিন্তু তার ছোট ভাই চেঁচামেচি করতে লাগল— হাঁ হ্যাঁ খেতে দোব, আসুন।

আমরা এগিয়ে চললুম। নদীর মুখটা যেখানে বাঁদিকে বেঁকে গেছে, সেই জায়গায় একটা বড় পাথরের উপর কতকগুলো নুড়ীর সাহায্যে উনুন তৈরী হয়েছে। সেইখানে রান্না হচ্ছে। অন্যদিকে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে শতরঞ্চি বিছিয়ে মেয়েরা তাস খেলছে। তারই পাশে একটা গাছের ডালের ওপর চড়ে বসে দুটি ছেলে তারস্বরে চীৎকার কচ্ছে:—

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?

আমার হাতে ব্যাগ দেখে, তাদের এক জন জিগেস করলে—ওর মধ্যে কি আছে মশাই? বললুম—ক্যামেরা।

আপনি ফটোগ্রাফার নাকি? বলেই সে তড়াক করে নেমে পড়ল।

ততক্ষণে মেয়েদের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘোমটা টেনে দিয়ে কেউ ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন, কেউ বা রান্নার জায়গায় তদারক করতে উঠে গেলেন।

ছেলেটি বললে—বৌদি, আমাদের চায়ের আর কত দেরী? তিনকাপ এদিকে পাঠিয়ে দাও, নীরোদ খাবে, আমি খাব, এ ভদ্রলোক খাবেন।

বৌদিকে দেখে মনে হল—ষোড়শী, কি সপ্তদশী। মাথার কাপড়টা ডানহাত দিয়ে একটু তুলে দিয়ে বৌদি জবাব দিলে—চা হয়ে গেছে, পাঁউরুটি গুলো টোষ্ট করে, দিচ্ছি।

তখন আমরা দুজনে আলাপ করতে বসলুম। পরিচয়ে জানা গেল, তার নাম শরৎ এবং সে এবছর হল বি, এস, সি পাশ করেছে। চাকরীর বাজারে কোন সুবিধে করতে না পেরে উপস্থিত বিলেত যাবার মতলব করেছে। সেখান থেকে ঘুরে এসে যে কি করবে সে সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যাচ্ছেনা, তবে খুব বড় রকম যে একটা কিছু হবে, তাতে সন্দেহ করবার কি আছে?

আমি বললুম—কিছু না।

ছেলেরা ওদিকে আলুভাজা দাও, আর একটু মোহন ভোগ দাও—বলে বৌদিকে বিরক্ত করছে। মেয়েরা তাস তুলে রেখে গোলকধাম পেতে বসেছে।

একহাতে চায়ের বাটি, আর একহাতে পাঁউরুটি আর ডিম নিয়ে এসে বৌদি বললে, —ধরুন।

চা আমার সহ্য হয়না, কিন্তু বৌদিকে 'না' বলতে পারলুমনা। এ কায়দাটা বাংলা উপন্যাস থেকে শিখেছি। সবাকে চা দিয়ে বৌদি শরতের দিকে চেয়ে জিগেস্ করলে— ওঁর কাছে আর প্লেট আছে?

আমি বললুম—হু না আছে, কেন?

একটিবার মাত্র আমার দিকে চেয়ে বৌদি বললে—বলছিলুম, আমাদের একখানা গ্রুপ হলে হয়না, এখানে আজকের দিনটা তাহলে বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকত! অবশ্য যা খরচ পড়বে আমরা দোব।

আমি বললুম—খরচের জন্যে ভাবতে হবেনা বৌদি, সকলকে ডেকে বসিয়ে দাও, আমি তুলে নিচ্ছি। এত পরিচিত স্বরের জবাবে বৌদির মুখখানা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল।

শালবনের ছায়ায় ছায়ায় তিনসারে সকলে বসে গেল। কার মুখটা কোনদিকে ঘোরালে মানান সই হয়, কার সামনের চুল কপালের কোন্খানে পড়লে ভালো দেখতে হয়, সে আর কাউকে বলে দিতে হলনা। সোণার শাঁখা, পেতলের আংটি, হাতের ঘড়ি, পকেটের রুমাল ভালো করে দেখাবার লোভ সকলেরই হচ্ছিল দেখলুম। শুধু বৌদি বসেছিল, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে। ভালো দেখাবার চেষ্টাটুকুও যেন ছিল না।

ফটো তোলা হয়ে গেলে আমি বললুম —তাহলে চললুম বৌদি।

বৌদি ব্যাগটা হাত থেকে নাবিয়ে রেখে বললে,—তা কি হয়? আপনি এতটা পরিশ্রম করলেন আমাদের জন্যে, না খাইয়ে কি ছাড়তে পারি? বসুন একটু, বেশী দেরী হবে না।

খাবার যখন আয়োজন হল,—তখন দশটা বেজে গেছে। আমার পাতা করে বৌদি বললে—নতুন ঠাকুরপো, লজ্জা করবেন না যেন।

খাওয়ার শেষে দেখা গেল, আমায় দেখে সঙ্কোচ করবার সেখানে কেউ নেই, আমি অত্যন্ত পরিচিত হয়ে গেছি। সেদিনকার মতন বিদায় নেবার সময় সকলেই বলে দিলে ছবিটা কেমন উঠল, দেখাতে যেন ভুলে না যাই। পরদিন বিকেলে ছবি দেখাবার জন্যে বৌদিদের বাড়ীতে হাজির হলুম। পাথরচাপটির শেষে নদীর ধারে ছোট্ট বাংলা, ফটকের গায়ে লেখা—পল্লীশ্রী। লাল সুরকির রাস্তা যেখানে বারান্দার কাছে শেষ হয়েছে সেইখানে হারমোনিয়ম্ বার ক'রে এনে বৌদি বাজাচ্ছিল—

যাই যাই দেখি যদি পাই!
আলোকে আঁধারে নিশিদিন ধরে
অন্তরে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াই॥

আমাকে দেখে থতমত খেয়ে এগিয়ে এসে বললে—আসুন, স্বাগত! ফোটো এনেছেন নাকি?

তিনখানা ছবি হাতে তুলে দিলুম। একে একে বাড়ীর সকলেই বেরিয়ে এসে ছবি কখানা নিয়ে দেখতে লাগল। লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল, যে যার নিজের ছবির দিকেই চেয়ে আছে।

হারমোনিয়মটা সরিয়ে রেখে বৌদি বললে,

—সুন্দর উঠেছে, খঞ্জপাদ ! এখন চলুন, চাটা খেয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্।

পাত্তাবাহারি গাছগুলোর পাশে বেয়ারা চেয়ার পেতে দিয়ে গেল। চায়ের কাপ সবে মুখে তুলেছি, এমন সময় কোথা থেকে কাদের বাড়ীর একদল মেয়েরা এসে হুড় হুড় ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে লাগলেন। বেরবার সময় বাড়ীর সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দিব্যি সব সরে পড়লেন, শুধু গেল না বৌদি।

আমি বললুম—তুমি যে বড় গেলেনা বৌদি ?

অতিথিকে ফেলে কি করে যাই !—বলে বৌদি দরজার কাছ থেকে জুতোটা নিয়ে পরতে লাগল।

* * *

নদী পার হয়ে দুজনে এগিয়ে চললুম। মাঠের শেষে সূর্য্য তখন ডুবছে। নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। অনেক দূরে একটা গোলার ঘরের পাশ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওধারে রেলের লাইন দেখা যাচ্ছে।

একটা বটগাছের তলায় বসে বৌদির সঙ্গে কথা কইতে লাগলুম। কি সরল সুন্দর স্বভাবটি বৌদির। এই রকমের নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা, বাংলার সকল ঘরে কেন দেখতে পাইনা ? হঠাৎ বৌদি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—নতুন ঠাকুরপো, চলুন ভাই, অন্ধকার হয়ে আসছে।—তখন বাড়ীর দিকে ফেরা গেল।

একেবারে এসে ছাতের ওপর ওঠা গেল ঈজি চেয়ারটায় আমায় বসতে বলে বৌদি নীচে নেবে গেল। কালো আকাশের গায়ে তখন শীর্ণ চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

বৌদি ফিরে এল, হাতে একখানা টেলিগ্রাম।—ওকি বৌদি ?—বলে আমি উঠে বসলুম।

—আমরা কাল যাচ্ছি নতুন ঠাকুরপো

—কেন, হঠাৎ ?

—আমার ছোট্ট ঠাকুরপোর বিয়ে।—ও কার টেলিগ্রাম ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বৌদি বললে—এ আপনার দাদা করেছেন।

দুদিনের আলাপ কিন্তু চলে যাবে শুনে ভারী মন খারাপ হয়ে গেল।

—আজ আমি উঠি বৌদি—বলে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

—আচ্ছা আসুন তবে। কিন্তু কলকাতায় গেলে আমার শ্বশুরবাড়ীতে একদিন নিশ্চয় আসবেন !

—নিশ্চয় তা আর বলতে ! ঠিকানাটা কি ?

ঠিকানা জেনে নিয়ে আমি বিদায় নিলুম। ফটকের কাছ অবধি পৌঁছে দিয়ে বৌদি বললে—আমাদের ফোটোর আরো দুকপি আমাকে দিতে পারবেন ? আমার দরকার আছে।

—আচ্ছা দোব কলকাতায় গিয়ে।

বৌদি দাঁড়িয়ে রইল—ডাবিকেল হাতে। আঙুলে জড়ানো আঁচলে সন্ধ্যার বাতাস এসে লাগছিল ! চমৎকার !

পনেরোদিন বাদে বুকভরা আশা নিয়ে বৌদির কলকাতার বাড়ীর খোঁজে বেরুলুম। কি বলে আজ কথা আরম্ভ করব কেবলি তাই ভাবছিলুম।

বাড়ীর দরজায় নীরোদ দাঁড়িয়েছিল বললুম—ভাই বৌদিকে বল তাঁর ছবি এনেছি। খানিকক্ষণ পরে একটি ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে বললে—বৌদি ছবিগুলো দেখতে চাইলে দিন্।—দিলুম।

কতক্ষণ বসবার পর একজন চাকর এক হাতে চা আর একহাতে আজারের খাবার

ভরা একখানা রেকাবী নিয়ে এসে টেবিলে রাখলে, সঙ্গে সঙ্গে নীরোদ এসে বললে— একটু মিষ্টিমুখ করুন বৌদি বললে।

বৌদি কোথায়? কি করছে?

—বাড়ীর ভেতর কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত আছে।— আর বলবার কিছু ছিল না। তাহলে আসবে না? 'বৌদি' কখনো হয়নি তাই এই পাতানো বৌদির সম্পর্কটা গোড়া থেকেই কত মিষ্টি বোধ হচ্ছিল। হঠাৎ চমক ভাঙে। কোথায় কার বাড়ী বসে কেবল দাবী করতে এসেছি? দিনের অনেকখানি সময় আমার ভাবীকালের অন্ধকারে কেটে যায়, এতখানি ভুল করা তাই বোধ হয় আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়!

ভেবে বাহিরে বাবুকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বলে নীরোদ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল! বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে ছাতা ছিল না তবু আমি বেরিয়ে পড়লুম। চা জুড়িয়ে যাবে, মুখের খাবার পড়ে রইল তা দেখে বৌদি কি মনে করবে তা ভাববার আমার অবসর ছিল না, মায়ের হাতের তৈরী খাবারের জন্য আমার মন তখন বাড়ীর দিকে ছুটেছে।

পাড়াগাঁ

[শ্রীনিতাইহরি ভট্টাচার্য্য]

পল্লীগ্রামের অপভ্রংশের নাম পাড়াগাঁ। পাড়াগাঁ কথাটী অতি ক্ষুদ্র বটে আর বাহ্যসৌন্দর্য্যে অর্থপ্রাচুর্য্যে বর্ত্তমান নগর-নগরীর সহিত তুলনা ক'রলে এর কোন স্থানই খুঁজে পাওয়া যায়না তাও সত্য। কিন্তু তথাপি জিনিষটা মোটেই উপেক্ষার নয়! বন জঙ্গলে পূর্ণ হ'লেও, হিংস্রশ্বাপদাদির লীলা নিকেতন বলে পরিগণিত হ'লেও, বিশ্ববিদিত ম্যালেরিয়ার আবাসস্থান ব'লে বিবেচিত হ'লেও, এ একেবারে ছেড়ে ফেলবার বস্তু নয়! আজ বিংশ শতাব্দির সভ্যতালোকে আলোকিত না হলেও এ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। এর বনে জঙ্গলে থেকে এখনও দেখতে পাওয়া যায় অতীত সভ্যতার ক্ষীণ আলো মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে! দেখতে পাওয়া যায় যে হিংস্র শ্বাপদাদির সহিত বাস করে ব'লে সকলেই হিংস্র শ্বাপদ নয়। তাঁদের মধ্যেও এখনও এমন লোক আছেন যাঁরা হিংস্র শ্বাপদকে পোষ মানাতে পারেন—পাড়াগাঁয়ের লোকেই সহরের অধিবাসীদের তাঁর টুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারেন—পাড়াগাঁয়ে থেকেই পৃথিবীব্যাপী সুনাম কিনতে পারেন! এই পাড়াগাঁয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের মত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, রামকৃষ্ণের মত দেবতার আবির্ভাব হয়, রামচন্দ্র, ঠাকুর,

থাকৃত আজ তার নিকট দিয়ে দিনভাগে যেতে ভয় করে—শরীর রোমাঞ্চিত হয়' হৃদয় কেঁপে ওঠে! অরণ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে পতিত গৃহ সমূহের স্তূপীকৃত ইট একত্র হ'য়ে ঢিবির আকার ধারণ ক'রেছে; আর মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরস্পর বিভক্ত বাসে মরা বাপে সেথান অধিবাসীদের বাস! এদের অবস্থা যে কি শোচনীয় তা বর্ণনা করার ক্ষমতা লেখনীর নেই! উপায়হীন, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন বলেই এখন তারা বাধ্য হ'য়ে এই বিজন বিপিনে প'ড়ে আছে! নতুবা কোন দিন এ স্থান ত্যাগ ক'রে পালাতো? যাদের ক্ষমতা আছে গাঁয়েব উন্নতি করবার মত পয়সা আছে তাঁরা বহু পূর্ব্বেই নিজ নিজ জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে পাড়া প্রতিবাসীদের পায়ে ঠেলে সহরে উঠে এসেছেন; আর এখানে এসে সময়ের গুণে ভগবানের কৃপায় বেশ দুপয়সার মালিক হয়েছেন! তাঁদের এখন সে প্রাণ নেই! গাঁয়ে ফিরে যাওয়া তো দূরে থাক্, ফিরে যাওয়ার কথাও তাঁদের কাছে তুললে তাঁরা আঁতকে ওঠেন, চখে আঁধার দেখেন— বাপরে! সেই বুনো দেশ, শৃগাল কুক্কুরের আড্ডা, বাঘ সিংহীর গুহায় কে পুনরায় ফিরে যাবে! আর যদিও বা বৎসরের মধ্যে এক আধবার যাওয়া যায় তার জন্ত অনর্থক আবার একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ইত্যাদি ক'রে লাভ কি? এই তো তাঁদের মত? গ্রামের উন্নতি তো পড়ে থাক, তাঁরা দয়া ক'রে একবার জন্মভূমিকে পদার্পণ ক'রতেও রাজী নন! তাতেও কেন [illegible] হ'য়ে যাবে! এইরূপে [illegible] সম্বন্ধিত আত্মীয় স্বজনের [illegible] আজ অনন্য পাড়ায় পরিণত হ'চ্ছে [illegible] পল্লীবাসীর

এক পেট পিলে যকৃৎ নিয়ে নিকর্ম্মা হ'য়ে অর্থাভাবে খাদ্যাভাবে শুশ্রূষা চিকিৎসা অভাবে দিন দিন ক্ষুণ্ণ প্রাণ হ'য়ে অকালে পরপারের যাত্রী হ'চ্ছে; আর যে কয়দিন বেঁচে থাক্‌ছে হা অন্ন হা অন্ন করে চেঁচাচ্ছে! পূর্ব্বে খাদ্য সামগ্রী পানীয় জলের যাও বা সুবিধা ছিল রেলওয়ের কৃপায় তাও আর নেই! রেলওয়ের সেতুর জন্য আজ নদী খাত শুষ্ক হ'য়ে ময়দানের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছে! পাড়াগাঁয়ে দ্রব্যসামগ্রী আর কিছু মাত্র মিলছে না! সব সহরে চলে যাচ্ছে; তার উপর দুর্ভিক্ষ দুর্মূল্যতা; আশু পাড়াগাঁয়ের কোন ব্যবস্থা না হ'লে আর কিছু দিন পরে তার আর চিহ্ন ও খুঁজে পাওয়া যাবে না! মধ্যে কংগ্রেস হ'তে "মাভৈ! ধ্বনি শুনতে পেলাম —Village improvement! Village improvement! রব কানে প্রবেশ করল; শুনলাম দলে দলে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা গিয়ে পল্লী-গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে পল্লীর মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী সুধা এনে দেবে—একটু আধটু কাজও হ'ল শুনতে পেলাম কিন্তু এমনি পাড়াগাঁয়ের দুর্ভাগ্য এমনি পল্লীবাসীদের দুরদৃষ্ট যে দুদিনে সে সব কোথায় শূন্যে মিশিয়ে গেল! আবার যে শীঘ্র কিছু হ'বে তাও আশা হয় না! কংগ্রেস আজ সকল কাজ ভুলে, সকল কাজ ছেড়ে দিয়ে Council entry নিয়ে ব্যস্ত! এখন কি আর পল্লী-গঠনের দিকে তার নজর প'ড়বে? Government এর কথাতো বাদ দিলাম! ও বিষয় কাগজ কলম নষ্ট ক'রে কোন ফল নেই! পূর্ব্বেকার [illegible] যে [illegible] গিয়েছে তা আর ভুলবার নয়! Reform হ'ল, Minister হ'ল, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Scheme পড়া গেল, বাস্ শেষ! এখন শোনা যাচ্ছে টাকা না হ'লে কিছুই হবেনা! —নিশ্চিন্ত!—বাঁচলাম! Reform „ এ অনেক পাওয়া গেল! আবার কি।

যাই হ'ক Government না তাকিয়ে থাকতে পারেন, কংগ্রেস অন্য কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারেন কিন্তু যাদের জিনিষ তাদের আর চুপ ক'রে থাকলে চলবে না! সব গিয়েছে এই তাদের পালা! এই মারণ যজ্ঞ যেমন ক'রে হ'ক আটকাতে হবে! বন্ধ ক'রতে হবে। তাদের অর্থ নেই সত্য, সামর্থ্য নেই সত্য, সাহায্য করবার বড় লোক নেই সত্য, চালাবার মত প্রকৃত নায়ক নেই সত্য তথাপি তাদের নিজেদের চেষ্টা ক'রতে হবে দিন দিন রোগে ক্ষীণ হ'য়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে যেমন ক'রে হোক বাঁচতে হবে। না থাক অর্থ! না থাক সামর্থ্য! না থাক বড় লোক! না থাক চালক! কিছু আসে যায় না। এখনও গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় লোক আছে—হোক্ অন্ধ, হোক্ খঞ্জ, হোক্ আতুর, সব এক হ'তে হবে; প্রাণে প্রাণে মিশে যেতে হবে। মনের শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, হৃদয়ের বল পুনরধিকার ক'রতে হবে—দৈহিক দুর্ব্বলতায় কিছু যায় আসে না মনের শক্তি থাকলে দেহের বল আপনি আসবে। মনের তেজ থাকলে দেহের জ্যোতি ফুটে বেরুবে। চাই প্রাণ—চাই মনের বল—চাই হৃদয়ের শক্তি, প্রাণের উৎসাহ, অন্তঃকরণের অধ্যবসায়! ধনী চাই না! ধনী লোক জগতের কোন্ কাজ ক'রে থাকে? দিবারাত্র আরাম কেদারায় বসে অন্নধ্বংস ক'রতে তারা অভ্যস্থ! অর্থ! অর্থের জন্য চিন্তা নেই! কাজে মেতে গেলেই অর্থ আপনি এসে দেখা দেবে! তারপর নায়ক—নায়ক নেই সত্য। কিন্তু নায়ক গ'ড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকেই নায়কোচিত গুণ অর্জ্জন ক'রবার জন্য মনে প্রাণে লেগে যেতে হবে।

মেয়ের মা-রূপ

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

খেয়ালের রাণী কন্যা আমার
জননী সেজেছে আজ,
বাহুডোরে বেঁধে মাটির পুতুল
পরায়ে নূতন সাজ।
ছেলে কোলে, ঐ দেয় মৃদু দোল,
চুমু খায় কভু তোলে গীতরোল,—
ছুটাছুটি খেলা ভুলে গেল নাকি,
নাহি কি কিছুই কাজ?

আঁখির গতিটি হয়েছে ললিত—
দেখি নাই কভু হেন;
নতমুখী হ'য়ে বসিয়াছে মরি,
সত্য জননী যেন।
মাঝে মাঝে কয় কত মধু কথা,
মা হওয়ার মাঝে এত মধুরতা!
কোথা ছিল এত স্থির লাবণ্য
চঞ্চল ছবি-মাঝ?

কর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ম্ম বলিতে কি বুঝিলাম? কর্ম্ম শক্তির বিকাশ। প্রকৃতির উপাদানে কর্ম্মের অভিব্যক্তি, কর্ম্ম চিত্তের বৃত্তি। কিন্তু কি ভাবে বিকাশ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শক্তির কি ভাবে বিকাশ, তাহার আলোচনা আবশ্যক। ধর্ম্ম কর্ম্মের অঙ্গ। যাহা ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। কর্ম্মই ধারণ করিয়া রাখে, কর্ম্মের অন্তরেই ধর্ম্ম। কর্ম্ম বৃহত্তর, ধর্ম্ম তাহার অন্তর্ভুক্ত। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সমানার্থক ধরিয়া লইতে পারি। ধর্ম্ম' কি? বৈশেষিক দর্শনকার ধর্ম্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সঃ ধর্ম্মঃ"—যাহা হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি এবং মোক্ষ সংসাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম! ধারণের বস্তু—ধর্ম্ম আশ্রয়—যাহাকে আশ্রয় করিলে স্বরূপে অবস্থান তাহাই ধর্ম্ম। মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনি বলিতেছেন "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" যাহাতে পুরুষার্থ প্রয়োজনে প্রবর্ত্তনা করে, তাহাই ধর্ম্ম। চোদনা ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক যাহা দ্বারা লক্ষিত হয় তাহাই লক্ষণ। যেমন ধূম অগ্নির লক্ষণ, চোদনা দ্বারা প্রবর্ত্তনা দ্বারা যাহা লক্ষিত হয় তাহাই অর্থ। তাহাই পুরুষকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিতে নিয়োজিত করে। চোদনা, ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, সকল প্রকার অর্থকেই বুঝাইতে সমর্থ। চোদনা বা প্রেরণাই কর্ম্মের বিকাশের হেতু, চোদনা ভিতরের কি বাহিরের? প্রেরণা অবশ্যই ভিতরের। শক্তির প্রেরণাই কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম, কিন্তু অধর্ম্ম বা বিকর্ম্ম একটী বস্তু, যাহা কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রেরণা তাহাতেও নিয়োজিত করে। এমতাবস্থায় অধর্ম্মকে বিকর্ম্মকে কখনই কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, এই জন্যই 'অর্থ' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, অনর্থ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে বা লক্ষ্য নহে, যাহা পুরুষার্থ যাহা লক্ষ্য তাহাতে যে পুরুষকে নিয়োজিত করে তাহাই ধর্ম্ম, প্রেরণা কর্ম্মের মূল, প্রেরণা অন্তরের, তাহা হইলে কর্ম্মকে ভাবনাত্মক ব্যাপার বিশেষ বলা যাইতে পারে, কর্ম্ম ভাবনাত্মক, ক্রিয়ার যে সংজ্ঞা পূর্ব্বে জ্ঞানবিচার প্রসঙ্গে দিয়াছি, "ক্রিয়াহিনাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপ নিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারা-ধীনাচ," বেদান্তভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় কর্ম্ম ভাবনাত্মক, পুরুষের চিত্তের ব্যাপার, এইজন্যই কর্ম্মকেই চিত্তের বৃত্তি বলিয়াছি, মীমাংসা দর্শনে বিধি নিষেধ ও অর্থবাদ এই তিনটী স্বীকৃত, বিধিই প্রেরক, বিধির বল ভিতরের, এই ভিতরের বোধই প্রবর্ত্তক, বৈদিক অনুশাসন অন্তরের বোধের উদ্রেকক মাত্র, ভাবনাই কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে, এই জন্যই ভট্টকুমারিল শাব্দীভাবনাকেই বিধি বলিয়াছেন, জৈমিনিরও ইহাই মত, প্রভাকর

মতে নিয়োগকেই বিধি বলিয়াছে, কিন্তু ইহা সমীচীন নহে, নিয়োগের কর্ত্তা কে? অন্তরেই কর্ম্মের বীজ, বৈদিকবাক্য সমূহ উত্তেজকমাত্র, নিয়োগের কর্ত্তা ভিতরে হইলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাই সঙ্গত হয়, যদি বাক্যসমূহ নিয়োজিত করে তাহা হইলে আমার অন্তরের প্রবর্ত্তনা ব্যতীত আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইব কেন? শত উপদেশও আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। তার্কিকগণ ইষ্টসাধনাকেই বিধি বা প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন, ইহাও সর্ব্বাঙ্গীন শোভন নহে, ইষ্ট হইবে ইহা বোধ থাকিলেও লোকে সে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে না অনেকেই পুণ্য কর্ম্মের ফল জানে কিন্তু সে কর্ম্ম কথনই করে না, অন্যায় জানিয়াও নিবৃত্ত হয় না অতএব কর্ম্ম ভাবনাত্মক উহা ভিতরের। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" তিনি আরও বলিয়াছেন "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়" 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" স্বভাবেই প্রবর্ত্তনা করে, কর্ম্ম স্বভাবজাত, কর্ম্ম বা ধর্ম্ম নিজের অর্থাৎ স্ব, শক্তির প্রেরণা বা ভাবনাই কর্ম্ম, শক্তির প্রেরনাই কর্ম্মের উন্মেষ, অনুশাসন বাক্যগুলি উত্তেজক বা সহকারী কারণ মাত্র। কর্ম্মে বিকাশের সূত্র পাইলাম, তাহা প্রেরণা বা চোদনা বা ভাবনা এই তিনটী শব্দের ভিতরে প্রথম দুইটা অর্থাৎ প্রেরণা ও চোদনা বাহিরের নিয়োগের অপেক্ষা করে, ভাবনা জিনিষটা অনেকটা পরিমানে অন্তরের, কিন্তু তাহাতেও বহির্বিষয়ের সংস্পর্শ আছে, অতএব তিনটী শব্দকেই একার্থ বোধক রূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়, ভাবনা বলিতে সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান বা ভাবনা মনে করিতে হইবে, ভাবনার ভিতর দিয়াই কর্ম্মের বিকাশ, শক্তিই কর্ম্মের মূল, শক্তিই ব্রহ্মের, অতএব কর্ম্মের মূলও ব্রহ্ম। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" কর্ম্মের কারণ বেদ, বেদ অক্ষর পুরুষ হইতে উদ্ভূত, অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন কর্ম্মের অন্তর পুরুষ তিনিই, তিনিই কর্ম্মের অন্তরের তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাঁহা হইতে কর্ম্মের প্রেরণা ও প্রকাশ, তিনি সর্ব্ব প্রকাশক বলিয়াই সর্ব্বগত, যজ্ঞে বিধি প্রাধান্যের জন্যই তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, বিধিই প্রেরনা, প্রেরণার স্থূল প্রকাশে, প্রকাশ তিনি, অতএব কর্ম্মের মূল তিনি, আর কর্ম্মের অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাখ্যফলেও তিনি, প্রবর্ত্তক ও মূলতঃ তিনিই, ফলও তিনি। শ্রুতিও বলিয়াছেন "অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বানি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ ধর্ম্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধর্ম্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্" প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম সকল প্রাণের মধু, মধুর ন্যায় মধু, আবার প্রাণিগণ এই ধর্ম্মের মধু, উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধই ধর্ম্ম ও প্রাণিগণের সম্বন্ধ আদান প্রদানই শাশ্বত নিয়ম; কর্ম্মই প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া রাখে, এবং প্রাণিগণ কর্ম্মকে অনুষ্ঠানে সজীব রাখে, "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্" ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষণ করে, আবার ধার্ম্মিক ধর্ম্ম রক্ষার্থাই জীবন উদ্দীপন করে, এই আদান প্রদানই মধুর, এখন এই ধর্ম্ম জিনিষটী কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন "ধর্ম্মশ্চ ব্যাখ্যাতঃ শ্রুতিস্মৃতি লক্ষণঃ জগদাদীনাম্‌ পিনিয়ন্তা বৈচিত্র্যকৃৎ পৃথিব্যাদীনাং পরিণামহেতুত্বাৎ প্রাণিভিরনুষ্ঠীয় মানরূপশ্চ"

ধর্ম্ম বলিতে শ্রুতি স্মৃতি বিহিত, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির নিয়ন্তা, পৃথিবী প্রভৃতির পরিণামের কারণ বলিয়া জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদক, প্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত পদার্থ, ধর্ম্ম বা কর্ম্ম মূলতঃ সূক্ষ্মরূপে নিয়ন্তা তাহাই জগতের বৈচিত্র্যতার কারণ তাহাই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, তাহাই জীবের চিত্তবৃত্তি, তাহাই জীবের অনুষ্ঠেয়, ইহাই কর্ম্ম শ্রুতি বলিতেছেন "এই ধর্ম্মের যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি অধ্যাত্ম ধর্ম্মে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল।"

সত্য ও ধর্ম্ম শাস্ত্র ও আচার, ইহাই অভেদে ধর্ম্মশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আচার গুলি প্রাণিগণের অনুষ্ঠান। আর নিয়ন্তা ও বৈচিত্র্য সম্পাদক বস্তুটীই সত্য, এই উভয়কে অভেদে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অদৃষ্ট বা অপূর্ব্বই ধর্ম্ম; ইহা সামান্য রূপে পৃথিবী প্রভৃতির প্রযোক্তা এবং বিশেষ রূপে কার্য্য কারণ সঙ্ঘাতের অধ্যাত্মের প্রযোক্তা, পৃথিবী প্রভৃতির প্রযোক্তাই ধর্ম্মের তেজোময় পুরুষ, আর কার্য্যকারক সংঘাতের প্রযোক্তা ধর্ম্ম ও তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, উভয়েই এক, অভিন্ন আত্মাখ্য ব্রহ্মই ধর্ম্মের অন্তরের অমৃত ময় পুরুষ, অতএব কর্ম্মের অন্তরের পুরুষ ব্রহ্ম। গীতায় ভগবান ইহাই বলিয়াছেন, "যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং" যাহা হইতে সমস্ত প্রাণি গণের কর্ম্মচেষ্টা তিনিই সর্ব্বব্যাপী আত্মা "যেন সর্ব্বমিদং ততম" কর্ম্ম বা ধর্ম্মের মূল ব্রহ্ম, কর্ম্ম শরীরের আত্মা ব্রহ্ম, কর্ম্মের শক্তি ব্রহ্ম শক্তি, কর্ম্মের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম, ইহাই কর্ম্মের মূল তত্ত্ব। এটুকু আরও বিশদভাবে আলোচনা আবশ্যক। কর্ম্ম তত্ত্বে তিনটী বিষয়ের আলোচনার দরকার। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রীয় বিহিত কর্ম্ম, অকর্ম্ম তূষ্ণীং ভাব বা মৌন, বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম, কর্ম্ম বলিতে এ ক্ষেত্রে সাধারণ শারীরিক স্বাভাবিক কর্ম্ম বুঝিতে হইবে না। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে তাহা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। কর্ম্ম বলিতে যে অংশে ধর্ম্ম বুঝায় তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় সেই উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে সমানার্থক বা একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্ম কি? অকর্ম্ম কি? ইহার তত্ত্বালোচনা অতীব দুরূহ ব্যাপার, কর্ম্ম ও বিকর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান ও বিন্যসংস্থান প্রতি পদ ক্ষেপে হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। বর্ত্তমানে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্বালোচনা করিব। ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ, তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"। বিদ্বান ব্যক্তিরাও কর্ম্ম কি ও অকর্ম্ম কি এই বিষয়ে মোহিত, প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, মুগ্ধ বলিয়া একদেশদর্শী হয অতএব তোমাকে আমি কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি, যাহা জানিয়া অর্থাৎ যে তত্ত্ব জানিয়া তুমি অশুভ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ভগবানের এই বাক্যে পাইলাম, কর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ব জানিলে সংসারের নিবৃত্তি, অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ বা মুক্তি লাভ হয়। মেধাবী ব্যক্তিরাও এবিষয়ে মোহিত, অতএব বিষয়টী দুজ্ঞেয়, ফল—শ্রেষ্ঠ ফল অর্থাৎ মুক্তি এই তত্ত্ব না জানিলে লাভ করা যায় না। অতএব তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্যকরণীয়। ভগবান্ আরও বলিতেছেন 'কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"। কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক, কর্ম্মের মূলসূত্র কি? কি প্রকারে করিতে হইবে? কর্ম্মের গতি বা পরিণতি

কি? অধিকারী কে? এই সকল বিষয় না জানিলে কর্ম্ম করিতে পা। যায় না। এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি তাহাও জানিতে হইবে, যাহা নিষিদ্ধ তাহা না জানিলে, এই নিষেধের কারণ জানা না থাকিলে এই নিষিদ্ধ কর্ম্মেও প্রবৃত্তি হইতে পারে, কারণ কর্ম্ম প্রবৃত্তি জীবের স্বভাবজ, অকর্ম্মই বা কি তাহা বুঝিতে হইবে, কারণ ইহাই কর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং অকর্ম্মেই কর্ম্মের গতি বা পরিণতি, অতএব কর্ম্মাকর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ অবশ্যই কর্ত্তব্য, কারণ "গহনা কর্ম্মনো গতিঃ" কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মের তত্ত্ব অতি বিষম, অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়। ভগবান্ একটী শ্লোকেই সমস্ত কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্মতত্ত্বের উৎপত্তি সার, স্বভাব উপরেই কর্ম্মের ভিত্তি উহাতেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। যাহা যাহার স্বরূপ যাহা যাহার যাথাত্ম্য তাহাই তত্ত্ব, মূলও যাহাতে পরিণতিও তাহাতে ইহাই তত্ত্ব, যখন মূল ও পরিণতি এক বা অভিন্ন হইল তখনই বুঝা গেল তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে। যেমন ঘট ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, পরিণতি মৃত্তিকায় ঘটের তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া গেল। সুবর্ণের কুণ্ডল, সুবর্ণই উপাদান সুবর্ণই পরিণতি, কুণ্ডলের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইল।

"অরু-বৌদি"

[শ্রীসত্যরঞ্জন বসু]

দ্বিতীয় স্তবক

(ক)

সংসারে এক জন অন্যের মন বুঝে সহানুভূতি ও ভালবাসা দিবা—বয়স বা বুদ্ধির কোন সংশ্রব এতে নাই। যে যত ভাল বাসিয়াছে, অন্যের হৃদয়ের কথা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়াছে! এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি কেবল ভালবাসারই জোরে পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে নহে। ইহা খাঁটি সত্য এবং জীবনে ইহা যে উপলব্ধি করিবার অবসর পায় নাই সে নিতান্ত অভাগা!

সুরথের জীবনে এই অনুভূতি এই ভালবাসার ন্যায্য পাওনা খুব তীব্র ভাবেই কাজ করিতেছিল। অরুণার চিঠিখানা পাইয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার চারিদিক হইতেই যেন এই কথাটাই সকলে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল "তোমার অন্যায় হইয়াছে—ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।" বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে সুরথের সেদিনকার কাজটা খুব অন্যায় হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু যেখানে প্রাণের সম্বন্ধ সেখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার বাহির হইতে করিলে চলিবে না। অন্তরে তাহার শাস্তি এবং বেদনা অনুভব করিবে।

সে যেমন আসিয়াছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই মেস্ হইতে বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু স্থির করিতে পারিল না কি করিবে। মানুষের মনে অনেক সময় এক একটা

সামান্য কারণেও এমনই ধাক্কা লাগে যে তাহার ফল কি ভাবে তাহার মধ্যে কাজ করিবে অথবা করিতেছে সে তাহা নিজে বুঝিতে পারে না। এবং ইহা হইতে এমনও ঘটিতে দেখা যায় যে তাহার মানসিক গতির অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সমপাঠী না হইলেও দীপ্তি ছিল সুরথের অন্তরঙ্গ। সুরথের অভাব অভিযোগ, মান অভিমান হইত ইহার সঙ্গেই; এবং সময় সময় দীপ্তির মাতাকেও এই সমস্ত বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতে হইত।

মেস্ হইতে বাহির হইয়া অনেক রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া সুরথ দীপ্তিদের বাড়ীতে হাজির হইল এবং সোজা দীপ্তির পড়ার ঘরে ঢুকিয়াই তাহার সাম্‌নে অরুণার চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

ছুটির পরে আসিয়া অবধি সুরথ উঁহাদের সঙ্গে দেখা করে নাই। তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরথের আগমনে ও লিপি ক্ষেপনে দীপ্তি একটু আশ্চর্য্যই হইয়া পড়িল। মুখ তুলিয়া চাহিতেই সুরথের অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া—যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে তাড়াতাড়ি সুরথকে বসিতে বলিয়া মাকে ডাকিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

লোকে এই সমস্ত বিষয় বড় আমলে আনে না—কারণ জীবনে দৈনন্দিন সংঘর্ষের মধ্যে প্রাণের বেদনা অনুভব করিবার অবসর কোথায়? তাই এক কথায়—বড় "সেণ্টিমেণ্টাল" বলিয়া ওসব বিষয়ের সমাধান করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু যাহারা এই মরম-রাজ্যের ওঠানামার মধ্যে একবার পড়িয়াছেন তাহারা ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না অথবা গ্রাহ্য না করিয়া স্বস্তিও পান না। দীপ্তি ছিল এই দলের; তবে সে সুরথের মত আপনার অনুভূতির, তাড়নায় এগাইয়া পড়িত না। বরং সে ইহাকে বাড়িয়ে একটা আকার দিয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইত!

"কিরে সুরথ মা'কে একেবারে ভুলে গেছিস্?—একবার কি এসে দেখা করতেও নেই।" বলিয়া দীপ্তির মা আগে আগে ঘরে ঢুকিতেই সুরথ ধচ্‌মচ্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়াই কি যেন বলিতে যাইতেছিল—তাহার বলার আগেই মা ফের বলিয়া ফেলিলেন—"আজ কিন্তু বাছা দুপুর বেলা না খেয়ে মেসে ফিরতে পারছো না—আমি খবর পেয়েই মনাকে দিয়ে তোমাদের মেসে সংবাদ দিয়েছি।"

এই অযাচিত স্নেহ ও করুণার আতিশয্যে সে সব ভুলিয়া গেল। তাহার অন্তরের গুরুভার যে কেমন করিয়া অন্তর্হিত হইল সে তাহা মোটে টেরই পাইল না। সে যেন আর আগের মানুষ রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সুরথকে লইয়া যখন দীপ্তি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তখন কথায় কথায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা জানিয়া লইল; এবং সুরথকে যখন মেসে রাখিয়া গেল তখন তাহার মনের কালিমা দূর হইয়া গিয়াছে; দীপ্তির প্রাণের তড়িৎ-স্পর্শে তাহার হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে জোড়্‌করে সেই অদৃশ্য শক্তিকে যাহার প্রসাদে সে আজ নব-জীবন লাভ করিল—তাহাকে প্রণিপাত করিল।

(খ)

সে দিন সন্ধ্যা হইতে হইতেই বাহিরের সমস্ত কাজ সারিয়া অরুণা নিজের ঘরে

আসিয়াছে। আজ কয়েকদিন যাবৎ সুব্রতের অল্প অল্প জ্বর। সুব্রত একটু চুপ করিয়াছিল, আস্তে আস্তে অরুণা আলোটা কমাইতেই "কে-ও" বলিয়া সুব্রত পাশ ফিরিল। "এখন কেমন ? জ্বরটা কমেছে ?" বিশেষ কিছু উত্তর না দিয়া অরুণাকে সে একটু জল দিবার জন্য বলিল।

সরকারী কলেজে চাকুরী করিয়া অল্প বয়সেই সুব্রত বেশ মোটা মাহিয়ানা পাইতেন। সহকর্ম্মিদের মধ্যে তাঁহার বেশ নাম ছিল; কলেজের ছেলেরাও তাঁহাকে অল্প দিনের মধ্যেই খুব আপন করিয়া লইয়াছিল। অসুখে পড়িয়া অবধি বন্ধু বান্ধব এবং ছাত্র মহল হইতে অনবরত তাহার খোঁজ করিতে আসিত বলিয়া দিনের বেলা অরুণা বড় বেশী খবর করিবার অবসর পাইত না। এই জন্য আজিকার সন্ধ্যায় স্বামীর একটু সেবা করিবেই বলিয়া তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই যে যাহা হাতের কাছে—সহজলভ্য সে দিকে মোটেই সে চায় না। অসম্ভব যাহা তাহার জন্যই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। সে আপন মনে বলিতেছিল—"সুরথটা আজ কাছে থাক্‌লে কত...যাক্‌ ......কপালে দুঃখ থাক্‌লে খণ্ডান খুব সোজা নয়।"

অরুণা পায়ের দিকে বসিয়া আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল; সে কোন কথাই বলিল না। তাহার নীরব প্রাণে কে যেন জোরে আঘাত করিল। অনেক অনুনয় করিয়াছে, কত মধুর করিয়া আহ্বান করিয়াছে—কত আক্ষেপ করিয়া চিঠি দিয়া সুব্রতের অসুখের সংবাদ জানাইয়াছে, কিন্তু সুরথ নিরুত্তর, সুরথ অবিচলিত। সুব্রতের কথায় অরুণা একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

"বৌদি' দরজা খোল"—অরুণার তন্দ্রা আসিয়াছিল সে ভাবিল বুঝিবা স্বপ্ন দেখিয়াছে। আর একবার ডাকিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। দরজা খুলিয়াই দেখে সুরথচন্দ্র হাজির। তাহাকে দেখিয়া অরুণা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। তাহার মুখে একটা নির্ভরতার ছায়াপাত হইল; কিন্তু মুখ নত হইয়া পড়িল। পায়ের ধূলা লইয়া মাথা তুলিতেই সুরথ অরুণার সহজ করুণ চাহনি ও ঠোঁটে মধুর হাসিতে কেমন যেন হইয়া গেল। যেন সে অনেক কালের পরে পাওয়ার মত আপনার অন্তরকে সঁপিয়া দিল। বক্‌ বক্‌ করিয়া অনেক কথা বলিবে বলিয়াই সে মনে মনে তর্জ্জমা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

"আমাদের কি এমন করিয়াই শাস্তি দিতে হয় ভাই ?" বলিয়া অরুণা কথা আরম্ভ করিল; কিন্তু সুরথ কোনও উত্তর করিতে পারিল না কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই করিল না তাহা বোঝা গেল না। সে আস্তে আস্তে খাটের দিকে অগ্রসর হইয়া মশারী তুলিয়া সুব্রতের গায়ে হাত দিয়া তাপ অনুভব করিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইতে বসিয়াছে। কাজেই অরুণা শুইবার জন্য সুরথকে বিশেষ তাগাদা না করিয়া একটু চা তৈয়ারী করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। সুব্রত সম্ভবতঃ একটু ঘুমাইতেছিল কাজেই সুরথের আগমনবার্ত্তা টের পায় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে অরুণা সুরথের জন্য চা লইয়া ফিরিয়া আসিলে সুব্রত যেন ঘুমের ঘোরেই বলিয়াই উঠিল—"আমাদের কি চা খেতে নাই ?"

(গ)

নেহাৎ গরীবের সংসার না হইলেও সুব্রতদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। ছোট বেলা হইতেই সুবোধ সুশীল ছাত্রের মত লেখা পড়া করিয়া সুব্রত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্তগুলি পরীক্ষা পার হইয়াছেন। সরকারী একটি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতে কেবল নিজের সংসার হইলে মন্দ চলিত না, কিন্তু ভগবান তাঁহার ঘাড়ে কর্ত্তব্যের বোঝা এমন করিয়াই চাপাইয়াছিলেন যে বেচারা কোনও মতে ঘাড় সোজা রাখিয়া চলিতে পারিতেছিলনা।

অসময়ে পরিবারের অন্য সমস্ত উপার্জ্জনক্ষম আত্মীয়গুলির তিরোধানে তাহাদের ছেলে পেলেদের ভরণপোষণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কেবল যে ইহাতেই তাহার নিষ্কৃতি ছিল তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঋণভার আপন স্কন্ধে লইয়া নাবালক গুলিকে শান্তিতে রাখিতে চাহিতে ছিল। এহেন সুব্রত কোনওদিকে সামাল দিতে না পারিয়া দিনের দিন ম্রিয়মান ও ক্ষুন্নমনা হইয়া পড়িতেছিল। সুব্রতের সাংসারিক এই অনটনের মধ্যেও সে আপনার দিকে কোনও প্রকার দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে নির্ব্বিবাদে দিন চলিয়া যায় এই জন্য উতালা হইয়া পড়িত! সুরথ কিন্তু এই মনোভাব সহজেই ধরিয়া ফেলিত ও যেমন করিয়াই হউক দাদাকে খুসী রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। ইহাতে অরুণা অনেক সময় সুব্রতকে মন্দ বলিত—"ছেলেমানুষ সুরথ তাহাকে কেন আবার আমাদের সংসারের অনটনের মধ্যে আনিয়া জড়াও—।" এই বাধা এবং আপত্তির মধ্যে কোনও ভাল মন্দ না বলিয়া সুরথ নীরবে দাদার প্রিয় কাজ সাধন করিয়া যাইত।

এই অভাব ও অভিযোগের মধ্যে তাহারা একটা সময় করিয়া লইয়াছিল যখন সংসারিক সুখ দুঃখ গুলিকে একেবারে মনের বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিত। রাত্রিটা ছিল এইসময়।

অনেকদিন হইতেই সুব্রত ও অরুণার মধ্যে সুরথকে জীবনে স্থায়ী করিবার একটা গোপন চক্রান্ত চলিতেছিল। সেদিন হঠাৎ রাত্রিবেলা এই কথা অরুণা উত্থাপন করিতেই সুরথ—"থাক্, থাক্. মেয়েমানুষের আর কোনও কাজনাই, কেবল বিয়ে বিয়ে করেই ব্যস্ত হয়'—ইত্যাদি বলিয়া কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল। এতকাল সুব্রত এবিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে সুরথের কাছে কোনও কথা বলে নাই। আজ কিন্তু সেও একটু. বলিল। কথাটা চলিতেছিল এর মধ্যে নীচেরতলা হইতে অরুণার ডাক পড়াতে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। ইহাতে সুরথ যেন আশু বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাহিরে সে যতই এবিষয়ে আপনার একান্ত অনিচ্ছা ও অনুপযুক্ততা বিষয়ে তর্ক করুক না কেন, অন্তরে কিন্তু এই অভিনব ব্যাপারটির কতরূপই যে সে কল্পনা করিয়া আনন্দে মসগুল হইত তাহা এক এক সময় অরুণার কাছে প্রকাশ করিতে চাহিয়াও থামিয়া যাইত।

আজ হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সে প্রথমতঃ লজ্জা পাইল—সুব্রত ধুয়া ধরিয়াছে বলিয়া। কিন্তু তাহার নিঃসঙ্গ এলোমেলো একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু সরসতা আনয়নের এই যে প্রচেষ্টা—ইহাকে সে কিছুতেই অবহেলা করিতে পারিতেছিল না। তাই অরুণা ফিরিয়া আসিলে সে নিজেই বলিয়া বসিল—"দেখ বৌদি'

তোমাদের যখন এতই সাধ তখন একটা জুটিয়ে দিলেই তো হয়। এত সাধ্য সাধনার কাজ কি?" "তবে দেখো যেন কেবল বাইরে সাধা না হয়।" অরুণা কিন্তু কথাটাকে ঠিকভাবে লইয়াই একটু চোরা হাসি হাসিয়া বলিয়া ফেলিল—"ঠিক যেন থাকে, তখন কিন্তু ফেরৎ দেওয়া চল্‌বেনা" "হ্যাঁ ভাই—!" বলিয়াই সুরথ ঘুমাইবার জন্য সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ঘ)

গেল বছর এম্‌-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া সুরথ এবৎসর প্রথম হইতেই খুব আঁটিয়া পিটিয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু মেসের হৈ চৈ হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে কেহ অব্যাহতি দিত না। ভোর থেকে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত চায়ের আড্ডা! দুপুরে কলেজে যাওয়া কিম্বা ঘুমান, বৈকালে —খেলা দেখা ইত্যাদিতে কাটিয়া যাইত। আবার সন্ধ্যার পর গল্পের আড্ডা পূর্ব্বাদমেই চলিত।

হঠাৎ তাহার এই দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর একটু ব্যাঘাত ঘটিল। কেন?—ইহার একটু ইতিহাস আছে।

মেসের যে ঘরে সুরথ আপনার আড্ডা গাড়িয়া ছিল তাহার পশ্চিম দিকের জানালার নীচেই ছোট একখানা দোতালা বাড়ীতে ভূধর চক্রবর্ত্তী বলিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করিতেন। ঐ জানালায় দাঁড়াইলে উক্ত ভদ্রপরিবারের ঘরকন্না সবই দৃষ্টিগোচর হইত। পাশের বাড়ী বলিয়া এই পরিবারের সহিত মেসের ছেলেদের বেশ জানাশুনা ছিল। দু'একটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে সর্ব্বদাই মেসে আসিয়া ছেলেদের খোঁজ রাখিত।

আজ বিশেষ বেলা হইবার পূর্ব্বেই এই বাড়ীতে গোলযোগ শুনিয়া পাশের জানালা খুলিয়া সুরথ ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া ছিল। দেখিল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন আর তাঁহার বিধবা ভগ্নী বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন। ব্যাপারটি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে আস্তে আস্তে কি ভাবিতে ভাবিতে ঐ বাসার বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

কেন জানিনা সুরথের মনে একটা কোমল করুণ ভাব উদয় হইয়া ক্লেশ দিতে ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিধবা ভগ্নীর একটি বিবাহোপযোগী কন্যা আছে, অনেক চেষ্টা করিয়া একটি বর জুটাইয়াছেন, কিন্তু দেনা পাওনা লইয়া কিছুতেই মিটিতেছেনা। আজ খবর পাঠাইয়াছে বরকে সোনার ঘড়ি চেন না দিলে বিবাহ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই এই কান্নাকাটি।

সুরথ নিঃশব্দে এইকথা গুলি শুনিল এবং কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন মনে বলিলেন—"বাবা ভগবানের রাজ্যে কি বিচার নেই? গরীবের—বিধবার মেয়ে—রূপগুণের কথা আপনার জনের বলা অন্যায়—টাকা নেই বলে কি এত নিগ্রহ?'—বৃদ্ধের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া পড়িল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। ভিতর হইতে "মামা"—"মামা" বলিয়া ডাকিতেই বৃদ্ধ উঠিয়া গেলেন। সুরথ বুঝিল আজ ইহার জন্যই বৃদ্ধ নিগ্রহ সহ্য করিতেছেন।

আজ আর সারাদিন ঠিক তেমন করিয়া সুরথ সকলের সঙ্গে হৈ চৈ করিয়া দিন কাটাইতে পারিতেছিলনা। তাহার কোমল প্রাণে যে দুঃখের, যে বিষাদের ছায়াপাত

হইয়াছে তাহারই বেদনা তাহাকে বড় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আজ সে সমস্ত ভুলিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। ইহাই তাহার স্বভাবের বৈচিত্র্য!

শীতের সন্ধ্যার ঘন কুয়াসা চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সুরথ উদাসনেত্রে জানালায় দাড়াইয়া দূরে আকাশের পানে তাকাইয়া আছ। মানুষের জীবনের অদৃষ্ট দিন গুলির কত কথাই না আজ তাহার মনে উঠিয়া তোলপাড় করিতেছিল। দূরে দেবালয়ের সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার শব্দ কানে আসিতেই তাহার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। নীচে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে তখন একটি মেয়ে প্রদীপ জ্বালাইয়া দক্ষিণ করে বেষ্টন করিয়া বাহিরে তুলসীতলায় আসিতেছিল। সুরথ অবাক্ হইয়া তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানার দিকে চাহিয়াছিল।

(৬)

সুরথের চিঠি পাইয়া অরুণা একটু অবাক হইয়া গিয়াছে। চিঠির সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু একটা অব্যক্ত আশা ও আনন্দে তাহার সমস্ত শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সুব্রত তখনও কলেজ হইতে আসে নাই; অরুণা চরকা লইয়া সুতা কাটিতেছিল—কিন্তু তাহার মনছিল কখন সুব্রত আসে। সুরথ যে এমন হঠাৎ তাহাদের একটা সংবাদ না দিয়া বিবাহ করিতে পারে তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু সুরথ যে তাহার কাছে মিথ্যা কথা লিখিয়াছে তাহাও সে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই দুই বিপরীত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া তাহার চরকা কাটা এক রকম বন্ধই হইয়া ছিল। সুব্রত আসিতেই চিঠি খানা তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সুরথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই চিঠিতে ব্যক্ত করিয়াছে, এবং সেই দিনই যে তাহারা অরুণাদের কাছে হাজির হইবে তাহাও জানাইয়াছে। অরুণা আগ্রহাতিশয্যে সুব্রতের চিঠি পড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলনা, কি জোগাড় করিতে হইবে না হইবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

রাত্রিবেলা গাড়ী করিয়া যথা সময়ে সুরথরা হাজির হইল। "বৌদি, বৌদি গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এসো" বলিয়া সুরথ তাড়াতাড়ি আর কাহারও সঙ্গে দেখা না করিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে সুব্রতের ঘরে চলিয়া গেল। অরুণাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া গাড়ী হইতে সঙ্কোচভরা মূর্ত্তিমতী মিনতি রমাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া আনিল।

মনুষ্যত্ব অর্জ্জন জীবনের শ্রেয় হইলে
আত্মশক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী।

বাঞ্ছিত

[শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ]

বাঞ্ছিতার নব নব মাধুরী বিলাসে
কম্পিত কোমল কণ্ঠে সরমে সোহাগে,
হর্ষে, অভিমানে সুধাস্মিত স্নিগ্ধহাসে
বেদনায়, অশ্রুজলে, পলে পলে জাগে
প্রেমের অমৃত প্রভা—সুন্দর মধুর!
তাই ক্ষুব্ধ ভৃঙ্গ সম রূপ-পুষ্প মাঝে
প্রেমিকের মুগ্ধ হৃদি সুখ-তৃষ্ণাতুর
কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুঁজে, কোথায় বিরাজে
পঞ্চরস-সম্ভোগের বন্ধন অতীত
অপূর্ব্ব পরশমণি—সাধনার ধন,
তপস্যা বরদা যবে পায় তিরপিত
কি নিত্য নারীত্বনিধি ভুবনমোহন;—
যমজয়ী কামজয়ী—ত্রিলোক-বিজয়া
শান্তি, কান্তি, দীপ্তি, তৃপ্তি, প্রেম পুণ্য দয়া।

পাহাড়ের পথ

[৺মোক্ষদা কুমার বসু]

মনে কত সময় কত কথা উদয় হয়, কত কিছু দেখিয়া কত স্মৃতি জাগিয়া উঠে; একটি ফুল, সরসীবক্ষে একটু রৌদ্র কিরণ, সূর্য্যাস্তের সময় মেঘের রং, দূরের গাছ পালা, ছোট পাহাড়, পথের ধারের ঘাসের একটু গন্ধ, কখনও বা পথের মেয়ের একটু হাঁটিবার ভঙ্গী, এমন ছোটখাট কত কিছুতে কত আবেগ তুলিয়া দেয়—এ সকল কাগজ কলমে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, ভাবগুলিকে আর একটু দীর্ঘ জীবন দিতে বাসনা হয়। কিন্তু যথার্থই বলিতেছি ভাষা প্রয়োগের অক্ষমতায় পারিয়া উঠিনা—যেমন করিয়া

ফুটাইয়া উঠাইতে চাই তাহা হয় না—তাই চেষ্টা করিতেও ইচ্ছা হয় না। একবার একটু লিখিয়া, পড়িয়া দেখি কিছুই হয় নাই—অমনি সব ফেলিয়া দিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ জঙ্গলের পথে পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গত দিনগুলির কথা সব মনে হইতে লাগিল। এই ৪।৫ বৎসরেই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সব পথে এই বনে কত বেড়াইয়াছি—কত আনন্দ কত স্ফূর্ত্তি কত আশা কত বিষাদ লইয়া তখন এই নির্জ্জন পাহাড়ের পথে ভ্রমণ করিয়াছি—কখনও একাকী, কখনও দুই একটি প্রিয়-সঙ্গী লইয়া। আজ তাহারাও সঙ্গে ছিল। কিন্তু এখন আর সেরূপ আনন্দ সেরূপ বিষাদ কিছুই নাই—এই কয়টী বৎসরে কত ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যে সব পথের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম, যে যে গাছগুলির তলায় বসিয়া কবিতা পুস্তক পড়িতাম, যে গাছের ডালে, একটু কাটিয়া চাঁচিয়া লইয়া আমরা বসিবার স্থান করিয়া লইয়াছিলাম—সে সব চিনিতে পারিলাম; যে সব নিম্ন স্থানে আমরা উপর হইতে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া নামিতাম সেই সমস্ত দেখিলাম—আর জীবন পথের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

পাহাড়ের উপরে যাইয়া বাঁশের টঙের উপর উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। যত দুর দেখা যায় কেবল বন জঙ্গল ও পাহাড়—মনে হয় যেন বন-সমুদ্র, দূরে পাহাড়গুলি তীর। যতই চাও কেবলই বন, বনের পর বন। একদিকে কেবল শুভ্র প্রাসাদটি দেখা যায়, আর এখানে ওখানে গাছের ফাঁকে দু' একটি চালাঘর চোখে পড়ে। জনকোলাহল হইতে দূরে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নগরের দিকে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। পথের ধারে এখানে ওখানে আজকাল দুই চারখানা পশ্চিম প্রদেশীয় শ্রমজীবিদের কুটীর উঠিয়াছে, তারা গরু বাছুর ঘরে নিতেছে; আর আজ হাটের দিন, হাট সারিতে যাহাদের দেরী হইয়াছে এরূপ দু' এক দল মানপুরী স্ত্রী-পুরুষ চিত্র বিচিত্র কাপড় পরিয়া, কাণে ফুল গুজিয়া, মাথায় দ্রব্যের পসরা লইয়া সংসারের সুখ দুঃখের আলোচনা করিতে করিতে জঙ্গলের পথ দিয়া দূরে বস্তিতে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহার পরে পথের ধারে আর একটি দৃশ্য যাহা দেখিলাম তাহা অতি সুন্দর—সভ্যতার চাকচিক্যহীন সরল গ্রাম্য জীবন যাঁহারা পটে চিত্রিত করেন তাঁহাদের তুলিকার উপযুক্ত দৃশ্য। দু'টী নগ্নশিশু—পথের মাঝে খেলা করিতেছিল, অদূরে ধনীর রথ-চক্রের শব্দ পাইয়া পথ ছাড়িয়া, পথ পার্শ্বেই একটু দূরে যাইয়া অধিক অবাক হইয়া, কিছু ঔৎসুক্য-পূর্ণ নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দু'জনেই নগ্ন—বড়টী ছোটটীকে অভয় প্রদান করিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইয়া গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—বড় সুন্দর—বড় প্রাণস্পর্শী। উভয়েই নগ্ন শিশু, একটু ছোট বড় মাত্র—তবুও দেখিয়া মনে হয় এক জন যেন আশ্রয়দানে সমর্থ, আর অন্যজন তাহারই আশ্রয়ে যেন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একটু পরে আসিয়াই প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম—সে সব সরল দৃশ্য, সরল ছবি, গ্রাম্য-শোভা, পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—যথার্থ যাহা তাহা পেছনে ফেলিয়া অযথার্থে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

নারীর ক্রন্দন

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়]

সংসার অশ্রুসাগরে ভাসিতেছে, বক্ষে বক্ষে দীর্ঘশ্বাস ঘনাইতেছে, চক্ষে চক্ষে বেদনার অশ্রুকণা ঝরিতেছে, কণ্ঠে কণ্ঠে যাতনার করুণ কান্না বাজিতেছে এখানে সুখ কোথায়? এ কান্নার হাটে মানুষ শুধু চোখের জল দিয়া চোখের জল কিনিতেছে বেদনার মূল্যে শুধু বেদনাই ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। মায়ের উদর হইতে সে যখন প্রথম জগতে আসিল তখন হইতেই তাহার সাথী হইল কান্না। জীবন যাত্রা সুরু হইল পৃষ্ঠে কান্নার বোঝা সঙ্গের পাথেয় অশ্রুজল! শৈশব বাল্য ও যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের তীরে সে যখন ভারাক্রান্ত পৃষ্ঠে ক্লান্তদেহে দাঁড়াইল তখন সে একবার পিছন পানে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল পথের প্রথম অংশ সোণারকিরণে কিছুদিন হাসিয়াছিল বটে—কিন্তু অবশিষ্ঠ সারাটাপথ অন্ধকারে ঢাকা চোখের জলে সে পথ কদ্দমাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের রক্তধারায় সে পথ রঙিন। যাত্রার প্রারম্ভে যে দুঃখের বোঝা সে অতি সহজে বহিয়াছিল, যাত্রার শেষে মরণের তীরে আসিয়া সে দেখিল সে বোঝা শতবেদনার চাপে দুর্ব্বহ হইয়াছে। সারা-জীবন ধরিয়া সে শুধু জমাইয়াছে যাতনার দীর্ঘশ্বাস আর বেদনার অশ্রুজল!

রোগের যাতনায় সে কতদিন চীৎকার করিয়াছে, ক্ষুধার অসহ্যকষ্টে সে কতদিন কাঁদিয়াছে—উদরান্নের চেষ্টায় সে পথে পথে অনাহারে কত ঘুরিয়াছে; সাংসারিক দুশ্চিন্তায় সে কতরাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে গিয়া সে কত দুঃখ পাইয়াছে। অনুতাপের দুঃসহ অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া সে কতদিন আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। বিরহের আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তাহার কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়াছে। তাহার সাধের পুত্র কন্যাকে সে সমাধি দিয়াছে প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আপন হাতে চিতায় রাখিয়াছে। সংসারের প্রায় সারাটা পথ সে কেবল যাতনার বোঝাই বহিয়াছে। এইত মানুষের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ বেদনার ইতিহাসের শেষ নাই। We are to be exercised, humbled, tried and tormented to the end. It is our patience which is the touchstone of our virtue.

আমরা আজ যে বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি সেও জীবনের এই কান্নার ইতিহাসেরই একটী অধ্যায়! আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য প্রবন্ধ "নারীর ক্রন্দন।" আপনি না কাঁদিলে অপরের কান্না ঠিক বুঝাও যায়না বোঝানও যায়না। আজ আপনাদের সম্মুখে এই প্রবন্ধ লইয়া উপস্থিত হইবার যে সাহস করিয়াছি তাহার কারণ নারীর ক্রন্দন নারীর প্রতি অবিচার মাঝে মাঝে বড় তীব্রভাবে অনুভব করি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এসব অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে

না পারিলেও এটুকু বেশ অনুভব করি নারীর জীবনকে আমরা নরক হইতে খুব বেশীদূরে রাখি নাই। বাহিরে আমরা ইংরাজ শাসনের বিভীষিকার কথা যত উচ্চ কণ্ঠেই ঘোষনা করিনা কেন ঘরের ভিতরে মেয়েদের উপর আমরা যে শাসন করি তাহার বিভীষিকাও বড় কম নয়। বাহিরে আমরা যতই বলিনা কেন ইংরাজ আমাদের জন্মভূমিকে বৃহৎ কারাগারে পরিণত করিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া যখন চারিদিকের উচ্চ প্রাকারের প্রতি দৃষ্টি-পাত করি—প্রচুর রৌদ্রবায়ুহীন কক্ষগুলির মধ্যে দিবারাত্র আবদ্ধ মাতাভগ্নিদের বেদনা-ক্লিষ্ট মুখগুলি নিরীক্ষণ করি তখন নিতান্ত লজ্জা ও ঘৃণার সহিত মনে হয়—শুধু ইংরা-জের দোষ দিয়া লাভ কি? তাহারা আমাদের সোণার মাতৃভূমিকে একটী সুবৃহৎ কারাগার করিয়া রখিয়াছে সত্য কিন্তু আমরাও ত এই বৃহৎ কারাগারের মধ্যে অসংখ্য কারা-গারের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভিতরে আমাদের মাতৃজাতিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ডায়ার সাহেবের নৃশংনতার অপেক্ষা আমাদের নৃশংসতা কম কোথায়? সে নয় লোহার গুলির সাহায্যে দশমিনিটে কয়েকশত বিদেশীর ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল—আমরা গুলির অভাবে শাস্ত্রের কতকগুলি বুলি ও সংস্কারের জোরে আমাদের স্ত্রীকন্যা মাতা ভগ্নিকে শতশত বৎসর ধরিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে তিল তিল করিয়া মারিতেছি। মৃত্যু কি আজীবন বন্ধন দশার চাইতে শ্রেয় নহে?

নারীর কান্না নারীর মুখেই ঠিক শোনায়। কিন্তু শুনাইবার যে তাহার ভাষা নাই! আমরা যে স্বার্থহানির ভয়ে ছলনা ও প্রব-ঞ্চনার আশ্রয় লইয়া নারীকে প্রস্তর-খণ্ডের মত নির্জীব জড় ও মূক করিয়া রাখিয়াছি। নারীর বুকের গোপন কান্না তাই আজ অনেক স্থলে পুরুষকেই শুনাইতে হয়। ইহার চাইতে অধিকতর ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে?

বাংলার নারী-জীবন—বেদনার কি মর্ম্ম-স্তুদ ইতিহাস! যাতনার কি প্রাণ-স্পর্শী ছবি! যেন মানুষের অনাদিকালের শোক দুঃখ মূর্ত্তি ধরিয়া বাংলাদেশে নারী হইয়া জন্মিয়াছে! সে যখন মাতৃ-গর্ভ হইতে প্রথম ভূমিষ্ট হইল তখন হইতেই তাহার অপমানের সূত্রপাত; অজ্ঞাতসারে অসন্তোষের ও নৈরাশ্যের কালিমায় গৃহখানি ভরিয়া গেল—আত্মীয় স্বজন ও পিতামাতা কন্যার বিবা-হের অর্থ-ব্যয়ের কথা ভাবিয়া মনে মনে প্রমাদ গনিল। তাহার পর কন্যা যতই মাথায় বাড়িতে লাগিল পিতার আহারের পরিমাণ ততই কমিতে লাগিল, মাতা ততই ভাবিয়া আকুল হইলেন কেমন করিয়া কন্যা পার করিবেন। আত্মীয়-স্বজন প্রতি-বাসী সকলে এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই এই বলিয়া পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষ বাক্য-বান বর্ষণ করিতে লাগিল। কন্যা ভাবিতে লাগিল একি! তাহাকে লইয়া এত উদ্বেগের ও আশঙ্কার কারণ কি! এই অল্প বয়সেই সে আপনাকে ধিক্কার দিতে শিখিল—তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল—তাহার বাল্যের খেলা ধূলা ফুরাইল—তাহার হাসিতে কান্নায় আলাপে ব্যবহারে কি যেন একটা অপ-রাধীর সঙ্কোচের ভাব আসিয়া দেখা দিল; সে যেন কত বড় একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলি-য়াছে! তাহার জন্যই না তাহার পিতা মাতার এত দুঃখ এত যাতনা! হায়, বাংলার অভিশপ্ত বালিকা-জীবন কোথায়

সংসারের দুর্ব্বহ বোঝা স্কন্ধে লইবার পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহের স্নেহ শীতল ছায়ায় একটু স্বাধীন ভাবে হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটী করিয়া আনন্দ করিবে, তা নয়, সমাজ তাহাদের সে আনন্দ করিবার সামান্য অবসরও দিল না!

বাংলার নারী-জীবনের প্রথম অঙ্ক এই অপমান ও অশ্রু-জলের মধ্যে সমাপ্ত হইল। তাহার পর দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ, এখানেও নারীর সেই ব্যর্থ জীবনের হাহাকার—সেই দীর্ঘশ্বাস সেই যাতনার পালা! বাল্যের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে ঘটকের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া এক দিন তাহাকে দাঁড়াইতে হইল; তাহার পর কোন এক শুভ বা অশুভক্ষণে একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যক্তির সাহিত তাহার জীবন চিরদিনের মত গ্রথিত হইয়া গেল! পিতাকে কোনও প্রকারে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া সে শ্বশুর গৃহে স্থান পাইল; পক্ষীশাবকা নীড়ত্যাগ করিতে না করিতে পিঞ্জরাবদ্ধ হইল। কুসুমকোরক ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতে মাতৃ বক্ষ হারাইল। পিতৃ-গৃহে স্বাধীনতার যে একটু আলোক-কণা দেখিতে পাইত শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া তাহাও আর পাইল না। চারিদিক হইতে অন্ধকার—বিরাট জমাট অন্ধকার আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। স্বামী গৃহে নব-বধূর জীবন হইল যেন কারা গৃহের খুনী আসামীর জীবন। সে বেচারার তবু চক্ষু দুইটী মুক্ত থাকে—কিন্তু নব-বধূর সে সুবিধাও নাই। আধবক্ষ অবগুণ্ঠন টানিয়া শাশুড়ী ননদিনী দেবর প্রভৃতির সকৌতুক দৃষ্টির সম্মুখে সসঙ্কোচে চলিতে হয় ঠিক জীবন্ত ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলিটীর মত! পদে পদে ভয়, কি জানি একটু দ্রুত হাঁটিলে একটু জোরে কথা বলিলে একটু বেশী খাইলে অবগুণ্ঠনের পরিমাণ একটু কম হইলে লোকে হয়ত নির্লজ্জা মুখরা বলিবে। নিজের দুঃখ মানুষ অনেক সময় সহিতে পারে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের নিন্দা অনেক সময় তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে। নব-বধূকে অনেক সময় পিতৃ নিন্দা শুনিতে হয়। ছেলের ঘড়ীর চেনটা কোথায় একটু খারাপ হইল—গরদের কাপড়ের দাম কোথায় একটু কম হইল—দানের ঘড়াটা কোথায় একটু ছোট হইল আর রক্ষা নাই! ছোটলোক, জুয়াচোর, কৃপণ প্রভৃতি বহু বিশেষণে পিতা ভূষিত হইল। নব-বধূর তখনকার বেদনা কে বুঝিবে! তাহারই জন্য না তাহার পিতার আজ এই দুরবস্থা! ভিটা মাটী বন্ধক দিয়াও অব্যাহতি নাই! কেন সে পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল; জন্মিয়াছিলত সূতিকাগৃহে মরিয়া গেল না কেন! সে মরিলেত ত তাহার পিতামাতাকে আজ এই সকল কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না! কালে সকল দুঃখ সহিয়া যায়! নব-বধূও তাহার এই নূতন বন্দিনী জীবনে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইল!

এবারে আবার এক অভিনব দুঃখ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। এ দুঃখ অপরিনত মাতৃত্বের দুঃখ। বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হইতে না হইতে – শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ সমূহ সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে না করিতে বধূর উপর চাপান হইল মাতৃত্বের গুরুভার! অপরিণত বৃক্ষে ফল হইলে বৃক্ষের অবস্থা যেমন শোচনীয় হয় অপরিনত-দেহ বালিকার পক্ষে সন্তান জননও তেমনি শোচনীয় হইয়া থাকে! কিন্তু শোচনীয় হইলে উপায় কি! পুরুষের লালসা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে কে! আপনাকে রক্ষা করিবার উপায় তাহার

নাই—পুরুষেরও এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই! উপর্য্যুপরি বছরের পর বছর ধরিয়া বধূ একটীর পর একটী করিয়া সন্তান প্রসব করিতে লাগিল! একে ত বাংলার গৃহে গৃহে ম-লক্ষ্মীর এই অভাব! ইহার উপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা না হইলে কি চলে! কিন্তু উপর্য্যুপরি এই সন্তান প্রসবের ফলে বধূর অবস্থা কি দাঁড়াইল! সে কথা কি আবার বলিতে হইবে! সেত বাংলার ঘরে ঘরে মাতৃ-কুলের অবস্থা দেখিলে সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়! স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলিতেন বার বছরে বেটা বিউনীর দল! স্বাস্থ্য নাই, সৌন্দর্য্য নাই—দেহ অসংখ্য দুরারোগ্য ব্যাধি জালে পরিপূর্ণ! সে দিনের বালিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে বীর্য্য-হীন শীর্ণ-দেহ কতকগুলি পুত্র কন্যার রুগ্না মাতা হইয়া দাঁড়াইল! আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নারীর এই যে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর মাতৃত্ববহনের দুঃখ যে ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার নহে! এ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'Guide to Health' নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন—সমীচীন বোধে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম!

Besides becoming pregnant at a premature age—they are the sad victims of men's last even after pregnancy as well as imediately after child birth. So that conception again takes place at too short an interval. This is the state of utter misrey and wretchedness in which lacs of our young girls and women find the males in our country today. To my minds, life under such conditions is little removed from the tortures of hell. So long as men continue to behave monstrously, there can be no hope of happiness for our women.

"তাহারা যে শুধু অত্যল্পবয়সে গর্ভবতী হয় তাহা নহে এমন কি গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের অনতিকাল পরেও তাহারা পুরুষের ইন্দ্রিয় লালসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়না। ফলে অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহারা পুনরায় অন্তঃসত্ত্বা হয়। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বালিকা ও রমণী আজ এই নিদারুণ দুঃখে শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে আমার মনে হয় এরূপ অবস্থায় জীবনযাপন করা নরকযন্ত্রনা ভোগ করারই তুল্য। পুরুষগণ যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিতে করিতে থাকিবে ততদিন আমাদের নারীগনের কোন সুখের আশা নাই।"

Consent Billএর আন্দোলনে জানা যায় ভারতে এক পুরুষে ৩২লক্ষ অল্প বয়স্ক মাতার মৃত্যু হইয়াছে। বাংলাদেশে এইযে ঘরে ঘরে অসংখ্য নারীবলি হইতেছে ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এই যে বাংলাদেশের লক্ষমাবোন পুরুষের অস্বাভাবিক পাশবিক প্রবৃত্তির চরনে আপনাদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য আপনাদের ভবিষ্যতের সমস্ত আশা বলিদান দিয়া অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে ইহার জন্য একটী প্রাণও কি কাঁদেনা? এই নরমেধ যজ্ঞের শেষ হইবে কবে? নারীর অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি যে বাংলার আকাশ বাতাসপূর্ণ করিয়া ফেলিল!

মাসিক-কাব্য-সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

প্রবাসী—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—

বর্ষাসন্ধ্যায়। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবে বৈশিষ্ট্য নাই—ভাষা বিন্যাসে কিন্তু বেশ পারিপাট্য আছে।

ঝঞ্ঝাঞ্জপদে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় ঝঞ্ঝাকে বলেছেন—

নূতন সৃজন হবে বলে' পুরাতনে ধ্বংস হানো,
ব্যর্থ জরার কবল হতে যৌবনেরি অংশ আনো।

কবিতাটি দুইবৎসর আগে মানসীতে প্রকাশিত "প্রভঞ্জন" কবিতাটিকে মনে পড়াইয়া দেয়। বক্তব্য বিষয় একই। বৈশাখীঝঞ্ঝা আকাশ বাতাস হতে দূষিত বাষ্প রোগবীজাণু, ধূলি ক্লেদ ও ভূতল হইতে আবর্জ্জনা ভস্মাবশেষ ভস্মপাংশু সব দূর করে। ধরার জীর্ণতা ও বিকলতা দূর করে' নবীনের সম্ভবের সম্ভাবনা জন্মিয়ে দেয়। যুগেযুগে কালঝঞ্ঝাও মানুষের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংসারিক জগতেও ঠিক এই কাজ করে।

রচনায় অনেক স্বেচ্ছাচারিতা ও Mannerism আছে—যে ভাষা কবির স্বাভাবিক নয় সেই ভাষাতে চেষ্টা করে' ইচ্ছা করে, কবি লিখেছেন! বোধহয় ঝড়ের উদ্দামতা দেখাবার জন্য কবি ইচ্ছা করে উদ্দাম হয়েছেন। রচনা সর্ব্বত্র তেমন রোচক হয়নি।

৺সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার কাব্যের আসরে নেমেছেন—এতকাল তিনি গল্প উপন্যাসই লিখ্‌ছিলেন, তাতেই তাঁর যৌবনের অধিকাংশ কেটে গেছে। হেমেন্দ্রকুমার স্বর্গত বন্ধুর ধারা বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করছেন—শক্তির অনেক তফাৎ হলেও হেমেন্দ্রকুমারের শক্তি নাই একথা বলিবার যো নাই। স্থলে স্থলে বেশ মর্ম্মস্পর্শী হয়—শিল্প হিসাবেও হেমেন্দ্রকুমারের কৃতিত্ব আছে—তা' ছাড়া সৎসাহসে ইনি সত্যেন্দ্রনাথের অযোগ্য বন্ধু ন'ন। তবে এঁর রচনায় স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা বড় কম।

আলেয়া। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। এ আলেয়া রূপকের অবগুণ্ঠনে আধ্যাত্মিক আলেয়া। কবিতা অযথ দীর্ঘ এবং অনেক স্থলে অসংলগ্ন—জমাট বাধুনী নাই। শেষকালে "মহামানবের জয়" গেয়ে Topheavy করে' তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের অসমছন্দের অপব্যবহার হয়েছে বলে' মনে হয়।

কালো-হরা—মনোহরা মিলও নয়, কালোহরা শুনতেও ভালো নয়। স-মৃণাল ততোধিক। রাধাচরণের টুকরো কবিতা গুলো বরং বেশ লাগে।

পেটুকদাসের স্বপ্ন। শ্রীসুনির্ম্মল বসু-র সুনির্ম্মল বাবু সন্দেশে প্রকাশিত "ভোজরাজ" পড়েছেন ?

অকালবন্যা। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। সোজা ভাষায় সত্যকথা,—বেশ লাগল।

চাঁদের আলো। ঐ—বেশ সুন্দর স্বচ্ছ রচনা—রচনায় পংক্তিবিন্যাস ও অলঙ্ক্রিয়া অনিন্দ্য। কেবল ১টী পংক্তি ভাল লাগে-নাই—

"কচিমুখের কুন্দকুচি একটি দুটী দন্তরুচি।"

ধীরে। শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা। এঁর কবিতা আগে নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে পড়তাম।

সনেটটি মাত্র ২টী উপমায় গঠিত। উপমা ২টী মন্দ হয় নাই।

কুড়ানো মাণিক। গোলাম মোস্তাফা। ছন্দটি বেশ মিঠে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবার নাই।

যমুনা। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।—

ভাই ফোঁটা। লীলাদেবী। কবিতার শেষ পংক্তিটি বেশ।

ধিক যৌবন। শ্রীকালিদাস রায়। কবিতায় নিজের খুব বাহাদুরী আছে এই পর্য্যন্ত।

মরণ। শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী। চলনসই।

একটি কথা কও। শ্রীলীলাদেবী। তথৈবচ!

বিকিয়ে যাওয়া। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় বেশ সুমিষ্ট রচনা। "বিকিয়ে যেতে চাই" এইটি গানের ধূয়া। ধূয়াটা আমাদের তেমন ভাল লাগে নাই।

মাধবী। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। মোহিত বাবুর নিকট অন্তরের কথা শুনিবার উপায় নাই। রূপের মোহ কবিকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে, মোহিত বাবুকে এ রূপ মোহ অপূর্ব নামা করে তুলেছে। কবি প্রাণের কথা দরদ দিয়ে কোন প্রাণে বলেন না—তাঁর প্রত্যেক পংক্তিটি অলঙ্কারের ভারে ন্যুব্জ তার উপর পাণ্ডিত্যের মুদ্রাঙ্ক কোন কবিতাতেই দিতে ভুলেন না। সরল ও সহজ সত্যকে জটিল ও অলঙ্কৃত ক'রে বলবার দিকেই তাঁর ঝোঁক। মোহিত বাবু যতটা পণ্ডিত ততটা ভাবুক নন, যতটা বড় শিল্পী ততটা দরদী নন, যতটা রসজ্ঞ ততটা রসিক নন। শিল্প চাতুর্য্য হিসাবে কবিতাটি অনিন্দ্য। অলঙ্করণে বেশ পরিপাট্য আছে. কতকগুলি পংক্তি বড়ই রমণীয়। পংক্তিগুলিকে পৃথক ভাবে অনিন্দ্য করতে গিয়ে কবি সমগ্রতার সৌষ্ঠব নষ্ট করেছেন ব'লে মনে হয়।

কবি এই কবিতাটিতে শেষ ভাগে দার্শনিকতার উপল খণ্ড দিয়া রসের ধারাকে নিজ হাতেই রুদ্ধ করেছেন। কবির নিজের কথাতেই কবিকে বলা যায়,—

হায় কবি হায় এমনি করিয়া জীবনের
যত ফাঁকি,
কল্পনা রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া ঢুকায়েছ
দুই আঁখি।
আধখানি দেখে বাকি আধখানি ভরিয়া
গানের সুরে,
যাহার প্রতিমা গড়িতেছ তুমি সে যে
থেকে যায় দূরে।

শিল্পীকবির তুলিকা লালসার রঙ্গে ভিজান। মোহিনীর রূপচিত্রনে কবি মঞ্জুল—এই চিত্রটি যে তাঁর হাতে বেশ ফুটে—তার পরিচয় আমরা "ইরাণী" কবিতাতেই পেয়েছি। কবি মোহে ভরপুর কণ্ঠে গেয়েছেন—

পট্টকলা রঙ্গ শাড়ীটির ভাঁজে-ভাঁজে
সকল রেখা
নত উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা,

মুখটি আড়াল খোঁপাটি আকুল—দোপাটির
ফুল তায়
গণ্ড চিবুক একটু যে গ্রীবা—হাতখানি
দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র
সে ফুলতনু;
সবটুকু তার দেখা নাহি যায় শরতের রামধনু।
তবু মনে হয় হেরিলাম যেন সারাদেহ
আঁখিভরি
ষোলকলা যেন নিমেষে পূরিল পূর্ণিমা
বিভাবরী

শিল্প হিসাবে এসকল পংক্তিকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কিন্তু তবু ততঃ কিম্? কবির পক্ষে ইহাই ত যথেষ্ট নয়। কবিতায় শোভা আছে, শ্রীসৌষ্ঠব আছে ঝঙ্কার আছে, অলঙ্কার আছে, পারিপাট্য ও মসৃণতা আছে—কিন্তু প্রাণ কই? প্রাণ নাই বলে' মনমাতায় না—দশবার পড়তে ইচ্ছে করেনা—পংক্তি-গুলো মুখস্থ করতে ইচ্ছা হয়না—মনে স্থায়ী স্মৃতি থাকেনা—স্বরূপটি ভালকরে' মনে বিম্বিতও হয়না। কবি ভাষায় তাজমহল তৈয়ার করছেন কিন্তু তার নীচে মমতার মমতাজ নাই। তাই এত শ্রীসৌষ্ঠব সত্ত্বেও প্রাণমন গলায় না। কবির নাদীর শাহ ও নুরজাহানে প্রাণ আছে এবং এই দুটী কবিতায় কবির নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির অলঙ্কার গুলি ইংরাজী কবির অনুকরণে সংরচিত। অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যও অনেকস্থলে Flimsy & etherial.

কাব্য কবির জীবনে অঙ্গীভূত হয়নি—ইহলোককে—এই ধরণীর প্রকৃতিও সংসারকে কবি কাব্য লোক করে' তুলতে পারেন নাই—কবির কাব্যলোক যেন পৃথক একটা কল্পলোক। আমরা ইহলোকের রক্ত মাংসের মানুষ—আমরা তাঁহার কল্পলোকের অনির্ব্বচনীয়ত্বাকে অনুভব করিতে পারিনা। মনে হয় এতবড় শক্তিমান কবিকে আমাদের এই সুখদুঃখময় সংসারে বরণ করিয়া লই—কিন্তু এ সংসারে তাঁর আতিথ্যের আয়োজন কিছুই নাই। বাংলাদেশ অপেক্ষা স্বপ্নের ইরাণ ভূমি তাঁকে অধিকতর মুগ্ধ করে—আমাদের পরিচিত মানুষগুলিকে তিনি মানবকমাত্র মনে করিয়া বাধাবন্ধহীন বেদুইনের জীবনের তাঁর লোভ বেশী। বাংলার কমলকুমুদ তাঁকে মুগ্ধ করে না, বসোরার গুলের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। দূর অতীতের নাদীরশাহ তাঁর কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছে—নুরজাহানের বেদনা তাঁহাকে চঞ্চল করেছে। 'বেদুইন', নাদীর, নুরজাহান কেহই type নয়। কেহই আমাদের পরিচিত জগতের মানুষগুলির প্রতিনিধি নয়। সবগুলিই স্বপ্ন দিয়ে তৈরী কল্পলোকের অধিবাসী।

জানিনা কবির Unvisited Yarrow কোন দিন visited হবে কিনা!

বঙ্গ সাহিত্যে মোহিত বাবুর স্থান যে নেই তা নয়—আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ দরদী কবিদের মধ্যে তাঁর ঠাঁই নাই বটে—কিন্তু শব্দশিল্পিদিগের মধ্যে তাঁর ঠাঁই অনেক উচ্চে। দেশীয় সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির দিক হ'তে দেখতে গেলে এই শ্রেণীর শব্দশিল্পীরও প্রয়োজন আছে। এই শিল্পের সহিত জন-সাধারণের কোন সম্পর্ক নাই সত্য; কিন্তু বিশেষজ্ঞ পাঠকগণের ইহা আনন্দের সামগ্রী। সে হিসাবে দেখতে গেলে—মধুর কেন জড় হ'লনা ব'লে দুঃখ করবার প্রয়োজন নাই।

মোহিত বাবুকে তাঁরি কথায় বলি,—

"ডুব নাহি দিয়ে, শুধু রূপজলে গানের
গাগরী ভরা।"

ডুব দিলে তিনি হয়ত অরূপ রতন পেতেন কিন্তু তাঁর কাছে আমরা গানের গাগরী পেয়েই তুষ্ট থাকব।

ভারতী। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

গিন্নী। শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়। আমরা বরাবরই কিরণধন বাবুর কবিতার পক্ষপাতী। বোধ হয় এ পক্ষপাতিত্বের একটা কারণ কিরণবাবুর লেখার প্রত্যেক পংক্তিটা আমরা বুঝি! এ কবিতায় কিরণ বাবুর যথেষ্ট মানব চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের ও বাঙ্গালীর সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই পরিচয় দেওয়াই কোন কবির কোন কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ও দুটি না থাক্‌লে বাঙালীর জন্য ভাল বাংলা কবিতার সৃষ্টি করা বড় কঠিন। কিরণ বাবু আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ কবিগণের মধ্যে উঁচু ঠাঁই পেয়েছেন—তিনি আমাদেরি অন্তরের কথাই লেখেন, আমাদের প্রাণের তারে তিনি মধুর ঝঙ্কার দিতে পারেন—তাঁহার বাণী আমাদের হৃদয়ের কুহরে কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

আলোচ্যমান কবিতাটিতে কলানৈপুণ্যও যথেষ্ট আছে—রচনা চাতুর্য্যের প্রাচুর্য্যও এ কবিতার একটা উপভোগ্য সামগ্রী।

রাত জাগা। শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়। কোন দিক হতেই কবিতাটি ভাল হয় নাই। হেমেন্দ্র বাবুর অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা গুলির তুলনায় এ কবিতা নেহাৎ নিস্তেজ ও নীরস। ভারতী সম্পাদক-যুগল ও হেমেন্দ্র বাবু নিজে (ভারতীর সহঃ সম্পাদক) নিশ্চয়ই কবিতাটিকে খুব ভাল হয়েছে মনে করেছেন নতুবা নিজেদের পত্রিকার জন্য এটাকে নির্ব্বাচন করবেন কেন? এই চিন্তা মনে আসাতে ২।৩ বার কবিতাটা পড়েও বিশেষ কোন রস পেলামনা—বিশেষতঃ কবি যখন লিখেছেন—

"কবির সাথে হলে বিয়ে
এমন বিপদ হবে প্রিয়ে"

তখন সামান্য একটু যা রস জমে উঠছিল তাহাও উবে গেল।

কবি 'ঘুমাবোনা' কে ঘুমিওনা করেছেন তাতে 'তুমিওনার' সঙ্গে বেশ মিল হয়েছে—কিন্তু 'ভুলিওনার" সঙ্গে কেমন করে মিলল?

হেমেন্দ্র বাবুর এই বয়সে আবার নব-যৌবনের সমাগম হয়েছে দেখছি—

বন্ধুকে congratulate করা যাচ্ছে।

শরৎ। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শরতের সৌন্দর্য্য, কবি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন বলে' মনে হয়না। মামুলী বাগ্বিন্যাস—অসংলগ্ন পংক্তি সমুচ্চয়। কবিগুরুর "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি" এমনি একটা পংক্তিতে শরতের যে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ ফুটেছে তার এক কণাও এই ২২ লাইনে ফোটে নাই—কবি আকাশকে নিয়ে মহাবিব্রত হয়ে' পড়েছেন। একবার মেঘকে বাষ্পাকুল কল্পনা করে" আকাশকে ক্ষেত্রের সহিত উপমিত করেছেন—আকাশকে দিয়ে আর একবার স্বর্ণ রেণু বইয়েছেন। প্রকৃতিকে এক মহাপতঙ্গ কল্পনা করে আকাশকে তার চোখ বলেছেন। আবার আকাশকে শেষে নীলকণ্ঠের "নীল কণ্ঠ" কল্পনা করেছেন, তাতে ফণী মালার বদলে বলাকার মালা দোলায়েছেন। এক আকাশ নিয়ে নানা উপমার কল্পনা করতে গিয়ে কোনটাই জমাতে পারেন নাই।

পলাতক। শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত, কবিতার ভাবটি নেহাৎ মন্দ নয় কিন্তু রচনার দোষে জমে নাই, কবির ভাষায় একেবারেই দখল নাই—কবিকে এখন—কিছু দিন কবিতার উপযোগী ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। রচনা আড়ষ্ট—কষ্টকল্পিত, পদে পদেও সংলগ্ন, প্রতিপদ ভগ্ন—মাজাভাঙ্গা সাপের মত বড় কষ্টে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমে বল্লেন "অতৃপ্ত প্রকৃতি আমার" তার পর হলো হৃদয় চিত্ত ইত্যাদি তার পর কবি নিজেই ছুটতে চান "বাঁধনের পারে",—বাঁধনের পার কষ্টকল্পনা 'কোন্‌না আগারে' বিশ্রী। যামি'—কি? তৃপ্তি পানে রূপ পানে মুক্তি পথ গামী" অর্থ কি? নহে মোর মোহভরা ভুবন বাঁধনে" প্রাঞ্জল নয়। "দুঃখ সুখ বর্ম্ম আবরণ" কি প্রকার উপমা? "অতলের প্রশান্তি সীমায়" এটা কিরূপ? তৃপ্তি নিতে নিলুপ্ত কই? বৈষ্ণব কবির অনুসরণে "তিরপিতি" করলেও হ'ত। "দুঃখে হরষণে" দুঃখের বিপরীত হর্ষণ হলেও antithesis নয়। "ছোট বড় বাঁধা ধরা সবচূর্ণ করা" বড়ই এলো মেলো।

"উন্মত্ত চরণ করে নিষ্পেষণ যত বাঁধা যত কারাগার ঝাঁপায়ে পড়িতে খুঁজে মুক্তি পারাবার"।

চরণ উন্মত্ত হোক নিষ্পেষণও করুক কিন্তু বাঁধা ও কারাগার চরণে নিষ্পেষণের কথা অদ্ভুত। এই চরণ আবার কারাগার নিষ্পেষণ করছে মুক্তি পারাবার খুঁজে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য। অসহ্য।

"ছুটে ছুটে ভেসে (?) যাই, পিপাসায়,
মুকতির দোলে কোন্‌-শক্তি কোলে।"

পিপাসায় ও মুকতির দোলও যেমন শান্তি-কোলও তেমনি কি গুরু পক্ষু ভাষায় একত্রবিন্যাস। একি কবিতা?—না—কুষ্ঠাশ্রম?

কবি আবার কবিতায় দার্শনিক ভাবুকতা দেখাতে গিয়াছেন এতে আরো হাস্যাস্পদ হয়েছেন। অন্তরে যে গভীর তত্ত্বের অনুভূতি হয় নাই শুধু ভাবুকতার ভান করে' তা প্রকাশ করতে গেলে লোকে পাগলই বলবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে' না বুঝে—না হজম করে' মাসিকের পাতায় পাতায় উদ্গিরণ করলে লোকে সহ্য করবে কেন? যা' জীবনব্যাপী সাধনার ফল—তা' কি দুদিন কলম চালালেই আয়ত্ত হয়? আমরা লক্ষ্য করছি অনেক নবীন কবি বস্তুজগতের সঙ্গে ভালকরে' পরিচয় না করেই একলাফে Abstraction এ'র জগতে চলে' যাচ্ছেন। Abstraction কি এতই সোজা জিনিস?

কন্যাশরৎ। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার রূপমোহের কবি শরতের রূপটি বেশ ফুটিয়েছেন। কিন্তু কন্যাশরতের অলঙ্কার গুলি ভাল লাগল না। দোপাটীফুল পায়ের চুটকী কেন হলো? আর যদি হলোই তবে ভ্রমর গুঞ্জনে চুটকী বাজিয়ে দিলেন না কেন? সন্ধ্যামণিইবা নাকছাবি হলো কেন? কোন একটা ক্ষুদ্রফুলকে নাকছাবি করলে না কেন? অপরাজিতার গোট বা চন্দ্রহার হবার কি যোগ্যতা আছে? অপরাজিতা সোনা কিংবা রূপা কোন'টাকেই মনে পড়ায় না। কুন্দকুঁড়ি মুক্তা কেমনে পড়ায়। কৃষ্ণকাল রিংএর চাবি হোক্‌ আপত্তি নাই কিন্তু "লাখ চাবি" কি শুধু নাকছাবি সঙ্গে তাল মিল দিবার জন্যই আমদানী করা হয় নাই? মিল ভাল হওয়া প্রশংসনীয় বটে কিন্তু রসের দিকেও ত দেখতে হবে।

"আকাশ দীঘির স্তুজলে শাদা মেঘের

গামছা ভাসছে"—বেশ লাগছে—তবে কন্যা শরতের গামছা খানা ডুবেও নয়—রঙীনও নয়—বড়ই দুঃখের বিষয়। 'সাঁতার দিয়ে কে ধায় তায়?" বেশ। কিন্তু তারপরই 'স্বপন গো ছায় আঁখির পাতায়' পংক্তিটি উহার সহচরী হলো কেমন করে? গামছার খুঁট দাঁতে চেপে কলসী ধরতে সাঁতার দিলে কন্যার জলকেলি আরো মনোজ্ঞ হত না?

কবি শিউলী বোঁটা-রঙা শাড়ীখানা ফেলে কন্যাশরতকে এত সাঁচ্চা সোণার কস্কা দেওয়া বারাণসী পরাতে গেলেন কেন? কন্যা-শরতকে কবি যে ভাবে এঁকেছেন তাতে 'সোণার ঘটে' তাঁর কাঁখ না চাপলেই ভালো হতো।

শরৎ। শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য। কবির রচিত সমাস গুলো ভাল লাগল্ না। 'গৃহছাড়া'—'পথেপথে ছুটে-চলা' (বিশেষণ) 'বজ্রভাঙা', 'পাঁজর-গলা-অশ্রু' "কল্পনা-এলা" "প্রিয়েরিবারতা-পাওয়া" (বিশেষণ) "বুকের কাঁপনলাগা" "অযুত আ'যাজন" "শিহরণে দিশেহারা" ইত্যাদি। আরো ছোটখাট অনেক ক্রুটী সত্বেও কবিতাটা নেহাৎ মন্দ হয় নাই।

অগ্রহায়ণের ভারতীতে "বাদল রাতের গান" বেরিয়েছে—শ্রীমোহিত লাল মজুমদার রচিত। বাদল রাতে বাঁশী বাজছিল—কবি বিনি নিদ্রায় স্বপন দেখছিলেন বিছানাতে শুয়ে, এক তরুণী হাসির গাঙে সুখের নীরে কলস ভরতে আসছিল কিন্তু পথ হারিয়ে অন্য কারো ঘরে উঠ্‌ল—পরে দেখলেন—বাদল মেঘের অশ্রুজলে তার কুম্ভ ভরা—কিন্তু তবু তা' তরুণী বুকে আঁকড়ে ধরে' রেখেছে। কবির শিথান পরে দাঁড়িয়ে 'ঝুঁকে' বাদল ধারায় গান করছিল। বুকের আঁচে' অধর তেমনি রাঙা আছে দেখে কবি তাঁকে (অবশ্য স্বপ্নে) চুমু খেতে গেলেন আর অমনি—

"জানলা ঠেলে দম্‌কা হাওয়া
ধম্‌কে বলে "আবার চাওয়া,
সিঁদুর ওযে সীঁথির রেখায়,—
পরের ঠোঁট চুমু কি খায়?"

বিক্সাব গান। শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়। ভাল ভাল মিল দেওয়ার লোভে কবি মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব পদ বিন্যাস করেছেন—তা ছাড়া অন্য হিসাবে কবিতাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী ও সুশ্রাব্য হয়েছে। কবিতার ভাষাটা সম্পূর্ণ বিক্সাওয়ালার মুখের উপযোগী করলে আরো ভাল হতো। কবি নিজে বিক্স টান্‌লে যে সব কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত—সেই সব কথা অনেক ঠাঁয়ে বেরিয়ে গেছে।

'এক'—শ্রীগিরিজা কুমার বসু। লেখক নিজেকে বিশ্বভোলা কবি বলেছেন—তিনি তা বলতে পারেন—গিরিজা বাবু এমন কিছুই এখনো দেন নাই যে জন্য তাঁকে আমরা কবি বল্‌তে পারি। এত সহজে কবি হওয়া যায় না। ৺সত্যেন্দ্র নাই। বঙ্গ সমাজে এবস্তোঽপি ক্রমায়তে হিসাবে কবি হ'তে পারতেন—কিন্তু তারো উপায় নাই। শ্রীনরেন্দ্র দেব অনেকের চেয়ে ঢের বেশী বড় কবি। হেমেন্দ্র কুমার বাবু ২।৪ মাস কবিতার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাও কতকটা বিস্ময়জনক—৺সত্যেন্দ্র নাথের ধারা তিনি বজায় রাখতে পারবেন ভরসা করি। কিন্তু গিরিজা বাবুর কোন আশা নাই।

পল্লী শ্রী—শারদীয় সংখ্যা—

পল্লী শ্রী। শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ। শ্রীপতি বাবুর রচনাভঙ্গি ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে। এ কবিতাটিতে বিশেষ 'আন্তরিকতার' পরিচয় পাওয়া না গেলেও একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

শ্রীপত্রিবাবু অতীব বিভক্তি 'র' ও 'এর' ইত্যাদির পর অনাবশ্যকে 'ই' লাগান, কেন? মহাপ্রলয়ের ধ্বংশের মাঝে জেগে আছি নিজ গরিমায়"—একেবারে মহাপ্রলয়ের কথাটা না দিলেই ভাল হ'ত। "গরজিয়া কত কালের লহর"—কালের লহর ভাল শোনাচ্ছে না। "ছুটে আসে বক্ষ সিন্ধু উপর"—ছন্দের দোষ। একই কবিতায় 'তুমি' ও 'তুই' দুই প্রকার আহ্বান সুষ্ঠু নয়। "সরলতা তোর বুকের বসন"—শিষ্ট অলঙ্কার নয়।

'বোপেছে' না লিখে 'বুনেছে' লিখলে ভাল হ'ত। আরো ২।৪ টি ছোট খাট ত্রুটী আছে।

গান। দেশনায়ক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত—গানটীতে মহাত্মার ভক্ত হৃদয়ের মাধুর্য্য বেশ ফুটেছে।

গান। শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

সুন্দর রচনা। ভারত তপোবনের অমৃত পুত্রগণের যা অন্তরের বাণী কবি তা' ললিত মধুর ছন্দে ঝঙ্কৃত করেছেন।

মরণ মথিয়া এনেছি বহিয়া বার্ত্তা অমৃতের
অন্ত করিয়া অন্ধ শাসন মায়াবি অনৃতের।

এই দুই পংক্তি একেবারেই সুরচিত হয় নাই।

জনম মরণ—অনৃত মাঝে অমৃত পথ যাত্রী"

এখানে ছন্দের দোষ ঘটেছে। ছন্দের দোষ ঘটিবার কারণ হয়েছে কবি অমৃতকে "অম্রিত" উচ্চারণ করেছেন বলে'।

ভগ্নস্তূপ। কাজী নজরুল ইস্লাম। কারুণ্য ও মাধুর্য্যে ভরপুর। এই কবিতায় কবির স্বভাব-সিদ্ধ mannerism ও conceit একেবারেই নাই। রচনায় প্রেরণাহ অপরিচিত শব্দের চড়ায় চড়ায় প্রতিহত হয়নি।

শিউলি ও কাঞ্চন। শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। চলন সই রচনা। কবি একসঙ্গে শ্যামল সবুজ লিখলেন কেন! শ্যামলই ত সবুজ।

দেহের মিলন। শ্রীকালিদাস রায়। কবি বলতে চান প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষার সহায়ক দেহের মিলন অপবিত্র নয়—এবং এই মিলনেই "প্রেমের হলো জয়। এই মিলনই করল তারে অনন্ত অব্যয়।" "বৈকুণ্ঠে মিলন হলো তাইত হবর ছুটে"—এই বৈকুণ্ঠের মিলন জিনিসটা ভাল বুঝলাম না—কাজেই ২য় শ্লোকের সৌন্দর্য্যও আমাদের অনুপভুক্ত থাকল।

পল্লীপূর্ণিমা। শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। "চাঁদের ফিক্-ফিক্" আবার কি? কবি বলছেন—"নিঝুম নির্জ্জন" অথচ বলছেন—"বাউল কীর্ত্তন" ঝিঁঝির ঝন্ ঝন্? চাতক ক্রন্দন।" পূর্ণিমা রাত্রিতে চাতক ক্রন্দন—অলঙ্কার শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আবার বলছেন "কে অই যায় সব। দেশের গায় স্তব"। এটা আবার নেহাৎ বেপাপ্পা। "নিঝুম নির্জ্জনের সার্থকতাই বা কই?

"বাতাস ঝির ঝির শরীর সির সির"

তা হোক—কিন্তু অকারণে কেন "আঁখির বয় নীর? এত পাখী থাকতে "কাকের মিল মিশ"ই বা কেন? পূর্ণিমা রাত্রে দিন ভেবে কাক ডেকে উঠতে পারে কিন্তু কবি তা'ত বলেন নাই।

জলদ ভাসমান বেড়ায় খান খান,
শোনায় আস্মান মেঘের সামগান।

জলদ ও মেঘ যেন দুটো পৃথক জিনিষ এ দু'ছত্রে তাই সূচিত হয়। আর ভাসমান কি? ভাসমান অর্থে—দীপ্যমান কিন্তু কবি সে অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে'ত মনে হয় না। প্লবমান-অর্থেই ব্যবহার করেছেন—কিন্তু সেটা ভুল। আর—সামগানই যদি গাওয়াতে হয় তবে আকাশকে 'আস্মান' (পারসী শব্দ) বলা ভাল হয়নি।

'শেয়াল মালসাট' ও 'কুঁকুর ঝগ্‌ড়াট' এ সমাস ছুটী ভাল লাগলনা।

"ব্যাঙের সোরসাড়" শ্রুতিকটু।

মশায় পঁন পঁন"—বুঝি—মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝি। কিন্তু—

খামায় নন্দন আকুল ক্রন্দন,

তাবায় স্পন্দন আলোর গুঞ্জন

একেবারেই বুঝলাম না।

মোটের উপর কবিতাটা তেমন জমে নাই।

যতীন্দ্র প্রসাদের এ শ্রেণীর অনেক কবিতাই আমাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু এটির আমরা প্রশংসা করতে পারলাম না।

ছাত্রজীবনরঙ্গ চিত্রের কবিতা তিনটি বেশ লাগল। একালের ছাত্রের চরিত্র বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত হয় নাই। একালের ছাত্রগণ যেন সাপের পাঁচপা দেখেছে—অধ্যাপক ও শিক্ষক গণকে অপ্রতিভ ও অপমানিত করতে পারলেই এদের বাহাদুরী। বিশেষতঃ যে সকল ছেলের বাপের অবস্থা একটু ভাল তারা দরিদ্র শিক্ষককে বাজার সরকারের মত নগণ্য মনে করে। অধ্যাপক বা শিক্ষক বিদ্বানই হোন্ চরিত্রবান ও ত্যাগী পুরুষই হোন্ আর অধ্যাপনা কার্য্যে যতই কৃতিত্ব দেখান কিছুতেই সরল ও সৎপথে নৈতিক তেজস্বিতার সঙ্গে চলিলে ছাত্রগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন না। বরং যাঁরা সাহেবি ভাবে চলেন, বিলেতী পোষাক পরেন সাহেবি ঢঙে কথা বলন—ছেলেদের সঙ্গে প্রগলভ ভাবে মিশে' তারল্য ও লঘুতা প্রকাশ করেন—ছেলেদের অসঙ্গত আবদারে ও ধৃষ্টতার প্রশ্রয় দেন—তাঁরা ছাত্রগণের কতকটা মনোরঞ্জন করতে পারেন। ১৫।১৬ বৎসর আগে যখন পরীক্ষা পাশকরা কঠিন ছিল—তখন ছেলেরা অনেক ভদ্র শান্ত ছিল—বখাটে ও গুণ্ডারা তখন কলেজ পর্য্যন্ত পৌছাতেই পারতনা। এখন পাশ করার চিন্তা নাই—কাজেই শিক্ষক মর্দ্দনের প্রচুর অবসর।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক কবি শ্রীমানবুদ্ধদেব বসুর 'খোকা' চমৎকার রচনা। এই বালক কবিকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এখানে সুন্দর রচনাটি আমূল তুলিয়া দিলাম।

খোকা

উজ্জ্বলদ্যুতি তব সুন্দর বদনে
বিকসিত হয়ে উঠে পুণ্যের বোধনে।
অন্তরমাঝে তব সরলতা কোহিনুর,
বীণা তান জিনি তব আধবুলি সুমধুর।
নয়নের নীল নভে রামধনু সৃষ্টি
স্বর্গের মহিমায় পূর্ণ ও দৃষ্টি।
মুখে তব মাখা মাখি অশ্রু ও হাস্য,
প্রাবৃট কমলে যেন রবিকর লাস্য।
বাধাহীন সারাদিন গতি উচ্ছৃঙ্খল,
নির্ঝর সম শুধু ছুটে চলে অবিরল।
শ্রাবণের ধারাসম তব চুমে শান্তি,
তব ক্রন্দনে হয় সাহানার ভ্রান্তি।
তব প্রাণ নন্দনে ফুটে কত পারিজাত,
মুঠি মুঠি ছড়াইছ নাহি কোন দৃকপাত।
উদ্দাম দুর্দ্দম খেলা ধূলা সারাদিন,
স্বাস্থ্য ও স্বস্তিতে ও জীবন অমলিন।
অঙ্গের কান্তিই তব সাজ সজ্জা,
অন্তরে নাহি কোন দ্বিধা ভয় লজ্জা।
নীলাকাশ সম তুমি মুক্ত উদার
মানস মোহন যেন বালক অনঙ্গ।
প্রেমময়ী ম্যালেরিয়া—এখনও আসেনাই—
পথ অনেক একত্র আছে।

গ্লেসিয়ারস্
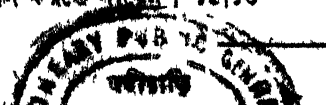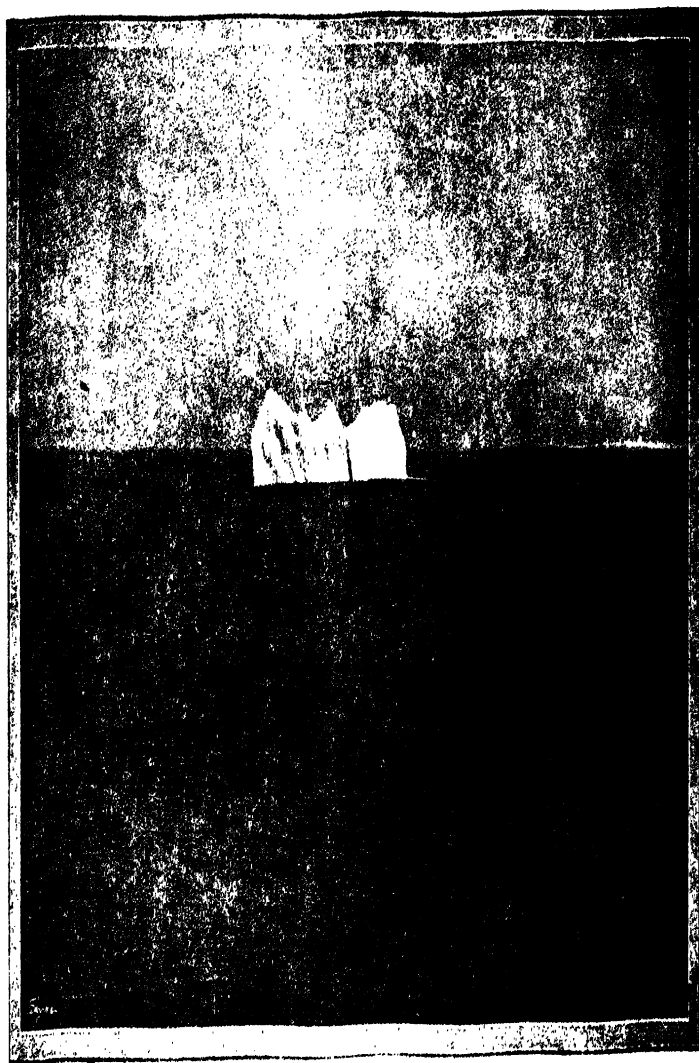
“সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।”

১৮শ বর্ষ } মাঘ ১৩২৯ { ৭ম সংখ্যা

“প্রকৃতির পরিহাস”

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]
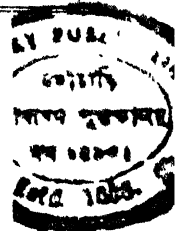
বাইশ বছর পেরিয়ে এসে হঠাৎ সে আজ সন্ধ্যাবেলা থম্‌কে দাঁড়াল—সাম্‌নে শীতের দারুণ বর্ষা-দুর্যোগে, সে আজ কেমনতর বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

বুকের মধ্যে একটা চাপা কান্না গুমরে গুম্‌রে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল—একটা অজানা অস্থিরতায় সে আজ উন্মনা, আকাশের দিকে উদাস ভাবে চেয়ে দেখ্‌ল—তার এত দিনকার জীবনভরা ব্যথার কালিমা যেন ঘনিয়ে উঠে আজ মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়েছে—আরো কালো!—আরো কালো!

তিন দিনের অসহ্য গুমট্ বুকে নিয়ে আকাশ যেন ভারী হয়ে পড়েছে!—পাঁজরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় যেমন বেদনা জমে জমে মনটাকে ভারী আর দেহটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তেমনি মেঘের পর মেঘ ঘুলিয়ে উঠে সারা আকাশকে কালো করে পৃথিবীর বুকে কি একটা চঞ্চলতা এনেছে! তার মধ্যে আজ ও কিসের উত্তরোল, কিসের ঘনায়মান নিগূঢ় আন্দোলন?

অকস্মাৎ আজ নিজের সমস্ত মনের কালো ছাপটা সারা আকাশের গায় পড়ে গিয়েছে দেখে সে আজ থম্‌কে দাঁড়াল—তার এই বাইশ বছরের জীবনের উপর আঘাতের পর আঘাতে এমনি কালো ছাপই ত' পড়ে গিয়েচে—শুধু কালো, ওগো শুধু কালো—একটুও আলো নেই, একটুও আলো নেই!

বাইরের প্রকৃতিতে জীবনের প্রতিকৃতি দেখে সে ত আজ সান্ত্বনা পেল না—জীবনের রসকে উপভোগ করতে গিয়ে সে যে এতদিন শুধু হলাহল পান করে এসেছে এইটে অনুভব করে' সে যেন মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল!!

কন্‌কনে বাতাস এসে তার দেহটাকে একটা এমন জানান দিয়ে গেল— সে ভাব্‌ল এ প্রকৃতির পরিহাস!!

বৃষ্টি তখন টপ্ টপ্ করে পড়ছিল, মনটা যেন হাঁপিয়ে উঠে বল্‌ছিল—

ঢালো ওগো আরো ঢালো
বুকের আগুন শীতল করিয়া
অবিরাম শুধু ঢালো— !

খুব মুষলধারে একবার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে সে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত!!

বাইরের দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য, ভিতরের অক্ষমতা ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে যে এতদিন যুদ্ধ করে এসেছে—সে গুলো আজ যেন নূতন বলে" বলীয়ান হয়ে তাকে একসঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করে বস্‌ল—সে দেখ্‌ল চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে—আজ সে বাহিরকে বড় করে অবলম্বন করে দাঁড়াতে চায়—

কিন্তু কৈ, সব যে অন্ধকার,!—কিন্তু এ অন্ধকার বাইরের না মনের?—

সে ভাব্‌ল এও প্রকৃতির পরিহাস!!

* * *

শূন্য ঘর, একা সে বসে আছে আর সারা জীবনের হিসাব নিকাশের খতিয়ান করচে—সবই ফাঁকি, ওগো সবই ফাঁকি!!

কি সে অভাব?—বুক যে তার আজ আবার নোতুন বেদনায় ভরে উঠ্‌ল! কাঙাল সে যে, একটা কথার কাঙাল, একটু হাসির, এক বিন্দু করুণার কাঙাল, এক তিল স্নেহের কাঙাল সে, তার প্রাণে এই প্রকৃতি বিপর্য্যের মধ্যে একি অনন্ত শূন্যতা, একি অসীম অভাব, আজ জেগে উঠ্‌ল! ... ... ভারী অন্ধকার তখন চারিদিকে—তার মনের চাইতেও বেশী অন্ধকার তখন পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েচে।

* * *

হাতটা কেঁপে উঠ্‌ল—তিন বারের চেষ্টায় সে আলোটা জ্বালল বটে কিন্তু আচমকা একটা দমকা বাতাস এসে প্রদীপ নিভিয়ে তার জোড়া তাড়া দেওয়া বুকটা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল!—সব স্থির! সব নিস্তব্ধ! শুধু শুনতে পাচ্ছিল সে তার হৃদপিণ্ডের ত্বরিৎ কম্পনের শব্দ! উঠে দাঁড়াল সে—মাথায় তার কিসের খেয়াল?

* * *

নদীর ধারে, আধ-উপড়ান একটা বটগাছের তলায় ভোরের আলো যখন তার অবশ অবসন্ন দেহটার উপর এসে আস্তে আস্তে পড়ল, তখন সে অতি ভয়ে ভয়ে চোখ মেলবার চেষ্টা করচে,—

সারা রাতের বৃষ্টিতে তার দেহের উপর স্রোত বয়ে গিয়েচে—বাতাসের আগায় ধুলো মাটি উড়ে এসে তার সারা দেহ ছেয়ে ফেলেছে!—খুলি খুলি করেও চোখ সে খুলতে পারচে না—

জেগে ওঠার চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমতায় বেদনায় সে আরো অস্থির হয়ে উঠ্‌ল!—

এ কি? এ কার কোমল স্পর্শ এসে তার সারা গায়ে নিরাময়ের স্বস্তি বিলিয়ে দিলে।

ফুলের কলির মত কার আঙ্গুল ছটি তার চোখ খুলে দিলে?

—সে বিহ্বল হয়ে মিনতির সুরে বল্‌ল—সত্যই কি তুমি?—না এ প্রকৃতির পরিহাস?

বঙ্গনারী

[শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়।]

বিশ্বব্যথা তোর বুকে যে বাজছে মাগো দিবস যামী,
কেমন করে বুঝব সে ভাব, কেমন করে বলব আমি?
জীর্ণ বুকের তপ্তশ্বাস আর শিউলী-ঝরা অশ্রুরাশি
ভুলিয়ে ভলে, উঠছে ভেসে তোদের মুখে মরণ-হাসি!
কি বাথা অই হাসির আড়ে, শুকিয়ে উঠা কুসুম সম
ছদ্দিনে ঘোর বাজের আলো বিঁধিয়ে তোলে পরাণ মম।
আপন শিখা জ্বালিয়ে তুলি' গোপন মরম নিঃস্ব করি'
নিবিড় কালো আঁধার নাশি' আলোয় রাখ বিশ্ব ভরি'
মৃত প্রাণের সঞ্জীবনী, তপ্তহিয়ার শান্তিবারি;
সংজ্ঞা, সুধা দাত্রী ওগো জাগ্‌মা আজি বঙ্গনারী।

আকুল করা স্নেহের পরশ ছড়িয়ে গেছে সকল দেহে
অমর, সজীব প্রেমের বিতান উঠছে চেতে মৃতের গেহে।
পরের ছেলে, নিজের বলে আপন কর আপন-হারা
বিলিয়ে দিতে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখ মাতৃধারা।
'মা' 'মা' বলে ডাকলে পরে কোন স্বরগের চেতন-বায়ে
জাগিয়ে গেলে, সাধ্য কি তোর বসে থাকিস্ স্বপন-ছায়ে!
সাগর সম অতল হিয়া উথলে উঠে উত্তাল হ'য়ে
রাখতে সকল বিশ্বভুবন বাড়িয়ে দু'টি হস্ত দিয়ে!
বিশ্বমাতা শক্তিময়ী, তুই যে মাগো মূর্তি তারি
সংজ্ঞা, সুধা, সঞ্জীবনী জাগ্‌মা আজি বঙ্গনারী।

মরম মরুর পান্থপাদপ তৃষ্ণাতুরের হরতে জ্বালা,
আপনা শুধু বিকিয়ে দিয়ে বিশ্বভুবন করছ আলা।
তৃপ্তি তোমার ছড়িয়ে দেছ স্নিগ্ধ শ্যামল দেশের পরে
ফুল্ল হাসি ছড়িয়ে আছে রবির বিমল রশ্মি ভরে';
কণ্ঠে তোমার বিশ্ববাণী নিখিল ভুবন সাম্মিলনে
শান্তি প্রীতি সাম্য নীতি দেশের ব্রত উদ্বোধনে;
ভক্তি-ডোরে আছেন বাঁধা মন্দ-কারায় বিশ্বপতি
ছড়িয়ে গেছে কর্ম্ম মাঝে শক্তি তোমার আত্মব্রতী।
আশীষ তোমার শিয়ায় শিরায় চরণ রেণু বিঘ্নহারী
সংজ্ঞা, সুধা, সঞ্জীবনী জাগ্‌মা আজি বঙ্গনারী।

মত্ত উত্তাল মরণ-সায়র স্তব্ধ তোমার চরণ তলে
সিঁথির সিঁদূর উঠ্‌ছে ভাতি বিশ্ব-জোড়া ক্রন্দানলে।
ধূপের সম নিঃস্ব হ'য়ে বিলালে যে গন্ধ তুমি
তাতেই আজো অমর এ ধাম, বিশ্বজগৎ পুণ্যভূমি।
দুঃখে সুখে পতির পাশে ও'গো সতি আপন ভোলা,
প্রভঞ্জনে বরতে পার বক্ষে নিতে মরণ দোলা!
রোগে শোকে সান্ত্বনা দাও, দীর্ণ প্রাণে অভয় বাণী
আপন-হারা জীবন ভরি' পরের লাগি' – জীবন দানি'
সিঁদুর মাথে নোয়া হাতে তোমায় যেন দেখতে পারি
সংজ্ঞা, সুধা, সঞ্জীবনী দাঁড়াও আজি বঙ্গনারী।

দাঁড়াও আজি বঙ্গনারী, দাঁড়াও আজি মুখটী তুলে
বিশ্বভুবন ডাকছে তোমায় মিলন-মহাসাগর কূলে,
মাতৃরূপে মুক্তি জাগো দাশুক পরশ বক্ষে, মনে
ভগ্নীরূপে শক্তিময়ী, পত্নী প্রেমের উদ্বোধনে,
ক'ণ্ঠে তোমার বিজয় গীতি শঙ্খ বাজাও গভীর রোলে
লজ্জা ভয়ের কোথায় সময় জীবন দোলে মরণ দোলে?
উলুধ্বনি দাওগো আজি, আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালো
নীল আকাশের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিতে তোমার আলো;
দিও তোমার চরণ ছোঁয়া সর্ব্বজয়ী শান্তি বারি
ঘুমন্ত এই দেশের মাঝে জাগ্‌মা আজি বঙ্গনারী!

পাগলের ডায়েরী

বিশে মার্চ্চ,

ছিন্নপত্রে পড়েছিলাম "অ'মার দিনগুলো কথীর কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে দিচ্ছি।" আজ দিনের কাজ থামিয়ে দেখ্‌তে যেয়ে আমার সেই কথাটিই মনে পড়ে গেল। স্রোতের ফুলের মত হেল্‌তে দুল্‌তে ঢেউয়ের বুকে উঠে নেমে আমার দিনগুলো উদ্দেশ্যহীন পথের পথিক হচ্ছে—আর সে একটা দুটো দিন নয়, জীবনের অধিকাংশ দিনই। যতবার জীবনে নিয়মিত চল্‌তে' চেষ্টা করেছি, প্রতি-বারেই ব্যর্থ হয়েছি কেন? অন্তরের ভিতর হ'তে কোনও সাড়া আসেনা কি? বাইরে বাইরে একটা লোক-দেখানো মন-বুঝানো বুজরুকী। হায়রে! অবনতির প্রধান লক্ষণই তো তাই; ভিতরে ভিতরে কই তেমন কোনও উৎসাহের আভাসইত পাইনা, সোডা-ওয়াটারের মত কিছুখন উথলে আবার সব থির।

না, ঐটেই তাড়াতে হ'বে। আমার মধ্যে কোনও দিন আমিতো প্রাণের অভাব বোধ করিনি'। যৌবনের তরুণ-বীণায় মিঠে সুরে মেঠোরাগিনীর তো অভাব কোনও দিন হয়নি'—বরং তার প্রাবল্যটাই বড় বেশী অনুভব করি। চলার পথে কোনও দিন থামিনি'—আর যদিও থেমেছি তবে সে পথের পাশের ফোটাফুল চয়ন করুতে—তাই পথে চল্‌তে চল্‌তে এগিইছি কি পিছিইছি তা আমার বিচার করার দরকার হয়নি—চলাই আমার কারবার 'পথে চলা সেই তো আমার পাওয়া'।

আমার একটা আদর্শ আছে। তার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক আমার Shallowness ভাসা ভাসা অস্পষ্টতা—কুহেলী—নিত্য নূতন পথের খোঁজ।

সেটা একদিক দিয়ে ভালো। এমনি করে একদিন যেতে যেতে দিনের আলোয় তোমার সেই রক্তরাঙা পায়ের উদ্দেশ পাবো। সে কবে গো সে কবে?

একুশে মার্চ্চ

দুর্ব্বল দৈন্য নিয়ে মানুষের ম'রবার সখ কেন হয়?—যতক্ষণ না তার ক্ষমতা হচ্ছে যে সে সেই অক্ষমতার দৈন্যকে দূর করে' ঠিক্ বিপরীত রকম ক্ষমতার অধিকারী হয়, ততক্ষণ সেত মানুষই নয়। মানুষ কেন দুর্ব্বল হবে? যা সে ক'রবে, তার মধ্যে কোনও দ্বিধা থাক্‌বেনা। স্বাধীনতা তার মূল মন্ত্র। পরাধীনতা তা'র সইবে কেন? স্বাধীনতার পথে যত বাধাবিঘ্ন সে ঠেলে দূরে ফেল্‌বে—দু'পায়ে দলিয়ে যাবে। স্বাধীন যে তার স্বেচ্ছাচারী হওয়া চলে কিন্তু যে স্বেচ্ছাচারী তার স্বাধীন হওয়া চলেনা।

ওগো! বুকের মাঝে যে বেদনার রক্ত শতদল ফুটে উঠলো, তার সার্থকতা তোমার পূজায়! সে ফোটা ফুল যদি তোমার পথে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে পারে—তবে তার সব ক'টা পাপড়িই যে কৃতী! আমার সুখে দুখে, ব্যথায় বেদনায় তোমার পায়ের চিহ্ন।

আমি কবি, আমি তাই পথ ভুলি। আমি আনমনা, তাই লক্ষ্য ঠিক থাকেনা। কিন্তু সেই ভোলা-পথের প্রান্তেই শান্তি-কুঞ্জ। সেখানে তুমি আমার জন্য নিজ হাতে যত্ন

করে' অভ্যর্থনা ক'র্‌বে আমি তারই প্রতীক্ষা করি, আমি তারই আরাধনা করি। তাই এপথ চলার মাঝে আমি যদি সহস্রবার শত-বারও পথ ভুলি, তুমি আমাকে ভুল্‌বে না—সেখানে যে আমার শতবসন্ত সার্থক!

বাইশে মার্চ্চ শুক্লা চতুর্দ্দশী

এই তো ভালবাসা। এর দামই বা কত, এর স্থায়িত্বই বা কতটুকু। মনে পড়ে' কাণে কাণে সেই কতবার কতরকম করে বলা "তোমায় আমি বড় ভালবাসি গো এত ভালবাসা আমি কাউকেও বাসতে পারবো না—তুমি আমার প্রিয়তম।" আজ তাই মনে পড়ে' এত কষ্টেও আমার হাসি পায়। আমি তো তা শুন্‌তে চাইনি তবে যেচে যেচে বলা কেন? আর স্থায়িত্ব তো এই যে আমি যতক্ষণ তার মনোমত কাজ কর্‌বো ততক্ষণ—এইত ভালবাসা? হাসি পায়! তবে আমার কি দোষ। আমি যখন তোমার চোখে আজ আর সুন্দর নই তখন কেন তুমি আমার রইবে। ভালবাসায় যদি স্বার্থের অমৃত [?] না ফল্‌লো তবে সে ভালবাসা আবার কি?

কিন্তু বড় বুক ভরা তীব্র বিষাদ! এমন দেখিনি'। কত করে বোঝানো মনের কোণে তাও ব্যথা জমে, সেই আবার কত ভুলে যাওয়া অতীত নীরব রাতের গোপন চোখের জল গলে গলে পড়ে। তাও একটু আদরের কথা শুন্‌লে বুকে দমকা হাওয়া বয়—বড় ছেলেমানুষ-মন, সেত আর বাইরেটার মত এত অল্প বয়সে পেকে যাইনি' তাই। বড় অভিমান। কিসের জন্য? সৃষ্টিছাড়া অভিমান। অবুঝ মন সে বোঝেনা কার ক্ষতি!

যাক্ এর তো শেষ হবে না তবে কেন?

জানালার পাশে বসে অনেকক্ষণ শুক্লা চতুর্দ্দশীর নিদ্রাহারা চাঁদের দিকে চেয়ে আছি বড় কান্না পায়। সন্দাপের বড় বড় কথার অলঙ্কার কি আর সত্যিকার মানুষটিকে লুকিয়ে রাখতে পারে? সে যে বেরিয়ে আস্‌বেই নিখিলেশের মুখ দিয়ে। ভরা ফাল্গুন মনের আগুন বেড়েই চল্‌লো নিবলোনা। বড় একা। কিন্তু—না থাক। কাঁদান কেন? তাতেতো আর হারাধন ফিরে পাওয়া যাবে না, তবে কেন? যদি কোনও দিন পারি, হৃদয় দিয়ে আপন করে' নেবো। কিন্তু বড় একা!

তাই নানান্ রকম কথা, নানান্ রকম বার্ত্তা পথে চলার সাথী।

"জীবন আমার চল্‌ছে যেমন এম্‌নি ভাবে
দুঃখ-সুখের রঙে রঙে রাঙিয়ে যাবে
রঙের খেলার সেই সভাতে
দেখা হবে তোমার সাথে"
"তুমি আমায় চাবে আমিও
তোমায় চাবো।"

অপচয়-ক্ষতি-লোকসান—তার লাভের সাথে সমান আসন পাবে। তবে কেন আমি মুসড়াই।

আমার জীবন একটা গান! তাইতো কোকিল সেই গানের সাথে তান মিলিয়ে যখন কুহু কুহু ক'রে ডেকে উঠে তখন অত ভাল লাগে তাই চাঁপা ফুলের ভেসে আসা সুগন্ধের মদিরা পানে এত নেশা—তাই ছোট ছেলের কচি কচি দাঁতের হাসি এত সুন্দর দেখি, তাই মিষ্টি মুখে মিষ্টি কথা শুন্‌তে এত মিষ্টি লাগে। সে তো আমার সব জীবনের সাথে একহয়ে জড়িয়ে আছে,—থাক্।

[ক্রমশঃ]

আর্ট হিসাবে সাহিত্যের বিকাশ

(উপক্রমণিকা)

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সৌন্দর্য্য জিনিষটাকে রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের ভিতর দিয়া নিছক আনন্দ লাভের জন্য অনুভূতির দুয়ারে পৌছাইয়া দেওয়াই আর্টের সার্থকতা। হাটে মাঠে ঘাটে বাটে মানুষের এজন্য চেষ্টা দেখিতে পাই। রাস্তায় রাস্তায় প্রস্তর মূর্ত্তি, ময়দানে স্কোয়ারে সুদৃশ্য ফোয়ারা, বিচিত্র সাজে সজ্জিত গাছের সার, গৃহে গৃহে বারান্দায় লতাবাহার আর রঙ্গ‍গোলাপ র টবের সার বড় বড় লোকের বাড়ী কামরাকে কামরা ঠাশা বই এর রাশ, দেয়ালকে দেয়াল ভরা ছবির বহর এ সবই কি শুধু এই মনে করাইয়া দেয় না যে সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা আমাদের অস্থি-মজ্জাগত হইয়া আছে ? ইহা যেন আমাদের জীবনের অন্যতম উপাদান বিশেষ। প্রস্তর যুগের মানুষেরও গা ভরা উল্কি, পালকের মুকুট আর তালে তালে নৃত্য ভঙ্গিমা কি তাহারই সাক্ষ্য দেয় না ?

আর্ট বা কলাবিদ্যাকে মোটামুটি দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চারুকলা বা চারুশিল্প (Fine arts) ও ব্যবহারিক শিল্প (Mechanical arts) চারুশিল্প মানসিক আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য, নিছক মনের খোরাক পোষাক যোগায়, আর ব্যবহারিক শিল্প মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা অপনোদনের নিমিত্ত। কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি হইল প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ্যা আর কামার কুমার, ছুতার তাঁতির কাজ ইত্যাদি হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই দ্বিবিধ শিল্পের উন্নতিই মানব জাতির সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়েছে তবে ওর প্রথমটার সম্বন্ধ হইল মানুষের মনোজগতের সঙ্গে, দ্বিতীয়টার কারবার হইল দুনিয়াদারি লইয়া।

কারণ উদ্দেশ্য খুঁজিতে গেলে সহজেই অনুমিত হয় যে ব্যবহারিক শিল্পের মূলে হইল প্রয়োজনীয়তা কিন্তু চারুশিল্পের উদ্দেশ্যই বা কি আর তাহার সৃষ্টির কারণই বা কি ?

কবি বলিয়াছেন—

"গোলাপ ছিঁড়িয়া পাব কি গো কেহ
হাসি ভার কেড়ে নিতে
বলায় পড়েও হাসি ফেটে পড়ে
পাপড়িতে পাপড়িতে"—

মরণের অন্ধকারও উজ্জল করিয়া এই যে যোটা হাসি এই হাসি গোলাপের চাইতে অধিক সত্য ভাবে মানুষের বুকেই চিরন্তন হইয়া আছে ; তাহার রসদ যোগায় আর্ট— তাহার উপাদান যোগায় আর্ট, আর সেই-ই আর্টের কারণ, উদ্দেশ্য বা সার্থকতা।

অনেকে আর্টের চর্চ্চা Sentimental rubbish বলিয়া উড়াইয়া দেন, কারণ দুনিয়ায় তাঁহারা Utility র বাটখারায় তামাম্ জিনিষের তুল্য মূল্য বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে Sentiment rules the world" Sentimentএর বাঁধনেই সংসার চলে, সমাজ চলে, রাজ্য চলে। Utilityর দিক দিয়াও ইহার মূল্য আছে বৈ কি। মানব-রূপ যন্ত্রের Motor power হইল মন, যাহা

তাহার স্বাস্থ্য ও আনন্দ বিধান করে তাহার চর্চ্চা সুচারু রূপে করা একান্তই কর্ত্তব্য।

চারুশিল্প মোটামুটি দুই প্রকারের বলা যাইতে পারে,—প্রথম প্রকার—শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; দ্বিতীয়—দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সঙ্গীত ও কবিতা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে—ইহারা প্রথম শ্রেণীর, আর চিত্র, ভাস্কর শিল্প, স্থপতি বিদ্যা, ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর—ইহারাও প্রাণ আকুল করিয়া তোলে কিন্তু নয়নের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করে। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার কি করিয়া চলে? জার্ম্মান পণ্ডিত হেজেল ইহার বড় সুন্দর একটা ক্রমবিভাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আর্ট হইল তাহাই যাহা মনের দুয়ার গোড়ায় তাহাদের আনন্দ বারতা পৌছাইয়া দিতে বস্তুময় পদার্থের (matorial) স্বল্পতম সাহায্য লয়। এই বিভাগানুযায়ী কবিতায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও স্থপতি বিদ্যায় সর্ব্ব নিকৃষ্ট আর্টের বিকাশ সম্ভব। স্থপতি বিদ্যায় আর্টের স্ফুরণ বস্তুময় পদার্থের উপরই অধিকাংশ ভাবে নির্ভর করে, এবং বস্তুতঃ ইট-চূণ-পাথর-সুরকিতে আর্টত্ব ফুটিয়া ওঠে তখনই যখন ঐ গুলির সমষ্টি কোনো বিশেষ ভাবধারাকে অভিব্যক্ত করে। স্থপতি বিদ্যার পরেই ভাস্কর শিল্পের স্থান দেওয়া যাইতে পারে কারণ ইহাতেও বস্তুময় পদার্থ আর্ট বিকাশের প্রধান অবলম্বন বটে কিন্তু স্থপতি বিদ্যার সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে বস্তুময় পদার্থ ইহার প্রধান অবলম্বন হইলেও, ইহাতে এই অবলম্বনের স্বীয় বস্তুত্বের মূল্য কলা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমিয়া যায়। ইঁটপাথর ইমারতে পরিবর্ত্তিত হইতে তাহার যে পরিবর্ত্তন ঘটে—প্রস্তরখণ্ড বা পিত্তল ভাস্করের যন্ত্র ঠনৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ ভাবের ও কলার অভিব্যক্তিতে ঐ অবলম্বনের প্রস্তরত্ব বা পিত্তলত্বের মূল্য তখন খুব কমই থাকে,—থাকে না বলিলেই হয়। কারণ এখানে নির্জ্জীব প্রস্তর খণ্ড ইত্যাদিতে শিল্পকুশলতার সজীব বা অলীক পরিকল্পনার অভিব্যক্তি হইতেছে। ভাস্কর বিদ্যা হইতে চিত্রবিদ্যাকে আর এক ধাপ উপরে স্থান দেওয়া যায় কারণ এখানে অবলম্বন (পট) বস্তুময় পদার্থ হইলেও তাহার আয়তন কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থেই পর্য্যবসিত, উচ্চতা নাই সুতরাং ইহাতে বস্তুত্ব কম। কিন্তু এই অবলম্বন লইয়াই তাহার ত্রিবিধ আয়তনযুক্ত পদার্থের অলীক গতি ভাঙ্গিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়,—অতএব তাহার ভাস্কর অপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্য অধিক প্রয়োজন। তাহা ছাড়া চিত্রশিল্পী, স্থপতি শিল্পী ও ভাস্করের মাঝে শুধু নকলনবিশী করিয়াই খালাস পায় না; তাহাদের বাছাযের কাজ এবং মৌলিক সৃষ্টির কাজও করিতে হয়। তার পর সঙ্গীত বিদ্যার স্থান দেওয়া চলে। এখানে বস্তুময় পদার্থ হইল শব্দতরঙ্গ যাহার বিভিন্ন ছন্দে গ্রথিত ঘাত সংঘাত বিভিন্ন রস ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। তারও উচ্চে স্থান করিবার কারণ ইহা কথার ভিতর দিয়া প্রাণের মাঝে আনাগোনা করে,—আর 'কথ' জিনিষটা মোটেই বস্তুময় নহে। কিন্তু পণ্ডিত হেজেলের উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি এখানে আসিয়া একটু গোলকধাঁধার ফেরে পড়িয়া যায়। কারণ অনেকেই বলিবেন আর্টের অভিব্যক্তি গদ্য সাহিত্য অপেক্ষা পদ্য সাহিত্যেই অধিক প্রশস্ত। কিন্তু কবিতার সৌন্দর্য্যে ছন্দো-বৈচিত্র্যের মূল্য বড় কম নহে। ছন্দো-বিভিন্নতাজাত ধ্বনির বৈচিত্র্য কবিতার অনেক সৌন্দর্য্য যোগায়, কিন্তু গদ্য সাহিত্য ছন্দের ধার ধারে না, কাজেই ইহার বস্তুময় অবলম্বন কবিতার তুলনায় কম। যাহা হউক এত সুক্ষ্ম সমালোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই,—তা ছাড়া যদি কেহ বলেন গদ্যই শ্রেষ্ঠতর আর্ট বিকাশের উপযোগী তবে তাঁহার সহিত তো তর্কই থাকে না। যাহা হউক গদ্য ও পদ্য উভয়কেই সাহিত্যের গণ্ডীতে টানিয়া আনিয়া আর্ট হিসাবে সাহিত্যের মূল্য কি এবং ভালো মন্দ কি তাহার বিচারই আমরা করিব। [ক্রমশঃ]

নারীধর্ম্ম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

নারী সংসারের অন্তরে, আর পুরুষ সংসারের বাহিরে। বাহির ও অন্তরের মিলনেই এই বিরাট বিশ্বের বিকাশ। সৃষ্টি ও স্থিতি অনাদি অনন্ত কালের বিকাশের পরিণতি। নারী প্রকৃতি তাই প্রকৃতির সৃষ্টি ও পালনের ধর্ম্মে কোমলা, সেবাপরায়ণা। অনন্ত, অফুরন্ত সেবাব্রতের সাধনার ফলে প্রকৃতির পুত্র-কন্যায় বিশ্বের যে গার্হস্থ্য-জীবন তাহা আজ আমাদের নিকট বিরাট সমাজ ও ক্ষুদ্র পরিবার। সৃষ্টিকে কোলে করিয়া সস্নেহে নারী পালন না করিলে সৃষ্টি লোপ পাইতে বিলম্ব লাগিবে না।

নারী সৃষ্টির অন্তঃপুরে প্রথমে স্ত্রী, তার পরে মাতা। নারীত্বের সঙ্গে মাতৃত্বের এই সংযোগ শুধু রহস্য নয়, আদর্শ নয়, এই সংযোগে সৃষ্টির অদৃষ্ট পূর্ণরূপে বিকশিত। সৃষ্টির এই বিকাশ নরনারীর অদৃষ্ট ও পুরুষকারের জ্ঞান ও কর্ম্মের অনাদি অনন্ত শাশ্বত ইতিহাস।

নারী মা হইতে পারেন, স্ত্রী হইতে পারেন, ভগ্নী হইতে পারেন, কন্যা হইতে পারেন। নারীর মধ্যে এই যে রূপান্তরিত শক্তির চারিদিক বর্ত্তমান, ইহার মধ্যেই অনন্ত সৃষ্টি ডুবিয়া, মজিয়া, আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে।

সৃষ্টিকে বাদ দিয়া পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব সূক্ষ্ম অবস্থায় যেমনই থাক, স্থূল অবস্থায় তাহা লইয়া বিষয় ও সেইরূপ যাহা কিছু কার্য্য। বিষয়কে বাদ দিয়া সৃষ্টির সূক্ষ্ম বা অন্তর্নিবিষ্ট অবস্থায় শুধু মন ও আত্মা। মন ও আত্মা সৃষ্টির বাহিরের জিনিস নয়। অন্তরের এই অবস্থা বিষয়ের সম্পর্ক ছাড়া বাহিরের জগতে আনিয়া পৌঁছাইতে পারি না। সৃষ্টি তত্ত্বে তখন আমরা অদ্বৈতবাদী। কিন্তু দ্বৈতশক্তিই সৃষ্টি প্রবাহের মূল। এই দ্বৈতশক্তির মূলে নারী সৃষ্টিকে অস্বীকার করিয়া তার অফুরন্ত স্নেহ মমতা লইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম স্বীকার করে নাই, বরং সন্ন্যাসী পুরুষকে সঙ্গী লইয়া, সৃষ্টির অনন্ত দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, অনুভূতি মাথায় করিয়া লইয়াছে। নারী তখন সমাজকেন্দ্র পুরুষ ও নারীর শক্তি লইয়া সামাজিক হইয়াছে। সমাজের অন্তর কেন্দ্রে স্নেহ ও প্রেমের অনন্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। পুরুষ সৃষ্টিকে অস্বীকার করিয়া যখন অগ্রসর হইতে পারে নাই, তখনও নারী শক্তিকে লইয়া কাম্যবনে প্রবেশ করিয়াছে। নারীর ধর্ম্ম সে অনাদি অনন্ত কাল হইতে অস্বীকার করিয়া বুঝিয়াছে, সেও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে মাত্র। কারণ সৃষ্টি নারীরও নহে, পুরুষেরও নহে। সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রকৃতির নর-নারীর প্রবৃত্তি সঞ্জাত কামনার বিকাশ ও পরিণতি। ফলে, ফুলে, সচেতনে, অচেতনে প্রকৃতির এই লীলাসঞ্জাত জ্ঞানশক্তির দুটী ধারায় নারী আর পুরুষ পরস্পর প্রেমে

সম্মিলিত, প্রীতিতে আলিঙ্গিত, ভক্তিতে প্রনত ও স্নেহে সঞ্জীবিত।

নারীর কাছে পুরুষই সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা। নারীর কাছে পুরুষই তার সংসার সাধনার আশ্রয়। নারীধর্ম সৃষ্টির অন্তরে পুরুষের কামনার ও কর্ম্মপ্রেরণার সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িত। নারীর ধর্ম সৃষ্টি, সৃষ্টির পালন, সৃষ্টির সেবা, নারীর ধর্ম সৃষ্টির জন্য আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ,—সৃষ্টির জন্য তার সমগ্র মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনন্ত প্রয়োগ। নারীর ধর্ম্ম অনন্ত প্রেম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, অনন্ত সাম্য ভাব। নারীধর্ম্মের কাছে সৃষ্টির শিশু সুন্দর হউক, অসুন্দর হউক, নারীর সে স্নেহের দুলাল। নারীর ত্যাগ ধর্ম্মে সৃষ্টির স্বার্থে পুরুষও সাম্যবাদী হইতে পারিয়াছে। নারী ধর্ম্মের সহিত নরধর্ম্মের প্রভেদ শুধু জ্ঞানে নয়, কর্ম্মে নয়, প্রভেদ স্বার্থত্যাগে, প্রভেদ আত্মত্যাগে। পুরুষ জ্ঞান ও কর্ম্মের বহিরঙ্গে স্বার্থ লইয়া যে যত ব্যস্ত, সে তত স্বার্থত্যাগে অনিচ্ছুক। ত্যাগ পরায়ণা নারী জ্ঞান ও কর্ম্মের বহিরঙ্গের বাহ্যাড়ম্বরে বহির্জগতের মধ্যে স্বার্থের ব্যবসায় ছড়াইয়া দিতে চাহে নাই। চাহে নাই বলিয়াই পারে নাই। নারী অন্তঃপুরে নীরবে আপনার রাজ্যের সাম্রাজ্ঞীরূপে পরিবারের জন্য, স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য সকল স্বার্থ বণ্টন করিয়া দিয়া বাকীটুকু লইয়া ধর্ম্মের সেবায় ব্যস্ত রহিয়াছে। তার পরও যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, সে টুকু তার সমগ্র জীবনের সৌন্দর্য্য সাধনায় লাগাইয়া বাকী স্বার্থ-টুকু তার স্বামী পুত্রের জন্য বা আরও অধিক ব্যাপক-রূপে সংসারের সেবার জন্য সঞ্চয় করিতেছে, ব্যয় করিতেছে।

নারী ধর্ম্ম বিরোধী সেই খানেই, যেখানে পুরুষ তার প্রত্যেক আকাঙ্খিত অধিকার অবিরত ক্ষুণ্ণ করিয়া, তার শক্তি, সামর্থ্য নিষ্পেষিত করিয়া, তার ব্যক্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া তার স্নেহ, মমতা, স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মত্যাগ একান্ত অবজ্ঞা করিয়া তাহার নারীত্বের সমগ্র শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে, সমগ্র শক্তি সামাজিক কেন্দ্রের বাহিরে গড়াইয়া দিয়া বা ভিতরের দিকে কাটিয়া ছাটিয়া ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই খানেই নারী-ধর্ম্ম বিরোধী সামাজিকের মত আত্ম কলহে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সুখ, শান্তির উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। সমাজ তাহাতে হীনতর হইয়াছে, বিকার-গ্রস্ত হইয়াছে, শক্তিহীন হইয়াছে, কর্ম্মহীন হইয়াছে, জ্ঞান-হীন হইয়াছে। অবশেষে শান্তিহীন হইয়া সামাজিক ঐক্যকেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইয়াছে। আর না হয়ত অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় ঐক্য কেন্দ্রের শক্তি-সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

আকাঙ্খা যাহারই পূর্ণ হয় নাই তাহারই মধ্যে আশার সমাধি পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। যখন সে তাহার শক্তির অনুকূল অবস্থায় পৌছিয়াছে, তখনই আবার নির্ম্মূলিত আশাতরুর গোড়ায় শক্তি ও সাধনা সলিল সিঞ্চন করিয়া আপনার আকাঙ্খিত বস্তু লাভের প্রয়াশ পাইয়াছে। মনের ধর্ম্মের এই স্বাভাবিক অবস্থা স্ত্রী পুরুষে সমান। নারীধর্ম্মের এই মনস্তত্ত্বে ভ্রান্তি উপস্থিত হয় নাই, এমন সমাজও নাইই, পরিবারও বিরল। সৃষ্টির আনন্দ যে জ্ঞানে ও কর্ম্মে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই। সৃষ্টির আনন্দ রসে ও রূপে। নারী তাহার সে আনন্দ সৃষ্টির মধ্যেই জগদ্ধাত্রীরূপে বিতরণ করিয়া

দিয়া কল্যাণীমূর্ত্তি হইয়াছেন। ধর্ম্ম নর নারীর আত্মার বস্তু, সৃষ্টিও নরনারীর আপনার বস্তু। পুরুষের ধর্ম্মের সহিত স্ত্রী ধর্ম্মের মিলন চিরন্তন। পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শরীর, মন, আত্মা বাহিরের জগতের ও অন্তরের জগতের সৃষ্টি নূতন অনন্ত কাল ধরিয়া রচনা করিতেছে।

নারী অস্বতন্ত্রা বুঝি এই জন্যই। নারী আপনার অভিন্ন অস্তিত্বের অন্তরালে আপনা-আপনি স্বতন্ত্র কিছু খুঁজিয়া পায় নাই সে সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে তিল তিল করিয়া বণ্টন করিয়া দিয় স্নেহে আর প্রেমে, ভক্তিতে আর প্রীতিতে অরুন্ধতি হয় আছে।

অবগুণ্ঠিতা নারী আজ আপনার জ্ঞানও কর্ম্ম স্বতন্ত্র করি॥ তোমায় লইয়া সাহসা সমাজ পুরুষ ও নারীর। নারী স্বতন্ত্রা হইয়া সমাজ বহিস্কৃত হইবেন না, বরং স্বতন্ত্র শক্তি বাড়াইয়া পুরুষের স্বতন্ত্র শক্তির সঙ্গে জীবন্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবেন। সমাজের সর্ব্বব্যাপী হল শক্তির বিকাশ আজ নারীও চাহেন, পুরুষও চাহেন। সমাজের অন্তরে, বাহিরে নারীর ও পুরুষের অসংখ্য নবনব রক্তের ধারায় বিশ্বের রঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়া আজ নর ও নারীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এমনই বিক্ষুব্ধতা পরিবর্ত্তনের সূচনায় সকল সমাজেই আসিয়াছে, সকল সমাজেরই শতশত পরিবর্ত্তনে উন্নত, অবনতি হইয়াছে। নর নারীর জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির জাগরণ আজ বিশ্বের সমাজতত্ত্বের ইতিহাসের আর এক অধ্যায় লিখিয়া রাখিবে, ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা"।

নারী-ধর্ম্মে বিদ্রোহ অস্বাভাবিক। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী বীরের যেমন অধিকার ও আত্মসম্মান জ্ঞান (অতি+আচার) অত্যাচার মূলক নহে, তেমনি নারীর এই চেতনা, অধিকার ও আত্ম সম্মানের আকাঙ্খা অন্যায় নহে। পুরুষের সঙ্গে নারীর সমষ্টিগত ভাবে বিদ্রোহ, অন্যায়, অসঙ্গত, অসম্ভব। ইহা অধিকার লাভের প্রচেষ্টা। যথার্থ মাতৃত্ব ও নারীত্বের দাবী। নারীর যথার্থ বিদ্রোহ সমাজ ও পরিবার ধ্বংস নয়। নারী স্বামীর সর্ব্বস্ব চায় নিজের জন্য নহে, ভবিষ্য বংশের জন্য। এই ভবিষ্য বংশের বিকাশ "নারীর মাতৃত্ব বিশ্বের সর্ব্বস্ব লাভের অধিকারিণী।

নারী বিদ্রোহ করিবে কার সঙ্গে। সন্তানের সঙ্গে না স্বামীর সঙ্গে। পিতার সঙ্গে, না ভ্রাতার সঙ্গে। সে বিদ্রোহ করিয়া সৃষ্টির বিকাশ করিবে কি লইয়া! যথার্থ অধিকার স্থাপনের জন্য যে তেজস্বিতা, আত্মনির্ভরতা, মনস্বিতা, তন্ময়তা ব্যাকুলতা, তাহা তাহার বিদ্রোহ নিবারণেরই উপাদান। বিকাশের ইতিহাসে সংযোগ ও বিয়োগের ধারাবাহিকতায় বিদ্রোহীর স্থান শুধু নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, স্বতন্ত্র স্ব-স্বাধীন সামাজিকের স্থিতি যুগ-যুগান্ত ব্যাপী।

নারী-ধর্ম্মের উপাদান আত্মোৎসর্গে পরিপুষ্ট। নারী তার ধর্ম্মের ইতিহাস জানিবে, কর্ম্মের ইতিহাস জানিবে, জ্ঞানের ইতিহাস জানিবে, ইহাই নারীর স্বাভাবিক অবস্থা। এই নারী ধর্ম্মে বাধা দিয়া শাস্ত্র, পুরাণ গড়িয়া নারীর-স্বামী, পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা গৌরবান্বিত হইতে পারেন না।

মানুষের মঙ্গলের নৈতিক বিধান নর-নারী সকলের জন্যই রচিত। নৈতিক শক্তির মূল্য যাহারা বোঝে, তাহারা কখনই নৈতিক বিধান অমান্য করিতে পারে না। নীতি-

বিদও যদি কখনও কোনও অবস্থা বিপর্য্যয়ে নৈতিক বিধান অমান্য করিতেই বাধ্য হন, তিনি তাহার প্রায়শ্চিত্ত বা সংশোধনের জন্য ব্যস্ত না হইয়া পারেন না। অজ্ঞতা, অবস্থাবিপর্য্যয় ও নৈতিক নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাবই নৈতিক ধর্ম্মের ব্যাভিচারের মূল। নারী-ধর্ম্ম সতীত্বের জন্য, নম্রতা, লজ্জাশীলতা, ক্ষমাশীলতা, ও তেজস্বীতা সেবাপরায়নতার জন্য চির প্রসিদ্ধ। সতীত্বই নৈতিক-শক্তির সর্ব্বাঙ্গিন আদর্শ। সৎএর স্ত্রীলিঙ্গে সতী। সুতরাং সতীত্ব শব্দের অর্থ বড় ব্যাপক। নারী ধর্ম্মে সতীত্বের আদর্শ জগতের সর্ব্বত্রই সর্ব্বোচ্চ মহান্ আদর্শ। এই আদর্শ রক্ষার জন্য বিশ্বশিল্পীর চারু লেখনী প্রসূত মহনীয়া নারী তার অন্তরের সকল উপাদানে গৃহস্থালীর যাহা কিছু, তাহা সুন্দর, শুচী ও মহত্তর করিয়া রচনা করে।

গৃহস্থালী নারীর শিল্প-কুশলতার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেখানে সে পুত্র গড়ে, কন্যা গড়ে, সংসার গড়ে, পরিবার গড়ে। নারী অন্তঃপুরে সমাজের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, পুরুষ বাহিরে সেই সমাজকেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে কর্ম্ম কুশলতায় সমৃদ্ধ করে। বিশ্বের এই পুঞ্জিত সম্পত্তি সৃষ্টির শিশুকে মানুষ করিয়াই পুরুষের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী নারী বিশ্বের সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বের জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ গড়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ইতিহাস রচনা করিতেছে।

নারী-ধর্ম্মে শতরূপার অংশে অংশে সৃষ্টির গৃহস্থালী ঘরে, বাহিরে সুষ্ঠুরূপে চলিয়াছে। নারী অন্তঃপুর সাম্রাজ্যের নেত্রী, আর পুরুষ বাহির ও অন্তঃপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাহিরেও পুরুষ নারীর সাহায্য পায়। নারী-ধর্ম্মের অপর এক দিকে সৃষ্টি নিরোধ, নারীর সে যোগাসক্তারূপ সহিষ্ণুতার নহে। যোগাসক্তা নারীরূপ সমাজ ও ধর্ম্মের সেবিকা, কখনও বা মৈত্রেয়ীর মত বিষয় স্পৃহা শূন্য, মন ও আত্মার সংযোগে ব্রহ্মে সমাধিস্থা। এর যোগাসক্তার রূপের সঙ্গে পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সে ব্রহ্মচারিণীর সম্পর্ক অপেক্ষা সদ্য-বধূর সম্পর্কেই নারী-ধর্ম্মের অধিকতর বিকাশ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নারীর উৎসর্গীকৃত বাসনা রাশির মধ্যে সৃষ্টি স্ফূর্ত্ত, বিকশিত, সংযত ও সস্কৃত। নারী-আত্মোৎসর্গ করিয়া সৃষ্টির সেবা না করিলে পুরুষ সন্ন্যাসের মন্ত্রে সৃষ্টির বংশ লোপ করিয়া বিষয় ও মন লইয়া শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা করিত, এমন কথাও প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু সৃষ্টির ইতিহাসে বাসনার জালে পুরুষ ও নারী অলক্ষিত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির স্ব-ধর্ম্মে নর-নারী পরস্পর অনুরক্ত। নারী-ধর্ম্মের এই অনুরক্তির সর্ব্বোচ্চ বিকাশ তাহার সেবায়, নেত্রীত্বে, ব্রহ্মচর্য্যে, ত্যাগে, ক্ষমায়, দানে, তপস্যায় ও বিশ্বের কল্যাণ কামনায়। নারীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শে নারী-ধর্ম্মের নৈতিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই জন্য ভার্য্যা চাই শুধু পুত্রের জন্য, অর্থাৎ জগতের মাতৃত্বের জন্য। নারী ধর্ম্ম এই মাতৃত্বই শুধু সৃষ্টিকে কোলে করিয়া নিষ্কাম ভাবে সস্নেহে পালন করেন। সৃষ্টির শৈশব কালের পালয়িত্রী ধাত্রী জননী। এই জন্য সৃষ্টি ও পালন নারী-ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান অধিকার।

নারী-ধর্ম্মে সতীত্ব, ধর্ম্মের সমাজের ও নীতির পূর্ণ আদর্শ। সতীত্বের ধর্ম্ম মানসিক ও শারীরিক এই দ্বৈত সৃষ্টির অন্তর্বর্ত্তী। এই জন্য সতীত্বই নারীত্বের ও মাতৃত্বের আত্মা

ও প্রাণ। সতীত্ব ছাড়া নারীত্ব সুবিকশিত নহে, আর মাতৃত্বও মহান্ আদর্শপূর্ণ নহে। নারী-ধর্ম্মের মাতৃত্বের ও নারীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতে কেহ কখনও কোনও কারণেচ্যুত হইলেও সতীত্বই জীবনের আদর্শ। ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আদর্শ চ্যুত হওয়া অনুচিত। সত্যই নারী ধর্ম্ম। সৎ এর স্ত্রী সতী। সৎ যাহা কিছু তাহা আত্মার ধর্ম্ম। অসৎ যাহা কিছু তাহা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম হইতে আত্মার ধর্ম্মে পৌছানই জীবনের ধর্ম্ম। ইহাই মুক্তিপন্থা। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ও আত্মার ধর্ম্মের পথে প্রবৃত্তির পর নিবৃত্তি, নিবৃত্তির পর প্রবৃত্তি সৃষ্টির জীবনে ওতপ্রোতভাবে চলিয়াছে। কিন্তু নিবৃত্তিই যখন মুক্তি পন্থার সোপান, তখন সংযমই নারী ধর্ম্মের সতীত্বের আদর্শ। সতীত্ব জ্ঞান মূলক, কার্য্য মূলক, নীতি মূলক ও আদর্শ মূলক।

সতীর জন্য শিব পাগল হইয়াছিলেন। সতীর সঙ্গে সৎএর এমনই নিত্য নৈকট্য সম্বন্ধ যে, সৎ ও সতী ছাড়া কর্ম্ম ও জ্ঞান-রাজ্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শ রক্ষা করিবার উপায়ান্তর নাই। নারীধর্ম্মও শরীর মন, আত্মার ধর্ম্ম। পাপ পুণ্য লইয়াই নরনারীর শরীর ও মন। সংশোধন পাপেরই হয়। আত্মসংশোধনই যথার্থ সংশোধন। বিষয়ের মোহে বিভ্রান্ত মনের সংশোধনের নামই সংযম অভ্যাস। শারীরিক ও মানসিক সংযমেই নৈতিক সংযমের শিক্ষা হয়। নারীধর্ম্মে এই ত্রয়ী শক্তির বিকাশই সতীত্বে পরিস্ফুট। নারীধর্ম্মের সকল দিকের বিকাশ অবলম্বন করিয়াই নরধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে। নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিকাশেই সৃষ্টির অন্তর ও বাহিরের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

নারীধর্ম্ম বিশ্বের কোন দিক, কোন্ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে! পৃথিবীর ইতিহাসে নারীধর্ম্ম রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে সর্ব্বত্র আসক্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মশক্তির বিকাশ চাহিয়াছে। গৃহধর্ম্মের বাহিরে নারী জনসেবায় মন দিয়াছে, আত্মানন্দ ভোগ করিয়াছে, আবার আদর্শ চ্যুতও হইয়াছেন। তাই বলিয়া নারীধর্ম্মের যাহা স্বাভাবিক তাহা কখন ও পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

নারীধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা নরধর্ম্মের সাহচর্য্য। অথবা ধর্ম্মের লক্ষণ নরনারীকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সম্মিলিত করা। সুতরাং নারীধর্ম্মও মিলনেরই ধর্ম্ম, ও গঠনেরই ধর্ম্ম। পুরুষের ধর্ম্মের সহিত নারীধর্ম্মের বিরোধই একটা ব্যভিচারের ধর্ম্ম। নীতির ব্যভিচারে এই ধর্ম্মের পুষ্টি হইলেও বিশ্বের সম্মিলিত নর-নারীর ধর্ম্ম এই ব্যভিচারী নীতির সংশোধন করিয়া, নরনারীকে সামাজিক ভাবে সমাজে গ্রহন করিয়া সংযমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শক্তির বিকাশ সংযমেই হয়, শক্তির প্রচার মিলনের ধর্ম্মেই হয়। মিলনের ধর্ম্মেই নরনারীর কর্ম্ম ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যভিচারী হয়, স্বাধীনতায়, কর্ত্তব্যজ্ঞানে, সুশৃঙ্খলায়, ও কর্ম্ম প্রেরণায় যথার্থ পথে পরিচালিত হয়। সুতরাং নারীধর্ম্মের পক্ষে সমাজের অন্তঃপুরে ও বহিরাঙ্গনে তাহার সমগ্র শক্তির বিকাশের সুযোগ থাকা চাই। জগত বিরাট কর্ম্ম ক্ষেত্র। কর্ম্ম ক্ষেত্রে নরনারী সকলেই কর্ম্মী। কর্ম্মের জন্য সকলেরই বিশ্বের জ্ঞান আয়ত্ত করা প্রয়োজন। নারীধর্ম্ম চায় তাহার নারীত্বের ও মাতৃত্বের সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি। সমাজে রাষ্ট্রে, পরিবারে ধর্ম্ম ও নীতির

বন্ধনে নারীধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গিন স্ফূর্ত্তি সকল সময়েই এক আদর্শে হইতে পারে না। বয়স, বুদ্ধি, শিক্ষাও অভিজ্ঞতা হিসাবে অধিকার নির্ণয় হইবে। নৈতিক ব্যভিচারের কারণ সৃষ্টি করা স্ত্রী পুরুষ সামাজিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে! আবার নৈতিক শক্তির ভিত্তির উপর মানুষের সকল-অধিকারই সুস্থাপিত হওয়া উচিত। নৈতিক আদর্শও প্রয়োজন জ্ঞান ও কর্ম্মের আদর্শও প্রয়োজন। নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর জ্ঞানও কর্ম্মের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। আর অন্তঃপুর কেন্দ্রের জ্ঞান ও কর্ম্মের শাশ্বত অধিকারই জগতের প্রায় সমগ্র নারী শক্তি গ্রহণ করিয়া আছেন। নারীধর্ম্মের স্বাভাবিক ও সামাজিক অধিকার বুঝিয়া রাষ্ট্রে, সমাজে ও পারিবারে নারীর মর্য্যাদা দিতে হইবে। বয়স, বুদ্ধি, শিক্ষা, তেজস্বিতা, সাহসও অভিজ্ঞতা লইয়া নৈতিক শক্তি বলসম্পন্ন হইবে, এবং সামাজিক নর-নারী নারীশক্তিকে সতীত্বের ও মাতৃত্বের আদর্শে গাড়য়া তুলিবেন।

———

পল্লী-সম্পদ

[শ্রীরেবতীকান্ত বন্দোপাধ্যায়]

আছে তোর গরু, হাল,
আছে তোর তাঁত, জাল,
আছে দুধ, মাছ, বাস, গোলা ভরা ধান,
জোলা, জেলে, চাষী গোপ, বাঙ্গলার প্রাণ
তোদের সরল প্রাণ
ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থাবান,
বিলাস বাসন হীন, সরল বিশ্বাসী,
দেশের সম্পদ তোরা পল্লীগ্রাম বাসী!
শ্রম করি দিন রাত,
পাই যদি মোটা ভাত,
খাঁটি দুধ, তাজা মাছ তাঁতের কাপড়,
কে চায় সহুরে বাবু—পরের নফর?
ওরাত গোলামী করে',
দিন রাত খেটে মরে,

তবুও জুটে না অন্ন, থাকে উপবাসী !—
থাক্ ওরা হোথা চির গোলামী প্রবাসী !
ওদের মস্তিস্ক ছাই,
দেহে রক্ত মাংস নাই,
ভিতরে ক'খানি হাড় লিগামেন্টে বাঁধা !
ফুর্‌ফুরে বাবু শুধু ধুতি সার্ট শাদা !
মিছে গলাবাজি আর,
জেলে যাতায়াত সার,
হবে না ওদের দ্বারা দেশের উদ্ধার,—
আয় তোরা লয়ে নিজ নিজ হাতিয়ার ;—
অই তাঁত, গরু, হাল,
অই চর্কা, মাকু, জাল,
হয়ত ওতেই হবে দেশের উদ্ধার,
অই পল্লী মাঠ ঘাট বক্ষ ক্ষত তার !

মঞ্জুলিকা

[শ্রীঅশোককুমার চন্দ]

বড়লোকের ছেলে বলিয়া বেশ একটু আত্মাভিমান ছিল। কলেজেও প্রফেসারদের মন জয় করিয়া সহপাঠীদের মনে একটু ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিলাম। চেহারাখানাও নেহাইৎ মন্দ ছিলনা বলিয়াই জানিতাম। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অলকগুচ্ছ সরাইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে দিনমানে দুইচারিবার তাকাইতাম। "পাগলা" বলিয়া একটা অখ্যাতি বা সুখ্যাতি আমার ছিল। কখনও ঘরে বসিয়া একরাশ বই লইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতাম। আবার কখনও Knut সাজিয়া Society Goddess দের বাড়ী সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় হাজিরা দিতাম। রহস্যময়ী নারীর মুগ্ধদৃষ্টিতে তখন জীবনের সবসার্থকতা অনুভব করিতাম। কখনও Ranken এর পোষাক কখনও আচকান চুড়ীদার, কখনও মোটা কাবলী পায়জামা পরিতাম। আমি পরিচ্ছদেও বেশ একটু বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলাম—সে বিচিত্রতার বার্থ সুর—তাহাকে· [illegible]

dyহ বলা চলে আমার জীবনে বাজিয়াছিল।

তখন আমার বয়স কুড়ি। ঐসব পাগলামীর ভিতরদিয়া B. A. ফাষ্টক্লাস অনার্সে সবে পাশ করিয়াছি। এই বকাছেলেটী যে কেমন করিয়া সরস্বতী দেবীর পদ্মের একটী পাপড়ি ছিঁড়িয়া ঘরে ফিরিল এপ্রশ্ন অনেক শুভাকাঙ্খীর মনেই তীক্ষ্ণ কুশাগ্রের মত বিঁধিয়াছিল তাহা আমার অজানা নাই। মহাত্মা গান্ধীর বিজয়শঙ্খ তখনও বাঙ্গলার বুক ধ্বনিত করিয়া তোলেনাই—অন্ধ্র, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পঞ্চনদ তখন সেই প্রেমিক বীরের প্রেমের বন্যায় উচ্ছ সিত—কুম্ভকর্ণের শতাব্দীর ঘুম তাহাদের ভাঙ্গিয়াছে।

বন্ধু বরুণ সেনের বাড়ী হইতে একগাদা Bolshevism এর বই লইয়া বাড়ী ফিরিলাম Lounge Chairএ বসিয়া পুঁথির পর পুঁথি শেষ করিলাম। যতই পড়িতে লাগিলাম ততই সত্যের মহা আহ্বান প্রাণকে ভরিয়া দিতে লাগিল। ধর্ম্মকে অবশ্য দিয়া ঢাকিয়া সত্যকে অসত্যের মুকুট পরাইয়া, প্রকৃতিকে অস্বাভাবিকের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া মানুষ যে বিজয়নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—সে নৃত্যের শোচনীয় পরিণাম মনকে আনন্দের সাগরেই স্নান করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম সত্যইত আজ কিসের জোরে আমি দেশের বুকে ভাইয়ের রক্তরেখা টানিয়া বিলাসের রথ পরিচালনা করিতেছি? বুকটা বিদ্রোহে ভরিয়া উঠিল।

মহাত্মার মুখপত্র "তরুণভারতে"র ফাইল লইয়া বসিলাম। কি অশ্রুতবাণী—কি সত্য। মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, ভাইকে বুকে টানিবার জন্য কি এক শক্তিভরা আহ্বান।

ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—এক মুহূর্ত্তে কৃতসংকল্প হইলাম যে গান্ধীজীর বাণীতে দেশকে ভরিয়া দিব। মায়ের অশ্রু ভায়ের স্নেহভরা তিরস্কার—সব ভুলাইয়া আত্ম কর্ত্তব্যের আহ্বান প্রাণে বাজিল।

* * *

বুকভরা আশা লইয়া দেশে ফিরিলাম। সে অঞ্চলে ছিল বাবার অসাধারণ খ্যাতি। Fashionable বলিয়া ছেলেমহলে আমার নাম। কাজেই যখন মোটা খদ্দর পরিয়া সকলের সঙ্গেই নির্ব্বিবাদে মিশিতে সুরু করিলাম এবং কংগ্রেস আফিসে গিয়া কাজ করিব বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিলাম তখন আমার প্রশংসা চারিদিক ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কেমন একটা কাজের নেশা আমায় পাইয়া বসিল। আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া—বিলাসের স্নেহময় পাশ ছিন্ন করিয়া—দেশে আত্মনির্ভরতার মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলাম।

একদিন একলা বসিয়া ভবিষ্য' কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছি এমন সময় বন্ধু ও সহকর্ম্মী রমেশ আসিয়া বলিল "ভাই, সবজায়গাতেই পতিতদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে—আমরাই কি শুধু পিছিয়ে থাকিব?

আমি বলিলাম "সেকথা ভাই আমি অনেকবার ভেবেছি, কিন্তু পঙ্কভরা পথে যেতে হ'বে অথচ পায়ে কাদা লাগবে না—এ ত সহজ কথা নয়—তোমরা কেউ পারবে?"

রমেশ বলিল "ভাই এ তুমি ছাড়া হবার নয়—তোমার চরিত্রের কথাত কারো অজানা নেই—আমরা ওদের ওখানে গেলে সবাই বলবে ছেলেগুলো সব লেখাপড়া ছেড়ে অধঃপাতে গেল।

আমি বলিলাম "রমেশ, এ প্রশ্নের উত্তর আমি এক্ষুণি দিতে পারলুম না। আমি ভেবে দেখবো!"

* * *

আমি জানিতাম নারীহৃদয়ের কোমলতা আমার কোমল প্রাণে বড় বেশী বাজে—তাহাদের দৃষ্টিতে আমার প্রাণে কি একটা তুফান ওঠে—তাহাদের স্পর্শে একটা বিদ্যুৎ ছুটে কিন্তু এও জানিতাম নিজেকে সামলাইয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা আমার রহিয়াছে। প্রলোভন যে অনেকবার হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিয়া হতাশক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গিয়াছে।

ভাবনার ঝড় কাটিয়া গেল এবারও স্থির করিলাম যে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

* * *

পরদিন রমেশ আর রবীন্দ্র দুইবন্ধুর সঙ্গ সহরের সেই অজানা পথে বাহির হইলাম। দিনের আলোতেও ভয়ে বুকটা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। রবীন্দ্র সেই অঞ্চলে সুপরিচিত। গান্ধীর আত্মশুদ্ধির মন্ত্রে তাহার প্রাণে খানিকটা অনুশোচনা আসিয়াছে তাই আমি তাহাকে আমার সহকর্ম্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

কিন্তু বাড়ীর দ্বারে আসিয়া আমার সমস্ত প্রাণটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এত দিনের শিক্ষা—পৌরুষের এত গর্ব্ব সব লইয়া আমি আজ এ অঞ্চলে। কয়েকদিন আগে এযে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু দেশ সেবার জন্য বাহির হইয়াছি এরাওত দেশমাতৃকার সন্তান। রবীন্দ্রের পশ্চাতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলাম। ঢুকিতেই রমণীর নির্লজ্জ কলহাস্যে আমার বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। সব সহ্য করিতে হইবে। ঘরে ঢুকিলাম। রঙ্গীন অঞ্চলের অন্তরালে নির্লজ্জতাকে ঢাকিয়া ঘরে কয়েকজনা আসিল। সকলের পশ্চাতে ষোড়শী এক বালিকা। তার সলজ্জদৃষ্টিতে আর পদবিক্ষেপে কুমারীত্বেরই আভাস পাওয়া যাইতেছিল।

যখন আমি তাহাদিগকে মহাত্মার মহাবাণী শোনাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম তখন তাহাদের চক্ষের কোণে ক্রুর হাসিই ফুটিতেছিল—শুধু ঐ বালিকাই মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। ঘণ্টাখানেক পরে আমি নিষ্ফলতার অপমানে ক্ষুব্ধহৃদয় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সে সলজ্জকণ্ঠে কহিল "আমায় অনুগ্রহ করে একটা চরকা দিবেন কি?"

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মুক্তবাতাসে নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম বোধ হইতে লাগিল।

সারাদিনের শ্রান্তির পর রাত্রে Turgenive এর Smoke লইয়া পড়িতে বসিলাম—কালো হরফে ছাপা লাইনগুলি আমার চোখের সামনে এক অবোধ্যছন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বইখানি দূরে ছুড়িয়া ফেলিলাম। আমার মনে পড়িল সকাল বেলার কথা। বালিকার সলজ্জ করুণদৃষ্টির স্মৃতি আমার প্রাণকে পীড়ন করিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম বালিকা কেন ঐ ঘৃণিত ব্যবসায়কে বরণ করিয়া লইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। যখন জাগিলাম তখন নেশার মদির প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্ব দিকটা রাঙ্গাইয়া দিয়াছে।

* * * *

রবীন্দ্রের হাতে সেই দিন একটা চরকা

পাঠাইয়া দিলাম। রবীন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ভাই, মঞ্জুলিকা তোমার সঙ্গে একটী-বার দেখা করিতে চায়!" আমি বুঝিলাম বালিকার নাম মঞ্জুলিকা। তার জীবনের কাহিনী শুনিবার জন্য আমারও কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল; কাজেই বিশেষ পীড়াপীড়ির অপেক্ষা না করিয়াই আমি বলিলাম "বিকেলের দিকে সময় করে একবার যাব, তুমি এসো কিন্তু।" বিকালে রবীন্দ্রের সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলাম। লজ্জা সঙ্কোচ কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বিদায় লইয়াছে ভাবিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সে নিজেই আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল—যেন কাহার প্রতীক্ষাতে ছিল। আমি চরকা ইত্যাদি সম্বন্ধে দুই একটী কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কেন এই ঘৃণিত ব্যবসায়কে গ্রহণ করেছ?"

তাহার মুখে একটা করুণ বিষাদ ফুটিয়া উঠিল। আমি যে তার ক্ষতস্থানে আজ নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছি। সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে সে বলিল "মায়ের মুখে শুনেছি কোনকালে নাকি আমাদের বেশ সচ্ছল অবস্থা ছিল। আমার ছেলে বেলাতেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমার মা ঘরের আসবাব পত্র সব বিক্রী করে দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে আমায় মানুষ ক'রে তুলছিলেন। আমার বয়স যখন পনের আমার রূপ আর যৌবন দুইই আমার মায়ের মনকে পীড়িত ক'রে তুলল। আমার বিয়ের ভাবনায় বুড়ী মা আমার অস্থির হ'য়ে পড়লেন। হঠাৎ যখন মা একদিন জ্বরে পড়লেন তখন আমার মাথায় আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল। আত্মীয় স্বজন নেই—বন্ধু নেই—আপনার বলতে কেউ নেই। ঘরে যে ২।৪টে পয়সা ছিল তা দিয়ে দুদিন মায়ের পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল। তারপর আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখলুম। জগতে আমার একমাত্র অবলম্বন মা চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় অনাহারে মারা যাচ্ছেন—আর আমার সহ্য হ'লনা। আমার সমস্ত লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়ে পথের পাশে ভিক্ষা করতে দাঁড়ালুম।

অবজ্ঞার হাসি হেসে ২।৪ জন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। সেও যাচ্ছিল পথে। এসে অনুকম্পার সুরে বল্লে "তোমার কি হ'য়েছে?" সে সুরে আমার ব্যথার বাঁধ ছিঁড়ে গেল। আমি সব বল্লুম—তার চোখে কি একটা হাসি ফুটে উঠল—আমার প্রাণটা অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। আমার নিরাশ্রয়া পেয়ে সে এক ঘৃণিত প্রস্তাব করলে—আমার সমস্ত আত্মাটা রূঢ় ধাক্কায় চমকে উঠল—প্রাণটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল—কিন্তু আজ উপায় নেই। মাকে বাঁচাতে হ'লে আজ সব বিসর্জ্জন দিতে হবে। নারীর মাথার মণি লজ্জাকে অবধি। মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে—অর্থের জন্য আত্মাকে বিক্রয় ক'রে ঘরে ফিরলুম। তবুও যে মাকে বাঁচাতে পারলুম না। তারপর যে কেমন ক'রে এখানে এসে জুটেছি—তা ব'লে পাপের অজানা মূর্ত্তি আপনার চোখের সামনে ধরতে চাইনে।

তার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। আমি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উন্মুক্ত দ্বারের পথে বাহির হইলাম। বুকের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল—মাথা ঝিঁঝি করিতে লাগিল। 'এই সমাজ—এই আমাদের উদার অত্যুদার হিন্দু সমাজ—মাতৃ প্রেমের এই পুরস্কার? ভাবিলাম একটা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম উল্লাসে পৃথিবীর বুকে [illegible] রেখা টানিয়া—

মড়কের বেশে দেশের বুকে হাহাকার তুলিব—প্রবল বন্যার উচ্ছ্বাসে দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুকে নিয়া বাঙ্গলার গৃহগুলি উজাড় করিয়া দিব।

মাতালের মত টলিতে টলিতে গৃহে ফিরিলাম—পুরাতন ভৃত্য চন্দ্র আসিয়া বলিল "খোকাবাবু খাবার দেব কি?" তখন সে কথা আমার কাণেই ঢুকিল না। চন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম "আজ খাবনা। শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই।" চন্দ্র চিন্তিত দৃষ্টিতে কহিল, "খোকাবাবু যে কি পাগলামো সুরু করেছ—আর আমার ভাল লাগে না—মাকে আসতে লিখি।" আমি ব্যস্ত সমস্তভাবে বলিলাম "না, চন্দ্র, মাকে কেন টেনে এনে মিছে কষ্ট দেওয়া। আমি বেশ আছি।"

* * *

রাত্রে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। Tchekov এর The Nervous Breakdown" নামে গল্পটী মনে পড়িল। আমারও যে মনের সেই অবস্থা।

আমার তরুণ হৃদয়ে মঞ্জুর করুণ কাহিনী এক ব্যথার তুফান তুলিয়াছে—ভাবিলাম যে দেশের সমাজের শৃঙ্খল মিথ্যা ও ভণ্ডামী—যে দেশের মানুষ স্বার্থপরতার দাস আর যে দেশের সমাজের করুণার দ্বার সোণারকাঠির মোহন স্পর্শে খোলে সে দেশের আবার মুক্তি কিসের?

মঞ্জুর কথা মনে পড়িল। মায়ের স্নেহ ভাইয়ের প্রীতি সব হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাহার জীবনের দিনগুলি কাটাইয়াছে। হায় হতভাগিনী! তাহাকে কি সমাজে ফিরাইয়া লইবার কোনই উপায় নাই। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সমাজ কি এমন নিষ্ঠুর, তার শাসন কি এত নির্ম্মম যে একটী অপরাধেরও ক্ষমা নাই?

স্থির করিলাম যে ঝড় বাদল আসে আসুক, আপত্তি নাই। নবীনতার মন্ত্রে সমাজকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। না হয় পতিত অবনমিত হইয়া এ সমাজের অস্পৃশ্য হইয়াই বাস করিব।

* * *

পরদিন সকাল বেলা একলা দৃঢ় পদবিক্ষেপে মঞ্জুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা সব দূরে চলিয়া গিয়াছে। কোন ভূমিকার সৃষ্টি না করিয়াই মঞ্জুকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম "তুমি যদি তোমার এ ব্যবসা ছেড়ে দিতে চাও ত আমি তোমার খরচ দিতে রাজী আছি।"

মঞ্জুর মুখে একটা অবিশ্বাসের রেখা ফুটিল-রবীন্দ্রের কাছে আমার চরিত্র ইত্যাদির কথা শুনিয়া তার মনে যে আমার সম্বন্ধে একটা মস্ত ধারণা হইয়াছিল তাহা সংশয়ের মুখে তৈলহীন প্রদীপের মত নিবিয়া গেল—তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আবার দৃঢ় কণ্ঠে কহিলাম, "মঞ্জু, কুপথ থেকে ফিরতে চাও ত' আমি তোমায় আহ্বান করছি।"

এবার মঞ্জু চুপ করিয়া রহিল। তারপর দ্বিধার সুরে কহিল, "আপনি জানেন আপনি যা বলছেন তার ফলে হয়ত সমাজ আপনাকে ঘৃণায় দূরে ফেলে দেবে—আপনি আজ যাদের প্রাণে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন—তারা আপনাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে? আপনি আজ কিসের জন্য সমাজ সম্মান দূরে ফেলে দেবেন?"

আমি বলিলাম "নীতির দোহাই দিয়ে সমাজের মোড়লরা নারী জাতির উপর যে অত্যাচার করছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

সূচনা করাই হ'চ্ছে আমার উদ্দেশ্য। তুমি সমাজের কর্ণধার—তুমি ৪টে পত্নী ও ২০টা উপপত্নী রাখতে পারবে তাতে দোষ নেই—তুমি তোমার বিলাসবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য নিঃস্ব বিধবাদের বিপথগামিনী করতে পারবে তাতে দোষ নেই, আর নারী জাতির যারা বাধ্য হয়ে ঘটনাবিপর্য্যয়ে পড়ে হয়ত তোমারি মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে একদিনের জন্যে একটীমাত্র ভুল করে থাকে তার কি কোনই প্রতিকার নেই? বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, টাকার যারা গোলাম, আর যারা এক গাছা পৈতেকে অদের শ্রদ্ধার পণ্য করে তুলেছে তাদের কথায় পাপকে বরণ করে নেব? তোমায় যেতেই হবে।" শেষ কথাটা এমন অস্বাভাবিক জোরে বাহির হইয়া গেল যে আমি নিজেই চমকাইয়া উঠিলাম। মঞ্জু বিস্মিত হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে ধীরে মঞ্জু কহিল "আমায় ভাবতে দিন, কাল কি পরশু বলব।"

* * * *

আমি আর কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিকালে সংকর্ম্মী রমেশ আসিয়া বলিল "ভাই সহরেত তোমার ঢের কুৎসা রটেছে, তুমি নাকি দিন দুপুরে—পল্লীতে যাওয়া আসা কচ্ছ। পৃথিবীতে sacred বলে কোন জিনিষই নেই, যা কিছু পবিত্র আর noble তাতেই মানুষ কুৎসার কালো ছোপ দিয়ে সকলের চোখে ঘৃণিত করে তোলে। আজ কংগ্রেস আফিস থেকে ফিরছি। পথে শুনলুম দুটো স্কুলের ছেলে বলতে বলতে যাচ্ছে—'ভারিত'—বাবু ননকোওপারেসন করেছেন, যা কেলেঙ্কারী করে বেড়াচ্ছেন তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি।' আমি ভাবলুম ছোড়া দুটোর মাথা ঠুকেদি' কিন্তু তোমরা ভাই কি এক Non-Violence এর Clause বসিয়েছ যে সব অপমান মাথা নীচু করে সইতে হ'বে।"

আমি ক্রোধে, বিস্ময়ে আর ক্ষোভে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। একবারে লজ্জায় মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর একলা বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছি এমন সময় রবীন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটু গৌরচন্দ্রিকার সূচনা করিতেই আমি বুঝিলাম রবীন্দ্রও ঐ কথাই পাড়িবে। রবীন্দ্র মঞ্জুর নাম উল্লেখ করিতেই আমি অধীর কণ্ঠে বলিলাম "রবীন্দ্র ওসব কথা আমি শুনতে চাইনে, আমার ভবিষ্যৎ আর চরিত্র নিয়ে সহর শুদ্ধ লোকের এতো মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই। আমি অধঃপাতে যাচ্ছি তাতে তাদের কি?"

রবীন্দ্রের মুখখানি কালো হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে দুচার কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িল। আমার সঞ্চিত সব ক্রোধ ঐ বেচারার উপরেই বর্ষিত হইল। একটু দুঃখিতও হইলাম। আমি সার্টটা টানিয়া বাহির হইয়া প'ড়লাম। মঞ্জুর বাড়ীর দিকে রুক্ষকেশে পাগলের মত ছুটিয়া চলিলাম। সে অঞ্চলে তখন পরম উৎসব—ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সেখানকার হাওয়া হাসির নির্লজ্জ সুরে আর সুরহীন কদর্য্য গানে ভারি হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভারটা আমার গতি হ্রাস করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

মঞ্জুর ঘরে শুধু একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দরজায় আঘাত করিলাম। মঞ্জু নিজেই দরজা খুলিয়া দিল; তার অশ্রুসিক্ত মুখে কি একটা বিষাদ ভরা সৌন্দর্য্য উঁকি

মারিতেছিল। আমার প্রাণটা ঘা খাইয়া খাইয়া মানুষের প্রতি এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে তার হাসি কান্না সব ক'টাই আমার কাছে হ্যাবামি বলিয়া মনে হইত। তবু কেন জানি না ঐ অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার প্রাণের কঠোরতার মধ্যে একটা কোমলতার স্পর্শ দিয়াছিল।

আমি অধীর সুরে বলিলাম "মঞ্জু, আমি অপেক্ষা আর করতে পারব না। তোমার উত্তর আমি এক্ষুণি চাই! আমি আশার প্রতীক্ষা অপেক্ষা নিষ্ঠুর সত্যটাকেই সহ্য করতে পারব। তোমার যা বলবার থাকে বলে ফেল।"

মঞ্জু খানিক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল "আচ্ছা আমি যাব।" একটুকু বলিতে মঞ্জু এমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল যে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে তার প্রাণের অতি গোপন কথাটীকে অতি কষ্টে আর সঙ্গোপনে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি মঞ্জুকে বলিলাম "তা হ'লে আমি বাড়ী ঠিক করে কালই তোমায় নিয়ে যাব।" মঞ্জুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আমি ঘরের বাহির হইলাম।

রাত্রি অন্ধকার। আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া আসিল—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আমি প্রায় ঝড়ের মতো ছুটিয়া চলিলাম, কিন্তু বৃষ্টির আর ভাবনার গতি দুইই আমার গতিকে পিছনে ফেলিয়া চলিল—বাড়ী যখন ফিরিলাম—ভিতর আর বাহির দুই সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া আমি জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে আকাশের কালো বুকে বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠিতেছিল—আমার বুকটা আজ আশার সুখে ভরিয়া উঠিতেছিল। সব বাধাকে জয় করিবার আগে যে দৃঢ়তা থাকে, বাধা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সভয়ে ক্লান্তিকে তার আসন ছাড়িয়া দেয়। আজ যুদ্ধজয়ী ক্লান্ত সেনানীর মত শ্রান্ত চরণে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সহরে একটা ছোট্ট বাড়ীর সন্ধান করিয়া মাস ছয়েক জন্য ভাড়া লইলাম। চন্দ্রকে সব বুঝাইয়া বলিয়া তাহাকেই মঞ্জুর কাছে থাকিতে হইবে তাহা বলিলাম। চন্দ্রদা বিশেষ আপত্তি করিলনা। আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। সন্ধ্যার দিকে একখানা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া মঞ্জুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। সঙ্গে চন্দ্র। এবার মঞ্জুর বাড়ী-ওয়ালী মহা আপত্তি সুরু করিল। তার খাঁচার পাখিটী কি এমনি ছাড়িয়া দিবে? কি করি—অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া কিছু টাকা পর্য্যন্ত দিয়া মঞ্জুকে মুক্ত করিয়া লইলাম। চন্দ্রদার সঙ্গে মঞ্জুকে গাড়ীতে চাপাইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

দিন দুই পরে দাদার পত্র পাইলাম। স্নেহ, ক্রোধ আর তিরস্কার এই তিনটী জিনিষের মিলনে পত্রখানির ভাষায় এক অপূর্ব্বতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বুঝিলাম চন্দ্রদা কলিকাতায় পত্র দিয়াছিল।

এই দুই দিনে আমার জীবনে মস্ত একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে—আমার অসাধারণ সম্মান প্রতিপত্তি শুকনো পাতার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাত্র মহলে 'Hero' বলিয়া যে একটা তৃপ্তি অনুভব করিতাম তাহা ঐ প্লাবনের মুখে যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানিতেই পারিলাই।

আমার Lofty idealism যখন ঐ ঘাতে

ভাঙ্গিয়া গেল—তখন ভাবনায় পড়িলাম মঞ্জুকে লইয়া কি করি। ঝোঁকের মাথায় ঘোর নব তরুণ আশায় যাকে ঘাড়ে করিয়া লইয়াছি তাকে লইয়া কি করি।

প্রথমটা মানুষের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম প্রশংসা যেখানে খুব বেশী প্রাপ্য সেখানেই কেন ঐ জিনিষটী দিতে কার্পণ্য করা হইতেছে। আমি মনে করিতেছিলাম যে আমার এ কাজটী সকলেই একটু প্রশংসদৃষ্টিতে দেখিবে এবং ছাত্রমহলে আমার আসনটী আরো উঁচুতে পাতা হইবে কিন্তু এই যে একটা অঘটন ঘটিল তাতে আমার মনটা ক্রোধে ভরিয়া উঠিল—প্রথমটা নিজের উপরই চটিলাম বেশী,—কেন মিথ্যা পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেওয়া—তার জন্য লোকের প্রশংসা নাই—কারও ধন্যবাদ নাই—আছে শুধু কলঙ্ক আর অপমান।

সন্ধ্যায় যখন মঞ্জুর বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম তখন আমার মেজাজটা বেশ একটু রুক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু সেই করুণ চাহনী ও একটা নিঃসহায় অবস্থা লইয়া সে যখন আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন আমার প্রাণটা বসন্তের মঞ্জরিত সবুজের মতই স্নিগ্ধ আর সরস হইয়া উঠিল।

দুই চারিটী কথার পর মঞ্জু বলিল "একলা বসে বসে ভাল লাগছে না, কাজকর্ম্ম ও কিছু নেই—বইপড়ে কি আর দিন কাটান যায়? আপনার বাড়ী নিয়ে চলুন সেখানে আমি ঘর-কন্নার কাজ করব।"

আমি মঞ্জুর অসম্ভব প্রস্তাবে চমকাইয়া উঠিলাম। নারীহৃদয়ের ঐ যে একটা বাণী—যাকে ভালবাসা যায় তাকে সেবা করিয়া যে তৃপ্তি তাহা মঞ্জুর প্রাণে সাড়া দিয়াছে। আমি বলিলাম "তা হবার নয়। আমার নিষ্ঠুর উত্তর মঞ্জুর আগ্রহদীপ্ত মুখ খানিতে এক ছোপ কালি লাগাইয়া দিল। তারপর আর ভাল করিয়া কথা বলা চলে না। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন সকাল বেলায় একলা বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। আমার অনবসর দিনগুলি আজ একেবারেই কর্ম্মহীন—আশা ভরসার কোথাও মিলাইয়া যাইতেছে।

যে মহা আহ্বানে বুক বাঁধিয়া ভবিষ্যতের সমস্ত আশাভরসাকে আহুতি দিয়া জগতের সমস্ত দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছি বলিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলাম তাহা স্বপ্নরচিত প্রাসাদের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ বাহির আমাকে পীড়ন করিতে লাগিল অন্তরের হাত হইতেও নিষ্কৃতি পাইলাম না।

স্বপ্ন আর আশা দুইটা জিনিষ—পরমদুঃখ আর দৈন্যেও মানুষ যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে আজ আমি এমনি শক্তিহীন যে তাহাদিগকে বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিনা। নিজের সঙ্গ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে—মানুষের উপর মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-কর্ম্মচারীদের চক্ষুশূল—দেশবাসীর চোখে চরিত্রহীন, হেয়। আমার স্থান কোথায়?

কিন্তু ঐ নৈরাশ্যের প্রধান কারণ মঞ্জুই আজ আমার একমাত্র আশা। সূর্য্যতাপদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে ওই একটী ওয়েসিস্।

যতই দিন কাটিতে লাগিল—আমার সমস্ত ভাবনাকে ডুবাইয়া মঞ্জুর কথাই প্রাণে জাগিতে লাগিল।

তার অদর্শন আমার ভাল লাগেনা—সে যদি এখন কাছে থাকিত। সব কাজে কেমন একটা ভুল হইয়া যায়—সমস্তদিন

তার ভাবনায় কাটিয়া যায়—সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা কোমল আকর্ষণ আমাকে মঞ্জুর বাড়ী টানিয়া লইয়া চলে। স্বপ্নের মত আবেশভরা স্মৃতির মত মধুর, সবুজের মত মনভুলানো আর কুসুমের মত মদির সে আকর্ষণ, তাকে ছিঁড়িবার শক্তি নাই, চেষ্টাও নাই। আবার যখন তার কাছে যাই তখন নিজের একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করি—প্রাণের কথাকেও আর চাপিয়া রাখিতে পারিনা, বুকের ধক্ ধক্ শব্দ নিজের কাণে বাজে—অনুচ্চারিত বাণীতে মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠে। আমি যে তাহাকে ভালবাসিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ত বিবাহ করিতে পারিব না। সে শক্তিত আমার নাই। আমার আভিজাত্যের গর্ব্ব, আমার শিক্ষার গৌরব সঙ্গীণনারী শাস্ত্রির মত আমার পথ রুধিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সঙ্গীণের আঘাতে নিজের প্রাণকে ক্ষতবিক্ষত করিবার সাহসত আমার নাই।

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। ভাবিলাম হৃদয়ের ভার শরতের মেঘের মত হয়ত হাওয়ার মুখে উড়িয়া যাইবে।

নদীর তীরে সবুজ ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম। সূর্য্যের রক্তিমরাগে পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে বর্ণহীন মেঘের মেলা—তার ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে। লালে, নীলে, সাদায় কি এক অপরূপ মাধুরী। কাশবনে দোল লাগাইয়া বকুলের গন্ধ বহিয়া বাতাস বহিতেছিল। কিন্তু সব সৌন্দর্য্যকে, সব ভাবনাকে ডুবাইয়া মঞ্জুর কথাই মনে পড়িতে লাগিল। যখন আমি সে তৃণশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন রাত্রি তার স্নেহভরা কালো অঞ্চলে পৃথিবীকে ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। পথ চলিতে চলিতে কত কথা মনে পড়িল। শৈশবের স্বপ্ন—যৌবনের আশা। আবার মনে পড়িল মঞ্জুকে লইয়া কি করিব। এখন আমার সমস্ত ভাবনা সমস্ত আশঙ্কা ঐ মঞ্জুকে লইয়া।

ভাবিলাম পাড়াগাঁয়ে যাইয়া নারীকর্ম্ম-মন্দিরের আদর্শে একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিব। যারা পতিত—যারা অস্পৃশ্য—যাহাদের কেহ নাই তাহাদের লইয়াই আমার ঐ কর্ম্মমন্দির। চরকা আর তাঁত চলিবে। তাহাতে হয়ত ঐ আশ্রমের খরচের আংশিক সংস্থান হইতে পারে। রাত্রে স্কুল বসিবে—তাতে তাহাদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইবে। মঞ্জু বেশ লেখাপড়া জানে। ছেলেবেলায় মেয়ের স্কুলে পড়িয়াছে মনটাও হয়ত একটু উদার হইয়াছে। ঠিক করিলাম মঞ্জুকে ঐ আশ্রমের স্কুলের ভার দিয়া নিজে সহরে ফিরিব। ঐ দূরত্ব হয়ত আমাকে ঐ সর্ব্বনাশী ভালবাসার হাত হইতে রক্ষা করিবে। পরদিন সকালে মঞ্জুর বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম। মঞ্জুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। মঞ্জু স্তব্ধ হইয়া শুনিল। তার মুখখানি হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম মঞ্জু খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আজ মঞ্জুর এই অপ্রত্যাশিত নিরুৎসাহিতায় আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকিল। মঞ্জু যে আমাকে এইটুকুও ভালবাসে তাহা আমি কোন দিন বুঝিতে পারি নাই, আজ আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের কল্পনায় সে কেন এমন ধারা হইয়া উঠিল।

নভেল পড়িয়া পড়িয়া নারী-চরিত্রের মস্ত সমজদার বলিয়া আমার একটা গর্ব্ব ছিল। আজ বুঝিলাম নারী-চরিত্রের রহস্য সাগরের মত অতলস্পর্শী তাহা মাপিবার কাঠি

এই বৈজ্ঞানিক-যুগের মানুষও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম তারপর অপরাধীর সুরে বলিলাম "আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেণে পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছি। ওখানে সব ঠিক করে তোমায় পত্র লিখব।"

মঞ্জু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল "আচ্ছা"

আমি বাড়ী ফিরিয়া জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। ট্রেণে শুইয়া কেবল মঞ্জুর কথাই মনে পড়িতে লাগিল। আমার কথায় হয়ত কখনও ভালবাসার সুর বাজিয়াছে কিন্তু মঞ্জুত চিরকালই কঠিন। তার কথায় তার আচরণে কখনওত অসম্বৃত তার ভাব ফুটে নাই। আজ কেন সে তবে আমার প্রস্তাবে এমন হইয়া গেল। তবে কি সেও আমায় ভাল বাসিয়াছে। তার ভালবাসা কি তবে ফল্গুর মত লুকাইয়া লুকাইয়া তার প্রাণের তলে বহিতেছে।

না, আজ কঠোর হইয়া উঠিব। আমার জীবনকে, আমার ভবিষ্যতকে ঘৃণিত কুক্কুট শাবকের মত এমন ছুড়িয়া ফেলিতে পারিব না!

গ্রামে পৌছিয়া সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া 'মঞ্জুকে পত্র লিখিলাম যে আমি সহরে দু' তিন দিন মধ্যেই ফিরিব। তখন তাহাকে লইয়া এখানে আসিব।

* * * *

আমি যখন সহরে ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। মঞ্জুর বাড়ীর দিকেই চলিলাম।

মঞ্জুর ঘর অন্ধকার। দুয়ারে চন্দ্র মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মঞ্জু কোথায়?" চন্দ্র করুণ কণ্ঠে কহিল "খোকা-বাবু, তা'ত জানি না। কাল সন্ধ্যা থেকে তাঁর খোঁজ পাচ্ছি না।" বৃদ্ধ চন্দ্র মঞ্জুকে সত্যই স্নেহ করিত। আজ মঞ্জুর অভাবে তার প্রাণেও বাজিয়াছে। আমি বিস্ময়ে, দুঃখে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। মঞ্জুর ঘরে ঢুকিলাম। ঘরখানি তার স্মৃতির সৌরভে আকুল। বিছানার পাশে এক গাদা বই তার উপর 'কাগজ চাপা' দিয়া একখানি পত্র চাপা দেওয়া। আমি কম্পিত হস্তে পত্রখানা লইলাম। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পত্র পড়া চলিল না। পকেটে গুঁজিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বিস্ময়ে, দুঃখে আমার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। ঐ পত্রে না জানি কি রহিয়াছে। ভয় আর কৌতূহলকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না। পথের পাশে বাতির আলোকে পত্র পড়িতে সুরু করিলাম।

"দেবতা আমার,

যে দিন তুমি তোমার সৌম্য উদার ত্যাগের মূর্ত্তি লইয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে সে দিনই আমার প্রাণ তোমার চরণে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। তার পর যখন তুমি একদিন আসিয়া বলিলে যে তুমি আমায় আশ্রয় দিবে তখন তোমার জন্য আমার প্রাণে যতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল সব নিবিয়া গেল। আমি ভাবিলাম তুমি তোমার জাতের মত ঘৃণ্য জঘন্য। শুধু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আসিয়াছ আমায় ভুলাতে। কিন্তু তোমার নবীন বয়স—সরল মুখখানি. উদার হৃদয় তার ভিতর এতখানি কদর্য্যতা কেমন করিয়া আত্ম গোপন করিবে তাও ভাবিলাম। তারপর যখন তোমারি মুখে তোমার উদ্দেশ্য জন্য বাণী শুনিলাম তখন সমস্ত আশঙ্কা সমস্ত

সংযমের বাঁধ ছিঁড়িয়া একটা অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আমার প্রাণকে ডুবাইয়া দিল। তোমার উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম করিলাম। ভাবিলাম ভাল বাসিতে হয়—শ্রদ্ধা করিতে হয় এমন জনকেই। আমার দিনগুলি তোমার ভাবনায় সরস হইয়া উঠিল—আকুল প্রতীক্ষার অবসানে তোমার আগমনে সন্ধ্যাগুলি মধুর হইয়া উঠিল। তখনই ভাবিলাম ভগবানের এত সইবে না। ভাবিয়াছিলাম, আমি নীরবে তোমায় ভালবাসিব, তুমি শুধু অনুকম্পার চোখে আমার দিকে চাইবে—সে অনুকম্পা আমার মাথার মুকুট হইবে। কিন্তু একদিন বুঝিলাম তুমিও আমায় ভালবাস। তখনি বুঝিলাম সর্ব্বনাশ। যদি কোনদিন তোমার ভালবাসা ভাষায় ফুটিয়া উঠে তবেত আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিবনা। আমার প্রেম তোমাকে নীচুর দিকে টানিয়া লইয়া চলিবে। তুমি আমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তোমার ঘৃণ্য প্রেমিকা হইয়াও আমি দিন কাটাইতে পারিব না। গায়ের ধূলা একবার ঝাড়িয়া উঠিয়াছি আবার ধূলায় লুটাইতে পারিব না। আমি চাহিব তোমার সকল কাজে, সকল দুঃখে, সকল সুখে সাথী হইতে। সেত হইবার নয়। চেষ্টা করিলে শুধু তোমারই পতন হইবে। যাকে আমি ভালবাসি—তাকে গৌরবের আসন হইতে—সম্মানের আসন হইতে—নামাইতে পারিব না। তোমায় ভালবাসিয়াছি—সব চেয়ে বড় ভুল করিয়াছি। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হৃদয়হীনা পতিতার মত তোমাকে পরিত্যাগ। যদি জানতে আমার বুকে ... ... থাক। ইতি।

'মঞ্জু'

চিঠি হাতে লইয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাথাটা ঘুরিতে লাগিল—পায়ের তলার মাটী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল—আমি আলোর থামটা আঁকড়াইয়া ধরিলাম। দুইটি ছেলে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল—"দেখরে দেখ, নন্‌-কোপারেশন নেতা আজ মদের নেশায় পথে মাতলামী ক'রে বেড়াচ্ছে।"

আমি নিরাশ্রয়ের করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম।

প্রেমের বন্ধন

[শ্রীবিষ্ণুব্রত সেন]

কে জানে প্রেমের বন্ধন কোথা, কোন ডোরে বাঁধা প্রাণ
কে জানে কেমনে কুমুদি চাঁদের জোৎস্না করিছে পান।
কোথা সে সাগর তটিনী ছুটিছে
অসহ পুলকে বক্ষ দুলিছে—
কতনা রঙ্গে অধীর নৃত্য কল্লোলে কত গান।

কোথা দিগন্তে আকুলা পৃথ্বী কাঁদিছে নগ্ন কায়
মুগ্ধ আকাশ বাহু-বন্ধনে তাহারে বাঁধিতে চায় ;
বঁধু আমাদের তাই যে মিলন
নহে ফুল ডোরে ভুজবন্ধন,
এযে ব্যাকুলতা অতনু অধীর দুটি প্রাণ এক তান।

একখানি চিঠি

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

প্রিয়তমাসু,—

আজ সকালের ডাকে তোমার পাইনি। কেন? অথচ আজ তো পাওয়া উচিত ছিল। একদিন পর একদিন দাড়ি কামানোর মতো তোমার চিঠি পাওয়াটাও এখানে এসে অবধি আমার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। উপমাটা শুনে রেগো না,—ঝাঁ করে কথাটা মনে এলো লিখে ফেল্লুম। দাড়ি কামানোর ব্যাপারটা যে পরিমাণে অসীম বিরক্তিকর, তোমার চিঠি পাওয়াটা ঠিক ততখানি মধুর বলেই বোধ হয় দুটো কথা একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। জানোইতো Two extremes meet!

তোমায় দুটী জিনিষ পাঠাচ্ছি,—দুটী ফুল,—আর সঙ্গে এদের ক্ষুদ্র একটী কাহিনী। এরা পাশা-পাশি ফুটেছিল দুটি গাছে। এত অযত্নে গোলাপ গাছ গেলো কি করে জানি নে। পাহাড়ী মাটীর বুক ফুঁড়ে তারা কালো কালো পাথরের ফাটল দিয়ে উঁকি মারত। যখন দক্ষিণা হাওয়া বইত, এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে কত চুমোই যে খেত কত সুন্দর প্রভাতে, কত নির্জ্জন সায়াহ্নে, হয় তো বা কত নিস্তব্ধ দুপুর রাতে! এরা যেন প্রণয় সাগর পারের যুগলযাত্রী।......জায়গাটি দিব্য মনোরম তাই রোজই প্রায় সেখানে বেড়াতে যাই। সাম্‌নে ধূ ধূ করে মাঠ,—দূরে চক্রবাল রেখায় গিয়ে থাকে থাকে দু তিন সার নীচু পাহাড়ের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। মাঝখানেও এবড়ো খেবড়ো দুটো চারটে পাহাড়ের চাপ ঝাঁকড়া চুলওয়ালা, দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে মহুয়া গাছের লেখা জোখা নেই, তাদের পাতার রাশে পচিয়া * হাওয়া দিন রাত করুণ বাঁশী বাজিয়ে যায়। একটী তির্‌ তির্‌ করে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার বুকে

* পশ্চিমা হাওয়াই বৈদ্যনাথের এদিকে স্বাস্থ্যকর, তাহাকে এদেশবাসী সাওতালীরা "পচিয়া" বলে।

জগদ্দল পাথরের মতো চাপান মস্ত মস্ত কতগুলো পাথরের খণ্ড। তারি একটার উপরে বসি, আর চার পাঁচ দিন থেকে এই লাল সাদা গোলাপ দুটোর' চুম্বনে লীলাখেলা দেখি,... আর বসে বসে তোমার কথা ভাবি,—তুমি যে কাছে নেই।

পরশু পরলা ফাল্গুন। গিয়ে দেখিলাম গোলাপটা আরও টক্‌টকে লাল; বুকের মাঝের পাঁপড়ি ক'টিও মেলে ধরে সে তার সুরভি সম্ভার উজাড় করে দিচ্ছে,—নবীন বসন্তের হাওয়া তাকে যৌবনের বর দান করেছে। সাদা বড় গোলাপটা দেখি ম্লান, সে আর বসন্তের অপেক্ষা করেনি শীতের শেষেই সে তার যা কিছু মধু ঐ আধফোটা কিশোরী প্রিয়াকে নিবেদন করে দিয়েছিল, এখন শীতের কুজ্ঝটিকার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অভাগা রিক্তসর্ব্বস্ব সে দেখে আজ লালগোলাপ যৌবনের জোয়ারে নিজের চোখ ঝলসানো রূপ দেখে রূপের গরবে ভোম্‌রার স্পর্শে গুন্‌ গুণানির তালে তালে ঢলে ঢলেই সারা, তার পানে চাইবার তার আর ফুরসুৎ নেই। আজ কাঙ্গাল তার ব্যথাভরা ভাঙ্গাচোরা বুকের করুণ দীর্ঘশ্বাস উবে যাওয়া সুবাসের সঙ্গে লালের মুখে কেবল বুঝি আরো লালিমার ছোপ যোগায়! হারে অদৃষ্ট!

কাল বিকেলবেলা সেখানে গিয়ে বসেছি, দেখি লাল আরো গাঢ় হয়ে রাঙ্গিয়ে উঠেছে, সাদা ফুলটা থেকে গোটা দুই পাঁপড়ি কালো পাষাণের উপর অশ্রুবিন্দুর মতো ঝরে পড়েছে। আমি শুধু এদের দেখেই যাচ্ছি, ছিঁড়তে ইচ্ছে করে না।......কতক্ষণ পরে একদল স্ত্রী পুরুষ সেখানে ফোটো তোলবার নটবহর নিয়ে হাজির হোলো। এক ছোক্‌রা বল্লে "বাঃ খাসা লাল গোলাপটি তো,"—তার পর সেটাকে ছিঁড়ে বোঁটা সমেত কোটের বোতামের-ঘরে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। ইস্ত্রী দিয়ে পাট করা সাদা ফ্লানেলের গুল্‌জারেই কলারের ওপর সেটা যেন ফিক্‌ ফিক্‌ করে হেসেই সারা। একটি মেয়ে বল্লে 'দিব্যি সাদা ফুলটিও তো" বলে সেটাকে বোঁটা সমেত খুলে খোপার গুঁজে দিলে;—টানের চোটে আরও গোটা কতক পাঁপড়ি ঝরে প'ড়লো। তার পর তাদের ছবি তোলা হোলো গল্পগাছা হোলো। শেষে লাল গোলাপটা খুলে নিয়ে ছেলে মেয়েরা এ ওর গায়ে ছোড়াছুড়ি করে কত রঙ্গ করলে,—তার পর 'দূর ছাই খারাপ হ'য়ে গেছে' বলে এক ছোক্‌রা সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু সেই মেয়েটী সাদা ফুলটাকে কিন্তু খোপাতেই পুরে রাখলে, নষ্ট হতে দিলে না। ঘণ্টা দু'এক পরে তারা সব জট্‌লা করতে করতে চলে গেল। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমিও অন্যমনস্ক হ'য়ে বাসায় যাব বলে উঠে দু'পা' এসেছি,—সামনে দেখি দলিত পিষ্ট লাল গোলাপটী রাঙ্গা মাটীর পথখানির ধারে আধমরা দুর্ব্বার ওপরে পড়ে আছে,—আর তারি পাশে সাদা গোলাপটীও! বোধ হয় চলে যাবার বেলা অতর্কিতে সেই মেয়েটীর খোপা থেকে সেটা পড়ে গিয়েছিল। সেটাতে তখন মাত্র দশ বারোটি পাঁপড়ি আছে,—বাকীগুলি উঁচু থেকে পড়ার চোটে তার চার পাশে ঝরে পড়েছে।

আমি দুটীকে এক হাতের মুঠায় করে বাড়ী নিয়ে এলুম।......পথে ফিরতে বার বার মনে পড়ছিল "In their death they were not divided."......এই পুষ্প দম্প-

তাঁর ইতিহাস সমেত তাদের শেষাবশেষ তোমায় পাঠালুম।। আজ বিকেলে সেখানে গিয়েছিলুম, গাছ দুটিতে আর কুঁড়ি আছে—কিনা, আর ফুল ফুটবে কি না বিচার করতে গিয়ে দেখি, দুটো গাছের মাঝখানে পাশের আমগাছটা থেকে একটা মরা ডাল ভেঙ্গে পড়ে আছে! কাল পরশু গাছ দুটোর কাছে যাইনি বলে সেটা লক্ষ্য করিনি।

তুমি হয়তো বলবে—যেমন তুমি সর্ব্বদাই বলে থাক—'এটা একটা 'বোকা গল্প''—তা বল। কিন্তু আমি ক'দিন থেকে ফুলদুটীকে দেখে দেখে তাদের সুখ দুঃখের সন্ধান পেয়ে হাসি কান্নার অংশীদার হয়েছি। এদের দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি, দুঃখও পেয়েছি। আমার আনন্দ বেদনার পরস্পর অর্দ্ধেকটা চিরকালই তোমার—তাই তোমায় এ পাঠানো। পাঠিয়েই আমি খালাস তুমি উপভোগ করিতে পারো না পারো তা তোমার জিম্মায়।

চিঠি তোমার আজ পাইনি বটে, কিন্তু আমার মনে বলছে, তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছ। তুমি আমার আমার—না, কিছু জেনো না. কিছু নিও না, তুমি আজ সারা দিন আমায় জ্বালিয়েছ। নিশ্চয় বন্ধু নীহারের বাড়ী গিয়ে চিঠি ফিটি লেখার কথা সব ভুলে ছিলে, আমি অভিসম্পাৎ কচ্চি, নীহার যেন যতীন বাবুর চিঠি সারা বসন্ত কালটা জুড়েই না পায়—আর তোমার যেন তেরাত্তির পেরুতে না পেরুতেই একটী ঝগড়াটে সতীন জোটে।—ইতি।

তোমার—

নারীর ক্রন্দন

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইত গেল বাংলার কুমারী ও সাধ্বীজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস! এইবার বিধবা জীবনের দুঃখ কাহিনী কিছু কিছু শুনাইব। বর্ষিয়সী বিধবার কথা বলিবনা কেন না পুত্রকন্যা পৌত্রাদির দ্বারা বেষ্টিত থাকায় তাঁহারা দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া থাকিতে পারেন। এখানে যাঁহাদের কথা বলা হইবে তাঁহারা হইতেছেন সেইসব হতভাগিনীরদল যাহারা স্বামী কি জিনিষ তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই বৈধব্যের মরুভূমিতে পা দিয়াছেন। বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের কঠোর নিয়মের পাশে বালিকাকে আবদ্ধ করা হইল। পতির সহিত চিরবিচ্ছেদের যাতনা কি ভয়ঙ্কর তাহা হয়ত তিনি বুঝিলেন না কিন্তু সমাজ জোর করিয়া এই যাতনা তাঁহার উপর চাপাইয়া দিতে চাহিল। ফলে আসল দুঃখের চাইতে দুঃখের ভানটাই বেশী হইয়া দাঁড়াইল! নিষ্ঠুর সমাজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শুধু

কপটতার সৃষ্টি করিল। বাহিরে বিধবার বেশ পরিয়া মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেই কি অন্তরে বিধবা হওয়া যায়? নারী জীবনের সমস্ত সুখ আকাঙ্খা মানুষের স্বভাবের যাহা চিরন্তন দাবী তাহা কি শুধু হবিষ্যান্ন ও উপবাসের জোরে উড়াইয়া দেওয়া চলে? পতিপত্নী যেখানে পরস্পরের স্বভাবের মহত্ব ও মাধুর্য্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিল না—বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি ও বাসর-ঘরে এক রাত্রি অবস্থানের মধ্যেই সেখানে হয়ত তাহাদের ঐহিক মিলনের পরিসমাপ্তি। জীবনে যাহারা ভাল করিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিল না—পরস্পরকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিবার অবসর পাইল না। মৃত্যুর এপার ও ওপারের মধ্যে এমনি দুইটী অধিবাসীর মধ্যে শুধু পুরোহিতের গোটা-কতক মন্ত্রের জোরে চির মিলনের আশা কি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়না? আত্মায় আত্মায় মিলন কি এত সুলভ—এত সহজ-সাধ্য!

যেখানে বালবিধবার শিক্ষা দীক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে, যেখানে নারীহৃদয়ের নব-মুকুলিত শত শত বাসনার সম্মুখে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিনীর বিশ্ব প্রেমের স্থির শান্ত উদার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত আছে—যেখানে প্রেম আছে, শান্তি আছে, আলো আছে আনন্দ আছে যেখানে জ্ঞান আছে ঔদার্য্য আছে করুণা আছে—যেখানে মানবের আত্মার অনন্তক্ষুধা মিটাইবার জন্য স্বর্গের অমৃত আছে সেখানে বালবিধবাগন সংসার জালে আপনাদের অযথা না জড়াইয়া Floronce Night ingaleএর মত মানবের সেবাকেই জীবনের পরম ব্রত করিয়া মুক্তনির্ঝরিণীর মত দেশে দেশে 'আনন্দ উজ্জল পরমায়ু' বিতরণ করুক—ইহাত অতি উচ্চ আদর্শ! কে ইহার প্রতিবাদ করিবে? কিন্তু যেখানে শাসনের নামে শুধু পেষনের ব্যবস্থা—যেখানে জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র শুধু ধারাপাত, বোধোদয়, গোয়ালার ও ধোবার হিসাব, দুইবেলা রন্ধন এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবন্ধুর পরিচর্য্যার মধ্যেই আবদ্ধ—যেখানে অনাথা বিধবাকে একমুষ্ঠি অন্নের জন্য পিতৃগৃহে ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় ভ্রাতৃজায়ার দাসীবৃত্তি করিতে হয়—সেখানকার কথা আমরা ভাল করিয়া ভাবিয়াছি কি? সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পরে অবসন্ন দেহখানি সঙ্গীহীন শয্যায় ঢালিয়া দিয়া সে যখন পাশের ঘরের দম্পতীর প্রেমালাপ শুনিতে পায় তখন তাহার শূন্য প্রাণের হাহাকার আমরা শুনিয়াছি কি? পিতামাতা, শ্বশুর শ্বাশুড়ী সকলেই পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন তখন একবিন্দু জলের জন্য সারারাত্রি তাহার কচিবুক খানি কি বেদনায় ছটফট করে, কি অব্যক্ত যাতনায় তাহার তৃষ্ণাকাতর শুষ্ককণ্ঠ খানি বিদীর্ণ হয় তাহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? গৃহে যখন বিবাহের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠে, মিলনের মধুররাগিণী যখন আনন্দের উজ্জল প্রবাহে চারিদিক ভরিয়া-তুলে, জ্যোৎস্নাজোয়ারে আকাশ বাতাস যখন ভাসিয়া যায়—বসন্তের উৎসবে যখন হাস্যোৎফুল্লা কুসুমিতা অবনী গগনের তপোভঙ্গ করে, সমস্ত প্রকৃতি যখন মিলনের আনন্দগানে চারিদিক হাসাইয়া তুলে—তখন ভাগ্যদোষে অল্পবয়সে যাহারা সঙ্গিহীনা হইয়াছে তাহাদের গোপন আর্ত্তনাদ আমাদের

কর্ণে পশিয়াছে কি? পশিয়াছিল একজনের সে পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর—'বিদ্যারসাগর যিনি বিখ্যাত ভারতে—করুণাবসিন্ধু যিনি!' তাই হতভাগিনী যাহাদের এজীবনের সকল আশার সমাধি হইয়াছে—বিবাহের ফুলসজ্জা ভাল করিয়া রচনা করিতে না করিতে নিষ্ঠুর ভাগ্য যাহাদের জীবন কণ্টক শয্যায় পরিণত করিয়াছে—যাহাদের হাসি মিলাইয়াছে গান ফুরাইয়াছে—মানুষ যাহাদের কাছে শুধু সেবার দাবী করিয়া উদ্যত শাসন দণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাসর ঘরের আলোকমালার স্মৃতি ভাল করিয়া মিলাইতে না মিলাইতে জীবনের রঙ্গমঞ্চ যাহাদের অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের গোপন কান্না শুনিয়াছিলেন। তাই শাস্ত্রকারের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত না হইয়া তিনি তাহাদের জীবনকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! তিনি মানুষের স্বভাবের দাবী অগ্রাহ্য করেন নাই। কতকগুলি উপদেশের অমৃতসিঞ্চনেই যে নারীর হৃদয়ের ক্ষত দুইদিনে শুখাইয়া যাইবে এ বিশ্বাস তিনি রাখিতেন না! কতকগুলি শাস্ত্রের দেওয়াল গাঁথিয়া মানুষের হৃদয়ের শূন্যতা ভরাইবার চেষ্টা যে কেবল নিষ্ঠুরতা—কেবল মন্ত্রের জোরে—বিধিনিষেধের প্রভাবে মানুষের অন্তরের যে কান্না তাহাকে থামাইতে যাওয়া যে নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা একথা তিনি খুব ভাল করিয়াই বুঝিতেন। আয়ারলণ্ডের ত্যাগীবীর ম্যাকসুয়েনি তাঁহার Principles of freedom নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—"অনেকে বলিয়া থাকেন —'For Ireland's sake don't fall in love' 'আয়ারলণ্ডের স্বাধীনতার জন্য প্রেমে পড়িওনা'। আমার মতে তাঁহাদের কথা 'For Ireland's sake don't let your blood circulate' 'আয়ার্লণ্ডের জন্য তোমাদের দেহের রক্তচলাচল বন্ধ কর! ইহার মত অসম্ভব ও অনর্থক।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ম্যাকসুয়েনির মত বুঝিয়াছিলেন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অল্পবয়সে স্বামীহারা বিধবাদের যতই কেন বলনা 'Don't fall in love "প্রেমে পড়িওনা, তাহা 'Don't let your blood circulate' 'তোমার শরীরে রক্তচলাচল হইতে দিওনা, এইকথা বলার মতই অনেকটা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার চেষ্টা! শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টাতেই সমাজ ভ্রূণহত্যায় দিন দিন কলঙ্কিত হইতেছে এবং সমাজে পতিতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিধবার দুঃখকাহিনী আর দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। বালবিধবামাত্রেই যে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এমন কথা বলিতেছিনা। যাহারা সারাজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ চাহেন তাঁহাদের চরণে আমার প্রণাম—আবার যাঁহারা বিবাহ করিয়া ত্যাগে প্রেমে সংসারে আদর্শ স্বামীর আদর্শ সহধর্ম্মিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে চাহেন তাঁহাদেরও চরণে আমার প্রণাম। মোট কথা—জোর করিয়া কাহারও স্বভাবের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া নারীর উপরে আজীবন বৈধব্যের বোঝা চাপান—সমাজের নিতান্ত অবিচার এবং হৃদয় হীনতারই সাক্ষ্য দেয়। এ সম্বন্ধে আর কিছু লেখা বাহুল্য।

বাংলার নারী জীবনের উপর যে অত্যাচার অবিচার আজ শত শত বৎসর ধরিয়া

অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার সকল কাহিনী লেখা অসম্ভব। সংবাদ পত্রে আহিরিটোলা ও দিনাজপুরের বধূনির্য্যাতনের লোমহর্ষণ কাহিনী যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন বাংলার কত গৃহ আজ নিপীড়িত নারীর হাহাকারে পরিপূর্ণ! গৃহের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার কতটুকুই বা আমাদের কানে আসিয়া পৌছে। বাংলার নারী জীবন পুরুষের হস্তে আজ যে নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে তাহার মধ্যে দুইটী অত্যাচারই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ লাগে। প্রথমটী সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবার বলিতেছি মাতৃত্বের মিথ্যা-কুহকে প্রবঞ্চিত করিয়া দেশ আজ অসংখ্য নারীকে পুরুষের অস্বাভাবিক কামের চরণে বলি দিতেছে, বিবাহের নামে ঘরে ঘরে ব্যভিচার চলিতেছে, পরিণয়ের নামে গৃহে গৃহে হত্যা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ হত্যার শেষ কোন দিন হইবে না যদি না নারী আপনার দেহের উপর অধিকার লাভ করে এবং পুরুষও যত দিন না নারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়া আপনার বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখে। দ্বিতীয় অত্যাচার হইতেছে তাহাদিগকে ভগবানের দেওয়া দুইটী প্রাথমিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা—সে দুইটীর একটী আলোক ও অপরটী বাতাস। আজ যদি তাহাদের সকল অধিকার কাড়িয়া লইয়া শুধু এই দুইটীর অধিকার ফিরাইয়া দিতাম তাহারা যদি সারাদিনের সকল ক্লান্তি সকল গ্লানির পরে প্রাণ ভরিয়া মুক্ত আকাশের নীচে মুক্ত আলোকে মুক্ত বাতাসে একটু বেড়াইতে পারিত তবে বোধ হয় তাহাদের জীবনের বোঝা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত! পৃথিবীর নিকৃষ্ট কীটটী, পৃথিবীর ধূলা মাটী পাথর—তাহারাও ভগবানের এই দুইটী করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কি বেদনার কথা আমাদেরই মত রক্ত মাংসে গড়া লক্ষ লক্ষ প্রাণী যাহাদিগকে আমরা ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া থাকি যাহারা আমাদের রক্তের রক্ত মাংসের মাংস আমাদের জন্ম যাহাদের হইতে তাহাদিগকেই আমরা রৌদ্র বায়ুহীন কক্ষে বাঁধিয়া রাখি। সকলেরই অপেক্ষা কষ্টের কথা নারীর এই বন্ধনের নিমিত্ত যে একটা যাতনা বোধ আছে সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। কষাই যেমন বাল্যাবধি প্রাণী হত্যা করিতে করিতে ভুলিয়া যায় বধ্য প্রাণীরও তাহারই মত সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, আমেরিকার দাস ব্যবসায়ীরা যখন গরু ঘোড়ার মত মানুষ ক্রয় বিক্রয় করিত তখন তাহারাও যেমন ভুলিয়া থাকিত—দাসের শরীরের রক্তও তাহাদেরই মত লাল এবং ঠিক তাহাদেরই মত সেও যন্ত্রণা বোধ করে—আজ আমরাও তেমনি কষায়ের মত, দাস ব্যবসায়ীর মত নারীর বেদনা সম্বন্ধে উদাসীন আছি!

বন্ধনের কি যাতনা মুক্তির কি আনন্দ তাহা পুরুষ আমরা নিজেদের বেলায় খুব বুঝিয়া থাকি। এক ঘণ্টার জন্য কোনও ছাত্রকে তাহার বৈকালের ক্রীড়া হইতে বঞ্চিত রাখ দেখিবে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে—তাহার সমস্ত অন্তর বাহিরের জন্য ছটফট্ করিবে। আদালতের কর্ম্মচারীরা সারাদিনের বন্ধনের পরে যখন ক্লাবে একটু গান বাজনা করিবার জন্য বাহির হইতেছেন তখন তাঁহাদিগকে একটু আটকাইয়া রাখ দেখি দেখিবে জলের মাছ ডাঙ্গায় তুলিলে তাহার অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়—বেচারীদের অবস্থা ঠিক তেমনি হইবে। নিজেদের এই অবস্থায়

সহিত তুলনা করিয়া আমরা কি কোন দিন বিচার করিয়া দেখিয়াছি? দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর রান্না ঘরের ধোঁয়ার মাঝে ভাতের হাঁড়ি চাপান আর ভাতের হাঁড়ি বসান,—বহির্জগতের সমস্ত আনন্দ কোলাহল হইতে বঞ্চিত থাকিয়া একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে সেই প্রতিদিনের তুচ্ছ গৃহস্থালির কাজ—এই একঘেয়ে নীরস জীবন যাপন করা নারীদের পক্ষে কত কষ্টকর! মাথার উপরে যতটুকু আকাশ দেখা যায় ততটুকুই তাহার আকাশ, উঠানে যেটুকু সঙ্কীর্ণ স্থান আছে সেই টুকুই তাহার শ্যামলা বিপুলা পৃথিবী। বসন্তের এই যে আনন্দোৎসব বৎসরে বৎসরে প্রকৃতির রাজ্যে অভিনীত হইতেছে—এই যে ধরণীর বুকে ছয় ঋতুর বিচিত্র মেলা, আকাশের গায়ে কত রঙের বিচিত্র খেলা, এইযে সঙ্গীতের অন্তহীন উৎস প্রাণের গভীর স্পন্দন, তাহার কতটুকুতে নারীর অধিকার। তাহাদের চারিদিকে বিরাট প্রাচীর তুলিয়া আমরা যে তাহাদের সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি। পাখীর গান প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া তাহার যতটুকু গৃহের ভিতরে আসিয়া পৌঁছায় তাহাতেই তাহার অধিকার, ফুলের গন্ধ বাতায়ন পথে তাহার নাসিকায় যতটুকু আনিয়া পৌঁছে ততটুকুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে! জানালার খড়খড়ি একটু খোলা থাকিলেই সর্ব্বনাশ! দেওয়ালে একটু ছিদ্র থাকিলেই হইয়াছে আর কি! তাহা হইলে দেশে সতীত্ব বলিয়া কিছু থাকিবে কি! মেয়েরা যে তাহা হইলে সব বাহির হইয়া যাইবে! এমনি করিয়াই আমাদের স্ত্রী-কন্যা মাতা ভগ্নীকে শত শত বৎসর ধরিয়া বন্দিনীর ন্যায় জীবন কাটাইতে হইতেছে! কিসের জন্য? নহিলে বাংলা দেশে আর সতী থাকিবে না! আমি বলি যেখানে নারীকে পদে পদে নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া ভগবানের আলোক বাতাস হইতে নিজেদের প্রতিদিন বঞ্চিত রাখিয়া ভয়ে ভয়ে সন্তর্পনে আপনার সতীত্ব রত্ন বাঁচাইয়া রাখিতে হয় সেখানে সতীত্বের কোন মূল্য নাই! সেই সতীত্বই বরণীয় যাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ যাহা স্বভাবকে স্বীকার করিয়া সত্যশিব সুন্দরের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে। গৌরবের দাবী করিতে পারে সেই সতীত্ব যাহার মধ্যে নারীর সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত মাধুর্য্য মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহা হৃদয়ের স্বাভাবিক ভক্তি ও প্রেমের আকর্ষণে স্বামীকে আঁকড়িয়া ধরে! যাহা ধরার হাটে সহস্র মানুষের সম্পর্কে আসিয়াও উন্মুক্ত সূর্য্যালোকে আপনার নির্ম্মলতার পরিচয় দেয়! যাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বাঁধনের পর বাঁধন কষিতে হয় প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলিতে হয় শাস্ত্রের পর শাস্ত্র আওড়াইতে হয় বিধি নিষেধের পর বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা কৃত্রিম—মানুষের শ্রদ্ধার সামগ্রী নয়। কৃপণের গুপ্ত ধনের মত যাহাকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে চোখে রাখিতে হয়—সেখানে আনন্দের কিছু আছে বলিয়া ধারণা হয় না! যাহা কাঁচের মত ঠুনকো জিনিষ তাহা আলমারীতেই শোভা পায়। জীবনের মুক্ত পথে যেখানে পদে পদে আঘাত সংঘাত সেখানে উহা অল্প আঘাতেই ভাঙিয়া যায়! আমরা পরগাছা চাই না যাহা বারান্দার শীতল ছায়ায় টবের মাঝেই শোভা পায় একটু রৌদ্রে যাহা শুখাইয়া যায় একটু বৃষ্টিতেই যাহা পচিয়া যায়! তাহার অপেক্ষা বহুগুণে বাঞ্ছনীয়

মুক্ত প্রান্তরের ঐ চিরশ্যামল নব তৃণদল যাহারা রৌদ্র বৃষ্টি, মানুষের পদাঘাত সহ্য করিয়াও কেমন উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে! বাঙ্গালীর জীবন আজ কর্ম্মহীন, মৃত আবর্জ্জনার স্তূপে আবৃত—তাই সে আপনার সহধর্ম্মিণীকে বিলাসের সামগ্রী (wife concubine) করিয়া পুতুলের মত সাজাইয়া রাখিয়াছে, জীবনের শতধারায় উচ্ছ্বসিত কর্ম্মস্রোতে তাহাকে সঙ্গিনী (wife companion) করিয়া সংসার পথে চলিতে পারে নাই।

নারীর দুঃখের অনেক কথাই বলিলাম তাহার নিষ্পেষিত আত্মার অনেক দৈন্য অনেক ক্রন্দন শুনাইলাম। কেন এই দুঃখের করুণ কাহিনী শুনাইলাম? পুরুষের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য? পুরুষ আপনার মহিমার উচ্চ অচল হইতে নামিয়া ধূলাবলুণ্ঠিত নারীকে দয়া করিয়া তুলিবে ইহার জন্যই কি এত কথা বলিলাম? না, —কাহারও কৃপার উপর আমার বিশ্বাস নাই, কান্নাকাটি করিয়া অপরের অনুগ্রহ দৃষ্টি হয়ত লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে না ভিক্ষায় মানুষের চরম কল্যাণ সাধিত হয় না। নারীর দুঃখের প্রতিকারের ভার নারীকেই লইতে হইবে! মানুষের যাহা স্বাভাবিক অধিকার নারীকে তাহা আপনার সাধনার বলে অর্জ্জন করিতে হইবে। বন্ধন ছিঁড়িবার আগে তাহাকে বুঝিতে হইবে ভগবানের নিকট হইতে সে যতগুলি দান পাইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে তাহার হিতাহিত বিচার করিবার শক্তি। আর এই শক্তির গুণেই সে জীবরাজ্যে তাহার আসন খানি সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করিতে পারিয়াছে। মানুষ যখন সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইয়া জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করে আচারের জীর্ণ কঙ্কাল ছাড়িয়া বিচারের আশ্রয় লয় কতকগুলি চিরাচরিত প্রথা আর খান কতক পুঁথির শুষ্ক পাতার মোহ এড়াইয়া 'অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্ব্বাণ অগ্নি' তাহারই আলোকে জগতকে নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে তখন সে দেখিতে পায় সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের না হইলেও অধিকাংশ স্থলে সে নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝেই —হাহাকার করিতেছে। সে তখন দেখে সংসার জুড়িয়া দিবারাত্র এই যে কান্নার রোল এই যে ঘরে ঘরে যাতনার আর্ত্তনাদ দেশে দেশে নির্য্যাতনের করুণ চীৎকার—ইহার জন্য দায়ীত অদৃষ্ট নয় ভগবান নয় দায়ী যে আমরা নিজেরাই। মানুষই যে মানুষের টুঁটি চাপিয়া ধরিতেছে—ভাই যে ভায়ের বক্ষে ছুরিকা হানিতেছে! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজে, গৃহে, ধর্ম্মে সকল স্থানেই সেই একই কথা মানুষের অপমানের জন্য দায়ী মানুষ—সর্ব্বনাশ আমরাই আমাদের করিতেছি—আর কেহ নয়।

মানুষ যতকাল এই কঠোর সত্যটুকুর পরিচয় না পায় ততক্ষণই তাহার দুঃখ ততক্ষণই সে অদৃষ্টের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে তিলে তিলে মরিয়া থাকে —অত্যাচারীর সকল নির্য্যাতন জড় বস্তুর মত সহ্য করে! কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝে অত্যাচারী তাহারই মত একজন মানুষ বা কতকগুলি মানুষের সমষ্টি, আপনার বা আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কতকগুলি আইন ও নিয়মের প্রচলন করিয়া অজস্রের বক্ষ হইতে লক্ষ মুখ দিয়া রক্ত পান

করিতেছে ও স্বার্থোদ্ধত অবিচারে মানুষকে পশু স্বরূপ করিয়া তাহার আত্মসম্মান বিনষ্ট করিতেছে সেই মুহূর্ত্তে তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একখানি পর্দ্দা সরিয়া যায়! তাহার পর সে যখন আরও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিতে শেখে তাহার মনের মধ্যে যখন আরও সূক্ষ্মতর জটিল প্রশ্নের উদয় হয়—কেন এই সমাজের কঠোর বন্ধন—কেন সমাজের অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাশনে দিন পাত করে—জীর্ণ গৃহে শীর্ণ দেহে পশুর জীবন যাপন করে—সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও স্ত্রী পুত্রের অন্নের সংস্থান করিতে পারে না অথচ মুষ্টিমেয় লোক কোনও প্রকার পরিশ্রম না করিয়াও অলসের জীবন কাটাইয়া কেনই বা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী—মানুষ হইয়া মানুষকে ছুইলে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, জ্ঞানের জন্য সমুদ্র পারে যাইলে কেন সমাজে পতিত হয়—অষ্টম বর্ষে গৌরীদান না করিলে কেন মানুষ নিন্দনীয় হয় এই সব প্রশ্ন যখন তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে—তখন তাহার সম্মুখ হইতে আর একখানি পরদা সরিয়া যায়! ভগবান তখন তাহার সম্মুখে স্বর্গের সিংহ-দ্বার খুলিয়া দেন—সে তখন দেখে সম্মুখে অনন্ত বিকাশের পথ অমৃতের অসীম রাজ্য বিস্তৃত! আর সে রাজ্যের প্রবেশ পথে লেখা রহিয়াছে The kingdom of God is within you" ভগবানের রাজ্য তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। মুহূর্ত্তে সমাজ সংসার সাম্রাজ্য, পিতা, মাতা, রাজা, পুরোহিত, শাস্ত্র, আইন—সমস্তই অন্য রূপ লইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিল। সে তখন বুঝিল "Law was made for man not man for Law". মানুষের জন্যই আইন, আইনের জন্য মানুষ প্রস্তুত হয় নাই। সে দেখিল সম্মুখে অনন্ত ভগবান—তাহার একমাত্র বিচারক—তাহার কর্ম্ম বা বিশ্বাসের জন্য তাহার আত্মা তাহার রক্তমাংসের কারাগার হইতে মুক্ত স্বাধীন অমর আত্মা একমাত্র বিশ্ব-রাজের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। তাহাকে বিচার করিবার ও শাস্তি দিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। রাজ্য, সমাজ, গৃহ পিতামাতা সমস্তই তাহার অন্তরাত্মার বিকাশের জন্য। এই অমর সত্য প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দুন্দুভি দেশে দেশে বাজিয়া উঠিল—দেশে দেশে মানুষ বলিয়া উঠিল সোহহং—আমি চিরমুক্ত—চির স্বাধীন অমর আত্মা—আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই! মানুষের শাশ্বত আত্মার অগ্নিশিখার সম্মুখে নৃপতির স্বর্ণমুকুট নিষ্প্রভ হইয়া গেল—শাস্ত্রকারের আইন কানুন সে সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ে লুকাইল! মানুষ যে মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্মান করিতে ভুলিয়া যায় সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পতনের সূচনা হয়! তখন হইতেই সে অপরাধীর মত, তস্করের মত—পথ কুকুরের মত মাথা নীচু করিয়া শুধু হুকুম তামিল করিতে শিখে—পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়ায়। বিচার ছাড়িয়া আচারের জীর্ণ কঙ্কালকে আঁকড়িয়া ধরে—স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে তাহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে!

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম—সংক্ষেপে লিখিতে গেলে লিখিতে হয় সংসার সাধারণতঃ দুঃখময়—কিন্তু এই দুঃখের অধিকাংশই মানুষের নিজ হাতে গড়া। এই দুঃখের অবসান হয় কখন? মানুষ যখন ভাবিতে

শেখে—সে ভগবানের অংশ—নিত্য অমর আত্মা—তাহারই বিকাশের জন্য সমাজ, সংসার, আইন কানুন! আত্মার মহিমাকে খর্ব্ব করিয়াই সে এত দুঃখী—নিজেকে ভুলিয়া যাওয়াতেই তাহার এত দুর্গতি। সে রাজার পুত্র—অমৃতের সন্তান—নিজ হাতে আইন কানুনের সহস্র শৃঙ্খল গলায় আঁটিয়া কাঙালের মত পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! নারীকে আজ অন্তরে অন্তরে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিতে হইবে। তাহাকে জানিতে হইবে—সে মা—সৃষ্টি-কর্ত্রী—সন্তানের জনয়িত্রী। তাহাকে ছাড়িয়া পৃথিবী অপূর্ণা। তাহাকে আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে—তাহাকে বুঝিতে হইবে—যেখানে সে নাই সেখানে আনন্দ নাই শক্তি নাই প্রাণ নাই গান নাই—সৃষ্টির উৎস সেখানে নিরুদ্ধ।

পুরুষকে আজ বুঝিতে হইবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই—সে নারীকে পঙ্গু করিয়া আপনাকেই পঙ্গু করিয়াছে—নারীকে অন্ধকারে রাখিতে গিয়া আপনি অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে! Mazzini অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন Mosaik Bible has said: God created the 'man and the woman from man, but your Bible—the Bible of the future shall say God created humanity manifested in the woman and in the man." ভগবান নর হইতে নারী সৃষ্টি করেন নাই—তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন অখণ্ড মানব-পরিবার—যাহার বিকাশ নর ও নারী উভয়েই।

আজ তাই নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া চিনিতে হইবে—চিনিয়া বলিতে হইবে ওগো নারি! ওগো সন্তানের প্রসবিনী গৃহের মঙ্গল-স্বরূপা নারি! তোমাকে অনাদর করিয়াছি তাই আজ আমরা জগতের রাজপথপার্শ্বে ভিক্ষুকের সকল অপমান সহ্য করিতেছি—তোমাকে বন্দিনী করিয়াই আজ আমরা বন্দী—তোমার চরণে শৃঙ্খল পরাইয়াই ভারত আজ নিশ্চল! তোমার কণ্ঠে ভাষা দান করি নাই তাই ভারতের কোটী কোটী মৌন কণ্ঠে আজ গান নাই! এস নারি! তোমার মঙ্গলঘট লইয়া আজ ভারতের শূন্য শ্মশানে এস—তোমার কমণ্ডলু হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃত বারি ছিটাইয়া দাও। শ্মশান ভারত আবার জ্ঞানে বীর্য্যে রত্নের অজস্র ধারায় শক্তিমান হইয়া উঠুক! তোমাকে আমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম দেখিলাম বৃথা। পশ্চাৎ হইতে তোমরা আমাদের আকর্ষণ করিতেছ। বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রের বুকে পূর্ণ উৎসাহে যখন আমরা ঝাঁপ দিতে যাইতেছি তখন ভৈরবীর করুণ রাগিণী গাহিয়া আমাদের নিবীর্য্য করিতেছ—আমাদের চরণে প্রেমবাহুঘেরা অশ্রুকোমল শিকলি বাঁধিয়া দিতেছ! সে একদিন ছিল যেদিন ভারত তোমায় বন্দিনী করে নাই! যেদিন কুন্তীমা ভীম পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না—রাজ-পুত রমণী স্বামী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিলে আহার মুখ দর্শন করিত না! আর আজ। আজ আমরা তোমায় রুদ্ধকোণে বন্দী করিয়াছি—তাই তোমরাও তোমাদের অঞ্চল দিয়া আমাদের বন্দী করিয়াছ। প্রায়শ্চিত্ত যদি আমাদের না করিতে হয় কাহাদের করিতে হইবে? আমরা যে তোমায় নরকের দ্বার বলিয়াছি—বাঘিনী বলিয়া যে তোমায়

ভয় করিয়াছি ঘৃণা করিয়াছি—তোমার মধ্যে যে কামনার উদ্দীপক শুধু কোমল সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছি—তোমার মঙ্গলরূপিণী ভৈরবী মূর্ত্তিকে সসম্ভ্রমে দূরে রাখিয়াছি! তুমি দূরে—বহু দূরে সরিয়া গিয়া আজ যে নতমুখে কাঁদিতেছ :—

দেবতারে মোর কেহতো চাহেনি ল'য়ে গেল
সব মাটির ঢেলা!
দূর দুর্গম এই বনবাসে পাঠাইল তাঁরে
করিয়া হেলা!

আজ আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে—আজ আমরা তোমাকে শুধু সৌন্দর্য্যের পুতুল করিয়া রাখিতে চাহিনা; তোমাকে চাই আমরা জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে—সর্ব্ব কাজে মূর্ত্তিমতী কল্যাণীরূপে—বীর্য্যময়ী পত্নীরূপে—জ্ঞানময়ী জননী রূপে—! এস এস আজ হে নারি! ভিখারী ভারত অন্নপূর্ণার কাছে আজ অন্ন মাগিতেছে—তুমি যে অন্নপূর্ণারূপিণী! ঘরে ঘরে যে লক্ষীন্দর যে মরিয়া আছে—বেহুলা ভিন্ন কে আজ ভারতের কোটী কোটী লক্ষীন্দরকে বাঁচাইবে? সত্যবান যে আজ মৃত—সাবিত্রীরূপে আজ এস তুমি—ভারতের সত্যবানকে আজ জাগ্রত কর! দেবাসুরের যুদ্ধে ভারত আজ টলমল—শক্তিরূপে আজ এস! তোমার ধৃতরাষ্ট্র আজ অন্ধ—গান্ধারী রূপে এস আজ তুমি—তাহাকে অমৃতের তীরে পথ দেখাইয়া লইয়া যাও—ভারত আজ তাহার চরম ও পরম কল্যাণের জন্য তোমারই মুখপানে চাহিয়া আছে।

অজ্ঞাত রহস্য

[শ্রী শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

বিধাতার গৃহে মহা উৎসব—বিরাট নিমন্ত্রণ,
আহূত হয়েছে স্বর্গের সব পুণ্য প্রতিমাগণ।
'আশা'—'ভালবাসা' বান্ধবী-ডোরে অনুরাগে বাঁধা রয়,
হাসি কৌতুকে মুখরি তুলিছে সারা উৎবালয়।
কক্ষের এক নিভৃত কোণে চাইদেখে ভগবান্—
'কৃতজ্ঞতা' ও উপকার দেবী করিছে অনুষ্ঠান।
পাশাপাশি দোঁহে রহিয়াছে বসি তবু নাহি কথা কয়,
নিকটে থাকিয়া সুদূর সমান ঘটিল না পরিচয়।
এরা দুই দেবী হবে না কি সখী—চাহিবে না মুখ পানে,
অজানা অচেনা রবে চিরকাল দুর্জ্জয় অভিমানে?

মুক্তি পথে

[শ্রীসুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায]

যুগ যুগান্ত ব্যাপি মোহনিদ্রার পর ভারতের এই নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর অতীতের একটা গৌরবময় স্মৃতি—বিশ্ব বিধাতার একটা মঙ্গলময় ইঙ্গিতের আভাস প্রাণে যেন স্বতঃই ভাসিয়া উঠে। তন্দ্রা-বিজড়িত অলস নয়নে চাহিয়া কর্ম্ম জীবনে তাহার প্রথম পদক্ষেপ ধীরে ধীরে চলিযাছিল, প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহের দোলায় চিত্ত দুলিয়া উঠিয়া তাহার কর্ম্মের ফলাফলে সংশয় ও ব্যর্থতাই প্রাণে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যৌবনের জোয়ারে তাহার রূপের বান ডাকিয়াছে—কল কল ছল ছল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালায় দুকুল প্লাবিত করিয়া, সব বাধা বিঘ্ন, সংশয়, লজ্জা মান ভয় ত্যাগ করিয়, সে তাহার প্রাণের আরাধ্য পরম দেবতাকে পাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যৌবনের রূপ লাবণ্যে ঢল ঢল যুবতী প্রেমের পরশে আজ পাগল হইয়া প্রণয় কুসুমে প্রেম হার গাঁথিয়া তাহার পরান দেবতার গলে পরাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সব বাধাবিঘ্ন পদতলে দলিত করিয়া তাহার জীবন দেবতার চরণতলে আজ যে ছুটিয়া যাইবেই—তাহার গতিরোধ করা আজ বুঝি দেবতাদেরও অসাধ্য।

মুক্তিকামী তুমি—বীর তুমি। তোমাকে বাধা দেয় কার সাধ্য। সাধনার পথ বিঘ্ন বহুল চিরদিনই আছে। বাধা বিঘ্নে ভয় না পাইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় তুমি তোমার গন্তব্য পথে চলিয়া যাও—মুক্তি তোমার করতলগত। ক্লীবত্ব তোমার শোভা পায় না—
"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ তদুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রম হৃদয় দৌর্ব্বল্যম্ তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।"

উঠ জাগো বীর, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণের ভিতর জীবন দেবতাকে জাগাইয়া, মায়া মোহ দানবদলকে পদতলে দলিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের সেই বজ্র নির্ঘোষবাণী স্মরণ করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও—যদি তুমি মুক্তি চাও।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়
যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।"

ঐ ধর্ম্ম যুদ্ধে যদি তুমি জয়ী হও বিপুল বিরাট বিশ্ব তোমার করতলগত হইবে. তোমার আজ্ঞায় উঠিবে বসিবে, তোমার মুখের অপূর্ব্ব অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া. হিংসা দ্বেষ, অশান্তির অনল হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বস্রষ্টা সেই মহাগুরুর চরণ তলে লুটাইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িবে। যদি তুমি ঐ যুদ্ধে নিহত হও—কর্ত্তব্য পালনের ঐ প্রাণভরা বিশ্বাসের বিপুল চেষ্টা যদি তোমার ব্যর্থ হইয়া যায়—তাহা হইলেও তোমার দুঃখের কিছু নাই, তুমি তোমার ঐ সাধু সঙ্কল্পের জন্য, তোমার ঐ নিষ্কাম

ব্রতেব ফলস্বরূপ অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে। বুঝিবে এখনও সময় হয় নাই—নিয়তিব এ বিচিত্র খেলার মেলা এখনও সাঙ্গ হয় নাই। শ্রীভগবানের সেই শান্তিপ্রলেপ বাণী—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ" স্মরণ করিয়া তুমি তোমার সেই বিফল প্রয়াস জনিত প্রাণেব ক্ষতে শান্তি প্রলেপ লেপন করিয়া কর্ত্তব্য পালনের নির্ম্মল আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া দিবে।

সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে ভারত আজ কোন পথে ছুটিয়াছে। ভগবানের কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার এই কর্ম্মপথে আহ্বান আসিয়াছে। প্রাণের ভিতব স্থিব সত্যের এই ভাবটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। স্থির মনে কর্ত্তব্যের আহ্বানেব সেই মহা সত্য ভাবটুকু হৃদয়ে ষোল আনা ববণ করিয়া লইয়া তোমাকে তোমাব সাধনার সঙ্কল্প কবিয়া লইতে হইবে। তোমার ষোল আনা প্রাণ দেহ কারার ভিতর হইতে সাধনবলে বাহির কবিয়া ভগবানেব চরণতলে পৌছাইয়া দিয়া তাঁহার আদেশবাণী শুনিয়া লইতে হইবে, সেই ধ্রুব সত্যকে তোমার জীবনের লক্ষ্য-স্থান ভাবিয়া তোমায় কর্ম্মের পথে বাহির হইতে হইবে তবেই তুমি সাধনায় জয়যুক্ত হইবে। জীবনের লক্ষ্য আগে স্থির কর—তাহার সত্য সজাগ মূর্ত্তি প্রাণের মধ্যে আগে গড়িয়া লও, মুক্তির পথ তখন আপনিই বাহির হইবে আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, পথভ্রষ্ট হইবার ভয়ও তখন তোমায় থাকিবে না।

এতদিন তুমি ঘুমাইতেছিলে—মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া এত দিন তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থিব করিতে পাব নাই। জীবনের কটা দিন তুমি সংসারের মাঝে কোনওরূপে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া—অর্থ, মান ও যশের পথ উন্মুক্ত করিয়াই তুমি তোমার জীবনের স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টিত হইতে। কোনও মহৎ উদ্দেশ্য এত দিন তোমার লক্ষ্য পথে পতিত হয় নাই। নূতন ভাবের ফোয়ারা আজ ছুটিয়াছে. বসন্তের মলয় বাতাস আজ তোমার প্রাণে বহিয়াছে, আনন্দে, বিস্ময়ে, পুলকে আজ তুমি তোমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছ তোমার জীবনের চরিতার্থতা শুধু অর্থ, মান বা যশোপার্জ্জনে নাই! স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে শান্তি নাই, আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই—আছে কেবল একটা বিরাট তৃষ্ণা—একটা বিরাট অভাব—একটা বিবাট হাহাকার!! নবীন বসন্তেব এই মলয় মারুতেব প্রতি স্পন্দনে তোমার জীবন আজ নাচিয়া উঠিয়া ইহার অতিরিক্ত একটা মহত্বের আদর্শে জীবনেব চরিতার্থতা খুঁজিতে বাহিব হইয়া পড়িয়াছে। সে আদর্শ কি?—সে চরিতার্থতাই বা কোথায় স্থির হইয়া সেই সত্যেব অনুসন্ধানে জীবন ঢালিয়া দিয়া ধন্য হও।

তুমি মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ—মানুষ বলিয়া জগতের সমক্ষে তুমি তোমার পরিচয় দিতেছ যদি তুমি আত্মপ্রবঞ্চক না হও, যদি সত্যের মর্য্যাদা একটুও তুমি অনুভব করিতে পার তাহা হইলে দেখিবে, তুমি মনুষ্য তোমার ধর্ম্ম, তোমার সত্য স্বরূপ—মনুষ্যত্ব, সর্ব্ব প্রথমে অর্জ্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত পক্ষে তুমি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে অধিকারি হইবে না। সৃষ্টির অন্যান্য জীবনের সহিত তোমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যান্য জীব হইতে উন্নত অবস্থায় জন্মগ্রহণজনিত তাহাদিগের অধিকাব

হইতে তোমার উন্নত অবস্থার স্বাভাবিক অধিকার প্রমাণ করিতে, তোমায় প্রথমে তোমার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তুমি—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অধিকারও তোমারই ভোগ্য। কিন্তু সে ভোগের অধিকারি হইতে হইলে তোমায় তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে; তাহা না হইলে শুধু মনুষ্য দেহের আকৃতি লইয়া তোমার সে শ্রেষ্ঠ অধিকার ভোগের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। ফাঁকির চাল এখানে চলিবে না, পরীক্ষক বড় কঠিন, তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইবার কোনও উপায় এখানে নাই। নিয়তির বিধানে, প্রকৃতির লীলায়, বাসনার তাড়নায় ভোগৈশ্বর্য্যের লালসায় প্রথমে যখন তুমি তোমার শান্তিময় গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছিলে তখন হইতে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবন সেই অনন্ত ভোগ সমুদ্রে ডুবিয়া শান্তি পাইবার আশায় তুমি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। শান্তির আশায়, তৃপ্তির আনন্দের জন্য ক্ষুদ্র কৃমী কীট জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম সকল জীবনের জীব ধর্ম্মকেই তন্ন তন্ন করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বিফল হইয়া হতাশ হৃদয়ে তুমি ফিরিয়াছ, কোথাও সে শান্তি তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই—সে তৃপ্তির, সে আনন্দের সন্ধান কোথাও তুমি পাও নাই—মুক্তির সে বিমল বাতাস বহিতে কোথাও তুমি দেখ নাই। প্রকৃতির এ বিচিত্র লীলায় লীলাময়ের সকল লীলার অভিজ্ঞতা একে একে সঞ্চয় করিয়া অবশেষে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নানা বৈচিত্রপূর্ণ এই নরলীলায় শেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তুমি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অর্থ মান, যশ, সৌন্দর্য্য প্রাণে যাহা কিছু তোমার ভাল লাগিয়াছে তাহাদের সকলেরই পিছু পিছু তুমি ছুটিয়া দেখিয়াছ, রূপের মোহে অন্ধ হইয়া তুমি কত হাবুডুব খাইয়াছ, অহঙ্কার, নাস্তিকতা শঠতা, কুটিলতা, সকলেরই দুয়ারে তুমি শরণ লইয়াছ কিন্তু কোথাও তুমি অনন্ত চিরশান্তি ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণের সন্ধান খুঁজিয়া পাও নাই। সকল দুয়ার হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া কত শত তীক্ষ্ণ কণ্টকে পা দুখানি তোমার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, কত হা হুতাশের বেদনা গায়ে মাখিয়া অনন্ত জীবনের শৈশব, কৈশোর, ও যৌবন বৃথা নষ্ট করিয়া, অশ্রুসিক্ত জীবনের এই সায়াহ্নে অপরাধীর মত সকল জীবনের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার অর্ঘ সাজাইয়া লইয়া, নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আজ তুমি তোমার জীবন দেবতার চরণ তলে শরণ লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। (কবি গুরুকে নমস্কার করি)। উচ্ছৃঙ্খলতা, কপটতা, আত্ম প্রবঞ্চনা দূর করিয়া, উন্মুক্ত উদার—নির্ম্মল শিশুর সারল্য লইয়া আজ তুমি সেই জগদ্‌গুরুর চরণ তলে শরণ লও, তাঁহার হাতে তোমার জীবনের কঠিন ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও। শান্তিময় প্রেমময় চির-আনন্দময় তিনি তোমার আত্ম-সমর্পণে প্রীত হইয়া তোমার জীবনে শান্তি, প্রেম ও আনন্দের উৎস বহাইয়া দিবেন। মরুভূমি সম তোমার এ হিংসা দ্বেষ পূর্ণ হৃদয়ে, রোগ, শোক, বিরহবেদনা জর্জ্জরিত তোমার ঐ অশান্তি পূর্ণ প্রাণে, তুমি এক নূতন জীবনের আস্বাদ পাইবে। মৃত্যুতে আর তুমি ভীত হইবে না—তুমি মৃত্যুঞ্জয় হইবে। পুত্র শোকে তুমি কাতর হইয়া ছট্ ফট্ করিবে না, সংসারের

কোনও অমঙ্গলে আর তোমার হৃদয় টলিবে না, তুমি অনন্ত সৌন্দর্য্যের, অনন্ত শান্তির সন্ধান পাইয়া সর্ব্ব অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের ইঙ্গিত আভাষ দেখিতে পাইবে, সর্ব্ব বৈচিত্র্যতা, সর্ব্ব-বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সুচারু শৃঙ্খলা ও সাম্যভাব দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হইবে।

জীবনের লক্ষ্যকে আপাততঃ এইরূপ স্থির করিয়া তোমার প্রাণকে গড়িয়া তোল। জীবনে ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর আরও মহত্তর লক্ষ্য সাধন করিবার আছে—তবে আপাততঃ ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি মানুষ হও—সর্ব্ব প্রথমে তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয় দাও। যে দেশে সৌভাগ্য বলে ও বহু পুণ্যফলে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ সে দেশের অতীত গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর। পিতা, পিতামহদের পুণ্যময় অস্থিমজ্জা যে দেশের প্রতি ধূলিকণায় মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে সে দেশের প্রতি ধূলকণাকে পরম পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া তাহাকে মস্তকে তুলিয়া লও—তাঁহাদের জীবনের আদর্শে নিজেদের জীবন গঠিত করিয়া সে দেশের আকাশে গগনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির বীজ ছড়াইয়া দাও।

মুক্তি ও শান্তি ভারতের চির দিনই করতল গত ছিল দুঃখে, দৈন্যে, অশান্তিতে কোনও দিনও তাহাকে টলাইতে পারে নাই—আধ্যাত্মিক সম্পদে সে চিরদিনই ধনী। সংসারের মোহ কোনও দিনই তাহাকে ভুলাইতে পারে নাই মায়ার বাঁধন হইতে সে চির দিনই মুক্ত। জীবন ছিল তাহার একটা অনন্ত শান্তিসুখের অফুরন্ত সঙ্গীত—সে সুরের রেশ যেন আজও কাণে আসিয়া বাজে—মরমের কোন নিভৃত তন্ত্রীতে সে সুর রেখা যেন আজও আসিয়া দেখা দিয়া চলিয়া যায়!!

কর্ত্তব্যের ডাক তোমার আসিয়াছে—মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া সে আহ্বান আবার কত—কাল পরে তোমায় পথে বাহির করিয়াছে। মুক্তি এবার তোমার নিজের জন্য নয়—জগৎকে এবার তোমায় মুক্ত করিতে হইবে। শান্তি এবার তোমার একার জন্য নয়—জগতের পাপ, তাপ, হাহাকার, ঈর্ষাকলুষিত হৃদয়ের রক্তলোলুপ দৃষ্টি দূর করিয়া এবার তোমায় এই বিশাল বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। আনন্দ এবার শুধু তোমার একার উপভোগের জন্য নয়—জগতের মাঝে সে আনন্দের অমৃত ধারা ছড়াইয়া দিয়া জীব সমূহকে সে অমৃতের আস্বাদন দিতে হইবে। স্বরাজ লাভ এবার তোমার শুধু একটা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন (change of government) নয়—মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে স্বরাট্ পুরুষ হইয়া তোমাকে ষড়রিপু ও বাসনার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া জগৎকে সেই মুক্তিপথের সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া সে পথে লইয়া চলিতে হইবে। কর্ত্তব্যের এই মহা আহ্বান পালনের জন্য তোমার স্বরাজ লাভ—অনুকূল রাষ্ট্রীয় বিধি বিধান প্রনয়নের ব্যবহার তোমার নিজের অধিকার লাভ—সে পথের শুধু একটা সহায় মাত্র। রাষ্ট্রীয় মুক্তি তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য নয়—ঐহিক ভোগে তোমার জীবনের চরিতার্থতা নয়—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পারমার্থিক জীবনে, ব্যক্তিগত মুক্তির পথে তোমাকে যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুবর্গের সহিত—তোমার মুক্তি পথের চির শত্রু মায়া, মোহ, প্রভৃতি দানব-

দলের সহিত সকল সম্বন্ধ, সকল আত্মীয়তা ছিন্ন না করিলে তোমার মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। সেইরূপ বিরাট বিশ্বের মুক্তি সাধনায় ব্যাপৃত সাধকবৃন্দের সাধন পথের শত্রু ও অন্তরায় বলিয়া যাহা কিছু বিবেচিত হইবে তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে দূরে পরিহার করা ভিন্ন এ মহদুদ্দেশ্য সাধনের অন্য পথ নাই। সাধন-পথে আত্মবিস্মৃতি, প্রলোভন ও নানা বাধা বিঘ্ন চির দিনই আসিয়া থাকে। সাধনাকে ব্যর্থ করিবার জন্যই যে এ সব বাধা বিঘ্ন আসে তাহা নয়। সাধকের হৃদয়ের পবিত্রতা, তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, তাহার স্থির আত্ম-সংযমের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই এইরূপে সয়তানের বেশ ধরিয়া আসিয়া থাকেন। ইহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। এই অমঙ্গলের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি চিনিয়া ধরিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। বিশাল সমুদ্রে নানা নদ নদীর জল প্রবিষ্ট হইয়াও যেমন তাহার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিতে পারেনা—তাহার স্থির ধীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে সক্ষম হয় না সেইরূপ যে সাধকের হৃদয় দৃঢ় আত্ম-সংযমের গাম্ভীর্য্যে স্থির প্রশান্ত হইয়া এই সব বাধা বিঘ্নে উত্তেজিত না হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হয় সেই বীর সাধকই এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তি পথের সন্ধান পায়। শত্রুকে সর্ব্বদা উপেক্ষা করিয়া চলিবে—শত্রু বলিয়া কখনও তাহাকে ঘৃণা করিবে না। ঘৃণা করিবার অধিকার তোমার নাই কারণ সেই শত্রুভাবও ভগবানেরই আর এক রূপের অভিব্যক্তি। বিনা বাধায় পাছে তোমার উদ্যমে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে তাই ঘাত প্রতিঘাতে তোমার শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য—তোমার সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করিবার জন্যই করুণাময়ের অপার করুণার মহিমায় তাঁর এই শত্রুভাব ধারণ—ইহা সত্য, স্থির সত্য—বিশ্বাস কর—ইহা ধ্রুব সত্য !!

বীর সাধক! কঠিন এ কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত করিয়া তোমার হৃদয়কে গঠিত কর। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও—তোমার সকল উদ্যম জয়যুক্ত হইবে—তোমার সকল আশা, আকাঙ্খা, পরিতৃপ্ত হইয়া গৌরবের বিজয় মুকুট অচিরে তোমার শিরে শোভিত হইবে। রোগ, শোক, পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য সকল অশান্তি দূর হইয়া জগতে আনন্দ ও চির শান্তির মঙ্গল বাতাস বহিতে থাকিবে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জগতের সকল জাতি পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দের তালে নাচিতে নাচিতে আবার সেই শান্তিময় গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিবে। জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির সে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল মধুর মিলন দেখিয়া তোমার জীবন সার্থক হইবে—জগৎ ধন্য হইবে।

জ্যোৎস্নালোকে

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!
বুঝি দ্যুলোক ছাপিয়ে পুলক আজিকে
নেমে এল ভুবনে!
খুলে ফেল প্রিয়ে, অবগুণ্ঠন,
পড়ুক্ নয়নে চন্দ্র কিরণ,
ঘুচে যাক্ আজ লাজ-আবরণ
দুটি তব নয়নে।
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

কোথা ডাকিছে বিহগ কানন-চূড়ায়
ওই শোন ভামিনি
বুঝি পরাণ-ছাপান উচ্ছাসে তা'র
আকুলিছে যামিনী।
রজনীগন্ধা মাধুরী-নেশায়
রূপের অধরে অধর মেশায়,
আঁখির কথার আঁক্ পড়ে তা'র
দুরন্ত পবনে!
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

যদি বসন্ত-ধারায় ধুয়ে গেল ওগো,
সুনিবিড় তমসা,
ওই যামিনীর বুকে জ্যোৎস্না-আলোকে
উপচিল ভরসা,
কেন পুষে' থোও অভিমান আর,-
গোলাপ-পাতায় নাহি আঁধিয়ার,
চ'খে নাহি লাগে ব্যথাটি কাঁটার
পুলকের প্লাবনে!
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

ওরে শিশির ফোঁটাটি উজ্জ্বল বড়
ঢল ঢল রভসে,
বুঝি চক্ষের জল উথলি উঠিছে
সুবিপুল হরষে!
ক্ষমা কর মোর যত অপরাধ,
ভুলে যাও প্রিয়ে, বাদ প্রতিবাদ,
মেঘ ঠেলি' ওই হেসে উঠে চাঁদ
উজ্জ্বল বরণে!
আজি জ্যোছনা মধুর—হাসিটি বিধুর
উছলিছে গগনে!

এস কর্ণের মূলে ঝুম্‌কা জবার
দুল্ দু'টি দুলায়ে,
গোটা পূর্ণিমাখানি রক্ত অধর
প্রান্তরে লুটায়ে।
নিখিল ভুবন সরসীর জলে
একটি ফোঁটায় আজি ঝল্ ঝলে,
সব ধরা ছোঁয়া, সব বুকে নেওয়া
একখানি স্বপনে!
ওগো, দ্যুলোক ছাপিয়ে পুলক বুঝিরে
নেমে এল ভুবনে!

অগ্নি-পরীক্ষা

(উপন্যাস)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেব্‌ল্ থরপ্ প্রাসাদ

প্রস্তাবনা

স্থান—ইংল্যাণ্ড।

কাল—১৮৭০ খৃঃ অব্দের শীতঋতু।

পাত্র—জুলিয়ান্ গ্রে, হোরেস্ হোম্‌ক্রফট্, প্রাসাদের অধিকারিণী জ্যানেট রয়্, গেস রোজবেরি ও মার্সি মেরিক।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জ্যানেটের সঙ্গিনী

শীতের একটী সুন্দর দিন। আকাশ সুনির্ম্মল—মৃত্তিকা কঠিন তুষারাবৃত।

মেব্‌ল্ থরপ্ প্রাসাদের সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকের সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট সুপরিচিত। প্রাসাদের সম্মুখ ভাগেই একটী পরম রমণীয় উদ্যান। সেখানে নানা জাতীয় ফুল ও বিচিত্র তরুলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

বেলা অপরাহ্ণ; ঘড়িতে তখন ঠিক ২টা বাজিয়াছে। টেবিলের উপর জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত।

টেবিলের পার্শ্বে ৩ জন লোক উপবিষ্ট। প্রথম জ্যানেট রয়্; দ্বিতীয় তাঁহার সঙ্গিনী একটী যুবতী; তৃতীয়—সেই গৃহের একটী নবাগত অতিথি। শেষোক্তের সহিত পাঠকের পরিচয় আছে। ইনিই ফ্রান্সে পরিদৃষ্ট ইংরাজী সংবাদ পত্রের সাময়িক সংবাদদাতা—হোরেস্ হোম্‌ক্রফট্।

উচ্চপদস্থ ইংরাজ সমাজে জ্যানেট্‌কে চিনেন না এমন লোক অতি অল্পই আছে। তাঁহার মূল্যবান রত্ন মণিক্য, তাঁহার সুবিন্যস্ত কেশ কলাপ, তাঁহার গাম্ভীর্য্যদ্যোতক মূর্ত্তি, ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু—এ সকলই লোকের নিকট সুবিদিত। তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার অতি মধুর। লোকের সহিত প্রসন্ন ভাবে তিনি আলাপ করিয়া থাকেন—তাঁহার সৌজন্য ও সুরসিকতার জন্য তিনি সকলের প্রিয়। তাঁহার দানশীলতা ধনী নির্দ্ধনের বিচার করিত না—যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। স্বদেশী বা বিদেশী দীন দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনে তিনি সদা তৎপর ছিলেন। তিনি বিধবা,—তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই। জ্যানেটের বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক—কারণ তাঁহাকে সকলেই জানে।

কিন্তু জ্যানেটের দক্ষিণপার্শ্বে যে যুবতী আহার্য্য লইয়া অন্যমনস্কভাবে নাড়া চাড়া করিতেছে—ঐ রমণী কে?

তাহার বেশ-ভূষা পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছদের সীমান্তভাগ ধূসর মখমলের আস্তরণে সজ্জিত—কণ্ঠের নিম্নে গাঢ় লোহিতবর্ণের একটী ফিতার গুচ্ছ। একটী মধুর সৌন্দর্য্যের আভাস দেহখানিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া বিদ্যমান। তাহার বৃহৎ চক্ষু দুইটী কিন্তু বিষাদের বেদনায় পরিপ্লুত—দেখিলেই মনে হয় যুবতী কোন ধনশালী অভিজাত বংশের কন্যা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জ্যানেটের দাসী মাত্র।

জ্যানেট্ কোন কথা বলিলে যুবতীর মস্তক সসম্মানে নত হইতেছিল—জ্যানেটের আদেশ পালনে তাহার হস্ত সর্ব্বদা সযত্নে নিযুক্ত ছিল। বৃদ্ধা জ্যানেটও যুবতীকে নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন—তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার মাতৃস্নেহই সূচিত হইতেছিল। যুবতী কৃতজ্ঞতার সহিত জ্যানেটের স্নেহ স্বীকার করে—কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা অতি সংযত—তাহাতে বাহুল্য বা আতিশয্যের লেশ মাত্র ছিল না। তাহার মুখে হাসিটুকুও যেন প্রচ্ছন্ন বিষাদের সংযমে সংযত। যুবতীর এ বিষাদ ভাব কেন? তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে কি কোন বিষাদের কারণ প্রচ্ছন্ন আছে? এ বেদনা শারীরিক না মানসিক?

তাহার কর্ত্রী ও অন্যান্য সকলের নিকট সে জ্যানেটের দুঃখিনী আত্মীয়া গ্রেস্ নামে পরিচিত। কিন্তু তাহার নিজের কাছে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে জানে সে পতিতাশ্রমের অধিবাসিনী—সে গৃহহীনা নিরাশ্রয়া নারী। সে জানে ধর্ম্মের পথে চলিয়া সমাজে স্থান লাভের কোন আশা নাই দেখিয়া সে প্রতারণাপূর্ব্বক সুখের গৃহ ও সুনাম অপহরণ করিয়াছে। তাহার নিজের প্রকৃত রূপ তাহার নিকট কি বিকট, কি ভয়ঙ্কর!

সে নীচ ছলনার আশ্রয়ে অপর এক জনের নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে! এই যুবতী অপর কেহই নহে—সে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মার্সি মেরিক। সে শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পাপকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে—সে গত ৪ মাস ধরিয়া গ্রেসের ছদ্মবেশে এই গৃহে বিরাজ করিতেছে!

আজ তাহার মনে অনুতাপের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। পাপপুরুষ তাহার অধঃপতনের পথ কত না সহজ করিয়া দিয়াছিল—বিনা ক্লেশে সে আপনাকে জগতের নিকট রোজবেরি রূপে পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছে। জ্যানেট তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন—তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। মার্সির পরিচয়ের জন্য সেই অপহৃত পত্রখানির প্রয়োজন হয় নাই—তাহার উদ্ভাবিত আখ্যায়িকারও আবশ্যকতা হয় নাই। জ্যানেট পত্র না খুলিয়া উহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। আখ্যায়িকার দু একটী কথা বলিতে না বলিতেই তিনি মার্সিকে থামাইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার মুখখানিই তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয়পত্র; তোমার মুখ অপেক্ষা তোমার পিতার পত্র তোমার পরিচয় সুন্দর রূপে দিতে পারিবে না।" গৃহকর্ত্রী সস্নেহে মার্সিকে নিজের গৃহে নিজ কন্যার ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন প্রকৃত গ্রেস্ জার্ম্মান হাঁসপাতালে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, ছদ্মবেশিনী গ্রেস্ সেই সময়ের

মধ্যে জ্যানেটের গৃহে তাঁহার আত্মীয়া স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। মার্সির মনে এ সন্দেহের ছায়ামাত্রও ছিল না যে গ্রেসের প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হয় নাই—সে শুধু মস্তিষ্কের আঘাতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল। সে জানিত অভাগিনী গ্রেস্ সংসারের সকল সুখ-শান্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু-লোকে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং মার্সির অবশিষ্ট জীবন যে নিরাপদ অবস্থায় সুখ সৌভাগ্যে অতিবাহিত হইবে এ বিষয়ে তাহার বা জগতের সন্দেহের কোন কারণই ছিল না। কিন্তু বিবেকের কশাঘাত মার্সিকে সুখ সৌভাগ্যেও সুস্থির থাকিতে দিল না।

মার্সি সহসা টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে সর্ব্বদাই অনুতাপের অগ্নি জ্বলিতেছিল; স্মৃতিই তাহার এক্ষণে পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই স্মৃতির হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে সর্ব্বদা আপনাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিত—কোন কার্য্যেই কিন্তু সে অধিকক্ষণ স্থিরভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারিত না।

সে কর্ত্রীকে বলিল—"আমি একবার বাগানে বেড়িয়ে আসি?"

জ্যানেট্ বলিলেন—"সে জন্য আমার অনুমতির অপেক্ষা কেন? যাও না একটু বেড়িয়ে এস।"

মার্সি উদ্যানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে করুণ দৃষ্টিতে একবার জ্যানেটের ও হোরেসের দিকে চাহিয়া গেল। হোরেসের চক্ষু তাহার অনুসরণ করিল। হোরেসের মুখে যুগপৎ প্রশংসা ও বিরক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইল। যখন মার্সি অদৃশ্য হইল তখন হোরেসের প্রশংসার ভাব চলিয়া গেল কিন্তু বিরক্তির ভাব গেল না। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; সে গম্ভীর হইয়া কাঁটা চামচ হস্তে বসিয়া রহিল।

জ্যানেট্ বলিলেন—"হোরেস্, কিছু খাবার দেব?"

"না—আর কিছু চাই না।"

"কিছু নাও না।"

"না, আর কিছুরই দরকার নাই।"

হোরেসকে গম্ভীর থাকিতে দেখিয়া জ্যানেট বলিলেন—"হোরেস, আমি দেখছি কেন্‌সিংটনের আবহাওয়া তোমার সহ্য হ'চ্ছে না। তুমি যত এখানে বেশীদিন থাকৃছ ততই তোমার আহার কমে যাচ্ছে—আর তোমার চুরুট টানা, আর মদ খাওয়া বেড়ে যাচ্ছে। যুবকের পক্ষে এ সব ভাল লক্ষণ নয়। যখন তুমি এবার প্রথম এখানে এলে তখন তুমি গোলার আঘাতে আহত হ'য়ে এলে। আমি হলে সংবাদ পত্রে যুদ্ধের বিবরণ জোগাবার জন্য আমার জীবনকে এমন নির্ব্বোধের মত সঙ্কটাপন্ন করতাম না। এতে জগতের কি উপকার আছে, বল। তবে সকল লোকের রুচি এক নয়—সেই যা কথা। তুমি কি পীড়িত? তোমার ঘায়ে এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"না, না। কিছুই যন্ত্রণা নেই।"

"অস্বস্তি বোধ ক'রছ।"

হোরেস্ কাঁটা চামচ টেবিলের উপর ফেলিয়া বলিল—"হাঁ, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি।"

এ উত্তর জ্যানেটের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি বলিলেন—"হোরেস, মাথা তোল। কাঁটা চামচের দিকে না

তাকিয়ে আমার দিকে চাও। আমার গৃহে কোন লোক অস্বস্তি বোধ ক'রছে—এ কথা বল্লে আমাকে গালাগালি দেওয়া হয়। যদি এখানে তোমার ভাল বোধ না হয়—আমায় সে কথা স্পষ্ট করে বল; তোমার যেখানে তৃপ্তি হয় সেখানে তুমি যেতে পার। তুমি চাকরির জন্য দরখাস্ত ক'রলে চাকরী পেতে পার। হেসো না—আমি তোমার হাসি দেখতে চাই না, আমি আমার কথার জবাব চাই।"

হোরেস বলিল—"ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যে এখনও যুদ্ধ চ'লছে—সংবাদপত্রের সংবাদদাতা স্বরূপে আমি পুনরায় চাকরী পেতে পারি।"

"দেখ, এই যুদ্ধ আর সংবাদপত্রের কথা আমার কাছে ব'লো না। আমি সংবাদপত্রগুলাকে ঘৃণা করি—আমি আমার গৃহে কোন সংবাদপত্র আসতে দেব না। এই জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যে রক্তারক্তির ব্যাপার চলছে—তার মূলে ঐ জঘন্য সংবাদপত্র গুলা।"

"আপনার এ কথার অর্থ কি? আপনি কি ব'লতে চান সংবাদপত্রগুলাই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী?"

"সম্পূর্ণ দায়ী। ভেবে দেখনা আমরা কি যুগে বাস করছি। এখন লোকে যা কিছু করে তার মূলে থাকে একটা লোভ—সে লোভ হচ্ছে এই যে, সংবাদ পত্রে তাদের কার্য্যের বিবরণ ছাপা হবে। তুমি গরীবদের দুঃখ দূর করবার জন্য কিছু টাকা দান করলে; অমুক পাদ্রী একটী ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন; অমুক একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন;—এই তুমি, এই পাদ্রী, এই বৈজ্ঞানিক সবাই চান একটী জিনিষ—সেটী হ'চ্ছে সংবাদ পত্রে আপন আপন কার্য্যের প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ। রাজা, সৈনিক, রাজনীতিক—এঁরা কি সাধারণ মনুষ্য-নীতির বাইরে মনে কর? আমার স্থির ধারণা এই—যদি ইউরোপের কোন সংবাদপত্র এই যুদ্ধের বিবরণ মুদ্রিত না ক'রতো—এ বিষয়ে যদি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতো—তা হ'লে এই ভীষণ যুদ্ধ উৎসাহের অভাবে কোন্ দিন শেষ হ'য়ে যেত! কলম তরবারীর বিজ্ঞাপন প্রচারে বিরত হোক্—তা হ'লে তার ফল কি হবে তা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—বিজ্ঞাপন উঠে গেলেই যুদ্ধ উঠে যাবে।"

"আপনার এ যুক্তি খুব নূতন বটে! আপনার এই মত যদি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করি তা হ'লে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?"

জ্যানেট হোরেসের বিদ্রূপ বুঝিয়া বলিলেন—"আমিও তো এই যুগেরই লোক; না হয় আমার বয়সই একটু বেশী। সংবাদপত্রে ছাপানোর কথা বল্লে, না? আমার মাথার দিব্যি—খুব মোটা মোটা অক্ষরে ছাপিয়ে দিও।"

হোরেস কথা বদলাইয়া বলিল—"আপনি আমার অশান্তি ও অবসাদের জন্য আমাকে দোষ দিচ্ছেন? আমার শরীরের তো কোন কষ্ট নেই। আমার অশান্তি মানসিক। ফলকথা—আমি গ্রেস রোজবেরির আচরণে সন্তুষ্ট নই।"

"গ্রেস্ কি করেছে?"

"গ্রেস্ ক্রমাগতই দেরি করছে—কিছুতে সে আমাদের বিবাহের দিন স্থির করতে রাজী হ'চ্ছে না।"

কথাটা সত্য। মার্সি উদ্দাম প্রবৃত্তিবশে

হোরেস্‌কে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে ছদ্মবেশে ও অলিক নামের আশ্রয়ে হোরেস্‌কে বিবাহ করিবে—এতদূর নীচ তাহার হৃদয় ছিলনা। আজ ৩।৪ মাস হইল হোরেস্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসে। সে পাঠ্যাবস্থায় অনেক সময় তাহার অবকাশকাল জ্যানেটের গৃহে অবস্থান করিয়া কাটাইত। জ্যানেট হোরেসের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তিনি মনে করিয়াছিলেন এ সময় তাঁহার গৃহে থাকিলে হোরেস্ অনেকটা মনের আনন্দে কাটাইবে। হোরেস্ জ্যানেটের গৃহে আসিয়া দেখিল তাহার ফ্রান্সে পরিচিত সেই ইংরাজ রমণী সেখানে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সেখানে মার্সির সহিত একত্র বাস করিতে করিতে তাহার মনে মার্সির প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইল। মার্সিও হোরেস্‌কে ভালবাসিল। তাহাদের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব চলিল। মার্সি একান্ত অনিচ্ছা ক্রমে বিবাহে সম্মতি জানাইল। কিন্তু সে বিবাহের দিন স্থির করিতে সম্মত হয় না—হোরেস্ বারম্বার চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে তাহাকে রাজি করিতে পারে নাই। এ বিবাহে মার্সির যে কি অন্তরায় হোরেস্ তাহা বুঝিতে পারে না। মার্সির কোন আত্মীয় কুটুম্ব নাই—সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহাকে কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে হইবে না। সে জ্যানেটের কুটুম্ব—এই কথা জানিয়া হোরেসের মাতা ও ভগ্নী তাহাকে যথাবিহিত সম্মানের সহিত আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল। এ বিবাহে অর্থেরও কোন প্রয়োজন ছিল না—হোরেসের নিজেরই প্রচুর অর্থ ছিল। সে তাহার পিতার একমাত্র পুত্র এবং তাহার পিতাও বেশ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং উভয় পক্ষেই কোন বাধা উপস্থিত ছিল না—অথচ মার্সি কেন যে দিন স্থির করিতে অসম্মত ইহার কারণ হোরেস কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আর এই বিলম্বের কারণও মার্সি কিছুই বলিতে চাহে না। সুতরাং ক্রমশঃই তাহার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল।

জ্যানেট বলিলেন—"গ্রেস কেন এরকম ক'রছে তার কিছু কারণ তুমি বুঝতে পারছ?"

"আমি কথাটা স্পষ্ট ক'রে ব'লতে রাজি নই, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয় যে তাহার এমন একটা গূঢ় কারণ আছে যেটা সে আমাকে বা আপনাকে খুলে ব'লতে সাহস ক'রছে না।"

"তোমার এমন কথা কেন মনে হ'চ্ছে?"

"আমি দুএকবার তাকে নির্জ্জনে কাঁদতে দেখেছি। প্রায়ই দেখতে পাই আমোদ প্রমোদ ক'রতে ক'রতে সে যেন সহসা অন্যমনস্ক হয়; মুখ তার বিবর্ণ হ'য়ে যায়—আর সে বিমর্ষ ও গম্ভীর হয়ে পড়ে। এই একটু আগে যখন সে এই ঘর হ'তে বেরিয়ে বাগানে গেল তখন আমার দিকে এম্নি করে চেয়ে গেল যে মনে হল যেন সে আমার জন্য মহা দুঃখিত। এ সবের অর্থ কি?"

হোরেসের এই উত্তরে জ্যানেটের দুর্ভাবনা না বাড়িয়া যেন অনেকটা কমিয়া গেল। মার্সির আচরণ সম্বন্ধে হোরেস্ যাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, জ্যানেট নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"নির্ব্বোধ

যুবক—এর অর্থ বুঝতে পারছ না?—এর অর্থ খুবই সোজা। কিছুদিন হ'তে গ্রেসের শরীর ভাল নেই—ডাক্তারেরা তাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"আপনি না নিয়ে গিয়ে, আমি যদি তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম তা হ'লেই তো ঠিক ব্যবস্থা হ'ত। আপনি যদি একটু জিদ্ ক'রে ধরেন তা হ'লে সে বোধ হয় দিন স্থির করার বিষয়ে সম্মত হয়। আমার মা তো কতবার তাকে অনুনয় বিনয় ক'রে পত্র দিয়েছেন—কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি! আমাব প্রতি এই দয়া আপনাকে ক'রতেই হবে—আজ আপনি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন। আপনি তো আমার প্রতি অনেক দয়া প্রকাশ ক'রেছেন—এ কাজটাও করতে হবে।"

জ্যানেট হোরেসের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। তাহার গৌর কান্তি, নীল চক্ষু, সুদৃশ্য কেশরাজি—আকর্ষণের বস্তু। এ সৌন্দর্য্যে অনেক বালিকাই মুগ্ধ হইতে পারে। জ্যানেট যে হোরেসকে শুধু তাহার নিজের গুণের জন্য ভালবাসিতেন তাহা নহে। হোরেসের সহিত তাঁহার অনেক প্রিয় পূর্ব্ব-স্মৃতি জড়িত ছিল। হোরেসের পিতা একদা জ্যানেটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—ঘটনা ক্রমে তাঁহারা কিন্তু বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতে পারেন নাই। অন্য লোকের সহিত জ্যানেটের বিবাহ হইল। কিন্তু এ বিবাহের ফলে কোন সন্তান সন্ততি হইল না। বহুপূর্ব্বে যখন প্রথম হোরেস জ্যানেটের গৃহে অবসর কাল যাপন করিতে আসিয়াছিল, তখন জ্যানেটের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন—হোরেসের তাঁহার পুত্র হওয়াই উচিত ছিল। আর হোরেসের পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে হোরেস নিশ্চয় তাঁহারই পুত্র হইত এই ভাবিয়া হোরেসকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

সুতরাং হোরেস যখন তাঁহাকে মার্সির সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে বলিল তখন জ্যানেট তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিনি বলিলেন—"তবে কি সত্যই আমাকে গ্রেসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইতে হবে?"

হোরেস দেখিল তাহার অনুরোধ বৃথা হয় নাই। জ্যানেট তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন। তাহার মুখমণ্ডল আশার জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

জ্যানেট তখন হোরেসের গাত্রে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া বলিলেন—"যাও, তবে, ঐ ঘরে গিয়ে চুরুট খাওগে। ঊনবিংশ শতাব্দির এই প্রিয় পাপ সযত্নে সাধন করগে যাও—যাও গিয়ে দু দশটা চুরুট পোড়াও।"

হোরেস চলিয়া গেলে জ্যানেট সেই নির্জ্জন গৃহে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া কিছু ক্ষণ কি চিন্তা করিলেন।

সত্যই হোরেসের অভিযোগের যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল। কেন গ্রেস্ বিবাহে বিলম্ব ঘটাইতেছে? যখন বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে, তখন আজ হউক বা দু দিন পরে হউক, বিবাহ করিতেই হইবে—তবে নিরর্থক এ বিলম্ব কেন? এখন কথা হইতেছে—কিরূপে গ্রেসকে ক্ষুন্ন না করিয়া কথাটা উত্থাপন করা যায়? জ্যানেট ভাবিলেন—আজকালকার মেয়েদের ভাব

গতিক ভাল বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের কালে যদি আমরা কোন পুরুষকে ভালবাসতাম তা হ'লে আমরা তদ্দণ্ডেই তাকে বিয়ে ক'রে ব'সতাম। আর এটা তো শুনতে পাই উন্নতির যুগ! তা হ'লে তো মেয়েদের এ সম্বন্ধে আরো তৎপর হওয়া উচিত।"

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া জ্যানেট গ্রেসের নিকট কথাটা উঠাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কিরূপে কথা পাড়িবেন তাহা আর ভাবিলেন না। তিনি মনে করিলেন— অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

তিনি উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন "গ্রেস্"।

কর্ত্রীর আহ্বান শুনিয়া মার্সি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—

"আমাকে ডাকৃছিলেন?"

"হাঁ; তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আমার কাছে এসে বসো।"

এই কথা বলিয়া জ্যানেট একটী আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন এবং মার্সিকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন।

শুভক্ষণে

[শ্রীসরসীকান্ত দত্ত]

কখন তুমি পাড়ি দিলে
আঁধার পারাবার;
কখন যে মোর গেল টুটে
কঠোর কারাগার!

চেয়ে দেখি চাঁদের আলো
ফুটে ধরার বুকে;
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে
শিউরে উঠে সুখে।

ভাঙাঘরের গোপন কোণে
বসেছিলাম আপন মনে;
হিয়ার মাঝে ছিল শুধু
মৌন হাহাকার।
কখন যে মোর গেল টুটে
কঠোর কারাগার!

না-জানি কোন্ শুভক্ষণে
দেখা হ'ল তোমার সনে;
গুঞ্জরিলে কানে কানে
গোপন সমাচার!
কখন যে মোর গেল টুটে
কঠোর কারাগার!

কর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর উপরেই তত্ত্ববিশ্লেষণ স্থাপিত, আমরা কর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলনে দেখিয়াছি কর্ম্মের মূল ব্রহ্ম, কর্ম্মের পরিণতি বা গতি ব্রহ্ম, এই হিসাবে আমাদের তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে। ভগবানের বাক্যে আমাদের অনুশীলনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলিতেছেন "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ, স পশ্যে দ কর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ, বুদ্ধিমান্। মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ৪। ১৮, ॥

যিনি কর্ম্মতে অকর্ম্ম দর্শন করেন এবং অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন তিনি মনুষ্যের ভিতরে বুদ্ধিমান্ তিনিই যোগী, তিনিই কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা, অর্থাৎ তিনিই কর্ম্ম বা অকর্ম্মের তত্ত্বদর্শী। ভ্রান্তি বশে আমরা আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা মনে করি; তাঁহাতেই কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি, ইহা ভ্রান্তি মাত্র, অধ্যারোপ দূর করাই জ্ঞান, অপবাদেই আরোপ বিদূরিত হয়। তাহাতেই তত্ত্ব বস্তুর প্রকাশ, লোকে কোনও নৌকায় চলিবার সময় মনে করে তীরস্থ বৃক্ষগুলি দৌড়িতেছে। তীরের বৃক্ষগুলির চাঞ্চল্য প্রতীতি, ভ্রান্তি মাত্র। তীরস্থ তরুতে কর্ম্ম বা চাঞ্চল্য প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রান্তি, প্রকৃত জ্ঞান কি? তীরস্থ তরু স্থির, কিন্তু চলিতেছে নৌকা, লোকের দেহাদি কর্ম্মের আশ্রয় কিন্তু কর্ম্ম আরোপিত করে আত্মার, ইহার বশে লোক আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইহা আমার কর্ম্ম এরূপ মনে করে। অসঙ্গনির্লিপ্ত পুরুষে আরোপই ভ্রান্তি, স্থাণুতে পুরুষ ভ্রান্তি দিক্ ভ্রান্তি, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, প্রভৃতি সহজে বোধগম্য হয়, কিন্তু আত্মাতে অনাত্মার দেহাদির অধ্যাস সহজে বোধগম্য হয় না। প্রকৃতিই সকল করিতেছে আত্মা অকর্ত্তা, এই বোধ সহজসাধ্য নহে, আমাদের জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই এই ভ্রান্তির উপরে, পারমার্থিকভাবে। অকর্ম্মই সৎ, কিন্তু মূঢ় বুদ্ধি আমাদের নিকট অকর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্মরূপে অবভাসিত হইতেছে। এবং কর্ম্ম অকর্ম্মের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে কর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, আমি প্রকৃতির কর্ম্ম আমাতে (আত্মাতে আরোপিত করিয়া, আমি কর্ত্তা আমার কর্ম্ম কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিব এইরূপ ভ্রান্তি বশে সকল ব্যবহার করিতেছি প্রকৃত কর্ম্মদর্শী তিনি যিনি এই কর্ম্মে, এ স্থলে কর্ম্মকে প্রকৃতি মাত্র রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ব্যবহারে আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি 'কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই তত্ত্বার্থদর্শী, ইহাই কর্ম্মের মূলতত্ত্বের এক দেশ, পক্ষান্তরে অতি দূরের বস্তু গতিশীল হইলেও স্থির বলিয়া বোধ হয়, যেমন দূরে বহুলোক যাইতেছে আমার নিকট বোধ হইল, উহারা স্থির।

পূর্ব্বে নৌকা চলিতেছিল বোধ হইতেছিল তীরের তরুগুলি চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে বহু দূরস্থ লোক সম্বন্ধে তদ্ বিপরীত, পৃথিবী চলিতেছে। আমরা মনে করি সূর্য্য চলিতেছে ইহা নৌস্থিত ব্যাপারের মতন। রেলগাড়ী চলিতেছে, আমরা মনে করি গ্রামগুলি চলিতেছে, আমরা চলিতেছি, মনে করি চন্দ্র আমাদের সহিত চলিতেছে এগুলি একই প্রকারের। কিন্তু দূর স্থিত গতিশীল পদার্থকে আমরা নিশ্চল বলিয়াই বোধ করি, আমাদের ব্যবহারে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকায় প্রকৃতিকে নিশ্চল মনে করিয়া দেহাদি সংঘাতকে অকর্ত্তা অর্থাৎ অকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, ইহা আমাদের ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু তত্ত্বার্থদর্শী জানেন কর্ম্ম প্রকৃতির ব্যাপার। তাই মূঢ় আমরা যে ক্ষেত্রে অকর্ম্ম মনে করিতেছি সে ক্ষেত্রে তিনি কর্ম্মই দর্শন করিতেছেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "অকর্ম্মাণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' তিনিই তত্ত্বদর্শী বাস্তবিক ইহাই কর্ম্মের তত্ত্ব, আত্মা অকর্ত্তা ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"অব্যক্তোঽয়ম্ চিন্ত্যোঽয়ম্"

'নজায়তে ম্রিয়ন্তে' আত্মাতে কর্ম্মাভাবই দেখাইয়াছেন, দেহাদির আশ্রয় কর্ম্ম, আত্মাতে আরোপ না করিলেই, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলেই প্রকৃত কর্ম্ম-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। আরোপ মাত্রই ভ্রান্তি, আত্মায় দেহাদির আশ্রয়ীভূত কর্ম্মের আরোপে আমি কর্ত্তা আমার কর্ম্ম ইত্যাদিও ভ্রান্তি আর আমি তূষ্ণীং ভাব অবলম্বী আমি যাহাতে নিরায়াস অকর্ম্মা সুখী হইতে পারি এই ভাবও আরোপ, কার্য্য ও কারণ বা দেহ ও ইন্দ্রিয়াশ্রয় ব্যাপারের উপরম করিয়া তজ্জনিত সুখ আত্মাতে অধ্যারোপ ও ভ্রান্তি। আমি কিছুই করিব না, মৌন থাকিব, মৌন সুখ ভোগ করিব ইহাও ভ্রান্তি, আরোপের সামান্ত বিশেষ সকলই ভ্রান্তি কর্ত্তৃত্বও ভ্রান্তি, ভক্তিত্ব ভ্রান্তি। সাধনার অবস্থায় প্রথমে কর্ত্তৃত্বের নিরাশ তৎপরে ভক্তিত্বের নিরাশ, ইহা সাধন প্রসঙ্গে বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত করিব, এখন প্রাসঙ্গিক ক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র, বিপরীত দর্শন মিথ্যাজ্ঞান ইহা তাত্ত্বিক দর্শন নহে। প্রকৃত স্বরূপে দর্শনই কর্ম্মতত্ত্ব তাহা আমরা পাই-লাম। আত্মা অকর্ত্তা, প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব বা ভক্তিত্ব আরোপেই সংসার ব্যবহার চলিতেছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়া কর্ম্মনিবৃত্তি পরম পুরুষার্থ জ্ঞানই কর্ম্মের উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম প্রাপ্তিই কর্ম্মের গীত; সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠাই কর্ম্মের পরিণতি। তত্ত্বাংশে কর্ম্মেতে অকর্ম্মদর্শন, নিষ্ক্রিয়ত্ব উপলব্ধি, আর অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন প্রকৃতির অক্রিয়ত্ব বোধ সাধনাংশে কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দর্শন—'আমি কর্ত্তা, আমার কর্ম্ম প্রভৃতি বোধের বাধ বা পিয়াস, এবং অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শন আমি কর্ম্ম করি না, তূষ্ণীং ভাবে আছি, সুখে আছি, ইহাতেও অহঙ্কার অভিসন্ধি আছে, ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম দর্শন, অভিমান আছে বলিয়াই কর্ম্ম আছে, এই বোধ, অতএব ভগবানের এই বাক্যেই কর্ম্মের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘোষিত। এই তত্ত্বের উপরেই কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের কর্ত্তৃত্ব এবং আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব,—ইহাই কর্ম্মের মূলতত্ত্ব, সাধনাংশে অভিব্যক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকেই পর্য্যবসিত "পূজানাম্নসীয় যে ভুক্তির্নাস্তি খোলো হ পূজানাৎ। পূজাকের বিচ্ছেদেন সদা পূজেতি পূজনং।"

সোমানন্দ পাদাচার্য্য—

পূজা ও পূজকের অভেদ দর্শনই প্রকৃত

পূজা, বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন, অবিষ্ণু পূজয়েৎ বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ। বিষ্ণুর্ভূত্বা পূজয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণু সবৈস্মৃতঃ” বিষ্ণুর সহিত অভেদ জ্ঞানে পূজাই প্রকৃত পূজা, সেই উপাসকেই মহাবিষ্ণু তত্ত্বজ্ঞানে আত্মার নিত্তিময় ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি হয়, প্রকৃতির চঞ্চলতা 'কর্তৃত্ব (কর্ম্ম) বুঝিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মুক্তি। কর্ম্মতত্ত্ববিচারের আবশ্যকতা কি? বিচারের অনাবশ্যকতা শৃঙ্খলা। বিচারের সমন্বয়স্থার পরেই প্রতিষ্ঠা। তত্ত্ববিচারে সমস্ত জিনিষটার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহিত একটা জৈবিক সম্বন্ধ আছে।

পাড়াগাঁ

[শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জগতের নিয়মই এই যে যাদের জিনিষ তাদের যেরূপ দম বা টান হবে অন্যের তা অসম্ভব। আবার মালিকদের মধ্যেও যাঁহারা সদা সর্ব্বদা সাংচর্য্যে থাকেন তাঁদের টান্ কদাচিত যাঁরা নিজের জিনিষ অনুসন্ধান করেন, তাঁদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং পল্লীবাসীদের অন্যের উপর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজের গ্রাম নিজে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। গ'ড়ে তোলা মোটেই সোজা কথা নয় তা জানি পদে পদে বাধা, বিঘ্ন এসে গতিরোধ ক'রবে, ঝড় তুফান এসে নৌকা ডুবিয়ে দিতে চাইবে, বিপদ বিষাদ এসে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে দিতে প্রয়াসী হবে, হিংসা বিদ্বেষের সঙ্গে অহর্নিশ যুদ্ধ কর্ত্তে হবে, তা ও জানি তথাপি উপায় কি? ভূমিকম্পে বা বিষম বাত্যায় যখন নিজের বাড়ী ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন কি আর অন্যে এসে তুলে দেয়? নিজেকেই তুলতে হয়। পাড়াগাঁরও আজ সেই দশা ঘটেছে। ঘূর্ণীবাত্যায় তার বাড়ী ঘর মাটির সঙ্গে এক হয়ে মিশিয়ে গিয়েছে, ভূমিকম্পে উঠান ভেঙ্গে দয়ে পরিণত হ'য়েছে। এখন নিজেদেরই চেষ্টা ক'রে সেই বাড়ী পুনরায় গেঁথে তুলতে হবে। দ'বু'জিয়ে উঠান প্রস্তুত ক'রতে হবে। কাজ শক্ত বটে তাই নিজেদের ও শক্ত হ'তে হবে

এখন কথা হ'চ্ছ গাঁ গ'ড়ে তোলার প্রণালী কি? কি নিয়ম পালন ক'রলে এর পুণরুদ্ধার হয়? আমার মনে হয় এর এক-মাত্র প্রণালী—সকলে সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করা; গ্রামে গ্রামে এক একটী ক'রে সমিতি স্থাপন করা। এই সমিতির কার্য্য হবে গ্রামের উন্নতি কল্পে প্রাণ বিসর্জ্জন। এই সমিতির সভ্য হবেন সকলেই। এতে কোন জাতিভেদ নেই, উচ্চ নীচ নেই, ধনী গরীব নেই। সকলেরই সমান অধিকার। সকলেই সেবক। সেবক মাত্রেরই কার্য্য হবে ভিক্ষা ক'রে পরিশ্রম করে যেমন ক'রেই হোক

গ্রামের উন্নতি সাধন। বিবেকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে নিজ নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। প্রথমতঃ সমিতি স্থাপন করতে গেলেই স্থানীয় প্রবীণেরা এর উপর সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করবেন। নানা রূপ ঠাট্টা বিদ্রুপের বাণ বর্ষণ ক'রবেন; এর অস্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকরত্বের বিষয় ব্যাখ্যা ক'রে ধ্বংস দেখবার জন্য ব্যগ্রভাবে শ্যেণ চক্ষু নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকবেন। যখন একটু একটু উন্নতি দেখবেন তখন ক্রোধে অধীর হ'য়ে এর বিরুদ্ধে আড়ে হাতে লেগে যাবেন। এই সময়ে এই ঝঞ্ঝাবাতের হাত থেকে খুব শক্ত মাঝির বুদ্ধি নিয়ে একে ধ'রে রাখতে হবে, আর ঠিক পথে চালাতে হবে। কিছু দিন অপেক্ষা ক'রতে পারলেই, কিছুদিন স্থিরবুদ্ধি নিয়ে হাল ধ'রে থাকতে পারলেই প্রবীণেরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ এর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিজেরাই এর পতাকা তলে ফিরে এসে দাঁড়াবেন। তখনই গ্রামের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হবে। প্রথম প্রথম স্থানীয় যুবকদেরই সমিতির সভ্য হ'তে হবে, গ্রামের জন্য সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণপণে কাজ ক'রে যেতে হবে। আর প্রবীণদের সহিত লড়ায়ের সময় বিনাবাক্য ব্যয়ে সব সহ্য ক'রে সমিতির কাজ ক'রে যেতে হবে।

এ সব কথা লেখার পূর্ব্বে আমার বলা উচিত যে এ সকলের কিছুই আমার কল্পনা প্রসূত বা খেয়াল বশে লিখিত নয়। সবই নিজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসের অংশ বিশেষ। নিজে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে বিপদ আপদের সংঘাতে নিষ্পেষিত হ'য়ে যেটুকু জানতে পেরেছি তাই সকলের সামনে সরল ভাবে বলছে চাই।

নবদ্বীপের অন্তর্গত বেলপুকুর একটী অতি প্রাচীন পল্লী। এই গ্রামের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা ক'রে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ক'রতে চাইনা। এক কথায় এটী একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদি বাসস্থান। বহু মহাপুরুষ এ স্থানে জন্মগ্রহণ ক'রে একে পবিত্র ক'রে গিয়েছেন। রাম রাম ন্যায়বাগীশ, বলরাম তর্কপঞ্চানন, তিতুরাম তর্কবাগীশ, প্রসন্ন কুমার ন্যায়রত্ন, রামচন্দ্র ঠাকুর, রামজয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু বহু স্বনামধন্য মহাত্মা এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন। গ্রামের যদিও আজ ভগ্নাবস্থা তথাপি এখনও এখানে অন্ততঃ আড়াইশ' তিনশ' ঘর ব্রাহ্মণ আছেন এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সম্প্রদায় আছেন। দেব দেবীর মন্দির অসংখ্য দেখতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শিবমন্দিরই অধিক। তবে সব গুলি ভগ্ন, কতকগুলি বা মৃত্তিকাবৃত। গ্রাম্য দেবতা মা সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির এখনও স্তূপাকারে প'ড়ে আছে বটে কিন্তু মা আর সেখানে নাই। বর্ত্তমান নদীয়াধীপের লোকপূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণ দয়া ক'রে সাধারণের উপকারের জন্য, দেশময় ধর্ম্ম ভাব জাগিয়ে দেবার জন্য, এখানে মা সিদ্ধেশ্বরীকে স্থাপন ক'রেছিলেন, এবং সেবাদির জন্য দেবত্তর ভূমি দান ক'রেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, কেন ব'লতে পারিনা বেলপুকুর হইতে নদীয়ার মহারাজ সে বিগ্রহ কৃষ্ণনগরে আনয়ন ক'রে মা আনন্দময়ীর বেদির পার্শ্বে রেখে দিয়েছেন। এখন যখনই মা আনন্দময়ীর মন্দিরে যাই তখনই মায়ের মূর্ত্তি দেখে চোখে জল আসে। এই বেলপুকুরই গৌরাঙ্গ দেবের মাতুলালয় এবং সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত মহাত্মা বৈষ্ণবগণ বৎসর

বৎসর ধূলট উপলক্ষে কীর্ত্তনাদি নিয়ে এই স্থানে পদার্পণ করেন। তখন এর দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করে মা সুরধুনী প্রবাহিতা ছিলেন, এখন তথায় একটা খালের রেখা আছে মাত্র। তাতে চৈত্র বৈশাখ মাসে জলের চিহ্ন মাত্রও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পানীয় জলাভাবে স্থানীয় লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা লেখনীর নাই। খালটী কাটাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কত আবেদন করা গিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। District Board বৎসর বৎসর রোড সেস্ ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে আদায় করিয়া যান কিন্তু জলকষ্টের বিষয় বল্লে সে কথা আর কানে তুল্‌তে চান না। আজ ২।৩ বৎসর ধ'রে তাঁদের নিকট কাঁদা কাটার পর, বহু সাধ্য সাধনার পর, বহু উপাসনার পর, তাঁরা গ্রামের নিকট হ'তে পঞ্চাশ টাকা deposit নিয়ে তবে একটা ইঁদারা দিয়েছেন। তাও এমন সুন্দর ক'রে Contractor মহাশয় গেঁথে তুলেছেন যে এরই মধ্যে তার চারি পার্শ্বে মস্ত মস্ত গর্ত্ত হ'য়েছে। আশা করা যায় ২।১ বৎসরের মধ্যেই ইঁদারাটীর পাতাল লাভ হবে। রাস্তা অনেক আছে বটে কিন্তু খাবরায় পায়ে হোঁচট্ লেগে প্রাণ যায়। দয়াল হৃদয় District Board Contractor মহাশয় বৎসর বৎসর কৃপা-পরবশ হ'য়ে রাস্তায় দুটি মাটী ছিটাতে আসেন—আর দুই একদিনের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত ক'রে মহাপ্রস্থান করেন। গ্রামের স্থানে স্থানে ভীষণ জঙ্গল ও গর্ত্ত, রাস্তার দুই পার্শ্বে ভূস্বামীরা বেড়া দিয়ে এমন ক'রে ঘিরে নিয়েছেন যে রাস্তা দিয়ে একখানি গো-যান অতি সন্তর্পণে চল্‌তে পারে! এইতো সামান্য ভাবে গ্রামের বাহ্য অবস্থার বর্ণনা করা গেল। এই দুর্দ্দশা বাঙলার সকল পাঁড়াগায়ের।

পঞ্চামৃত

বিলাতের কথা

লণ্ডন

ইংরাজ জাতটা ঘোরতর শাক্ত। এরা দুটা জিনিষ দুনিয়াতে সব চাইতে বেশী বুঝে। এক শক্তির চাপ, আর এক ধনের প্রতাপ। আর বাহুবল যেমন বল, ধনবল সেইরূপ বলই ত! বাহুবলের ভজনাই কর, আর ধনের উপাসনাই কর, দুই-ই শক্তির উপাসনা। ইংরাজ এই দুইটা শক্তিকেই অত্যন্ত ভক্তি করে। এইজন্যই ইংরাজ জাতটা ঘোর শাক্ত, একথা কহিতেছি। বিলাতে যাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজের মতিগতি দেখিয়া এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম।

শাক্তমাত্রেই শক্তের কাছে নরম ও নরমের কাছে যম হইয়া থাকে। ইংরাজচরিত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের লোক অতিশয় নরম বলিয়া ইংরাজ এখানে এমন দুর্দ্দমনীয় আধিপত্য করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ শক্ত, ইংরাজ সেখানে বড়

নরম হইয়া চলিতেও জানে। তার নিজের দেশেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এদেশে ইংরাজ তাহার সভ্যতার অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া চলে। এতদিন সে এদেশে বসবাস করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ বা রীতিনীতি এ পর্য্যন্ত সে একটুও নিতে পারিল না। নিবাঁর মতন যে কিছু নাই, এমন বলা যায় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের অসহ্য গরমের সময় ইংরাজ যে আমাদের ফিন্‌ফিনে ধুতি, জামা ও চাদর দেখিয়া লুব্ধ হয় না, তাহা নহে। এদেশে বিধাতা আবহাওয়ার যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এ সকল পোষাক পরিচ্ছদই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর, এমন কি খালি গায়ে থাকার যে আরাম তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়। ইংরাজের নিজের দেশে এই গ্রীষ্মের উৎপাত নাই। বারমাসই একরূপ ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালের ত কথাই নাই, গ্রীষ্মকালেও আমাদের দেশের শীতকালের মতন ঠাণ্ডা থাকে। সে দেশে সার্ট কোট পাণ্টলুন মোজা প্রভৃতি পোষাক না হইলে চলে না, কিন্তু এ দেশে দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে এরূপ কাপড় চোপড় বাঁধিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। এখানে শীতকালেও একখানা গরম গায়ের কাপড়েতেই চলে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলার লোকে শাল দোশালা প্রায় ব্যবহার করিত না। বৃদ্ধেরা বালাপোষ এবং অপরে দোলাই গায়ে দিয়াই শীত কাটাইতেন। ধনী লোকেরা কালে ভদ্রে বিবাহ সভাদিতে শাল জামিয়ার বাহির করিয়া পরিতেন। তারপর বৎসরের বাকি কয়মাস ধনী দরিদ্র সকলেই খোলা গায়ে থাকিতেন। আমাদের দেশের আব্‌হাওয়ার অবস্থাধীনে ইহাই সাজে। ইংরাজ যে এ কথাটা বুঝে না তাহা নহে। কিন্তু তার সভ্যতার অভিমান এত বেশী যে সে কিছুতেই নিজের পোষাক পরিচ্ছদের এক চুল পরিবর্ত্তনেও রাজী নহে। রাজী নহে এই জন্য যে সে এখানে রাজা—রাজার জাত, এ দেশের লোকের উপরে প্রভুত্ব করিতে আসিয়াছে, সুতরাং দেশের লোকে যেভাবে চলে ফেরে সেভাবে চলিলে কি জানি তাহার পদমর্য্যাদার হানি হয় এই ভয়ে সে এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিজের সমাজের ও দেশের চালচলনটা এ দেশেও প্রাণপণে বজায় রাখিতে চাহে। দেশে থাকিতে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই যে ইংরাজ কখনও তাহার নিজের বেশভূষা ছাড়িয়া অন্য জাতের বেশভূষা ধারণ করিতে পারে। কিন্তু বিলাত যাইবার পথে সুয়েজ বন্দরে পৌঁছিয়াই এ ভ্রমটা ঘুচিয়া গেল। এখানে দেখিলাম মিশরের খেদিভের ইংরাজ কর্ম্মচারীর মাথায় হ্যাট নাই, লাল ফেজ্ চড়িয়া বসিয়াছে। সত্য বলিতে কি ইংরাজের এই বেশ দেখিয়া মনটা বড় খুসী হইল। দেখিলাম যে অবস্থা বিশেষ ইংরাজকেও মাথা হেঁট করিতে হয়, সে'ও মাথা হেঁট করিতে জানে।

তবে ইংরাজ মাথা হেঁট করে শক্তির নিকটে। ইংরাজ যখন উদ্ধত হইয়া উঠে তখন যে তাহার সেই ঔদ্ধত্যকে সহিয়া যায়, ইংরাজ তাহাকে পাইয়া বসে। নরম দেখিয়া সে আরও গরম হইয়া উঠে। কিন্তু যে ইংরাজের ঔদ্ধত্য সহে না, তাহার পাল্টা জবাব দেয়, যে মারের পরিবর্ত্তে মার দিতে পারে, আর ভাল করিয়া ঘষি দিতে জানে, তাহা হইলে ইংরাজ টুপি খুলিয়া তাহার শাস্তাকে—তার জাত বা বর্ণ যাই হউক না কেন—শ্রদ্ধা সহকারে সেলাম করিয়া থাকে।

বিলাতে যাইয়া সকলের আগে ইংরাজ চরিত্রের এই দিকটা ভিন্ন দেশীয় লোকের চক্ষে ফুটিয়া উঠে।

অক্সফোর্ড হইতে লণ্ডনে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ইহার অনেক প্রমাণ পরিচয় পাইলাম। একদিনের কথা এখনও মনে আছে। সে সময়ে লণ্ডনে একটু জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সহরের জলের কলে চৌবদ্দিন সমানে জল চলিত না। কলিকাতায় আমরা তখন কোনও দিনই চব্বিশ ঘণ্টা কলে জল পাইতাম না। কিন্তু এজন্য আমরা কোনও দিন এত ব্যস্ত হইয়া উঠি নাই, অথচ আমাদের জলের খরচ কত! ইংরাজ এত জল ব্যবহার করে না। কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের শতকরা সত্তর আশীটা বাড়ীতে স্নানের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। অনেকেই চিলিমচাতে করিয়া জল লইয়া দুবেলা মুখ হাত ধুইয়া নিজেদের দেহশুদ্ধি সাধন করিত। মাঝে মাঝে পয়সা দিয়া সাধারণ স্নানাগারে বা Public Bathএ যাইয়া স্নান করিয়া আসিত। স্নানের জন্য লণ্ডনের লোকের বেশী জলের প্রয়োজন ছিলই না। আর পানের জন্যও তেমন প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ ইংরাজ বিয়ার পান করে। জলের প্রয়োজন কেবল বাসন কোসন ধুইবার জন্য। আর সে ধোয়াও গরম জলে অতি সংক্ষেপেই সারিয়া লওয়া হয়। দিন রাত কলে জল না চলিলে ইংরাজের দিন যে চলে না, কিছুতেই এমন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া লণ্ডনে যখন জলের অনটন হইল ইংরাজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। 'আমি জল ব্যবহার করি বা না করি, সে আমার মর্জ্জি। জলের টেক্স যখন দেই তখন জল পাইব না কেন?' ইংরাজ এভাবেই কথাটা ধরিল। তার প্রয়োজনের দিক দিয়া সে এ বিষয়ের বিচার করিল না, সত্ত্ব বা rightএর দিকে দিয়াই সে এই জলের অভাবটাকে দেখিল। খবরের কাগজে এই লইয়া একটা আন্দোলন উঠিল। দিন দুই তিন এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি চলিল। তার পর একদিন প্রাতঃকালে খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্ব দিন লণ্ডনের পূর্ব্ব অঞ্চলের কতকগুলি লোক দল বাঁধিয়া যে কোম্পানীর উপরে সহরের জল সরবরাহ করিবার ভার, তাদের আফিসে যাইয়া চড়াও করিয়া জানালা দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছে। 'টাকা লও জল দিবার জন্য, জল দিবে না কেন?' এই হইল এদের যুক্তি। 'যদি না দেও তবে তোমার অর্থহানি করিয়া আমরা ইহার শোধ তুলিব।' ভিতরকার কথাটা হইল এই। এই ব্যাপারে রক্তপাত হইয়াছিল কিনা মনে নাই, কিন্তু এই হাঙ্গামার জন্য লণ্ডনের রাজপুরুষেরা একচুলও বিচলিত হইলেন না। যারা এ উৎপাত করিয়াছিল বে-আইনী জনতা করিবার জন্য তাদের উপরও ধর পাকড় আরম্ভ হইল না। জল কোম্পানীর আফিসের জানালা দরজা ও আসবাব ভাঙ্গিবার অপরাধে কাহারও সপরিশ্রম কারাদণ্ড হয় নাই। যদি কারও কোনও দণ্ড হইয়া থাকে, সে এত সামান্য যে খবরের কাগজে তাহার কোনও উল্লেখ হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। মনে পড়ে কেবল এই কথা যে এই ঘটনার দুই তিন দিন পরেই খবরের কাগজে পড়িলাম যে লণ্ডনে জল সরবরাহ করিবার কোম্পানী বহু যোজন দূর হইতে সহরে জল আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং অতি সত্বরই লণ্ডনের জলের অনাটন দূর হইবে। এই ঘটনাতে মনে অনেক কথাই জাগিল—ইংরাজের

জাতীয় প্রকৃতির কথা, আর আমাদের জাতীয় প্রকৃতির কথা। এদেশে আমরা কত অভাব অনাটন নীরবে সহিয়া যাই, কত বিষয়ে আমরা টাকা দিই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কিন্তু যে জন্য টাকা দিই তাহা পাই না, তাই বলিয়া মারধোর করিতেও যাই না, আর গেলেও সহজে রেহাই পাই না। এই ঘটনাতে ইংরাজ যে কত বড় শক্তি উপাসক, এ কথাটা প্রাণের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া গেল। শক্তির প্রকাশ বা চাপ বা ভয় না দেখাইলে ইংরাজের নিকট হইতে কাজ হাঁসিল করা যে কত কঠিন, এ কথাটাও বুঝিলাম।

ইংরাজ জন্মিয়াই শক্তির উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। ইংরাজ বালকেরা নিতান্ত শান্তশিষ্ট হইবার শিক্ষা করে না। ছেলেটা দুরন্ত না হইলে সে কখনও যে মানুষ হইবা উঠিবে, ইংরাজ এ কল্পনাই করিতে পারে না। সুতরাং ইংরাজের পরিবারে বা বিদ্যালয়ে কোথাও দুরন্তপনার জন্য বালকদিগের উপরে কোনও কঠোর শাসনের ব্যবস্থা নাই। এই দুরন্তপনার ভিতর দিয়াই যে একদিকে শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তি এবং অন্যদিকে মনের শৌর্য্য ফুটিয়া উঠে, ইংরাজ একথাটা বেশ বুঝিয়াছে। এই জন্য বালক এবং যুবকদিগের শিক্ষাতে তাহাদের সহজ পশুবৃত্তিগুলিকে একেবারে চাপিয়া মারিবার কোনও চেষ্টা হয় না।

একদিন লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটা স্যানিটোরিয়াম গির্জ্জায় রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বা Sunday School এর বালকদিগের নিকট বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম। উপর তলায় গির্জ্জা ঘর, নীচের তলায় রবিবাসরীয় স্কুল ঘর। এই ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম দেওয়ালে কতকগুলি ছোট বন্দুক ঝুলান আছে। দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। খ্রীষ্টীয়ানেরা নিজেদের ইষ্টদেবতা যীশুখ্রীষ্টকে শান্তির অধীশ্বর বা 'Prince of Peace'রূপে ভজনা করেন। জগতে শান্তি স্থাপন এবং প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যীশু খৃষ্টের অবতার। এই খৃষ্টের ভজনা যেখানে হয়, খৃষ্টজন্ম দিনের বা খৃষ্টমাসের উৎসবে যাহারা খৃষ্টের নামে পৃথিবীতে শান্তি এবং মনুষ্যসমাজে সৌন্দর্য্য—Peace on Earth and Good will among men—প্রচার করে তাহাদের ভজনালয়ে এতগুলি বন্দুক সাজানো দেখিয়া অবাক হইবারই ত কথা। এই ভজনালয়ের পুরোহিত যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে এতগুলি বন্দুক সাজানো কেন? এটা তো তোমার গির্জ্জা, কোনও স্বেচ্ছাসেবক দলের আফিস বা Volunteer Head-quarters ত নহে। এর মানে কি?" তিনি কহিলেন, "তুমি কি জান না যে আমরা কিছু দিন হইতে একটা চার্চ্চ ব্রিগেড গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি? আমার এই রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের সংস্রবে এই চার্চ্চ ব্রিগেডের একটা দল আছে। এ সকল বন্দুক তাহাদেরই।" এ কথার কোনও উত্তর দিয়াছিলাম কি না মনে নাই। চার্চ্চ ব্রিগেডের কথা শুনিয়াছিলাম, তবে মুক্তিফৌজ যেমন একটা রক্তারক্তির ফৌজ নহে, কিন্তু দুনিয়ার দুঃখ দারিদ্র্য দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সুখ শান্তি নীতি এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই ইহারা ফৌজ নাম লইয়াছে, সেই রূপ চার্চ্চব্রিগেডেরও একটা আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া লইয়াছিলাম। কথাটাকে একটা রূপক মাত্র ভাবিয়াছিলাম। তার ভিতরে যে ইংরাজ জাতির ক্ষাত্রবীর্য্য বৃদ্ধি করিবার একটা চেষ্টা লুকাইয়া ছিল, ইহা কল্পনাও করি নাই। ইংরাজ অতিশয় শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজের সেনাদলের জন্য লোক পাওয়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া পড়িতেছিল। জাতিটার সমরবিদ্যার প্রতি অনুরাগ নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। ইংরাজ নীতিজ্ঞেরা এজন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং স্বজাতির ক্ষাত্রবীর্য্য হানির এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য তাঁরা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। এই সূত্রেই চার্চ্চব্রিগেডের সৃষ্টি হয়। তখনও বয়স্কাউটের সৃষ্টি হয় নাই। এই চার্চ্চব্রিগেডই ইংরাজের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাং

সৈনিকদলের বা Territorial Forceএর গোড়া পত্তন করিয়াছিল। লণ্ডনের এই গির্জ্জায় রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে যাইয়া ইংরাজের শক্তি উপাসনার আর একটা নূতন প্রমাণ পাইলাম।

কিছুদিন পরে ইহার আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইলাম লাট কিচেনারের সম্বর্দ্ধনায়। কিচেনার তখন ওমদারমানের যুদ্ধ জয় এবং মাধির শক্তির উচ্ছেদসাধন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। এতদিন পরে কর্ণেল গর্ডনের হত্যায় শোধ তোলা হইল। ইংরাজ সমাজ ছোট বড় নির্ব্বিশেষে তখন কিচেনারের বিজয়মদে মত্ত হইয়া তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কিচেনারকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত উপাধি বা Honorary Degree দিবার আয়োজন করিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও ক্ষেপিয়া উঠিল। যেদিন কিচেনার কেম্ব্রিজে গেলেন সেদিন সহরটা আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। এ সকল উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের লোকেরা কেবল নিজেদের ঘর বাড়ী আলো দিয়া সাজায় না কিন্তু খোলা ময়দানে বিশাল অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া স্তূপাকার কাঠ জ্বালাইয়া দিকমণ্ডল আলোকিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। এ সকল অগ্নিকুণ্ডকে ইংরাজীতে Bonfire কহে কেম্ব্রিজ সহরের মাঝখানে একটা খোলা ময়দানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া এই বীর পূজার আয়োজন করিয়াছিল! ইহারা কিচেনারের সম্বর্দ্ধনার জন্য এতটাই মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল যে পয়সা খরচ করিয়া কাঠ-কুটো সংগ্রহ করিবার দেরী সহ্য হইল না এই খোলা ময়দানের চারিদিকে অনেক গুলি দোকানপাটছিল। দোকানপাট বীর পূজা উপলক্ষে বন্ধ ছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এ সকল দোকানের দরজা এবং জানালার বাহিরের কাঠের ঝিলমিলি প্রভৃতি টানিয়া ভাঙ্গিয়া আনিয়া এই অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া Bonfire জ্বালাইয়া দেশ-মাতৃকার বীরপুত্রের নামে এই মহাযজ্ঞ করিল। কথাটা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদের কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুবকেরা এই রূপ পরদ্রব্য হরণ করিয়া মাতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাদের ভাগ্যে কত কঠোর কারাদণ্ড বিহিত হইত, ইহা জানিতাম, পরে সে কথা মনে করিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। এদেশে এ সকল অনুষ্ঠানে ইংরাজরাজের বক্ষে বিদ্রোহের বিভীষিকা জাগিয়া উঠে। সুতরাং এখানে আমাদের প্রভুরা আমাদিগকে শান্ত সুশীল ও সদাচার করিবার জন্য এ সকল প্রতিবৃত্তিকে অঙ্কুরেই পিষিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কেম্ব্রিজের কর্তৃপক্ষেরা সেরূপ কিছুই করিলেন না। ব্যাপারটা আইন আদালতের কাছেই গেল না। কেম্ব্রিজের ছাত্রদের যে সভা আছে ইহাকে Cambridge Union কহে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় সেই সভার সভাপতিকে ডাকাইয়া দোকানদারদের জানালা দরজা ভাঙ্গাটা যে বড় অন্যায় হইয়াছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য ছাত্রদিগের নিকট হইতে যথোপযুক্ত চাঁদা তুলিয়া দোকানদার-দিগকে দিতে বলিলেন। এই ঘটনাতেও ইংরাজের শক্তি উপাসনার আর একটা বিশিষ্ট প্রমাণ পাইলাম।

প্রবর্ত্তক—পৌষ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আমার দেশ!

নবাবীর বহর

আবকারী বিভাগ

ভাঁটীখানা

(Distilleries)

৩১৫০০০৲

(তিন লাখ পনের হাজার)

মাতাল সামলাবার কোতোয়ালের খরচা

(Allowances & Contingencies)

৫৭১০০০৲

(পাঁচ লাখ একাত্তর হাজার)

শৈল-বিহার

৬০০০০৲

(ষাট হাজার)

লস্কর

৭০০০০০৲

(সাত লাখ)

বাজে খরচ

১৬৫০০০০০৲

(এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ)

লাট সাহেবের দেহরক্ষী

১২০০০০৲

(এক লাখ বিশ হাজার)

পুলিশ

লালটুপী আর কাল কোর্ত্তা

(Clothing)

২৭৩০০০৲

(দুই লাখ তেয়াত্তর হাজার)

থানা বাড়ীর খরচা

৪৫০০০০৲

(সাড়ে চার লাখ)

তিন শ' দশ জন

শ্বেতাঙ্গ ছেলের ইস্কুল খরচ

২০০০০০৲

(দুই লাখ)

কৃষি-বিভাগের

মোড়লীর ব্যয়

(Superintendence)

৫৯০০০০৲

পাঁচলাখ নব্বুই হাজার

"বিজলি" ১৯শে মাঘ।

অভিনেতার বেতন

রিচার্ড বরবেজ এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কেবল তাই নয়—তিনি সে কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলেও গণ্য হয়েছিলেন। তিনি বছরে নিয়মিত দু'হাজার টাকা করে বেতন পেতেন, তাছাড়া থিয়েটারের অংশীদার রূপেও যথেষ্ট টাকা পেতেন। সে কালের দু'হাজার টাকার অর্থ এ কালের পোনেরো হাজার ছ'শ' টাকার সমান।

১৬৩৫ সনে একজন সুদক্ষ অভিনেতা বছরে বেতন পেতেন দু'হাজার সাত'শ' টাকা তার অর্থ এ কালের সাড়ে একুশ হাজার টাকারও বেশী।

অভিনেতাদের মধ্যে সবচাইতে কম বেতন পেয়েছেন বলে যে খবর জানা গিয়াছে তা প্রতি দিন প্রায় তিন টাকা, অর্থাৎ এ কালের প্রায় পোনেরো টাকার সমান।

মহাকবি শেক্সপিয়র অভিনেতারূপে ১৫০০ সনের আগে বছরে বারো হাজার টাকা মাইনে পেতেন। বড় বড় অভিজাতের বাড়ীতে অথবা রাজদরবারে অভিনয়ে তিনি যে বেতন পেতেন তা ১৫৮০ সনের হিসাব গ্রাহ্য হলে বলা যায় তিনি আঠারো শ টাকা মাত্র পেতেন।

সুবিখ্যাত অভিনেতা নেল গিন প্রতি অভিনয়ে ষাট টাকা করে বেতন পেতেন।

বিলাতে ষোড়শ শতাব্দিতে সে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা যে অর্থ বেতনরূপে পেতেন, সে তুলনায় আমাদের দেশের গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি যে কত নগণ্য বেতন পেয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁর প্রতিভার উপোযোগী বেতন তো পেতেনই না, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের মত বেতনও পেতেন কিনা সন্দেহ। আজকের দিনে অবশ্য গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ মোটা বেতনে অভিনয় করছেন, কিন্তু তাঁর পিতা, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র তার অর্দ্ধেক বেতনও পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

বিয়ের বাজার

রুশিয়া দেশে অনেকগুলি বিয়ের বাজার আছে তন্মধ্যে মস্কো নগরের নিকটবর্ত্তী ক্লুই নামক স্থানের বাজারটাই প্রসিদ্ধ। এই বাজার বৎসরে একবার মাত্র বসে। যে সকল যুবতী সেই বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সেই স্থানের প্রধান প্রধান রাস্তায় লম্বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একত্রিত করা হয়। সেই যুবতীগণের দর্শনার্থী যুবকগণের চক্ষে নিজেদের মনোরম করিবার অভিপ্রায়ে, যুবতীরা যাহার যাহা কিছু বেশ ভূষা আছে, সমস্তই পরিধান করিয়া থাকেন; অলঙ্কারাদিও বাদ যায় না অনেক যুবতী তাহাদের কাপড় চোপড় সুচিত্রিত পেটরার ভিতর লইয়া আসে এবং কখন কখন তাহাদিগকে সেই পেটরার উপর বসিয়া থাকিতেও দেখা যায়। বিবাহেচ্ছু যুবতীগণ এইরূপে তাহাদের ভাবী প্রণয়ীগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া কয়েক ঘণ্টা থাকার পর,

গির্জ্জাভিমুখে শোভাযাত্রা করে এবং তথায় গিয়া কোন প্রণয়দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। গির্জ্জায় যাইবার সময় পথে কোন কোন যুবক যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে। এইরূপে যদি সেই যুবক যুবতীর পরস্পরের মধ্যেও প্রেম সঞ্চার হয়, তাহা হইলে যুবক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যুবতীর পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়।

কর্পূর-উৎসব

বর্ণিও দ্বীপের সব চাইতে প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্প হচ্ছে কর্পূর সংগ্রহ। এর সঙ্গে বহু কষ্টসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান জড়িত আছে।

কর্পূর গাছের কাঠ ও পাতা থেকে কর্পূর পাওয়া যায় এবং বর্ণিও দ্বীপে অনেক দামী বিভিন্ন রকমের কর্পূর পাওয়া যায়। কর্পূরের ব্যবসায়টা দ্বীপের অধিবাসীদেরই একচেটিয়া, কেননা ইউরোপিয়ানগণ রবারের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত।

দ্বীপবাসীরা কর্পূর সংগ্রহে বার হবার আগে গ্রামগুলি একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। যে সকল লোক কর্পূর সংগ্রহ করে, তারা কোন রূপ তেলই ব্যবহার করতে পারে না এবং যখন বাড়ীর বার হয় তখন কোনরূপ বিলাস দ্রব্য, যেমন আরসী সঙ্গে নিতে পারে না।

যতদিন তারা বাড়ির বাইরে কর্পূর সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে ততদিন তারা মাত্র কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট খাদ্য খেতে পায়। এবং প্রতিলোক সৌভাগ্যের সূচনা সূচক খানিকটা মাটি খায়। এই সময় তারা কতকগুলি বাঁধিগৎ আওড়ায়, এগুলিকে পবিত্র কর্পূর ভাষা বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

কলমের ইতিহাস

সেই আদি যুগে যে লোক সব প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম সরু চুল আচড়াইবার বুরুশ ব্যবহার করেন। আজকাল চীনা ধোপারা উষ্ট্রের লোমের তুলি দিয়ে কাপড়ে চিহ্ন দিয়ে থাকে। এর পরই জনৈক সাদা ব্যবসায়ী লোহার কলমের ব্যবহার আরম্ভ করে।

কলমের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ত্রিরকমের কলমের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রথম খাগড়া, দ্বিতীয় পালক। আজকাল অবশ্য লোহার কলমের প্রচলন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মণ লোহা প্রতিবছর তাতে ব্যয়িত হচ্ছে। তবে এখনো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা খাগড়া ও পালকের কলমে লিখে থাকেন।

চীনের কনফিউসিয়াসগণ কলমরূপে তুলি ব্যবহার করিত। হাজার হাজার বছর ধরে তারা তুলিকেই কলমরূপে ব্যবহার করে আসছে। খাগড়ার কলম পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে চলিত আছে। তুলির চাইতে খাগড়ার কলম অনেকটা উন্নত অবস্থার।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম যুগেই পালকের উপযোগিতা আবিষ্কৃত হয়, পালকের প্রচলন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পাশ্চাত্য হতে পালকের ব্যবহার আমেরিকায় যায়। লোহার কলমের প্রচলন হবার আগে ইংলণ্ডে বছরে আড়াই কোটি পালক আমদানী হত।

পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্-এ রমণীরা কলা, লেবু, খুমআলু, ইক্ষু ইত্যাদির গুরুতর বোঝা নিয়ে

হেসে খেলে ঘণ্টায় চার মাইল উঁচু নীচু বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে সর্ব্বদা চলাফেরা করে থাকে।

এরা দেখতে ভারী সুশ্রী, ঠিক যেন এক একটি রাণীর মত। তারা চল্লিশমাইল পথ হাঁটাটাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না, এটাকে তারা স্বাভাবিক বলেই মনে করে থাকে। এরা পথ চল্‌তে চল্‌তে হাসি খুসিতে ও গল্প গুজবে সময় কাটিয়ে দেয়।

দক্ষিণ আমেরিকার কাফি ও তুলার চাষ-কারিগণ বলে যে, পুরুষের চাইতে মেয়ে ও ছেলেপিলেরা বেশী খাটতে পারে অথচ তারাই পুরুষদের চাইতে মজুরী ঢের কম পায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াতের জন্য যে ষ্টীমার চলে তাতে মেয়েরা ফল, শাক-সবজী, জামা কাপড় ইত্যাদির ব্যবসা করে থাকে। গ্রেণেদাতে তারা কামার, রাখাল, ছুতর ও বাহকের কার্য্য চালিয়ে থাকে।

কোন কোন দেশের পুরুষ তার ছেলে-পিলের প্রতিও যত্ন নেয় না। স্ত্রীরাই তাদের যা কিছু যত্ন আত্তি করে থাকে। কেন না তারা এটা ভাল রূপেই জানে যে, যদি তারাও ছেলেমেয়েদের যত্ন না করে, তা হলে হতভাগা ছেলেমেয়েরা একেবারে না খেতে পেয়েই মরে যাবে, কেননা ফিকিরশূন্য কুড়ে পুরুষগুলি একেবারে নিশ্চেষ্ট বসে বসে পায়ের উপর পা রেখে স্ত্রীদের উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা রক্ষা করে থাকে।

রকমারি খবর

ভারতে ১৪৭ রকমের দেশীয় ভাষা আছে। তন্মধ্যে ২৩ প্রকার ভাষাই প্রধান।

মনুষ্য শিশু আকার হিসাবে চারি বৎসর বয়সে মস্তিষ্কের পূর্ণতা লাভ করে। সবজী ও ফলমূল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর খাদ্য শিশুদের পক্ষে আর কিছুই নাই; ইহাতে পেট পরিষ্কার থাকে।

সে দিন লর্ড সভায় লর্ড ক্লিফোর্ড এক খানি দরখাস্ত পেস করিয়াছেন তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল এবং উহাতে ৭৫, ১০৫ জনের নাম স্বাক্ষর আছে।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের কোন অনাথ আশ্রমে এক অপূর্ব্ব মোমবাতি প্রস্তুত হইতেছে—ইহা দৈর্ঘ্যে বার হাত এবং ওজনে ১২॥ মণ হইবে; ইহা প্রস্তুত করিতে দুই মাস দশ দিন লাগিবে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উচ্চ চিমনি আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের Montanna নগরে Boston & Montanna Copper and Silver Mining কোম্প-নীর ঢালাই ঘরে আছে। ইহা ৫০৬ ফিট উচ্চ। এই চিমনীর ঊর্দ্ধ সীমায় উঠিবার জন্য বহির্ভাগে একটি মই আছে। এই সুবৃহৎ চিম্‌নীটী প্রস্তুত করিতে ১৩০০০ টন প্রস্তর, ৩০৭৫ পিপা সিমেণ্ট ৫২২৫ পিপা চুণ, ৪১৮০ কিউবিক গজ বালুকা লাগিয়াছে।

কচ্ছপের পিটের খোলা হইতে উৎকৃষ্ট চিরুণী তৈয়ারী হয়; লোকের ধারণা যে কচ্ছপের খোলা সংগ্রহ করিতে হইলে কচ্ছপকে মারিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। এই খোলা সংগ্রহ করিতে হইলে মৎস্যজীবী কচ্ছপ ধরিয়া তাহার পিঠ শুষ্ক ঘাস এবং পাতা দ্বারা আবৃত করে, পরে তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই শুষ্ক পাতা এবং ঘাস অল্পে অল্পে পুড়িয়া

গেলে তাহার উত্তাপে সেই খোলার ভেরটী স্তর জোড়ের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে আল্গা হইয়া যায়, তৎপরে ছুরি দ্বারা সেই স্তর গুলি চাঁচিয়া ফেলা হয় এবং কচ্ছপকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; খোলার গোড়া যেমন তেমনি থাকে এবং পরে তাহার আবার বৃদ্ধি হয়।

ভাষাহীন জাতি

সুইটজ্যারল্যাণ্ডের নিজস্ব কোন মাতৃ-ভাষা নেই। পৃথিবীর আর কোন দেশের এমন দুর্ভাগ্য আছে বলে শোনা যায় নি। কেন না প্রকাশ, পৃথিবীতে একমাত্র সুইচ দেরই অপরাপর দেশের ভাষা নিয়ে কার-বার করতে হয়। যদিচ তাদের কোন মাতৃভাষা নেই, তথাপি তাদের অপরিসীম স্বদেশপ্রীতি ও অকপট স্বদেশ হিতৈষণার কথা শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

সুইটজ্যারল্যাণ্ডের সরকারী আফিস আদালতে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই তিনটি বিদেশী ভাষাকেই অধিকাংশ সুইচগণের মাতৃভাষা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

সুইটজ্যারল্যাণ্ডের অধিবাসিদের চার ভাগের তিনভাগ, অর্থাৎ বারো আনা জার্ম্মেণ ভাষায় কথা বলে থাকে। বাকী চার আনা অধিবাসী অপর চারটি ভাষাকে তাদের মাতৃভাষা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। এই চারটি ভাষার মধ্যে ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষাই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জাতি বলতে যা বুঝায়, সুইটজ্যার-ল্যাণ্ডের স্বদেশী ভাষা ছাড়া আর সকল সম্পদই প্রকৃতি তাকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করেছে কিন্তু তার একটি নিজস্ব ভাষা যে কেন নেই তার কারণ বলা শক্ত।

পাতলা কাগজের রহস্য

বিলাতে 'অক্সফোর্ডইণ্ডিয়া পেপার' নামের এক প্রকার পাতলা কাগজে আজকাল বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মপুঁথি ছাপবার মরসুম প'ড়ে গিয়েছে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে বিলাতের কেউ এই কাগজের এতটুকু সন্ধানও জানত না. এই কাগজের পিছনে বেশ একটি মজার ইতিহাস আছে, নীচে দিচ্ছি—

১৮৪১ খৃঃ অঃ একজন অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট দূর প্রাচ্য (চীন) থেকে এক প্রকার পাতলা কাগজ নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান, ও রকম কাগজ তার পূর্ব্বে বিলেতে কখনো দেখা যায় নাই। এই কাগজ যদিও অত্যন্ত পাতলা, কিন্তু তথাপি এরূপ অস্বচ্ছ ও কঠিন কাগজ ইউরোপের আর কোথাও পাওয়া যেত না।

ছাত্রটি ঐ কাগজ নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দান করেন। এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাকর মৃত মিঃ কোম্বে ১৮৪২ খৃঃ অঃ এই কাগজে ক্ষুদ্রতম আকারে পঁচিশখানা বাইবেল মুদ্রিত করেন।

এই পঁচিশখানা বাইবেল আর বাজারে বিক্রীর জন্য বা'র ক'রবার আবশ্যক হ'ল না, একখানা মহারাণীকে উপহার দেওয়া হয় এবং বাকী কয়খানা বিভিন্ন লোককে বিতরণ করা হয়, যদিও তার এক একখানা বাইবেল তিনশ' টাকায়ও লোকেরা কিনিতে চেয়েছিল!

এই প্রকার কাগজ কি ক'রে কোথায় নির্ম্মান করা হয় তা জানবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হ'ল না। মিঃ গ্লাডষ্টোন জাপানের কথা বল্লেন, কিন্তু মিকাডোর রাজ্যে এক প্রকার অদ্ভুত পাতলা কাগজের সন্ধান পাওয়

গেল বটে ; কিন্তু তা দিয়ে মাত্র এক পিঠ ছাপা হ'তে পারে।

কিছুদিনের জন্য ব্যাপারটা চাপা প'ড়ে গেল এবং অনেকেই এই প্রচেষ্টার কথা একেবারে ভুলে গেল। তার ১৮৭৪ খৃঃ অঃ প্রথম দিকে ১৮৪২ খৃঃ অঃ ছাপা বাইবেলের একখানা বই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের লণ্ডনস্থ কারবারের ভাবপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ ফ্রাউডকে দেখানো হয়।

এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উলভার কোটস্থ কাগজ নির্ম্মানের কারখানায় এইরূপ কাগজ নির্ম্মান করবার উপায় পরীক্ষা চল্‌তে লাগল এবং কিছু দিন চেষ্টার পর এক আশ্চর্য্য উপায়ে এই কাগজ নির্ম্মানের কৌশল আবিষ্কৃত হ'ল, কিন্তু পাছে সেই কৌশল জেনে নিয়ে অন্য কেউ দু পয়সা উপায় ক'রে বসে এই ভয়ে এই কাগজ নির্ম্মানের কৌশলটি অদ্যাপি গোপন রাখা হ'য়েছে।

১৮৭৫ খৃঃ অঃ ২৫শে আগষ্ট তারিখে "ডায়মণ্ড বাইবেল" নামে বাইবেলের এক নূতন সংস্করণ বা'র হয়। এই সংস্করণের বইও সেই ১৮৪২ খৃঃ অঃ মুদ্রিত বাইবেলের অনুরূপ। এর আগে কথনো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইবেলের কোন সংস্করণ বার হয়নি। বই বাজারে বের হ'তে না হতেই একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল এবং অত্যল্প সময় মধ্যে আড়াই লক্ষেরও উপর বই নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

এই কাগজ নির্ম্মাণের সেই গুপ্ত সন্ধান যে সকল লোক জান্‌ত, তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন লোক বেঁচে আছে। কোন কর্ম্মচারীকেই নির্ম্মাণ কৌশলের একটি ধাপের বেশী শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় না। আজকের দিনে এ কাগজে অপর বইও লক্ষ লক্ষ ছাপা হচ্ছে।

সংবাদ।

গুপ্তধন আবিষ্কার

মিশরের প্রাচীন সমৃদ্ধি কিরূপ ছিল তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব কাহিনী যে অমূলক নহে, লর্ড কার্ণারভনের আবিষ্কারের ফলে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। লর্ড কার্ণারভন ইংলণ্ডের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সম্রান্ত অধিবাসী। তিনি মিশর গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সেখানে ইতিহাস বিখ্যাত এক রাজার কবর খুঁড়িয়াছিলেন। এই রাজার নাম তুতান খামেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১৩৫৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে তিন হাজার দুইশত পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই রাজা পরলোক গমন করেন। রাজা তুতান খামেনের কবর হইতে বহু বহুমূল্য ধনরত্ন বাহির হইয়াছে। মিশরের পারোয়া বংশীয় রাজারা কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, এই অমূল্য দুর্লভ রত্নরাজিই তাহার প্রমাণ। মিশরের পূর্ত্ত-বিভাগের মন্ত্রী সে দিন বলিয়াছেন,—লর্ড কর্ণারভনের সঙ্গে সর্ত্ত হইয়াছিল যে, কবর হইতে যে সব সম্পত্তি পাওয়া যাইবে, তাহাতে তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না, লর্ড কার্ণারভোন এই সর্ত্তে রাজী হইয়াই কাজ আরম্ভ করেন। মিশরের রাজধানী কাইরো সহরের যাদুঘরে এই সব ধনরত্ন রক্ষিত হইবে।

সঞ্জিবনী

লেনিন

ডি, ভ্যালেরা

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ ফাল্গুন ১৩২৯ ৮ম সংখ্যা

প্রবাসীর শিক্ষা ও সাহিত্য

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়]

প্রবাসী বাঙালীর ভাব ও আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিবার সুযোগ এতদিন মিলে নাই। এতদিন পরে সুযোগ মিলিল। বিদেশে মানুষ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে, অল্প সংখ্যক বিদেশীর ভাব বিনিময় কল্পে যে অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে তাহাতে জাতীয় গরিমা এমন কি আত্মম্ভরিতার ভাবই প্রকাশ পায়, কারণ যে উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা আর্ট বা সাহিত্যের প্রাণ বিদেশের প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় তাহা পাওয়া কঠিন। বিশেষতঃ প্রথম প্রবাসী যাঁহারা তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কর্ম্মঠ ও কঠোর প্রকৃতির লোক। আমেরিকার পিউরিটানেরা সাহিত্যের ধার ধারিতেন না। আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা তেমনি এখানে নানা আয়োজন কাঁদিয়া বসিয়াছেন, সামাজিকতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া তাঁহারা বিশেষ কিছু করেন নাই। যদিও তাঁহারা পিউরিটান বোধহয় ছিলেন না, এমন কি প্রয়াগের মুখপত্র "প্রবাসীর" জন্ম বাঙালীর "পরবাস ভূমে" আত্মরক্ষার জন্যই হইয়াছিল। কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক আহারের চেষ্টায় ঘরের পাট উঠাইয়া বিদেশে বাস করিতেছে এ ভাবের দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এখন আমরা এমন একটা ভাবের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি যাহাতে একটা উন্নতিশীল জাতির ক্রমিক বিস্তার ও গৌরবের দিকই পরিস্ফুট। যদি জার্ম্মান জাতি জগতে তাহার স্থান খুঁজিতে গিয়া এমন একটা কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিল, তবে বলে গুণে বিস্তায় কম কিন্তু সংখ্যায় সমান হইয়া আমরা না হয় বিদেশে আসিয়া একটু গোলযোগ করিলাম।

কিন্তু গোলযোগ বাধাইয়া গোল থামানোও কর্ত্তব্য। দুই দিক হইতে গোল হয়। জন্ম-নিকেতনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বায়ু কাটাইয়া বিদেশে কোন জাতির চরিত্র দৃঢ়তা লাভ করে ইহা সত্য হইলেও, আপনার স্বধর্ম্ম ও বিধিব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের বাহিরে জাতিচ্যুতির আশঙ্কা বড় কম নহে। তাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য প্রবাসে নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সামাজিকতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাব, লাইব্রেরী, মজলিস বা অভিনয়, স্বদেশবাসী দরিদ্রের জন্য পরোপকারের আরও বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতি আবশ্যক। আনন্দ ও দুঃখ, স্বার্থ ও অনাবিল প্রেমের মধ্যে আমাদের প্রবাস জীবন এখন যে সর্ব্বতোমুখী হইয়া বিকাশ পাইতেছে, ইহাই আমাদের আশার কথা।

কিন্তু যাহা মনে হয় প্রবাসী বাঙালীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরু দায়িত্ব তাহার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ যত্নবান হই নাই। আমরা নিজেরা এখানে আসিয়াছি অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে, বাংলাদেশের সহিত আমাদের ভাববিনিময়ও হয়। আমাদের জীবনে আমরা যে বাঙালীর রূপ বিকাশ করিব তাহার প্রতিমা আমরা দেখিয়া ও বুঝিয়া আসিয়াছি। আমাদের মনে মনে সে প্রতিমা অঙ্কিত আছে এবং তাহাকে আমরা আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্ম্ম প্রভৃতি দিয়া পরখও করিয়া লইতে পারি। কিন্তু এদেশে যে সব বাঙালী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা বাঙলার আবহাওয়ায় যাহাদের জীবন বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, তাহাদের পক্ষে বাংলার মনোময় রূপটি কল্পনা করা একবারে অসম্ভব। কারণ শুধু গৃহের শিক্ষায় সে সুযোগদান খুব কঠিন। সে সুযোগ থাকিলেও কোন জাতি অমন বিক্ষিপ্ত ভাবে অপ্রত্যাশিত ঘটনের উপর শিক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। তাই প্রবাসে শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লওয়া এত প্রয়োজন। এ শুধু মাতৃভাষার স্বাধিকার স্থাপনের কথা নহে। বাংলাভাষার শব্দে যে ইঙ্গিতটী আছে তাহাকে ধরা চাই, তাহা না হইলে আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের চিন্তাধারা হইতে একবারে বিচ্যুত হইবে। তাই উত্তর ভারতের প্রত্যেক স্থানে যাহাতে আমাদের ছাত্রেরা সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার সেই প্রথম সূচনা হইতে আমাদের জাতীয় সাধনার ক্রমবিকাশলব্ধ ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহাতে বাঙালী তাহার আপনার ভাষার অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য এই সম্মিলন হইতে আয়োজন ও আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে, এবং ইহারই মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একটি পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। কানপুরের বঙ্গ-সাহিত্য সমাজ যখন উত্তর ভারতীয় সাহিত্য সম্মিলনের সূচনা করিয়াছিলেন তখন গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার স্থান নির্দ্দেশ, সম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নিজের ভাষার উপর নিজের স্বাভাবিক অধিকারের শুধু কথা নহে। নিজের সভ্যতাটুকুও পাওয়া চাই, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে নিজেদের জীবনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে আপনার করিয়া লওয়া চাই, বাংলার মনোময় রূপটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে রূপে রূপে বিস্তার চাই।

এদেশে আমার বাংলার ভাব-মূর্ত্তিটা

প্রতিষ্ঠা করিব কি করিয়া? তাহা শুধু বুদ্ধির দ্বারা পাইবার নহে। শিক্ষার যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এদেশে কল্পনাকে আরও বেশী আশ্রয় করিতে হইবে, তবেই বাংলার আব্‌হাওয়া স্কুল কলেজের ঘরের ভিতর বহিলে বাঙালীর ছেলে তৈয়ারী হইতে পারে। সুশীল সুবোধ বাঙালীর বুদ্ধির বিকাশের জন্য বোধোদয় পড়াইলে সে সুশীল বা সুবোধ হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী হইবে না। বোধোদয় নহে, স্বাভাবিক বৃত্তির উন্মেষ শিক্ষাকার্য্যের প্রধান সহায়,—ইহাই এখন প্রত্যেক শিক্ষাতত্ত্ববিৎ প্রচার করিতেছেন। কল্পনার সৃজনী শক্তির উদ্রেক করা শিক্ষার প্রধান আশ্রয়—ইহা এখন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালীর গোড়ার কথা। সেই জন্য শিশু ও বালক বাঙালীর মানসিক উন্নতি সাধন করিতে বাংলার রূপকথা, আখ্যায়িকা, গল্প, কথাসাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। বিশেষতঃ বিদেশে যেখানে আচার ব্যবহার বিভিন্ন সেখানে কল্পনার দ্বারা বাংলার প্রাণকে স্পর্শ করিতে হইবে, স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে দেশের মহাপুরুষদের ছবি টাঙ্গাইয়া, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নদ নদী উপত্যকা মন্দির সরোবর প্রভৃতির ফটোগ্রাফ ছবি সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, pageant দ্বারা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া,—বাংলার রাজ্য ছাত্রদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই রকম অভিনয় গ্রামে গ্রামে করিয়া আয়র্লণ্ড এবং ওয়েলস্‌এ (Ireland ও Wales) জাতীয় আন্দোলন আধুনিক ইংরাজ প্রাধান্য সত্ত্বেও গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার কথকের মত কথা ও গানের দ্বারা ডেনমার্ক (Denmark) এর কৃষক সমাজের মধ্যে যে জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতেও এই শিক্ষা প্রণালীরই কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার ভিতর দিয়া এই রূপ একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা না হইলে, আমরা প্রবাসে একটা বিরাট মিশ্রিত বস্তুতন্ত্রহীন সমাজ-জীবনের মধ্যে নিজেদেরকে হারাইব, জাতি হারাইলে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায় থাকিবে না।

আর এক দিক হইতে গোল হইবার সম্ভাবনা। এ দেশের বিভিন্ন আচার ব্যবহারের মধ্যে প্রত্যেক বাঙালী এক একজন একটা সামাজিক সমস্যা। এই জিনিষটা সঙ্কীর্ণতার জন্য ভবিষ্যতে একটা আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যাতেও পরিণত হইতে পারে। একটু উদার ভাবে দেখিতে গেলে জিনিষটা তাহা দাঁড়ায় না। কারণ জাতি, সভ্যতা ও সামাজিক আদর্শ হিসাবে প্রবাসী বাঙালী এ দেশবাসীর সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে; দ্বিতীয়তঃ, ২৬০০০ বাঙালী যুক্ত প্রদেশে আছে, কিন্তু বাংলাদেশ এ দেশের প্রায় ৪০০,০০০, চার লক্ষ লোককে অন্ন দিতেছে। সুতরাং আর্থিক সমস্যা বলিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ করা এ দেশের শোভা পায় না।

কিন্তু এই নূতন আবেষ্টনের মধ্যে বাঙালীকে নূতন করিয়া সাড়া দিতে হইবে। শুধু চাকুরীর জীবনের ভিতর দিয়া নহে, স্বাধীন অন্নসংস্থানের দ্বারা, ব্যবসায়ের উন্নতির দ্বারা, সমাজ সেবার দ্বারা, এখানকার সর্ব্ববিধ আন্দোলনের উন্নতিকল্পে আপনার ত্যাগস্বীকারের দ্বারা, এ দেশের সামাজিকতায় পুষ্টি বিধানের দ্বারা, এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের দ্বারা।

জীবনের সাড়ার প্রধান চিহ্ন যে শুধু আবেষ্টনকে ছাপ দেয় তাহা নহে আবেষ্টনের ছাপে সে নিজেও গড়িয়া উঠে। নূতন আবেষ্টনে বাঙ্গালীর মন একটা বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিবে, তাহার সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্যও একটা নূতন ছাঁদ পাইবে এই নূতন ছাঁদকে খুঁজিয়া পাওয়া আমাদের এখন গুরুদায়িত্ব।

সাহিত্য জিনিষটা বইয়ের নহে, জীবনের। তাই প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্য চর্চ্চা প্রবাস জীবনের ছাপে অঙ্কিত হইবেই। জীবনটা প্রবাসে আর এক রকম আকার ধারণ করে। সেই আলাদা রূপটাকে ফুটাইয়া তুলা প্রবাসী সাহিত্যের কাজ। বাংলার সেই চির-কল তান উদার গঙ্গার তীরে, শান্তির নীড় পল্লী গ্রামে যে ধীর মন্থর গতিতে জাতীয় জীবন প্রবাহ চলিতেছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের প্রাণ। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান নব-নাগরিক সাহিত্য বাংলা দেশের পোষাকী সাহিত্য, তাহা পাশ্চাত্যের আমদানী ও টেবিল চেয়ার চায়ের পেয়ালা সজ্জিত ড্রইং রুমের জিনিষ। তাই তাহা তত নিবিড় ভাবে এখনও বাঙালী জাতির প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এবং তাই যাহা স্বাভাবিক, সহজ সরল জীবনকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে, বাংলার অকৃত্রিম সামাজিক মনের যাহা স্বাধীন প্রকাশ, তাহাই আমাদের জীবনের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। কলিকাতার বৈঠকখানার সাহিত্য নহে। প্রবাসী সাহিত্যে কৃত্রিমতার ভয় খুব বেশী। কারণ প্রবাস জীবন বড় কৃত্রিম হয়, উপরন্তু বাংলার সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যোগাযোগ নাই।

বাংলার পল্লীগ্রামের সেই সহজ সরল জীবনের রসবোধ, যাহা বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রাণ তাহা আমাদের এখানে ঘটিয়া উঠে না। কারণ এখানে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া সহর-বাসী। বাংলাদেশের সেই গরুচরা মাঠ, ছায়া-ঢাকা খেয়াঘাট, বনেঘেরা কুটিরের নিত্য নূতন রস-উৎসবের মাধুর্য্য হইতে আমরা বঞ্চিত। এখানকার এই শুষ্ক উষ্ণ তৃষ্ণাদীর্ণ প্রকৃতির মধ্যে আমাদের পিপাসিত চিত্ত কত না আগ্রহভরে সেই বিপুলা পদ্মার পালতুলা ছোট তরীর পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, নদীতীরের স্নিগ্ধ গম্ভীর বর্ষ—সন্ধ্যার কাঁসর ঘণ্টা কান পাতিয়া শুনে, বাংলার সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত শারদ গগনে চাতকের মত লুণ্ঠিত হইতে চাহে। সেখানকার সেই সুন্দর রসভরপুর মধুর জীবন প্রাতঃকালের অবকাশের মধ্যে কত অশ্রু-সজল ভৈরবীগানে পথহারা পথিক পরাণ তরুণ হৃদয়কে কাঁদাইতেছে, মধ্যাহ্নের কর্ম্মক্লান্তির আবেশে কত ভাটিয়াল, কত গম্ভীরা, কত বাউল কত প্রসাদীগানে ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্নজল দিতেছে, এবং ঝিল্লীমুখরিত রাত্রের স্নিগ্ধতার মধ্যে কত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কত কাহিনী শুনাইয়া কত সুখ দুঃখের আশা নিরাশার নিবিড় ঘুমের মধ্যেও সজাগ রাখিতেছে। যুগযুগান্ত কালের ইতিহাসলব্ধ সে রসবোধের সাড়া আমরা বিদেশে পাইল না। নাই বা পাইলাম। আমাদের ত বাঙালীর চোখ আছে, বাঙালীর চোখ দিয়া আমরা প্রকৃতির অপরূপ খেলা, মানব-জীবনের অবিরাম লীলা দেখিব; আমাদের ত বাঙালীর প্রাণ আছে, নিখিল বিশ্বকে এখানে আমরা বাঙালীর প্রাণের রূপে গড়িয়া তুলিব।

বাঙালীর চিন্তার যে মূল সূত্র সে বহুৰ

মধ্যে এক, এবং একের মধ্যে বহুকে জ্ঞানের দ্বারা নহে, হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা অনুসন্ধান করে, তাহা এখানেও আমাদের নিকট বিচিত্র রসবস্তু আনিয়া দিবে। কবীরের মায়াবাদের মূল প্রস্রবণ এক, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাবের প্রস্রবণ আর এক। এখানে ভক্তি জ্ঞানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। মানব-জীবনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা ভয় ও ভালবাসা এখানে সেই এক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, তাঁহাকে ভজন কর, ধ্যান কর; তিনি সমস্ত অজ্ঞানের অন্ধকার-জাল ছিঁড়িয়া দিবেন। এই হইল যুক্তপ্রদেশের আত্মার বাণী। ইহার সঙ্গে বাংলার বিহ্বলতা, বাংলার আত্মনিবেদন, মধুর ভাবের আকাশ পাতাল প্রভেদ। কর্ম্ম-ফলের উপর এমন বিশ্বাস ও অবশেষে তাহার নিকট আত্ম-সমর্পন বাঙালী এমন ভাবে করে নাই। কবীর গাহিয়াছেন কর্ম্মের জাল সেই আদিম তন্তুবায় পৃথিবী ও আকাশকে অব-লম্বন করিয়া এখনও বুনিতেছেন এবং সে বুনার শেষ নাই—কর্ম্মের সহিত কর্ম্ম টানিয়া, বুনার সহিত অবুনা, সুতার জাল রচনা করিয়া চালিতেছেন সেই সুন্দর বিশ্বতন্তুবায়। এমন কি প্রেমিক সুরদাস পর্য্যন্ত প্রাক্তনের ফলা-ফলের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস দেখাইয়াছেন—

করমগতি টারী নাহি টরে,
ভাবী কে বশ তিন লোক হৈ,
সুর নর দেহ ধরে
সুরদাস প্রভু রচী, সো হৈ হৈ,
কো করি সোচ মরে।

তুলসীদাসের রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইব—জাতিগত সাধনার বিশিষ্টতা। তুলসীদাসের দার্শনিক নাম কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে আমাদের কৃত্তিবাসে পাই হাস্তরস। যেমন অঙ্গদ-রায়বার ও লবকুশের কথা কাটা-কাটি। শান্ত সংযত আরাধনার পরিবর্ত্তে পাই ভক্তের দুর্গোৎসব। বাঙালীর ভাব-সাধনা রামায়ণের ঘটনা পরম্পরায় কত না মধুর রস, কত না স্নেহ ভক্তির লীলাখেলা, কত না বিরহ মিলনের অবিরাম পর্য্যায় খুঁজিয়া পাইয়াছে।

বাংলার ও যুক্তপ্রদেশের একটা মিলন-কেন্দ্র তবুও আছে, তাহা হইতেছে বৃন্দাবন-লীলা, কিন্তু ব্রজবিলাস কাব্যে যাহা কামুকতা ও ইন্দ্রিয় ভোগের স্পর্শ দেয়, তাহা বাংলাদেশে কত না তুরীয় রসভোগের আশ্রয় হইয়াছে। বৃন্দাবন ত আমাদের বাংলা দেশেরই মত শস্য-শ্যামল সুন্দর। নদিয়ার গৌর নিতাই বাংলা-দেশের অন্তঃস্থলে বৃন্দাবনকে আনিয়া যুক্ত-প্রদেশের একদিককার ভাব সাধনার সহিত আমাদের সাধনার মিলন সংঘটন করিয়াছেন। এই সাধনা এদেশে এক সময় খুব পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, এখন তাহা জনসমাজের কুরুচির গভীর অতলে পড়িয়া রহিয়াছে। এদিককার লোকসাহিত্যে, কবীর সুরদাসের গানে নহে বাঙালী আপনারই প্রাণের সতেজ স্পন্দন শুনিবে। তাই যুক্তপ্রদেশবাসীর মধ্যে আমাদের অতুল প্রসাদ সেন মহাশয় বাংলার সাহিত্যকে মনোরম সম্পদ দান করিয়াছেন, তাঁহার গীতিকবিতায়। তাঁহার গীতিকাব্য হইতেছে, বাদলরাতের এক মর্ম্মন্তুদ করুণ অভিসার—মানব ও ভগবৎ প্রেমের এক ব্যাকুল সমাবেশ; কিন্তু লক্ষ্মৌর ঠুংরীর সেই চঞ্চল চরণ-ভঙ্গ যাহা বাংলার ছন্দে নাই তাহা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের সেই রংয়ের হোলিখেলায় তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতি চুনীর গানগুলি মানব-প্রেমের জলন্ত

অনুভূতির বিচিত্র রঙে রঙীন করিয়াছেন, আর ইহাদিগকে গ্রথিত করিয়াছেন তিনি এ দেশের লোকচৈতন্তের গ্রথিত একটী স্থল-মিলন সূত্রে। উত্তর ভারতে যাহা কিছু মিঠা সুর আছে, হিন্দী গানে, গজলে, কাজরীতে গীত হইয়া যাহা এ দেশের ঘাট মাঠকে উৎসব দিনে মুখর করিয়া তুলে তাহা তিনি বাছিয়া বাছিয়া বাংলার গীতি কবিতাকে উপহার দিয়াছেন, উর্দ্দু গানের সেই তীব্র বেদনা আনিয়াছেন; এমন কি তাঁহার কবিতার অপ্রাচুর্য্যও যেন এ দেশের কবিগণের অভ্যাস-গত। অথচ বাংলার বাণী তাঁহার প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। ইহা হইয়াছে প্রবাসী সাহিত্যের একটা সহজ, সুন্দর দান।

বাস্তবিক যুক্ত প্রদেশের ভাবধারা আর এক দিক হইতে বাংলার সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিবিধান করিতে পাবে। উর্দ্দু সাহিত্যের যে তীব্র ভাবোন্মাদ তাহা সংস্কৃত শিক্ষা দীক্ষায় পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে নাই। সে ভাবোন্মাদ মরুভূমির তৃষ্ণার মত জ্বালাময়—তাহার জন্ম পশ্চিম এসিয়ার মরুভূমির অন্তর্গত গুলবাগানে। আবার তাহার বিপরীত ভাব এমন বৈরাগ্য আনে যাহা বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। আনিসের চক্ষে, আকাশ সর্ব্বদাই মেঘে ভরা, বাতাস ঝড়ের মত, সমুদ্র উত্তালতরঙ্গময়; যৌবন বিদ্যুৎ চমক ও আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত দুঃখ মানুষের শ্রেষ্ঠ সাথী, এবং চোখের জল তাহার শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আত্মার দর্পণের চাকচিক্য হইতেছে চোখের জল, মানুষের চোখের আলো চোখের জল—হৃদয়ব্যথা দূর হয় কিসে? সকল দুঃখের অবধি চোখের জলে। দিল্লীর বিখ্যাত কবি যিনি শেষে পল্লীবাসী হইয়াছিলেন মীর তকি গাহিয়াছেন,—সময় চলে যায়, কুল শুকায়, স্বপ্ন ফুরাইয়া যায়, জীবন চলিতে থাকে। সাকি! তোমার পিয়ালা, তোমার অপরূপ, ভরা পিয়ালা প্রত্যেকের সেই শেষ দশা, বিলম্ব করিতে পারে কিন্তু নিরোধ করিতে পারে না। আবার কখনও মানুষের এই জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষাকে কবিগণ অতি মধুর রসে অপ্লুত করেন। কখন যে সাকী পিপাসার্ত্ত পথিকের পিয়ালা ভরিয়া দিয়া তৃষ্ণা দূর করিবে, বেদনাতুরের অঙ্গে শ্রান্তির ঝারি বর্ষণ করিবে তাহা কবি জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে জগৎটা একটা প্রকাণ্ড সরাই আর জগতের প্রত্যেক জীবই বেদনাক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত পথিক। তাই একদিন নিশ্চয়ই জীবনের শ্রান্ত অপরাহ্নে যখন পশ্চিম আকাশ ভরা পিয়ালার রঙ্গের মত লালে লাল, তখন পথের সীমানায় অপ্রত্যাশিত ভাবে ভরা পিয়ালা হাতে লইয়া সাকী সম্মুখে উপস্থিত হইবে—তখন হয়ত পথিকের তৃষিত জীবনের সেই শেষ সার্থকতার সাক্ষী আর কেহ থাকিবে না—দুই জনের প্রেমবিহ্বল চক্ষের দুই ফোঁটা জল ছাড়া। এই রস বস্তুত এ দেশের অতি পরিচিত। বাংলার লোকসাহিত্যের হর গৌরীর মায়া-মমতা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—রাধার অভিসার হইতেও ইহা স্বতন্ত্র।

এই গুলি হইতেছে রস-বস্তু হিসাবে বিশ্বের সামগ্রী, শুধু বাংলার নহে। এবং প্রবাসী সাহিত্য যদি বাংলাদেশকে এই রস ও আখ্যান বস্তু যাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম এসিয়ার আদরের ধন তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় তাহা হইলে বিশ্ব সাহিত্যেরও ভাবসম্পদ পুষ্টিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। কারণ পশ্চিম এসিয়ার সাহিত্য

এত'কাল অনুবাদের দ্বারা জগতের নিকট পৌঁছিয়াছে প্রাচ্যের প্রাণের স্পর্শের ভিতর দিয়া নহে। পুরাতন রূপক, ভাষার কৃত্রিমতা ও অত্যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া একই রসকে একই আখ্যানবস্তুকে আশ্রয় করিয়া সুন্দর সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ইহাতে বাঙালী ও যুক্তপ্রদেশবাসী দুইয়েরই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে বাংলা ও উত্তর ভারতের সাহিত্যের দুইয়েরই পুষ্টি লাভ। এখানকার সাহিত্যে যাহা কিছু পুরাতন, গতানুগতিক ও কৃত্রিম তাহা ঝরিয়া যাইবে, অপরদিকে লোকসাহিত্যের সহজ সরল ভাব আমাদের নব-নাগরিক সাহিত্যকে নূতন রস সঞ্চারে অভিষিক্ত করিবে।

এখানকার গ্রামে গ্রামে যে সকল ইতিহাস যে সকল ভক্তের কাহিনী; যে সকল ধর্ম্মোপদেশ বচন, প্রবাদ, আখ্যায়িকার আকারে প্রচলিত তাহাদের মধ্য হইতেও বস্তুরস সংগ্রহ করিতে হইবে। লৌকিক গান গজল ও গাথা সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহ করিয়া বাংলার প্রাণ দিয়া তাহার নূতন আকার দিতে হইবে। রবীন্দ্র সাহিত্য ভারতবর্ষে চিন্তা ধারার সহিত বিশ্ব চিন্তার যে সংযোগ আনিয়াছে তাহার দ্বারা অন্যপ্রদেশের সাহিত্যের যাহা কিছু গতানুগতিক ও আড়ষ্ট তাহা নবজীবন পাইবে। যাহা এখন প্রাদেশিক তাহা তখন বিশ্বের রসবস্তু হইবে। তুলসী দাসের দাস্যভাব তখন আধুনিক সেবা ব্রতের নব ইন্ধন জোগাইবে, সাকীর ব্যাকুল প্রেম তখন বিশ্বপ্রেমের দারুণ-পিপাসা মিটাইবে। এই হইল আমাদের দান। আমরা পাইব এদেশ হইতে ইহার অনুভূতির তীব্রতা, লইব ইহার রঙের খেলা যে রঙের মেলার পরাকাষ্ঠা আমরা কাশীর বস্ত্র শিল্পে দেখিতে পাই, স্ত্রীলোকের দৈনন্দিন পরিচ্ছদে যাহার সৌন্দর্য্য এ দেশের ঘাট বাট তট মাঠকে সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে, এ দেশের কাজরী, হোলির উৎসব নৃত্য, কত না আমোদ প্রমোদে যাহার ব্যাকুলতা গ্রাম্য জীবনকে উল্লসিত করিতেছে। বঙ্গ সাহিত্য কলায় যেমন আমাদের অতুল প্রসাদ সেনের বিশিষ্টতা, তেমনি বঙ্গচিত্র শিল্পে আমাদের বন্ধু সমরেন্দ্র নাথ ও তাঁহার ছাত্র আব্দর রহমান চাকৃতাই এই রঙের লীলা ভারতীয় চিত্র কলাকে দান করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের রং ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বাহুল্য, তাঁহাদের সহজ ও সার্ব্বজনীন চিত্র-বস্তু তাঁহাদের শিল্পের সৃষ্টিকে প্রাদেশিক ছাপ দিয়া একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। দুই ক্ষেত্রেই উত্তরের ভাব সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভার নিকট, বাঙালীর ছাঁদে, নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু উত্তর ভারতের হলুদ সবুজের পরিচ্ছদ সম্ভার লোকচৈতন্যের নিরাবিল আনন্দের ছাপে রঙীন হইলেও এ দেশের আকাশ মাটির একটানা পাটল রঙ তাহার উগ্রতা ও কঠোরতা দূর করিয়াছে। অন্তর্জ্জীবনেও সেইরূপ এ দেশের আনন্দ উৎসব একটা অলৌকিক জগতের বিধিনিয়মের গণ্ডীর মধ্যে, মানুষের হর্ষের পশ্চাতে পরলোকের অনিশ্চিততার আড়ালে, নিয়মিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের বার মাসের তের পার্ব্বণ এখানে আরও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজীবনের পর্য্যায়ের সঙ্গে এই সকল নানাবিধ বিধিনিষেধ আমোদ প্রমোদের একটা নাড়ীর যোগ আছে। বাস্তবিক বাহিরের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের উপর ইহা একটা

পরলোকের ছাপ দিয়াছে, একটা অতীন্দ্রীয় জগত হইতে সঙ্গীত কর্ম্মকোলাহলকে এক সুরে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছে। তাই মনে হয় মুসলমানের সেই আবেগের বিলাস ও ব্যাকুল বাসনার গান যেমন একটা অন্তহীন বিলাস ও অসীম বাসনার উদ্বেগ জাগাইয়া লয়লা মজনুর প্রেমের মত বৈরাগ্যের কোলে মিশিয়াছে, তেমনি আবার এ দেশের লোক সাহিত্য ও পূজাপার্ব্বণে মায়াময় জগতের বাহিরে কর্ম্মফলের একটা নূতন জগৎ তৈয়ার করিয়া বহির্মুখীনতাকে খর্ব্ব করিয়াছে। বাংলার সে ভক্তিরস এখানে পাওয়া যায় না, রামপ্রসাদের স্নেহময়ী মার গানের ব্যাকুলতা এখানে নাই, আগমনী গানের বিহ্বলতা এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু গুরুভক্তি আছে, সংসার মায়াময় এ জ্ঞান আছে, জন্মজন্মান্তরের দুঃখভোগের অবসান স্পৃহা আছে, সুকর্ম্মের মহিমাবোধ আছে। মুসলমানের বিলাসের অসীমবোধ ও জন্মান্তর বিশ্বাসী হিন্দুর পুণ্যার্জ্জন আকাঙ্খা সুন্দরী বিলাসিনী যমুনা ও কাশীতনবাহিনী পুণ্যদায়িনী গঙ্গার মত যুক্ত প্রদেশেই মিশিয়াছে। বিপরীত ভাবের এই পুণ্য সঙ্গম এই সুন্দর দেশের মনোরম পাটল রঙের মত প্রাচীন নগরের চকের বিলাসিতা, নূতন সহরতলীর আড়ম্বর, দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্রের সহিষ্ণুতা, ও কৃষক পরিবারের যুগসঞ্চিত পরিশ্রমকে যেন সদা সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই রুদ্র দীপ্ত বৈরাগী বৈশাখের মুক্ত পাটল রঙের স্পর্শে সব রঙই কোমল হইয়াছে। রূপের ভিতর অরূপের এই ইঙ্গিত, বাংলা দেশেই পাই বা যুক্ত প্রদেশেই পাই, ইহাই সাহিত্যের প্রধান আশ্রয়। যে কোন রূপক যেখানে অরূপকে পরিচিত করাইয়া দেয় তাহাই বিশ্বজনীন রসের আধার। শুধু নূতন রস ও আখ্যান বস্তু সংগ্রহের দ্বারা নহে, আমরা আরও এক দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতির ধারার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর একটা ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা ও উদারতা, জীবন অতিবাহনের উত্তাপ, বাঙলা সাহিত্যের নূতন বস্তুতান্ত্রিকতার সহায়তা করিবে। একটা কর্ম্মঠ জীবনের প্রাচুর্য্যে রসপ্রবণতা ও কেন্দ্রচ্যুতি সাহিত্যের—অসামঞ্জস্য বলিয়া তখন নিরূপিত হইবে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে এখন একটা নূতন শক্তি আসিতেছে। জীবনের উত্তাপ ও দুঃখের সহিত নিবিড় অনুভূতি এক দিকে যেমন ভাষাকে সহজ, ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণময় করিয়াছে, তেমনি সাহিত্যের সহিত দৈনন্দিন জীবনের অন্তরের বস্তুর যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উহাকে সতেজ ও বস্তুতন্ত্র করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথা-পন্থ অথবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেম-উপন্যাস মহৎ দুঃখ এবং দুঃখের গভীর ও জীবন্ত অনুভূতি আনিয়া সাহিত্যকে নানাদিক হইতে সতেজ করিয়াছে। বস্তুগত জীবনের প্রাচুর্য্য ও উত্তাপ আমাদের কাব্য ও উপন্যাসকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু বাস্তব জীবনের বিরোধ ও ভাববিপর্য্যয় যে নিয়তই প্রভূত উপকরণ সঞ্চয় করিতেছে তাহার দিকে আমাদের নাটের মনোযোগ নাই। কাব্য উপন্যাসেও জীবনের প্রাণান্তকর ঘটনা ও ভাব-বিচিত্রিত হইলেও একটা অসাম্য ও কেন্দ্রচ্যুতিরও পরিচয় আমরা পাইতেছি। একটা স্নায়ু বিকার ও মানসিক বিক্ষোভ বর্ত্তমান বাধাবিঘ্ননিরাশয় বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত বাঙালীর

ঠিক যেন স্বাভাবিক অবস্থা, তাহার ধাতেরই পরিচায়ক। এই দিক হইতে বর্ত্তমান উপন্যাস অকালযৌবন বিলাসী স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত বাঙালী চিত্তের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। ইহা হইতে আমাদের রক্ষা পাওয়া চাই। সাহিত্যে জীবনকে প্রচুর ও গভীরতর ভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে শুধু যৌবনের আবেগ চিত্রিত করিলে চলিবে না, জীবনের সমস্ত দিক দিয়া, শুধু প্রিয়তমের প্রতি নহে, সেই আবেগের রূপান্তর এবং শেষে পরিশুদ্ধিও চিত্রিত করিতে হইবে। বাস্তবিক আবেগের এই স্বাভাবিক পরিণতি উপন্যাসকে যে শুধু লঘুতা ও চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করিবে তাহা নহে, একই সঙ্গে জীবনের বিপুলতর অনুভূতি ও রসের প্রতুলতা তাহাকে কল্পনার মায়াজাল ও ইন্দ্রিয় ভোগের লাস্য হইতেও রক্ষা করিবে।

এক কথায় জীবন চাই। "জীবন জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।" যে জীবন রাস্তায় ঘাটে, ক্ষেতে, আফিসে, কারখানায়, বাজারে কত সুখ দুঃখ, আবেগ ও বিহ্বলতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে বিপুলতর, মহত্তর ভাবে সাহিত্য-দর্পণে ফিরিয়া পাওয়া চাই। জনসমাজের জাগ্রত অনুভূতির উত্তাপ সাহিত্যকে নব কলেবর দান করিবে, সাহিত্যের সে বিরাট কায়ায় আমাদের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে। শুধু রূপ দর্শন নহে, অরূপও এই রূপে মিলিবে। আমাদের শিল্পীর যুগ-যুগান্তরলব্ধ ভাবুকতা মানব-জীবনকে একটা শাশ্বত তুরীয় জীবনের ছায়া রূপে, একটা বিশাল অনধিগম্য স্রোতের বিচিত্র ও মোহন বুদ্বুদের রূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করিবে। তখন সাহিত্যের রস ও আখ্যান বস্তু দুই-ই—রূপান্তরিত হইবে। প্রকৃতি, প্রেম ও মানুষ তখন এক নূতন প্রভায় রঞ্জিত হইবে। এই আমাদের চিরপরিচিত শ্যামলা বিপুলা ধরণী তখন কত রহস্যময়ী হইবেন, কত না স্নেহভরে সেই শাশ্বতী জননীর মত আমাদের চিন্তাক্লিষ্ট, তপ্ত ললাটে তাঁহার স্নিগ্ধ হস্তখানি বুলাইয়া দিবেন। যার প্রতি কত অনুরাগে লক্ষ ব্যাকুল বাসনায় কবি হাজার হাজার বছর ধরিয়া ছুটিয়াছে, সে যখন এ জগতের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া কোন সৌন্দর্য্যলোকে লীলাকমল হাতে লইয়া দাঁড়াইবে, বিশ্ব সৃষ্টির কোন নিগূঢ় রহস্য তাহার মাধুরীতে তখন প্রতিভাত হইবে, নব নব আকাশে যুগযুগান্তের কত না ছায়া তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিবে, কোন অমর প্রেমের ধ্যানদৃষ্টিতে এই জগতের প্রেমিকা চরাচর লোকের শাশ্বত মিলনের পথে তখন আহ্বান করিবে। এই যে দারুণ গ্রীষ্মে কঠিন পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কৃষক সংসারের সমস্ত গুরু-ভার স্কন্ধে লইয়া বসুন্ধরার সহিত সংগ্রাম করিতেছে; বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন, প্রত্যুষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত,—সে কি একলা এই বিপুল পরিশ্রমের শ্রমিক,—তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে যে অসংখ্য ছায়া-রূপ, সমস্ত মানব-ইতিহাসের বেদনা; আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ, নিরাশা মূর্ত্ত হইয়া তাহার অগ্রে পশ্চাতে চলিয়াছে, অনাদিকালের উদ্দাম অফুরন্ত মহা-জীবনের উজ্জ্বল মেলায় সেই চির-প্রেমিক কত না বিপুল পরিশ্রমলব্ধ ফল, কত লক্ষ যুগের পসরা লইয়া ফিরিতেছে। মানবাত্মার এই চরম লক্ষ্যের আভাস আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাইয়াছি। জীবন সৃষ্টির সেই অনাদি গূঢ় ক্রন্দনের বিপুল ব্যথা, সেই ব্যাপকতর অন্তর্দৃষ্টি, সেই সূক্ষ্মতর ভাবুকতা, আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে তখন অন্য চক্ষে দেখিবে। রস তখন আরও গাঢ় হইবে, সহানুভূতি আরও

জীবন্ত হইবে, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আরও পবিত্র হইবে। অসীম শিল্পী এবং শাশ্বত তাঁহার জীবন, যাহা এখন কল্পনার মায়া, যাহা এখন ছায়ার মত অস্ফুট তাহা তখন আপনার প্রাণেরই বিস্তার বলিয়া সে চিনিবে। দুইয়েরই মধ্যে দুইয়েরই চিরন্তন বিকাশ,—ইহাই ত সাহিত্য। শিল্পী কি আপনাকে চিনিবেন? আপনার জীবনকে অধিকার করিবেন? তখন যে সাহিত্যের নূতন চেতনা, "লীলা নব নব, নিতুই নব।"

নিধুবনে

[শ্রীমুণীন্দ্রনাথ ঘোষ]

কোন মধুরার প্রেমে এ দুয়ারে দ্বারী?
কোথা গেল যোগিবেশ কোথা জটাজুট.
কে পরালে গোপিকারে রতন-মুকুট,
এ কি রঙ্গ 'রাইরাজা' তোমার পিয়ারী?
ওগো নিধুবন-বিধু বরাঙ্গে তোমার
সহে নাকি সুধাধরা রাধারূপচ্ছটা,
কোথা চারু চন্দ্রমুখে চুম্বনের ঘটা?
উজ্জ্বল রসের সভা দূরে পরিহার!
অতি আদরিণী করি মানিনী রাধারে,
আবার পালাবে নাকি গোপিকারঞ্জন?
আঁখিজলে বিগলিত নয়নঅঞ্জন—
কাঁদিবে অধীরা রাধা কানন-কান্তারে?
সেবাকুঞ্জে সেবা করি বাড়াইলে মান—
এত গরবের পর রবে ত পরাণ?

পাড়াগাঁ

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

[শ্রীনিতাইহরি ভট্টাচার্য্য]

বেলপুকুর গ্রামের ভিতরের অবস্থা আবার আরও সুন্দর ছিল। ঘরে অর্থ নেই—কিন্তু মোকদ্দমা মামলার অবধি ছিল না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার লোকের অপ্রতুল ছিল না। ঋণ করিয়া মহাজনকে ফাঁকি দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। ৫৲ টাকা ঋণ দিয়া সুদে আসলে তার সুদে তার আসলে ৫০০৲ টাকা আদায় করে নেবার লোকের কমতি ছিল না। তার পর সমাজ। অস্পৃশ্যতা তার হাড়ে হাড়ে। ও চাঁড়াল ওকে ছোঁয়াও পাপ; ও নাপিত, ওকে ছুঁলে স্নান করতে হবে! ও হাড়ি, ওকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে দেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ প্রধান গাম, অন্য জাতিকে কিছুতেই প্রাধান্য দেওয়া হবে না। হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তার অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে Government সাহায্য বন্ধ করে' দেবার Notice দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টীর আয় ছিল না তা নয়। দুঃখের বিষয় স্কুলের অর্থগুলি যে কিরূপে নষ্ট হ'ত তা লিখে লেখনী কলঙ্কিত ক'রতে চাই না। গ্রামে কারও মৃত্যু হ'লে মৃতদেহ সংকার একরকম অসম্ভব হ'য়ে উঠ্ত। প্রথমতঃ আত্মীয় স্বজন বা জাত ভাইরা এক অন্ধ বিশ্বাসের মূলে শবদেহ সংকারে বেরুতেন না। তার উপর মজা দেখাও একটা স্বভাব ছিল—মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া বেশ আনন্দকর বোধ হ'ত। গ্রামে কয়েকটী মাতাল ছিলেন। মৃতের আত্মীয়কে অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে তাঁদের নিকটই যেতে হ'ত। তাঁরা মদের মূল্য স্বরূপ অগ্রিম ২০৲।২৫৲ টাকা হাতে না নিয়ে এগুতেন না। এইতো গেল শবদেহ সংকারের বিষয়। তারপর অনাথ আতুরের সেবা শুশ্রূষার কথা! সকলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। নানারূপ যুক্তি তর্ক দ্বারা সেবা করা মহাপাপ একথা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিতে ছাড়তেন না। তারপর দলাদলি—এক কথায় যতগুলি লোক ততগুলি দল। সবাই মুরুব্বি—সবাই সমাজপতি।

গ্রামের শোচনীয় অবস্থা ভেবে দেখতে গেলে এ সব ব্যাপার কেবল এই গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়। অল্পবিস্তর ভাবে পল্লীগ্রাম মাত্রেই আছে। নতুবা পাড়াগাঁয়ের এমন দুর্দ্দশা ঘটত না॥ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্ন ফুরাত না।

যাই হোক গ্রামের এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের প্রাণ সত্য সত্যই কেঁদে উঠেছিল। তাঁরা সংখ্যায় অতি অল্প তথাপি তাঁদের হৃদয়ে দেবতার শক্তি ছিল, প্রাণে অতুল উৎসাহ ছিল—মনে অদম্য অধ্যবসায় ছিল। তাঁরা কয়েকজন এক হ'য়ে ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসের শুভ মুহূর্ত্তে এক সমিতি স্থাপন ক'রলেন, সমিতির

নাম হল—"বেলপুকুর সেবক ও সৎকার সমিতি।" প্রথম এই সমিতিতে সেবক হ'ল মাত্র ১০।১১ জন। তাঁদের নিয়েই সমিতি কাজ আরম্ভ ক'রল। ভগবানের ইচ্ছায় এক মাস যেতে না যেতেই এক ব্রাহ্মণসন্তানের দোকান ঘরে আগুন লাগল। সেবকেরা দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও চমকিত ক'রে সে আগুণ নিবিয়ে দিলেন। তারপর সমিতি সেবকদের জন্য কয়েকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ ক'রলেন। এখানে তার উল্লেখ করা অসম্ভব। তার ভাব এই যে সেবক মাত্রেই বিনা বাক্যব্যয়ে মৃতের আত্মীয়ের নিকট কিছু না নিয়ে শবদেহ সৎকার ক'রবেন। যথনই যার অসুখ শুনতে পাবেন তখনই সেবা শুশ্রূষা ক'রবেন। পাড়ায় পাড়ায় দুস্থ অনাথের সংবাদ রেখে সমিতি হ'তে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা ক'রবেন। রবিবারে রবিবারে মুষ্টিভিক্ষা আদায় ক'রবেন এবং সমিতিতে মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য ক'রবেন। সমিতি এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতে লাগলেন। সমিতির জন্ম হওয়ার পূর্ব্বে শবদেহ ২।৩ দিন প'ড়ে থাকত এখন আর ২।১ ঘণ্টাও প'ড়ে থাকে না। আপনা হতে সেবকেরা কোথা হ'তে ঘটনাস্থলে এসে একত্র মিলিত হ'য়ে শবদেহ স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে তীরস্থ করে সমিতির ব্যয়ে শবদেহ সৎকার ক'রে গৃহে ফিরে আসেন। কারও অসুখ সংবাদ শুনলে ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসেন ও সঙ্গে সঙ্গে তার সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। গরীব দুঃখীদের নিয়মিত ভাবে খোঁজ খবর ক'রে সমিতি হ'তে অর্থ, বস্ত্র, চাউল ও ঔষধ সাহায্য দেন। সমিতির কার্য্যে সাধারণ স্ত্রীপুরুষ সকলেই সন্তুষ্ট হ'লেন। সেবকদের মনেও অতুল আনন্দ। কিন্তু প্রবীণেরা এর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ালেন। প্রথম প্রথম তাঁরা বিদ্রূপ উপহাস ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন। এর ভাবি অকাল মৃত্যুর বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রেই দিন কাটাতেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে সমিতি বেশ গ্রামের মধ্যে নাম ক'রে বসল—দল পুষ্ট হয়ে উঠল, তখন তাঁরা আর নিশ্চিন্ত থাকা উপযুক্ত নয় বিবেচনা ক'রে অনেক কাণ্ড ক'রতে লাগলেন। নিজ নিজ ছেলেদের তীব্র ভৎর্সনা ক'রে সমিতি থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। যেখানে সেখানে সমিতির নিন্দা অখ্যাতি ক'রতে সুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হ'লেন না। যে পুণ্যভাবে তখন গ্রাম্য যুবকেরা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ছিলেন তাতে মানুষের বাধায় কিছু আসে যায় না। বৃদ্ধেরা পার্লেন না—এমন সময় গ্রামের মধ্য হ'তে কয়েকজন মহাত্মা মিলিত হ'য়ে অজ্ঞাতভাবে ষড়যন্ত্র ক'রে সমিতিকে "ডাকাতের আড্ডা" এই বিশেষণে বিভূষিত ক'রে নদীয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটর নিকট বেনামী দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ ক'রলেন। তখন রাজনৈতিক ডাকাতির হুজুগ। শিবপুরের বিখ্যাত ডাকাতি মাত্র ১০।১২ দিন হ'ল হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই যেমন দরখাস্ত অমনি দারোগাবাবু এসে হাজির সেবকদের মধ্যে অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবে সত্যের সর্ব্বত্র জয়—এ নিশ্চিত—! তাই সেবকেরা কোন রকমে উদ্ধার পেলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় শাপে বর হ'য়ে গেল। দারোগাবাবু, ডেপুটীবাবু সকলেই রায়ে লিখে গেলেন যে এরূপ সমিতি প্রতি গ্রামে গ্রামে থাকা দরকার। এখন হ'তে সমিতি জেলা ব্যেপে সুনাম কিনে বসল। তারপর সমিতির

কার্য্য পুনরায় উৎসাহের সহিত আরম্ভ হ'ল। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুরের নাম পাঠকদের অনেকেই শুনেছেন আশা করি। এইখানে দেবাদিদেব ধর্ম্মরাজের বিগ্রহ স্থাপিত আছে এবং বহু লোক বৈশাখী পূর্ণিমায় বিগ্রহ দর্শনেচ্ছায় সেখানে যান। স্থানটী বন জঙ্গলে পূর্ণ। প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। পানীয় জল, ঔষধ ও আশ্রয় অভাবে যাত্রী-দিগকে এতই কষ্ট পেতে হয় যে তা বর্ণনাতীত। অনেকে কষ্ট সহ্য ক'রতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ব্যাপার জান্‌তে পারা অবধি সমিতির সেবকেরা বৎসর বৎসর জামালপুরে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করে আসেন। কালনার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেবকদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাদের এক সুন্দর প্রশংসা-পত্র দেন। এই ভাবে কিছু দিন যেতে না যেতে প্রবীণেরা সেবকদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে' দিলেন। দুই একটী সেবক কার্য্যক্ষেত্র হ'তে স'রে গেলেন। সমিতির কার্য্যে অনেক বাধা বিপত্তি এসে পড়ল কিন্তু কিছুতেই কার্য্য বন্ধ হ'ল না। এই ভাবে দীর্ঘ ৭ বৎসর যুদ্ধের পর প্রবীণদের দয়া হ'ল। তাঁদের কৃপা লাভ করা গেল। তাঁরা তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সমিতির মধ্যে আস্‌তে চাইলেন। এইবার হ'তে সমিতি সাধারণের সমিতি ব'লে পরিচিত হ'তে পারল! এততেও যে তার সব দুঃখের শেষ—সকল কষ্টের অবসান হ'ল তা নয়। আর এক রকম নূতন বিপদ এসে এর ঘাড়ে চেপে ব'সল! সে বিপদ আর কিছু নয়—অবসাদ! কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনিচ্ছা!

সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই জীবিকা অর্জ্জন উপলক্ষে দেশবিদেশে চলে যেতে লাগলেন আর তখন হ'তেই আর সমিতির উপর নজর রাখলেন না। সমিতির কি উপায় হবে তার কিছুমাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ব'লে মনে ক'রলেন না।

যারা দেশে থাক্‌লেন তারাও অল্প বিস্তর যেন একটু একটু ক'রে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে সরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন।—কোন কাজে যোগ দিলেন কোন কাজে বা দিলেন না—এই ভাবে চল্‌তে লাগ্‌ল। প্রবীণের মধ্যে যাঁরা সমিতির মেম্বররূপে নাম পত্তন ক'রলেন, সমিতির কার্য্যকরী সভায় সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হ'লেন—তাঁরা বড় বেশী কিছু উন্নতি করতে যত্ন নিলেন না! সমিতির অনেক কাজই প'ড়ে থাক্‌তে লাগ্‌ল। তখন বোঝা গেল এক ঘোর অবসাদ এসে সমিতিকে ঘিরে ফেলেছে! প্রবীণেরা যোগদান করায় যুবকেরা যেন একটু চক্ষুলজ্জাযুক্ত হ'লেন! সভা সমিতিতে তর্ক বিতর্কের সময় তারা তত বেশী কথা বল্‌তে পার্ত্তেন না!—কারণ একটু বেশী তর্ক হ'লেই—প্রবীণেরা, সম্মান থাক্‌ল না, তাঁদের উপযুক্ত সম্মান রাখা হ'ল না এইরূপ বিবেচনা করতে লাগলেন। সুতরাং উভয় পক্ষ থেকেই যেন একটু কর্ম্মলিপ্সা কমে গেল। তখন যুবকেরা বুঝলেন—সমিতির সংস্কারের প্রয়োজন! কি সংস্কার হবে তার সাব্যস্ত হ'ল, প্রবীণদের দিয়ে পরামর্শ-সভা গঠনের প্রস্তাব করা হ'ল; কার্য্যকরী সভার সকল কার্য্যের ভার যুবকদের উপর দেওয়া উচিত বলে স্থির হ'য়ে গেল। স্থির হ'ল যুবকেরা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সমিতির কার্য্য চালিয়ে যাবেন আর গুরুতর বিষয়ে প্রবীণদের পরামর্শসভা আহ্বান ক'রে কি করা কর্ত্তব্য তা স্থির ক'রে নেবেন আর তদনুযায়ী কাজ করবেন।

এইবার হ'তে আশা করা যাচ্ছে সমিতি

প্রকৃত উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে। গ্রামের যথার্থ উন্নতি সাধন ক'রতে সমর্থ হবে। সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারবে।

তাই বলছি সমিতি স্থাপন করে গ্রামের প্রকৃত উপকার করতে হ'লে একটু ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন। গ্রামের যুবক সম্প্রদায়ের তৈরী হওয়ার দরকার। আর এই ভাবে গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন ক'রতে পারলে পাড়াগাঁর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রলয়-নৃত্য

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায]

সমাজের এই বন্দীশালের শিকল ভাঙ্গ, ওগো ভাঙ্গার দেবী,
বুকে হেঁটে নারী যেথায নর-দানবের আদেশ চলে সেবি';
ভুলে গেছে নারী যেথায কেমন করে' মাথা তুলে দাঁড়ায়,
মাথা মোটা পুরুষগুলো তাইতো তা'দের নিত্য দু'পায় মাড়ায়!
এক ডাযারের অত্যাচারে ভারত জুড়ে' জা'গ্‌ল হাহাকার
চিরদিন কি বইব মোরা সমাজের এই ডাযারগুলোর ভার?
শুষ্কমুখে, গোপনদুখে, চিরদিন কি চল্‌বে কানাকানি?
পশুর সুখে সমাজবুকে তা'রা কেবল কর্‌বে হানাহানি?
আর্য্য-ধর্ম্ম- দালাল যাঁরা, তাঁরা বলেন,—নীরব হ'য়ে থাক,
সুপুরুষের মুখোস দিয়ে কাপুরুষের পোড়ার মুখকে ঢাক।
ঘরের নিন্দা বাহিরে আর জাহির ক'রে কি ফল বল ভাই?
ও সব দিকে চোখ্ না দিয়ে এস আর্য্য-ধর্ম্মের গুণ গাই।"
আমরা বলি—নিমকহারাম! যাদের কাছে এত নিমক খেলে,
মিথ্যা দিয়ে ভুলাও তা'দের এতদিনে এই কি সত্য পেলে?
ধর্ম্মে তোমার ঘূণ ধরেছে গুণের তাহার আছে কি আর বাকী?
তোমার ধর্ম্ম-মাকাল ফলের উপর ভাল, ভিতর বেবাক্ ফাঁকি!

বার বছর মেয়ের বুকে চাপায় যা'রা জগদ্দলের বোঝা,
বিয়ের নামে যেথায় কেবল আপনাদের কামের সাথী খোঁজা,
বংশ যেথায় ধর্ম্ম রাখে ধ্বংশ ক'রে দু'টী তিনটী নারী
তেমন ধর্ম্মের মুখে আগুণ, সে ধার্ম্মিকের মুখে ঝাড়ুর বাড়ি!
নারী যেথায় পরপুরুষের মুখের দিকে চাইলে ধর্ম্মনাশ,
পুরুষ হ'লেই ধর্ম্মরাজা স্বয়ং তাহার দেহে করেন বাস,
ব্যভিচারের হোক্ না রাজা, হোক্ না ভণ্ড-ষণ্ড-অত্যাচারী
তবুও সে নারীর রাজা, তাহার পায়ে প'ড়বে লুটে নারী!
পুরুষ হাজার ভুল করিলেও, সেতো তাহার পৌরুষেরি ফুল,
এক নিমেষের একটি ভুলে নারীর তরে আছে সমাজ-শূল!
অবিধির এই বিধি-বাঁধন আর কতদিন র'বে এদেশ ছেয়ে?
একেবারেই মরা ভাল, মরার মত বেঁচে থাকার চেয়ে!
ভাগ্য-দোষে, বিধির রোষে কৈশোরে যে হারিয়ে ফেলে পতি,
সব সাধ তা'র ফুরিয়ে গেল—জাঁতাকলে হ'তেই হ'বে সতী!
হেথায় ধর্ম্ম-রক্ষা তরে ধর্ম্ম-বিহীন বৃদ্ধ তাহার পিতা
তাহার বুকে বজ্র হেনে আনেন ঘরে ষোড়শী এক মিতা!
পিতা সাজান সোহাগ আসর, প্রেমের বাসর তাহার চোখের পরে
সেই আগুণের হল্কা লেগে দুহিতা তাঁর জ্বলে' পুড়ে' মরে!
তৃষিত এই নারীর বুকে শতরূপে সুধা দিবার ছলে
কত পুরুষ টান্‌ছে তা'দের সর্ব্বনাশের গভীর ডুবন্-জলে!
তবু তা'দের হিয়ার স্বাধীন অধিকারের পথ দেবে না ছাড়ি',
ইচ্ছামত কামের তৃষা তা' হ'লে যে মিটাবে না নারী?
সমাজের এই আঁস্তাকুড়ের পূতিগন্ধ জঞ্জালের এই জাল,
আগুণ-ঝাঁটায় ঝাঁটাও তুমি অগ্নি-ভালী রুদ্র মহাকাল!
ছেলের মুখে নাইক হাসি, যুবার বুকে নাইক উদার স্নেহ,
শাস্ত্র-গুরুর আদেশ ব'য়ে কুঁজো হ'ল তা'দের মন ও দেহ,

ভিক্ষা করাই শিক্ষা যা'দের, জিনে নেওয়ার ইচ্ছা মহাপাপ
মিথ্যা-খাঁড়ায় ঝোপ বুঝে কোপ মারতে শেখায় যা'দের মা ও বাপ,
শক্ত দেখেই রক্ত যাঁদের জল হ'য়ে যায়, গরম নরম পেলে,
কোন্ কাজেতে লাগ্‌বে সে সব অকর্ম্মণ্য মানুষ-মেষের ছেলে?
অভাগা আর হতভাগা মেয়ের বাপের সর্ব্বনাশের চূড়ে,
রক্ত-পিশাচ ছেলের বাপের অট্টহাসের বিজয়-কেতন উড়ে!
বাজারের ওই কশাই ছুঁলে শাস্ত্রে বলে জাত তোমাদের যা'বে,
মানুষ-মারা-কশাই সাথে ঘর করে' কি স্বর্গ তোমরা পা'বে?
গরীব মেয়ে শ্মশান করে সেই শ্মশানে ধনী-প্রেতের দল
বিলাস-ব্যসন-বীভৎসতায় কাঁপিয়ে ধরা হাস্‌ছে খল খল্!
ছিন্ন কর, ভিন্ন কর, দীর্ণ কর এই সমাজের বুকে,
প্রলয়-নাটের ও নটরাজ, নৃত্য কর, নৃত্য কর সুখে!
শিশুর মুখে হাসি হ'য়ে যুবার বুকে সত্য-জ্যোতিঃ জাগো,
রুদ্রাণী গো, নারী হ'য়ে শবের বুকে আপন্ আসন মাগো,
অসত্য আর অত্যাচারের দানবগুলোয় পাঠাও রসাতলে
শবের মুখে শিবের হাসি জাগুক তোমার দৃপ্ত-চরণ-তলে!
বজ্র-বিষাণ বাজাও তুমি, মুক্তি আসুক দীন দুখীদের দলে
অত্যাচারী উঠুক কেঁপে, আসন তাহার লুটাক্ ধূলি তলে!
ছিন্ন কর, ভিন্ন কর, দীর্ণ কর এই সমাজের বুকে
প্রলয়-নাটের ও নটরাজ! নৃত্য কর, নৃত্য কর সুখে!

সাহিত্যিকের খেয়াল

অনেক বড় বড় কবি, লেখক যখন যেখানে বস্‌বেন সেইখানেই তিনি লিখতে পারবেন, আর অনেকে আবার আপনার বিশিষ্ট জায়গাটি না হ'লে, বা আপনার ঘরে নিজের বিশিষ্ট কলমটি ছাড়া এক ছত্রও লিখতে পারবেন না।

স্যার লিউইস মরিস তাঁর বিখ্যাত "এপিক অব হ্যাডস" নামক বইটি ভ্রমণের সময় পথিমধ্যে চল্‌তে চল্‌তে লিখে শেষ করেছিলেন। জর্জ্জ গিসিং তাঁর 'গ্রাবষ্ট্রীট" খানা একটি ছোট কুঠরীতে ব'সে লিখেছিলেন। ফ্রান্সিস টমপসন তাঁর অমর "গ্রাউণ্ড অব হেভেন" নামক বইখানা লণ্ডনের একটা সাধারণ মেসের বাড়ীতে লিখেছিলেন!

ডাক্তার জনসন্ বলেছিলেন যে, যখন লেখবার ঝোঁক চেপে বসে তখন যে অবস্থায় কেননা থাক তাতেই লেখা রীতিমত আসবে। তাঁর এ কথা যে সত্য নয় তার প্রমাণস্বরূপ নীচে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স-এর জনবহুল রাজপথে চল্‌তে চল্‌তেই তাঁর মাথায় গল্প বা উপন্যাসের ভাব বা আখ্যানভাগ এসে যেত কিন্তু সেই সব আখ্যান বা ভাবগুলিকে ভাষায় গাঁথতে হ'লে তাঁকে নিজের সেই চিহ্নিত ঘরটির দরজা বন্ধ ক'রে বসা চাইই। সে ঘরের যা-কিছু তাঁর আবশ্যক বা প্রিয় বস্তু তার একটিরও অনুপস্থিত থাকলে তাঁর কলম চল্‌ত না কিছুতেই। ঘরের মেঝেতে এক টুকরা কাগজ প'ড়ে থাকলে বা যে স্থানে যে বই থাক সে স্থানে সে বই না থাকলে তাঁর সব ভাবটাব গুলিয়ে যেত।

সাউদের লিখবার সময় তাঁর চার পাশে বইগুলি ছড়ানো না থাকলে তিনি মোটেই লিখতে পারতেন না। স্কট ও টেনিসন আবার পড়বার ঘরের সুমুখে একটি বাগান না থাকলে কিছুতেই স্বস্তি পেতেন না, বলা বাহুল্য যে স্বস্তি না পেলে লেখার কাজ এগুতে পারে না কিছুতেই।

আবার অপর পক্ষে কার্লাইল, ডুমা, বেকন—এরা যেখানে সেখানে একটি যেমন তেমন টেবিল ও একখানা চেয়ার পেলেই সানন্দে লিখতে পারতেন। কিন্তু থিয়ার্স, ইউজিনিসু প্রমুখ লেখকগণ আবার বিলাসদ্রব্যে সুসজ্জিত আসবাব পূর্ণ ঘর না হ'লে মোটেই লিখতে পারতেন না।

অক্টেভ ফ'লেট গোলমাল সম্বন্ধে এতটা ওয়াকিবহাল থাকতেন যে, তিনি যে তলায় ব'সে লিখবেন সে তলায় আর কারো প্রবেশের অধিকার থাকৃত না; সময় সময় তিনি তালাচাবী দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতেন।

কবিবর ষ্টারন্-এর লেখা ততক্ষণ কিছুতেই আস্‌ত না, যতক্ষণে না তিনি সুন্দর পোষাকের উপর একটি সুন্দর সলোম পশুচর্ম্মের টুপী প'রে তাঁর নিজস্ব আরাম কেদারায় বস্‌তে পেতেন।

শেরিডান, সিলার মদের বোতল সুমুখে

না পেলে লিখতে পারতেন না। রুশো ফুল বাবুটি সেজে বসতেন; লর্ড লিটন এর তলোয়ারশুদ্ধ দরবারী পোষাক না পরলে লেখা আসত না। বাফন একটা সামান্য সার্ট গায়ে দিয়েই লিখতে পারতেন।

পল দ্য সেণ্ট ভিক্টর নামক সুবিখ্যাত ফরাসী সমালোচক নিজের চিহ্নিত দোয়াতটি না পেলে কিছুতেই লিখতে পারতেন না। তাঁর ভাব তখন আসে আসি ক'রে আসতে পেত না। এই দোয়াতটি কালো কাঠের তৈরী, একে তিনি সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে কিনেছিলেন। বাইরে কোথাও যেতে হ'লে তিনি এই দোয়াতটি সঙ্গে নিতে ভুলতেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনাকে নাড়িয়ে দেবার জন্য লাল কালি ছাড়া লিখতেন না। ফলে তাঁর লেখা হ'তও তাই। সাঁবুর প্রতিভা তখনই খুলে যেত যখন তিনি তাঁর প্রিয় পুরু ও মসৃণ বিশিষ্ট কাগজ লিখবার জন্য পেতেন। এক কাগজ তিনি বিশেষ ফরমায়েস ক'রে তৈরী করাতেন এবং তার দাম এক সিটের দাম এক আনা ক'রে।

আরো অনেকের খেয়ালের কথা বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে পুঁথি বেড়ে যায় ব'লে ক্ষান্ত দিচ্ছি।

মানুষের গুপ্ত-শত্রু

মহাভারতে ধর্ম্মরূপী বক যুধিষ্ঠিরকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি এই "সব চেয়ে আশ্চর্য্য কথা কি'? তাহার উত্তরে পরমধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—' প্রাণী মাত্রেই নিত্যই মরিতেছে; তবুও যাহারা অবশিষ্ট বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহারা আশা করিতেছে যে, অন্ততঃ তাহারা মরিবে না,—ইহাই এ জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা।"

যাঁহারা ডাক্তারি করেন, তাঁহারা জানেন যে, আমাদিগের জন্য, চারিদিকেই মরণের ফাঁদ পাতা আছে—ঘরে বাহিরে সব জায়গাতেই। যাঁহারা চিকিৎসক নন, তাঁহারা এ কথা না জানিতে পারেন কিন্তু কথাটা একটুও বাড়াইয়া বলা কথা নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য কথা।

কেহ তোমাকে ছুরি মারিতে আসিলে তুমি সে শত্রুকে দেখিতে পাইয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতে পার, কিন্তু প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও গুপ্তশত্রু আরও ভয়াবহ।

আমাদের ঘরে ঘরে যে প্রাণীরা রোগের বাহন স্বরূপ বিরাজ করে, সকলে তাহাদিগকে চিনেন না, তাই তাহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য, সেই শত্রুগুলির তালিকা দিলাম :—

গরু—গোদুগ্ধ ও মাংস হইতে ক্ষয়কাশ হইতে পারে।

ঘোড়া—আস্তাবলে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ পাওয়া যায় এবং ঘোড়ার গ্লাণ্ডাস রোগ মানুষেরও হয়।

বিড়াল—হইতে ডিফ্‌থিরিয়া (কণ্ঠনালীর) রোগ হইতে পারে।

কুকুর—কামড়াইলে জলাতঙ্ক হাইড্রোফোবিয়া হয়।

ভেড়ার—লোম পশম হইতে অ্যাকটিনোমাইকোসিস বা অ্যানথ্যাকস হয়।

ইন্দুর—গায়ের মাছি কর্ত্তৃক প্লেগ ছড়াইয়া পড়ে।

ছারপোকা—দ্বারা কালাজ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

মশক—দ্বারা ম্যালেরিয়া, বাত শিরার জ্বর ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ে।

মাছি—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

পিপীলিকা—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড রোগের বীজ ব্যপ্ত হয়।

স্বাস্থ্য, ফাল্গুন।

ইজিপ্টের নারীশক্তি

নারীদের জীবনের ধারা সনাতনের পথ ছেড়ে নূতন পথ ধ'রে চল্‌বার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে এবং তার জন্য যে সাড়া প'ড়ে গেছে তার ঘা লেগে সমস্ত দুনিয়া আজ থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছে। আফ্রিকাতেও এই জাগরণের চাঞ্চল্যের ঢেউ গিয়ে পৌঁচেছে এবং পৌঁচেছে যে তার প্রমাণ একান্ত ভাবেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে সেখানকার নারী-কর্ম্মীদের কাজের ভিতর দিয়ে।

১৯১১ সালে এই সাড়াটার চাঞ্চল্য সেখানে প্রথম অনুভূত হয়। জনকয়েক মহিলা মিলে সে সময় একটা "নারী-সঙ্ঘ" গ'ড়ে তুলেছিলেন। তার নাম "La Femme Nouvelle' বা "নবনারী"। তখন নারীদের আন্দোলনের শক্তি বোঝা না গেলেও ১৯১৯ সালে তাদের আন্দোলন যে শক্তি অর্জ্জন ক'রেছে তাকে অস্বীকার ক'র্‌বার জো নেই। একদল-মহিলা ইজিপ্টের স্বাধীনতার জন্য আত্মসমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে এই সময় যে নারীসমিতিটি গ'ড়ে তুলেছিলেন আজ তার প্রভাব সমস্ত ইজিপ্টকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। এই নারীসমিতি ইজিপ্টের অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলমান খৃষ্টান অনেককেই দলে টেনে এনেছেন; মনের ভিতর বড় হবার স্পৃহা জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার বিস্তার ক'রে এঁরা মধ্য-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জীবন সঞ্চার ক'রেছেন; এঁদের সাধনা কৃষকদের হৃদয়ও নূতন ধরণের আশা-আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন সোফিয়া হানুম। সোফিয়া খুব বড় ঘরের মেয়ে। এঁর বাপ মুস্তাফা পাশা সাহমী দ্বিতীয় আব্বাস হিলমার সময় পনর বৎসর ধরে প্রধান-মন্ত্রির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বাপের দিকের পরিচয়ের চেয়ে এঁর স্বামীর দিকের পরিচয়ের গৌরব আরো বেশী। ইনি সৈয়দ জগলুল পাশার সহধর্ম্মিণী। যে জগলুল পাশা ইজিপ্টকে মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তুলেছেন। জগলুল পাশার দ্বিতীয় বারের নির্ব্বাসনের পর ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে সোফিয়া হানুম স্বামীর পরিত্যক্ত পতাকা তুলে ধ'রে তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। সোফিয়ার চারি পাশে এসে জড়ো হ'য়েছেন সেইসব রমণী যাঁদের স্বামীরা জগলুল পাশাকে সাহায্য করার অপরাধে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হ'য়েছেন।

সোফিয়া যে গৃহে বাস করেন তাকে 'জাতীয় মন্দির' নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান রাজা বাদ্‌সা বেগম সাহেবাদের নামের সঙ্গে বিলাস এবং ঐশ্বর্য্য এমন ভাবে জড়িত যে এগুলো ছাড়া তাঁদের কল্পনা করা দস্তুর-মত কঠিন হ'য়ে ওঠে। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই "জাতীয় মন্দিরে"ও বিলাসের আতিশয্যের অভাব থাক্‌বে না, সেখানেও শ্বেতপাথরের ফোয়ারা হ'তে গোলাপ জলের উৎস উৎসারিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, বাঁদীদের বীণায় সুরতরঙ্গ ঝঙ্কৃত হচ্ছে, দুয়ারে দুয়ারে মুক্তকৃপাণ হাতে খোজা প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আসলে এ সকলের বাহুল্য "জাতীয় মন্দিরে" কিছু মাত্র

নেই। খোজার বদলে সেখানে একালের আটপিঠে পরিচারিকারা সমস্ত ব্যাপারের খবরদারী ক'রে বেড়ায়; বিলাসী, ভয়কাতুরে, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছে পড়া মেয়েদের বদলে সেখানে গিয়ে জড়ো হ'য়েছেন যত তেজস্বিনী ও নির্ভীক স্বার্থত্যাগী রমণী।

জগলুল পাশার সহধর্ম্মিণীর চেহারার ভিতরেও তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট। চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—গোলগাল মুখখানিতে বাঁশীর মত সরু হ'য়ে নাক নেমে এসেছে। দেশের এই নিদারুণ উত্তেজনা এবং সঙ্কটের মুহূর্ত্তে তাঁর চার পাশের আর সকলে যখন উত্তেজিত ও চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে, তখনও তাঁর ভিতরে কোনই চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। আপনার পরিপূর্ণ মহিমায় তিনি স্থির হ'য়ে আছেন, কণ্ঠস্বর কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে চল্‌বার সাহস পায় না। তাঁর মনের দৃঢ়তা যে কতখানি বেশী, তা তাঁর স্বামীর বন্দী হওয়ার পর তিনি যে কথাটা বলেছিলেন তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, নিজের ঘরে আমি বন্দী, এ বন্দীত্বের শিকল আমি স্বেচ্ছাক্রমেই পরেছি। আমার স্বামী দূরে আটক হ'য়ে আছেন কিন্তু আমি এখানে আছি—তাঁর স্ত্রী, তাঁর সহধর্ম্মিণী—তাঁরই পরিত্যক্ত জায়গা গ্রহণ করবার জন্যে।

জগলুল পাশাকে ১৯২১ সালের ২২শে ডিসেম্বর বন্দী করা হয়। তখন তাঁকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবার জন্য তাঁর প্রাসাদ ঘিরে দেশের লোক বিদ্রোহী হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমে সোফিয়া হানুম স্থির ক'রেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তিনিও নির্ব্বাসন-দণ্ড বরণ ক'রে নেবেন। কিন্তু তাঁর নিজের বাড়ীর দোরেই যখন বিদ্রোহীদের একটি পনেরো বৎসরের বালক গুলির আঘাতে মারা প'ড়ল, তখনই তাঁর সঙ্কল্প ঘুরে গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলেন, তাঁকে দিয়ে তাঁর স্বামীর যে প্রয়োজন, তার চাইতে ইজিপ্টের প্রয়োজন অনেক বেশী। স্বামীর পরিত্যক্ত কর্ত্তব্য ভার মাথায় তুলে নেবার জন্যই তাঁর স্বামীর সঙ্গ গ্রহণ করা চল্‌বে না। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোঁতে গিয়ে ব্রিটিশ হাই-কমিশনারকে ডেকে পাঠা'লেন। সেক্রেটারী এসে টেলিফোঁর চোঙ ধরতেই তিনি বল্‌লেন, "লর্ড এলেন্‌বীকে আপনি জানাবেন, আমি কায়রোতেই থাক্‌ব এবং আমার স্বামীর স্থান গ্রহণ করবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব। আপনারা আমার স্বামীর দেহটাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করতে পারবেন; কিন্তু তাঁর আত্মাকে নির্ব্বাসিত করতে পারবেন না। তাঁর নিজের ঘরেই সে আত্মা জেগে থাক্‌বে যতদিন সৈয়দ ফিরে না আসেন, ততদিন আমি তাঁর স্থান অধিকার করে থাক্‌ব। দীর্ঘকাল আপনারা তাঁকে নির্ব্বাসিত করে রাখতেও পারবেন না, এদেশের জনসঙ্ঘই তা হ'তে দেবে না। তবে যদি তিনি মারা যান, তবে তখন বানের স্রোতের মত লোক জেগে উঠ্‌বে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, ইজিপ্টের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের বহ্নি জাগিয়ে তুল্‌তে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে আজ হ'তে চেষ্টা কর'ব। এর বেশী আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।"

এর একঘণ্টা পরে স্বামীর সঙ্গ নেবার অনুরোধ জানিয়ে তাঁর কাছে হাই-কমিশনারের চিঠি এসে হাজির হ'ল। এই চিঠির উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, অনেক সংবাদ-পত্রেই তা প্রকাশ হ'য়ে গিয়েছে।

সোফিয়া হান্নুমের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিষপত্রের ভিতরেও বিদেশী কোনো দ্রব্যের স্থান নেই। তাঁর সব জিনিষ স্বদেশী। বেশীর ভাগ তাঁর নিজের ঘরে তৈরী হয়। কোনো অভ্যাগত বাড়ীতে এলে তিনি তাকে অভ্যর্থনা করেন ঘরের তৈরী খাবার দিয়ে, বিদেশী কেক প্রভৃতি তাঁর ঘরে চলবার জো নেই। তাঁর এই স্বদেশীর মূলে রয়েছে 'বয়কট।' নেতারা যখন তাঁদের দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত হলেন, তখন তার প্রতিবাদস্বরূপ মহিলাসঙ্ঘের দ্বারাই এই বয়কটের আন্দোলন সুরু হয়। নব-নারী-সঙ্ঘের (La Femme Nouvelle) এবং মহম্মদআলি সোসাইটির বহু বিখ্যাত মহিলা ব্রিটিশপণ্য বয়কট করার কাজে তখন একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ জন্য তাঁরা যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা একান্ত ভাবেই আধুনিক। ছয় জনে মিলে টেলিফোঁতে কথা চালিয়ে প্রথমে এই পথ গ্রহণ করার কথা ঠিক করে ফেলেন। তার পর দুপুরে ২৪ জন মহিলা নিয়ে গঠিত একটা দল নিজেদের মোটরকার ও গাড়ীতে করে গিয়ে হাজির হন একেবারে কায়রো এবং আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বড় বড় দোকানীদের কাছে। প্রথমে অবশ্য তাঁদের ভাগ্যে যে জিনিষটা জুটেছিল তা উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দোকানীদের হার মানতে হল। অবশেষে তাঁরাই রমণীদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কায়রোতে চল্লিশজন মহিলা নিয়ে এই বয়কট কমিটি গড়ে' উঠেছে, এ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশেও এর শাখা-কমিটি গঠিত হয়েছে। গত মে মাসে এঁদের একটা সম্মিলনী হয়েছিল। এই সম্মিলনীতে দেশের সমস্ত স্থান হ'তে প্রায় দুই হাজার মহিলা এসে যোগ দিয়েছিলেন। এই বয়কটের কালে প্রথম কয় মাসে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হয়েছে তার বহর বড় কম নয়। তার পর গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন এবং ব্রিটিশ প্রোটেক্‌টোরেট তুলে নেবার ফলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা অনেকটা কমে' গিয়েছে। তবুও ব্যবসায়ীরা এখনও বিদেশীর সঙ্গে এমন কোনো ব্যবসা করতে পারে না যাতে স্থানীয় ব্যবসা নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। স্বীকার করুক আর নাই করুক, এই ব্যাপারের পর থেকে অনেক বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় ঢের কমে গিয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই বয়কট-ব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম বহি-উদ্‌দীন—বে বরাকং। ইনি খুব বড ও প্রতিপত্তিশালী ঘরের মেয়ে। ইনি যে কিরূপ ভাবে বয়কট চালিয়েছেন তার একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন রাস্তার আর একদিক থেকে ইনি দেখতে পেলেন দুইজন ইজিপ্‌সিয়ান্ ভদ্রলোক জিনিষ কিনবার জন্য একটি ইংরেজের দোকানে ঢুকলেন। কোনো ইতস্ততঃ না করে' তিনি সটান্ রাস্তাটুকু পেরিয়ে এসে তাঁদের বল্লেন, "মশাইরা ইংরেজের পণ্য কিনবেন না।" মুখ তাঁর ঘোমটায় ঢাকা, বয়স বিশ বাইশ বৎসর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য্য বসনের বাঁধনকে ছাপিয়ে উথলে প'ড়ছে। ভদ্রলোক দুটির আর জিনিষ কিনবার সামর্থ্য রইল না। দামী জিনিষগুলো তাঁরা ক্রুদ্ধ দোকানীর টেবিলের উপর রেখে দিয়ে দোকান হ'তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোম্‌টা-পরা নারীদের পক্ষে পুরুষকে এমন ভাবে সম্বোধন করা ইজিপ্টে লজ্জাকর

ব্যাপার। কিন্তু ধীরে ধীরে এসব কুসংস্কার ব্যাঙাচির লেজের মত খসে পড়ছে।

জগলুল পাশার পত্নী সোফিয়া হানুম বলেন, তাঁর স্বামী নারীদের রীতি নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার। তাঁর নিজের মতও হচ্ছে এই যে ঘোমটার সঙ্গে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নেই। ঘোমটাটানা প্রথাটাকে যত শীঘ্র সম্ভব তুলে দেওয়া সঙ্গত। পুরুষের সাম্‌নে বক্তৃতা কর্‌বার সময়েও তিনি নিজের মুখ ঘোমটায় ঢেকে রাখেন না। একটা পর্দ্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যা তাঁর বল্‌বার তা ব'লে যান। সাধারণতঃ তাঁর বক্তৃতার বিষয় থাকে ইজিপ্টের স্বাধীনতা। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রাণের আবেগ, ব্যথা ও বেদনা যখন শব্দময় হ'য়ে বেরিয়ে আসে তখন শ্রোতাদের পক্ষে চোখের জল বন্ধ ক'রে রাখা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠে।

নব্য নারীসম্প্রদায়ের চেষ্টায় সমাজ ও শিক্ষার দিক্ দিয়ে ইজিপ্টের এই অল্পদিনের ভিতরেই অনেকখানি উন্নতি হ'য়েছে। তাঁদের এই বৃহত্তর জীবনের প্রভাবে দেশের অনেক বৈষম্যও বিদূরিত হ'য়েছে। দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আজ সহজেই কাজের ক্ষেত্রে এক হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌ছে। মিলনই যে শক্তি এ তারা আজ বেশ বুঝতে পেরেছে সুতরাং ধর্ম্মে গোঁড়ামী কাজের সময় এক হ'য়ে দাঁড়াবার পক্ষে আর বাধার সৃষ্টি কর্‌তে পারে না।

La Femmo Nouvelle বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ব্যবসা-বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, এম্‌নি হাজার রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে' তোল্‌বার ভার এঁরা গ্রহণ করেছেন। আমেরিকার আদর্শে কায়রোতে একটি সামাজিক ক্লাবের গোড়াপত্তন কর্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে এজন্য যে চাঁদা উঠেছে তার পরিমাণ সম্ভবতঃ পঞ্চাশ হাজার ডলারের কম হবে না। এই বিরাট্ স্ত্রী-সঙ্ঘটিতে জ্ঞান, অর্থ এবং বুদ্ধির দিক্ দিয়ে যে-সব লোক দেশের সেবা :তাঁরাই এসে জড় হয়েছেন। এঁদের উদ্দেশ্য—দেশের সব রকম কল্যাণের কাজে এঁরাই উৎসাহ ও রসদ জুগিয়ে চল্‌বেন। কায়রো হ'তে নূতন জীবনের ধারা এবং ভাবপ্রবাহ সমস্ত বড় বড় সহরগুলিতে সঞ্চারিত হবে।

কিন্তু তথাপি এখনো ইজিপ্টের এই নব-নারী-সমাজ কেবল মাত্র শক্তিই সঞ্চয় ক'রে চলেছেন ; ক্রমাগত অজ্ঞতা, রীতিনীতি, সংস্কার এবং পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। যে নূতন নারী-শক্তি ইউরোপে আমেরিকায় চীনে জাপানে সমাজ এবং শাসনতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে তাকে নূতন ক'রে গড়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, ইজিপ্টের নারী-সমাজও আজ সেই শক্তির ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন।

প্রবাসী (ফাল্গুন)

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

(ভদ্র ও কৃষক সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ)

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কোন্ কোন্ স্থানে পরিবর্ত্তনের আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটী যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন নিম্নে

আমরা তাহার মোটামুটি বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। কোর্ফা প্রজা ও বর্গাদার ইত্যাদি যাহারা ভূমি চাষ করে তাহাদের ঐ ভূমিতে সাধারণ রায়তীস্বত্বের উদ্ভব হইবে।

২। প্রজাগণ তাহাদের রায়তী স্বত্ব যাহার ইচ্ছা তাহার নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। যে মূল্যে জোত বিক্রয় হইবে তাহার সিকি পরিমা টাকা মালীক নজর স্বরূপ পাইবেন।

৩। যদি প্রজা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির নিকট জোত বিক্রয় করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শতকরা দশ টাকা বেশী দিয়া মালীক তাহা নিজে ক্রয় করিবার অধিকারী হইবেন।

৪। বর্গাদারগণ শস্য দেওয়ার পরিবর্ত্তে জমির মালীককে টাকা দ্বারা খাজনা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন। পার্শ্ববর্ত্তী নিরখ অনুসারে সাধারণতঃ তাহার ঐ জমির খাজনার পরিমাণ ধার্য্য হইবে।

৫। বর্গা জমির নিরিখ ধার্য্য কালে জমা মালীক শস্য দ্বারা নিজের পারিবারিক উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন কি শস্য বিক্রয় করেন তদ্বিষয়ে আদালত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৬। ১৯২২ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে বর্গাদার ও ভূমির মালীকের কোনও রেজিষ্টারীযুক্ত চুক্তিপত্রদ্বারা কোনও বিশেষ চুক্তি না হইয়া থাকিলে এবং বর্গাদার নিজ হাল গরু দ্বারা চাষাবাদ কার্য্য চালাইলে ঐরূপ প্রত্যেক বর্গাদারেরই ঐ ভূমিতে রায়তী-স্বত্ব জন্মিবে।

৭। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের বিচার দেওয়ানী বিভাগে না হইয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা কালেক্টরী বিভাগে হইবে।

৮। জোতান্তর্গত অধিকাংশ গাছ কাটিবার ক্ষমতা প্রজাগণের থাকিবে।

৯। আংশিক মালীক তাঁহার অংশের জন্য খাজনার ডিক্রী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

১০। পতিতাদিঃ পত্তনদার জোতদারগণের স্থায়ী স্ব-স্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবগুলি আইনে পরিণত হইলে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইবে—মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় ও কৃষকশ্রেণীর কি সর্ব্বনাশ হইবে দেশের লোক তাহা চিন্তা করুন। মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের কি উপায়ে সুবিধা হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোন আইন করা প্রয়োজন বোধ করেন না অথচ তাহারা উৎসন্ন যাইতে পারে এমন আইন প্রস্তুত হইতেছে।

আইনের যদি কোন ভাল উদ্দেশ্যও থাকে তাহা ব্যর্থ হইবে। এই আইনের বলে মহাজনগণ দরিদ্র ঋণভারগ্রস্থ কৃষি প্রজার সমুদয় জোত জমি খরিদ করিয়া লইবে এবং তাহারা নিজেরা ঐ সমস্ত কৃষককে চাকর রাখিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে হাল গরু দিয়া জমির শস্য উপভোগ করিবে। আইনের বলে এই সমুদয় মহাজন প্রবল শক্তিশালী হইবে আর দরিদ্র কৃষকশ্রেণী ভূমিশূন্য চাকর মজুরে পরিণত হইয়া দেশের দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। এই আইনের ইহাই প্রথম নম্বর! দ্বিতীয় নম্বর, যে সমুদয় মধ্যবিত্ত লোক বর্গাজমীর সাহায্যে উপজীবিকা সংগ্রহ করে তাহারা সম্পূর্ণ বেকার হইয়া যাইবে। আইনে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার একটা বিধান আছে বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া কি কার্য্য করা হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই সুতরাং বিবেচনা করার কথা বলা শুধু একটা ধোকা মাত্র।

আমরা প্রস্তাবিত আইনের মোটামুটী

খসড়া ও উদ্দেশ্য পাঠকের সামনে ধরিলাম। আপনারা ধীরভাবে ইহা চিন্তা করুন। প্রস্তাবগুলি আইনে পরিণত হইলে দেশ যে অচিরেই উৎসন্ন যাইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ভিতরে ইহার আরও যে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে স্বতঃই তাহা আশঙ্কা হইতেছে। দুর্ব্বল দরিদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় প্রবল ধনী মহাজনদের অত্যাচারে আরও নিষ্পেষিত হইতে থাকিবে —এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব অচিরে লোপ পাইবে। এই দুই শ্রেণীর পরিবর্ত্তে গ্রামে গ্রামে কতকগুলি বড় বড় মহাজন ও মণ্ডলের সৃষ্টি হইবে এবং তাহারাই হাল গরু রাখিয়া কৃষক চাকর দ্বারা জমি চাষ করিয়া দেশের উপর আধিপত্য করিতে থাকিবে। সরকার হয়ত মনে করিতেছেন এই কয়েকটী প্রভুত্বশালী লোক হাতে রাখিতে পারিলেই অপ্রতিহত ক্ষমতায় আবহমানকাল দেশের শাসন চালাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ বণিকগণই এ দেশের প্রধান মহাজন—তাহাদের বহু টাকা পয়সা এ দেশের লোক ধার করিয়া থাকে। এই সমুদয় বণিক অদূর ভবিষ্যতেই ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জোতজমী নীলামে ক্রয় করিতে পারিবেন এবং হাল গরু রাখিয়া কৃষক মজুরদ্বারা জমি চাষ করাইতে পারিলেই আইনের বলে তাহারাই সমুদয় জমির মালিক হইতে পারিবেন। ইংরাজ বণিকগণ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়াও এই রূপে কৃষকদের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেরাই দেশের সমুদয় ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত আইনের এই উদ্দেশ্য আছে কিনা তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু প্রস্তাবগুলি আইনে পরিণত হইলে অদূর ভবিষ্যতেই ফল যে এই রূপই হইবে তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই।

স্বরাজ—পাবনা।

গ্রাম্য-সমাজ চলিবে কি করিয়া

পূর্ব্বে গ্রাম্য সমাজ যে পদ্ধতিতে চলিত, এখন অনেকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কারণ তখন সে পদ্ধতি পল্লীর জল বায়ুর সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়াছিল যে, তাহাকে ব্যক্ত করিয়া একটা স্বরূপ দিবার তখন আদৌ প্রয়োজন হয় নাই। এখন সেই পদ্ধতিকে ব্যক্ত করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের পল্লীজীবন যতটা সহজ ও সরল ছিল এখন আর সেই পরিমাণে সহজ ও সরল নাই। উহা অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। হইবার কথাও, যেখানে একটা সুস্থ মন ও সবল প্রাণ ছিল, সেখানে একটা কৃত্রিম দুর্ব্বল জীবন দেখা দিয়াছে। সুতরাং গ্রাম্য সমাজ কি উপায়ে করস্থাপন করিয়া নিজেদের কাজগুলি সুশৃঙ্খল-পদ্ধতিতে চালাইয়া লইবে, তাহার আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের পল্লী-সমাজ চিরকালই বিচিত্র উপায়ে নূতন নূতন অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃত্তি, মুষ্টিভিক্ষা, মার্জ্জা, কয়ালী প্রভৃতির সহিত আমরা বাঙ্গালা দেশে বিশেষ পরিচিত। মসজিদ ও আরবী স্কুল রক্ষণের জন্য মুসলমানের কর-স্থাপন প্রসিদ্ধ। এই সকল অর্থ সংগ্রহের উপায় প্রচলনের দ্বারা এক দিকে যেমন পল্লীবাসীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তাহাদের স্বাবলম্বনের শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। এই গুলিকে নূতন অভাব ও আদর্শের অনুযায়ী করিয়া ফিরিয়া পাইলে আমাদের গ্রাম-সংস্কার বিষয়ে আর অর্থের অভাব হইবে না।
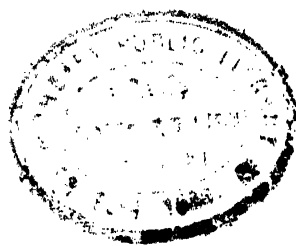
সেণ্ট অগষ্টিন।

(বিশ্বাস ও নির্ভরতা)

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যে সকল কর স্থাপনের উপায় প্রচলিত ছিল, তাহার কয়েকটী এখানে নির্দ্দেশ করা যাউক—

(১) প্রত্যেক বহির্মুখী খড়ের গাড়ীর উপর দুই আনা।

(২) প্রত্যেক বিঘা জমীতে পাঁচ সের কাবরা চাউল।

(৩) প্রত্যেক ভিটার জন্য দুই আনা।

(৪) প্রত্যেক শিল্পীর নিকট চারি আনা।

এই উপায়ে গ্রাম্য-সমাজের ভাণ্ডার পূর্ণ হইত। গ্রামের খাল ডোবা ও পুষ্করণী খনন বা সেগুলির উন্নতির জন্য গ্রামবাসিগণের জমির হিসাবানুযায়ী কর ধার্য্য করা হইত।

গ্রাম সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে—

(১) গ্রামের নিকটস্থ সাধারণ জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, ঘাস কাটা ইত্যাদির জন্য সামান্য কর ধার্য্য করা।

(২) সাধারণের পুকুরে হাঁস চারণের জন্য কর।

(৩) বাজার কর (বা তোলা) যথা, প্রতি গরুর গাড়ীর পিছু এক আনা, প্রতি ঝাঁকা বা বোঝা পিছু এক পয়সা।

(৪) জলাভূমির ঘাসের জন্য কর স্থাপন।

(৫) সাধারণের জমিতে গাছ রোপন ও সাধারণের ফলন্ত গাছ জমা দেওয়া।

(৬) যে সকল গ্রামে তাঁতি আছে সেখানে প্রত্যেক তাঁত পিছু সামান্য কর।

(৭) কসাইয়ের নিকট হইতে প্রত্যেক ছাগল প্রতি দুই আনা।

(৮) পাঁন মাছ, ভেড়া ও ছাগলের মাংস বিক্রয়ের জন্য যে জমা দেয় তাহার নিকট হইতে কর আদায়।

(৯) গ্রামের খামারের কাছে শস্য মাড়াইএর সময়, পান সুপারী, আক কিংবা গুড়ের দোকানদারের নিকট কর আদায়।

(১০) গৃহস্থের বাড়ী ধানের তোলা তুলিয়া সেই টাকা দ্বারা গ্রাম্য কোন উৎসব, গ্রাম্য ধর্ম্মমন্দির বা গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা। এইরূপে গ্রামের আয় অনেক সময়ে ২০০৲ টাকা হইতে ৫০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গ্রামের টাকার অভাব নাই। তাহা নিয়োগ করিবার লোক ও পন্থার অভাব।

এই সকল পুরাতন উপায়গুলি ভিন্ন এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী আরও অনেক উপায় আছে। যেমন fishery, poultry, diary প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য ব্যবসায়গুলি বর্ত্তমানকালের বিশেষ উপযোগী। গ্রাম্য-সমাজ স্থানীয় জমীদারদিগের নিকট হইতে অপরিস্কৃত পুষ্করিণীগুলি জমা লইয়া সেগুলিতে মৎস্য পালন করিবেন। তাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যও উন্নত হইবে, আয়ের পন্থাও বাড়িবে। তারপর, পশুপক্ষীপালন—যাহাকে ইংরাজিতে poultry বলে, তাহাতেও গ্রামের অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। গ্রামের গো-মহিষ রক্ষা করিবার ভারও গ্রাম্য-সমাজ গ্রহণ করিবেন, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া cowbreeding অর্থাৎ গরুর বংশবৃদ্ধি ও রক্ষার চেষ্টা করিবেন। এইরূপ নানা উপায়ে গ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার অনেক পথ আছে।

বাঙ্গালার কি ছিল বা কি ছিল না, তাহা আলোচনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার

প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালার কি আছে এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। অনেক স্থলেই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ শ্যাম শস্যক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি ছিল, গাছে ফল ছিল, খড়ের ছাউনি ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজগাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। এখন এ সকল কিছুই নাই। পল্লীর মাঠ ঘাট এখন শ্মশান, পল্লীর কৃষকেরা এখন রোগ-জীর্ণ, ঋণভারগ্রস্ত, বিষাদক্লিষ্ট। পল্লীর মাঠে আবার বসন্তের হরিৎ-শ্রী ফিরাইয়া আনিতে হইলে, কৃষকের মুখে আবার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উপায় নাই। বাঙ্গালার যে সব নর-নারায়ণ এখনও অনন্ত শয়নে শুইয়া আছে, তাহাদিগকে জাগাইবার মন্ত্র ধ্বনিত করিয়া বলিতে হইবে—

"লক্ষ্মীর কোমল কর পল্লব পরশে,
অনন্ত শয়নে আছ নিদ্রার আবেশে,
হৃতলক্ষ্মী হের আজি মেলিয়া নয়ন
প্রলয় পয়োধি জলে জাগ নারায়ণ।"

রাজ বন্দীর জবানবন্দী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে—রাজার মুকুট; আর ধারে—ধূমকেতুর শিখা।

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর এক জন সত্য, হাতে ন্যায় দণ্ড।

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত, রাজ-বেতনভোগী রাজ কর্ম্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে' সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে, কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহা-বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে আইন বিশ্বমানবের সত্য উপলব্ধি হ'তে সৃষ্ট। সে আইন সার্ব্ব-জনীন সত্যের, সে আইন সার্ব্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার পক্ষে—আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে—রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ; আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত্ত সৃষ্টিকে মূর্ত্তি-দানের জন্য ভগবান-কর্ত্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে

সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান অনির্বাণ সত্য স্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা যে বীণায় চির সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙ্গলেও ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্গবে কে? একথা ধ্রুব-সত্য, যে সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধ'রে আছে এবং চিরকাল ধ'রে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিত আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে কা'ল হয় ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

যাক্ আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নিয়ম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রে যিনি বাজান, সে বীণায় যিনি রুদ্র বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে,—কিন্তু কোনো কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আরেক বাঁশী নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফুটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তার বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দী করবার মত পুলিস বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে; তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি, তার সত্যকে অনুবাদ করতে পারেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত্ত বিশ্ববাসী পক্ষের আমি সত্য তরবারী, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখছি—আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি

দাঁড়িয়ে নই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্যবিচারক হ'তে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন করে যে দিন খৃষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করা হ'ল, গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল, সে দিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁহাকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নৈলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয় রাজ ভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি,—এই যে বিচারাসন এ কা'র? রাজার না ধর্ম্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে?—রাজা-না—ভগবান? অর্থ না আত্ম-প্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীন বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্তঊষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ততারা আর উদয় তারার আলোর মিলন হবে কি না বলতে পারি না,—আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জ্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ ত ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎ-পীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রনা-চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রিকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্ত্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার

মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তা হলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বল্‌তেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার বা প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের জাতির দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে —তার জন্য ঘরের বাইরের বিদ্রূপ, অপমান লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছু ভয়েই নিজের সত্যকে আপনার ভগবানকে হীন করি নাই, লাভ লোভের বশবর্ত্তী হয়ে আত্মউপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্ম-প্রসাদকে খাটো করি নাই কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয় সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্মা উপলব্ধির আত্ম বিশ্বাসের চেতন-লব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোক-ভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করুতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারিনা! তা হলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহমন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেইত লোকে এ মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয় তূর্য্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল। সে সর্ব্বনাশা নিশান পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণরূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিল। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব্ব-সূচনা। তাই আমি নির্ম্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম তাঁর তূর্য্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছি-লাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাঙলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূততূর্য্য-বাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জান্‌তেন, * * প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজ্‌বে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্ব্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-দীন বুকে লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে তাঁর মরণনাচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আবার শ্রান্ত আমায় সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সে দিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমি আবার তাঁর তরবারীছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত উষার আশা আনন্দে আমার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি, হাসিগানের কল্লোলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলব।

চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশ মণি দিয়ে নির্য্যাতন লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্ত্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবেনা। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।

কারাগারে বন্দিনী মায়ের আমার আঁধার শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানিনা, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।

আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি—

ঐ অত্যাচারীর সত্য-পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য-আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
প্রেসিডেন্সি জেল; কলিকাতা
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩
রবিবার—দুপুর।

ছাড়-জোড়া

[ঘোষ]

বি, এ, পাসের পর বিনোদের পিতা তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন।

চুক্তি অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে দেনা পাওনা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া বিবাহের পর নূতন দাবী উপস্থিত হইলে কন্যার মাতা তাহা দিতে অস্বীকার করায়, পুত্রবধূর উপর কঠোরদণ্ডের আদেশের ফলে তাহাকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে স্থান দেওয়া হইল না। পিতার নির্ম্মম আদেশ পুত্র সম্পূর্ণভাবে পালন করিল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার নির্ম্মল চরিত্রে ভবিষ্যতের জন্য যে বিষের বীজ প্রোথিত করা হইল স্বার্থের বশে বিনোদের পিতা হরিমোহন তাহা বুঝিতে পারিল না।

বিনোদ পিতার একমাত্র পুত্র পিতার স্বচ্ছল অবস্থায় আদরে লালিত পালিত হইলেও তাহার নিষ্কর্ম্মা জীবনকে কর্ম্মময় করিয়া তুলিবার জন্য পিতার অজ্ঞাতসারে, কয়েকটি বন্ধুর পরামর্শে থিয়েটারের য়্যাকটার হইয়া একটা পেশাদারি থিয়েটারে যোগ দিল।

বিনোদের পিতা হরিমোহন পুত্রের এই অসঙ্গত কার্য্যে বাধা দিল না। রস চাতুর্য্যে নাটকীয় অভিনয়ে বিনোদ দর্শকের নিকট বাহবা পাইয়া নিজের জীবনকে কবিত্বময় করিয়া তুলিয়া ক্রমশঃ পিতার নিকট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল; অবস্থা বুঝিয়া হরিমোহন পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া নববধূ ঘরে আনিবার চেষ্টা

করিলে বিনোদ তাহাতে অস্বীকার করিল। তখনও হরিমোহন স্বীয় কৃতকার্য্যের ভুল সংশোধন করিয়া পুত্রবধূটীকে তাহার সংসারে স্থান দিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিল না।

তিন মাস বছর গুলি কাহারও প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইতে লাগল, বিনোদও ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরিমোহনের সংসারে তাহার বিধবা কন্যা কুমুদিনী আর তাহার বড় শালী বিনোদের মাসী, আর একটী চাকর একটী চাকরাণী। বৃদ্ধা মা মাতাকে রান্নার ভার না দিয়া কুমুদিনী নিজেই সে ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

সেদিন কুমুদিনী ভাত রাঁধিয়া উনুনে তরকারী চড়াইয়া বাটনা বাটিতেছিল। এই সময় বিনোদ আসিয়া বলিল "কুমো শিগ্‌গির ভাত দে।"

দিনের বেলায় বিনোদের ভাতের তাড়াতাড়ি থাকিত না, আজ অসঙ্গত প্রশ্নে কুমুদিনী বলিল "দিনে তার তোমাদের থিয়েটার হয় না ভাতের জন্য তাড়াতাড়ি কেন?

বিনোদ বলিল, "বিলাসপুরের বাবুদের ছেলের বিয়েতে আমাদের কোম্পানি অভিনয় করতে যাবে এখনি গাড়ী আসচে শিগ্‌গির ভাত দে।"

"একটু অপেক্ষা কর তরকারি চড়িয়েছি তরকারি সেদ্ধ হলে ভাত দিচ্চি।"

বিনোদের খাওয়ার আবশ্যকতা তরকারি ও উনুনের তাপ কেহই গ্রাহ্য করিল না ওদিকে গাড়ী আসিয়া গাড়ী হইতে তাগিদ আসিতে লাগিল।

বিনোদ না খাইয়া বিদায় হইতে উদ্যত হইলে কুমুদিনী বাধা দিয়া বলিল "একটু অপেক্ষা কর।"

বিনোদ কুমুদিনীর বাধায় বিরক্ত হইয়া বলিল "এতক্ষণ ব'সে কি কর্‌ছিলি?"

কুমুদিনী বলিল "এত আর আফিসের চাকরি নয়?"

"তুই থাম" বলিয়া বিনোদ যখন বাহির হইতেছিল, কুমুদিনী বলিল "বিলাসপুর যেতে গেলে তোমার শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়ের ওপর দিয়ে যেতে হয়। তুমি যাদের সঙ্গে যাচ্ছ তা'দের সঙ্গে নিয়ে সেখান দিয়ে যেতে তোমার লজ্জা কর্‌বে না? তাও না খেয়ে,—কেন এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

বিনোদের উৎসাহময় সচ্ছন্দগতি কুমুদিনীর কথায় কিছুক্ষণের জন্য বাধা প্রাপ্ত হইল। এমন সময় গাড়ী হইতে তাগিদ আসিল "বিনে আয় না?"

বিনোদ অদৃশ্য হইল।

কুমুদিনী তাহার পিতার সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া থাকার জন্য তাহার পিতা এবং ভ্রাতাকে, কোন দিনই ভাইবউটিকে আনার জন্য অনুরোধ করে নাই; তাহার মাসি সময় সময় সে কথা উত্থাপন করিলে, সে পিতার কার্য্যের সমর্থন করিয়াছে। আজ অনাহারে বিনোদ চলিয়া গেলে কুমুদিনীর হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। সে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিল, প্রকৃত অধিকারীনীকে বঞ্চিত করিয়া আমি স্বার্থের বশে যে অন্যায় করিতেছি এর প্রতিকার আমাকেই করিতে হইবে। কুমুদিনী নিজের ইচ্ছায় তাহার প্রতিকার করিয়া ফেলিল।

বৈশাখের শেষ, পল্লীর বনে জঙ্গলে লতা গুল্মে বসন্তের পূর্ণ বিকাশ। নব পল্লবিত তরু লতায় লতায় ফুল। পতিত জমী গুলিতে

ভাঁটের ফুল ফুটিয়া প্রমোদ উদ্যানের মত দেখাইতেছে। আম গা'ছে ছোট ছোট গুটী দেখা দিয়াছে, পাখির কাকলির মাঝে মাঝে কোকিলের তান। পল্লিশ্রীতে শ্রীময়ী বিনোদিনী তাদের মাঝ উঠানে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসিয়া বাসন মাজিতেছিল এই সময় সতীন্দ্র 'খুড়িমা' বলিয়া বিনোদিনীদের বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদিনীর 'মা কখন এলি বাবা' বলিয়া পিঁড়েতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলিল—"বস।"

বিনোদিনীর শ্বশুর বার বিঘা জমীর জন্য পুত্রবধূর উপর সমস্ত দোষ আরোপ করিয়া তাহাকে ঘরে আনেন নাই। আর আগন্তুক সতীন্দ্রের পিতা অর্থ লইয়া তাহাকে বাল বৌ দিয়াছিল বলিয়া অভিমানে সতীন্দ্র বৌটীকে বাড়ী আনিতে দেয় নাই।

যে সতীন্দ্র এত দিন রূপের ব্যাখ্যা রূপের পূজা করিয়া আসিয়াছে, বিনোদিনীর কাছে কত রকম রূপের কবিতা পড়িয়া শুনাইয়াছে আজ পঙ্কিল জলে তার সেই রূপতৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল না; সে মনে মনে বিনোদিনীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিল বিনোদিনীর অমূর্ত্ত রূপ; নিষ্ঠুর অন্ধ পুরোহিত পূজার যোগ্য বিবেচনা করে নাই। সে তাহার অতুলনীয় রূপের ধ্যান করিয়া সংযমী সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত যোগীর মত দূরে থাকিয়া কক্ষ-চ্যুত উল্কার মত অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তার উচ্চ উদার প্রেমের কথা শুনিয়া সংযতবাক্ বিনোদিনী সতীন্দ্রের ব্যর্থ জীবনের উপর প্রবল আঘাত করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছিল, সে আজ এক বৎসরের কথা। এতদিন সতীন্দ্র বিনোদিনীর কঠোর আদেশ ভঙ্গ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করি-বার সাহস করে নাই। সে ধ্যানী যোগীর মত দূরে থাকিয়া বিনোদিনীর রূপ ধ্যান করিবে আর স্বামী পরিত্যক্তা বিনোদিনী তার জীবন ধারা কোন অনির্দ্দিষ্ট সরল পথে চালাইয়া উভয়ে এক লক্ষে এক ভাবে জীবন যাপন করিবে এত উচ্চ আদর্শ বিনোদিনী উপেক্ষা করিয়া সতীন্দ্রকে অসম্ভ্রমের সহিত বিদায় করিয়াছে আজ তাহার পূর্ণ প্রতি-শোধের দিন আসিয়া উপস্থিত।

সতীন্দ্র বিনোদিনীর মায়ের প্রদত্ত মাদুরে বসিলে বিনোদিনার মা জিজ্ঞাসা করিল "কখন এলি বাবা?"

"আজ।"

"এবার পরীক্ষা দেওয়া শেষ হলো?"

"পরীক্ষার কি শেষ আছে খুড়িমা, কত পরীক্ষা আছে।"

"এমে পাশ কর্লেইতো কলেজের পড়া হ'য়ে গেল।"

মৃদু হাসিয়া সতীন্দ্র বলিল "হাঁ একরকম তাই বটে।"

"পরীক্ষার ফল কি হ'ল?"

"তা জান্তে এখন দুমাস বাকী।"

"পাশই হবে।"

"তোমার আশীর্ব্বাদ।"

বিনোদিনী মাজা বাসন ধুইয়া মুছিয়া রাখিতেছিল। তাহার তৎপর হস্ত দ্রুত সঞ্চালনে মাথার কাপড়ের সহিত চুলগুলি এলোমেলো হইয়া পৃষ্ঠের উপর পড়িয়াছিল, চুলের ফাক দিয়া গৌর কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সতীন্দ্র আসা মাত্র বিনোদিনী একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর লইয়া আপন কাজে গিয়াছে।

বিনোদিনীর প্রশ্ন "সতীন দা কেমন ছিলে?"

সতীন্দ্রের উত্তর—"ভালই ছিলাম।"

বিনোদিনী দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া যখন চলিয়া গেল তখন সতীন্দ্র যে সংকল্প মনে করিয়া এখানে আসিয়াছে তাহা বলিবার সলক্ষণ সুযোগ বুঝিল।

বিনোদিনীর মা সতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হারে সতীন আমাদের বিনোদের সঙ্গে কি তোর দেখা হতো?"

কোন্ বিনোদের কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন হইয়াছে তাহা সতীন্দ্রের বুঝিতে বাকী ছিল না। কথাটা ঘোরাল করিয়া বিনোদিনীকে সুস্পষ্ট শুনাইবার ইচ্ছায় উচ্চ কণ্ঠে সতীন্দ্র বলিল "কার কথা বলুচ খুড়িমা?"--কথাটা বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে বিনোদিনীর পানে চাহিল, বিনোদিনী তাহা দেখিয়া মোটেই গ্রাহ্য করিল না।

বিনোদিনীর মা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিলেন "আমার জামাই বিনোদের কথা বলুচ বাবা।"

বিনোদিনীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সতীন্দ্রও নির্ম্মম ভাবে বলিল, "সেই নরাধমকে তুমি আমার বলুচ খুড়িমা?"

যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সতীন্দ্র বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিল বিনোদিনীও প্রশ্নকর্ত্তাকে সেই বিশেষণের উপযুক্ত ভাবিয়া ঘৃণাভরে তাহার দিকে না চাহিয়া অন্য প্রসঙ্গ লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া বলিল—"মা কি রান্না করব?"

সতীন্দ্রের মমতাবর্জ্জিত উগ্র কথায় বিনোদিনীর মায়ের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

বিনোদিনীর কথার উত্তর না দিয়া সতীন্দ্রকে বলিল "হারে সতীন, তোর শাশুড়ী মাসে মাসে আমার জামাই বলে তত্ত্ব পাঠায়—কেউ তাকে এমন ক'রে ব্যথা দিয়ে কথা বলে না।"

সতীন্দ্র জবাব শুনিয়া একটু দমিয়া গেল কিন্তু যাকে আঘাত দিবার জন্য কথাটা বলা হইল সে অবাধে আঘাত সহ্য করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল আঘাত গুরুতর রূপে বিনোদিনীর মায়ের হৃদয়ে লাগিলেও তিনিও কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলেন না। সতীন্দ্র পিচকারী করিয়া যাহার অঙ্গে অসহ্য উত্তপ্ত সলিল ছড়াইল সে অবাধে তাহা সহ্য করিল কিন্তু উভয় পক্ষ হইতে উদাসীনতার ভাব দেখিয়া সতীন্দ্র নিজেই অসহ্য জ্বালা অনুভব করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল—"একটা জঘন্য নারীর সংসর্গে প্রায়ই তো দেখতে পাই।"

কথা বিনোদিনীর কানে গিয়াছিল কিন্তু সে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ—সতীন্দ্র তাহা বুঝিলেও বিনোদিনীর আত্মসংযমের কঠিন আবরণ ভেদ করা তাহার বাকশক্তিতে কুলাইল না। কিন্তু সতীন্দ্র ইহাতেও ক্ষান্ত হইল না, আজ বিনোদিনীর উদ্বেগ বিরহিত সরল ভাবকে দলিত করিয়া তাহার কঠোর বাক্যের প্রতিশোধ লইয়া সে যাইবেই।

কিছুক্ষণ বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া থাকার পর সতীন্দ্র বলিল—

"এমন জঘন্য স্থানে এমন সোনার কমল ভাসিয়ে দিলে কেন খুড়িমা?" দ্বিধা না করিয়া বিনোদিনীর মা বলিলেন—"সেও ত বাবা সোনার ছেলে যা দেখে দিতে হয় তাই দিয়েছে, এমন ভাল ছেলে মন্দ হলো সেটা আমার কপাল!

মৃদু হাস্যে সতীন্দ্র বলিল "কপাল তোমার কি আর কার তার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে যার বিয়ে জমি নিয়ে তা দিলেই তো সব গোল চুকে যেত।"

কথাটা বিনোদিনীর স্বপক্ষে বিপক্ষে দু' ভাবে বলিয়া সে বিনোদিনীর দিকে চাহিল।

বিনোদিনী সতীন্দ্রের এই বাচালতার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদিনীর লজ্জাসঙ্কুচিত ভাব নয় তাহা সতীন্দ্র বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল,—বিনোদিনীর নিশ্চিন্তভাবে সতীন্দ্রের ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়া যাইতেছিল।

বিনোদিনীর মা সতীন্দ্রের কথায় অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহকারে বলিলেন "সতীন, ক'বিঘে জমীর কথা বলচ' ওতো আমি দিতেই চেয়েছিলাম কিন্তু ঐ মেয়ে—"

"ওঃ—ওঃ বিনু দিতে দেয় নি।"

বিজ্ঞের মত বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া সতীন বলিল "বিনু ভাল করনি।"

বিনোদিনী সতীন্দ্রের কাছে কিছুদিন লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সেই খাতিরে সে তাহাকে সম্মান করিয়া থাকে। আজ হঠাৎ তাহার মঙ্গলকামী হইয়া সতীন্দ্র প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মধ্য দিয়া তাহার উপর যে কটাক্ষ করিতেছিল এবং কথার আঘাতে তাহার মাকে যন্ত্রণা দিতেছিল, বিনোদিনী ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইলেও এতক্ষণ তাহা প্রকাশ করে নাই।

সতীন্দ্রের অযোগ্য সান্ত্বনা সহ্য করিতে না পারিয়া বিনোদিনী বলিল "মন্দ করা দেখ্‌লে কোথায় সতীনদা?"

বিনোদিনীকে উত্তর দিতে বাধ্য করিয়া পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে সতীন্দ্র বলিল "ভবিষ্যৎ ভেবে কাজটা কর্‌তে পার নি বিনু।"

মাঝ উঠানে একটা গাই বাঁধা ছিল গাই দুইবার জন্য ভুবন ঘোষ বাড়ী প্রবেশ করিলে বিনুর মা উঠিয়া গেল।

বিনু তখন উঠিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "ঝগ্‌ড়াটে মেয়ের মত যা'তা বকচ কেন সতীনদাদা! ব'য়ের বোঝা ব'য়ে সবে মাত্র বাইরে এসে দাঁড়িয়েছ এখন সংসারের অবস্থা বুঝে চল্‌বার মত হওনি। জমি বার বিঘে দিয়ে মায়ে ঝিয়ে লোকের বাড়ী ভিক্ষা ক'রে বেড়ানো ভালো হতো কেমন?"

বিনোদিনী তীব্র শ্লেষের সহিত পুনরায় বলিল "ভবিষ্যৎ দর্শনের শক্তি তোমার খুব বেড়েছে নয়—নিজের ভবিষ্যতটা একবার ভেবে দেখেচ কি?—আগে নিজের বিষয়টা ভেবে তবে পরকে উপদেশ দিও আর কোন কথা থাকে বলো—মাকে এমন ক'রে কাঁদিও না।"

বিনোদিনী ঝড়ের মত আসিয়া ঝড়ের মত সতীন্দ্রের ধূলা ময়লা ঝাড়িয়া ঝড়ের মত চলিয়া গেল।

শাসকের আদেশের মত বিনোদিনী সতীন্দ্রকে যে কথাগুলি শুনাইয়া গেল গুরুভার পাষাণ চাপের মত সতীন্দ্রকে নিশ্চল করিয়া সেখানে বসাইয়া দিল। আজ তাহার মানস ক্ষেত্রের ভাব ধারণার স্রোত রুদ্ধ হইয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া সতীন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহ দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরে সদ্যস্নাতা বিনোদিনী আসিয়া দেখিল সতীন্দ্র উঠিয়া গিয়াছে। এলোচুল সিক্ত বস্ত্রে তাহার রান্নার সামগ্রীগুলি গোছাইয়া লইতেছিল, অনতিদূরে রাখাল বালকদলের নিকট আমতলায় একখানি গো-গাড়ীর আরোহী নামিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে পল্লী-রমণীর দিকে সমাধিস্থ যোগীর মত চাহিয়াছিল, তাহার পলকবিহীন দৃষ্টিতে মনে হইতেছিল রমণীর সমস্ত অবয়ব তার বুকের মাঝখানে

আঁকিয়া লইতেছে। পশ্চাৎ হইতে যখন তার জামার কাপড় ধরিয়া টানিয়া সঙ্গিনী ধমক দিল "কি অসভ্যের মত গৃহস্থের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছো—যেতে হবে না ?"

বিনোদ সুপ্তোত্থিতের মত প্রশ্ন কারিণীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বলিল "চলো চলো—" বলিয়া অনিচ্ছা স্বত্বে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বিনোদের বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামখানার অবস্থা খুবই জঙ্গল পূর্ণ ছিল। কালক্রমে কয়েক ঘর চাষা আসিয়া বিনোদিনীদের বাড়ীর সম্মুখের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাস বসত করিয়াছে। বিবাহ রাত্রিতে পল্লীগ্রামের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য আসিয়া স্থানটী তাহার স্মৃতির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

বিনোদ হৃদয়ের মাঝখানে যে ছবি আঁকিয়া লুকাইয়া লইয়া গেল তাহা তাহার সমস্ত উৎসাহকে ভঙ্গ করিয়া একটা কেমনতর অবসাদ আনিয়া দিল।

বিনোদ যেমন বিনোদিনীকে তাহার হৃদয়ের গুপ্ত মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল বিনোদিনীর সতর্ক দৃষ্টি ও তাহার কার্য্যের মধ্য দিয়া তাহার এই অসঙ্গত কাজ দেখিতে পাইয়াছিল।

থিয়েটারের অ্যাক্‌টীংএ সুযশ লইতে না পারিয়া বিনোদ বাড়ী আসিয়া কয়েক দিনের জন্য থিয়েটারে যাওয়া বাদ দিল—এই সময় পারিবারিক আর একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

কুমুদিনী পরের ঘরের পোদ্দারি লইয়া আর তাহার পিত্রালয়ে থাকা উচিৎ বিবেচনা করিল না, শ্বশুরকে সংবাদ দিয়া আনিয়া বাপ এবং ভায়ের নিষেধ স্বত্বেও শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। কুমুদিনী যাইবার সময় বউটিকে ঘরে আনার জন্য তাহার পিতাকে অনুরোধ করিয়া গেল।

কুমুদিনী যাওয়ার পর বিনোদ তাহার অশান্ত জীবনকে নির্জ্জনতার মধ্যে আনিয়া যতটুকু শান্ত করিতে পারিয়াছিল বামুন ঠাকুরের হাতের রান্না আর তাহার অবাধ গতিবিধির উপর কোন রকম বাধা দিবার লোক না থাকাতে সে পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিল। সাংসারিক অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া হরিমোহন বুঝিল বার বিঘে জমির জন্য বউটীকে ঘরে না আনিয়া তাহার মাতাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা কোন মতেই সঙ্গত হয় নাই; দুটী রমণীকে জব্দ করিতে গিয়া নিজেই জব্দ হইয়াছে। অনেক চিন্তার পর বৌটীকে ঘরে আনাই স্থির হইল।

বিনোদিনীর মা বিনোদিনীকে শ্বশুরের সঙ্গে যাইতে দেখিয়া প্রসন্ন মনেই কন্যাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

বিনোদ নাটকীয় কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া রস মাধুর্য্যে আপনার মনটাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল। বিনোদিনী বাড়ী আসিলে তাহার নিকট হইতে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মধুর মিলনানন্দের একটা কিছু পাইবে আশা করিয়াছিল, বিনোদিনী তাহার কিছুই তাহাকে দিতে পারিল না। সাংসারিক কার্য্যের মধ্যে সে আত্মগোপন করিয়া স্বামীর নিকট হইতে দূরে দূরে রহিল।

বিনোদ তাহার স্বপ্নাঙ্ক মানস প্রতিমাটীকে নিকটে পাইয়া তাহার অসঙ্গত দাবী পূর্ণ হইল না দেখিয়া সেও সরিয়া পড়িল। বিনোদিনী ইচ্ছা করিয়া তাহার চরিত্রহীন স্বামীর নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাহার নারীত্বের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না অথচ

স্বামীর প্রতি তা'র কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটী সে করিল না।

উভয়ের মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসক হইয়া আপোস করিয়া দিবার লোক সংসারে কেহ ছিল না কাজেই উভয়ের এই মৌন দ্বন্দ্বের প্রভাব হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পুত্রবধূটী তার কার্য্যতৎপরতায় শ্বশুরটীকে সম্পূর্ণ বাধ্য করিয়া ফেলিল।

দীর্ঘবিচ্ছেদের করুণ কাহিনী করুণ রাগিনীর সুরে বিনোদের নিকট প্রকাশ না করাতে তাহার কবিত্বময় প্রাণটা যাহা পাওনার দাবী করিয়াছিল তাহা থিয়েটারের ষ্টেজে মিটাইয়া লইতেছিল। বিনোদের পিতা বিনোদের উপর বিরক্ত হইয়া বিবিমতে চেষ্টার দ্বারা যখন পুত্রের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইল তখন বিনোদিনীর উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তীর্থ দর্শন উপলক্ষ্য করিয়া কৌশলে বিনোদকে বিনোদিনীর অধীন করিয়া বাড়ী হইতে বিদায় হইল।

বিনোদিনী তাহার লব্ধ অধিকারের অপব্যবহার করিয়া স্বামীর সঙ্গে বা স্বামীর কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিল না।

বিনোদিনীর এই নির্লিপ্ত ভাবকে বিনোদ তাহার গর্ব্বান্ধতা মনে করিয়া সেও পিতার যাওয়া পর হইতে একেবারে বাড়ী আসা বন্ধ করিয়া দিল।

বিনোদিনীর দিনগুলো সহরের সীমানা সরহদ্দ যায়গাটুকুর মধ্যে একরকমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ মাসিটীকে লইয়া তাহার সংসারের কাজের পর অবশিষ্ট সময়টুকু স্বামীর ব্যবহারের চিন্তা মনকে শক্ত করিয়া রাখিলেও একটা অব্যক্ত বেদনার আঘাত তাহার শরীর সহ্য করিতে পারিল না, শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল, শ্বশুর যাওয়ার পর প্রায় একমাস গত হইল, ইহার মধ্যে বিনোদ দু' একবার মাত্র বাড়ী আসিয়াছে। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বিনোদিনী চিন্তা করিতেছিল, ইতিমধ্যে বাহির হইতে তাহার শ্বশুরের নাম করিয়া ডাকার শব্দ শুনিয়া ভগিরথ চাকর দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে, আগন্তুক লোক দুটী সংক্ষেপে বলিয়া গেল "বিনোদ সিঁড়ি হতে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়, তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে, তার পা কেটে ফেল্‌বে, তার বাপকে খবর দিবার জন্য এসেছিলাম, নিচের তালায় বার নম্বর সিটে সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে।"

খবর দিয়া লোক দুটী চলিয়া গেল। কথাগুলি শুনিয়া বিনোদিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া চিন্তা করিল। পল্লীবাসিনী রমণী আজ তাহার স্বাধীন চিন্তাকে জাগ্রত করিয়া সমস্ত বাধা ব্যবধান ঘুচাইয়া তার নারীশক্তিকে আত্মজাগ্রত করিল।

মাসীকে সঙ্গে করিয়া নিজেই হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যে অতি সহজে বিনোদকে লইয়া তাহার মায়ের নিকট আসিল।

এই ইচ্ছাকৃত বাহাদুরীর মধ্যে তাহার বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যকে সম্বল করিয়া সে গ্রামের গদাধর নাপিতকে দিয়া চিকিৎসা করাইবে, কদাচ স্বামীর পা কাটিয়া ফেলিতে দিবে না এই সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। গদাধর আসিয়া পায়ে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। বিনোদিনীর দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিনোদের এত দিনের সঞ্চিত রত্নগুলো সমস্ত যেন ঝুটো হইয়া গিয়াছে। এখন শান্ত বালকটীর মত

বিনোদিনীর অধীনে মস্তক অবনত করিয়া বিনোদ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।

সাত দিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখার নিয়ম, সাত দিন পরে গদাই আসিয়া বিনোদের পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলিতেছিল, বিনোদিনীর গলা ধরিয়া এক পায়ে ভর দিয়া বিনোদ দাঁড়াইয়া ছিল। আজ বিনোদ তাহার সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলিয়া নিজের দেহভার বিনোদিনীর উপর ন্যস্ত করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিতেছিল তাহাতে তাহার শরীর হইতে তাহার পা খানা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার গ্রাহ্যের মধ্যে আসিত না।

সমুদ্রের মাঝখানে ডুবিয়া সে যে রত্ন পাইয়াছে তাহার তুলনা জগতে নাই। তাহার অত্যধিক আনন্দের মাঝখানে সতীন্দ্র পুষ্পগুচ্ছের মত তার ছেলেটী কোলে করিয়া আসিয়া বলিল "বিনু, হাড় কি জোড়া লেগেছে?" তখনও গদাধরের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয় নাই, বিনোদিনী সতীন্দ্রের আসল কথার উত্তর না দিয়া ছেলে দেখিয়া বলিল "কালো জলের শুক্তির বুকের মানিক বিনুদা একটা চুমো দিতে পারচি নে।"

সতীন্দ্র বলিল "চুমো দেবার সময় আছে—এ তোমার চক্ষুদানের ফল।"

"সতীন দা রাগের বসে যা বলেছি ভুলে যাও। ভগবান যে বিপদে ফেলেছেন আশীর্ব্বাদ কর তা হতে যেন মুক্ত হতে পারি। নইলে লজ্জা রাখবার স্থান হবে না।"

বিনোদিনীর আর্দ্রচক্ষু দেখিয়া বিনোদ আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলিল 'সতীন বাবু পশুত্ব ঘুচে আজ মৌন দেবতার মুখের কথায় মনুষ্যত্ব লাভ করেছি, আমার শরীর থেকে একাংশ বিচ্ছিন্ন হলেও আমি দুঃখিত হবো না।"

এই সময় গদাধর চিৎকার করিয়া বলিল "বিনু দিদি, হাড় জোড়া লেগেছে।"

কল্‌কাতা গেল—

একা কল্‌কাতায় বালিকা বিধবার সংখ্যা ১৮২৫৬ আঠার হাজার দুশো ছাপান্ন। ১ থেকে ৪ বছর বয়সের আছে ২৬৯৬ আর ১০ থেকে ১৫ বছরের ১৪৭৪০ চোদ্দ হাজার সাত শো উনপঞ্চাশটি। এ ছাড়া আর আর বয়সেরও বিধবা আছে। এ নমুনাতেই বোঝা যায় যে হিন্দু বাঙ্গালীদিগের ভেতর বালিকা বিধবা কত আছে! ধন্য সমাজ!

সনাতন

বঙ্গের ভিক্ষুক

[শ্রীরাধাচরণ দাস]

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ॥

অপাত্রে দান শাস্ত্র নিষিদ্ধ। অযোগ্য পাত্রে দান করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়, কারণ তদ্দ্বারা পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পাপ প্রশ্রয় পাইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আমরা সামাজিক জীব। সমাজ লইয়াই আমাদের অবস্থিতি, সমাজের যাহাতে রক্ষা হয় ও পুষ্টি বিধান হয় এবং যাহাতে তন্মধ্যে কোনরূপ দুর্নীতি বা অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। তাই সমাজ রক্ষার্থে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দয়া প্রদর্শন করা প্রয়োজন,। "দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত, তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে—বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ মোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। যাহার দারিদ্র্য দুঃখ নাই, তাহাকে ধন দান বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময় পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়।"—ধর্ম্মতত্ত্ব।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন আছে। রামায়ণে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এই ভিক্ষার ছলেই সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এ প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। এক্ষণে উহা সমাজ-শরীরে বদ্ধমূল হইয়াছে। অতি দরিদ্র হিন্দু গৃহস্থও দ্বারদেশ হইতে ভিক্ষুককে রিক্ত হস্তে বিদায় দেওয়া পাপ-জনক মনে করেন। ইহা হিন্দুগণের আজন্ম পুষ্ট সংস্কার। এই মুষ্টিঅন্ন ইঁহারা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই মুষ্টি মুষ্টি অন্নের সমবায়ের শক্তি অসীম। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন ভাল কাজ হইতে পারে অপর দিকে, তেমনি সর্ব্বনাশও সাধিত হইতে পারে। এই মুষ্টি ভিক্ষার অন্নগুলি কেবলই যে সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে এরূপ বলা ভ্রম। ইহার দ্বারা দেশের অনেক প্রকৃত গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তির জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহারা দয়ার উপযুক্ত পাত্রও বটে। কিন্তু "বঙ্গের ভিক্ষুক" এই কথা আমাদের কর্ণগোচর হইবামাত্র এই দীন দরিদ্র বিকলাঙ্গগণের পার্শ্বে অনেক হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ নর-নারীর মূর্ত্তিও আমাদের মানস পটে প্রতিফলিত হয়। ইহারা (শেষোক্ত শ্রেণী) দয়া লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই দয়ার অপাত্র, সামর্থ্য বিশিষ্ট পরিশ্রম পরাঙ্মুখ হীন ব্যক্তিরা কোনরূপ কাজকর্ম্ম না করিয়া

দলে দলে এই অল্পায়াসসাধ্য ভিক্ষুকের জীবন অবলম্বন করিয়া দেশটা উৎসন্নে দিতেছে। এমন সুখের, সহজ, সরল, পন্থা বিদ্যমান থাকিতে শ্রম-ভীরু বাঙ্গালী কঠোর জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে যাইবে কেন? তাই আমাদের দেশে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে "হরি বল্‌লে কাঁড়া চাল মিলে।"

রবিবার ভিক্ষুকের পক্ষে পরম শুভদিন—মহা উপার্জ্জনের দিন। এই দিন ধনী ব্যক্তিরা কেহ এক মণ কেহ দুই মণ চাউল দান করিয়া থাকেন। রবিবার দিন রাস্তায় বাহির হইলে ভিক্ষুক দলের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে হয়, এত ভিক্ষুক সেদিন আমদানী হয়। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় শিশু, বালক, বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সমর্থ অসমর্থ, সকল রকমই আছে। তবে অসমর্থ অপেক্ষা সমর্থ ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশী।

ইহা দিগকে খাটিয়া খাইতে বলিলে ইহারা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে "তোমার ইচ্ছা হয় বাপু তুমি ভিক্ষা দাও, না হয়, না দাও, তোমার অত কথার দরকার কি?" এসব কথা শুনিয়া অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে যতদিন না আত্মসম্মান জ্ঞানের উদয় হইবে, ততদিন এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেনা। কবি বলিয়াছেন ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান।" কিন্তু একথা দেশের লোক বুঝিল কি? কবি শুধুই আক্ষেপ করিয়া গেলেন।

হিন্দুগণ অতি ভাবপ্রবণ ও ধর্ম্মোন্মত্ত জাতি। হরিকথা শুনিতে পাইলে তাহারা সব ভুলিয়া যায়, অতিকৃপণও মুক্তহস্ত হয়; পাত্রাপাত্র তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না। লম্পট বাবাজী ভিক্ষুকের চরণে অনেক অশিক্ষিতা অপরিণামদর্শী গৃহস্থ কামিনী ভাবে বিভোর হইয়া আত্মসমর্পন করিয়া কুলে কালিমা লেপন করে। পল্লীগ্রামে সরল কুলবধূগণের মধ্যে তথাকথিত বাবাজী ভিক্ষুক গণ (ইহাদের তুল্য অলস; ধূর্ত্ত ও পরিশ্রম কাতর অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়) "হরিনাম" ও গায়ে হরিনামের ছাপ সম্বল করিয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে।

"প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে সব বৈষ্ণব দেখিতে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলক মালা ধারণ করে।" (হিমালয়) ইহাদের হরিনাম কীর্ত্তন কত খানি হরির জন্য, আর কত খানি ভিক্ষার জন্য তা বলা শক্ত নয়।

"আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময় ভুলে যাই সুতরাং আমরা পাপী কিন্তু এই বৈষ্ণব গুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে তাকে এক দণ্ড কাছ ছাড়া করতে পারে না। তাই তারা তাদের উনকুটি চৌষট্টী ঝুলির ভিতর পুরে দিন রাত কাঁধে করে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম করবে। ইহাদের প্রাণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সংসার।"

অনেক সময় একজন বাবাজীকে দুই বা ততোধিক বৈষ্ণবী সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা খঞ্জনি ও মন্দিরা বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। বৈষ্ণবীরা অনেক সময় গানে শ্রোতাদের চিত্ত এরূপ ভাবে আকর্ষন করে যে তাহারা বক্‌শিস দিতে বাধ্য হয়। ইহারা পল্লীগ্রামে নৌকা করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

এই নেড়ানেড়ীর দল হরিনাম করিয়া হরিনামের অপমান করে। উহাদিগকে ভিক্ষা দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে ভিক্ষা

দেয় তাহারও পাপ হয়। তথাকথিত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ সমাজের কলঙ্ক ও দেশের ভার স্বরূপ। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহ মহাশয়ের "ধ্রুবতারা" তে এ সম্বন্ধে উত্তর প্রত্যুত্তরচ্ছলে বেশ একটা আলোচনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১ম ব্যক্তি। তথাকথিত বৈষ্ণবগণ সমাজের কলঙ্ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু ত' তাহারা সমাজের অঙ্গ।

২য় ব্যক্তি। অঙ্গ বটে, সমাজরূপ অট্টালিকার নর্দ্দামা।

১ম ব্যক্তি। নর্দ্দমার দরকার আছে, অতএব উহার রক্ষার প্রয়োজন।

২য় ব্যক্তি। রক্ষা করা আবশ্যক আবার পরিষ্কারও করা উচিত। ইহারা রাত্রে বদ-মাইসি করিবে আর দিনের বেলা অলসভাবে হরিনামের ছল করিয়া অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া নিজেদের অন্নের সংস্থান করিবে, ইহাও ভাল নহে। ইহাদিগকে নিজ নিজ উদর পোষণের জন্য যদি রীতিমত পরিশ্রম করিতে হইত, তবে বোধ হয় ইহাদের স্বভাব এত খারাপ হইত না। তাহা হইলে একজন বৈরাগীর পক্ষে একটা বৈষ্ণবী রাখাই কঠিন হইত—সে চারি পাঁচটা কোনক্রমেই রাখিতে পারিত না।"

এখন এই ভিক্ষুকদলের উপায় কি? ইউরোপে কেহ ভিক্ষা করিলে বা কাহারও নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হইলে তাহাকে কারা-গারে বাস করিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও যখন সে দেশের ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস হইল না তখন সে দেশের লোক **আদর্শ ভিক্ষুক সংশোধনাশ্রম** প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভিয়েনা নগরের কয়েক মাইল দূরে কোর্ণাবুর্গ নামে একটি গ্রামে এইরূপ একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ভিক্ষুকদিগকে শাস্তি দেওয়া নহে—তাহাদিগকে সংশোধন করা, কার্য্যক্ষম করা। "এখানে সমস্ত কার্য্য ভিক্ষুকদের দ্বারা করান হইবে, কাজ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং কাজের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে হইবে,—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। *

একবার বিলাতের এক সংবাদ পত্র সম্পাদক সেখানকার ভিক্ষুকদের সঠিক অবস্থা জানিবার জন্য ভিক্ষুকের বেশে ইংলণ্ডের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর যখন তিনি আপিসে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখা গেল যে সমস্ত দিনে তিনি মাত্র আড়াই পেনি অর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু আমেরিকার অবস্থা ভিন্ন রূপ। সেখানে "দশ লক্ষ লোক ভিক্ষাবৃত্তি ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এক নিউ ইয়র্ক সহরের ভিতরেই নাকি চারি লক্ষ। ইহারা ভিক্ষুক—কেবল মাত্র ব্যবসায়ে। সম্পদে অনেক ধনীর ভিতরেও ইহাদের নাই। সময় সময় ইহাদের এক এক জনের উপার্জ্জন ঘণ্টায় দুই শত টাকা পর্য্যন্তও উঠিয়া থাকে। ইহারা ভিক্ষায় বাহির হয় মোটরকারে চড়িয়া। অনেক ভিক্ষুকের আবার ভাড়াটিয়া ভিক্ষুক আছে দৈনিক ৪৲ ৫৲ টাকা দিয়া এই সব ভাড়াটিয়া ভিক্ষুকদের উপার্জ্জন ভিক্ষুক পাণ্ডারা গ্রহণ করে। (তবে) নিউইয়র্ক সহরে ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।"

আমাদের বাংলা দেশে কি কোনো চেষ্টাই হইবে না?

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

রুদ্রমঙ্গল

[শ্রীঅচ্যুতকুমার সেন]

নিখিল বিশ্বে আজি হেরি হে, তোমারি রোষ চিহ্ন
—হে রুদ্র, তব রোষ চিহ্ন।
হে ব্রাত্য, হে অব্রাহ্মণ দেব, বন্ধন কর বিচ্ছিন্ন॥
নিষ্ক্রীয় আছিল ত্রিশূল তব হে সুচীর ধ্যান-প্রসুপ্ত।
বিকল্প বিহীন জ্ঞান বিলীন নির্ব্বাণ সিন্ধু বিলুপ্ত॥
সুপ্তি বিবশ আছিল প্রমথ, নির্জ্জন ত্যক্ত শ্মশান।
ছন্দ বিলিন ও তব নর্ত্তন, স্তব্ধ ধ্বংস বিষাণ॥

বিশ্বের বক্ষে জ্বলিছে লেলিহ তব ক্রোধ-অনল শিখা,
শোণিত প্রবাহে ধৌত অবিরত অতীত কর্ম্মের লিখা।
ভীষণ ভ্রূকুটী দহিছে ভস্মে দুর্ব্বল নাশক রাক্ষস জনে
দহিছে বিদ্বেষ দহিছে লিপ্সা পাশবরুত্তি নিচয় মনে।
তীব্র গরল উঠিছে ফুটিয়া পেষিত কৃষক হৃদয় বিন্দু
শ্রমিক নিশ্বাস-প্রলয ঝঞ্ঝাতে কম্পিত জীবন সিন্ধু।

বিশ্বেরি ইতিহাস লিখিছে হর্ষে না জানি কি নূতন অঙ্ক
জলদ নিস্বনে মন্দ্রিছে মুক্তি ভীষণ তব জয় শঙ্খ।
তব জ্ঞান-দীপ্তি পরশ মাত্রে বন্ধন শৃঙ্খল ছিন্ন ;
ভৈরব কণ্ঠে বজ্র-হুঙ্কারে ভেদ প্রভেদ বিদীর্ণ।
মানব পরাণ পাগল উদ্দাম নাশিছে সহস্র বন্ধে
তব চরণ নিম্নে মঙ্গল-ভিক্ষু গাহিছে সকল ছন্দে।

প্রতিচী মর্ম্মে করিছ নৃত্য শ্মশানসুন্দর নটরাজ!
দিবস রাত্রি অসাড় মৌন দীন সে জাগ্রত আজ॥
পুঞ্জিত মেঘের প্রাচীর ললাটে মহাকাল ফির হর্ষে।
জাগ্রত জাপ চীন মিশর জাগ্রত ভারতবর্ষে॥
শিব হে তব জ্যোতি মঙ্গলপূর্ণ আবৃত হিরণ্ পাত্রে।
অপাবৃত কর অনাবৃত কর আবির্ভব হে নগ্নগাত্রে॥

হের, দৈন্যলাঞ্ছিত কুটীরে কুটীরে জাগ্রত আজি নব জাতি।
কর্ষিত ক্ষেত্রে লাঙ্গল ধারণ তাম্র তপন ভাতি॥
ঘর্ম্মে আকুল পথেরি পার্শ্বে পাষাণে চূর্ণিছে দৈন্য
বাহক, শ্রমিক, নীরব সেবক বিশ্বেরে বহিয়া ধন্য।
হে ক্ষুধিত চিরলাঞ্ছিত দেবতা, হে উলঙ্গ হে রিক্ত
তব মঙ্গল আশীষে এ নব জীবন করহে কর অভিষিক্ত।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই লোক আসিতেছেন।

জ্যানেট বলিলেন—"তোমার চেহারা আজ বড় খারাপ দেখাচ্ছে, গ্রেস্; তোমার কি হয়েছে?"

মার্সি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার শরীর ভাল নেই। সামান্য একটু শব্দে আমি চম্‌কে উঠি—একটু হাঁটলেই বড় ক্লান্তি বোধ হয়।"

জ্যানেট সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন—"আমরা তো শীগ্‌গির বায়ু পরিবর্ত্তনে যাচ্ছি—তা হলেই তোমার শরীর ভাল হবে এখন।"

"আপনি আমার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন—ততটা অনুগ্রহের আমি একেবারেই অযোগ্য।"

"তোমার এমন মিষ্টি স্বভাব যে আমি তোমাকে যতই যত্ন করি না কেন, আমার মনে হয় যেন তোমাকে যথেষ্ট যত্ন করা হচ্ছে না।"

মার্সির মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"আপনার কথা শুনলে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। আপনি যে আমাকে ভালবাসেন এ কথা শুনলে আমার যত আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। আপনি সত্যি ক'রে বলুন—আপনি কি আমার ব্যবহারে ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছেন?"

মার্সি গুরুতর পাপের কার্য্য সাধন করিয়াছে। কিন্তু যদি সে জানিতে পারে যে প্রকৃত গ্রেস জ্যানেটকে যে ভাবে সেবা করিতে পারিত তাহা অপেক্ষাও সে তাঁহার অধিক সেবা করিতেছে—তাহা হইলে তাহার

এই জঘন্য প্রতারণার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়।

জ্যানেট বলিলেন—"তোমার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট কি না জিজ্ঞাসা করছ? তুমি যে ঠিক একটী ক্ষুদ্র বালিকার মত কথা বলছ দেখছি!" তাহার পর তিনি মার্সির গাত্রে হস্ত স্থাপন করিয়া সস্নেহে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"গ্রেস, বলতে কি, যে দিন তুমি প্রথম আমার বাড়ীতে এসেছ সেই দিনটীকে আমি আমার জীবনের পরম শুভদিন বলে মনে করি। তুমি আমার নিজের কন্যা হ'লে, তোমাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারতাম কি না জানি না।"

মার্সি মুখ লুকাইবার জন্য মাথা ঘুরাইয়া লইল। জ্যানেট দেখিলেন—মার্সির হাত কাঁপিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েছে, আমায় খুলে বল।"

"আমার কিছুই হয় নি তো। আপনার দয়ায় আমি অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছি।"

জ্যানেট ভাবিলেন—আমি এমন কি ব'ল্‌লাম যে গ্রেসের মন এমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো! এর স্বভাব বড় কোমল—এর প্রাণটা দেখছি কৃতজ্ঞতায় গলে গেছে। তবে এই তো হোরেসের কথা তোলবার ঠিক সুযোগ উপস্থিত।

এই মনে করিয়া জ্যানেট বলিলেন—"আমরা দুজনে এম্নি সুখে ও আনন্দে এত দিন কাটালাম যে এখন কোন পরিবর্ত্তন ঘটলে আমাদের উভয়েরই কষ্ট হবে। এ বুড়ো বয়সে আমার কষ্ট তো খুব বেশীই হবে। গ্রেস, যে দিন তোমাকে বিদায় দিতে হবে সে দিন আমি কি করব জানি না।"

মার্সি চমকিয়া জ্যানেটের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার গণ্ডস্থলে তখনও অশ্রুর চিহ্ন বিদ্যমান। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আমাকে বিদায় দেবেন কেন?"

"তার কারণ তো তুমি বেশই জান।"

"না, আমি তো কিছুই জানি না।"

"হোরেসকে জিজ্ঞাসা ক'রো—সে তোমাকে সব বল্‌বে।"

তখন মার্সি সকল কথা বুঝিল। তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। পুনরায় তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। জ্যানেট তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন।

"তোমার ও হোরেসের মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটেছে নাকি?"

"না"

"তুমি তোমার নিজের হৃদয়কে ঠিক বুঝতে পেরেছ তো? হোরেসকে না ভাল বেসেই তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে তোলো নি তো?"

"না, তা নয়—"

"কিন্তু তথাপি—"

এই প্রশ্নে মার্সি তাহার কর্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া নিজে কথা বলিল—"মা, আমাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ হবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। ধীরে সুস্থে সে কথা পরে ভাবলেই চলবে। আপনি একটু আগে আমাকে একটী কথা বলবেন ব'লছিলেন—সে কথাটী কি?"

জ্যানেট সহজে দমিবার পাত্রী নহেন—কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনীর এই শেষ প্রশ্নে তিনি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। এতক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে এত কথা হইবার পর গ্রেস্ বলে কি না—তিনি কি কথা বলিতে চান!! জ্যানেট ভাবিলেন—আজ কালকার মেয়েদের ব্যাপার কি? এদের প্রকৃতি বোঝাই যে শক্ত সমস্যা দেখছি! ইহার পর তিনি

যে কি বলিবেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মার্সি নীরবে তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল—জ্যানেট অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। ঠিক এই সময় একটী চাকর সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

জ্যানেট পূর্ব্ব হইতেই একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি এখন চাকরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি, তোমার দরকার কি? আমি তো তোমাকে ডেকে পাঠাই নি? না জানিয়ে ঘরে এলে কেন?"

চাকর বলিল -"এই চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। সে জবাবের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।" চাকর এই কথা বলিয়া একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

জ্যানেট চিঠির ঠিকানায় হস্তাক্ষর দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি মার্সিকে বলিলেন—"একটু অপেক্ষা কর, আমি চিঠি খানি পড়ে নিই।" মার্সি একটু দূরে সরিয়া গেল। সে তখন বুঝিতেও পারিল না যে এই সামান্য পত্রখানি তাহার জীবনের কি মহৎ পরিবর্ত্তন সূচনা করিল।

জ্যানেট চসমা পরিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিলেন। আপন মনে বলিলেন—"আশ্চর্য্য। এরি মধ্যে ফিরে এসেছে।"

তাহার পর তিনি চিঠি খুলিয়া পড়িলেন এই চিঠির লেখক অন্য আর কেহই নহে—সেই পতিতাশ্রমের নবীন প্রচারক।

চিঠিখানি এই :—

"প্রিয় মাসিমা,—

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমি লণ্ডনে ফিরে এসেছি। আমার বন্ধুধর্ম্মযাজক যত দিনের অবকাশ নিয়েছিলেন তার পূর্ব্বেই তিনি ফিরে এসে নিজের কাজে যোগ দিয়েছেন। আমার এত শীঘ্র ফিরে আসবার কারণ শুনলে আপনি আমাকে দোষ দেবেন। কিন্তু শীঘ্র নিজের দোষ স্বীকার করতে পারলেই আমার মনের শান্তি হয়। এ ছাড়া আপনার সঙ্গে শীঘ্র দেখা করবার আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমার এই চিঠির জবাব পেলেই আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেই সময় আমি আমার সঙ্গে একটী মহিলাকে নিয়ে যাব—তিনি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তাঁর উপকার করতে আমি প্রতিশ্রুত হয়েছি। আশা করি এই পত্রবাহক মারফৎ দেখা করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

আপনার স্নেহাধীন—

জুলিয়ান্ গ্রে।"

জ্যানেট ভাবিলেন—এ মহিলাটী আবার কে? তাঁহার মনে নানারূপ সন্দেহ জাগিতে লাগিল। জুলিয়ান্ জ্যানেটের ভগ্নীর পুত্র। জ্যানেটের সে ভগ্নী এখন মৃত—কিন্তু সেই ভগ্নীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে জুলিয়ান্ যে সকল মত পোষণ করিতেন তাহার সহিত জ্যানেটের কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। এই জন্য জুলিয়ান্ জ্যানেটের কতকটা বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্যানেট জুলিয়ানকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—কারণ মৃত ভগ্নীর সহিত জুলিয়ানের আকারগত বিশিষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জুলিয়ান্ অল্প বয়সেই সুলেখক ও প্রতিভাবান প্রচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—ইহাতেও জ্যানেট মনে মনে গৌরব অনুভব করিতেন। এই সকল কারণেই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বিনষ্ট হয় নাই। জ্যানেট ভাবিলেন—এই মহিলা কে, যাহার উপকার করিতে জুলিয়ান্ প্রতিশ্রুত

হইয়াছে? জ্যানেটের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তবে কি জুলিয়ান্ নিজের বিবাহের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে? এ বিবাহ তাঁহাদের বংশমর্য্যাদার উপযোগী হইবে তো? জুলিয়ানের যেরূপ ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস তাহাতে বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকা সম্বন্ধে জ্যানেটের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। জুলিয়ান্ কি কাণ্ড বাধাইতে বসিয়াছে তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না;

তিনি আরাম কেদারা হইতে উঠিয়া বলিলেন—"গ্রেস, আমার বোনপোকে এক খানি চিঠি লিখতে হবে—আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।"

মার্সি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বিস্ময়ে বলিল—"আপনার বোনপো? কই, আপনার বোন-পো আছেন—এ কথা তো এর পূর্ব্বে আপনি আমাকে বলেন নি?"

জ্যানেট বলিলেন—"অনেক বার এ কথা তোমাকে বলব বলব বলে মনে করেছি—কিন্তু অন্যান্য কথার মধ্যে একথাটা একেবারে চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া আমার বোনপো সম্বন্ধে আমি বেশী কথাবার্ত্তা বলি না। আমি তাকে ঘৃণা করি তা নয়, কিন্তু আমি তার সব অদ্ভুত মত ও বিশ্বাসকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। যাই হোক, তুমি তাকে দেখে তার সম্বন্ধে তোমার নিজের মতামত ঠিক করো এখন। সে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ এই ঘরে অপেক্ষা কর—হোরেসের বিষয়ে আরো কিছু আমার বলবার আছে।"

মার্সি জ্যানেটের জন্য দরজা খুলিয়া দিল। তারপর সে উদ্বিগ্ন ভাবে গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

সে কি জ্যানেটের বোনপোর কথা ভাবিতেছিল? না; জ্যানেট তাহার নাম বলেন নাই—সুতরাং তাঁর বোন-পোর বিষয়ে মার্সির মনে কৌতূহলেরও উদ্রেক হয় নাই। মার্সি ভাবিতেছিল জ্যানেটের সেই কথাগুলি—"যে দিন তুমি এসে আমার সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলে সে দিনকে আমি জীবনের পরম শুভদিন মনে করি।" এই কথাগুলি তাহার বিক্ষত চিত্তে অমৃত প্রলেপের ন্যায় কার্য্য করিল। কিন্তু পরক্ষণেই জঘন্য প্রতারণার স্মৃতি তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণা, কি শোচনীয় অধঃপতন! কেন সে এমন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল! যদি মুক্ত-কণ্ঠে সত্যকে স্বীকার করিয়া সে জ্যানটের প্রাসাদে নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতে পারিত—তাহা হইলে আজ তাহার কি অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি লাভ হইত! আচ্ছা, এখন যদি সে সকল কথা স্বীকার করে, তবে কি এ প্রাসাদে তাহার পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? বিচারবুদ্ধি বলিল—অসম্ভব। তুমি প্রাণপণ পরিশ্রমে নিজের গুণপণায় জ্যানেটের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছ সত্য, কিন্তু এ সকলের মূলে তোমার ঐ প্রতারণা। সে প্রতারণা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—কিছুতেই তাহার ক্ষালন হইবে না। মার্সির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। যতই সে রুমাল দিয়া অশ্রু নিবারণ করিতে চায়—ততই তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসে। কর্ত্রী বলিলেন—হোরেসের সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বলবার আছে। মার্সি বুঝিতে পারিল—সে কী কথা। হোরেস্ যাহা বলিতে চায় মার্সি তাহা বিশেষভাবেই অবগত ছিল। জ্যানেট এ কথা তুলিলে মার্সি কি উত্তর দিবে?

হোরেস্ তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সেও হোরেস্কে ভালবাসিয়াছে—এরূপ ক্ষেত্রে হোরেসের সহিত প্রতারণা করা কি উচিত? সে যে কিরূপ নারী—হোরেস্ তাহা কিছুই জানে না। হোরেস সম্পূর্ণরূপে ভ্রমে পতিত হইয়াছে। না, না; মার্সির কর্ত্তব্য হোরেসকে সাবধান করা। কিরূপে সে এ কার্য্য সাধন করিবে? এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় দিলে হোরেস মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে—তাহার জীবন নিরানন্দ হইবে—তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। না, না, এ কথা মার্সি কিছুতেই বলিতে পারিবে না। ইহার অপমান যে মার্সি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। মর্ম্মচ্ছেদী যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধর্ম্ম-বুদ্ধির বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ভাবিল—আমি কিছুতেই নিজের প্রকৃত পরিচয় দিব না। কেন, অন্য স্ত্রীলোকের অপেক্ষা আমি হীন কিসে? পরক্ষণেই সে ভাবিল—আমি যে ভীষণ প্রতারণা করিয়াছি,—আমার মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। ধর্ম্মের নিকট তাহার সকল যুক্তিই যে অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! সে একখানি চেয়ারে বসিয়া হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিল—অন্তরে তাহার কি ভীষণ আন্দোলন! মার্সি নিরাশার সাগরে হাবুডাবু খাইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল—"হায়! এই গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন? আহা! এই মুহূর্ত্তে যদি আমার মৃত্যু হয়—তাহা হইলে আমি এ যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।" ইহার পূর্ব্বেও বহুবার ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির দ্বন্দ্ব এই ভাবেই শেষ হইয়াছিল—আজিও তাহার এই ভাবেই অবসান হইল।

হোরেস জ্যানেটের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সেই গৃহে বসিয়া ছিল। জ্যানেট গ্রেসকে তাহার কথা বলিতে গিয়াছেন। বিলম্বে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল।

সে যে ঘরে মার্সি ও জ্যানেটের কথা বার্ত্তা চলিতেছিল সেই ঘরের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে চাহিল—এখনও উভয়ের মধ্যে কথা হইতেছে কি না। সে দেখিল ঘরে গ্রেস একাকী বসিয়া আছে। তাহার মনে হইল কথা বার্ত্তা তবে শেষ হইয়া গেছে। গ্রেস কি তাহারই সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় সেখানে একাকী বসিয়া আছে? সে ঘরের মধ্যে কএক পদ অগ্রসর হইল। মার্সি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ভাবেই বসিয়া রহিল—সে তাহার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। গ্রেস কি তাহারই কথা ভাবিতেছে? হোরেস আরও একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল—"গ্রেস্

মার্সি সহসা চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পুনরায় চেয়ারে বসিয়া সে বলিল—"তোমার হঠাৎ এ ভাবে আমাকে চমকিত করা উচিত হয় নি।" মার্সির কথায় বিরক্তির ভাব সূচিত হইল।

হোরেস এ জন্য প্রেমিকের উপযোগী ক্ষমা চাহিল। মার্সির মনে তখন দুশ্চিন্তার প্রবল তরঙ্গ ছুটিতেছিল—সে কিছুমাত্র প্রসন্ন হইতে পারিল না। সে নীরবে অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল।

হোরেস মার্সির পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার সঙ্গে কর্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে?" মার্সি অধৈর্য্য ও বিরক্তি সহকারে উত্তর করিল—"হাঁ"।

প্রেমপথের অভিজ্ঞ পথিক এ উত্তরের পর আর সে সময়ে মার্সিকে এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রকৃষ্টতর সুযোগের

প্রতীক্ষা করিত। কিন্তু হোরেস অল্পবয়স্ক যুবক—আর অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের মধ্যে থাকিয়া তাহার ধৈর্য্যের সীমা ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"কর্ত্রী তোমাকে আমার কথা কিছু বলেছেন ?"

আর দ্বিতীয় কথা বলিবার পূর্ব্বেই মার্সি ক্রুদ্ধভাবে হোরেসের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমিই তাঁকে ব'লে ব'লে এই বিবাহের দিন এগিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রছ ? তোমার মুখ দেখেই আমি এ কথা বুঝতে পারছি।"

হোরেস এখনও সাবধান হইতে পারিল না। সে বলিল—"তুমি রাগ ক'রো না। কর্ত্রীকে যদি এ অনুরোধ ক'রে থাকি, তবে সেটা কি আমার অন্যায় অনুরোধ হয়েছে ? আমি নিজে ব'লে তো তোমাকে কিছুতেই রাজি ক'রতে পারিনি। আমার মা ও ভগ্নীরাও পারেন নি। তুমি সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে-

মার্সি আর সহ্য করিতে পারিল না। সে গৃহের মেঝের উপর জোরে পদাঘাত করিয়া বলিল—"তোমার মা ও ভগ্নীর কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে ; তোমার কি আর কোন কথা নেই ?"

মার্সির মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার সহিত ব্যবহার বিষয়ে হোরেসের আর একটী মাত্র ভুল করা সম্ভবপর ছিল—হোরেস সে ভুলটীও করিয়া বসিল। সেও মার্সির উত্তরে উত্তেজিত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার নিকট তাহার মাতা ও ভগ্নী নারীচরিত্রের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন—তাঁহাদের প্রতি তাহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সাময়িক উত্তেজনা-বশে কঠোর ভাষায় মার্সিকে তিরস্কার করিল—

"গ্রেস্, যদি আমার মাতা ও ভগ্নীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রতে পারতে—তা হ'লে পরম সুখের বিষয় হ'তো। যারা তাঁদের ভালবাসে তাদের প্রতি তাঁরা কখনও এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন না।"

দৃশ্যতঃ এ তিরস্কারে কিছুই ফল হইল না—মার্সি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া থাকিল। তাহার মধ্যে একটী তীব্র বিদ্রোহের ভাব ছিল—সে ভাব তাহার দুঃখময় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত হইয়া ছিল। হোরেসের মুখে সর্ব্বদা তাহার মাতা ও ভগ্নীর প্রশংসা কীর্ত্তন শুনিলে সেই বিদ্রোহের ভাব উগ্র আকার ধারণ করিত। সে মনে মনে ভাবিত—"যে সব স্ত্রীলোক কখনও প্রলোভনে পড়ে নি, তাদের উন্নত চরিত্রের প্রশংসা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। যখন তোমার জীবনের পথ সুখ ও সৌভাগ্যের কুসুমে আস্তীর্ণ, তখন ধর্ম্মে স্থির থাকায় আর তোমার বাহাদুরী কি আছে ? হোরেসের মাতা কি অনশনের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন ! তাহার ভগ্নীরা কি দুঃখের পীড়নে গৃহহীন অবস্থায় সহরের রাজপথে দাঁড়িয়েছেন ? তবে আর তাঁদের এত প্রশংসা কেন ?" হোরেস যখন তাহার মাতা ও ভগ্নীকে মার্সির আদর্শস্থল রূপে তাহার সম্মুখে প্রতিভাত করিতে চেষ্টা করিল—তখন মার্সির হৃদয় তাহাদের প্রতি বিরাগে যেন আরো কঠোর হইয়া দাঁড়াইল। হোরেস কি কোনও কালে এ কথা বুঝিতে পারিবে না যে, কোন স্ত্রীলোকের নিকট অন্য একজন স্ত্রীলোককে আদর্শ রূপে দাঁড় করাইতে গেলে সে তাহা অত্যন্ত ঘৃণা করে ?

মার্সি হোরেসের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে দেখিল হোরেস তাহার দিকে পশ্চাৎ

ফিরিয়া টেবিলের নিকট মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। যদি হোরেস সে সময় তাহার নিকটে আসিয়া বসিতে চাহিত—সে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিত। যদি হোরেস পুনরায় কোন তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করিত—সে তাহাকে তীব্রভাষায় উত্তর দিত। কিন্তু হোরেস একটী কথাও না বলিয়া দূরে নীরবে বসিয়া আছে! স্ত্রীলোককে জয় করিবার পক্ষে পুরুষের নীরবতাই ব্রহ্মাস্ত্র। স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রোধ সহ্য করিতে পারে—কলহের উত্তরে সে দশগুণ গলা চড়াইয়া কলহ করিতে পারে—কিন্তু নীরবতার কাছে সে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

কিছুক্ষণ পরে মার্সি চেয়ার হইতে উঠিয়া বিনীত ভাবে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। সে-ই তো হোরেসের মনে কষ্ট দিয়াছে—তাহারই সম্পূর্ণ দোষ। হোরেস বেচারা কি-রূপে জানিবে যে বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া সে তাহার মনে কষ্ট দিতেছে? সে এক এক পদ করিয়া অগ্রসর হইয়া হোরেসের পার্শ্বে দাঁড়াইল। হোরেস মাথা তুলিল না—তাহার দিকে চাহিল না। মার্সি অতি সন্তর্পণে হোরে-সের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল—"হোরেস, তুমি আমাকে ক্ষমা কর; আজ আমার মন ভাল নেই—আজ আমি যেন কী হয়ে গেছি। আমি যা বলেছি তার জন্য আমি দুঃখিত—আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নেই—আমাকে তুমি ক্ষমা কর।" সেই স্নেহপূর্ণ ভাব, সেই সুকোমল ভাষা—হোরেস স্থির থাকিতে পারিলনা। সে মুখ তুলিয়া মার্সির দিকে চাহিল—সে মার্সির হাত ধরিল।

মার্সি বলিল—"বল তুমি আমাকে ক্ষমা করলে?"

হোরেস বলিল—"হায় প্রিয়তমে, যদি তুমি বুঝতে আমি তোমাকে কত ভালবাসি!"

মার্সি অঙ্গুলিতে এক গুচ্ছ কেশ জড়াইতে জড়াইতে বলিল—"সে কথা আমি বিলক্ষণ জানি।"

তাহারা এইরূপ বাক্যালাপে সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়াছিল—তাহাদের কেহই সে সময় দেখিতে পাইল না যে সেই ঘরের একটি দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল।

জ্যানেট দ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন—হোরেস ও গ্রেস উভয়ে আলাপে মগ্ন। ভাবিলেন—আমার মক্কেলটী তো নিজেই আপনার মকদ্দমা বেশ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উকিলের আর প্রয়োজন কি? আমার আর যাবার দরকার দেখচিনে। তিনি ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হোরেস বিবাহে বিলম্বের কথা উত্থাপিত করিল। হোরেসের বিবেচনাশক্তি তাদৃশ প্রখর ছিল না—থাকিলে এ সময় এ কথা তুলিত না। কথা উঠিতেই মার্সি বিষণ্ণভাবে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

"আজ আর ও কথা তুলো না—আজ আমার মন ভাল নেই।"

"তবে এ বিষয়ে কাল কথা বার্ত্তা হবে কি?"

"হাঁ, তাই হবে।" তাহার পর সে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"কর্ত্রী কত দেরী করছেন—অনেক ক্ষণ গেছেন—এখনও ফিরলেন না! এত দেরী হবার কারণ কি?"

"তিনি এ ঘর হ'তে চ'লে গেলেন কেন?"

"তাঁর বোনপোকে পত্র লেখবার জন্য তিনি চলে গেছেন। ভাল কথা, তাঁর বোনপো কে বল ত?"

"তুমি তাঁকে জান না ?"

"না—আমি কিছুই জানি না।"

"তুমি তাঁর কথা অবশ্যই শুনেছ। তিনি এক জন বিখ্যাত লোক। তাঁর নাম জুলিয়ান্ গ্রে।"

মার্সি বিস্ময় ও অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে হোরেসের মুখ পানে চাহিল। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

হোরেস অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। "গ্রেস, আমার উত্তর শুনে তুমি এমন ভীত ও বিস্মিত হ'লে কেন ?"

মার্সি ধীরে ধীরে বলিল—"জুলিয়ান গ্রে কর্ত্রীর বোনপো! সে কথা আমি আজ জানতে পারলাম!"

হোরেসের বিস্ময় বাড়িয়া চলিল। "তুমি এ কথা আজ জানলে বলে তোমার ভয়ের কারণ কি ?"

হায়! হোরেস কি বুঝিবে মার্সি কেন ভীত? মার্সি ভাবিল—তাহা কর্ত্তৃক গ্রেসের ছদ্মবেশ ধারণ নিয়তিরই দুর্ব্বোধ্য লীলা! তাহা না হইলে সে অন্ধভাবে সেই গৃহেই আসিয়া উপস্থিত হইল কেন যেখানে পতিতাশ্রমের সেই প্রচারকের সহিত তাহাকে আবার মিলিত হইতে হইবে? যে লোক তাহার নির্য্যাতনপীড়িত হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছেন, যিনি তাহার সমগ্র জীবনের উপর অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—সেই লোকই এখানে আসিতেছেন! তবে কি মার্সির বিচারের দিন সমুপস্থিত হইল ?

মার্সি বলিল—"আজ আমার কথা কিছু মনে কর্‌্ো না—আজ আমি

আমার এ ব্যাধি কাটবে—আমি আবার ভাল হয়ে উঠব।"

"গ্রেস, আমার মনে হল যেন জুলিয়ানের নাম শুনে চমকে উঠলে। তিনি বিখ্যাত লোক আমি জানি; অনেক স্ত্রীলোক তাঁকে দেখলে তাঁর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকে তাও জানি। কিন্তু তুমি তাঁর নাম শুনে অত্যন্ত ভীত হ'য়ে উঠলে দেখলাম।"

মার্সি যেন চেষ্টা করিয়া কতকটা সাহস সংগ্রহ করিল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ভীত হলাম ? অসম্ভব; জুলিয়ানের নামে আমার ভয়ের কারণ কি ? এই দেখ, আমাকে ভীত মনে হচ্ছে কি ? হাঁ, আমি আগে তাঁর নাম শুনেছি—তিনি কি আজই এখানে আসবেন ?

মার্সির এ কথায় হোরেসের বিস্ময় ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইল না। মার্সি তাহার দুর্ভাবনা দূর করিবার অনেক চেষ্টা করিল। সে বলিল—"এই বিখ্যাত লোকটীর কথা আমাকে কিছু বল না। তিনি কেমন লোক ?"

হোরেস বলিল—"তিনি পাদ্রি। কিন্তু পাদ্রি বলতে সাধারণতঃ যা বোঝা যায় তাঁর ভেতরে তার কিছুই পাবে না। তাঁর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের সঙ্গে তাঁর আদৌ মিল নাই। তাঁর অদ্ভুত মত। তিনি সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতের বিরোধী। তিনি বলেন—ধর্ম্মের মন্দিরে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী থাকা অসম্ভব। সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁর আদরের বস্তু। পৌরহিত্যের অভিমান তাঁর আদৌ নাই। তিনি বলেন—যাজকেরাই কি শুধু ঈশ্বরের সন্তান? —সকল মানুষই তাঁর সন্তান। ধর্ম্মের রাজ্যে "উচ্চ" "নীচ' রকম জাতিভেদ থাকতেই পারে না। পদোন্নতি তিনি প্রার্থনা করেন না। তাঁর মত—যাজকদের পদোন্নতি তখনি হবে, যখন তারা ক্ষুধিত, পীড়িত, ব্যথিত নির্য্যাতিতদিগের বন্ধু ও সুহৃদ হয়ে তাদের দুঃখ মোচনের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

নারীসম্প্রদায়ের তিনি অত্যন্ত প্রিয়। কোন কষ্টের কারণ উপস্থিত হ'লে তারা তাঁর কাছে উপদেশ নিতে যায়। আমার মনে হচ্ছে, তুমি যদি তাঁর কাছে সদ্যুক্তির জন্য যাও, তা হ'লে ভাল হয়।"

মার্সি বলিল—"এ কথার অর্থ কি ?"

"জুলিয়ান মানুষের মতি পরিবর্ত্তন ক'রতে সিদ্ধহস্ত। তিনি যদি তোমাকে অনুরোধ করেন, তা হ'লে তুমি আর দিন স্থির ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রবে না। আমি জুলিয়ানকে অনুরোধ ক'রতে ধ'রব ?"

হোরেস কথাটা বিদ্রূপের ছলে বলিল। কিন্তু মার্সি ভাবিল—সর্ব্বনাশ! তা হ'লে হোরেস নিশ্চয়ই তাঁকে অনুরোধ ক'রবে। এটা কিন্তু ঘটতে দেওয়া হবে না। কেমন ক'রে এ-কে নিবৃত্ত করা যায় ? এর একমাত্র উপায়—জুলিয়ান এ বাড়ীতে আসবার পূর্ব্বেই হোরেসের প্রার্থনা পূর্ণ করা। তাই মার্সি হোরেসকে বলিল—"তুমি এ সব কী ছেলে-মানুষের মতন কথা বলছ ? জুলিয়ানের কথা হবার আগে আমাদের কি কথা হচ্ছিল ?"

হোরেস বলিল—"আমরা বলছিলাম, কর্ত্রীর ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? তাঁর কী হ'ল ?"

"না না ; এ কথার পূর্ব্বে তুমি আমাকে যে কি বলছিলে।"

আমি ব'লছিলাম—"আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি।"

"শুধু এই কথা ?"

"তুমি কি এ কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ ?"

"আচ্ছা সত্যিই কি তুমি খুব বেশী ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছ ?

"আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে ?"

"হাঁ।"

"এইটী যে এখন আমার জীবনের সদা-চিন্তনীয় বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

মার্সি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, কবে দিন স্থির ক'রলে তোমার মনোমত হয়, বল।"

হোরেস আপনার এই আকস্মিক সৌভাগ্যে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। এত দিনের মধ্যে মার্সি তো এ ভাবে কখনও কথা বলে নাই! সে আপনার সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সে বলিল—"গ্রেস, আমার সঙ্গে বিদ্রূপ ক'রছ নাকি ?"

"তোমার এ সন্দেহ হচ্ছে কেন ?"

"একটু আগে যে তুমি আমাকে আমাদের বিবাহের কথা কইতে নিষেধ ক'রছিলে ?"

"একটু আগে কি ক'রছিলাম সে কথা ভুলে যাও। জানই তো মেয়েদের মতি বড় চঞ্চল। স্ত্রীজাতির এ একটা বিষম দুর্ব্বলতা।"

"এ দুর্ব্বলতার জন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তা হ'লে আমি দিন স্থির ক'রব ?"

"যখন তুমি এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ—তখন দিন স্থির কর।"

হোরেস মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল—"আইন অনুসারে এক পক্ষের পূর্ব্বে আমাদের বিবাহ হ'তেই পারে না—সুতরাং আজ হ'তে এক পক্ষ পরে আমাদের বিবাহের দিন স্থির হ'ক।"

মার্সি বলিল—"এত শীঘ্র হ'তে পারে না।"

"কেন পারে না? আমার সব আয়োজন প্রস্তুত। আর আমাদের এ বিবাহে কোন লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা হবে না। তুমি তো পূর্ব্বেই সে কথা ব'লে রেখেছ। তবে আর দেরি কেন? আইনে না বাধলে—কালই আমাদের বিবাহ হ'তে পারত। তা হ'লে এখন বল যে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি হ'লে?"

মার্সি এতক্ষণ অতি কষ্টে যে প্রসন্নতার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল—সে বেশ সহসা স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে হোরেসের দিকে চাহিয়া রহিল।

হোরেস বলিল—"গ্রেস, তুমি এমন গম্ভীর হ'য়ে যাচ্ছ কেন? বিবাহের কথা—আনন্দের কথা। শুধু একটি মাত্র কথার অপেক্ষা—বল "হাঁ", তা হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যায়।"

মার্সি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"হাঁ"। হোরেস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেল—মার্সি ধীর ভাবে বলিল—"আমাকে এখন একটু একাকী থাক্‌তে দাও; দয়া ক'রে আমাকে একটু নির্জ্জনে চিন্তা ক'রতে দাও।"

মার্সির আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল। হোরেস তাহা দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সে বলিল—"আমি জ্যানেটের সঙ্গে দেখা ক'রতে চ'ললাম; এর পূর্ব্বে তিনি আমাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখেছিলেন; আমি গিয়ে বলি এইবার আমি পরম সুখী হ'য়েছি। আর এ সুখের কারণ কি—তাও তাঁকে জানাই গিয়ে।"—তার পর মার্সির দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি এখান হ'তে চলে' যেও না; তোমার মন একটু স্থির হ'লে আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চাই।"

"আমি এইখানেই থাক্‌ব।"

হোরেস চলিয়া গেল।

মার্সির মস্তক চেয়ারে নত হইয়া পড়িল। তাহার হাত দুইটি তাহার অঙ্কের উপর শিথিল ভাবে লুটাইয়া পড়িল। তাহার চিত্ত যেন কি এক ভীষণ আঘাতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। সে জাগ্রৎ, না স্বপ্নালোকে বিচরণ করিতেছে? সত্যই কি সে পক্ষান্তে হোরেসকে বিবাহ করিবে বলিয়া কথা দিয়াছে? পক্ষান্তে? ইহার মধ্যে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সে এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে কোন উপায়ে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। সে ভাবিল—ফলাফল যাহাই হউক সে নিভৃতে জুলিয়ানের সহিত সাক্ষাতের বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে। জুলিয়ানের সহিত সাক্ষাতের কথা মনে হওয়াতে মার্সির শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন জুলিয়ান সেই মুহূর্ত্তে সেই গৃহে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। জুলিয়ান যেন তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মোহিনী শক্তির দ্বারা তিনি যেন মার্সির জঘন্য হৃদয়ের লুক্কায়িত পাপের সংবাদ জানিয়া লইয়াছেন—মার্সির কণ্ঠস্বরে যেন তাহার পাপের সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে—মার্সির কম্পিত হস্তে তাঁহার হস্ত স্থাপন করিয়া তিনি যেন তাহার কলঙ্কের কাহিনী অনুভব করিয়া লইয়াছেন। তিনি যেন বিধাতা-প্রেরিত বিচারকের ন্যায় মার্সির মুখ

হইতে একটী একটী করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন। মার্সি যেন তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে আপনার পাপের কথা স্বীকার করিয়াছে। তাহার উত্তেজিত কল্পনা তাহার সম্মুখে এই সকল দৃশ্য যতই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল—ততই যেন তাহার অন্তরাত্মা কি এক অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

জুলিয়ানের সহিত নিভৃতে যাহাতে তাহার সাক্ষাত না হয়—সে তাহার উপায় অবলম্বন করিয়াছে সত্য; কিন্তু যখন এই গৃহে তিনি থাকিবেন তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাত তো অনিবার্য্য। কোন সময়ে জুলিয়ানের সহিত তাহার একবার সাক্ষাত হইলেই যে সে তাহার সকল রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বসিতে পারে! হৃদয়ের গোপনীয় কথা টানিয়া বাহির করিবার যে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা আছে! মার্সি কি সেই শক্তি অতিক্রম করিতে পারিবে? জুলিয়ানের কথা ভাবিয়া মার্সির পাপী হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

মার্সি তখন কাঁদিতে বসিল। সে কেন কাঁদিতেছে তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কি এক অবসাদের ভাব আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে—ধীরে তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল— গৃহের ভিতর ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ যেন অল্পে অল্পে তাহার নিকট ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর বোধ হইতে লাগিল। ধীরে—ধীরে সে তন্দ্রাভিভূত হইল। এ যেন ঠিক জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থা।

জ্যানেট ও হোরেস গৃহে প্রবেশ করিলেন। মার্সি তন্দ্রাবেশে বুঝিতে পারিল গৃহে যেন লোক প্রবেশ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে দেখিল—গৃহ শূন্য। জ্যানেট ও হোরেস তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবার তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল—আবার সে তন্দ্রার ঘোরে অবসন্ন হইল। ধীরে ধীরে মার্সি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

তামাকু-তত্ত্ব

[শ্রীঅঃ—]

সংবাদ পড়িয়া আমাদের মাথা এমনি গুলাইয়া গিয়াছে যে আমাদের চিরপ্রচলিত সনাতন আর্য্য আচার গুলির মধ্যে কী যে গভীর অধ্যাত্ম রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, মানিতে চাই না এবং কেহ বুঝাইয়া দিলে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করি। Familiarity breeds contempt প্রবাদ কথাটা মিথ্যা নয়; বেশী ঘনিষ্টতার জন্য অনেক গভীর দার্শনিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমাদের কাছে অর্থহীন অকেজো ঘরোয়া বাজে ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইতেছে। কোন আচার ব্যবহার বা বস্তু বা তত্ত্বের ইতিহাস খুঁজিতে গিয়া আমরা পাশ্চাত্য গুরুদের বুলি আওড়াই আর নেহাৎ

মৌলিক গবেষণার গর্ব্ব জাহির করিতে হইলে তাঁহাদের তত্ত্বগুলির কাটছাঁট করিয়া একটা থাড়া করি আর বলি ইহা অমুক বা এই ইত্যাদি—।

এই ইংবাজি মোহের ফলে আমবা শিখিয়াছি তামাক বা তাম্রকুট...আমেরিকার দেশজ গাছ আব ওয়ালটার ব্যালি উহা প্রাচীন ভূখণ্ডে প্রথম আমদানি কবেন, আব পর্ত্তুগীজবা নাকি উহা ভারতে প্রথম প্রচলন করেন। এত বড় গুলিখুবী মিথ্যা প্রবাদ কখনো কেহ শুনিয়াছেন? তামাক যে বৈদিক যুগে ঋষি সমাজে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বেদেই আছে? এই সর্ব্বজ্ঞান মহাবত্নাকব...গোপ্যতত্ত্ব মহাবাবিধি রূপ বেদে নাই কি? ছিল নাই বা কি? আছেই বা না কি? একালেব প্রতীচ্য ভক্তদেব ধাবণা বেডিয়াম নাকি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেবা কয় বৎসব হইল বাহিব কবিয়াছেন! কিন্তু যে কেহ উপনিষদ্ পড়িয়াছেন তিনি জানেন ঋষিবা বেডিয়ামতত্ত্ব জানিতেন। মনে করুন সেই শোলোকটা..."তমেবভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—।" গোঁড়াবা বলিবেন উহা ব্রহ্ম কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ ঋষিরা গোঁড়ামিব যে কিরূপ ভক্ত ছিলেন তা মধু পর্কে ও "গবালম্ভনে" বুঝা যায়—সে যাক্ উক্ত শ্রুতিবাক্য যে বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম তত্ত্ব জ্ঞাপক তা'তে আর সন্দেহ আছে?

গুপ্তরত্ন মহাশয় বেডিয়মে হাত দেন নাই নচেৎ এ তত্ত্ব এতদিন গৌড় বাসীদের জ্ঞাননয়নকে উন্মিলিত করিত। তবে 'শিষ্যাহম্ তস্য গুরোর্গরীয়াণ্' মদীয় এই গরীয়সী শিষ্যবিদ্যায় তিনি নিশ্চয়ই গর্ব্বে নেপথ্যে দাড়ি বিস্ফাবিত করিবেন। যাউক বাজে কথা—

অদ্যকার আলোচ্য তামাকু-তত্ত্ব। অবান্তর কথা রাখিয়া আমি এখন দেখাইব তামাকুর ধূমপান বৈদিক যুগে আর্য্য সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। আমি দিব্য মানসী দৃষ্টিতে দেখিতেছি...পুণ্য নৈমিষারণ্যে সুৎ বেষ্টিত ঋষিদল...সুচিক্কন সদণ্ড নাবিকেল গর্ভযন্ত্র যোগে...কলিকাতে 'অগ্নিমীড়ে' যোগ করিয়া ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মার্পণং করিয়া...তরলিত ওঁকাব ধ্বনিতে সামগান কবিতেছেন ও নাসাপথে "আনন্দ বায়ু" বিচরতি করিতে করিতে ধূম মার্গে মিলিত আর্য আত্মাবা আনন্দ লোকে যাত্রা করেতেছেন। —অথর্ব্ব বেদের উত্তবাকাণ্ডের অন্তর্গত চর্ম্মচর্পটী * বল্লীতে "সোমান্তে পর মানৌ দেবৈকমাতা" এই উক্তিটী দেখা যায়। জ্যেষ্ঠতাত সায়ন ইহার কুলকিনারা করিতে পারেন নাই। গোঁজা দিয়া গিয়াছেন। শংকরেব অশ্মসারময় ধীশক্তি কঠিন কোনো কিছুর অর্থ উৎপাটন কবিতে গিয়া কতই কদর্থ করিতেন তাহা তো গুরুবৎ গুপ্তবত্ন মহাশয় কত বার দেখাইয়াছেন। আমি কিন্তু গুরু কৃপায় ইহার অর্থ বাহির করিয়াছি; কেবল সুধী জনেব সুবুদ্ধি প্রণোদিত বিশ্বাস দরকার। পাঠক জানেন অকস্ম বামা গতি; বেদ ছন্দ গুনিত মাত্রায় বচিত বলিয়া উহাকে—সটীক ভট্ট বেদাঙ্কও বলেন। বেদাঙ্গ নয়, পাঠক ভুল কবিবেন না। এই সূত্রানুসাবে "দেবৈকমাতা"—"তামাক বৈ দে—" "তামাক বঃ ইদে"—"আমাদের তামাক দে"। অনেকে এই ভাবিয়া হয়তো হাসিবেন যে "ঋষিরাও 'তামাক দে' বলিয়া ডাক দিতেন!! অসম্ভবটা কি? ঋষিবা যদি পাশা খেলিতে পারিতেন, সোমপান করিয়া 'glad" হইতে পাবিতেন

তবে তামাক খাওয়াটার বৈচিত্র্য কি? জীব দেহ ধরিলে সোমপান, ধূমপান ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বিহিত কর্ম্ম। গীতা বলেন—ন হি ভিষ্ঠ্যত্য কর্ম্মকৃৎ ক্ষণমপি ইত্যাদি। জন্মিয়া জীবন ধারণ করিতে গেলে পানাদি বিহিৎ কর্ম্ম বটেই।

এ কথায় যদি কেহ বলেন সোমপান উত্তেজক মাদক দ্রব্য নহে; উহা ব্রহ্মজ্ঞানের Symbol বা প্রতীক। ৺বটব্যাল প্রভৃতি মনীষীরা উহা প্রমান করিয়াছেন। খাতিরে না হয় মানিলাম যদিচ আমার মতে ব্রহ্মজ্ঞানই মাদকরসের Symbol বা প্রতীক। এটা Esoteric view; গোপ্যরহস্য। সাধারণের জ্ঞাতব্য নহে! সে যাউক—সোম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতীক ধরিলেও আমি পশ্চাৎপদ নহি; আমিও দেখাইব তামাকুও সপ্ততত্ত্বের প্রতীক। 'ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎব্যোম কাষ্ঠ লোষ্ট্র' এই সপ্ততত্ত্বে চতুর্দ্দশভুবন ও জাগতিক দ্রব্যাদির সৃষ্টি ইহা সকলেই মানিতে বাধ্য। প্রাচীনতম ঋষিরা পঞ্চভূতেতর কাষ্ঠ লোষ্ট্র দুই তত্ত্ব বাদ দিয়াছিলেন কেন জানিনা, বোধ হয়—কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমজ্ঞান থাকার জন্য। যাহাই হউক তামাকু যোগে ধূম পান ব্যাপার থানার মূলে একটী গভীর আর্যবিজ্ঞানতত্ত্ব, ইহার রূপকের খোসাটায় বস্তুতান্ত্রিক নব্যরা খুব ভক্ত হইয়াছেন, ইহার যে কুটস্থ অধ্যাত্ম অর্থটা তাহা হারাইয়া ফেলিয়া আমরা ... ব্যাকুব জাতি কাঞ্চণ ত্যাগ করিয়া কাচে মজিয়াছি। অহো কি দুর্ম্মদ দুর্ভাগ্য!

এখন দেখা যাউক সপ্ততত্ত্ব ভজনাটা তামাকুতে কেমন করিয়া সিদ্ধ হয়। সুধী এবং রসজ্ঞ মাত্রেই জানেন—আমরা কলিকাতে ঠিকরা দিয়া তাহাতে তামাকু দিই. তদুপরি অগ্নি সংযোগ করি, এবং হুকার বদনরন্ধে অধরযোগ করত—মৌখিক প্রাণায়াম সাধন করি (পুরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিক্রিয়া দ্বারা ধূম গ্রহণ ধারণ ও বর্জ্জন করাকেই মৌখিক প্রাণায়াম কহা গেল)

পাঠক দেখিলেন তামাক খাওয়া মানেই একপ্রকার বায়ব্য যোগ সাধন। 'ত্রিতন্ত্র যোগ বিলাস' গ্রন্থে—মুনি সদাভরপুরানন্দ এই তামাকুসেবনে হট, রাজ ও অধ্যাত্ম যোগের সমন্বয় করিয়াছেন। এ গ্রন্থ খুবই সুদুর্লভ টুবিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যায়তনের লাইব্রেরীতে এক খানি কীটদষ্ট কাপি আছে; তাহা হইতে আমার এ তত্ত্ব সংগ্রহ। যাউক সে কথা।

এখন সপ্ততত্ত্ব বিস্তার ব্যাখ্যা শুনুন—

(১) তামাকু	=	ক্ষিতিতত্ত্ব,—	গন্ধ ইহার ধর্ম্ম বলিয়া।
(২) টীকা, গুল, কাষ্ঠ	=	তেজ (অগ্নি) তত্ত্ব—জ্যোতি	... ... ।
(৩) ঠিক্‌রে	=	লোষ্ট্র তত্ত্ব—	ছিদ্র বন্ধ করে বলিয়া।
(৪) হুকার জল	=	অপ তত্ত্ব—	রস ইহার ধর্ম্ম বলিয়া।
(৫) ধোঁয়া	=	মরুৎ তত্ত্ব—	উর্দ্ধগতি প্রবাহ, ইহার ধর্ম্ম।
(৬) নলচে ও খোল	=	কাষ্ঠ তত্ত্ব—	আধার ও ধারণ ইহার ধর্ম্ম।
(৭) সশব্দ টান্	=	ব্যোম তত্ত্ব—	শব্দ ও স্তব্ধতা ইহার ধর্ম্ম বলিয়া

ইহার নিভৃত বহির্শব্দাত্মক অপ্রকাশনীয় মন্ত্র য, ড়, ল ন, ড়, ণ য, র্‌, ল ক, র, ল গ, র, ল...। ইহার আর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিৎ নয়। মন্ত্র গোপনীয় ব্যাপার।

গুরুমুখী এ তত্ত্ববিদ্যা-বিলুপ্তোষিনী তন্ত্রেশ্বরী গ্রন্থে শিব ভক্তবৃন্দকে উবাচ করিয়াছেন. —(এ যোগে নারী অনধিকারিনী বলিয়া) —"কলৌ ত্রিতন্ত্র যোগং" কলিতে তামাকু সেবনই মহা যোগ। তবে দুর্ভাগ্য বশতঃ সজ্ঞানে এ সাধনা কেহ করেন না। অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ—প্রচ্ছবেদাৎ (লুকিয়ে লুকিয়ে সকলে এ যোগ সাধন করেন।)

শাস্ত্রীয় মতে সজ্ঞানে এযোগ সাধন কলিতে কেবল দু'এক স্থানে হয়। তন্মধ্যে পীঠস্থান ব্রহ্মপুরে—কলির নৈমিষারণ্য শ্রীধাম রমণা-শ্রমে—ইহার সাধনা এখনো নাকি হয়। তথায় সুৎস্থানীয় গুরু চন্দ্রাচার্য্য তদীয় প্রধান শিষ্য সট্টীকভট্ট ও অন্যান্য সাধকবৃন্দ মধ্যে নামোল্লেখ যোগ্য শ্রীহরানন্দ, শ্রীজ্ঞানো-পানন্দ, বায়কুণ্ঠাচার্য্য ইত্যাদি, এ অধম লেখকও উঁহাদেরি পদারবিন্দাশ্রিত, একটী কীট।

(আগামী বারে আফিঙ্গতত্ত্ব আলোচনা করা যাইবে)

জামাইবাবু !

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে একখানি ট্রেণের ইণ্টার ক্লাশ কামরার সামনে কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে; ট্রেণখানি অল্পক্ষণ পরেই ছাড়িবে। তাঁদের অধিকাংশেরই চোখে চশমা, মাথায় টেরি হাতে ঘড়ি ও ছড়ি, মুখে বিড়ি—থুড়ি—হাভেনা চুরুট অথবা মিকশ্চার তৈরী; ফাগুনের হাওয়া বইছে, দুই একটা কোকিল কুজনও মাঝে মাঝে শোনা যায়, সুতরাং বসন্ত এসেছে এটা ধরে নেওয়া যায়। তাঁদের চুড়িদার পাঞ্জাবী ও আভুমি লম্বিত উড়ানী হাওয়ায় কভু উড়িতেছে, কভু নিশ্চল। একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেই কামরার নিকটে অসিয়া গাড়ী-খানি খালি দেখিয়া তাহাতেই উঠিলেন, এবং একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া-সেই যুবকদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভদ্র-লোকটীর গায়ে একটী লংক্লথের পাঞ্জাবী, এক খানি সামান্য আলোয়ানও সঙ্গে আছে, কারণ সবে ফাল্গুনের মাঝামাঝি এখনও রাত্রিতে শীত আছে। ক্রমে বাঁশি বাজিল। ফ্ল্যাগ উড়িল ও গাড়ী ছাড়িল। যুবক কয়টি এক-দিকের জানালার ধার ঘেঁষিয়া বসিল। গাড়ী বেশ চলিতেছে, এমন সময় যুবকদের ভিতর একজন, প্রভাতপ্রসুন বাবু বলিলেন, "ওহে নীহার একটা গান ধর না, মুখ বুজে যাওয়া যায় কি ?" নীহার কান্তি বাবু অমনি গান ধরিলেন,—

"কোন খানে কোন গগনের মাঝখানে
শত বসন্ত ছিল ঘুমন্ত, জাগিল কাহার
আবাহনে।"

তারপর ট্রেণখানি একটী ষ্টেশনে থামিল, অমনি গানও থামিল। কারণ অনেকেরই ট্রেণে উঠিলে গান গাহিবার সাধ হয়, কিন্তু ট্রেণ খানি ষ্টেশনে আসিলেই তাহাদের গান বন্ধ হইয়া যায়, কারণ ট্রেণের "ঐক্যতান বাদন" থামিলেই গানের 'সঙ্গত' ত আর হয় না ! যাহো'ক দু'একটী ষ্টেশন পার হইবার

পর নীহার বাবু আবার গান ধরিলেন,—"ময়লা দিদি লো তোর ময়লা বড় প্রাণ।" তখন সকলে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ থাম, একজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, ও গান কি গায়!" যা'হোক এই বার গান থামিল। সুন্দরী মোহন বাবু যার নাম, তিনি এতক্ষণ টাইম টেবেলের পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া কি দেখিতে ছিলেন তিনিই জানেন, হঠাৎ চশমাটী খুলিয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে প্রভাত তোর ঘড়ীতে ক'টা বাজলো দেখত?" প্রভাত বাবু হাতটী কানের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওই যাঃ! আমার ঘড়ি বন্ধ হ'য়ে গেছে, ভাই আমার শ্বশুর বেটা যা ঠকিয়েছে তা আর বলবার নয়. কোথাথেকে একটা 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' রিষ্ট ওয়াচ কিনেছে, দিনে দু'বার বন্ধ হ'য়ে যায়।" নীহারকান্তিবাবু তাঁহাকে 'সেকেণ্ড' করিয়া বলিলেন "আরে ভাই ও কথা তুলিস না, আমার শ্বশুর লোকটা আবার আরও ছোট লোক! কালো একটা মেয়ে বিয়ে করলাম তাত তোরা দেখেছিস্, তার পর যা বা দেবার কথা, তিন বছর হ'ল সেই মেয়ের ছেলে হ'তে চললো তবু তিনি দুখানা গয়না, আজ পর্য্যন্ত দিলেন না।" সুন্দরী বাবু 'থার্ড' করিয়া বলিলেন, "আর ভাই শ্বশুর বর্গের কথায় কাজ নেই—আমার বিয়েতে নগদ টাকা যা দেবার কথা, তা ত দিতে পারলে না, বিয়ের সময় বললে এই বছরের মধ্যেই বাকী টাকা শোধ করে দেব, বছর পুরে গেল, তখন এসে বললে, আর একটী কন্যাদায়ে পড়েছি এটী উদ্ধার হ'লেই দেব। সেটা গেল, তার পর এই দিচ্ছে আর কি। আমিও ত ক্রমে ছাড়বার পাত্র নই? চোবের মেয়েকে বিয়ের পর থেকে বাপের বাড়ীর দিকে মুখ ফিরুতে দিই নি।"

প্রৌঢ় ভদ্র লোকটী বেশ মনোযোগ দিয়া এঁদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়রা কোথায় যাবেন?"

প্রভাতপ্রসুন বাবু উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে—আমরা কলকাতায় যাব।"

ভদ্র। কোথায় আসা হ'য়েছিল?

প্রভাত। কাল এক ফ্রেণ্ডের বিয়েতে বর্দ্ধমানে এসেছিলাম, আজ ফিরছি।

ভদ্র। আপনারা কি করেন? কলেজে পড়েন টড়েন বোধ হয়?

প্রভাত। আজ্ঞে হ্যা, আমি এবার ল' ফাইন্যাল দেব, নীহার বাবু গেল বার এম-এ, পাশ করেছেন, বিশেষ কিছু করেন না, আর উনি এবার বি-এস্ সি দেবেন, ফিজিক্‌সে অনার্স আছে।" এই রূপে তিনি সকলের পরিচয় দিয়া ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন?"

ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি আপনাদেরই সঙ্গী, আমিও কলকাতা যাব।"

নীহার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কলকাতাতেই বোধ হয় চাকরী করেন, এখান থেকে কি ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করেন নাকি? ডেলি প্যাসেঞ্জারী বড় বদারেশন!"

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে না, এই বর্দ্ধমানের নিকটেই আমার বাড়ী, আমি আগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সম্প্রতি রিটায়ার করেছি; কলকাতায় আমার জামাই আছেন, লোহার কারবার করেছেন, তাঁদের দেখতে যাচ্ছি! ভাগ্যিস্ মশাই আপনাদের মত পাশ করা জামাই খুঁজিনি, তা'হলেই

হয়েছিল আর কি! তিনিও বোধ হয় আপনাদের মত আমার সঙ্গে 'শ্বশুর সম্বন্ধ' না রেখে অনেক মধুর কথা শোনাতেন! আপনাদের শ্বশুরদের খুব সৌভাগ্য যে খুঁজে খুজে আপনাদের মত সুপাত্র বের করেছেন।—"

ভদ্রলোকটীর কথা শেষ হইতে না হইতে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, সেটা ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন। যুবক কয়জন তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি আমার উপর রাগ ক'রে—" "আজ্ঞে না, এই খান থেকে আমাদের এক ফ্রেণ্ড—" বলিতে বলিতে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। ট্রেণ ছাড়িলে দূরের এক খানা কামরা হইতে তাঁহাদের উড়ানী উড়িতে দেখা গেল।

মঞ্জরী

সত্যানুসরণ

অবিশ্বাসী ও বহুনৈষ্ঠিকের হৃদয়ে ভক্তি আস্‌তেই পারে না।

ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে; আর আসক্তি বহুর জন্য একেকে ভালবাসে।

আসক্তিতে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, আর ভক্তিতে পরার্থে আত্মতুষ্টি!

ভক্তির অনুরক্তি সৎএ, আর আসক্তির নেশা স্বার্থে, অহংএ।

আসক্তি কামের পত্নী, আর ভক্তি প্রেমের ছোট ভগিনী।

অনুভূতির দ্বারা যা' জানা যায় তাই জ্ঞান।
জানাকেই বেদ বলে, আর বেদ অনন্ত।
যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিৎ।

জ্ঞান ধাঁধাঁকে ধ্বংস ক'রে মানুষকে প্রকৃত চক্ষুদান করে।

জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে নির্দ্দেশ করে, আর বস্তুর যে ভাব জান্‌লে জানা বাকি থাকে না, তাই তার স্বরূপ।

ভক্তি চিত্তকে সৎএ সংলগ্ন ক'রতে চেষ্টা করে, আর তা' হ'তে যেরূপ উপলব্ধি হয় তাই জ্ঞান।

অজ্ঞানতা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে। অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ, আর জ্ঞানই আনন্দ।

তুমি যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হবে, ততটুকু শান্ত হবে। তোমার জ্ঞান যেমনতর, তোমার স্বচ্ছন্দে থাক্‌বার ক্ষমতাও তেমনতর।

অহঙ্কার যত ঘন, অজ্ঞানতা তত বেশী; আর অহং যত পাতলা জ্ঞান তত উজ্জ্বল।

সন্দেহ অবিশ্বাসের দূত, আর অবিশ্বাসই অজ্ঞানতার আশ্রয়।

সন্দেহ আস্‌লে তৎক্ষণাৎ তা' নিরাকরণের চেষ্টা কর, আর সৎচিন্তায় নিমগ্ন হও—জ্ঞানের অধিকারী হবে আর আনন্দ পাবে।

অসৎ চিন্তায় কুজ্ঞান বা অজ্ঞান বা মোহ জন্মে, তা পরিহার কর, দুঃখ হ'তে রক্ষা পাবে।

তুমি অসৎএ যতই আসক্ত হবে ততই স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন হবে আর ততই কুজ্ঞান বা মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়বে; আর রোগ,

শোক, দারিদ্র্য, মৃত্যু ইত্যাদি যন্ত্রণা তোমার উপর ততই আধিপত্য করবে, ইহা নিশ্চয়।

অহঙ্কার আসক্তি এনে দেয়; আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি; স্বার্থবুদ্ধি আনে কাম; কাম হ'তেই ক্রোধের উৎপত্তি; আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা।

ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান; জ্ঞানেই সর্ব্বভূতে আত্মবোধ হয়; সর্ব্বভূতে আত্মবোধ হ'লেই আসে অহিংসা; আর অহিংসা হ'তেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোন একটীর অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে।

অহঙ্কার থেকেই আসক্তি আসে; আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা আসে; আর অজ্ঞানতাই দুঃখ।

সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে; আর অবিশ্বাসই জড়ত্ব।

আলস্য থেকেই মূঢ়তা আসে; আর মূঢ়তাই অজ্ঞানতা।

বাধাপ্রাপ্ত কামই ক্রোধ; আর ক্রোধই হিংসার বন্ধু।

স্বার্থবুদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায়ই লোভ; আর এই লোভই আসক্তি। যে নির্লোভ সেই অনাসক্ত।

সরল সাধুতার মত আর চতুরতা নেই;—

যে যেমনই হোক্ না কেন এ ফাঁদে ধরা পড়্‌বেই প'ড়্‌বে।

বিনয়ের মত সম্মোহনকারক আর কিছুই নেই।

প্রেমের মত আকর্ষণকারীই বা আর কে?

বিশ্বাসের মত আর সিদ্ধি নেই।

জ্ঞানের মত আর দৃষ্টি নেই।

আন্তরিক দীনতার মত অহঙ্কারকে জয় করার আর কিছুই নেই।

সদ্‌গুরুর আদেশ পালনের মত আর মন্ত্র কি আছে?

চল, এগিয়ে যাও, রাস্তা ভেবেই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড় না, তা' হ'লে আর যাওয়া হবে না।

যে আগে ঝাঁপ দিয়েছে, আগে পথ দেখিয়েছে, সেই নেতা; নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া যায়।

আগে অন্যের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ঢেলে দাও, দশের পায়ে মাথা বিক্রয় কর, আর কারো দোষ ব'লে দোষ দেখা ভুলে যাও, সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। নতুবা ওসব কেবল মুখে মুখে হয় না।

যদি নেতা হ'তে চাও, তবে নেতৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ কর, আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যথাসর্ব্বস্ব পণ কর, আর যা' মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই ক'রে দেখাও আর সকলকে প্রেমের সহিত বল, দেখ্‌বে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ ক'র্‌বে।

নির্ভর কর, আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ ক'রে যাও; লক্ষ্য রেখো, তোমা হ'তে তোমার নিজের ও অন্যের কোনরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখ্‌বে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।

কথায় আছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।" তা' ঠিক; বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই তিনটিই বীরত্বের লক্ষণ।

নাম যশ আত্মোন্নয়নের ঘোর অন্তরায়। তোমার একটু উন্নতি হ'লেই দেখ্‌বে কেউ তোমাকে ঠাকুর বানিয়ে ব'সেছে, কেউ মহাপুরুষ বল্‌ছে, কেউ অবতার, কেউ সদ্‌গুরু ইত্যাদি বল্‌ছে; আবার কেউ শয়তান,

বদ্‌মায়েস্, কেউ ব্যবসাদার ইত্যাদিও বল্‌ছে, সাবধান! তুমি এদের কা'রো দিকে নজর দিও না। তোমার পক্ষে এরা সবাই ভূত, নজর দিলেই ঘাড়ে চেপে বস্‌বে, তা ছাড়ানও মহা মুস্কিল। তুমি তোমার মত কাজ ক'রে যাও, যা' ইচ্ছে তাই হোক্।

নাম যশ ইত্যাদির আশায় যদি তোমার মন ভক্তের আচরণ করে, তা' হ'লে ত মনে কপটতা লুকিয়ে রয়েছে,—তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে বের ক'রে দাও তবেই মঙ্গল, নতুবা সবই পণ্ড হবে।

ঠাকুর, অবতার কিম্বা ভগবান ইত্যাদি হ'বার সাধ গেলেই তুমি নিশ্চয় ভণ্ড হ'য়ে প'ড়বে, আর তাতে মুখে হাজার বল্লেও কাজে কিছুই করতে পার্‌বে না। যদি ওরূপ ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে এখনি ত্যাগ কর, নতুবা অমঙ্গল নিশ্চয়।

তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবেন এবং নিজের ভিতরে তেমন অধিকারও দেবেন; ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ক'চ্ছ; তবে আর চাইবে কি? প্রাণপণে প্রকৃত হ'তে চেষ্টা কর। প'ড়ে না পাশ কর্‌লে কি ইউনিভারসিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে?

ভুলেও নিজেকে প্রচার কর্‌তে যেওনা বা নিজেকে প্রচার কর্‌তে কাউকে অনুরোধ ক'র না—তা হ'লে সবাই তোমাকে ঘৃণা কর্‌বে আর তোমা হ'তে দূরে স'রে যাবে।

তুমি যদি কোনও সত্য জেনে থাক, আর তা' যদি মঙ্গলপ্রদ ব'লে জান, প্রাণপণে তারই বিষয় বল, এবং সবা'কে জানাতে অনুরোধ কর, বুঝ্‌তে পার্লে সবাই তোমার কথা শুন্‌বে এবং তোমার অনুসরণ কর্‌বে।

তুমি যদি সত্য দেখে থাক, বুঝে থাক, তবে তোমার কায়মনোবাক্যে তা' ফুটে বেরুবেই বেরুবে। তুমি তাতে হারিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারবে না; সূর্য্যকে কি অন্ধকার ঢেকে রাখ্‌তে পারে।

তোমার ভিতরে যদি সত্য না থাকে, তবে হাজার বল, হাজার ভাণ কর, হাজার কায়দাই দেখাও, তোমার চরিত্রে, তোমার মনে, তোমার বাক্যে তার জ্যোতি কিছুতেই ফুট্‌বে না; সূর্য্য যদি না থাকে, তবে বহু আলোও অন্ধকারকে একদম্ তাড়িয়ে দিতে পারে না।

যে সত্য প্রচার কর্‌তে গিয়ে আপন মহত্বের গল্প করে, এবং সব সময় আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত, আর নানা রকমের কায়দা ক'রে নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায়, যার প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে ঝলকে ঝলকে অহঙ্কার ফুটে বেরুচ্ছে, যার প্রেমে অহঙ্কার, কথায় অহঙ্কার, দীনতার অহঙ্কার, বিশ্বাসে জ্ঞানে ভক্তিতে নির্ভরতায় অহঙ্কার,—সে হাজার পণ্ডিত হোক্, আর সে যতই জ্ঞান-ভক্তির কথা বলুক্ না কেন, নিশ্চয় জেনো সে ভণ্ড; তার কাছ থেকে বহুদূরে স'রে যাও; শুনো না তার কথা; কিছুতেই তার হৃদয়ে সত্য নেই; মনে সত্য না থাক্‌লে ভাব কি ক'রে আস্‌বে?

প্রচারের অহঙ্কার প্রকৃত প্রচারের অন্তরায়। সে-ই প্রকৃত প্রচারক যে আপন মহত্বের কথা ভুলেও মুখে আনে না, আর শরীর দ্বারা সত্যের আচরণ করে, মনে সত্য-চিন্তায় মুগ্ধ থাকে এবং মুখে মনের ভাবানুযায়ী সত্যের বিষয় বলে।

যেখানে দেখ্‌বে কেউ বিশ্বাসের গর্ব্বের সহিত সত্যের বিষয় ব'লছে, দয়ার কথা ব'লতে ব'লতে আনন্দে এবং দীনতায় অধীর হ'য়ে প'ড়ছে, প্রেমের সহিত আবেগভরে সবাইকে ডাক্‌ছে, আলিঙ্গন ক'রছে, আর যে মুহূর্ত্তে

তার মহত্ত্বের কথা কেউ ব'লছে, তা' স্বীকার ক'রছে না, বরং দীন এবং ম্লান হ'য়ে বুক-ভাঙ্গা মত হ'য়ে প'ড়ছে,—খুবই ঠিক, তার কাছে উজ্জ্বল সত্য আছেই আছে, আর তার সাধারণ চরিত্রেও দেখ্‌তে পাবে সত্য ফুটে বেরুচ্ছে।

তুমি ভক্তিরূপ তেলে জ্ঞানরূপ প'লতে ভিজিয়ে সত্যরূপ আলো জ্বালাও, দেখ্‌বে কত ফাড়িং, কত পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ তোমাকে কেমন ক'রে ঘিরে ধ'রেছে।

য সৎকেই চিন্তা করে, সৎকেই যাজন করে, যে সত্যেরই ভক্ত, সেই প্রকৃত প্রচারক।

আদর্শে গভীর বিশ্বাস না থাক্‌লে নিষ্ঠাও আসে না ভক্তিও আসে না; আর ভক্তি না হ'লে অনুভূতিই বা কি হবে, জ্ঞানই বা কি হবে, আর সে প্রচারই বা ক'রবে কি?

প্রকৃত সত্য-প্রচারকের অহঙ্কার তার আদর্শে; আর ভণ্ড প্রচারকের অহঙ্কার আত্মপ্রচারে।

যা' মঙ্গল ব'লে জান্‌বে, যা সত্য ব'লে জান্‌বে, মানুষকে ব'লবার জন্যে বুক ফাটো ফাটো হ'য়ে উঠ্‌বে। মানুষ তোমাকে যাহা বলুক না কেন মনে কিছুই হবে না; কিন্তু মানুষকে সত্যমুখী দেখ্‌লে আনন্দ হবে;—তবেই তাকে প্রচার বলি।

ঠিক ঠিক বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভক্তি না থাক্‌লে সে কখনই প্রচারক হ'তে পারে না।

যে নিজেকে প্রচার করে সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে, আর যে সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে তার বিষয় বলে, সেই কিন্তু ঠিক ঠিক আত্ম-প্রসার করে।

প্রকৃত সত্য-প্রচারকই জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তার দয়ায় কত জীবের যে আত্মোন্নয়ন হয় তার ইয়ত্তা নেই।

তুমি সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ থাক, হৃদয়ে ভাব আপনিই উথ্‌লে উঠ্‌বে আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, কত লোকের উন্নতি হবে তার কিনারা নেই।

গুরু হ'তে চেও না। গুরুমুখ হ'তে চেষ্টা কর, আর গুরুমুখই জীবের প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা।

দেহ থাক্‌তে অহঙ্কার যায় না, আর ভাব থাক্‌তেও অহং যায় না। তবে নিজের অহং আদর্শের উপর দিয়ে, passive হ'য়ে, যে যত থাক্‌তে পারে সে তত নিরহঙ্কার এবং সে তত উদার।

নিজের গর্ব্ব যত না করা যায় ততই মঙ্গল, আর আদর্শের গর্ব্ব যত করা যায় ততই মঙ্গল।

পরমপিতাই তোমার অহঙ্কারের বিষয় হউন, আর তুমি তাঁতেই আনন্দ উপভোগ কর।

অসৎ আদর্শে তোমার অহঙ্কার ন্যস্ত ক'র না; তা হ'লে তোমার অহঙ্কার আরও কঠিন হবে।

আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভাল, কারণ যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নেবে তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে।

যখনই দেখ্‌বে মানুষ তোমাকে প্রণাম ক'রছে, আর তাতে তোমার বিশেষ কোন আপত্তি হ'চ্ছে না, মৌখিক এক একবার আপত্তি ক'রছ বটে, মনে বিশেষ একটা কিছু হ'চ্ছে না—তখনই ঠিক জেনো, অন্তরে চোরের মত হামবড়াই ঢুকেছে; তুমি যত শীঘ্র পার, সাবধান হও, নতুবা নিশ্চয় অধঃপাতে যাবে।

আর যখনই কেহ প্রণাম ক'রলেই অমনি দীনতায় তোমার মাথা হেঁট হ'য়ে যাচ্ছে, সেবা নিতে মন মোটেই রাজি নয়কো, বরং সেবা ক'রতে মন সকল সময় ব্যস্ত র'য়েছে,—

আদর্শের কথা ব'লতেই প্রাণে আনন্দ বোধ হ'চ্ছে—তোমার ভয় নেই, তুমি মঙ্গলের কোলেই র'য়েছ; আর নিয়ত আরও বেশী অমনি থাক্‌তে চেষ্টা কর।

তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন করি, আর আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধর সিদ্ধকাম হবে।

যদি তোমার আদর্শের কথা ব'লতে আনন্দ হয়, শুন্‌তে আনন্দ তাঁর চিন্তায় আনন্দ হয়, তাঁহার হুকুম পেলে আনন্দ, তাঁর আদরে আনন্দ, অনাদরেও আনন্দ হয়, তাঁর নামে হৃদয় উথ্‌লে উঠে, আমি নিশ্চয় ব'লছি তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেব না।

সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন কর, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ কর— আমি নিশ্চয় ব'লছি, তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাব্‌তে হবে না।

তুমি ভক্তিরূপ জল ত্যাগ ক'রে আসক্তিরূপ বালির চড়ায় বহুদূর যেওনা; দুঃখরূপ সূর্য্যো তাপে বালির চড়া গরম হ'লে ফিরে আসা মুস্কিল হবে; অল্প উত্তপ্ত হ'তে হ'চ্ছে যদি না ফিরে আস্‌তে পার, তবে শুকিয়ে ম'রতে হবে।

ভাবমুখী থাক্‌তে চেষ্টা কর, পতিত হবেনা বরং অগ্রসর হ'তে থাকবে।

গুরুমুখী হ'তে চেষ্টা কর, আর মনের অনুসরণ ক'রনা; উন্নতি তোমাকে কিছু ত্যাগ ক'রবে না।

বিবেককে অবলম্বন কর, আর মনের অনুসরণ ক'র না, উদারতা তোমাকে কখনও ত্যাগ ক'রবে না।

সত্যকে আশ্রয় কর, আর অসত্যের অনুগমন ক'র না; শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না।

দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও, অহঙ্কার তোমার কিছুই ক'রতে পারবে না।

যা' ত্যাগ ক'রতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট বা আসক্ত হ'য়ো না, দুঃখ হ'তে রক্ষা পাবে।

প্রেমকে প্রার্থনা কর, আর হিংসাকে দূরে পরিহার কর, জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে।

তোমার মনের সন্ন্যাস হোক্; সন্ন্যাসী সেজে মিছামিছি বহুরূপী হ'য়ে ব'স না।

তোমার মন সৎএ বা ব্রহ্মে বিচরণ করুক, কিন্তু শরীরকে গেরুয়া বা রংচঙ্গে সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ো না, তাহ'লে মন শরীরমুখী হ'য়ে প'ড়বে।

অহঙ্কার ত্যাগ কর, সৎস্বরূপে অবস্থান ক'রতে পারবে।

পুস্তক সমালোচনা

সহজিয়া।—শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট প্রণীত। ৪৪ ডি পুলিস হাসপাতাল রোড্, ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট হইতে শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নিদারুণ গ্রীষ্মের গুমটের সময় এক ঝলক দখিন হাওয়া যেরূপ আরামদায়ক, আজকালকার উপন্যাসের ভিড়ের গুমটের মধ্যে 'সহজিয়া'র আবির্ভাবও সেইরূপ। বৈচিত্র্যহীন প্রেমবিলাসী নাকীসুরের উপন্যাসের অত্যাচারক্লান্ত মনের উপর 'সহজিয়া' শান্তি-প্রলেপ।

প্রথমেই চোখে পড়ে পুস্তকখানির ভাষার ঐশ্বর্য্য ও ভঙ্গী। গল্পের উপলবন্ধুর পথে ভাষার উচ্ছ্বসিত নৃত্যবিলসিত গতি, কল্পনার মাধুর্য্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য উপন্যাসখানিকে এক অপূর্ব্ব কাব্যলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে। বইখানির কাব্য-উপন্যাস নাম সার্থক হইয়াছে। গদ্যেরও যে একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, সেই ছন্দের দোলায় ভাষাকে বসাইতে পারিলে পাঠকের মনও যে কবিদের "দোদুল-দোলায়" দুলিতে থাকে, 'সহজিয়া' পড়িতে গিয়া প্রতি পদে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সহজিয়ার সমস্তই সহজ। চিন্তা, ভাব বা ভাষা, কোথাও কৃত্রিম চেষ্টা বা কষ্ট-কল্পনার ব্যর্থতা ধরা পড়ে না। দেবব্রত, বিপ্রলব্ধা ও হাসির আত্মবিবৃতির মধ্যে এত-টুকু কুণ্ঠার জড়তা কৃত্রিমতার দৈন্য বা অতিশয়োক্তির মিথ্যা গর্ব্ব নাই। যে টুকু না বলিলে নয়, সকলেই আপন আপন সেইটুকু কথা মাত্র অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেই বিচিত্র ঘটনার সহজ সমাবেশে গল্পের অংশটি মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন কোন কুশলী মালাকরের নিপুণ হস্তের গাঁথনী। মালা গাঁথার সহজ সরল আনন্দ হইতেই সে গাঁথিয়া চলিয়াছে—কোন্ ফুলের পর কোন্ ফুলটী দিতেছে সে দিকে তা'র লক্ষ্যই নাই। কিন্তু মালা গাঁথা শেষ হইলে দেখা গেল যে ফুলের পর যে ফুলটি পড়িলে সৌন্দর্য্য সুষমা অক্ষুন্ন থাকে মালাকরের নিপুণ হস্ত কোন্ অলক্ষ্য নিয়মবলে আপনার অজ্ঞাতসারে সেইরূপ ভাবেই মালা গাঁথিয়া তুলিয়াছে।

তারপর উপন্যাসের মূল কথা:—মানুষ সহজকে জানে না, চেনে না, জান্‌তে চায় না। তাই যাহা তাহার পক্ষে সহজ, স্বাভাবিক, যাহা তাহার অন্তরের মধ্যেই আছে, তাহাকে পরিহার করিয়া সে যায় বাহিরে, বিশ্বে, যাহা অসহজ তাহারই অন্বেষণে। এই অসহজকে বরণ ও অধিকার করিবার আগ্রহ হইতেই মানুষের সাধনার উৎপত্তি। কিন্তু ইহার মধ্যে শুধু একটীকে লইয়াই জীবন নয়। সহজ এবং সাধনা উভয়কে লইয়াই জীবন সম্পূর্ণ। কিন্তু এ কথা মানুষ সহজে স্বীকার করে না। তাই যত দুঃখ, ভুল ভ্রান্তি, মায়ার বিক্ষেপ, ছায়ার অন্ধকার। দেবব্রত, বিপ্রলব্ধা, তুরীয়ানন্দ, ও হাসির জীবনের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার এই কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার শেষ কথা তিনি পুস্তকের শেষে দেবব্রতকে দিয়া বলাইয়াছেন—"এক সঙ্গে এই অস্তি নাস্তিকে দুঃখ সুখকে স্বীকার করাই সহজ দর্শন। একই কেন্দ্রে এই দুইকে স্বীকার না করাই ভুল, মায়া, মিথ্যা। কেবল সুখকে চাইলে সুখ থাকে না, ছুটে পালায়। আর কেবল দুঃখকে ত' কেউ চায়ই না—কিন্তু আমি জানি মানুষ অন্তরে অন্তরে এই দুটোকেই চায় এবং এক সঙ্গেই চায়। দোষের মধ্যে এইটুকু যে, সে জানে না যে সে এক সঙ্গে এবং সহজেই এই দুটোকে চাচ্ছে। এই অজ্ঞানই তাকে এই পরম অদ্বৈতের আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করেছে। এই দ্বৈতকে ধরেই যে তার অখণ্ডানন্দের অদ্বৈত অস্তিত্ব, এইটিই জানে না বলে সে গতির মধ্যে, চঞ্চলের মধ্যে স্থির হ'তে পারে না, তাই আনন্দের হাটে এসে কেবল নিরানন্দকেই কিনে বেড়ায়।"

গল্পের মধ্যে এইরূপ তত্ত্বকথার অবতারণা শুনিয়া অনেকে হয় ত' ভয় পাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের বলি—"মাভৈঃ"। 'সহজিয়া'র মধ্যে তত্ত্বকথার সত্য মহিমা আছে কিন্তু তত্ত্বের শুষ্ক কচ্‌কচি নাই। জীবনের 'সত্য' কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে উপন্যাসের মধ্য দিয়া 'সুন্দর' রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দে লীলায়িত, কল্পনায় উল্লসিত, ভাবে বিলসিত, ও সত্যে অলঙ্কৃত 'সহজিয়া' বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ।

দন্তবিকাশ—করিয়াছেন শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য গোস্বামী—আর তৎ পূর্ব্বে মুখোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী বি, এ,—দুই গোস্বামী প্রভু একই শ্রীপাট হইতে আমাদের প্রতি—তথা সমাজের প্রতি দন্তবিকাশ করিয়াছেন—আমরা বলি সাধু! সাধু!!—

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিয়াছেন—

"আমরা খাসা আছি—
হাস্য পেলেই হাস্য করি,
নৃত্য পেলেই নাচি"—

'খাসা' নিশ্চয়ই আছেন, নতুবা এমন বই লিখিতে পারিতেন না। ম্যালেরিয়া বধ কাব্য, মিলন মাধুরী, তামাক খাও প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বেশ ভালই লেগেছে। কিন্তু তাঁহার চৈতন্য-চুট্‌কি যে কেবল এক টানা বাড়িয়াই চলিয়াছে, নানা ভাবের নানা কথা থাকিলেও তাহার মধ্যে যে কোনও শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই ইহাতে পাঠসুখের অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। লেখকের রস-সাহিত্যে যেমন অনুরাগ, সার্থকতা ও তাঁর সাধনার অনুরূপ লাভ হয়েছে বলে মনে হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-কবিতা বা নিবন্ধের খুবই অভাব, নাই বলিলেই হয়। দুঃখ দৈন্য বিক্ষোভ মথিত বাঙ্গালী জীবনের মধ্যে যিনি হাস্য রসের অবতারনা করিয়া কিছুমাত্র আনন্দেরও সৃষ্টি করিতে পারিবেন তিনি দেশের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হাসি স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে অন্তর হইতে ফুটিয়া উঠে সেই হাসিরই আমরা সমাদর করিব। গোস্বামী মহাশয়ের কবিতার কোনও কোনও স্থলে সহজ সরল অনাবিল হাসির উৎস আছে —তত্রাচ কেন যে তিনি 'উসকুনী' দিয়া "দন্ত বিকাশ" করিবার প্রয়াসী—তাহা বুঝা গেল না।

যাহা হউক তাঁহার সংকল্প সাধু, ভবিষ্যতে তাঁহার দন্ত বিকাশ না দেখিয়া—হো হো হাসি শুনিতে পাইবার আশায় থাকিলাম। কাব্য জীবনের প্রভাতেই গোস্বামী কবি যে পূরবী রাগিণীতে 'বেলা শেষে' 'খেয়াঘাটে' 'অন্তিমে' 'শেষ নিবেদন' প্রভৃতি কবিতায় কাকুতি প্রকাশ না করিয়া—জোর হাসি না হোক অন্ততঃ দন্ত বিকাশও করিয়াছেন ইহা খুবই আশা ও আনন্দের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান যুগ। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত। রাড়ীখাল শ্রীরাম কৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে আশ্রম সম্পাদক শ্রীযুক্ত লাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ॥০ আট আনা।

গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁহার মত জানা শুনা সাহিত্যিক দু' একজন ছাড়া কাহারও কথা মনে পড়ে না। আজ প্রায় ১৪৫ বৎসর পূর্ব্বে 'বিবেকানন্দ চরিত' প্রকাশিত করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম উদ্যমের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা আমরা এখনও ভুলি নাই। বঙ্গ ভাষায় স্বামীজির এই জীবনী অতি দুর্লভ বস্তু।

তিনি যাহা লেখেন তাহা তাঁহার নিজের বিশিষ্ট লিখন ভঙ্গী ও রচনা চাতুর্য্যের পরিচায়ক। লেখার মধ্যে যে প্রসাদ গুণ থাকিলে বিষয়টি পাঠকের চিত্তগ্রাহী ও উপভোগ্য হয় তাহা তাঁহার বেশ আছে। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁহার মধুর ভাষায় বর্ত্তমান যুগ ও স্বামীজির বিষয় লইয়া আমাদের অনেক কথা শুনাইয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে এই রূপ পুস্তকের সমাদর হইবে!

Revolutionaris of Bengal (বাঙলার বিপ্লববাদী) শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার এম-এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট্ হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। খদ্দরে বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা। ইংরাজি বই হইলেও এই ধরণের বই এই নূতন বাহির হইল বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি।

বই খানিতে বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাস কর, পুলিন দাশ, যতীন মুখোপাধ্যায়, রাস বিহারী, শৈলেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অগ্নিযুগের যুগান্তরকারীদের কথা বিবৃত হইয়াছে। এই বই খানি পড়িয়া বাঙ্গলা দেশে কি প্রকারে এই আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া কোন দিকেই বা ইহার পরিণতি হইল তাহা বেশ বুঝা যায়।

হেমন্ত বাবু দেখিতেছি সব্যসাচী হইয়া পড়িয়াছেন—বাঙলা সাহিত্যে গল্প, প্রবন্ধ নক্সা প্রভৃতি লিখিয়াও তাঁহার অস্ত্র থামিল না, এবার আবার ভাষান্তরে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে দেখিতেছি। ইংরাজী লেখাতেও তাঁহার বিশিষ্ট

সহজ সরল ভাষাবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আশা করি লেখক বইখানিকে বাঙলা ভাষায় লিখিয়া সাধারণের পাঠোপযোগী করিবেন।

মর্ম্মবাণী ঃ শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক, শান্তিপুর নদীয়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।॰ আনা। কবিতার বই। লেখকের অনুভূতির পরিচয় আছে তবে তাহা কবিতায় তেমন ফুটে নাই, কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগে নাই—শেষ ভাগের অনেক গুলি কবিতা কাহাকে না কাহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা। সেগুলির মধ্যে লেখকের ঈশ্বর ও মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, গুণী লোকের উপর শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায়; সুন্দর এন্টিক কাগজে ছাপা।

বিবেকানন্দ চরিত ঃ অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজ ষ্ট্রীট্ মারকেট হইতে শ্রীলেখরাজ কোঁহার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

ছেলেদের উপযোগী করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখা। স্বামীজির জীবনের অনেক ঘটনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছেলেরা এই পুস্তক খানি পড়িয়া আনন্দ পাইবে আশা করি।

চোখের দেখা ঃ হরিহর শেঠ প্রণীত। চন্দন নগর পুস্তকাগার হইতে প্রকাশিত, মূল্য চার আনা। লেখক 'নিবেদন' করেছেন—"সংসারের পথে চল্‌তে চল্‌তে যখন যেটা দেখেছি বা দেখে ঠেকেছি এবং শিখেছি তখনই সেগুলি মনের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করে সংগ্রহ করে রেখেছি। * * *।

আমার পথে, আমার জীবনের সঙ্গে যার পরিচয় পেয়েছি তাই আদর করে রেখেছি" —লেখক সেই সংগৃহীত কথা গুলি একত্র করে সাধারণের সম্মুখে ধরেছেন। সংসার পথের অভিজ্ঞতার অনেক কথা তিনি সুন্দর ভাবে বলেছেন। অনেক সংসার পথের পথিকই পড়ে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে মিল দেখে আনন্দ পাবেন।

অসাধ্য সাধন।—প্রসিদ্ধ বাস-ব্যবসায়ী মেসার্স শর্ম্মা ব্যানার্জীর আবিষ্কৃত "নিরুপমা" তৈলের গ্রাহকদের উপহার দিবার জন্য লিখিত একখানি সুন্দর উপন্যাস। অনেক দিন হইতে তাঁহারা "নিরুপমা" তৈলের গ্রাহকদিগের মধ্যে এইরূপ উপন্যাস বিতরণ করিতেছেন।

পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে এই কৃতি ব্যবসায়ীদের বিষয় দু'একটি কথা বলা দরকার মনে করি। তাঁহারা আজ যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা বাঙালীর পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে বেশ গুণী লোক আছেন তাহা প্রত্যেক মাসের বিজ্ঞাপনগুলি দেখিলেই বলা যায়। তাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের মধ্যে বেশ একটা নূতন ধারা আনিয়াছেন। "হিমানীর" বিজ্ঞাপন নানা ভাবে আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহাদের সাধনা জয়যুক্ত হোক্।

বইখানিতে গল্পভাগের মধ্যে যে সব ঘটনার অবতারণা আছে আর্ট হিসাবে তাহার মূল্য বিশেষ না থাকিলেও লেখকের যে কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য্য আছে—ইহা নিশ্চয়। এই উপন্যাস খানির নায়ক তাহার জীবনে 'অসাধ্য সাধন' করিতে পারুন আর নাই পারুন; শর্ম্মা ব্যানার্জী যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'অসাধ্যসাধন' করিতেছেন এ কথা আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি।
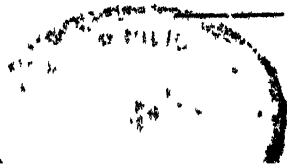
সানিয়াৎ সেন

জগ্‌লুল পাশা

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ | চৈত্র ১৩২৯ | ৯ম সংখ্যা

ইবসেন

[শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত]
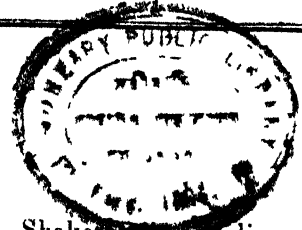
আধুনিক ইওরোপীয় নাট্যসাহিত্যরাজ্যে ইবসেনের স্থান সকলের বহু উর্দ্ধে। অন্যান্য কলাচর্চ্চার ন্যায় নাট্যকলাও সাধারণতঃ দুইটী ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া প্রসার লাভ করিয়া আসিতেছে :— প্রথম, বাস্তবাত্মক নাট্য বিষয় বা (realistic drama), দ্বিতীয় ভাবাত্মক নাট্য বিষয় বা (idealistic)। ইবসেন বাস্তবাত্মক নাট্যকারদের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

বিশ্বের সাহিত্য দরবারে ইবসেনের এই যে এত নাম যশ তাহার আবার দুইদিক আছে। অর্থাৎ তাঁহার কুযশও যেমন সুযশও তেমনি ; তবে স্তাবক ও নিন্দুক উভয়েই তাঁহার অসাধারণ নাট্যরচণা প্রতিভা অস্বীকার করেন না। কলাসৃষ্টি ব্যাপারে তিনি যে একজন প্রথম দরের কারিগর, Sophocles, Shakespeare, Moliere, Goethe প্রভৃতি কালবিজয়ী সুধীদিগের এক পর্য্যায়ে নামোল্লেখ যোগ্য একথা কলারসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন ; তবে নিন্দুক দলের আবির্ভাব কিসে হইল জিজ্ঞাস্য হইলে তাহার উত্তর এই :— ইবসেন শুধু কলা সৃষ্টি যোগে অলসের মনে আনন্দ মাত্র দিবার জন্যই কলা-সরস্বতীর সেবা করেন নাই ; আনন্দ দান তাঁহার গৌণ উদ্দেশ্য ; মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অধঃপতিত মানব জাতিকে তাহার গলিত পূতিগন্ধময় ধর্ম্ম ও সমাজ-শয্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেওয়া। ইহাতো ভাল উদ্দেশ্য তবে লোকে কেন তাঁহার নিন্দুক হইয়া দাঁড়াইবে? ইহার উত্তর সহজ :— এক শ্রেণীর মানুষ আছে তাহাদের ভাল

ভাবিয়া কেহ তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিলে তাহারা চটিয়া লাল হয়। প্রাণী বিশেষ যেমন পূতিগন্ধময় পঙ্কে নাক গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেই ভাল বাসে, কেহ তাহাকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া দিলে সে রাগিয়া গুঁতাইতে আসে, এ শ্রেণীর লোকও তেমনি। জগতে এ শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। প্রত্যেক মানব সমাজেই অল্প বেশী কদাচার, অনাচার, মিথ্যাচার প্রশ্রয় ও আদর পাইয়া আসিতেছে; কেহ কেহ অন্ধ গোঁড়ামি বশতঃ কেহ বা স্বার্থ সাধনের উপায়-ভূত ভাবিয়া সে গুলিকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে; কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি নির্ভয়ে সেই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলে বা বাক্যব্যয় করিলে এই মিথ্যাচার-পরায়ণরা তাঁহাকে সমাজের শত্রুরূপে প্রচার করতঃ লোক চক্ষে ঘৃণাস্পদ ও অপদস্থ করিতে থাকে। এবং যাহারা সমাজের পাপাচার দেখিয়া ব্যথিত হন, সংস্কার কামনা করেন, কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ততা বশতঃ ভয়ে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না তাঁহারা এই রূপ এক নির্ভীক যোদ্ধার আবির্ভাবে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করেন ও তাঁহার জয় গান করিতে থাকেন। ইবসেনের যা কিছু দুর্নাম বা নিন্দা পূর্ব্বোক্ত অনাচার প্রশ্রয়ীদের বা অন্ধ গোঁড়া দিগের দল হইতেই উঠিয়াছে।

এই শ্রেণীর নিন্দুকরা তাঁহাকে Social anarchist ও revolutionary 'সমাজ ধ্বংসকারী' 'নীতি-ধর্ম্ম বিপ্লবকারী' দুরাত্মা, পাষণ্ড ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে ছাড়েন নাই। একজন সাধু ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হিতকামী মানববন্ধুকে কতদূর অভদ্র ও ইতর ভাষায় লোকে গালাগালি দিতে পারে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন বার্ণার্ড শ'র Quintessence of Ibsenism গ্রন্থে। তৎকালীন ইংরাজ সম্পাদকরা ইবসেনকে কি অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার ভাষার নমুনা ইবসেন-ভক্ত বার্ণার্ড শ উক্ত গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। সে কথা যাউক।

ইবসেনের নাট্যকলা রচনার মূল উদ্দেশ্য কি—তাঁহার মতামত বা কি ও নাটক রচনার রীতি প্রভৃতির বিশেষত্বই বা কি—আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব।

(ক) ইবসেনের নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্য কি?

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পাঠককে কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা যোগে আনন্দ দেওয়াই ইবসেনের উদ্দেশ্য নহে, উপরন্তু ক্রমাভিব্যক্ত মানবজীবনের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির ভালমন্দ আলোচনা করিয়া জীবনের ক্রমোন্নতির সাহায্য লাভে মানবকে চেষ্টিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইবসেন তাঁহার সৃজনী প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ উদ্দেশ্য খাঁটী সাহিত্যিকের থাকা উচিৎ কি না তাহা লইয়া চিরকাল বাদানুবাদ হইয়া আসিয়াছে। ইহার সুমীমাংসা হয় নাই, হওয়া সম্ভবও নহে; তবে আবহমান কাল হইতে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা এ উদ্দেশ্যকে মনে রাখিয়া সৎ-সাহিত্য রচনা করিয়া আসিয়াছেন; এবং গেটে, টলষ্টয় ডিকেন্স প্রভৃতির মত উচ্চদরের সাহিত্যিকরা আর্টকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসিদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য মানব শক্তির মত সাহিত্য রচনা শক্তিও যদি মানবের ক্রমোন্নতির সাহায্য করিতে পারে অথচ

লোকোত্তর আহ্লাদ দানে অক্ষম না হয় তাহা হইলে একাজে ক্ষতি কি?

একথা ঠিক যে প্রাচীন নাটককারদের কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রঙ্গমঞ্চে মানবজীবনের নিখুঁৎ প্রতিচিত্র দেখাইয়া সাধারণের চিত্ত-রঞ্জন করা বা নায়ক নায়িকার বিপু-তাড়িত জীবন আলোচনা করিয়া 'ধর্ম্মের জয়' 'অধর্ম্মের পরাজয়' প্রভৃতি নীতি মূলক সত্যের প্রভাব দেখাইয়া ইঙ্গিতে শিক্ষা দান করা; সেক্সপীর প্রভৃতির রচিত নাটকের প্রধান সুর হইতেছে—জীবন খেলার অভিনয় করিয়া অন্তরের অসংযত আনন্দ জাগাইয়া দেওয়া। সে একযুগ যখন মানবজাতির জীবন ছিল যুবা বা বালকের জীবনের মত সবল সুন্দর ও আনন্দ উজ্জ্বল জীবনে দুঃখ কষ্ট বা দুশ্চিন্তার কারণ থাকিলেও যুবা বা বালকরা সেদিকে বড় দৃকপাত করে না; জীবনের আনন্দের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিকটাই দেখে, এবং যতটা পারে তাহা হইতে আনন্দের রস পান করিতে থাকে প্রৌঢ় বিষয়ে ঠিক ইহার উল্টা দেখা দেয়। অভিজ্ঞতার ফলে দুঃখের ছায়া-ঘোরালো দিকটাই প্রৌঢ়ের নজরে বেশী করিয়া ধরা দেয়, জীবনের কূট সমস্যাগুলি তাহাকে ভাবাইয়া তোলে, এবং কিরূপে সেই সমস্যার পূরণ হইয়া জীবনভার সুবহ ও জীবনসম্ভোগ সুখকর হইবে তাহাই তখন প্রৌঢ়ের চিন্তার বিষয় হয়। আধুনিক যুগের মানব এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে, মনস্তত্বের জটীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া পড়িতেছে; ভোগকামী বা মুক্তিকামী মানুষের কাছে নূতন নূতন ধর্ম্ম-নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার অবতারণা হইতেছে; অতীতের সহজ সরল জীবন ধারা বঙ্কিম ও কুটীল হইয়া উঠিতেছে; ভাবুকের মনে সমগ্র মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আশা আশঙ্কা জাগিতেছে; কেহ বা নিজ ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বৃদ্ধির আশায় ব্যস্ত, কেহ বা সমাজ বা জাতির মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন, আবার কেহ কেহ বা সমস্ত বিশ্ব-মানবের ক্রমোন্নতির চিন্তায় মন প্রাণ উৎসর্গ তৎপর। শেষোল্লিখিত শ্রেণীর মধ্যে আধুনিক যুগের ভাবুক সাহিত্যিক দলের বেশী ভাগকেই দেখা যায়। স্বজাতি বা বিশ্বমানবের ভাগ্য সমস্যা পূরণ চেষ্টাতেই আধুনিক সমস্যাসাহিত্য (Problem literature) বেশী পরিমাণে ব্যস্ত। টলষ্টয় ইবসেন, বারনড শ, ব্রিউ এই শ্রেণীর সাহিত্যিক।

তাই যদ্যপি হয় তাহা হইলে ইহাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য স্বভাবতঃই এই হইবে যে ব্যাধি প্রতিকারের চেষ্টা করিতে গেলে কোথায় ব্যাধি এবং কি যে ব্যাধি অপিচ কেসের দোষে এই ব্যাধি তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণীতব্য। এই স্থলে আবার দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকের আবি-র্ভাব দেখা যায়। এক দল কেবল মাত্র ব্যাধির স্থান ও কারণ নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন; অপর দল ব্যাধির প্রতিষেধক ব্যবস্থার ইঙ্গিতও করিয়া দেন। ইবসেন পূর্ব্বোক্ত দলের সাহিত্যিক। তিনি নির্ভয়ে স্পষ্টস্বরে সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে কোথায় বিরূপ গলদ তাহা ব্যক্ত করিয়া মানুষকে প্রতিকারের পন্থা খুঁজিয়া নিতে বলিয়াছেন মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক শ্রেণীর অন্ধ গোঁড়া দল আছেন যাঁহারা হিতকামী সংস্কার প্রয়াসীর খোলাখুলি তিক্তবচনপ্রয়োগকে শত্রুতা আচরণ বলিয়া গালি প্রয়োগ করেন। এই শ্রেণীর লেখক ও

সমালোচকবর্গ ইবসেনকে সমাজ ও ধর্ম্ম ধ্বংসকারী বিপ্লবপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জেম্‌স হিটন ঠিকই বলেন উল্টা পিরামিড্‌কে সোজা করিয়া স্থাপন করাকে যদি পিরামিডের ধ্বংশ সাধন করা বলে তাহা হইলে এই অর্থে ইবসেনকে সমাজ ধ্বংসকারী বিপ্লবপন্থী বলা যাইতে পারে। Overthrowing Society means an inverted pyramid getting straight! ইবসেনের জ্বালাময়ী অগ্নিগর্ভ নীরবাণী কেবল এই অধঃপতিত মানব সমাজের জঘন্য ভণ্ডামি ও অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হইয়াছিল।

(খ) ইবসেনের মতামত কি ?

ইবসেন সমাজের মধ্যে বাস করিয়া দেখিয়াছিলেন যে নরনারী কতকগুলি পুরাতন জীর্ণ অর্থহীন কুসংস্কারের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পড়ায় তাহাদের আত্মার স্বাধীন বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। এক সময়ে হয়তো প্রয়োজন থাকায় ঐ সকল সমাজ বা ধর্ম্ম-বিধি কার্য্যকরী ছিল কিন্তু এখন মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় আর সেই বিধিনিষেধগুলি অনুকূল না হইয়া বিকাশের প্রতিকুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ বিধিনিষেধের মালিকরা স্বার্থের খাতিরে বা লোকগঞ্জনাভয়ে বা অন্ধ অতীতাসক্তির ফলে তাহাদের পরিবর্ত্তন করিতেছে না। অপিচ স্বভাবপ্রবৃত্তিপ্রবল মানুষ এমনি একটা নৈতিক আদর্শ খাড়া করিয়াছে যাহার পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। বহুপ্রাচীনতা বশতঃ গুরু গৌরব এই আদর্শকে মানুষ অনুসরণ করিতে পারিতেছে না, অথচ সমাজ শাসন ভয়ে বা লোক লজ্জায় তাহা ত্যাগও করিতে পারিতেছে না; ফলে এই হইয়াছে যে মানুষ ভণ্ডামীর আশ্রয় লইয়াছে; ভগবানের সংকেত যে যার সাধ্যমত একটা রফা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া চোখ বুঁজিয়া, বিবেককে চোখ ঠারিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ফলে কি হইতেছে? ইবসেন বলিতে চাহেন,—এই ভণ্ডামির ও মিথ্যাচারের ফলে মানুষের অভিব্যক্তির স্রোত বন্ধ হইতে বসিয়াছে, বা একবারে বন্ধ না হইলেও প্রায় বন্ধ হইতে বসিয়াছে। মানুষ এরূপ রফা বন্দোবস্তের ফলে নিজ গঠিত আদর্শের নিকট-বর্ত্তী হইতে পারিতেছে না। বাহিরে মুখে আদর্শের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতেছে ভিতরে পশুজীবন বহন করিতেছে! ইহাই স্বাভাবিক; ইবসেন মানুষের স্বভাবগত ভোগস্পৃহাকে নিন্দা করিতেছেন না; ইহাতো দেহীর পক্ষে স্বাভাবিক; তাহার আক্রোশ কেবল তাহাদের উপর যাহারা মানুষের সম্মুখে একটা অসম্ভব নৈতিক আদর্শ খাড়া করিয়া দিয়া, সেই অসম্ভব দুর্গম দুঃসাধ্য আদর্শকে অনুসরণ করিতে বলিতেছে এবং মিথ্যা ভয় শাস্তিপ্রয়োগ দ্বারা অকৃতযত্ন বা অসিদ্ধ দুর্ব্বল মানুষদের তাড়না করিতেছে। যাহারা বিধিনিষেধ গড়িয়াছে এবং যাহাদের তাহা মানিতে বাধ্য করা হইয়াছে এই উভয় দলের মধ্যে যেন একটা গুপ্ত রফা বন্দোবস্ত হইয়াছে এইরূপের —"খাবে", দু এক গ্রাস খাও কিন্তু দেখো বাবা, যেন রামতনু না জান্‌তে পারে।" সমাজের বেশীরভাগ লোকের মধ্যে এই যে গোপন চুক্তি (Compact majority) ইহার ফলে এই হইয়াছে যে যা করে করুক, যা হয় হউক, জীবনটা একরূপ সুখে শান্তিতেত কাটিয়া যাইতেছে তাহাই লাভ।

ইবসেন এই প্রাণহীন অসাড় কোন-রকমে-চলে-যাওয়া শান্ত জীবন ধারাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন। কেন? কারণ তিনি বলেন এইরূপ স্বল্পে সন্তুষ্ট ভাব, এই সস্তায় কেনা-শান্তি মানুষের কর্ম্মমুখরতা ও সতত চেষ্টাশীলতাকে নষ্ট করিয়া দিয়া তাহার ক্রমোন্নতিতে বাধা দিবে। মানুষের স্বভাব এই যে, সে একটা নূতন ভাবের তীব্র উত্তেজনায় দিন কয়েক উদ্যম সহকারে খুব হৈ চৈ করিয়া শীঘ্রই হাত পা গুড়াইয়া চুপ হইয়া যায়; কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ সতত সমান বেগেই ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান; এ প্রবাহের মুখে যে নিরস্তকর্ম্মা হইবে সে হয় ধ্বংস হইবে না হয় তাহার ক্রমবিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে।

ইবসেনের মূল নালিশ এই যে—কোন্ এক সুদূর অতীত যুগে প্রচারিত এক অসম্ভব আদর্শকে মানাইবার জন্য কতকগুলি কৃত্রিম বিধি নিষেধের অত্যাচারের ফলেই মানুষ বিশ্বের ক্রমোন্নতির পথে চলিতে পারিতেছে না; মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক শক্তি প্রবৃত্তির দিকে নজর রাখিয়া যদি এই আদর্শ খাড়া করা হইত, আর মানুষকে যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে বিচারযোগে এই আদর্শ অনুসরণ করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে আজ বর্ত্তমান জগতে এই ভণ্ড মিথ্যাচারী ভীরু মানুষ নামক জীবটী দেখিতাম না; কোনো এক কালে কোনো এক আদর্শ কিছু দিনের জন্য সম্ভবপর থাকিতে পারে, কিন্তু নব নব অবস্থার সংঘাতে পুরাতন আদর্শ বাতিল হইয়া যায়; সূক্ষ্ম নূতন সত্য ও আদর্শ দেখা দেয় ও প্রয়োজন হয়; মানুষের চরম লক্ষ্যকে না মানিয়া এই সব নূতন সত্য বা আদর্শকে গ্রাহ্য না করা এও একটা আধুনিক মানুষের ভুল হইতেছে। ভুলের ফলে সমাজে নানা পাপ ও ভণ্ডামী প্রশ্রয় পাইতেছে; জান্তব সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিঘ্ন না হইতে পারে, মনুষ্যত্ব বিকাশের যথেষ্ট বাধা হইতেছে।

সমাজকে ও সমাজ রক্ষকদের তিনি ডাক দিয়া এই সত্য কথাগুলি শুনাইতে চান। কাজটা যে গুরুতর, বড় সুবিধাজনক নহে তাহা তিনি বিশেষভাবে বুঝিয়াছেন। এই সব অপ্রিয় হিতবচন শুনাইতে গিয়া তাঁহাকে ঘরে বাহিরে বিধিমত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে; নানা রকমে নানা ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে; মধ্য যুগের বর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে হয়তো আগুনে বা ফাঁসী কাষ্ঠে পুড়িতে বা ঝুলিতে হইত। বন্ধুর মত ব্যবহার করিয়া শত্রুর অপবাদ পাইলেন। তথাপি তিনি বীরের মত শেষ পর্য্যন্ত এই অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিতে ক্ষান্ত হন নাই। কাহারো খাতির রাখিয়া খোসামোদ করিয়া মুখ চাহিয়া স্পষ্ট কথা শুনাইতে তিনি ইতঃস্তত করেন নাই। এইখানেই তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

Dramatic Art

[নাট্য রচনা শিল্প]

আমরা বুঝিলাম ইবসেনের নাটক রচনার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া; সমাজ কতকগুলা প্রাণহীন অর্থহীন বিধিনিষেধের বন্ধনে মানুষকে বাঁধিয়া রাখায় তাহার ভিতরের স্বাধীন ক্রিয়াশীলতা বাধা পাইয়া নিশ্চল হইয়াছে—ফলে মানুষের ক্রমবিকাশের গতি নিরুদ্ধ হইতেছে, এই প্রবাহের মুখ খুলিয়া দিতে হইবে, এই সব পুরাতন মিথ্যা কুসংস্কারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া। সমাজ সংস্কার যদি উদ্দেশ্যই হয় তবে তাঁহার এ বিষয় মতামত কি তাহাও

তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : ধর্ম্ম, নীতি রাজনীতি, বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মতামত খোলসা করিয়া সহজ সরলভাবেই জানাইয়াছেন। তাঁহার প্রধান নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কালে আরো স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাইবে।

এই খানে একটা কথা বুঝাইবার আছে। সাহিত্যজগতে ইবসেনের এই যে এত নাম-যশ ইহার মূল কারণ তাঁহার সমাজ সংস্কার চেষ্টার জন্য নহে। সমাজ সংস্কারক অনেক আছেন ও ছিলেন; সৎসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য লোক চিত্তে লোকোত্তর আহ্লাদ দান করা। তবে ইহার পূর্ণ সার্থকতা রাখিয়াও যিনি সমাজ বা মানব জাতির সেবা করিতে পারেন; সংশিক্ষার, সৎচিন্তার বিষয়াবতারণা করিতে পারেন তিনি আরো বেশী দক্ষ কারিগর সে বিষয়ে ভুল নাই। গুণী-জ্ঞানী-শিল্পী সকলেই যথাসাধ্য বিশ্বমানবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। ইবসেন এই শ্রেণীর একজন মানব-সেবক সুদক্ষ শিল্পী বলিয়াই তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা।

দেখা যাউক নাট্যকার হিসাবে ইবসেনের মৌলিকত্ব ও স্বাধীন কৃতিত্ব কোথায় ও কতদূর—

ইবসেনের পূর্ব্বে যে ধরণে নাটক রচনা হইত তাহাকে naturalistic drama বলা হয়। Realistic Drama হইতে ইহার প্রভেদ এই যে naturalistic নাটক— মানুষের রিপুতাড়িত প্রাত্যহিক জীবনের ও কাজকর্ম্মের ফটোগ্রাফের মত নিখুঁৎ চিত্র দিতে ভাল বাসে; Realistic drama বাস্তব মানব জীবনের চিত্র দেয় বটে তবে বাস্তবের অনুকরণে রচনার বা চরিত্রের সৃজন করে মাত্র। আর এই সব ঘটনা বা চরিত্র পৌরাণিক বিষয় হইতে বা রাজা বাদসার জীবনী হইতে লওয়া নয় : সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখেরই ঘটনা সমাবেশ মাত্র। Naturalistic drama মানুষকে তার ধর্ম্মসমাজ বন্ধন হইতে সরাইয়া খাঁটী প্রাকৃতিক জীব হিসাবে.. (nature's animal) দেখিয়া কামাদি ষড়রিপুর শাসনে তার কি অবস্থা হয় তাহাই দেখাইতে চাহে। Realistic বা naturalistic নাটকে মানুষ অবস্থার দাস মাত্র, বহির্জ্জগতের প্রভাবেই ক্রিয়াশীল হইয়া তাহার যা গতি হয় তাহাই দেখান এই জাতীয় নাট্য রচনার উদ্দেশ্য। নায়ক নায়িকার মনের ভিতরের অবস্থা দর্শকদের অগোচরে থাকে; তাহাদের কৃত কার্য্যকলাপই দর্শকবৃন্দ দেখেন। এসব নাট্যকাররা নায়ক নায়িকার জীবনের ঘটনা গুলাকেই বেশী জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইতে চান। কিন্তু মানুষ তো কলের পুতুল নয় যে তাড়িৎস্পর্শে নাচিয়া উঠে; মানুষের আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ ভিতরে আছে, বাহিরের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সেই আত্মার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে মানুষ কোনো-না-কোনো একটা আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চলে ফেরে, কাজ করে, কথা কয়, কাজেই বাহিরের ঘটনা সেই আদর্শের পথে চলিবার পক্ষে কোথাও বাধা দেয়, কোথাও সাহায্য করে; কাজেই বাহিরের ঘটনা সেই আদর্শের পথে চলিবার পক্ষে কোথাও বাধা দেয়, কোথাও সাহায্য করে; আদর্শ দুঃসাধ্য হইলে বাহিরের ঘটনা তাহার অনুকূল না হইলে জীবাত্মার মধ্যে মহাসমর বাধে; ফলে আত্মার জয় পরাজয়। বর্ত্তমান ধর্ম্মসমাজ রাজনীতির দুর্ব্বহ বিধিনিষেধের

ফলে মানুষের পক্ষে এই আদর্শ অনুসরণ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মানুষের অন্তর-রাজ্যে সর্ব্বদাই বাহিরের এইসব বাধা বিঘ্নের ফলে একটা আধ্যাত্মিক সমর চলিতেছে। দুর্ব্বল, প্রবল সকল আত্মাই এই সমরে শশ-ব্যস্ত কাহারো জয় হইতেছে, কাহারো পরাজয় হইতেছে। ফলে জীবাত্মার অন্তরের এই আধ্যাত্মিক সমর (Spiritual Struggle কোনো কালে কোনো নাট্য গ্রন্থের বিষয়ী-ভূত হয় নাই। হয়তো Greek Drama ইহার ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত।

ইবসেনের এক নম্বর নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব এই খানে। তিনি এই আধ্যাত্মিক সমরকেই তাঁহার নাটকের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাটকের প্রথম হইতে শেষাঙ্ক পর্য্যন্ত শুদ্ধমাত্র অন্তরের অন্তরালের এই অদৃশ্য অভিনয় দেখাইতেই চাহেন। বাহিরের action ছাড়িয়া মনের ভিতরের actionটা দেখানই ইবসেনের নাটকের উদ্দেশ্য। সভ্য মানুষ একটা মাত্র ভাবের উত্তেজনায় কাজ করে না, তাহার অন্তরে অতীতজন্ম সহস্র সংস্কার আছে, বাহিরের একটা নূতন idea বা ঘটনা তাহার এই সহস্র সংস্কারকে কমবেশী প্রভাবযুক্ত করে; কাজেই এই নূতন ভাব বা ঘটনার প্রথম সংযোগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা এবং সমস্ত কৃতকর্ম্মগুলা পর-স্পরের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া ভিতরে একটা মনস্তত্ত্বের জাল বোনা হইয়া যায়; অকারণ বাজে পাত্রপাত্রীর অবতারণা করিয়া অর্থহীন ঘটনার সমাবেশ না ঘটাইয়া, কয়েকটী মূল পাত্র পাত্রীর জীবনে ঘটনা-সংঘাতে সমস্যা তুলিয়া নায়ক নায়িকার অন্তর্জীবনে, চিত্তক্ষেত্রে কেমন করিয়া যুদ্ধ বাধানো যায় এবং শেষে জয় বা পরাজয় হয় ইহা দেখানই শ্রেষ্ঠ নাট্য সাহিত্যিকের চরম কারিগরী এবং ইবসেন এই শ্রেণীর কারিগর। সমস্তার উপযোগী চরিত্র সৃজন, চরিত্রের উপযোগী কথোপকথন, কথোপ-কথনের ভিতর দিয়া মানসিক বিপ্লবের চিত্র-দান ইহাই ইবসেনের নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব।

এ শ্রেণীর নাটককে খাঁটী realistic drama বলা একরূপ অবিচার করা। পূর্ব্বে realismএর যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহার সহিত ইবসেনের বিশেষত্ব তুলনা করিলে বুঝা যায় ইবসেনের নাট্যসাহিত্য দৈনিক জীবনের বাহ্য কার্য্যকলাপের ফটোগ্রাফী নহে।

তবে ইহাও ঠিক যে এই আধ্যাত্মিক সমরের ফলে জীব যে প্রতিকূল অবস্থাকে দলিত করিয়া বিজয়ী হইয়া উঠিতেছে এরূপ চিত্র দেওয়াও ইবসেনের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উদ্দেশ্যই যেন দেখানো যে এই কঠিন আধ্যাত্মিক সমরে অসহায় দুর্ব্বল জীব বেশীর ভাগই পরাজয় লাভ করে। একারণ অনেকে তাঁহাকে pessimist নিরাশবাদী বলেন। তিনি এ অপবাদের উত্তরে বলেন, হইতে পারে আমি pessimist, মানুষ যত দিন মিথ্যাবিধিনিষেধের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া দুঃসাধ্য আদর্শ সাধনে চেষ্টা করিবে, ততদিনই তার পরাজয় অনিবার্য্য; তার এই নাগপাশ খুলিয়া দাও সে অবিলম্বে সহজ সরল পথে চলিয়া ক্রমোন্নতির পন্থা ধরিবে, তার তখন যুদ্ধে জয় হইবে—।

—আধ্যাত্মিক সমরে ব্যর্থ হইয়া পরাজয় লাভ করাই বর্ত্তমান মানবের অদৃষ্টলিপি। ইবসেনের প্রধান প্রধান নাটকের এই-ই প্রধান সুর।

ইবসেনের নাট্যকলার দ্বিতীয় নম্বর নূতনত্ব এই যে—যে সমস্যা খাড়া করিয়া

মানুষের অন্তরস্থ আধ্যাত্মিক বিপ্লবের চিত্র দেখানো হইবে তাহার বিকাশের জন্য ঠিক যে কয়টী চরিত্রের অবতারণা বা যে কয়টী ঘটনার প্রয়োজন ইবসেন তাহার অধিক বাজে চরিত্র বা ঘটনা নাটকের বিষয়ীভূত করেন না। পূর্ব্ব কালীন নাটকে—অপ্রয়োজনীয় চরিত্র বা ঘটনার অযথা সমাবেশ দেখা যায়। মূল আখ্যায়িকাকে Sensational (উত্তেজক) করিয়া দর্শকদের চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে এ কৌশল অবলম্বিত হইত; অনেক সময় অদ্ভুৎ, অসম্ভব ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবতারণা করিয়া একটা দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করা হইত; অবান্তর চরিত্র ও ঘটনা সংযোগে Sub-plot রচনা করতঃ নাট্যবিষয়কে অযথা দীর্ঘ ও চমকপ্রদ করা হইত; ইবসেন এই সব বাজে বিষয়, ঘটনা বা চরিত্রের অবতারণা নাটক হইতে একেবারে বাদ দেন। তাঁহার নাটকে প্রধান নায়কনায়িকার মানস-সংগ্রাম ফলেই বহিঃক্রিয়ার সংঘটন দেখানো হইয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনাটীর মূল জন্মস্থান নায়ক—নায়িকার বিক্ষুব্ধ মনস্তত্ত্ব ভূমিতে, বাহিরে কোথাও নহে। প্রধান নায়ক নায়িকার কার্য্যকলাপ বা ভাবভাবনা অন্য যে কয়টী পাত্রপাত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত কেবল সেই কয়টী পাত্রপাত্রীর অবতারণা করা হইয়াছে।

ইবসেনের নাট্যরচনারীতির তৃতীয় বিশেষত্ব পাত্রপাত্রীর কথোপকথন ধারায় দেখা যায়। যাহাদের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে তাহারা ছাড়া অন্য পাত্র পাত্রীকে রঙ্গমঞ্চে রাখা হয় না; পূর্ব্বকালীন বহু নাটকে দেখা যায় দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতেছে; আর একাধিক পাত্রপাত্রী অকারণে চুপ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে বা কোন এক পাত্র বা পাত্রী মনে মনে সুদীর্ঘ আত্মোক্তি (Soliloquy) করিতেছে আর যাহাদের শুনিবার নহে তাহারা তাহা শুনিতেছে। অপ্রকাশ্য উক্তিও (aside) অপরের সম্মুখে ব্যক্ত করানো হইতেছে। ইবসেন এরূপ হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারগুলি কৌশলে এড়াইয়া চলিয়াছেন।

যে সময়ে যাহার রঙ্গমঞ্চে থাকা উচিৎ নহে তাহাকে কৌশলে সরাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার নাটকে (aside) অপ্রকাশ্য উক্তি কোথাও যে পাইয়াছি তাহা মনে হয় না।

ইবসেনের চতুর্থ বিশেষত্ব বা নূতনত্ব রঙ্গমঞ্চে পাত্রপাত্রীর বা আসবাব পত্রাদির সমাবেশ নির্দ্দেশ করা। কাহার কিরূপ চেহারা, পোষাক, বয়স, মেজাজ, কোথায় কোন দ্রব্য বা আসবাব থাকিলে ঘটনার সুবিধা হইবে, কখন কাহাকে কি করিতে হইবে সমস্ত ব্যাপার তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। আধুনিক নাটককারেরা ইবসেনের অনুকরণে স্বীয় স্বীয় নাটকে তাহাই করেন; কেহ কেহ মাত্রাতিরিক্তভাবে ইহা করিয়াছেন, যেমন বার্নার্ড শ’।

মোটের উপর দেখা গেল প্রাচীন নাট্যরচনা রীতিকে ইবসেন একটা সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রচলিত করিয়াছেন। এ রীতি যে পূর্ব্ব রীতিরই একটা ক্রমোন্নত রূপ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারিগরী হিসাবে ইবসেন পূর্ব্বগামীদের অপেক্ষা যে দক্ষ কারিগর তাহা ভালই বুঝা যায়। তবে নাটকের বিষয়বৈচিত্র্যে ও বহিঃসৌন্দর্য্যে, ঘটনার নূতনত্বে ও বহুলত্বে, সাধারণ দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণে ইবসেন রচিত নাটক যে সেক্সপীয়রাদি রচিত নাটকের অপেক্ষা বেশী

ৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা মনে হয় না। এ বিষয়ে সাধারণের এমেচারি গানে ও বালোযাত্রি গানে যে তফাৎ ইবসেনী নাটকে ও পূর্ব্বগামী রোমান্টীক নাটকে কতকটা সই রূপ।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম ইবসেনের মৌলিকত্ব কোথায়। নাটকের উদ্দেশ্য সাধনে ও রচনা কৌশলে এই উভয় বিষয়েই তাঁহার মৌলিকত্ব। তিনি শিল্প সাধনার উপলক্ষ্য করিয়া সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি মানবীয় অনুষ্ঠানে যে সকল কুরীতি কুনীতি মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়াছে ইবসেন তাঁহার অপূর্ব্ব নাট্য প্রতিভার কশাঘাতে তাহাই দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হন। এবং নাটকরচনাকে তদুপযোগী করিবার জন্য তিনি নাটকীয় পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন ছাঁচে গড়িয়া লয়েন।

অতঃপর তাঁহার বিখ্যাত নাটকগুলির মূল প্রতিপাদ্য কি তাহাই সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে।

সচরাচর তাঁহার রচিত Brand ; Emperor & Galilean ; Doll's House, Ghosts ; Pillars of Society, An Enemy of the People বেশী জনপ্রিয় ; কিন্তু শিল্প হিসাবে বাকী গুলিও কম সুন্দর রচনা নহে।

'Brand' এক খানি নাটকীয় কাব্য। —আমরা দেখিয়াছি ইবসেন ভণ্ডামির মহাশত্রু।—ইবসেন বলেন—আমাদের মধ্যে এত যে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের প্রাবল্য তাহার জন্য দায়ী আমাদের মামুলী ধর্ম্ম ও সমাজ আদর্শের অসম্ভব কাঠিন্য। যে আদর্শ মানুষের দ্বারা অনুসৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব তাহা ভাল না করিয়া মন্দ করিবেই। লোকে পাপভয়ে লোক লজ্জায় বা প্রাচীনের খাতিরে এইসব দুঃসাধ্য আদর্শকে মানিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন রক্তমাংসময় মানবিকতা (humanness) আছে, যে চিরন্তন ভোগস্পৃহা তাহার মজ্জাগত, তাহাকে সে নষ্ট করিতে পারেনা, ফলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঘোর সংগ্রাম হয় এবং এই সংগ্রামে কোটীর মধ্যে একটী জয়লাভ করে, বাকী সব গুলির ইহ-পরকাল ধ্বংস হয়। কবি তাঁহার Brand কে এইরূপ এক দুঃসাধ্য আদর্শসাধনশীল বীর ভাবে চিত্রিত করেন, এবং দেখান যে এই খ্রীষ্টীয় অসম্ভব আদর্শ জীবনে পালন করিতে গিয়া Brandএর জীবন কিরূপ ব্যর্থ হইয়া গেল। দৈনিক ভোগজীবন ও আদর্শানুযায়ী নিবৃত্তি পন্থার এই পূর্ণবিরোধবশতঃ লোকে একটা মাঝামাঝি রফা করিয়া লয় এবং দুই দিক বাঁচাইয়া একরূপ জীবন কাটাইয়া দেয়। ইহাতেই ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের এত প্রশ্রয় বৃদ্ধি হয় ; Brand একজন আদর্শ খৃষ্টশিষ্য, তিনি 'মাঝা মাঝি রফার' লোক ছিলেন না', এই মধ্যপন্থা ধরিলে হয়তো তিনি টিঁকিয়া যাইতেন ; তা তিনি করিলেন না, ফলে তাঁহার জীবনটা Tragedy তে শেষ হইল।

Pillars of Societyর উদ্দেশ্য অনেকটা এই জাতীয়। এক সমালোচক কয়েকটী কথায় ইহার মূল বক্তব্য বেশ বলিয়াছেন "The play as a whole is admirably descriptive of the immoral tyranny of moral effects"। পনের আনা মানুষ আত্মরক্ষার ও সাংসারিক আত্মোন্নতির জন্য না করিতে পারে বা না করে এমন কাজ নাই। অথচ 'ত্যাগী,' 'ধার্ম্মিক,' 'আদর্শগুণী,' 'পরো

পকারী' ভাবে পরিচিত হইবার জন্ম সতত ব্যগ্র ও কৌশলকলাপ্রিয়। আমরা যাহাকে বকধার্ম্মিক ও বিড়ালতপস্বী বলি সেই শ্রেণীর জীব। এ-হেন জগতে কোনো লোক সত্যই আন্তরিক ভাবে সমাজ মঙ্গলের চেষ্টা করিতে গেলে এই সব বকধার্ম্মিকের হাতে তাহার কি দুর্দ্দশা লাঞ্ছনা হয় তাহাই এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"Ghosts" নাটকটী ইবসেনের সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, তেজোগর্ভ, ও বিপ্লবাত্মক রচনা। প্রচলিত নীতি শাস্ত্রের ভিতরটা যে কি পূতিগন্ধময় পুরীষপূরিত জিনিস, কবি তাহাই ইহাতে দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বংশানুক্রম বিধি এই নাটকের মূলতত্ত্ব। পাপের সংস্কার পুরুষানুক্রমে জীবে সঞ্চারিত হয়। শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইহার হাত হইতে নিস্তার নাই। ইবসেন বলিতে চান যে আমাদের মজ্জাগত পাপসংস্কারস্বরূপ ক্ষতকে মলম দিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলে তাহাকে নষ্ট করা যায় না। যথা কালে উহা তাহার কুফল প্রকাশ করিবেই। আমরা সচরাচর স্বভাবগত 'কু' কে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি ও কৃত্রিম বাহ্য আবরণ দিয়া তাহাকে শক্তিহীন করিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

'An Enemy of the People' নাটকে বার এই কথাটাই বিদ্রূপাত্মক সুরে বলিতে চান যে যে ব্যক্তি সত্যই সরল ভাবে লোকের দোষ দেখাইয়া সমাজ সংস্কার করিতে চান তিনি এ সংসারে লোকশত্রু বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। Ibsen কে তাঁহার সদর্প স্পষ্ট উক্তির জন্য লোকে সমাজশত্রু বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়ে নাই। কবি কৌশলে দেখাইয়াছেন তিনি কিরূপ ধরণের 'মানব শত্রু'। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন লোকের মন যোগাইয়া প্রিয় মিথ্যা না বলিয়া অপ্রিয় সত্য বলাই তিনি পছন্দ করেন। উহাতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত অপমানিত হইতে হয় সেও ভাল। তিনি বলেন 'The most dangerous foes of truth and liberty among us is the compact majority. The majority have never the right on their side. Never I say. The majority have the might, alas ; but the right they have not. The minority is always right.

'The wild Duck' নাটকখানির বেশ একটু নূতনত্ব, বিশেষত্ব আছে। নাটকখানি নিজের উপর একটী শ্লেষাত্মক কশাঘাত—Satire on himself. ভ্রান্ত মানবকে তাহার স্বদোষ সম্বন্ধে চেতনা দিতে গিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হন। এ বিষয়টী মনে মনে আলোচনা করিয়া তিনি যেন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "আমি আমার এই সব নূতন মত লইয়া কি জন্য লোকের শান্তিবিঘ্নকর হইতে যাই? আমার কি অধিকার আছে যে একটা অসম্ভব আদর্শ লইয়া লোককে ব্যতিব্যস্ত করি? দোষে গুণে তাহারা তো বেশ স্বচ্ছন্দে আছে? তাহারা তো বলিতে পারে— "life might yet be quite tolerable if we were only left in peace by these blessed duns (as I Ibsen am) who are continually knocking at the doors of us poorfolk with their ideal demands". এই নাটকটী রচনার সময় ইবসেন খুব হতাশ হইয়া পড়েন। তিনি বুঝিলেন 'no amount of preaching will make them any better than they are.

'A Doll's House' তাঁহার সব চেয়ে বিখ্যাত নাটক। ইবসেনের ইবসেনত্ব এই নাটকে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। পাশ্চাত্য দেশের বিবাহ ব্যবস্থার দোষ গুণ আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য। ইবসেনের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে ইউরোপে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—কেন হইল ইহার উত্তর এই নাটকে দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইবসেন চিরকাল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বন্ধু। এই স্বাধীনতার অভাবে ইউরোপীয় সমাজে নারী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারিতেছে না। নারীকে চিরকাল মানুষ নিজের মনোমত আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছে। নারী তাহার মনোরঞ্জনের পাত্র, সুখের ও সাধের খেলনা মাত্র। ভোগের সামগ্রী। যে নারী পুরুষের এই আদর্শ মানিয়া চলে সেই তাহার বেশী প্রিয় পাত্রী। কাজেই নারীর সমস্ত চেষ্টা হয়—কিসে সে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় পুরুষরঞ্জিনী করিয়া তুলিতে পারে। তাহাদের যে একটা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা আছে—তাহাদের যে জাতিগত বক্তব্য। গুণধর্ম আছে তাহা তাহারা জানিয়াও জানে না। পুরুষের প্রিয়া হইবার জন্য তাহাদের সেই সব স্বভাবগুণ বিসর্জন দিতে হয়। দুর্বলের প্রতি প্রকৃতির এই অভিশাপ। ফলে নারী তাহার প্রাকৃতিক নারীত্ব ভুলিয়া কৃত্রিম নারীত্বের বিকাশে চেষ্টাশীল হইয়াছে। নায়িকা নোরা পারিবারিক কোনো দায় উপলক্ষে স্বাধীন ভাবে একটা অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে; তাহার স্বামী উহা জানিতে পারিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করে। নোরা তখন বুঝিল তাহার কি মূল্য, কি অবস্থা এবং সমাজে তাহার স্থান কতটুকু। স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া তাহার দায়িত্ব ভোগ করিবারও তার শক্তি নাই। সমাজের নানা বিরোধী শক্তির চাপে পড়িয়া সে নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ফুটাইতে পারে নাই; কাজেই একটা দায়ে পড়িলে নারীকে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। পুরুষের সহিত এক কর্মক্ষেত্রের কর্ম্মী, অথচ পুরুষের মত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য তাহার নাই। সে নিজে চিরকাল পরাধীন, তার মনুষ্যত্ব অপুষ্ট; সে কেবল আজন্ম পুরুষের রুচি অনুসারে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে—তাহার ভোগ্য হইবার জন্য;—সংসারের অন্যান্য গুরুতর ভার বহনের জন্য,—যে শিক্ষা, সংযম, শক্তি-নিয়োগ প্রয়োজন কিছুই তাহার হয় নাই। নোরার চোখের উপর হইতে একটা একটা করিয়া মায়ার আবরণ খুলিয়া গেল। সে দেখিল—উভয়ের দাম্পত্যজীবন একটা মিথ্যার কাঠামোর উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর আদর্শ-স্বপ্ন তাহার চোখ হইতে সরিয়া গেল। নিজের অপদার্থতা সম্বন্ধে তার চোখ ফুটিল তার সুখের ঘরের মোহন স্বপ্নজাল ছিঁড়িয়া গেল। সে বুঝিল যে সে একটা খেলাঘরের সাজানো পুতুল হইয়া খেলার জিনিষ ছিল। নোরা আরো বুঝিল যে যতদিন না সে সংসারভার বহন করিবার মত স্বাধীন শিক্ষার দ্বারা নিজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিতে পারিবে ততদিন এ গৃহস্থালীতে তার আর স্থান নাই। সে কেবল মাত্র স্বামীর সোহাগের পুতুল হইয়া এ গৃহে থাকিতে চায় না।

এক দিনের একটা কলহসূত্রে স্বামী পুত্র ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার চিত্রটা আমাদের চোখে তো বীভৎস লাগেই, ইবসেনের স্বধর্ম্মী ও স্বজাতীয়রাও তাঁহাকে তজ্জন্য অপরাধী করিয়াছেন। এই নিন্দা একটা ভুল ধারণার উপর স্থাপিত। ইবসেনের

এ নাটক রচনার উদ্দেশ্য একটা ছবি আঁকিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করা নয়; তিনি একটা vital সমাজ-problemএর ইঙ্গিত করিতে চান। তিনি বলিতে চান, সংসার ক্ষেত্রে, জীবন যুদ্ধে, সমাজ জীবনে নারীকে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার না দিলে সে কখনোই দুর্বহ ভারবহনের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না।

নোরার গৃহত্যাগের মূলে এই অভাবের উপলব্ধিটাকেই নাট্যকার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইবসেন বলিতে চান যে প্রত্যেক সমাজ-জীব কি স্ত্রী কি পুরুষ সংসারে আসিলেই তার অধিকার আছে জানিবার—কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে আসিল, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবের কতটুকু আত্মিক বিকাশ সাহায্য করে, এবং ইহাদের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলিতে যে স্বাবলম্বন, আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন তাহাও তাহারা দাবী করিতে বাধ্য। ইবসেনের অনুযোগ এই যে নারীকে এ অধিকার হইতে সাবধানে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে নারীর যে স্থান, যে মূল্য, যে প্রয়োজনীয়তা, যে দায়িত্ব ইয়ুরোপের সভ্য সমাজ তাহা অস্বীকার করিয়া নারীকে জীবপ্রসবিনী জননীব্রত হইতে বঞ্চিত করিয়া পুরুষের ভোগসঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে, তাহাকে জীব-জননী রূপে না গড়িয়া দিয়া পুরুষরঞ্জিনী ভোগবিলাসিনী করিয়া তোলা হইতেছে। পূর্ণমাত্রায় আত্মবিকাশের দ্বারা মানবজাতির ক্রমোন্নতিতে সাহায্য করিবার অধিকার পুরুষের মত নারীরও আছে। এই স্বাধীনতার মূলে ভোগলিপ্সু আধুনিক সভ্য নব কুঠার বসাইয়া বিশ্বমানবের অর্দ্ধ অঙ্গকে বিকৃত করিয়াছে।

নারীর স্বাধীনতা এক ও স্বেচ্ছাচারিতা অন্য বস্তু। পুরুষের বশ্যতা ও সমাজ বন্ধন হইতে মুক্তি, নারীর আত্মোদ্ধার যে প্রয়োজনীয় ইহা অনেকে বুঝিয়াছেন—কিন্তু সংসারে ভাব বস্তুকে ভুল ভাবে বোঝাটা খুবই বেশী। অনেক নারী এই স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়া সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া নিয়মাধীনতা পায়ে দলিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতে পারে। ইবসেনের আদর্শকে ভুল বুঝিয়া এই হইয়াছে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার সেবিকা যে নারী হয় তাহার ইহপরকাল উৎসন্নে যায়। Ibsen—Hedda Gabler নাটকে এরূপ এক উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিণীর চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, যে তাঁহার বক্তব্য কথা ভুল বুঝিলে কি শোচনীয় ও হাস্যকর পরিণাম হয়।

শ্বশুর বাড়ীর যাত্রী

[শ্রীদ্বিজরাজ ঘোষ]

স্বগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার, এখানে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশপ্রত্যাগত শরৎ চন্দ্র মিত্তির আজ বেঞ্চায় ভাবাবেশে নিমগ্ন। রমাপ্রসাদ এসে প্রশ্ন করেছে তা তাঁর কাণের ঢাকটাতে আদৌ ঘা দিতে পারে নি।

একটা জটিল তত্ত্বের মিমাংসা নিয়ে না হয় তাঁর হাকিমগিরীর মামলার মতলব নিয়ে মাথাটাকে বইয়ের আবহাওয়া থেকে সরিয়ে রেখেছিল, রমাপ্রসাদ যখন তার মাথার ওপর হাত দিয়ে মতলবটা গুলিয়ে দিলে, চোখ দুটো ওপর দিকে চেয়ে সে বল্লে—"কে—রমা—কখন এলি? —বস্"।

'একেবারে তন্ময়, সংজ্ঞা বিলুপ্ত। ব্যাপার কি?"

দম ধরিয়া থাকার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শরৎ বলিল, "ব্যাপার—বস্—" আবার যেন ভাবাবেশ।

"বলি ব্যাপার কি হে—মন দেড়েক ওজন দেহের মাঝখানে মনটাকে চেপে রেখে দিতে চাও? বাইরের বাতাস লাগ্‌তে দেবে না নাকি?"

একটু মৃদু ভাবেই সচ্ছন্দ গতিতে উত্তর হলো—"বস্ বলছি। তামাক খাস্ তো বল্ সেজে এনেদি' তারপর বল্‌চি"।

যাক্ তোমাকে স্বভাবে এনেছি—তামাক খাওয়ায় প্রয়োজন নেই, এখন বল দিকি তোমার চিন্তাবাণীর কথা—?" রমাপ্রসাদের কথাটা দুই রকম অর্থ ক'রে নেওয়া যায়। শরৎ মৃদু হাসিয়া বলিল - চিন্তাবাণী চপলার মত চঞ্চল। সে গভীর তত্ত্বের ধার ধারে না—

তাই নাকি?— নিশ্চিন্ত হ'লাম—এখন ব'লে ফেল তোমার তত্ত্বের কথা—"

দম ধরিয়া থাকার পর শরৎ ব'লল— "কথাটা বল্‌তে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হচ্ছি, থা'ক আর শুনে কাজ নেই"।

কথার মাঝ খানে থাক্ বলাতে রমাপ্রসাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়া উঠিল, রমাপ্রসাদ বলিল—থাক্। যদি তোমার গুপ্ত প্রাসাদের ধন রত্নের কথা বল্লে কেউ লুটে নেয় তবে বলে কাজ নেই এখন আমি চল্লাম। থাক্। কথা কাজের একটু এদিক ওদিক্ নেই; রমাপ্রসাদ কতক দূর চলে গেলে শরতের আক্কেল দাঁতটি গজাইয়া উঠিল—শরৎ ডাকিল, "রমা, শুনে যা।" রমাপ্রসাদ ফিরিল।

শরৎ বলিল।—শোন সেদিন হাকিমের চেয়ারে বসে মেজাজ কেমন গরম হ'য়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময় চিন্তাবাণীর আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসে হাজির। তার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন রবিবারে, লুচি ক'খানা বাদ দিয়ে যা যা আর সব বাজার করে নিয়ে তার নিকট (শ্বশুরবাড়ী) হাজির হ'তে হবে। তারের তাড়ায় এসে নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বেরিয়ে কাজ শেষ করে যাত্রা করলাম। রমা তুই তো জানিস্ ষ্টেসন থেকে রসুলপুর যেতে গেলে মাঝে একটা মরা নদী পড়ে, তার পূর্ব্ব দিন

এদিকে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, ষ্টেশন থেকে নেমে জিনিস পত্র মুটের মাথায় দিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখি—মরা নদীতে বান ডেকেছে—নৌকা নেই—পারের উপায়? তখন ছেলে বেলাকার কথা মনে প'ড়লো "হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে--তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা ডাকিছে তোমারে।"

রমা মৃদু হেসে বল্লে "এ যে শ্বশুর বাড়ীর যাত্রীর রস মরা নদীর সঙ্গে মিলে চলেছে।"

তার পর ভাবচি--আটলান্টিক পাড়ি মারা মানুষ একটা মরা নদীর কূলে এসে পারের কথা ভেবে অস্থির?"

রমাপ্রসাদ হাসিয়া বলিল —"এযে জলধরের হিমালয় ভ্রমণের ভূমিকা, দেখচি? বল্লে যাও লাগচে ভাল।"

তার পর বসে ভাবচি— এমন সময় দেখি—বাতাসের আগে, বাইকের ওপর একটি মানুষ এসে উপস্থিত, বাঁ হাতে ব্রেসলেটের মত ঘড়ী,টানা সিঁথে, মুখ দেখে স্ত্রী পুরুষ ঠিক করবার যো নেই, বাইক থেকে নাম্‌লে বুঝা গেল। আঙ্গির মধ্যে দিয়া হাড় ক'খানার ফেকাশে রং ফুটে বেরুচ্ছে—তার পোষাকের মৃদু গন্ধ স্থানটাকে আমোদিত ক'রে তুল্লে।

সঙ্গের মুটেরা পারের ভয়ে সরে পড়ল। আগন্তুক ফিনফিনে বাবুটি নেমেই নিবারণকে কিছু না বলে আমার দেহটার দিকে চেয়ে বল্লে—"পার করে দিতে পার? কিছু বকশীস পাবে।" তার কথায় নিবারণ কি বল্‌তে যাচ্ছিল চোখ ইসারায় বারণ করলাম—বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম "বাবু কোথায় যাচ্ছেন?' উত্তর—"অক্ষয় বোসের বাড়ী।" সাগ্রহে আমিও উত্তর দিলাম– বাবু আমিও সেই বাড়ী যাবো, আমি তাঁর বড় কন্যার চাকুরী করি, এই মোট নিয়ে যাচ্ছি—সম্বন্ধ সুদৃঢ় হলো দেখে তিনি জোর করে বল্লেন—"পার ক'রে দাও—"

নদীতে জল বেশী ছিল না--এক কোমর আন্দাজ জল: বাবুটিকে কচি খোকার মত দু'হাতের ওপর তুলে নিয়ে জলে নেমে মনে হলো একটু পা হড়কে বাবুর শ্বশুর ঘরে যাওয়ার মতটা বদলে দিই—কিন্তু পতঙ্গের প্রাণ জলে চুবড়ে লাভ কি? এতটুকু উদারতা করেও তাঁরের কাছে বাঁ হাতখানা একটু উচু করে তোলাতে মাথাটা নীচু হ'য়ে জল স্পর্শ করবার মত হলো অমনি বাবু চেঁচিয়ে উঠিলেন —"আহা কর — কি—গেলুম—মলুম যে—" অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে বল্লুম "পারের যাত্রী বাবু—এই রকম ক'রে ঊর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে তপস্যা করতে হয়—" তখন বাবু কিনারার কাছে এসে হাজির আমার হাত থেকে ফিংয়ে পাখিটীর মত তুড়ুক ক'রে নেমে কটমটিয়ে চেয়ে বুক পকেট থেকে একটা টাকা ফেলে দিয়ে, সাইকেল চেপে দৌড়। আমার আগে নিবারণ সাইকেল এ পারে নিয়ে এসেছিল।

পারে এসে চিত্রগুপ্তের খাতা খোলা —পাপ পুণ্যের বিচার'। মন দুয়েক বোঝার গোটাদশেক নট বহর—বসে ভাবচি এর মধ্যে ভগবান জুলে আয় নিমাই সর্দ্দার দুখানা বাঁক নিয়ে হাজির! এসে বল্লে "বড় দিদিমণি সকালেই আসতে বলেছিলেন তা বাস্তায় একটু দেরি—" বুঝলাম দুজনে তাড়ি খেয়ে দেরি করেচে। চিন্তামণীর ব্যবস্থায় ভার বহার দায় হ'তে অব্যাহতি পেয়ে সটান শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি নবাগত জামাইকে নিয়ে পাড়ার ছোট বড় মাঝারি মেয়ের দল ঘিরে বসেছে গান গাইবার জন্য হারমনিয়াম পর্য্যন্ত হাজির। বাড়ীতে পা দিতেই আমার

ছোট শালী হিরণ্ময়ী (তাহারই বর সদ্যসমাগত) ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির। আজ আর তার ও মজলিসে কলকে পাবার উপায় নেই। ছোট হ'তে আবদারটা আমার কাছে একটু বেশি রকমের, এসে বল্লে "জামাই বাবু আমার জন্য খদ্দরের রুমাল এনেছেন ?" আমি হেসে বল্লাম "তোমার এমন ফিন্ ফিনে পাতলা বরের গায়ে মোটা খদ্দরের রুমালের ছড় যাবে" সে বলিল—"যান্" তারপর সে ছুটে পালাতে উদ্যত হল, বাধা দিয়ে বল্লাম—থাম্, বরকে বৈতরণী পার করে এখানে এনেছি—কি দিবি বল্। সে পুনঃ বলিল—যান্।"

এমন সময় তার বরটী আমার পাশ দিয়ে মাথা গুজে চলে গেল।

আমি এত বড় একটা বিলাত ফেরত দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কালকের বাঁদর ছোঁড়া একটা মশা আমাকে মোটেই মান্‌লে না! রাগ হলো ছোঁড়ার উপর—ঘৃণাও হলো—ছোঁড়া যে তার অন্যায় কাজের জন্য লজ্জিত হয়েছে তা ভাব্‌তে পারলাম না। মনে মনে তার ওপর অভিযোগ এনে তাকে হুকুম শুনিয়ে দেবার অবকাশ পেলাম না। সকালে সে সকলের অগোচরে চলে গেছে "

কথাগুলা জলের মতো বলে শরৎ চুপ করে রইল। রমাপ্রসাদ বল্লে—"হাঁ হে শরৎ তুমি যে গভীর তত্ত্ব দর্শনের দিকে অগ্রসর হ'তে যাচ্ছিলে—তোমার ধ্যান ভেঙ্গে যে অভিসম্পাতে পড়লাম তার উপায় কি? বাবা, পরীক্ষীত গোটা মহাভারতখানা শুনে তার পাপ মোচন করতে পারিনি—আমার পাপ মোচনের উপায় কি বলে দিতে পারো?"

সে কথায় কাণ না দিয়ে শরৎ বল্ল,—তার পর আজ বাসার বারাণ্ডায় একটা সিগারেট মুখে দিয়ে পায়চারি করচি এমন সময় "বন্দে মাতরম্" "আল্লা হো আকবর" "মহাত্মা গান্ধির জয়!" বিপুল জন সঙ্ঘ, তুমুল কোলাহল এক খানা কয়েদীর গাড়ী, মাথায় লাল পাগড়ি পরা ভাইয়ার দল, রেগুলেশন লাটী হাতে জন চারেক সসস্ত্র গোরার মাঝেখানে সেই উদ্ধত যুবক সহ এক খানা গাড়ী উপস্থিত। যাকে পার করে খুব বীরত্ব অনুভব করেছিলাম আজ সে খদ্দর পরিহিত, গায়ে খদ্দরের জামা চুলের সে বাহার নেই, হাতে খদ্দরের রুমাল। —রুমাল খানা উড়িয়ে সে আমাকে বল্লে দাদা—"শশুর বাড়ীর যাত্রী—" দেখলাম তার রোগা দেহ যেন নব রক্ত কণিকায় বলশালী হয়ে উঠেছে—তার রমণীর মত মুখ খানা হ'তে দীপ্ত তেজ প্রকাশ পাচ্ছে। জামিনে খালাস করার জন্য তখনি একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে পিছে ছুটলাম, তখনও জেলের মধ্যে পোরা হয় নি। আমি আমার অভিপ্রায় জানিয়ে তাকে খালাস করার কথা বল্‌তেই সে হেসে বল্লে "তা হচ্চেনা দাদা"

তার হাসির মধ্যে যে তিক্ত বিদ্রূপ ছিল তারই জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ছিলাম।

রমা প্রসাদ হেসে বল্লে "আমিও যে তারা সহযাত্রী শশুর বাড়ীতে স্থানাভাব বলে তার আমায় ছেড়ে দিলে।" শরৎ অবাক্ হয়ে রমাপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জবাবদিহি

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

তোমায় আমি ভাল বাসি কি না ?--
হাজার রকম প্রমাণ আছে তা'র
বুঝবে না ক' 'জবাবদিহি' বিনা
ঋণের তাগিদ নাইক মোটে যার !

শুনবে.তবে শোন বলি শোন
বুঝে সুঝে প্রমাণ-হাতে গোণঃ—

এই দেখনা কারণ অকারণে
তোমায় শুধু বলছি নানা কাজে.
তুমি শুধু ওগো তুমিই আমার
শাসন চালাও হৃদয়-রাজ্য মাঝে,

কেন সেটা বলি ?—কেন জান ?
অবান্তরে যদিই মনে টান !

কি জানি গো কেমন করে তুমি
তাকাও আমার মুখের দিকে, যেন
আমি একটা মস্ত অপরাধী
কেন ? তোমার এত প্রতাপ কেন ?

চেঁচিয়ে তাকাও তুমি এমন জোরে
প্রাণটা আমার ওঠে কেমন ক'রে !

তুমি যদি চোখের আড়াল হও
নিমেষ যেন অশেষ মনে হয়ঃ
পথের সাড়ায় বুকের সেকি কাঁপন
হতাশ হয়ে চমকে ওঠে ভয় !

পায়ের শব্দ খুবই চেনা বটে
পদে পদে তবুও ভুল ঘটে !

কঠিন তুমি তবু চোখের জল
অনেক সময় রুধতে পার কই,
তোমার চোখের কান্না দেখে আমি
একেবারে এমন পাগল হই—

—ভাবি সবই আমার অপরাধ
মন জুড়ে দেয় করুণ আর্ত্তনাদ।

হয়ত তুমি ঘুমিয়ে আছ রাতে
আমি আছি সমান ভাবে জেগে,
মুখ চেয়ে মোর পলক পড়ে নাক
হঠাৎ কেন উঠন্থ এমন বেগে,

কথা তুমি কও না কেন মোটে
হতভাগার ভাগ্যে এমন জোটে ?

শুধাই তোমায় এমন অনেক কথা
নিজেই আমি জানি না তার মানে,
ঘুমিয়ে আছ দাও না কোন সাড়া
মনে মনে তাও বিপুল অভিমানে!

শুধু কথার অনেক মালা গেঁথে
পরাই, খুশি সকল জাগর রেতে!

চিবুক গণ্ড অধর রঙিন করে
দিলাম তোমায় কত রকম চুমো,
মন কেঁদে কয় একটু জাগো না গো ?
মুখে বলি,—ঘুমো ওরে ঘুমো!

আমার জাগা তোমার ঘুমের মাঝে,
তুমি আমি আছি নানান সাজে!

চেনা পথও এমন ভুলে যাই
তোমার কথায় পাগল যখন হই,
সোজা পথও চল্‌তে দেখি বাঁকা
মাঝখানেতে হঠাৎ থেমে বই ;

তোমায় ছেড়ে হয় না পথে চলা,
তোমার কথায় আমার কথা বলা !

ভাল মন্দ যা' খুসী তাই হোক
তোমাব কথা শুনতে ভালবাসি,
চোখেব জলে প্রাণ ফেটে যায় তবু
বুকে রাখি তোমার অশ্রু রাশি !

দেখলে হাসি ধন্য হয়ে যাই,
কান্না দেখে তেমনি দাগা পাই।

অগোছাল সামাল করে তুমি
সাজিয়ে তোল আমাব ভাঙা ঘরে,
হেলা ফেলা গুছিয়ে রাখ তুমি
আপন হাতে কত যতন করে,

কেন কর ? কেন কিসের টানে
একটানা স্রোত বয় যে দুটী প্রাণে।

আমাব যে কাজ তোমার পরশ বিনা
ব্যর্থ হয়ে অকাজ হতে যায়——
তুমিই তাবে পুণ্য করে তোল
কাজ অকাজ ও তাইত তোমা চায় !

আমার কি কাজ আছে তোমা ছাড়া,
ওগো আমার সকল কাজের বাড়া !

বিপর্য্যয়ের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে
পাঁজর যেন পড়ছে খসে খসে,
দীর্ঘ শ্বাসের দমকা হাওয়ায় মন
শিথিল হয়ে পড়ছে যেন ঢসে',

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে' বুকে
শুধু দিলে একটা চুমু মুখে,—
কোথায় গেল দুঃখ বিপর্য্যয়
সরিয়ে দিলে সব হতাশার ভয়!

অভিমানে মনের মাঝে শুধু
ঘনিয়ে ওঠে অন্ধকারের কালো,
তর্ক করে মনের কাণে কাণে
'এর চেয়ে যে মরণ তোমার ভালো'—

ওষ্ঠ কাঁপে কণ্ঠে মিলায় কথা
মর্ম্মে মরে শুধু নীরব ব্যথা,
বুকের পরশ ছুঁইয়ে দিলে তুমি,
মন বলে—গো এতই আপন তুমি?

তুমি যখন পরশ কর মোরে
সকল দেহ শিউরে ওঠে কেন?
বুকের মাঝে মেঘের দুরু দুরু
কোথায় আমি ঠিক থাকে না যেন!

সইতে নারি অধর পরশন
এমন সুখের তুমি আপন জন!
সুখ তুমি দাও এতই হৃদয় ভরে'
এই বুকে তা সইবে কেমন করে?

কি বল আর কি যে কর তুমি
পাই না সঠিক ঠিক ঠিকানা তা'র
মনটা আমার এমন ছেয়ে আছ
তোমার মনের খবর পাওয়া ভার !

দুষ্ট, তুমি করবে কেবল জয়
আমার কেন পরাজয়ই হয় ?
তা'তেই আমি অসীম সুখের ভাগী
আমি তোমার এমন অনুরাগী !

তোমার কাছে যেতে হ'লে আমার
পথকে আমি পথ বলে কি মানি,
লক্ষ যোজন তফাৎ থেকে কাণে
শুনি তোমার মুখের মধুর বাণী,

দূর যে তখন নিকট হয়ে আসে
মুখখানি যে আঁখির আগে ভাসে !

ভাষা দিয়ে ভালবাসার কথা
বলতে যাওয়া নিতান্ত দুরাশা,
এইটে শুধু জেনে রেখো মনে
আমার পথে তোমার যাওয়া আসা---

লক্ষ যুগের জীবন মরণ পণে
পথের যাত্রী তুমিই আমার সনে।

সহধর্ম্মিণী

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

নারীর সহিত পুরুষের যে ঐকান্তিক, অচ্ছেদ্য মিলনের বাঁধন, তাহাই যথার্থ সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম। সহধর্ম্মিণীর রূপ গার্হস্থ্য জীবনে নারীর যথার্থ স্বরূপ। সহধর্ম্মিণীর সঙ্গেই নৈতিক ও সামাজিক সম্মিলন। নারীই আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ সহধর্ম্মিণী।

দাম্পত্য প্রণয়ের সহধর্ম্মিণী অন্তপুর রাণী, অন্তররাণী, সংসার রাজ্যের পালয়িত্রী সম্রাজ্ঞী। গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষ বাহিরের ঐক্যকেন্দ্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সেবক। নারীও তার কর্ম্মকেন্দ্র অন্তঃপুরে জ্ঞান ও কর্ম্মের নিষ্ঠাবতী সেবিকা। কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিষ্ঠা ছাড়া সহধর্ম্মিণীর যথার্থ রূপ জগদ্ধাত্রীরূপ নহে। বাহিরের ও ভিতরের মিলনকেন্দ্রে নারী গার্হস্থ্যাশ্রমের গৃহিণী, পুরুষের সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী।

যৌবনের কামনাময় জীবন যাত্রায় দাম্পত্য জীবন আশা, আকাঙ্ক্ষায় আনন্দময়। বিশ্বের সৃষ্টি তখন নর নারী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া আনন্দ পায়। বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসে সহধর্ম্মিণী নারী তার সমধর্ম্মী পুরুষের কাছে ধর্ম্ম ও জ্ঞান স্ফূর্ত্তি দিয়া বিশ্বের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে।

এইজন্য সমধর্ম্মী পুরুষ চিনিবার, জানিবার ও বাছিয়া লইবার ন্যায্য অধিকার যথার্থ সহধর্ম্মিণীর অবশ্যই আছে। যেখানে নানা কারণে বাল্য বিবাহ ইহার প্রতিবন্ধক, সেখানে সহধর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মীর মিলন পদ্ধতি সুনির্ব্বাচিত করা শুধু পিতা মাতার কর্ত্তব্য নহে, সামাজিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বালিকার জীবন সুগঠিত না হইলে কিশোরীর জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা তার যৌবনের কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনার যদি অন্তরায় হয়, তাহা হইলে যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ যথার্থ সহধর্ম্মীর পক্ষে অসম্ভব। শুধু যৌন সম্বন্ধের সহধর্ম্মিণীর স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্ব জাতির ও পরিপারের আদর্শ হইতে পারে না। কাম ধর্ম্মের সহিত সতীধর্ম্মের সংযত বিকাশ ছাড়া স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্ব নারীর যথার্থ মর্য্যাদা দান করিতে পারে না। সতী ধর্ম্মের আদর্শ কাম ধর্ম্মের বিদ্বেষী; সতীধর্ম্ম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সংযম ও ত্যাগের ধর্ম্ম। সতীধর্ম্ম মাতৃত্বের ও স্ত্রীত্বের আদর্শ। সতী ধর্ম্মই সহধর্ম্মিণীর পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ। এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সহধর্ম্মিণী গড়িবার চেষ্টা ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে করিতে হয়। বালিকার শরীর, মন ও বাক্যের যথার্থ পরিণতি শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষার বালিকার হৃদয় ও মন সুগঠিত না করিলে নারীর ভবিষ্যৎ জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। বালিকার জীবন সংগঠন করিলে নারীত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। অনাদরে, অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের

গঠন না করিলে মাতা, জাতি ও সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিকে সুসন্তান দান করিতে পারে না। সংযমে যে বালিকার বাল্য জীবন সুগঠিত, শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পদে যে বালিকা আবাল্য অলঙ্কৃতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলন যে বালিকার লক্ষ্যপথে পথ প্রদর্শক, সে বালিকাই জগদ্ধাত্রী জননী, মঙ্গলময়ী সহধর্ম্মিণী হওয়ার আশা করিতে পারে।

যৌবনে যখন শরীর ও মনের পূর্ণতা লাভ হয়, নারী তখন পুরুষের মতন অন্তরে ও বাহিরের রাজ্যে সমধর্ম্মী খুঁজিয়া বেড়ায়। যৌবনের কাম মূলক ও প্রেম মূলক এই একান্ত আকর্ষণেই নর নারীর স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্মিলন সঙ্ঘটিত হয়। সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সহধর্ম্মীর যথার্থ মিলন হইলে তাহার প্রত্যাখ্যান হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই জন্য সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর মিলনের জন্য মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে নৈতিক দ্বৈত ঐক্য সাধন নিতান্তই সম্ভবপর। সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীরা শরীর ও মনের মিলনে তাহাদের জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্ম-শক্তি পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া উভয়কেই উৎসাহিত করে। উভয়ের কর্ম্ম ও জ্ঞানের একান্ত অধ্যবসায়ের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফল লাভ হইতে পারে।

সহধর্ম্মিণীর সামাজিক মূর্ত্তি সমাজ মন্দিরে পারিবারিক বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। বালিকার শিক্ষায় সহধর্ম্মিণী গড়িবার আদর্শ সমাজ প্রচার করিতে পারে। বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে সহধর্ম্মী ও অসহধর্ম্মিণীর শারীরিক ও মানসিক ঐক্য সাধনের জন্য প্রথমতঃ দায়িত্ব পিতা মাতার বা পিতৃ মাতৃ স্থানীয় অভিভাবক বর্গের। কোনও স্বার্থ প্রেরণা জনিত বা অজ্ঞতায় ইহার অন্যথা হইলে সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর ব্যক্তিগত জীবনের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই রূপ ভাবে অনেক শ্রেষ্ঠতম মানব প্রতিভা অকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনেক আশাময় ও কর্ম্ম-ময় জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। অনেকে ব্যভিচারী হইয়া পরিবার ও সমাজের নৈতিক আদর্শ হীনতর করিয়া জীবনের পবিত্রতা নষ্ট এবং জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। অনেকে সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন হইয়া কামনায় পুড়িয়া, জীবনের মূল্যবান অনেক জ্ঞান সম্ভার তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া সমগ্র মানব সমাজের অকল্যাণ সাধন করিয়াছে। পিতা মাতা বা পিতৃ মাতৃ স্থানীয় অভিভাবকগণের অজ্ঞতা ভ্রান্তি ও স্বার্থ সাধনের চেষ্টার ফলে সহধর্ম্মীর চেয়েও সহধর্ম্মিণীর ক্ষতি অনেক বেশী হয়; কারণ পুরুষ কর্ম্মকেন্দ্রে ও জ্ঞানকেন্দ্রে সমাজ ও পরিবারে যে স্বাধীনতা পায় নারী সকল সময়ে সর্ব্বত্র তাহা পায় না। নারীর অজ্ঞতা অশিক্ষা, কুশিক্ষা, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক প্রকার অধীনতা তাহার সমস্ত জীবন ও ব্যর্থ করিয়া দেয়। ঘটক ও ঘটকী, কোথায়ও বা গুরু পুরোহিত, কোথায়ও বা যৌবন নির্ব্বাচন এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়া দেয়। এ সম্বন্ধে অভিভাবকগণের ও সামাজিকগণের সাবধানতা বিশেষ প্রয়োজন।

যথার্থ সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর দাম্পত্য মিলনই পরিবার গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তির মূলভিত্তি জ্ঞানময়ী, ধর্ম্মময়ী সতী সহধর্ম্মিণী লাভ। সহধর্ম্মিণীর যদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত না হয় তাহা হইলে অর্থ বিনিময়ে তাহার প্রতিকার অনেক স্থলেই অসম্ভব।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে নারীর আদর্শ গৃহস্থের অনুযায়ী না হয়, তাহা হইলে সহধর্ম্মিণীকে সুগৃহিণীতে পরিণত করা মোটেই সহজসাধ্য নহে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্ষ, অনুশীলন-সাপেক্ষ, অভ্যাস সাপেক্ষ। বালিকা বয়সে জ্ঞানের এই বীজ উপ্ত না হইলে সুফল ফলানো সাধারণ পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব, মধ্যবিত্ত পরিবারে দুঃসাধ্য; সম্পন্ন পরিবারেও নানা কারণে সহজ নহে।

বিবাহের আগে ও পূর্ব্বে নারীর যে পারিবারিক জীবন সুগঠিত হয়, উত্তর কালে সেই জীবনই সমাজে সহধর্ম্মিণীর আদর্শ হয়। পারিবারিক জীবনে গৃহস্থালী শিক্ষা, সেবাধর্ম্ম শিক্ষা, স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম পরিচালন শক্তি অর্জ্জন করা ক্রমশঃ সহধর্ম্মিণীর পক্ষে সমগ্র জীবনে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

পারিবারিক জীবনে সহধর্ম্মিণীকে সাহায্য করিবার শক্তি অর্জ্জন সহধর্ম্মিণীর নিতান্ত প্রয়োজন। সহধর্ম্মীর চিন্তাধারা ও কর্ম্ম-প্রণালীর সঙ্গে ঐক্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সহধর্ম্মিণীর জীবনের মর্য্যাদাহানীর কোনও সম্ভাবনা নাই।

পারিবারিক সুবন্দোবস্তে যেমন সুগৃহিণী হইতে হইবে, তেমন সহধর্ম্মিণী শরীর মন ও আত্মার বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ ধর্ম্মের সঙ্গে নৈতিক দিক হইতে অভিন্ন করিয়া লইবেন। প্রয়োজন হইলেই নারীর সর্ব্ব প্রকার নারীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নারীকে সমাজের অন্তঃপুরে বসিয়া অর্থো-পার্জ্জন করিয়া সহধর্ম্মীকে সাহায্য করিতে হইবে। সহধর্ম্মিণী যদি সহধর্ম্মীর অর্থে, স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে বা কর্ম্মে পরগ্রহ হইয়া পড়েন, তাহাতে শুধু সহধর্ম্মীর নহে, পরিবার ও সমাজের তাহাতে বহু শক্তি অযথা অপব্যয়িত হয়। সময় সময় তাহাতে ব্যক্তির, পরিবারের ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়।

পরিবার সংগঠনে সহধর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মী যতই হরিহর আত্মা হইবেন, যতই তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি পরস্পর সাপেক্ষ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন হইবে, ততই পরিবার নানা দিক দিয়া উন্নতিশীল হইয়া উঠিবে। যথার্থ সহধর্ম্মিণীই সুগৃহিণী হইতে পারেন।

অন্তঃপুর রাজ্যের প্রজাগণের স্বাধীনতা রক্ষার ভার সহধর্ম্মীর সহধর্ম্মিণীর উপরে। অন্তঃপুরে সকলের ন্যায্য অধিকার সকলকে প্রদান করা নেত্রীর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এই যোগ্যতার অভাবে অন্তঃপুর সংগঠন যথাযথ হয় না বলিয়াই অনেক পরিবার অকালে উচ্ছন্ন যায়।

সহধর্ম্মিণীর সন্তান জনন গুরুতর কর্ত্তব্য। সুসন্তান মহান জাতির আদর্শ জন্মদাতা। মাতৃত্বের পূর্ব্বে স্ত্রীত্বের প্রথম স্তরে সুপ্রজনন বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের সম্যক আলোচনা করা মানব জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও ইহা অনেক স্থলেই উপেক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাবে জনক জননী ও সন্তান কত শত অন্যায়, অধর্ম্ম ও পাপের সাহচর্য্যে পরিবার ও সমাজ পর্য্যুদস্ত করিয়া জাতিকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লয়। এই পিতা-মাতার অন্যায় যে সমাজ সুনীতি প্রচারে বন্ধ করে না ভবিষ্যতে সেই সমাজকেই তাহার অসংখ্য ফল মাথায় করিয়া বহন করিয়া জাতীয় দুঃখের ভাগী হইতে হয়। সন্তান জননের আশায় এই জন্য সহধর্ম্মিণী গঠন সমাজের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য।

সন্তান পালনের জন্য জননীর যে দায়িত্ব, তাহা জননী হইবার পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ

করিতে হয়। সহধর্ম্মিণী যথার্থ স্ত্রী হইবেন, যথার্থ গৃহিণী হইবেন, যথার্থ জননী হইবেন। সহধর্ম্মিণীর জীবনের এক অংশ স্ত্রী, এক অংশ গৃহিণী, এক অংশ জননী, অথচ এই অংশত্রয় অঙ্গাঙ্গীভাবে গঠিত হইয়া সহধর্ম্মিণীর স্বরূপ প্রকাশ করে।

পরিবার পালন ও সমাজসেবা সহধর্ম্মিণীর বিকসিত জীবনের গুরুতর দায়িত্ব। সহধর্ম্মীর সহিত সহধর্ম্মিণীর ব্যক্তি সংযোগ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাম্য ও মৈত্রির ক্রমশঃ বিকাশ।

বালিকা যদি কারও সহধর্ম্মিণী হয়, তাহা হইলেও তাহাকে সহধর্ম্মিণীর আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সহধর্ম্মিণী হইবার সুযোগ শিক্ষার দিক দিয়া সকলকেই দিতে হইবে। গার্হস্থ্য জীবনে দাম্পত্য বন্ধনে পুরুষ ও স্ত্রী না মিশিয়াও সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধে এরূপ সহ-ধর্ম্মিণীও বিরল নহে। কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধের কেন্দ্রে নারীর সহধর্ম্মিণী রূপ লইয়া জগতের গৃহস্থালী চিরদিন ঘরে ঘরে, সমাজে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সহধর্ম্মিণীর এই রূপই বংশের পর বংশ গড়িয়া জাতি গড়িয়া লইয়াছে। জগতের জ্ঞানবল ও ধনবল সম্ভোগ করিবার জন্য জনবল বৃদ্ধির জন্য সহধর্ম্মিণী পরিবার কেন্দ্রে সৃষ্টি সূত্রের মালা সংসারের গলায় পরাইয়া দিতেছেন।

সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ মানুষ মাত্রেই চায়। নারীশক্তি জ্ঞানশালিনী হইলে শক্তি কেন্দ্রের সকল দিক তাহার আয়ত্ত হইবে। জ্ঞানবতী নারী অন্যের গলগ্রহ হইতে পারেন না। জাতির বা সমাজের, পরিবারের বা ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকিলে সহধর্ম্মী ও সহধর্ম্মিণীর শুধু নয়, পরিবার ও সমাজের পঙ্গুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জাতি অকর্ম্মণ্য ও মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। *

সহধর্ম্মিণী নারীর জ্ঞান শক্তির উপর নারী মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা। নারীর উচ্চতর জ্ঞান নারীর উচ্চতম মানসিক সম্পদ। জ্ঞান শক্তি নারীকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সহধর্ম্মিণী. জননী ও নিষ্কাম ধর্ম্মে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী করিয়া সৃষ্টিরাজ্যে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠ করে। তাহার জ্ঞান শক্তির উপর সহধর্ম্মীর স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংসার ও গৃহস্থালী নির্ভর করে। নারী সর্ব্ব প্রকার ধনের যথার্থ অধিশ্বরী। সেই ধন তিনিই সহধর্ম্মীর সহায়তায় সংগ্রহ করেন, রক্ষা করেন ও ধনের সদ্ব্যয় করেন। সংসারের হিসাবে নারীর জ্ঞান শক্তি প্রেম ও ভক্তিতে গৃহকে শান্তিনিকেতনে পরিণত করিতে পারে।

সংসারের গৃহস্থালী সহধর্ম্মিণীর কর্ম্মশক্তির উপর নির্ভর করে। আর্ত্তের সেবায় দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে নারীর সহিষ্ণুতা, সেবা-পরায়ণতা অতুলনীয়। নারীর স্নেহ দানের জন্য বিশ্বের শিশু বাঁচিয়া থাকিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানময় জীবন গঠন করে। সেই শিশুরাই ভবিষ্যৎ জাতির ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে।

সহধর্ম্মিণী গঠন করিতে না পারিলে সহধর্ম্মীর জ্ঞান ও কর্ম্মের গার্হস্থ্য সংস্করণ উজ্জ্বল ও শিক্ষাপ্রদ হওয়ার আশা নাই। মানুষের ধর্ম্ম মানুষের উন্নতিমূলক। যে শক্তি উন্নত করে, সমৃদ্ধ করে, আনন্দ দেয়, অভাব দূর করে, কর্ম্মে নিয়োজিত করে, জ্ঞানে অভিজ্ঞতা ও আনন্দ প্রদান করে, যে শক্তি সংযত করে, সংগ্রাম করে, জয় পরাজয়ের আনন্দ ও নিরানন্দ সম্ভোগ করায়,—যে শক্তি সকল অবস্থায় আমাদের ধারণ করে, রক্ষা করে,

পরিপুষ্ট করে, পরিণতি শিক্ষা দেয়, সেই প্রকৃত ধর্ম। সহধর্মী ও সহধর্মিণী ধর্ম্মের এ স্বরূপ জানিলে ভোগে ও ত্যাগে, সংসারে ও সন্ন্যাসে জগজ্জয়ী হওয়ারও আশা পোষণ করতে পারে।

ধর্ম্মই নরনারীর আত্মিক মিলনের সূত্র। ধর্ম্মই সামাজিক ও পারিবারিক সম্মিলনের ভিত্তি। সহধর্ম্মিণী গড়িতে হইলে স্বধর্ম বা আত্মার ধর্ম্মে আস্থাবান হইয়া জগতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতে হইবে।

সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মের জ্ঞানাংশ ও কর্ম্মাংশ। সহধর্ম্মিণী গড়িতে হইলে আবার সত্য বধূ ও সহচারিণীর আদর্শ প্রয়োজন। সহধর্ম্মিণী লাভ করিতে হইলে জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীর মর্য্যাদা রক্ষার যা কিছু উপাদান, নারীকে কর্ম্মশক্তিকে তাহা সংগ্রহ করিতে দিতে হইবে। কর্ম্ম ও জ্ঞানে সমাজ কল্যাণের শুভ ইচ্ছা লইয়া নারী আপনাকে যাহাতে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইতে পারেন, এমন ব্যবস্থা সহধর্ম্মীকেই করিয়া দিতে হইবে।

পুরুষের সহিত নারীর এই সহধর্ম্মিণীর ভাব অতি ব্যাপক। সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তির মধ্যে নারীত্বের সর্ব্ব দিক পরিস্ফুট। সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তির মধ্যে স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব ও সতীত্ব সৃষ্টির উপাসনায় তন্ময় হইয়া আছেন। এই মূর্ত্তিই কল্যাণী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, আনন্দময়ী মূর্ত্তি।

সেবা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

"বউ মা একটু জল দিয়ে যাওনা মা ?"

বৃদ্ধা সরলার আহ্বানে কেহই উত্তর দিল না। অপর কক্ষে তখন তাস খেলার খুব ধুম পড়িয়াছিল, বধূর পনের ষোল ইত্যাদি ডাক গুলাও কানে আসিতেছিল, বৃদ্ধার মৃদু কণ্ঠ সে কক্ষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারিনা।

সরলা আবার ডাকিলেন—'বউ মা একটু জল দিয়ে যাও মা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

বধূর সাড়া পাওয়া গেল না। সঙ্গিনী একজন বলিল "ওগো, তোমার শাশুড়ি একটু জল চাচ্ছে যে।"

সরল কণ্ঠ এবার বেশ শুনা গেল, সে বড় বিরক্তিপূর্ণ স্বর 'আর পারা যায় না ভাই। বুড়ি জ্বালিয়ে খেলে মারছে। মরেও না তো যে আপদ যায়। ওর পেছনে খাটতে অষ্টপ্রহর একটা মানুষ চাই, এই আজ আট দিন বিছানায় পড়ে আছে, বলব কি ভাই, এক পঞ্চাশ বার কেবল জল দাও, সাগু দাও, দুধ দাও, ওষুধ খাওয়াও পারে কে বল তো? অত নেকরা আমার ভাল লাগে না বাপু। জ্বর হলে আর একটুও ওঠা যায় না নাকি ?"

সঙ্গিনী বলিল "তা এখন একটু জল দিয়ে এস তো"।

দ্বারের উপর বধূ উমার পদশব্দ শুনা গেল, সরলা অন্যদিকে ফিরিয়া ছিলেন, তাঁহার দুই চোখ দিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। উমা ঝঙ্কার দিয়া বলিল "কি চাই?"

সরলা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "কিছু চাই নে মা —"

"ভাল ঝকমারী: তবে শুধু শুধু ডাকাডাকির মানেটা কি? এমন হাতটা পড়েছিল, আমাদের বেড়সেটটা এবার খুলে যেত, সব মাটী হয়ে গেল অনর্থক শুধু শুধু—"

উমা পিছন ফিরিতেছিল সরলা এবার মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন 'বউ মা —"

উমা থমকিয়া দাঁড়াইল, সরলার চোখে জলধারা দেখিয়া একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "ওই তো তোমার বড় অন্যায়। দিন নেই, রাত নেই সব সময়ে গেরস্তের বাড়ী চোখের জল ফেলবে। ওতে যে ছেলেটার অকল্যাণ হবে—সেটা ডাক্তার বাবু তোমায় বলে দিয়েছি। তুমি সংসারের একটা অকল্যাণ না ঘটিয়ে ছাড়বেনা দেখছি।"

চোখ মুছিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরলা বলিলেন "না আমি চোখের জল ফেলছি নে, তুমি যাও।"

উমা কঠিন হইয়া বলিল "কেন—?"

সরলা উত্তর দিলেন না, বালিসের মধ্যে মুখখানা লুকাইলেন।

উমা গজ গজ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। সঙ্গিনী বলিল "জল দিয়ে এলে নাকি?"

উমা হাতের তাস কুড়াইয়া লইয়া বলিল "মাগীর সবই বজ্জাত গো, জল খাবে না ছাই, ও ঘর হতে শুনছে আমার হাতটা এবার ভাল এসেছে তাই খেলাটা নষ্ট করবার জন্যে এই ফন্দী। সবর কি ভাই এমনি করে আমার হাড় জ্বালাতন করলে। বিয়ে হয়েছে পনের ষোল বছর, একটী দিন ও দ আমায় সুখী হতে দিয়েছে। এ প্রায়ই দেখবে কেবল চোখে জল—কেবল চোখে জল। সত্যি বল ভাই, এতে অকল্যাণ ডেকে আনা হয় না? আমার বাবু তো আছে তার একটা কিছু না করে ও ক্ষান্ত হবে? আজ আসুন উনি বাড়ী দেখি বলে, যা করতে পারেন করবেন।"

কথা গুলা সরলার কানে বেশ স্পষ্ট হইয়া গেল: তাঁহার দুচোখ আর মানা মানিল না ঝর ঝর করিয়া জল উপচাইয়া পড়িল।

কি কষ্টের জীবন তাঁহার তাহা তিনি জানেন আর জানেন সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, যখন সংসারের কিছুই জানিতেন না তখনই তাঁহার স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন। গর্ভে ছিল পুত্র মণীন্দ্র।

সংসারের সব আশা সুখে জলাঞ্জলী দিয়া বালিকা সেই পুত্র মুখ দেখিবার ক্ষীণ আশাটী বক্ষে লইয়া বাঁচিয়া রহিল, পুত্র যে দিন ভূমিষ্ট হইল তখন তাহার জগৎ আবার সুখময় হইয়া উঠিল, আবার তাহার বাঁচিতে আশা হইল। পিত্রালয়ে ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা লাঞ্ছনা সহিয়া তিনি ছেলেটীকে লইয়া সেখানে পড়িয়া রহিলেন।

তাহার পর একদিন বালক মণীন্দ্র মামার ছেলের সহিত মারামারি করিয়া জয়ী হওয়ায় মাতা পুত্রকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। দুঃখিনী সরলা পুত্র লইয়া পরিত্যক্ত স্বামীর ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে নিজে লোকের বাড়ী কাজ করিয়া পৈতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া কোনও মতে ছেলেটীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। তাহার পর গ্রামের ধনাঢ্য

হরনাথ বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া ছেলেটীকে তাঁহার সহিত পড়িবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

গ্রামের ছেলে মণীন্দ্র তাহার ছেলেই ছিল, সহরে গিয়া সহরের বাতাসে সে বদলাইয়া গেল, এই সময় হরনাথ বাবুর মেয়ে উমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার ছেলে সেই হইতে একেবারেই পর হইয়া গেল, সে কদাচিৎ গ্রামে আসিত মাত্র।

বি, এ, এবং ল পাস করিয়া সে হাই-কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে লাগিল, হরনাথ বাবুর সহায়তায় অতি অল্পদিনে সে বেশ দু'পয়সা উঠিল, একখানা বাড়ীও করিয়া ফেলিল, লোকলজ্জায় এবং নব প্রসূত পুত্রটিকে মানুষ করিবার জন্য সে মাকে নিজের কাছে লইয়া আসিল। চির অনাদৃতা দুঃখিনী মাতা ভাবিলেন তাহার দুঃখরজনী ভোর হইয়াছে, পুত্রের সুখ-সৌভাগ্যে মায়ের বুক ভরিয়া উঠিল, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া যে মুহূর্ত্তে পুত্র তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল সেই মুহূর্ত্তেই রাজি হইলেন।

কলিকাতার বাসায় আসিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এই প্রাসাদসম অট্টালিকা তাঁহারই পুত্রের, অনিন্দ্য সুন্দরী সাভরণা যুবতী উমা তাঁহারই পুত্রবধূ, আর দেবশিশুর মত শিশুটি তাঁহারই পৌত্র। বিধবা ভাবিলেন, ছোট বেলা হইতে দুঃখ পাইয়াছেন, এইবার সুখী হইবেন। পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশ্যে দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া অতি আনন্দে তিনি হাসিলেন।

দু'চার দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার ভুল ঘুচিল। পুত্রের মুখে তিনি ঘৃণার ভ্রূকুটী দেখিলেন, বধূর মুখের টিপ্পনি শুনিলেন, তাঁহার সুখের আশায় ছাই পড়িল।

দেশে ফিরিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রবি তাঁহাকে বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিল। রবির মায়ায় ভুলিয়া তিনি কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ ভাঙ্গিল।

তাহার পর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রবি চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরমা আর তাহার নাগাল পান না, তিনি এখন বন্ধন গৃহের অধিকার পাইয়াছেন।

তাহার মনের যে দৃঢ়তা, সাহস পনের বৎসর পূর্ব্বে ছিল, আজ আর তাহা নাই। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী ছিলেন, এই অভিমানেই তাঁহাকে অত্যন্ত নত করিয়া রাখিয়াছিল। পুত্র বা পুত্রবধূ কাহারও মুখের উপর একটা কথা কহিবার ক্ষমতা আর তাঁহার ছিল না, সে সাহস অনেক দিন তাঁহার চলিয়া গিয়াছে। পনের বৎসর আগেকার সরলার এ একটি ছায়া মাত্র, সে সে-সরলা নয়।

সকাল বেলাটায় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সরলা আস্তে আস্তে উঠিয়া কলতলায় যাইতেছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠায় উঠানের মাঝখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মণীন্দ্র উপরের রেলিংয়ে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন "কেমন আছ মা ?"

পুত্রের পানে চাহিয়া মাতা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "ভাল আছি।"

মণীন্দ্রের পার্শ্ব হইতে উমা বলিল, "সেই এক কথা গো, এক কথা। যখনই জিজ্ঞাসা

করবে ওই এক উত্তর পাবে, অথচ ডাক্তারের কাছে কাঁদবেন কাটবেন কত কথাই বলবেন। আচ্ছা, আমি যা বলি—আমি তো মন্দ আছি-ই, ছেলের কাছে যা বল্‌তে পার না, পরের কাছে তা তো দিব্যি ব'লে যেতে পারো।"

গম্ভীরমুখে মণীন্দ্র বলিলেন "এটা কিন্তু তোমার বড় অন্যায় মা।"

উমা বলিল "এই দেখ না, তোমায় বললে ভাল আছি, ডাক্তার এলে দেখো'খন—কত রোগেরই ব্যাখ্যা হবে। তিনি আবার সেই সব কথা তোমায় বলবেন'খন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মণীন্দ্র বলিলেন, "বাস্তবিক, আমায় কোন কথা না জানিয়ে পরকে জানাতে যাওয়া তোমার ভয়ানক অন্যায় মা, ওতে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে যায় তা জানো? আমি অথচ কিছু জানি নে, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করে? লোকে ভাবে আমি তোমায় দেখি নে, তোমার কোন খোঁজ খবর নেই নে—"

অধৈর্য্য ভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া সরলা বলিলেন "ওরে বাছা, আমি বেশ আছি, বেশ আছি, আমার জন্য তোদের কারও কিছু করতে হবে না। বিশ্বাস না হয় নিজে এসে গায় হাত দিয়ে দেখে যা।"

তাঁহার প্রতি পুত্রের এই অনুযোগে সত্যই তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, তিনি, কোনও মতে তাহা গোপন করিয়া টলিতে টলিতে নিজের গৃহে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার নিয়মিত তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাহির হইতে তিনি ডাকিবা-মাত্র, কঠোর কণ্ঠে সরলা বলিলেন "আজ আমায় দেখতে হবে না, বাছা, আমি খুব ভাল আছি।"

ডাক্তার অবাক হইয়া গেলেন; ধীরে ধীরে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "কেন মা, দেখতে দিতে আজ আপনার আপত্তি কেন?"

পরের ছেলের কি বিনয়পূর্ণ কথা! হা ভগবান, নিজের ছেলে কি এমন করিয়া একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারে না? সরলার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তিনি হাতখানা চোখের উপর চাপা দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন না বাবা, আমি আর ডাক্তার দেখাব না, আর আমার ইচ্ছে নেই; তবে ওষুধ নিতে পারি, সে সারবার ওষুধ নয়, সরবার ওষুধ। আছে বাবা, তোমার ডাক্তার খানায় সে ওষুধ আছে কি?"

ডাক্তার বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, না মা—

"তবে যাও, আর এস না।"

সরলা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ডাক্তার বাহির হইলেন, মণীন্দ্র বাবুর নিকট বাহিরের গৃহে গিয়া বলিলেন "আজ তো মা কোনও মতেই দেখতে দিলেন না। কি করি বলুন তো।"

মণীন্দ্র নাথ উদাস ভাবে বলিলেন "কি বললেন?"

ডাক্তার বলিলেন "বললেন দেখতে হবে না—"

মণীন্দ্র নাথ একখানা মোকদ্দমার কাগজ টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন "যাক, তাঁর ইচ্ছামতই কাজ করুন তবে।"

ডাক্তার বলিলেন "রোগীর ইচ্ছামত কাজ? তা হলে রোগীর বাঁচবার আশা ছেড়ে দিতে হয় দেখছি। রোগী বলবে দেখাব না, ওষুধ খাব না—"

বিরক্ত মণীন্দ্র নাথ হাতের কাগজ খানা

ছুড়িয়া ফেলিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন 'তবে আপনি আমায় কি করতে বলেন শুনি?''

ডাক্তার তাঁহার বিরক্তি ভাবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন "কোনও কারণে তাঁর রাগ হয়ে থাকতে পারে। আপনি গিয়ে একবার যদি—''

বাধা দিয়া মণীন্দ্র নাথ কাগজ খানা আবার তুলিয়া লইয়া বলিলেন "না, সে সব এখন আমার দ্বারা হবে না। আমার আজ জরুরী মোকর্দ্দমা আছে তার কাগজ পত্র দেখতে ভারি ব্যস্ত আছি, এক মিনিট সময় নষ্ট করবার যো আমার নেই। আপনার সঙ্গে কথা বলতে যে সময়টা নষ্ট করেছি তার ক্ষতিপূরণ করতে অনেকটা সময় লেগে যাবে'খন আমার।''

ভ্রূকুটীপূর্ণ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া ডাক্তার একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন; সেই সময় পশ্চাৎ হইতে কে উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল "কাকাবাবু''

ফিরিয়া ডাক্তার দেখিলেন রবি।

সে আসিয়া তাঁহার হাত খানা চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না, আপনাকে দেখে যেতেই হবে ঠাকুমাকে। বাবা মা ঠাকুমাকে কি সব বলেছে ঠাকু মা তাই রাগ করে শু'য়ে আছে। আপনি চলুন না দেখলে ঠাকুমা মরে যাবে। ঠাকুমাকে ভাল করে দেশে পাঠিয়ে দিন, নইলে বাঁচবে না।''

বালক সত্যই ঠাকুর মাকে বড় ভাল বাসিত। পুত্র ও পুত্রবধূর এত অবজ্ঞার মধ্যে থাকিয়াও বৃদ্ধা সরলার এ সংসার মধুময় ঠেকিত শুধু ইহারই জন্য।

রবি গিয়া ডাকিল "ঠাকু মা—''

সরলা ফিরিলেন "কি দাদা?''

রবি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "একবার ডাক্তার দেখাও ঠাকুমা। ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যাও, কাকাবাবু তোমায় দেশে রেখে আসবেন। কাকাবাবুকে না দেখালে তুমি যে মরে যাবে ঠাকুমা।"

তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

"আহা, দাদা আমার—"

বৃদ্ধা বুকের মধ্যে তাহাকে টানিয়া ধরিলেন, আবার তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন "এস বাবা, দেখে যাও। আমি মরব না, আমি বাঁচব, নইলে রবি যে কাঁদবে।"

ডাক্তার রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আপনি বাঁচুন, আমি সত্যিই আপনাকে আপনার দেশে রেখে আস্‌ব।"

সরলা একটু হাসিলেন "আমার কি ঘর আছে বাবা যে যাব? চৌদ্দ বছরে বিধবা হয়েছি, ছেলেটি হ'লে কত আশা করেছিলুম— যা'ক সে কথা। এখানে এসে আছি আজ তের চৌদ্দ বছর, খড়ের সে চালা কি আর আছে? ক-বে সে মাটিতে মিশে মাটি হ'য়ে গ্যাছে। যাবার জায়গা এক আছে যমের কোলে, যদি পারো বাবা, তাই পাঠাও, তবে আমার যথার্থ ছেলের কাজ করবে।"

ডাক্তার গোপনে শুধু চোখ মুছিলেন।

৩

পুত্র আহারে বসিয়াছিলেন, মাতা পরিবেশন করিতেছিলেন, পুত্রবধূ নিকটে একখানা পাখা হস্তে বসিয়াছিল। সময়টা যদিও বাত্রি এবং মাছির উৎপাত মোটেই নাই, তথাপি পাখা হাতে, ইহার উদ্দেশ্য নিকটে একটা উপলক্ষ লইয়া বসিয়া থাকা বই আর কিছু নহে। রবি তখন আহারান্তে শয়ন করিতে গিয়াছে।

মাছের ডালনা একবার আস্বাদন করিয়া

মণীন্দ্রনাথ মুখখানা বিকৃত করিলেন; তাহা লক্ষ্য করিয়া উমা সাগ্রহে বলিল, "কি হ'ল ওটাতে?

মণীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যেমন ঝাল, তেমনি নুণ হয়েছে। মার রান্না যেন দিন দিন কি রকম হচ্ছে। এ রকম নুণ ঝাল প্রায়ই মাছের তরকারীতে হয়, আগে তো এমন ছিল না।"

তরকারীর পাত্র হাতে সরলা দরজার বাহিরে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, গৃহে প্রবেশ করিতে আর তাঁহার ক্ষমতা ছিল না।

উমা কঠিন স্বরে বলিল, "কিন্তু ওবেলায় যে নিরামিষ তরকারী হয়, তাতে তো এক দিনও নুণ কি ঝাল হয়না, তার মসলা ও নুণের পরিমান ঠিকই থাকে তো?"

কথাটার মধ্যে কতখানি লাঞ্ছনা বিদ্বেষ লুক্কায়িত ছিল তাহা বুঝিলেন গোপনে যিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন তিনিই। আস্তে আস্তে তিনি ফিরিয়া গেলেন, হাতের পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু ইহা তো তাঁহার কাছে আজ নূতন নহে। এরূপ কথা প্রায়ই তাঁহাকে শুনিতে হয়। প্রথমটা বড় আঘাত লাগিত, কিন্তু পরে আর তত আঘাত দিতে সমর্থ হইত না। আজিকার আঘাত তাঁহার বুকে বাজিল আগেকার মতই কঠিনরূপে, তিনি চোখের জল অতি কষ্টে সামলাইতে পারিলেন।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেল। মণীন্দ্রনাথ খোলা বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সরলা ধীর পদে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিবার সাহস তাঁহার হইতেছিল না।

মা আসিয়াছেন জানিয়াও মণীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া তামাকই টানিয়া যাইতেছিলেন। জননী আবার অজ্ঞাতসারেই চলিয়া যাইতেছিলেন—তখন তিনি বলিলেন "কিছু বলবার দরকার আছে নাকি?"

ফিরিয়া সরলা বলিলেন "হ্যাঁ—"

মণীন্দ্রনাথ বলিলেন "কি?"

মাতা এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন "আমি বাড়ী যাব।"

প্রথম প্রথম তিনি এ কথাটা প্রায়ই বলিতেন বটে, কিন্তু আজ তের চৌদ্দ বৎসর একেবারেই নির্ব্বাক হইয়া ছিলেন। তাঁহার যে স্বতন্ত্র বাড়ী বা দেশ আছে ইহা বাড়ীর আর সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিল।

মণীন্দ্রনাথ খানিক হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষটায় একটু হাসিয়া বলিলেন "বাড়ী যাবে? বাড়ী কোথা?"

বিধবার চোখে অভিমানে জল আসিয়া পড়িল, আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন "আমার দেশ, আমার স্বামী—তোমার পিতার সেই ভিটাটী।"

একটু দমিয়া গিয়া মণীন্দ্রনাথ বলিলেন "আঃ, সেই বাড়ী? কি আছে সেখানে? আজ পনের বছর এসেছ, সেই খড়োঘরখানা এখনও আছে ভাবছ? আমি খবর নিইছি—সেখানে কিছু নেই।"

সরলা বলিলেন "কিন্তু দুই চার টাকায় সেখানে তেমনি একটা খড়ের ঘর উঠানো যায়।"

মণীন্দ্রনাথ একটু বিরক্তভাবে বলিলেন "তা যায়, কিন্তু একটা কথা যে টাকা লাগবে তা পাওয়া যায় কোথায়? আর পাওয়া গেলেও সেই জায়গাটুকু পাবে কোথায়? কোন কাজে লাগে না, অমন প'ড়ে

আছে, তাই আমি তা বিক্রি ক'রে ফেলেছি।"

সবলার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—ভিটা, পিতৃ-পিতামহের ভিটা—

"তা আমি জানি; মনে ভেব না এতে আমার কষ্ট হয় নি একটুও, কিন্তু অনর্থক রেখে দরকার তো কিছুই নেই।"

সবলা একটু নীরব থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বেশ করেছ, কিন্তু আমায় কাশী যেতে দিতেও কি তোমার আপত্তি আছে?"

"কাশী? কার সঙ্গে যাবে সেখানে?"

সবলা বলিলেন "পাশের বাড়ীর সবাই যাচ্ছেন।"

মণীন্দ্রনাথ বলিলেন "আসল কথা তোমার—তুমি আমাদের কাছে আর থাক্‌তে রাজি নও। একবার দেশ, একবার কাশী, যাতে তাতে কেবল এখান থেকে পালাবার চেষ্টা। আমি অত টাকা পাব কোথায়, তোমাকে মাস মাস টাকা পাঠাব কোথা হ'তে? বাবা কিছু রেখে যান নি তা তো জানো? আর এ সব সম্পত্তি—সবই আমার শ্বশুরের, সুতরাং পরের জিনিষ নিয়ে—"

রুদ্ধকণ্ঠে মাতা বলিলেন, "না বাবা, আমি এঁদের একটা পয়সাও চাইনে। তুমি শুধু আমার অনুমতি দাও, মা হ'য়ে ছেলের কাছে অনুমতি চাচ্ছি, দাও আমায়, আমি চ'লে যাই। আমি ভিক্ষা করে সেখানে খাব, তোমরা একদিনও একটা কথা জানবে না। এই আমার জীবনে একটি ভিক্ষা তোমার কাছে, আর কখনও চাইনি, কখনও চাইব না।—আজ রাত্ত ভোরেই তাঁরা চলে যাবেন, মায়ের এই ভিক্ষাটী দাও।"

মণীন্দ্রনাথ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, সরলা আশান্বিত চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মণীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন "এখন তো তা হ'তে পারে না।"

মায়ের সকল আশা ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল; হাঁপাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন "কেন হ'তে পারে না?"

বিরক্ত হইয়া মণীন্দ্রনাথ বলিলেন "সব তাতেই তোমার জিজ্ঞাসা, আর তার উত্তর দিতে দিতে লোকের প্রাণান্ত হ'য়ে যায়। বললুম যাওয়া হ'তে পারে না, তবুও আবার জানতে চাও কেন যাওয়া হতে পারে না। খারাপ তোমার পুত্রবধূর আজ ক'দিন ধ'রে শরীর খারাপ যত যাচ্ছে, দেখছো মোটে উঠতে পারছে না, নড়তে পারছে না। এই রকম অবস্থায় ফেলে যে যাবার কথা মুখে আন্‌ছো তাই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। কোন আত্মীয়ে এরকম অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারে কি? আজকের ভোরে যদি তুমি যাও, বাধ্য হ'য়ে জোর ক'রে কা'ল তাকে উঠতেই হবে, শেষটায় মানুষটাকে মেরে না ফেলে তুমি ছাড়বে না। মনুষ্যত্ব যদি থাকতো তোমার—এ অবস্থায় ফেলে রেখে যাবার কথা মুখে আনতে পারতে না।"

সরলার মুখে আর একটিও কথা বাহির হইলনা। একবার নিস্তব্ধে পুত্রমুখ পানে চাহিয়া তিনি ছায়ার মতই ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

"ঠাকু মা—ও ঠাকু মা, ঘুমুচ্ছ নাকি?"

চুপি চুপি রবি ঠাকুরমাকে ডাকিতেছিল। গৃহের আলোটা নিভিয়া আসিয়াছে প্রদীপে আর তৈল ছিল না। সরলা অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতার ন্যায় মলিন শয্যাপরে পতিতা।

আজ তা' বহু পুরাতন কথা একে একে তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছে।

ওরে অকৃতজ্ঞ সন্তান, তোর কাছে কি তোর মায়ের দাবী করিবার মত কিছুই নাই? মনে কি পড়ে না যে—কে তোকে এত বড়টা করিয়াছে, কাহার বুকের রক্তে তুই জীবন ধারণ করিয়াছিস? ওরে কৃতঘ্ন—ওরে রাক্ষস—

ভগবান!—

সরলা চমকিয়া মুখে হাত চাপা দিলেন। না না, মা কখনও? ভগবানকে ডাকিতে পারিলেন না, পুত্র তাঁহাকে যদি পদাঘাত করিয়া যায় তাহাও সহ্য করিয়া যাইবেন, তথাপি একটী দীর্ঘশ্বাস যেন বুক ফাটিয়া না বাহির হয়। সে অভিশাপে আগুণ উঠিবে, সে দীর্ঘশ্বাসে প্রলয় তুফান তুলিবে। জ্ঞান হারা সন্তান বুঝিতে পারে না, মাও কি জ্ঞান হারাইবেন?

"ঠাকু মা—ও ঠাকু মা—"

রবি আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিতে লাগিল।

রাত তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, বাহিরে পরিপূর্ণ শান্তি। পৌত্রের কণ্ঠে বিস্মিত হইয়া সরলা উঠিয়া বসিলেন। গণ্ডের অশ্রুধারা মুছিয়া রবির পানে তাকাইয়া বলিলেন "তুই যে এত রাত্রে রবি?" রবি মুখে হাত দিল "চুপ, আস্তে।"

সরলা কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন "কেন?

রবি বলিল "আমি পালিয়ে এসেছি, বাবা, মা, দুজনেই ঘুমুচ্ছে, কেউ জানতে পারে নি। তুমি কাশী যাবে বলে বাবার কাছে গেছলে না?"

সরলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'হাঁ, গেছলুম।"

রবি বলিল "বাবা তোমায় যেতে দেবেন না।"

সরলা শুধু মাথা নাড়িলেন।

রবি বলিল বাবা বলছিলেন "তুমি গেলে আমাদের সংসারের কাজের অনেক অসুবিধা হবে। দেখ ঠাকু মা, এই জন্যই আমার বড্ড রাগ হয়। তুমি তো বাবার মা, তবু বাবা তোমায় একটু ভক্তি করেন না, আমি ও কেন আমার মাকে ভক্তি করব, ভালবাসব?"

সরলা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ও কথা বলতে নেই দাদা। তোমার বাবা করেন না বলে তুমিও করবে না এমন কি কথা হতে পারে? তোমার বাবা—"

বাধা দিয়া উষ্ণ কণ্ঠে রবি বলিল "তুমি আমায় বুঝিয়ো না ঠাকু মা, আমি ছোট্ট ছেলে নই, পনের বছর আমার বয়েস হয়েছে। স্কুলে আমাদের মাষ্টার যখন আমায় বলেন এ সব কথা, তখন লজ্জায় আমার মাথা একেবারে কাটা যায়। বাবা একটু ভাল ব্যবহার যদি করতেন, তোমার পরে মা যদি ভাল কথা বলতেন, তা হলে তো কেউ আমায় একটা কথাও বলতে পারত না।"

রবির দুই চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল। ব্যস্ত সরলা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "ও কি দাদা, কাঁদছিস?"

রবি রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "এ সব কথা আমি আর কখনও সইতে পারব না। তোমার যে অত বড় ব্যারামটা হল সে দিন কেউ একবার চোখ তুলেও দেখল না। কাকা বাবুও তো রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন আমি হাত ধরে টেনে আনলুম। নিজের মাকে যে ভক্তি করতে পারে না

তাকে আমি ভক্তি করব, ভালবাসব কি করে ?”

সরলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন “পাগলের মত কি বকছিস্ দাদু, বাপ মাকে ভক্তি করবি নে ভাল বাসবি নে—তবে —”

রবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল “কেমন করে ভালবাসব, ভক্তি করব ? দিনরাত চোখের সামনে দেখছি আমার বাপ মা তাঁর মাকে কত ভক্তি করছেন কত ভাল বাসছেন, তুমি যদি এখানে না থাক, বাপ মায়ের এ রকম ভাব যদি না দেখতে পাই, তবে আমি বাপ মাকে ভাল বাসতে, ভক্তি করতে পারব নচেৎ কিছু তই পারব না।”

সরলা নীরবে রহিলেন ; ভাবিয়া দেখিলেন কথাটা কতদূর সত্য।

তিনি বলিলেন “আমি কোথা যাব রবি ?”

রবি কাল বিলম্ব না করিয়া বলিল “কাশী যাবে বলছিলে সেখানে যাও।”

সরলা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “কিন্তু তোর বাবা ”

রবি রাগ করিয়া বলিল “আবার বাবার কথা বলছ ? তুমি বাবাকে ভালবাস, বাবার জন্যে কেঁদে মর, বাবা তোমার কথা একবার জিজ্ঞাসাও করেন না। বল যাবে তুমি কাশী ? তা হলে ওঠ, আমি ওদের বাড়ীতে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি।”

সরলা মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রবি উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল “তুমি যাবে না ঠাকু মা ? তোমায় ভালবাসি বলে বাবা মা আমায় দিনরাত গালাগালি করছেন, এক একদিন আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তা তো জানো ? তুমি এখানে যতদিন থাকবে আমি তোমার কাছে যাবই, যেখানে যা পাব তোমায় এনে দেবই, এমনি করলে বাবা মা আর আমায় ভালবাসবেন না,' একে বারে তাড়িয়ে দেবেন। তুমি তাই চাও ঠাকু মা ?”

“না দাদা” সকল বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া সরলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, “না দাদা আমি যাব ”

তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে, রবি তাঁহাকে লইয়া চুপি চুপি ডাক্তার বাবুর বাড়ী গেল। ডাক্তার বাবুর মাতা কাশী বাসিনী হইবেন জনম দুখিনী সরলাকে তিনিই লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন।

সরলা অশ্রু কোন মতে চাপিয়া বলিল “এইবার যা দাদা।”

রবি মাথা নাড়িয়া বলিল “তোমায় এইবার ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে তার পরে বাড়ী যাব।”

সরলা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন “সে যে ভোর বেলা, তখন বাড়ীতে ফিরে গেলে তোর বাপ মা সবাই জানতে পাবে তুই আমায় এনেছিস্। যা দাদা কেউ যেন তোকে দোষী না করতে পারে। তারা তা হ'লে ভাববে আমি একাই পালিয়ে এসেছি।”

রবি শক্ত হইয়া উত্তর দিল “বকবে এক-বার বই তো নয় ঠাকুমা, তা না হয় বকুনি খাব।”

ভোরের সময়কার ট্রেনে ঠাকুমাকে উঠাইয়া দিয়া সে অশ্রুসজলনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

ট্রেন যখন চলিতে লাগিল—সেই সময় পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া ঠাকুমার পাশে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, আপাতত খরচ বাহল ঠাকুমা—এখন দু'চার দিন যা হয় কোরো, তার পর ভিক্ষা করে খেয়ো, বাবার কাছে হ'তে এক পয়সাও চেয়ো না।”

ঠাকুরমায়ের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। পৌত্র যে শুধু তাঁহারই জন্ম পিতার বাক্স হইতে এই হাজার টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছে, এবং গাড়ী ছাড়িলে তবে ফেলিয়া দিয়াছে তাহা মনে করিয়া তিনি আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

পুত্রের এই টাকা চুরি করিয়া মাতাকে কাশী পাঠানোর ব্যাপার মণীন্দ্রনাথ ও উমা জানিতে পারিলেন। পুত্রকে শাস্তি দিতে পিতা সে দিন তাহাকে অনাহারে রাখিয়া একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, মাতা গোপনে জানালার পাশে খাবার ও জল দিয় তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিলেন। রাগটা যদিও তাঁহার খুব বেশী হইয়াছিল, কিন্তু দোষী যে তাঁহারই পুত্র, প্রধান দোষী পলাইয়াছে।

স্কুলের মাষ্টার রবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নাকি টাকা চুরি করে তোমার ঠাকুমাকে কাশী পাঠিয়েছ?"

রবি মাথা নাড়িয়া বলিল "না, আমার কি ক্ষমতা আছে? বাবাই তো হাজার টাকা দিয়ে মাকে কাশী পাঠালেন।"

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল নিষ্ঠুর মণীন্দ্রনাথেরও মাতৃভক্তি আছে। মা কি মুখের কথা? মণীন্দ্রনাথ বাহিরে নিষ্ঠুর আচরণ দেখাইলেও অন্তরে মাতৃভক্তি পোষণ করিতেন; মা বলিতেই মাকে কাশী পাঠাইলেন।

কথাগুলা কানে আসিয়া মণীন্দ্রনাথকে বিলক্ষণ দগ্ধ করিতে লাগিল, লোকের প্রশংসার চোটে কয়দিন তিনি মোটে বাহির হইতে পারেন নাই।

জীবন-সঙ্গীত

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

নাই ভয়, নাই নাই ভয়।
নবীন শ্যামল ধরা অনন্ত আনন্দ ভরা
হেথা জীবনের চিরজয়।
পূর্ণানন্দে উতরোল মরণে দিতেছে কোল
জীবন সে কোথা তার শেষ
সতেজ তরুণ প্রাণ গাহিছে বিজয় গান
জীর্ণ জরা করি' অবশেষ।
মরণ যা লয় হরি' জীবন তা দেয় ভরি'
চিরকাল একি কলরোল!
জন্ম-মৃত্যু পাশাপাশি আলোক-আঁধারে ভাসি'
দুলিতেছে মিলনের দোল।

মনে হয় সব শেষ আবার নূতন বেশ
নব লীলা নিবিড় সরস,
জীবনের পাত্র ভরি' উপছি পড়িছে ঝরি'
আনন্দের অমৃতের রস।
এত দুখ অন্ধকার বুকফাটা হাহাকার
এত ব্যথা সঙ্কট ভয়াল
তবু ত' এদের ছেপে ধরায় রয়েছে ঝোপে'
আনন্দের শুভ্র রশ্মিজাল
সুখহীন সেও হাসে দুখী সেও ভালবাসে
স্বার্থপর প্রাণ করে দান,
ব্যথিত সে ব্যথা ভুলে' আপন পরাণ খুলে
গাহে সেথা আনন্দের গান।
শোকার্ত ভুলিছে শোক সৃজিছে আনন্দ লোক
দিয়ে স্নেহ, দিয়ে ভালবাসা.
নিরাশার অন্ধকারে চলিযাছে অভিসারে
মানবের দুরন্ত দুরাশা
কোন অনন্তের পানে নিবিড় প্রেমের টানে
এ যাত্রার নাই নাই শেষ,
নিত্য-হৃদি-বৃন্দাবনে অন্তরের প্রিয়া সনে
মিলন-পুলক-রসাবেশ।
শতেক দুঃখের রাত্রি দারুণ বেদনা ধাত্রী
ডুবে যায় অতলের তলে,
নিমেষের হাসি গান লভে সে অনন্ত প্রাণ
অনির্ব্বাণ দীপ হ'য়ে জ্বলে।
আছে হেথা দুর্নিবার অবিচার অত্যাচার
আছে হেথা হিংসা দ্বেষ ভয়,
আছে হেথা মূর্ত্তিমান নিঠুর পাষাণ প্রাণ
অবিশ্বাস দারুণ সংশয়।
তবু কোথা হ'তে আসে জীবনের নিশাকাশে
ধ্রুবতারা আলোক উজ্জল,
সকল আঁধার ভেদি' সকল সংশয় ছেদি'
মানুষের আশার সম্বল?

জীবনের আঙিনাতে অনির্ব্বাণ দীপ হাতে
নেমে আসে সত্য প্রেম আশা,
আঁধার করিয়া লয় নাশিয়া সকল ভয়
প্রাণেতে জাগায় ভালবাসা।
অনাদি উষার সাথী আঁধার-মরণ-ঘাতী
জীবন চলেছে বাধাহীন,
নাহি দ্বিধা নাহি ভয় নাহি তার পরাজয়
নবীন তরুণ চিরদিন।

পাগলের ডায়েরী

২৩শে মার্চ্চ, দোল-পূর্ণিমা—

আজ দোল-পূর্ণিমা মাধবীরাতের আকুল করা জ্যোৎস্নভরা চাঁদ আজ সারারাত জেগে নিখিল ধরা পাহারা দেবে—আমি সেই পাহারাঘেরা ঘুমের রাজ্যে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে প'ড়বো—কত প্রিয়ের চুম্বনের শুভেচ্ছার স্বপ্ন আমাকে সারারাত আধঘুমন্ত আধজাগা রাখবে। দিনের আলোয় আমার যা অপ্রাপ্ত, রাতের জ্যোৎস্নায় আমি আজ তাই পাবো—শান্তি।

সারাদিনের উৎসবের ফাগ আমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সন্ধ্যায় আমি তা ধুয়ে ফেলেছি, কিন্তু তার সুরভির নেশা যে আমাকে পেয়ে বসেছে। সে আমার সারাগায়ে প্রিয়তমের আলিঙ্গনের মত জড়িয়ে থাকবে—সুখ !!

এত হাসিতেও আমার মন কই পাগল-করা মাতলামীর ঝোঁকে মেতে উঠেনি তো—হাসির সাথে হাসি হ'য়ে মিলিয়ে যাবার মত সারল্য সৌন্দর্য্য আন্তরিকতা ক্ষমতার আমার অভাব—তাই বুক বড় বাজে—বেদনা !!!

আমার সমস্ত দিনের, সমস্ত রাতের, 'হাসি কান্না চুণী পান্না' তোমার পায়ে নিবেদন করছি—ওগো আমার বৃন্দাবনের মোহন বংশীধারী ব্রজের রাখাল—তুমি তা' গ্রহণ ক'রে আমায় ধন্য কর—পুণ্য কর—তোমার পায়ের আরো কাছে আমাকে স্থান দাও—তোমায় প্রণাম, এই আমার—সার্থকতা।

২৪শে মার্চ্চ—

কাল রাতে যে আশা ক'রে শুইছিলাম—কতক্ষণ নিরাশ প্রতীক্ষার পর, একটু তন্দ্রা আসে আর জেগে ওঠার মধ্যে কত ব্যাকুল হিয়ার কাতরতা—সে বড় মধুর। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কি জানি। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি—কাছে এসে ডাকছেন। কেন ? এত দয়া কেন ? যার মধ্যে এতটুকু পাবার নেবার মত জিনিষের অবশিষ্ট নেই, তাকে

আবার কেন ?—দয়া ? তাই হবে। বুকে নিতে যেয়েতে' আর সেই ঠোঁট দু'খানা থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠেনা ? সেই অনেক দিনের পর 'পরশের ঝিলিক্‌মাখা একশো তড়িতের' দিন আর নেই- সেই অজ্ঞান অবশ হ'য়ে যাওয়া। আর কেন ? এ অক্ষমতা নিয়ে আমার এই নিদারুণ পরীক্ষা কেন ?

তবুওতো এতদিনের পর কাছে পেয়েছিলাম—তাই ভালো। এ বিচ্যুতি হ'তে আমাকে বেহাই দাও প্রভু। সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্ আমার তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

* * *

কিন্তু অতৃপ্তির জন্য দায়ী কে ? না—ওসব চুকতে দাও— আর ফিরতে চাহনে।

আজ এ সব কি মনে আস্‌ছে। গ'ড়ে ওটা জীবনের পথে কত বাধা, তা বেশ অনুভব কর্‌ছি। চেষ্টাও নেই কিন্তু আর সময়ও নেই—

"শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলো পড়্‌তেছে খসি
আর সময় নাহিরে
কবে তুমি আস্‌বে ব'লে রইবনা বসি'
আমি চল্‌বো বাহিরে"

বাতাস উঠেছে—এবার বাঁধন খুলে পাড়ি দিতে হবে। সাম্‌নের ঢেউসঙ্কুল গর্জ্জেওঠা সমুদ্রের পথে তুমি আমাকে রক্ষা ক'রো—তুমি আমার ছোট তরীখানার কাণ্ডারী—"আমার তরী নয়ক' বড়—পল্‌কা কাঁঠের নয়ক' দড়"—সেই তরী তুমি আমার রক্ষা করো—তোমার পদ্মফুলের মত চোখ দুটির নব-নীরদ স্নেহ শ্যামল দৃষ্টির বাইরে যেন কোন দিন না চ'লে যাই এই দেখো।

২৪শে চৈত্র,
৫ই এপ্রেল, মঙ্গলবার

ঘন-শ্রাবণ-মেঘের মত এই এক বুক কান্না কখন যে বরিষণ আরম্ভ ক'র্‌বে, কে জানে ? উঃ! কাল সে কি কান্না—বুকটা ফেটে ফেটে উথ্‌লে উঠতে লাগ্‌লো, বুকটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে থামাতে পার্‌লামনা—একেবারে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—প্রথম কান্নার কারণ ছিল নিজের ব্যথা—তারপর কখন যে আবেগ ভরা অভিমান তার স্থান এসে জুড়েছিল টেরই পায়নি। টের পেয়ে তাড়িয়ে দিলাম। তারপর একচোট মরণ ঘুম্, মধ্যরাত্রে একবার বাধা পেইছিল, না সে কথা আমার কেন ?

আমি চাইনে', কিছু চাইনে'—আমি যা দিইছি তার প্রতিদানের আকাঙ্খার তৃপ্তি ক'র্‌বে কে ? নিজেকে দু'হাতে বিলিয়ে দিইছি, দেহ-মন-প্রাণ। প্রতিদান পেইছিলাম কিন্তু সে ক'দিন ? তার পরও পেইছি কিন্তু সে পাওয়া, তাকে আমার কাছে পৌছুতে দেওয়াই ভুল হয়েছে, তা আমি খুব জানি।

কি জানি, মনকে কেন বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।

"যা হারিয়ে যায়, তা আগ্‌লে বসে'
রইব কত আর ?"

কিছুতেই মন শান্ত ক'র্‌তে পার্‌ছিনে ; এ আমার হয়েছে কি ? বেদন বেহাগ রাগিনী এই অকালেই আরম্ভ হ'লো ?

যেমন অকালে ফুট্‌লাম, তেম্‌নি ঝরে প'ড়্‌বো ? না, আমার জন্য এ জঘন্য জীবন নয়, আমি অতি-মানুষ। আমার প্রতিভা আছে চুপ্ করে' আমার বসে' থাকা সাজে না।

"ওরে তুই ওঠ্ আজি, আগুন লেগেছে কোথা
কার শঙ্খ উঠিয়া বাজি জাগাতে জগতজনে ?"

তার সাথে আমি আমার গলার সুরটি মিলিয়ে গেয়ে উঠ্‌বো—আমি এসেছি এসেছি, বুকে নিয়ে ব্যাকুল উৎসাহ, মনে নিয়ে উদার আকাঙ্খা, চোখে নিয়ে এইছি হাসিকান্নার জল, হৃদয়ে এনেছি কত ব্যর্থরাতের বেদন স্মৃতি ভরা দুরু দুরু আবেশ। তুমি আমার হাত ধরে' নিয়ে যাও ? এ হাতে তোমার "ধ্বজা বই
এমন সাধ্য কই ?"

আমাকে হাত ধ'রে' ধীরে ধীরে তোমার বিজন মন্দিরের পথের ছায়ায় ছায়ায় নিয়ে চল, আমি পথ জানিনে ; আমার পথে যে আলো নেই তার ভিতর বাহির কালোর কালো !

আমার হাত কাঁপ্‌ছে, কিন্তু তাও ব্যাকুল বলে তোমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছি—

তুমি এস, এস এস। ওগো আমার সকল চাওয়া সকল পাওয়া এস—এস, আমার দুর্ব্বল হাতে তোমার হাত দাও—

তোমার হাত ধরে' আমি চলি,
"চলিগো চলিগো যাইগো চলি
পথের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলি গগন তলে"

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর—তুমি আমার পথের দু' ধারের ফুল ফুটিয়ে আপন হাতে আমাকে তোমার সাথী কর।

আমি প্রতীক্ষায় আছি—

আর পারিনে'—আমি বড় দুর্ব্বল, বড় অবসন্ন, চোখ দুটি জলে ভরে গেছে, তাতে আর সামনের পথ দেখ্‌তে পাইনে'—পা থর্ থর্ করে কাঁপে, হাত শিথিল হয়ে পড়ছে, সম্বল আমার তোমার করুণা, তাও কি খোয়াবো ?

"এস গো এস সকল চাওয়া
সকল পাওয়া ঘুচাইয়ে
ব্যথায় ভরা নয়ন জল
আপন হাতে মুছাইয়ে—"

২৬শে চৈত্র ২৭। ৭ই এপ্রেল ২১

এই যে মিলনাশায় দুরু দুরু বুক, এর দুর্ভোগ আরও কতদিন পোহাতে হবে—? নাঃ, এ কিছুতেই চল্‌বে না, আমা'র এসব দুর্ব্বলতার হাত হতে রক্ষা পেতেই হবে।

এই কুড়েমী করে কাটানো মাসখানেক্কের অভিজ্ঞতা জীবনে অনেক কাজে লাগ্‌বে। এই ছন্দে, গানে কুড়েমী এর একটা আলাদা মূল্য আছে যা সাধারণে বুঝবে না। সব জমা পড়্‌বে পাথেয় হিসাবে জীবনের খাতায়—এ সব তোলা রইল। কোনও দিন দরকার হলে' বের হবে। কিন্তু এ যেন একটা অভ্যাসে না দাঁড়ায়।

আজ সন্ধ্যাতে এইটি লিখলাম।

মৌনময়ী এই সাঁঝেতে
ব্যথার পরিমল
আপন হাতে ফুটিয়ে দিলে
রৌদ্র ঝলমল।

রক্তরাঙা পাপ্‌ড়ি গুলি
তারেই আমি হাতে তুলি
নিবেদিলাম তোমার পায়ে
বেদন-শতদল।

তুমি তারে নিয়ো যতন করি
মিষ্টি মুখে চুমোয় দিয়ো ভরি,
অমৃত ফুল উঠ্‌বে ফুটি
আমার ব্যথা দৈন্য লুটি,
তোমার গোপন আদর ছায়ে
মুগ্ধ ঢল ঢল !

যাই ঘুমুতে যাই—

তুমি আমার নিদ্রালস নয়নে নয়নে থেকো, ওগো আমার 'সব-সুখ-দুখ মন্থন ধন—'

তোমাকে প্রণাম করি

২৮শে চৈত্র
৯ই এপ্রিল

আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি কোন অতল সমুদ্রে! দু'হাত হাৎড়ে কেবলি হাঁসফাঁস ক'র্‌ছি। এই অথৈ পাবাবার তো কই কূলের সন্ধান দেয় না।

এ একটা দুর্দ্দান্ত পরিহাস, সহ্য করা দায়। মন যা চায়, তার বিপরীত টুকুন কি ঠিক বাইরে ক'রবো? না, আমার আর এই ছ'লো অভিমানের পালা একটুও ভাল লাগে না। এর শেষ হোক।

সে দিনের সেই রাত্রে অপরাধীর মত কাছে যেয়ে বসা—আমার ছটো কথায় সে কি প্রচণ্ড রাগ, এই এই টুকুই প্রভেদ হয়েছে। আগে দেখিছি, হাজারেও আমার উপর এক টুকু রাগ হ'তো না, এখন পানটী হ'তে চুণ খস্‌লে আর রক্ষা নাই। সেই আগেকার মনকষাকষির কারণে ঐ হঠাৎ রেগে যাওয়া। কিছু না, আমি কেন সইব ওসব? আমি কারুর কাছে ছোটো হতে' পার্‌বো না—কারুর চোখ রাঙ্গানো সইব কেন? আমি কি কাউকে অকারণে দোষী করি? কই? কেউ বলুক্ দিকিন্ সে ছাড়া। আর সে এটাই ভুল বুঝবে। ভালো, কৈফিয়ৎ আমি দেবো না।" আমার যে কোথায় কাঁটা, সেটা তো তোমার হাতে বাধলো না। যদি কোন দিন শেষ ক'রে, তারপরে আচম্‌কা মনে পড়ে' যায়, সেই দিন তোমার উপর অলক্ষ্য দৃষ্টি রেখে আমি হাস্‌বো। হাঁা, আমি পড়ে' যেয়ে ব্যথা পেলাম, তার দিকে একটুকু নজর গেলনা? নিজের উপর অত্যাচার করলে—তার পর বেদনা। কই, হাজারবার কাছে যাবো না কাছে যাবো না মনে করেও রইতে পারলাম কই? * * * * * আমি তাই ভাবি যে কি করে' এ সব হয়।

চৈত্র সংক্রান্তি
১৩২৭

আজ বছরের শেষ সন্ধ্যা। আকাশজুড়ে মেঘ লেগে খানিকটা বাদ্‌লা হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে, ভাবছি, নোতুন বছরে জীবন কি রকম ভাবে আরম্ভ করবো। আকাশ ভরা একটা গুমোট—ছাই রঙ্ কেবলি মনটাকে কাবু ক'রে ফেলছে। একটা তারাও নেই—। আজ সকালে যখন গঙ্গায় নাই'তে গেলাম—তখন বাস্তবিকই বড় তৃপ্তির সাথে গিইছিলাম। কতদিন পরে এই অবগাহন স্নান—বড়'তৃপ্তিপ্রদ। স্নিগ্ধ শান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম।

আজ সত্যাগ্রহ সপ্তাহের শেষ দিন। সারা বেলা উপোষ করে কাটালাম—। যাক্!

পুরাতনকে আজ বিদায় দিলাম—তুমি আমাকে যা দিয়েছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, তোমাকে প্রণাম! যা নিয়েছো, তার জন্যও তোমাকে দোষী করবো না।

নূতনকে আজ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব কর্‌বো। এস ওগো চির নবীন—তোমার শ্যামায়মান বনবীথিকার আড়াল হতে' এসে, সজল কাজল আঁখি দুটি মেলে আমার

দিকে একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে চাও,—আমি তোমার অনুরাগী—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে এস গানে —

৩রা বৈশাখ। ২৮

আমি দেখিছি যখুনি আমি আমার জীবনকে একটা নিয়মের ধারায় চালাবার চেষ্টা করিছি তখুনি কতক গুলো এম্‌নি বাধা এসে আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে, যে সেগুলো আমার মনে হয়, আমার হাজার চেষ্টাতেও বাধা দিতে আমি অক্ষম। এত বিমুখ ভগবান আমার উপর? পয়লা বৈশাখের অশুভ সন্ধ্যাতে যে ঘটনাটি ঘটে গেল, তাতো আমার ইচ্ছাকৃত এতটুকুনও নয়—যেন ওটা ঘটবে তাই ঘটলো। আমার ক্ষীণ মন হ'তে বাধা দিতে যে চেষ্টা করেছিলাম, তা সফল হলো না। না, আমি আর পারিনে'—এই বদ্‌ বিশ্রী মেজাজ নিয়ে কেন আমার জগতে আসা? আর কতদিন আমাকে এ দুর্ব্বহ ভার বইতে হবে? এক একবার মনে করি একেবারে শেষ করে দিই। কিন্তু সেটুকু করবার মতও মনের জোরের অভাব। গঙ্গাস্নানে সেই প্রার্থনা, যে—আজ হতে আমি সবার উপর সব দাবী দাওয়া ছেড়ে দিলাম—তখন তো মনে হইছিল যে সেটা অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হতে' এসেছিল, এখন দেখছি সেটা একবারে মৌখিক তার সাথে অন্তরের বাণীর এতটুকু মিল ছিল না। ক্ষ্যাপা পাগল, অভিমানী, দুষ্টু মন, তোর জ্বালায় আমি আর প্যারিনে, আমাকে তুই ক্ষমা কর্‌। আমি বুকের রক্তে তোর পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছি, তুই আমাকে মার্জ্জনা কর।

না, এই তিন বছরের আশা জীবন এ হতে' আমাকে বাঁচতেই হবে। সব সময়ে, সব তাতে পরমুখাপেক্ষী হয়ে কি করে চলে? আর যে জন্য সে জীবনের দরকার, তারতো আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কোন প্রয়োজন নেই। তবুও মনের ভিখিরীটার খেয়াল নেই সে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে উঠবে। কেন? যা হয়নি, তা হবে না। অসম্ভব! হাজার করলেও আমার পুরুষের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতাটাকে আমি জঞ্জাল মনে করতে পারিনে'। আর আমি যা চেইছি, তাই বা পেইছি কবে? এতটুকু স্নেহ, আদরের এক কণা, তাতে কি আমার মনের তৃষ্ণা মেটে? হাঁ, যা পেইছি, তা কেউ কোনো দিন দেয়নি' দেবে না তবুও তাতো আমি চাইনি'। না, অবাস্তব। কেন আবার লিখতে লিখতে বুকটা ভরে' আসে। এ সব স্বপ্ন আমাকে ভুলতেই হবে।

কাল সন্ধ্যায় মনে হচ্ছিল, পা জড়িয়ে ক্ষমা চাই কিন্তু হাসি পায়, তার কি দরকার। সেতো চায় আমি তাকে সাধারণ মানুষের মত দেখি—সাধারণ মানুষের মত দাবী দাওয়া সব তার সহ্য করে চলি। তাকে কেন তার বেশী দেবো? কি করে এটা মিটে যায়? আমি জানি, এবার ওদিক হতে তাগিদ আসবে না। আমায়—না সে আমি পারবোনা।

আমাকে দূরে চলে যেতে হবে। আমি যাবো। তারপর যা হয়, তাই হবে।

আমার স্বভাব, আমার প্রকৃতি, তার সাথে মেনে চলা কারুরই পোষাবেনা। আমার দিক্‌ হতে তার চেষ্টাও নেই করবোও না। কেন? আমার কিসের অভাব?

একটা লোকের জন্য আমার সারাজীবনের বসন্ত বিফল হবে? সাহানার বাঁশী আর বাজবে না—চাঁপা রজনীগন্ধা আর ফুটবে না? তাও কখনও হয়? বেশতো, অতিথি এসেছিল, আমি তাকে স্থান দিইছিলাম? তার ভাল লাগে নি সে ফিরে যাবে। তাতে আমার কি?

সেও তো তাই বলে। কিন্তু তার বলায় প্রাণ নেই। আমি তাকে বুঝেছি, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে পারবো না। থাক।

আমার নব বৈশাখীর অরুণ বরণ নীল নীরদ নটবরকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো না। সে এসেছে তার সবুজ রঙের ওড়নাকে উড়িয়ে, মাথার মধবরণ চুলের রাশের গোছা ভাসিয়ে, গায়ে তার বকুলের সুবাস, হাতে তার নবপমাং। তাকে আমি ফেরাবোনা। ফেরাতে যে পারি না।

এসগো লক্ষ্মীমণি

চরণেতে তব বাজুক নূপুর নিতি রিণিকি ঝিনি

ঘুরে ঘুরে এস কদলীর পাশ

সঙ্গেতে আন সেফালীর বাস

মালা গেঁথে মোর গলে দাও ওগো রাণী

কহিয়া কাঁদয়া সোহাগের কথা,

আদরের শত মোহন মুরলী বাণী।

আকর্ষণ

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

আসে না কি চির উজ্জ্বল

দুখবিহীন পুণ্যালয়,

মোর চোখে ধরা বড় সুন্দর,

স্বরগ হতেও সে মধুময়।

তুহিন শীতল ও হিমগিরির

স্বপন ত আমি কভু না চাই

দুঃখ দহনে নাহি ক্ষোভ মোর—

তবু যেন লভি ধরাতে ঠাঁই।

কে বলে ধরণী কঠিন কঠোর,

স্বর্গসুখের প্রস্রবন ;

সবুজ-শোভন মোর এ ভুবন,

হেরিলে বারেক জুড়ায় মন।

হুরীর নৃত্যে নাহি অনুরাগ,
চাহিনা মাতিতে দেবতা নিয়ে ;
ধন্য মানিব মানব-সভায়
আপনারে আমি বিলিয়ে দিয়ে।

সুদূরের সাথে করি না মিতালী,
মানব আমার নিকট-জন ;
বন্ধুর মত রেখেছে জড়ায়ে
সুখে দুখে মোরে অনুক্ষণ।
সুললিত দেব গীতি ঝঙ্কারে
মুখরিত থাক্ অমরাবতী
মোর কাছে প্রিয়-কণ্ঠের সুর
সকলের-চেয়ে মধুর অতি

অক্ষয় ধ্রুব অজর স্বর্গ,
ছলনায় ভরা বসুধা নারি ,—
তাই যে সোহাগে বুকে রাখি সবে
কে জানে কখন দিবে সে ফাঁকি
ইন্দ্রপুরী সে অচেনা আমার
সাধনার দেবী পৃথ্বী মোর
এরি স্নেহ-রসে আপনা হারায়ে
এ জীবন আমি করিব ভোর।

জননীর মত সে পালিল মোরে
তারে ছাড়া কিছু জানি না আর,—
মোর মুখে তুলি সুধা-স্তনটিরে—
হাসিয়া সে নিল গরলভার।
উজাড়িয়া তার ভাণ্ডার সব
দিয়েছে সে মোরে পূর্ণ ক'রে,
সাজায়ে আমারে রতন-ভূষণে—
ভিখারীর সাজ নিজে সে পরে।

কত দুর্য্যোগ গহন নিশায়
আবরি' রেখেছে মরমপুটে,
তার করুণার নাহি পারাপার—
শীতলিয়া মোরে শতধা ছুটে।
এ কি শুধু মোর অলীক স্বপন,
অলস অসার ঘুমের ঘোর
তাই যদি হয়—ভেঙো না এ ঘুম,
এ সুখ স্বপন করো না ভোর।

কর্ম্মতত্ত্ব

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড

ভোক্তা ফল পরিজ্ঞাতা

ভোক্তৃত্ব কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ম্মের মূল বাসনা, বাসনা জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। বাসনার প্রেরণায় জীবের চেষ্টা। কর্তৃত্বের মূল ভোক্তৃত্ব, আমার ভোগ না হইলে আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইনা। ভোগ্য বস্তুর প্রতি আমার স্পৃহা আছে। ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই সকল চেষ্টা, ঈপ্সিত বস্তুর জন্যই, ভোগ্য বস্তুর আস্বাদনের জন্যই, অভাব বোধের জন্যই সকল প্রচেষ্টা। যাহার ঈপ্সিত বস্তু কিছুই নাই তাহার চেষ্টাও নাই। তামসিক ব্যক্তিও সুখ চায়। সুখের বাসনা তাহার আছে। কর্ম্মের অধিষ্ঠান বাসনাময় দেহ বা চিত্ত। আশয় প্রবৃত্তির মূল, বাসনা গুলি কর্ম্মের আশ্রয়, আশয়ের স্ফুরণে আশ্রয়ের স্পন্দনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই বাসনার বশে কর্ম্ম করিতেছে। জ্ঞানীর বাসনাও নাই কর্ম্মও নাই। কিন্তু অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না। জ্ঞানীর অধিষ্ঠান নাই, কর্ম্মও নাই। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখই বাসনাময় শরীর। ইহাই চিত্ত, চিত্তের ধর্ম্ম ভোগ। ভালবাসা চিত্তের ধর্ম্ম, ভালবাসা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না। যতক্ষণ কর্ম্ম আছে ততক্ষণ ভালবাসা আছে। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Emotion বা Natural impulse বলে তাহা অনেকটা পরিমাণে আমাদের চিত্ত। এই স্বাভাবিক বাসনা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে—"কর্ম্মের অধিষ্ঠান' প্রবন্ধে বিচার

করিব। এই আলোচনায় পাইলাম বাসনা ব্যতিরেকে কর্ম্ম অসম্ভব। সেই বাসনার বস্তু কি? সুখই হউক, আনন্দই হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। আমার সহিত সম্বন্ধ নাই এ বস্তু গ্রহণ করিতে বা ত্যাগ করিতে কখনও চেষ্টা হইতে পারে না। সম্বন্ধের অর্থই ত্যাগ বা গ্রহণ। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ বা গ্রহণাত্মক, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ চিত্তের বৃত্তি, সুখ ও সুখের সাধনে স্পৃহাই ইচ্ছা। ইহাই কাম বা রাগ। যে জাতীয় জিনিষ দুঃখের হেতুভূত বলিয়া জানাতে পুনরায় তজ্জাতীয় বস্তু পাইলে বিরক্তি হয় সেই বিরক্তিই দ্বেষ। বুদ্ধি সকলের মূলে বলিয়া ইচ্ছা দ্বেষে ও বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। উপলব্ধি বুদ্ধির ধর্ম্ম। অনুকূল, প্রসন্ন, সত্বাত্মক বস্তুই সুখ। প্রতিকূলাত্মক বস্তুই দুঃখ। সুখ দুঃখের নির্ণয় বুদ্ধি করিতেছে, কিন্তু অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ইহাদের আশ্রয়। বুদ্ধি করণ (instrument) বুদ্ধি দ্বারাই অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি বা চিত্তের পরিমার্জ্জনা হয়। ভালবাসা বা ভক্তির ক্ষেত্র চিত্ত। কিন্তু বুদ্ধির অনুপ্রবেশে চিত্ত-ক্ষেত্র পরিস্কৃত হইলেই তাহা ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহরূপে পরিণত হয়। আত্মবোধ সকলের মূলে, কিন্তু বাহিরের বিচারে উহাদের পৃথক স্থান নির্দ্দেশ আবশ্যক। কর্ম্মের হেতু চিত, বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয় কর্ত্তা. প্রাণের চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় শক্তির শক্তিমত্ব। চিত্ত ভূমিতে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের সহযোগে কর্ত্তার অভিমানে প্রাণের চেষ্টায় ইন্দ্রিয় শক্তির শক্তিমত্তার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। চিত্ত কর্ম্মের ভূমি বা ক্ষেত্র। বুদ্ধি তাহার লাঙ্গল। বুদ্ধিদ্বারা চিত্তভূমি কর্ষিত হয়। সাংখ্য ও পাতাঞ্জল দর্শন বুদ্ধিকেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মূল বলিয়াছে। বাস্তবিকই উহা সমীচীন নহে। পাতাঞ্জলে সুখকে বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। "সুখানুসারী রাগঃ" সুখের স্পৃহা রাগ, ইহা ক্লেশ। ক্লেশ হেতু কর্ম্মাশয়ের বৃদ্ধি হয়, পাঁচটী ক্লেশের মধ্যে রাগ বা কাম অবস্থিত হওয়ায় ভালবাসা, ভক্তি প্রভৃতি কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না। কিন্তু ভালবাসা বা ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানও অসম্ভব। বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেই আমরা যে বস্তু গ্রহণ করি না কেন তৎপ্রতি আন্তরিকতা অর্থাৎ টান বা ভালবাসা না থাকিলে কখনই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ভালবাসা স্বাভাবিক উন্মেষ। (sponteneous) উহা স্বাভাবিক বলিয়াই উহাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই স্থলে বিশেষ ভুল করিয়াছেন। তাঁহার মতে "Love is tyrany" ভালবাসা বা প্রেম অত্যাচার। জার্ম্মাণ দার্শনিক Kant ও বুদ্ধির দিকে জোর দিতে গিয়া বলিয়াছেন "Love is no duty" ভালবাসা কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাণ্টের ভালবাসাকে কর্ত্তব্য না বলার অন্য কারণ ইচ্ছা মত ভালবাসা যায় না, ইচ্ছা করিলেই বাড়ান কমান যায় না। আমাদের মনে হয় অনুশীলনে ভালবাসার বৃদ্ধি পাইতে পারে, অবশ্য ইচ্ছাগত বাড়ান কমান যায় না। এই জন্যই তিনি "An erring conscience is a Chimera" এই একদেশদর্শী ভাব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। ভালবাসা অপরিমার্জ্জিত হইলেই দোষের। বুদ্ধিরূপ কারণের সাহায্যে তাহা পরিস্কৃত না হইলেই ভালবাসা অত্যাচার এবং অকর্ত্তব্য, কিন্তু সেই জন্য ভালবাসাকে বিশ্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে না, কারণ ভালবাসা জীবের স্বভাব, চিত্ত শূন্য জীব হইতে পারে না, বুদ্ধিও যেমন জীবের ধর্ম্ম চিত্তও তেমনি জীবের। ভগবান গীতায় তাহাই

বলিয়াছেন "ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা, ১৩।৬। ইচ্ছা, দ্বেষ সুখ দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংঘাত। চেতনা বোধও ধারণা ইহাই সংক্ষেপে ক্ষেত্র, ইহাই বিকার যুক্ত। শ্রুতিতেও দেখিতে পাই "কাম সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহ শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ভী র্ভী রিত্যে তৎসর্ব্বং মন এব" কাম, সংকল্প, সংশয় শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি ভয় সকলই মন। এই স্থলে মন শব্দটী অন্তঃকরণ বাচী, ইহাতে মন বুদ্ধি চিত্ত সকলই অন্তঃপ্রবিষ্ট। অতএব কাম বা ভালবাসা বা রাগ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ইহাকে বাদ দিতে গেলে মানুষ অসার জড়যন্ত্রের মত হইয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকে "intellectual machine বলা যাইতে পারে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "মোক্ষকারণ সমেস্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা স্বাভাবিক কেবল বুদ্ধির বিচারে তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। জঘন্য ইন্দ্রিয় সুখও ব্রহ্মানন্দের অংশ। মোটামুটী এখানে আভাস দিলাম, বিশেষ বিচার স্থানান্তরে করিব। চিত্ত কর্ম্ম ভূমি, ভগবান গীতায় বলিলেন "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্" ইত্যাদি কর্ম্মের হেতু। অধিষ্ঠান শব্দে "ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখাদির অভিব্যক্তির আশ্রয়ীভূত শরীরকে বুঝায়, ইহাকেই আমরা চিত্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছি। ইহারই নাম অনুসাধনাত্মিকা বৃত্তি। কাম থাকিলেই তাহার লক্ষ্য বস্তু থাকিবে। ইচ্ছার বিষয় সুখ, দ্বেষের বিষয় দুঃখ, ঈপ্সিত তমই কর্ম্ম। কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম তাহাই কর্ম্ম। পানিনি বলিতেছেন "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" ঈপ্সিততম বস্তুই ভোগের উপাদান, ভোগের ভোক্তা অবশ্যই আছে ভোগ্যবস্তুর ভোগ ভোক্তাই করে। অতএব ভোক্তৃত্ব বোধেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, অন্তরে সেই কাব্যের নক্সা গড়িয়া ভোগ করেন, ভোগের অভিব্যক্তিই কর্ম্ম রূপে প্রকট, কবি ভিতরে ভোগ করিয়া মানস দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া নিজের ভোগ্য বস্তুই কর্ত্তৃত্বাভিমানে বাহিরে প্রকাশ করেন। শিশুর কর্ত্তৃত্ববোধের পূর্ব্বেই ভোক্তৃত্ব বোধ প্রকট। শিশু করিতে পারে না কিন্তু ভোগ করে। মনোহর চিত্র উপভোগ করিয়াই চিত্রকর চিত্র আঁকিতে বসে। তুলি দিয়া রং ফলাইবার পূর্ব্বে মানসী প্রতিমাকে ভোগ করিয়া উচ্ছিষ্ট করে। কর্ত্তৃত্ব অভিমানের ভোক্তৃত্বাভিমানে সকল চিত্র চিত্রিত। গায়ক প্রাণের সুরে সঙ্গীত নিজের অন্তরে ভোগ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে পরকে বিলাইয়া দেয়। গায়ক তাহার প্রাণের সুর আপনিই ভোগ করে, আপনার সুরে আপনি তন্ময় হইয়া গান করিতেই তাহার সুখ। সেই আপনার সুরে গান করাতেই পরের প্রাণেও ঝঙ্কার দেয়। মুসলমান বাদসাহ আকবর তানসেনকে একদিন সভায় গান করিতে বলায় তানসেন গান ধরিল, সে দিন আকবরের ভাল লাগিল না, আকবর প্রশ্ন করিলেন "তানসেন, তুমি সে দিন যমুনা বক্ষে গান গাহিয়াছিলে তাহা এত মধুর লাগিল আজ এমন কেন?" তানসেন উত্তর করিলেন "সে দিন জগদীশ্বরের নিকট গাহিয়াছিলাম আর আজ দিল্লীশ্বরের নিকট গাহিতেছি, অর্থাৎ সে দিন আপনার সুরে আপনি গাহিয়াছিলাম বলিয়া এত মধুর হইয়াছিল।" আপনার সুর আপনি ভোগ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, তাহাতে নিজের প্রাণ পূর্ণ হয় পরের প্রাণেও ঝঙ্কার দেয়। সমাজের ও নিজের মঙ্গল এক হইয়া

যায়। ভাস্কর পাথরে মূর্ত্তি খোদিত করিবার পূর্ব্বে মানসী প্রতিমা ভোগ করে। যে যেরূপ ভাবে অর্থাৎ যত আন্তরিকতার সহিত ভোগ করিতে পারে তত সে সুন্দর গড়িতে পারে। আন্তরিকতার যত বিশুদ্ধি মানসী প্রতিমাও তত বিশুদ্ধি লাভ করে, বাহিরের প্রতিমাও বিশুদ্ধ হয়। ভাস্কর তাহার ভালবাসা দিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির কমনীয়তা, স্নিগ্ধত্ব, লাবণ্য, মনোহারিত্ব সম্পাদন করে, বুদ্ধি দিয়া উহার উপরে মার্জ্জিত ভাব আনয়ন করে আন্তরিকতাই ভাস্কর্য্যের প্রাণ। বুদ্ধিতে উহা অনাবিল ও স্বচ্ছ হয়। ভোগের উপাদানে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

স্থপতি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অন্তর দর্পণে তাহার আদর্শ প্রতিফলিত করে, নিজের চিত্তভূমিতে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। বুদ্ধি দিয়া উহার প্রত্যেক অংশ মার্জ্জিত করিয়া ভোগের উপাদানে গড়িয়া তোলে। দক্ষিণ ভারতের মদুরার মন্দির তৈয়ারী করিতে স্থপতিকে অন্তঃস্থলে মন্দিরের আদর্শকে স্থাপন করিতে হইয়াছিল, চিত্তভূমিতে ভোগ করিয়া উহার অভিব্যক্তি বাহিরে মন্দিররূপে পর্য্যবসিত, তাই সে মন্দির এখনও দর্শকের প্রাণ হরণ করে। অনেক সময় আমরা কর্তৃত্বাভিমান না থাকিলেও ভোক্তা। যখন কোনও মনোরম দৃশ্য সম্মুখে প্রসারিত, তখন কোনও কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও হৃদয়ের ভাবে অর্থাৎ চিত্তের ভাবে আমরা দৃশ্যটি উপভোগ করি, তন্ময়ত্বে কর্ত্তৃত্বের অভাব, কিন্তু ভোক্তৃত্ব সামান্য ভাবে আছে, ভোক্তৃত্ব হইতে তন্ময়ত্বের উদ্ভব। কোনও বস্তু ভোগ করিতে করিতে তাহাতে আমরা তন্ময় হইয়া যাই, ভোগে আরম্ভ জ্ঞানে সমাপ্তি, জ্ঞানে পরিপূর্ণ তন্ময়ত্ব ভোগে তন্ময়ত্বের প্রথম বিকাশ। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য তিনটি বস্তুই ভোগের বা ভালবাসার, ইহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই কিন্তু ভোক্তৃত্ব আছে। ইংরাজীতে যে contemplating the sublime and the beautiful বস্তুর উল্লেখ তাহাতে ভোক্তৃত্ব আছে তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই উহা আভিজাত্যের জন্য উদ্ভূত নহে উহা স্বতঃ' উহা স্বাভাবিক উন্মেষ উহা উপাসনার বস্তু। উপাসনাও কর্ম্ম। উপাসনার ভাবের আবেশে আমরা কর্ম্মে চেষ্টিত হই। অনন্ত আকাশ, অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ নীরব পর্ব্বত, দিগন্ত বিস্তৃত অচল সমুদ্র ভোগের বস্তু এই সকল ভাবরাজ্যের বিষয়, ভাবকতার সামগ্রী, এই ভাবকতায় ডুবিয়া থাকে বলিয়াই জ্ঞানী ইহাকে নিরসন করিতে যান, ভাবুকতা নিরসন করিতে যাইয়া ভাবকেও নিরসন করিয়া বসেন। কপিল, পতঞ্জলি, প্লেটো ও ক্যাণ্ট সকলেই এই দোষে দুষ্ট। আবার অন্য পক্ষে বৈষ্ণবগণ, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও অল্লাধিক পরিমাণে ভাবুকতার প্রতিমূর্ত্তি ভোগের দিকে জোর দিতে গিয়া ইউরোপে Epicurian Cyrenaics ভারতে চার্ব্বাক পন্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইউরোপে Cynics ও Stoics বাসনাকে দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু মলিনা বাসনাই ত্যাগ করিতে হইবে শুদ্ধ বা শুভ্র বাসনা অবশ্যই প্রথমে ত্যাজ্য নহে, পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় বাসনা আপনা হইতেই খসিয়া যাইবে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবার কোনও আবশ্যকতাই থাকিবে না। জোর করিয়া চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী, হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করা সাধনের তাৎপর্য্য নহে। ভারতে বেদান্ত ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিয়াছে, ইউরোপে Spinoza এবং Hegel দার্শনিকদ্বয় ইহার কতকটা সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। এই সকল বিষয় যথাস্থানে দেখাইব। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে পাইলাম ভোক্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বের মূল। কর্ম্মী সুখের জন্য কর্ম্ম করে, দুঃখের কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সুখের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, ভোক্তা ভোগ্য সম্পর্কই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাহাতে দুঃখ হয় তাহা করিতে রাজি হই না, যাহাতে সুখ হয় তাহাই করিতে ব্যস্ত হই, ভোক্তৃত্বের দোষ অনেক, ভোক্তা ভোগে লিপ্ত হইলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়। "খাও দাও আর মজা লুট" এই মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও তাহার নিজের পক্ষে সয়তান। কেবল সুখের জন্য আছি, সুখই পরম পুরুষার্থ এই সংস্কার মানুষ হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকল বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু ভোগে তাহার তৃপ্তি হয় না। নিত্য নূতন ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়, কার্য্য করিতে হইলে ফল আগে চায় তাই প্রকৃত কর্ম্ম ভুলিয়া যায়, কেবল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বেগে আপনাকে ও সমাজকে কলুষিত করে। ভোগীর আরও এক দোষ আলস্য, ভাবুকতায়ও এই দোষটী পরিপুষ্ট। যাহারা ভাবুকতায় ব্যাকুল, তাহারা কর্ম্মী হইতে পারে না, যাহারা প্রাকৃতিক সুন্দর দৃশ্যে আপনাদিগকে বিলাইয়া দেয়, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মজীবন অসম্ভব, যে চিত্রকর কেবল ভাবুক সে কখনও একখানা চিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না, যে কবি আপনার কবিতার রসাস্বাদনে ব্যগ্র তাহার কবিতায় কর্ম্মশক্তি থাকে না নিজের রসে ভরপুর থাকিলে বাহিরের দিকে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে না, তাহা নিজের প্রাণে ভাবের পর্ব্বত সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ভাবের সমুদ্র সৃষ্টি করে না, কথার তাৎপর্য্য এই, পর্ব্বতের মত ধ্যানমগ্ন হইতে পারে কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা আনিতে পারে না। কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার বাড়াবাড়ি হওয়ায় নাটক ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাঁহার নাটকের ভাবুকতায় তিনি নিজে ধ্যানমগ্ন, তিনি তাঁহার নাটকে তন্ময় তাই ভাবুকতার আতিশয্যে কর্ম্মবিমুখ নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু মাইকেল মধুসূদন একটু বাহ্যমুখীন ভাবে লিখায় তাঁহার নাটক কর্ম্মের হিসাবে সজীব। মধুসূদনের মন্ত্র "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক, অতিরিক্ত ভাবুকতায় তাঁহার মন্ত্র "তোমরা কেউ পারবে নাগো পারবে না ফুল ফুটাতে * * যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে", "দিলেন যা রাজভিখারীরে, স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে, তখন কাঁদি চোখের জলে, দুটি নয়ন ভরে, তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে", ভাবুকতায় ভ বের আতিশয্যে ভোগের আকাঙ্খায় লোক কর্ম্মবিমুখ হয়। কবি নিজের ভাবে বিভোর হইলে কর্ম্মজীবনের অনুকূল বস্তু দিতে পারে না, চিত্রকর নিজের ভাবুকতায় মত্ত হইলে, চিত্রের ভোগে নিজে অত্যন্ত আসক্ত হইলে ফলের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইলে, সে চিত্র আঁকিয়া উঠিতে পারে না। দাম্পত্য প্রণয়ে অতিরিক্ত ভোগাসক্তিতে সংসার নষ্ট হইয়া যায়, কর্ত্তব্য বিপর্য্যস্ত হয়, স্বাভাবিক অন্যান্য ভাবেরও স্ফুরণ হয় না, মানুষ আর পশুতে বিশেষ তারতম্য থাকে না। ছাত্রজীবনে ভোগে আসক্ত হইলে, ভাবুকতার ঘোরে প্রমত্ত হইলে কর্ত্তব্য বিস্মৃতি অনিবার্য্য। সুখের লালসায় বাসনার তাড়নায় ছাত্রজীবন গঠিত হইতে পারে না। পরকে হাসাইতে হইলে যেমন নিজে হাসিতে নাই, নিজে অতিরিক্ত হাসিলে পরকে হাসান যায় না,

সেইরূপ ভোগে লিপ্ত হইলে পরের প্রতি ও নিজের প্রতি কর্ত্তব্য অসম্ভব হয়, পরকে হাসাইতে নিজের একটা কর্ত্তব্যবোধ আছে অর্থাৎ উহাদিগকে হাসাইতে হইবে। যে নিজে হাসিয়া ব্যাকুল সে ঐটী ভুলিয়া যায় এবং পরকে হাসাইতে পারে না। আবার আর এক দোষ আছে যাহা বাস্তিক বলিয়াও ধরিয়া নিতে পারি তাহাতে নিজের ভোগের দিকে দৃকপাত নাই, কিন্তু পরের ভোগের জন্য ব্যাকুল সে ব্যাকুলতাও এক অর্থে ভোক্তাসক্তি এবং তাহাতেও মানুষ ভাবুক, হিতাহিত বিবেচনা নাই। কেবল উত্তেজনার বশে পরের সুখ বিধানের চেষ্টা, ইহাতে কর্ম্মের দিকে অনেকটা পরিমাণে জোর আছে, কিন্তু ইহাও ভাবুকতা। কাহার জন্য করিতেছে কেন করিতেছে ইত্যাদি বোধ থাকেনা পরের সুখ হইবে কিনা তাহাও বিবেচনা করিবার অবসর নাই। কি করিলে পরের সুখ হইবে তাহারও বিচার নাই, কিরকম সুখ অভিপ্রেত তাহারও হিসাব নাই কেবল ভাবুকতা বা বাতিকের বশে পরের সুখ বিধান, গুরুর সুখ বিধান করিতে অনেক সময় কুকার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া। এইরূপ ভাবুকতার অন্তর্ভুক্তদেশের সুখে আমার সুখ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কর্ম্ম করিতে যাইয়া বিকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিতে যাওয়াও এইরূপ ভাবুকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভাবুকতাই ভোগের স্পৃহা, জ্ঞানবাদীর বিবেচনায় তাই ভাবুকতা মিথ্যা জ্ঞান, ভোগের স্পৃহা বৈদান্তিক পরিভাষায় অনুসন্ধানের স্পৃহা, কোনও কিছু পাইবার জন্যই অনুসন্ধান করি, ভোগ্য বস্তু পাইবার চেষ্টাই অনুসন্ধান, অতএব চিত্তকে অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভালবাসার বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে, ভালবাসার বস্তুর সুখের বস্তুর ঈপ্সিত বস্তুর অন্বেষনের প্রবৃত্তি জীবের স্বভাব জাত।

ঈপ্সিত বস্তু মলিন পঙ্কিল হইলেই ক্ষুদ্র, নীচ বিষয়ে স্পৃহা হইলেই তাহা হেয়। কিন্তু নিজের স্বরূপ অনুসন্ধান আত্মতত্ত্বানুসন্ধান কথনই হেয় হইতে পারে না। নিজে নিজের ভোগ্য বস্তু বলা আর না বলা উভয়ই সমান। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন "মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরিয়সী" মুক্তির হেতুভূত কারণ সকলের মধ্যে ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, এবং ভক্তির সংজ্ঞা "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে" আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি, অপর জ্ঞানী সকলের মতও তাঁহার অনুকুল তাহাও তিনি বলিয়াছেন। "আত্ম তত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ"। 'আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী ভক্তি, ইহা অপর জ্ঞানীগণের অভিমত, আত্ম তত্ত্বানুসন্ধান বা ভগবৎ তত্ত্বানুসন্ধান একই কথা। মূলতঃ ব্যাপক অখণ্ড অসীম বস্তুর অনুসন্ধানই মুক্তির পন্থা, তাহাতেই জ্ঞানাৎপত্তি হয়। অতএব চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম ব্যাপক বস্তুতে নিয়োজিত হইলেই তাহা বিশুদ্ধিলাভ করে। ক্ষুদ্র বস্তুর সসীমতা, খণ্ডত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব বোধে প্রতিফলিত হইলে অখণ্ড, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন (কাল, দেশও গুণ) বস্তুতে ভালবাসা জন্মিলেই ভাবুকতা দোষ বিনষ্ট হইয়া গেল, ভোগ্য বস্তু থাকাতেই দোষ হয় না, হয় ভোক্তৃত্ব থাকিলেই দোষাবহ নহে, উভয়ের সংযোগই দোষাবহ। সংযোগে বস্তু পরিচ্ছিন্ন হয় পরিচ্ছিন্নভাবের সহিত অপরিচ্ছিন্নভাবের সংযোগই দোষের। সংযোগেই বস্তু ক্ষুদ্র নীচ হইয়া পড়ে, বস্তু গত্যা কোনও দোষ হয় না। কিন্তু আরোপে উহা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র হইয়া যায়, একটি আখ্যায়িকা এই প্রসঙ্গে বলিলেই জিনিষটী আরও বোধগম্য হইবে।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

৮ম পরিচ্ছেদ।

সেই লোক আসিলেন।

কিছুক্ষণ নিদ্রার পর মার্সি একটা শব্দে জাগিয়া উঠিল। কে যেন বাগানের দিকের দরজা খুলিল। একজন চাকর কি কথা বলিল—তাহার পর আর একটী কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। মার্সির সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। এতো সেই কণ্ঠস্বর—বহু পূর্ব্বে পতিতাশ্রমে যাহা সে শুনিয়াছিল—যে স্বরে একদিন তাহার পাষাণ হৃদয় গলিয়াছিল। তবে তো জুলিয়ানই দরজা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।

জুলিয়ান মার্সির দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। মার্সি অপর দরজা খুলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। তাহার হস্ত কাঁপিতেছিল—তাহাতে যেন কোন শক্তিই ছিল না। কষ্টে দরজা খুলিয়া যেমন সে বাহির হইয়া যাইবে অমনি পশ্চাৎ হইতে জুলিয়ান তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"কে তুমি? পালিও না। আমি কোন ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব নই—আমি শুধু কর্ত্রীর ভাগিনা—জুলিয়ান গ্রে।"

মার্সি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ফিরিয়া জুলিয়ানের দিকে চাহিল।

কৃষ্ণ পরিচ্ছদে জুলিয়ানের দেহ আবৃত। টুপি হাতে করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। যুবা বয়স হইলেও তাহার মুখে চিন্তার চিহ্ন সুপ্রকট। মুখচ্ছবি পাণ্ডুর—বিষাদের একটী সূক্ষ্ম মেঘচ্ছায়া যেন তাহার দেহ-আকাশকে ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে। দেহের মধ্যে তেমন কোন অসাধারণত্ব নাই। কিন্তু তাহার সেই চক্ষু দুটি,—আহা! কি সুন্দর পদ্ম-পলাশের মত সেই দুইটী চক্ষু—কি উজ্জল কোমল মর্ম্মস্পর্শী তাহাদের দৃষ্টি। তাহার চক্ষু দুইটীই তাহাকে সাধারণ লোক হইতে বিভিন্ন করিয়াছে। সেই কোমল দৃষ্টিতে কি ছিল প্রকাশ করিয়া বলা কঠিন—কত বিভিন্ন ভাবই না সেই দৃষ্টির মধ্যে খেলা করিতেছিল। বিষাদে প্রসন্নতায়—কোমলে কঠোরে—উজ্জলে মধুরে—যেন প্রেমালিঙ্গন। সে দৃষ্টি মুগ্ধ করিতে পারে—সে দৃষ্টি সন্ত্রস্ত করিতে পারে। সে দৃষ্টি কখনও হাসায় কখনও কাঁদায়। সে দৃষ্টির প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। মার্সি যখন পলাইতেছিল—তখন সেই দৃষ্টিতে বালকের সরল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—কিন্তু যখন মার্সি তাহার দিকে ফিরিল—তখন সে দৃষ্টির সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল—জুলিয়ানের কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন হইল। যখন আবার সে কথা কহিল তখন তাহার স্বর কি কোমল—কি সহানুভূতিপূর্ণ!

"তুমি এই চেয়ারে বস। আমি না জেনে হঠাৎ এ ঘরে এসে প'ড়েছি। তুমি কিছু মনে করো না।"

মার্সি তখন যেন মন্ত্রমুগ্ধ—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়! একটু পরেই সে আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইল। সে জুলিয়ানকে নমস্কার করিয়া চেয়ারে বসিল; জুলিয়ান তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখ দেখিয়া জুলিয়ান বিস্মিত হইল। মনে মনে ভাবিল—'যে দুঃখ এই মুখখানিতে এরূপ চিহ্ন আঁকিয়াছে—সে বড় সামান্য দুঃখ নয়। এই নারীর মধ্যে যে হৃদয় স্পন্দিত—সে সাধারণ হৃদয় নয়। কে এই রমণী?''

মার্সি কথা বলিল—"কর্ত্রী লাইব্রেরীতে আছেন, আপনি এসেছেন, তাঁকে সংবাদ দেব?"

"না, না, তাঁকে সংবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। তোমার এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই।"—এই কথা বলিয়া জুলিয়ান জল-যোগের টেবিলের নিকট বসিল। এক পেয়ালা চা পান করিতে করিতে সে বলিল—"এ ঘরে বিনা আমন্ত্রণেই আমার আহার চলতে পারে। তুমি কিছু খাবে না?"

মার্সি বলিল—"না"

চা পান করিয়া জুলিয়ান বলিল—"মাসি-মার চা—খাঁটি চা; এতে কিছু ভেল নেই; মাসিমার প্রকৃতিটী যেমন খাঁটি, তাঁর ব্যবস্থা আয়োজনও তেমনি খাঁটি—এখানে কৃত্রিমতার চিহ্ন পাবে না।" তারপর সে কিছু আহার্য্যও উদরসাৎ করিল।

মার্সি ভাবিয়াছিল—জুলিয়ান ধর্ম্মযাজক, উন্নতলোকের জীব। আজ দেখিল ধর্ম্মযাজক হইলেও জুলিয়ান মানুষ—তাহাদেরই দশ জনের মত একজন; সে দুরধিগম্য অপূর্ব্ব জীব নহে।

তাহার পর খাইতে খাইতে জুলিয়ান মার্সির সহিত কথা আরম্ভ করিল। সে কথা-বার্ত্তায় কেমন সরল সহজ ভাব! যেন বহুদিন হইতেই তাহারা পরস্পরের নিকট পরিচিত।

"আমি 'কেনসিংটন উদ্যানের' পথে এখানে এসেছি। কিছু দিন হ'তে আমাকে বিশ্রী অনুর্ব্বর পল্লীতেই বাস করতে হয়েছিল। সেখানে প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য্য চোখে প'ড়ত না। যখন উদ্যানের কাছে এলাম—তখন যেন চোখ জুড়ুল। স্ত্রী পুরুষ, বালক যুবক—সব যেন আনন্দের ছবির মত আমার বোধ হ'তে লাগল—তাদের মধ্যে কেমন উৎসাহ, কেমন প্রফুল্লতার ভাব। চারি দিকের তরুলতার মধ্যে কেমন সজীবতা! এই সব দেখে আমার মন আনন্দে ভ'রে উঠলো। তখন মনের আনন্দে আমি বেশ উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়ে দিলাম। কিন্তু সেই সময় আমার এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। কা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—বলত?"

মার্সি ধীরে ধীরে বলিল—"তা আমি কি ক'রে জানব?"

"যখন বেশ ফূর্ত্তি ক'রে গান ধরেছি তখন কার সঙ্গে দেখা হ'ল শুনবে?—দেখা হ'ল প্রধান ধর্ম্মযাজক বিশপের সঙ্গে। গানটাও যদি কোন ধর্ম্ম সঙ্গীত হ'তো তা হ'লেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সে সময় যে গান গাচ্ছিলাম সেটা ধর্ম্ম-সঙ্গীত নয়; সেটার প্রথম ছত্র হচ্ছে—"বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই?" বিশপ বুঝলেন—আমি কি গান গাচ্ছি। তার পর যখন আমি তাঁকে টুপি খুলে অভিবাদন ক'রলাম—তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরুলেন। হয়তো এই ভাবলেন—জগতের চারিদিকে যখন পাপ ও দুঃখের তীব্র হাহাকার—সেই সময় একজন পাদ্রির গান হচ্ছে কিনা—"বাঁশরী বাজাতে চাহি"—!

কিন্তু আমার কি মনে হয়, জান? আমার মনে হয়—পাদ্রিরা এক স্বতন্ত্র জাতি হ'য়ে থাকবে কেন? নির্দ্দোষ আমোদে সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগ দিতে তাদের আপত্তি হবে কেন? আমার বিশ্বাস ধর্ম্মযাজকেরা যে নরনারীর দুঃখ মোচন ক'রতে সমর্থ হয়না তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে তারা আপনাদের এক উচ্চ জাতি ভেবে বসে থাকে। ধর্ম্মের জগতে "জাতি ভেদ"—এ কথা মনে হ'লে আমার হাসি পায়। যে কৃষক ধর্ম্মপথে থেকে প্রাণপণে আপনার কর্ত্তব্য পালন ক'রছে তার মধ্যে আর ধর্ম্ম-যাজকের মধ্যে কি ভগবান কোন অলঙ্ঘ্য বেড়া তুলে রেখেছেন?—আচ্ছা, তুমি কি সমাজদ্রোহী? আমি তো একজন ভীষণ সমাজদ্রোহী।"

মার্সি আনমেষে জুলিয়ানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। সে যেন ঘোর সমস্যায় পতিত। এই ব্যক্তিই কি পতিতাশ্রমের সেই প্রচারক—যাহার কথায় মার্সি মুগ্ধ হইয়াছিল—যিনি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাকে পবিত্র ভাব উদ্বোধিত করিয়াছিলেন? যিনি দীনা হীনা পতিতা নারীদিগের চক্ষে অশ্রুধারা বহাইয়াছিলেন? হাঁ, এই তো সেই কোমল প্রেমোজ্জ্বল নেত্র—যাহা মার্সির হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। এইতো সেই কণ্ঠস্বর যাহা তাহার নীরব হৃদয়-বীণায় আশা ও সান্ত্বনারই ধ্বনি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। উপদেষ্টার উচ্চ আসনে ইনি স্বর্গের দেবদূত—সংসারের নিম্ন ভূমিতে এ যে সরল কোমল বালক প্রকৃতি!

"সমাজদ্রোহী—এই কথা শুনে তুমি বিস্মিত হচ্ছ বুঝি? লোকে এর চেয়েও আমাকে জঘন্য আখ্যা দিয়েছে। কেউ বলে 'ধর্ম্মদ্রোহী'—কেউ বলে 'নাস্তিক'। একটু আগেই তোমাকে ব'লেছি—আমাকে এক পল্লীতে থাকতে হয়েছিল। সেখানকার যাজক কিছু দিন ছুটী নিয়েছিলেন—আমাকে তাঁর কাজ করতে যেতে হয়েছিল। অল্প দিন থাকার পরই পল্লীর জমীদার আমাকে বল্লেন—তুমি ধর্ম্মদ্রোহী। কৃষকেরা বল্লে—সমাজদ্রোহী। কাজেই তাঁদের ধর্ম্ম যাজককে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা হ'ল। এখন যে লোক তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছে সে কি জান? সে একজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি—সে একটী আরাম ও শান্তিপূর্ণ পল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে এসেছে।"

এই কথা বলিয়া জুলিয়ান মার্সির নিকটে একখানি চেয়ারে আসিয়া বসিল।

তারপর সে বলিল—"আমার অপরাধ কি শুনবে? এ দেশে কৃষকদের যে কি দুরবস্থা তা আমি আগে জানতাম না। এই পল্লীতে ধর্ম্মযাজকের কাজ করতে গিয়ে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে এ দেশের কৃষকদের মত হতভাগ্য জীব পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। দীন কুটীরগুলিতে দারিদ্র্য ও দুঃখের কী যে ভীষণ ছায়া—তা বলে বুঝান কঠিন। আর কৃষকেরা এই দুঃখ ও যন্ত্রণা কি সহিষ্ণুতার সহিতই না বহন ক'রছে! তারা অসীম দুঃখের পীড়ন নীরবে সহ্য করে চলেছে। কত দিন না তাদের উপবাসে কেটে যাচ্ছে—তাদের চোখের সম্মুখে তাদের প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগুলি অনাহারে শুষ্ক মুখে দিন কাটাচ্ছে—আর পাষাণের মত তাদের দাঁড়িয়ে সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। এক দিন নয়—দুদিন নয়—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—এমি একই ভাবে তাদের জীবন

অনন্ত দুঃখের ধারায় বয়ে চলেছে। কোন আশা নেই—কোন সান্ত্বনা নেই—এই জীবন্মৃতের অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে! হায়! ভগবানের এই সুন্দর পৃথিবী কি এরূপ নিদারুণ দুঃখের বোঝা ধারণ করবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল! এখনও তাদের কথা ভাবতে—তাদের কথা বলতে আমার চোখ জলে ভ'রে আসছে।"

জুলিয়ানের মস্তক তাহার বক্ষের উপর নত হইল। এতক্ষণে মার্সি তাহাকে যেন ঠিক চিনিল। তাহার মানস-চিত্রে যে মোহন ছবি অঙ্কিত ছিল—এই তো সেই অনুপম দেব-চিত্র। সে জুলিয়ানের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল।

জুলিয়ান পুনরায় বলিতে লাগিল—"আমি তাদের এই দুঃখ দূর করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম। ভূম্যধিকারিদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের প্রজার দুঃখের কথা শোনাতে লাগলাম। বললাম—এরা সহিষ্ণু, এরা তো বেশী আশা করে না—এদের অভাবও খুব বেশী নয়। যীশুর পবিত্র নামে এদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করে দাও।" জমিদারবর্গ এ কথায় শিউরে উঠল—সমাজ কাণে আঙুল দিয়ে ব'লল—কি সর্ব্বনাশ! দুঃখই যে কৃষকদের নিয়তি—তাদের কর্ম্মফলই যে তাদের দুঃখের কারণ। অদৃষ্টের বিচারের উপর মানুষ হস্তক্ষেপ ক'রবে! আমি কিন্তু চেষ্টা ছাড়লাম না—আমি আমার বন্ধুবর্গকে পত্র দিলাম। আমি দু এক জন গরীব কৃষককে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি—সেখানে তারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারবে। আমার এই আচরণে—আগুন জলে উঠলো, সেখানকার লোক আমার উপরে খড়্গহস্ত হ'ল। তা হো'ক, আমি তো আর এ সঙ্কল্প ছাড়তে পারি না। আমি গরীব প্রজাদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করব। আমি এ আগুন আরো বেশী ক'রে জ্বলিয়ে তুলতে চাই। বিলাসের আরাম ও ধনের নির্দ্দয়তা এ আগুনে একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠুক—তা হলেই গরীব প্রজাদের একটু পারিশ্রমিক বাড়বে। জুলিয়ান তো সমাজের চক্ষে ভীষণ সমাজদ্রোহী হ'য়েছেই—তার এ অখ্যাতিটা আরো একটু জাঁকিয়ে উঠুক।"

জুলিয়ান কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল। মার্সিও এই কাহিনীতে উত্তেজিত হইয়া জুলিয়ানের দিকে অগ্রসর হইল—তাহার হস্তে তাহার টাকার ব্যাগ। জুলিয়ান তাহার দিকে ফিরিলে সে বলিল—"দয়া ক'রে গরীব প্রজাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে আমার এই যৎসামান্য দান গ্রহণ করুন।"

জুলিয়ানের পাণ্ডুর গণ্ডস্থল মার্সির সহৃদয়-তার আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—

"না, না; আমি প্রচারক হলেও ভিক্ষের ঝুলি সব জায়গায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াই না।" মার্সি দান লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। জুলিয়ান বলিল—"আমাকে প্রলো-ভনে ফেলো না,—পাদ্রির সম্মুখে টাকার থলি—সে যে বিড়ালকে মাছ দেখানোর মতন।"

মার্সি কিছুতেই ছাড়িল না। তখন জুলিয়ান ব্যাগ হইতে সামান্য দান গ্রহণ করিয়া বলিল—"তুমিই প্রথম দানের দৃষ্টান্ত দেখালে—সে জন্য তোমাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধর্ম্মের খাতায় এ দানের মূল্য অনেক। চাঁদার খাতায় কী নামে এই দান তুলবো?

মার্সি বলিল—"কোন নাম লেখাব দরকার নেই। এ দান নাম-হীন থাকবে।"

এই সময় গৃহের একটী দরজা খুলিল। জ্যানেট ও হোরেস গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জ্যানেট বিস্ময়ে বলিলেন—"এই যে জুলিয়ান। কখন এলে?"

জুলিয়ান মাসিমাকে প্রণাম করিল। সে হোরেসের করমর্দ্দন করিল। হোরেস হস্তমর্দ্দনের পরই মার্সির নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা উভয় গৃহের বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। জুলিয়ান মাসিমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—"আমি বাগানের পথে এই গৃহে এসেছিলাম—আমি গৃহে ঐ স্ত্রীলোকটীকে দেখতে পেলাম। ওটী কে?"

"কেন, ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রতি এরই মধ্যে তোমার এত টান হ'ল যে!"

'সত্যিই ওর প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মেছে।" জ্যানেট মার্সিকে নিজের কাছে ডাকিলেন:—

"ওমা, এদিকে এস তো একবার তোমাকে আমার ভাগ্নের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিই। জুলিয়ান, এর নাম—কুমারী গ্রেস্ রোজবেরি—"

জ্যানেট সহসা থামলেন—। এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই জুলিয়ান যেন চমকিত হইয়া উঠিল—বোধ হইল যেন সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছে।

জ্যানেট বলিলেন—"জুলিয়ান, ব্যাপার কি?"

"কিছু না, মাসিমা"—এই কথা বলিয়া সে গম্ভীরভাবে মার্সিকে অভিবাদন করিল। মার্সিও কতকটা উদ্বিগ্নভাবে প্রত্যভিবাদন জানাইল। মার্সিও লক্ষ্য করিয়াছিল—রোজবেরি নাম উচ্চারণ করিতেই জুলিয়ান চমকিয়া উঠিলেন। এ বিস্ময়ের কারণ কি?

জুলিয়ান সহসা যেন গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছু পূর্ব্বের সে প্রসন্ন ভাব আর নাই—যেন অন্যমনস্ক ভাবে তিনি কি ভাবিতেছেন! তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত। আর এই ভাবান্তর উপস্থিত হইল সেই মুহূর্ত্ত হইতে যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মাসিমা মার্সির ছদ্ম-নাম উচ্চারণ করিলেন।

জ্যানেট জুলিয়ানকে বলিলেন—"তোমার ঘর ঠিক ক'রে রেখেছি, তুমি এখানে কিছুদিন থাকবে তো?" জুলিয়ান অন্যমনস্ক ভাবে সম্মতি জানাইল। উত্তর করবার সময় মাসিমার মুখের দিকে না চাহিয়া সে বিস্ময়ে মার্সির দিকে ফিরিয়া চাহিল। জ্যানেট বলিলেন—"লোকে যখন আমার সঙ্গে কথা বলবে, তখন আমি চাই যে তারা আমার দিকেই তাকাবে। আমার ঐ পালিতা কন্যার দিকে তুমি এমন বিস্ময়ে তাকাচ্ছ কেন?"

"আপনার পালিতা কন্যা?"

"হাঁ। ও হচ্ছে কার্ণেল রোজবেরির কন্যা। আমার আত্মীয়। তুমি কি মনে ক'রছ যে আমি রাস্তা হ'তে নাম ও গৃহহীন কোন পতিতা রমণীকে ধরে তুলে আমার পালিতা কন্যা করেছি?"

জুলিয়ানের দুশ্চিন্তা যেন অনেকটা কাটিয়া গেল। সে বলিল—"হাঁ হাঁ; আমি কার্ণেলের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তবে তো ঐ মেয়েটি আমাদের আত্মীয়।

"যা হোক্ গ্রেস্ যে নিরাশ্রয়া অনাথা নয় এ কথা তোমাকে বোঝাতে পেরে আমি সুখী হ'লাম।" তাহার পর জ্যানেট জুলিয়ানকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন—"তোমার চিঠির সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই। তাতে একটি ছত্র আছে—যার বিষয় জানতে আমার বড়

কৌতূহল হ'য়েছে। সেই অপরিচিতা নারী কে—যাকে তুমি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাও?"

জুলিয়ান চমকিয়া উঠিল। সে মৃদু স্বরে বলিল—"এখন আপনাকে সে কথা বলতে পারব না।"

'কেন?"

জ্যানেট সবিস্ময়ে দেখিলেন জুলিয়ান তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আর এক বার তাঁহার পালিতা কন্যার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

জ্যানেটের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন—"জুলিয়ান, আমার প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে গ্রেসের দিকে তোমার চাওয়ার সম্পর্ক কি, আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার?"

জুলিয়ান বলিল—"যতক্ষণ রোজবেরি আমাদের কাছে এই গৃহে রয়েছেন—ততক্ষণ আমার সে কথা বলা অসম্ভব।"

(ক্রমশঃ)

মঞ্জরী

বিজ্ঞান।

চূণ ও স্বাস্থ্য

ভারতবর্ষে পান খাওয়ার প্রচুর প্রচলন আছে। পানের চূণ শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী তাহা সকলেই যে জানেন এমন নহে। শরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। উহা না থাকিলে শরীর পুষ্টির অভাবে রোগ এবং মৃত্যু নিশ্চয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চূণ বা তাহার লবণ, উহার অভাবে পুষ্টি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে লোকে শরীরে চূণের প্রয়োজন সবে মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে শরীরে চূণের অভাবে রোগ হইয়াছে। চূণ বেশী পরিমাণ না থাকায় শরীরের সকল যন্ত্রে পুষ্টির অভাব ঘটিয়া এরূপ রোগ হয়।

রিকেট রোগ হয় শরীরে চূণের অভাবে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া, সূর্য্যালোকের অভাব প্রভৃতি যে কোন কারণেই হউক না কেন চূণের অভাব হয়। কতকগুলি যক্ষ্মারোগের যে কারণ চূণের অভাব তাহা নিশ্চিত স্থির হইয়াছে।

প্যারা থাইরয়েড Para thyroid নামে এক গ্রন্থি আছে, উহার কার্য্য থাইরয়েড thyroid গ্রন্থির ঠিক বিপরীত এবং পেশী সকলে চূণ সমাবেশ করা প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির একটা বিশেষ কার্য্য, সেই জন্য চূণের অভাবে ঐ গ্রন্থি যদি ভাল করিয়া কার্য্য করিতে না পারে তবে মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত হয় ও নানারূপ স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ হইতে পারে। একজন রোগীর স্নায়ুরোগের অতি বৃদ্ধি হইলে পর তাহাকে বৃষের ঐ গ্রন্থি চূর্ণ করিয়া সেবন করাইবার ফলে তাহার ঐ রোগ আরাম হইয়াছিল।

শরীরে বিষোৎপাদন হইলে দেখা গিয়াছে

যে ঐ রোগীর রক্তে চূণের ভাগ কম হইয়াছে। চূণ সেবন করিলে রক্ত সঞ্চালন ভাল করিয়া হয় এবং সেইজন্য হজম শক্তিও বাড়ে। চূণ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রাত্রের ঘাম বন্ধ হয়। চূণের অভাবে যেমন স্নায়ু উত্তেজিত হয় তেমনি চূণ সেবনে উত্তেজিত স্নায়ু সকল স্থির হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাহার শরীরে চূণের অভাব আছে তাহার শরীর চূণ সেবন করিলে পুষ্টিলাভ করে। শরীরে চূণের অভাব থাকিলে খাদ্যের পরিবর্তন করিলেই রোগ আরাম হইবে না। চূণও সেবন করিতে হইবে। সকল রোগেই শরীর হইতে চূণ বাহির হইয়া যায়। যখন পুষ্টি কম হয়, স্নায়ুর রোগ হইয়া থাকে তখন শরীরে চূণের ভাগ কম থাকিলে পরিপাক ভাল হয় না তজ্জন্য পুষ্টিও হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে প্রচুর পরিমাণে চূণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

সূর্য্যালোকের শক্তি

মুক্ত বায়ুতে বাস করায় যে উপকার হয় তাহা যে কেবল বিশুদ্ধ বায়ু বা ব্যায়ামের জন্য হয় তাহা নহে; শরীর সঞ্চালনের সময়ে বায়ুর যে শীতলকারী গুণ আছে এবং সূর্য্যালোকের যে জীবনীশক্তি প্রদানকারী শক্তি আছে তাহার জন্যও এই উপকার বোধ করিতে পারা যায়।

সূর্য্যালোকে যেরূপ উত্তাপ ও আলোক রশ্মি আছে তেমনি রাসায়নিক রশ্মিও আছে। উত্তাপ মানুষের গ্রন্থি ও ত্বকের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে, রাসায়নিক রশ্মি স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে। এই রাসায়নিক রশ্মির জন্যই সূর্য্যালোকে মানুষের মুখ কাল হইয়া যায়।

গাছ গাছড়ার যে বাড়িবার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল উহার সবুজ বর্ণের উপর সূর্য্যের আলোকের প্রভাবের ফল। সূর্য্যালোক মাটি ও বায়ু হইতে পুষ্টিকারক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া গাছের জীবন রক্ষা করে ও উহা বাড়াইয়া তোলে। প্রাণী জীবনেও সূর্য্যালোকের সেই শক্তির প্রয়োজন।

সূর্য্যালোক শরীরে লাগাইয়া যাঁহারা উপকার পাইতে চান তাঁহারা অনাবৃত শরীরে সূর্য্যালোক লাগাইবেন। যাঁহাদিগের সূর্য্যালোকে থাকার অভ্যাস নাই, যাঁহাদিগের চামড়া নরম তাঁহারা প্রথম প্রথম অল্পক্ষণ অর্থাৎ দশ বা পনের মিনিট সূর্য্যালোকে থাকিলে তাঁহাদিগের কষ্ট হইবে না। সূর্য্যালোকে থাকিয়া বর্ণ কাল হইলে কোন রোগ হয় না, আলোকে থাকার ফলে বর্ণ ঘোর হইলে আর অধিক সূর্য্যালোক লাগায় কোন অনিষ্ট হইবে না। কারণ ঐ বর্ণ সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে চামড়াকে রক্ষা করে।

মুক্ত বায়ুতে কিম্বা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শরীরে সূর্য্যালোক লাগান যাইতে পারে। যখন সূর্য্যালোকের তাপে কষ্ট বোধ হয় তখন সূর্য্য ও রোগীর মধ্যে নীল বর্ণের পাতলা কাপড়ের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিছু বালি সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া আরামে বসিয়া থাকিবার উপায় করিতে হইবে। ঐ বালির সাহায্যে ইচ্ছামত শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত করান যাইতে পারে।

সহরে প্রত্যেক গৃহেই একটু উন্মুক্ত স্থান থাকা আবশ্যক যেখানে বসিয়া সূর্য্যালোক গাত্রে লাগান যাইতে পারে। সভ্যতা প্রাপ্ত

মানুষ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ও জীবনযাপনের পদ্ধতির জন্য সূর্য্যালোক বেশী পায় না। যাহারা সহরে বাস করে পুরাকালের গুহাবাসী মানবের ন্যায় তাহারা যে স্থানে থাকে তথায় সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তাহাদের গৃহের জানালাতে পর্য্যন্ত পর্দ্দা দেওয়া থাকে। ইহার ফলে বৃদ্ধ ও যুবা সকলেরই মুখের চেহারা রক্তহীন হয়, শিশুগণের রিকেট রোগ হয়। সহরে দিন দিনই যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগের বিস্তার হয়। অনেকটা ইহার ফলেই মানুষ বিকলাঙ্গ হইতেছে, নিস্তেজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং নানারূপ অবনতি ঘটিতেছে। মুক্ত বায়ুতে বাস এবং আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় সাদাসিদা ভাবে জীবনযাপন করাই একমাত্র উপায়, যদ্দারা এই যে লোক ক্ষয় হইয়া বাঙ্গালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ বন্ধ হইবে।

"স্বরাজ"

বৈচিত্র্য।

অদ্ভুত রীতি

পারস্যদেশে এক অদ্ভুত রীতি আছে যে বাড়ীতে কেহ মারা গেলে, যাহারা মৃতের উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করিতে আসে, তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি বোতল দেওয়া হয়। ঐ বোতলে শোকের অশ্রুজল ভরিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, চিকিৎসক যে রোগীর আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এ অশ্রুজল সেবনে তাহার ব্যাধি দূর হইতে পারে।

বিচিত্র দেশ

স্পেনের অন্তর্গত লাস চার্ডেস নামক একটি প্রদেশ আছে। উহার পরিধি সাড়ে চারিশত বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় আট হাজার। ঐ স্থানের বৈচিত্র্য এই যে, সেখানে একটি পথও নাই। না আছে ডাক্তার—না আছে ঔষধ। রোগ আছে কি না তাই বা কে জানে?

স্ত্রীলোকের মর্ম্মর মূর্ত্তি

সমগ্র ইংলণ্ডে মাত্র চারিটি মহিলার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহাদের নাম—(১) ডোরা (২) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (৩) সারা সিডন্স (৪) কেভেল।

"স্বরাজ"

খবরাখবর।

মসজিদের জন্য ইংরাজ কবির দান

কবি ডব্লিউ এফ ব্লান্ট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিঙ্গ উইলিয়ম মিউজিয়মে দান করিবার জন্য তাঁহার কতকগুলি কাগজপত্র বোঝাই একটি বাক্স দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে যেন ঐ বাক্স খোলা না হয়। তিনি লণ্ডনে মসজিদ গড়িবার জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং পুরাতন প্রাচ্য পুঁথিপত্র ক্রয় করিবার জন্য ৭৫০০৲ দিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু

রঞ্জেনরশ্মি বা -এক্সরের আবিষ্কারক ডাক্তার রঞ্জেনের ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক সহরে মৃত্যু ঘটিয়াছে। ডাক্তার রঞ্জেন ১৮৯৫ সালে রঞ্জেনরশ্মি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"স্বরাজ"

গাজী মুস্তাফা কামালপাশা

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার,
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, ডুবুল দিয়ে বাধগো পারাবার,
লক্ষ যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩৩০ { ১০ম সংখ্যা

সন্ধি

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

পুরাতন বর্ষ কবি গত
ওরে ভাগাহত
পশ্চাতে চাহিয়া কেন অনিমেষ আঁখি
পুঞ্জীকৃত রাখিয়াছ বাকী
জীবনের পাতায় পাতায়,
হায় হায়
কিছু কি পড়েনি জমা!
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে রমা
আজন্মের যোগলব্ধ যে মানসীদেবী,
তারে সেবি,
পাওনি কি নির্ম্মাল্য প্রসাদ?
শুধু নিন্দা গ্লানি অবসাদ
অর্জ্জিয়াছ রাত্রি দিন?
তুমি ত ছিলেনা দীন
হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্পদে!

দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে বিপদে
তোমারে দেখেছি স্থির !
উন্নত রাখিয়া শির
সংসারের সহস্র সংঘাতে,
দারিদ্র্যের কশাঘাতে
ক্ষতদেহ, স্ফীতবক্ষ হয়ে তবু
অবিরাম যুঝিয়াছ, বিশ্বাসেরে হারাওনি কভু।
তবে কেন করুণ নয়ন
কণ্টকে কুসুম বলে শুধুই কি করেছ চয়ন ?

কারে তুমি দিলে প্রাণ
হৃদয় দু'পায় দলে কে তাহার দিলে প্রতিদান ?
তুমি যার পশ্চাতে ছুটিলে
আপনার দেহ মন বাসনার শেষ অন্য দিলে,
উপাড়ি' হৃদয়-পিণ্ড, উৎসারিত আনন্দ আবেগে
যে দিন দাঁড়ালে জেগে
সরবস্ব পণ করি
উৎসবের রঙ্গে রাঙা উৎসর্গের পাত্রখানি ভরি,
ভেবেছিলে সকলি সফল
জীবন যৌবন মন বসন্তের আনন্দে উজ্জল !
সেকি হায় মিথ্যা হ'ল আজ
কর্ম্মের দুর্ভোগ মাঝে পেলে শুধু অপমান লাজ

সত্যেরে টানিয়া বুকে মঙ্গলেরে করিয়া আশ্রয়,
মনুষ্যত্বে বড় করি যদি তোর হ'ল পরাজয়
সংসারের নির্ম্মম বিচারে,
কেন তবে ভাগ্যবিধাতারে
অকারণ দিলিরে গঞ্জনা ?
মানুষের নির্দ্দয় বঞ্চনা
যদি তোর বক্ষে বেজে থাকে,
কারণ খাতনাকে

বুকে নিতে চোখে যদি আসে জল
ওরে ও দুর্ব্বল,
মানুষে করিয়া বড় দাঁড়াইলি কেন পুরোভাগে ?
নিখিল ধরণী জাগে
অর্ঘ্য ভরি' আনন্দের কুসুমিত প্রফুল্ল মঞ্জরী,
তুই শুধু গতদিন স্মরি'
অশ্রু-আঁখি সকাতর দাঁড়াইয়া রহিবি পশ্চাতে ?
বৎসরের প্রথম উষায়
নবসূর্য্য করোজ্জ্বল কমলের বিকাশ ব্যথায়
বাজিয়া উঠিছে বাঁশী অনাগত ভবিষ্যের সুরে,
তুই কি রহিবি দূরে
বক্ষে রাখি সূচীপত্রখানি ?
আনন্দের মর্ম্মবাণী
চিত্ত মাঝে দিয়ে যায় দোলা
ওরে মূঢ় আজি থাক তোলা
যুক্তি তর্ক বিচারের জের ;
নব বর্ষ পুণ্যাহের
আশালোকে সঞ্চারিত গান
আকাশে ভাসিয়া চলে, রজনীর হ'ল অবসান।

পুরাতন বর্ষ হ'ল গত,
পশ্চাতের সুখ দুঃখ তার পায়ে মাথা কর নত !
তার পরে সমুন্নত মাথে
উষার আলোকে দীপ্ত অনাবিল উজ্জ্বল প্রভাতে,
চেয়ে দেখ নয়নের আগে
ধরার স্তিমিত প্রাণ একে একে ওই বুঝি জাগে ;
কণ্ঠহারা পাখী আজ গেয়ে ওঠে গান,
অন্ধকার ভাসাইয়া ওই এল আলোকের বান !
ধরণীর বক্ষ হ'তে আহরিয়া রস প্রস্রবণ
শ্যাম শোভা বিস্তারিয়া মর্ম্মরিল বন উপবন ;
ফল ফুল কিশলয় নিয়ে
বিশীর্ণা ধরণী আজ যাদু মন্ত্রে উঠিল যে জিয়ে ?

ওরে মূঢ় কাণ পেতে শোন্ দেখি আজি
আসন্ন কালের ভেরী কোন্ খানে উঠিতেছে বাজি—
সীমা হ'তে সীমান্তরে
গ্রামে গ্রামে নগরে প্রান্তরে,
এ দুর্জ্জয় আহ্বান তাঁহার
গর্জ্জিয়া উঠিছে বারম্বার—
ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি, শব্দ হ'তে প্রতিশব্দ ব্যেপে
ধরণীর দেহ যেন ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে কেঁপে—
আসন্নের আবির্ভাবে বুকে আজ ত্বরিত কম্পন
অপহত ওঠ জেগে জীবনের এই সন্ধিক্ষণ!

জাতীয় শিক্ষার কথা

[শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু]

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ, শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকমণ্ডলি, সোদরপ্রতিম ছাত্রবৃন্দ, বাঙলার এই দুরূহ সমস্যার দিনে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যখন ভাবপ্রবণ বাঙালীর যুক্তি তর্ক, অনুভূতিকে ক্লিষ্ট করিয়া একমাত্র প্রশ্ন উঠিতেছে "কঃ পন্থা?" তখন "জাতীয় শিক্ষা সম্মিলনে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর সভাপতির ভার অর্পণ করিয়া আমাকে যে কি গুরুদায়িত্বের মধ্যে ফেলিয়াছেন তাহা আমি নিজের অক্ষমতা বোধের সঙ্গে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

বাণীদেবতার পাদপীঠতলে আপনারা যে হোম-যজ্ঞের আয়োজন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার নেতৃত্বের ভার আমার মত "মন্ত্রহীন" পুজারীর উপর অর্পণ করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির পক্ষে কতদূর অনুকূল পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন অনাগত ভবিষ্যৎই তাহার যথার্থ উত্তর দিবে।

যেখানে "সৃষ্টির" কথা, "গঠনের" কথা সেখানে শুনাবার মত "বাণী" আমার ত নাই! তবে জীবন্ত মানুষের মত আমার সৃষ্টির অহংকার আছে, গঠনের আনন্দ আছে। আমার প্রতিদিনকার জীবন যাপনের মধ্যে দীনতা আছে আমি জানি তবু কেন যে আপনাদের সাদর আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই—তার কারণ সহস্র অক্ষমতার মধ্যেও মানুষ আনন্দ চায়—আপনাদের কাছে আত্মীয়ের মত এসে আমি যে আনন্দের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তার প্রলোভনেই আমি এখানে এসেছি।

দীন আমি তোমাদের কি করিব দান
তবু ভালবেসে মোর বাড়ালে সম্মান,
কিছু নাই তাও জেনে
বুকে যে নিয়েছ টেনে
সেই গর্ব্বে আজি মোর ভরিয়াছে প্রাণ।

জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে, হৃদয়ের সমস্ত কর্ম্মপ্রণোদনা জাগ্রত হ'য়ে বলে "আত্মানং বিদ্ধি" তখন মানুষের পক্ষে ভাবা সহজ হয় যে এ জগতের মধ্যে সে এমন একটা কিছু কর্‌তে এসেছে যা' সে ছাড়া আর কেহ পারবে না। শক্তির স্পন্দন সে দিন তার সারা দেহে সাড়া দিয়ে বলে যায় "তুমি বীর", অনুভূতির প্রাবল্য মনকে জাগিয়ে বলে "তুমি মানুষ।"

আমার মনে হয় আমাদের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে। আজ এই যে আমরা একটা কিছু সৃষ্টি করবার অহঙ্কারে শক্তি অনুভব করছি, আসন্ন সিদ্ধির আনন্দে পাগল হ'য়ে উঠেছি—এর কারণ কি? কোন্ বস্তুর আশায় আজ আমরা গতানুগতিক কর্ম্ম পদ্ধতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নব পর্য্যায়ে জীবনারম্ভের জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছি?

আমরা বুঝেছি যে জীবনটা মান্ধাতার আমলের একখানা প্রস্তরখণ্ড নয় যে তার গতি নাই, প্রাণ নাই। জীবনটা যে একটা অখণ্ড সত্য বস্তুর সার সমষ্টি তা আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি। আমরা বুঝেছি আমরা 'মানুষ', আমাদের প্রাণের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আছে—ঝটিকার প্রাবল্য আছে, আকাশের কম্পন আছে। জীবনের ত সবই গতি, সবই যে শক্তির চঞ্চলতা, আমরা স্থাণু নই। তাই বল্‌ছিলাম যে আমরা আজ জীবনের গতিবেগ প্রাবল্যের মধ্যে, শক্তি বিকাশের চাঞ্চল্যের মধ্যে জেগে উঠেছি। আমরা আজ মানুষের শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করতে চাই। আমরা নিজেকে ফিরিয়ে পাবার জন্য আজ এখানে সমবেত হ'য়েছি। আমরা আজ আপন অভিজ্ঞতায় দেশ জননীকে বলিতে পারি—

সাত কোটি বাঙালীরে হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।

আমরা আজ মানুষ হ'তে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের সমস্ত অধিকার লাভ করতে চাই।—আজ আকাশের দেবতা বাতাসকে তাঁর অগ্রদূত করে' পাঠিয়েছেন—তাঁর অমোঘ আহ্বান "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"! তাই আজ এতদিনের চক কাটা বন্দীদশার বাহিরে এসে আমরা শুধু দাঁড়িয়ে নেই—আমরা চলার পথে গান ধরে চলেছি

"আগে চল আগে চল ভাই"

সত্যকে আমরা চাই, ধ্রুব আমাদের লক্ষ্য—আমরা তাই এখানে সমবেত হয়েছি। সমপ্রাণের অভাব বেদনায় সমস্বরে বল্‌ছি,—"সত্যরে লভিতে চাই, অসত্যরে দলি পদতলে"

যুগে যুগে মানুষ আপনার শিক্ষা দীক্ষার সত্যকে পরমাশ্রয় করে' সিদ্ধিলাভ করেছে—আমরা মিথ্যা শিক্ষায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি; সত্যকে দূরে সরাইয়া মিথ্যাকেই এতদিন প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি।—আজ সত্যকে ফিরিয়া পাইতে হইলে মানুষ হইতে হইবে—মানুষ হইতে হইলে প্রকৃত শিক্ষা চাই।

যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাকেই আমরা জাতীয় শিক্ষা বলি। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—

প্রথমতঃ—জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-

নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্র্য—সেই দারিদ্র্য যাহাতে দূর করা যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালী আমাদের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি—কিন্তু এই সমস্যার মনের মত মীমাংসা আমি এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকে পাই নাই। আমার মতে জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষণ কি তা আমি সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিব।

জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আমাদের দেশে আমাদের দেশবাসী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া চাই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে যে শিক্ষা প্রণালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কোনও মতেই জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে না। আজ যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সম্বন্ধ না থাকিত তবুও আমি ঐ বিদ্যালয়কে কোনও মতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারিতাম না। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—"বিজ্ঞানে কোনও জাত নাই।" তার উত্তরে ঔপন্যাসিকপ্রবর শরৎচন্দ্র বলেছিলেন "বিজ্ঞানে জাত নাই বটে, কিন্তু cultureএ জাত আছে।" আমরা আর একটু এগিয়ে বলতে পারি যে শুধু cultureএ কেন, শিক্ষা প্রণালীতেও জাত আছে। কারণ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যে শিক্ষা প্রণালী এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে না সে শিক্ষাপ্রণালী কখনও সার্থক বা ফলদায়ক হইতে পারে না।

তাই আমি বলিতেছিলাম যে জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আমাদের নিজেদেরই ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়া ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতে হইবে। Froebel Montessori প্রভৃতি পাশ্চাত্য মণীষীগণ যে নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে বহু সময়, উদ্যম ও অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব বড় একটা ফল না পাইলে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

প্রথমতঃ শিক্ষা প্রণালী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ও জাতীয় আদর্শের উপযোগী হওয়া চাই। আমাদের দেশে যে পুরাতন শিক্ষা প্রণালী ছিল তার সহিত আমাদের এই নূতন প্রণালীর যোগ স্থাপন করিতে হইবে। ইংরাজের অধীনে যে শিক্ষা প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে এবং হইতেছে তা' এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শের ধারার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তার ফলে আজ কাল স্কুল কলেজের জন্য সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা মিছা মিছি ব্যয় করা হইতেছে, আদর্শ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষায় আমাদের বিশিষ্ট আদর্শকে চরিতার্থ করিতে হইবে। চরিত্রবত্তায়, জ্ঞানমহিমায়, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমাদের মানুষের মত মানুষ হইতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে ভাবিতে গেলে আর একটি কথা আমাদের মনে পড়ে—সেটা

হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রের কথা। শিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষার কোনও সম্ভাবনা নাই। কারণ, বিভিন্নতার মধ্যে যে অনর্থের উৎপত্তি হইবে তাহাতে আমাদের সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্র স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপনার সকল সন্তানকে যেন ঐকান্তিক স্নেহের সঙ্গে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে। সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, শিখ, পারশী; নির্ধন, কাঙাল সকলেই যেন জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমান স্থান পায়।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণ নিজ ধর্ম্মের বিশিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করিয়া উৎকর্ষ সাধন করিবেন, তাঁহাদের ধর্ম্মগত পৃথক ধারাকে বজায় রাখিয়া তাঁহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইবেন কিন্তু যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে কূলে কূলে মঙ্গল পরিবেশন করিয়া আপন গন্তব্য পথ ধরিয়া একই সাগরাভিমুখে বহিয়া চলে তেমনি নানা ধর্ম্মের নানা ছাত্র আপনার সাধনার পথ ধরিয়া, জগতের মঙ্গল বিধান করিতে করিতে "পথশেষে" একই বিধাতার চরণতলে যাইয়া উপস্থিত হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বিরোধী ভাবের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না—এই সার্ব্বজনীন শিক্ষা-ক্ষেত্রের উপর আমাদের অন্তরের সমস্ত যত্ন অধ্যবসায় এবং সৃষ্টি কৌশল নিয়োগ করিয়া আমাদের এক অভিনব জাতির সৃষ্টি করিতে হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রের আদর্শ হইবে জীবন্ত জাগ্রত মানুষ—অর্থাৎ শিক্ষকমণ্ডলী! বক্তৃতায় নয়, অধ্যাপনায় নয়, তর্কে নয়, যুক্তিতে নয়,—আপনার জলন্ত চরিত্রের মূর্ত্ত উদাহরণের দ্বারা শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে সাহসী, সত্যবাদী, স্বদেশপ্রেমিক, স্বার্থত্যাগী এক কথায় চারিত্র্যমাহাত্ম্যে অতুলনীয় করিয়া তুলিবেন। প্রতি মুহূর্ত্তের প্রলোভন হইতে, দুর্ব্বলতা হইতে, কাপুরুষতা হইতে,—সবার উপর নিরন্তর মনুষ্যত্বের অপমান হইতে ছাত্রগণকে রক্ষা করিবে—গুরুর জীবনাদর্শ!

আমাদের দেশের অনেকের মত যে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক প্রাচীন আশ্রমের অনুরূপ হওয়া উচিৎ।—আমরা সংযমে, দৃঢ়তায়, সাহসে ও জিজ্ঞাসায় প্রাচীন আশ্রমকে অনুসরণ করিব কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান করিবার পক্ষে আমরা যেন উদারতর দৃষ্টি ও গভীরতর সহানুভূতিকে আশ্রয় করিতে পারি।—ধর্ম্মের নামে দেশের নামে বা রাজ-নীতির নামে কোনও প্রকার গোঁড়ামী যেন আমাদের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

দ্বিতীয় কথা—শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধের মধ্যে একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে শুধু cultural training (অর্থাৎ হৃদয় বৃত্তির স্ফুরণ) বা শুধু practical training (অর্থাৎ অন্ন সংস্থানের উপযোগী শিক্ষা) এ মানুষ হওয়া যায় না। ইহার যে কোনও একটিকেই একান্ত করিয়া ধরিলে একদেশদর্শিতার দোষে আমাদের শিক্ষা পঙ্গু হইবে।

মনোবৃত্তির বিকাশ শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষার সঙ্গে হইবে শুধু এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা হইবে। বাঙ্গালীকে যদি মানুষ করিতে হয় তবে শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিয়া চাকুরিজীবী বাঙ্গালীকে চাকুরীর

হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তা' যদি আমরা করিতে না পারি তবে আমাদের বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক ছাত্র পড়িতে আসিবে না। কিন্তু একথাও আমাকে বলিতে হইবে যে practical training এর দ্বারা ছাত্রদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যা'ক্ কলিকাতার Bengal Technical Institute, সেখানে ছেলেদের practical training হয়ত বেশ ভালই হয়, তাতে ক'রে বড় বড় Engineer, বড় বড় Mechanic হ'য়ে ছেলেরা বাহির হয় কিন্তু তাহারা মানুষ হিসাবে কি যে পাথেয় সংগ্রহ করে তাহা ভাবিবার এখন সময় আসিয়াছে।

এই যে শিক্ষা ইহাত কলের শিক্ষা! কিন্তু মানুষের জীবনটা ত Machine (যন্ত্র) নয়,—তার জীবন একটা organism. নানা দিকের বৃত্তিগুলি যদি কলের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া পড়ে, মনের আশা আকাঙ্ক্ষা যদি কলের ধোঁয়ায় অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায় তবে সে শিক্ষা যে শুধু আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করিবে তাহা নহে আমরা তাহাতে বিশ্বের দরবারে চির দিনই কাঙাল হইয়া থাকিব। আমাদের দৈন্য, আমাদের অভাব, আমাদের দুঃখ কোনও দিন ঘুচিবে না।

এই কলের শিক্ষায় মানুষ বড় বড় কল গড়িতে পারে—কিন্তু মানুষ গড়িতে পারে না। শিক্ষার্থী আপনার কৃতীত্বে বৃহদায়তন Factoryতে কাজ করিতে পারে কিন্তু আমরা কি এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য যন্ত্রজীবনের পুনরাভিনয় করিব? যে দুর্ব্বহ "যন্ত্র-জীবন" হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমরা শিক্ষা বিধানের আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছি আমরা কি তাহাকেই আমাদের মতিভ্রমে শ্রেয়জ্ঞান করিব? এই Factory জীবনের যে হলাহল অহর্নিশ উত্থিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করিয়াতুলিয়াছে—আমরা কি তাহাই আবার পান করিব?

তাহা ছাড়া আমাদের দেশে Factoryর সংখ্যা খুব অল্প। শত শত ছাত্র যদি Factoryর উপযোগী শিক্ষা পাইয়া শিক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হয় তবে তাহারা কাজ পাইবে কোথায়? বহু Factory গঠন করা ব্যয় সাপেক্ষ—আমাদের দরিদ্র দেশে তাহা সম্ভবপর নহে। আর এক কথা,—আমরা যদি Factoryর বিধিবদ্ধ কর্ম্মপদ্ধতির নিকট আত্মবিক্রয় করি—সেই ঘড়ির কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত সময়ের বন্ধনে দাসত্ব করি, ধনীদের কৃপাদত্ত পুরস্কার বা রোষদৃপ্ত বিরাগের কাছে আত্মসম্মান বিকাইয়া দিই, তবে আমাদের দাসভাব ঘুচিল কোথায়?

কাজেই আমার মনে হয়—এসব ধারণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে ছাত্রগণ অতি অল্প মূলধন লইয়া আপন আপন গৃহে বা গ্রামে আপনার কর্ত্তৃত্বে গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে আমাদের শিক্ষালয়ে সেইরূপ practical training এর প্রবর্ত্তন হওয়া উচিৎ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—পথ কোথায়? উপায় কি?—পথ আমাদিগকেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, পাথেয় আমাদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমার বলিবার কথা এই যে—এই গৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে স্থানীয় অবস্থার উপর। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা নির্ভর করিবে প্রত্যেক স্থানের আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্য-

সম্ভাবের উপর। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক কৃষি বিভাগ—যে স্থানে আঁখের চাষ প্রভূত পরিমাণে হয়—সেখানে চিনি প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী শিখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের একটা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যেখানে রেশমের চাষ হয় সেখানে ২।৪টা করিয়া রেশমের কারখানা করা, নানা রকমের কাপড় প্রস্তুত এবং রং করা ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ভিজাগাপাটম অঞ্চলে Nuxvomica গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সব গাছ সস্তা দরে বিদেশে রপ্তানী হয়; সেখানে তাহার নির্য্যাস হইয়া ঔষধাকারে আমাদের দেশে আসে—আমরা দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে তাহা ক্রয় করি। যদি এই সব স্থানে ছোট ছোট Laboratory বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার খোলা যায় এবং Nuxvomicaর নির্য্যাস প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি শিখানো যায় তাহা হইলে সহজেই ছাত্রদের অন্ন সংস্থানের একটা উপায় হইতে পারে। আপনারা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় মৃত গো মহিষ ফেলিবার একটা ডাঙ্গা (পতিত জমি) বা ভাগাড় আছে। সেখানে রাশিকৃত হাড় শিং পড়িয়া থাকে—বিদেশী বণিকের অর্থে পুষ্ট ব্যাপারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান দেয়। কিন্তু এই শিং হইতেই চিরুণী, বোতাম এবং পরিত্যক্ত অংশে সিবিধ প্রস্তুত হইতে পারে। এসব স্থানীয় ব্যাপার—স্থানীয় লোকেরা এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের কুসংস্কার ইহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী—সমাজপতি হয়ত রোষকষায়িত লোচনে দরিদ্র গরুর হাড় বা শিং সংগ্রহকারীকে কঠোর শাস্তি দিবেন। এই সব অন্ধ বর্ব্বরতাকে আমল দিলে চলিবে না।

তার পর যেসব স্থানে নারিকেল অধিক পরিমাণে জন্মায় সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। Central Jailএ দেখিয়াছি অনেক আন্দামানী রাজনৈতিক বন্দী নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুন্দর দড়ি, মালা প্রভৃতি কারুকার্য্য করিতে পারিতেন। নারিকেলের মালা হইতে বোতাম তৈয়ারী শাঁস হইতে তৈল উৎপাদন করিবার প্রণালী অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারা যায়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পাগার থাকিলে, ছাত্রেরা সাহিত্য, চারুকলা, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে। তদ্রূপ পিন, নিভ, ক্লিপ, কলম, পেন্সিল, কালি প্রভৃতি অনেক ছোট ছাট সামগ্রী প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি আমরা ছাত্রদের শিখাইতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা সহজেই করিতে পারিব। ছোট ছোট শিল্পাগার ও কারখানায় স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া অবশিষ্ট সময়ে মনোবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য ধর্ম্ম, সাহিত্য, চারুকলা, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা ও গবেষণায় মানুষ আপনাকে নিয়োজিত করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে।

জাতীয় শিক্ষার আর একটি অঙ্গ হইবে ছাত্রগণের সৎ প্রবৃত্তির সাহচর্য্য করা, উৎসাহ প্রদান করা। যে ছাত্রের মনের সদ্‌গতি যে দিকে তাহাকে সেই দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন—যথা, আর্ত্তের সেবাশুশ্রূষার জন্য

সমিতি গঠন, দরিদ্রের সাহায্য কল্পে অনাথ ভাণ্ডার স্থাপন, দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামাগার, অর্থনীতি শিক্ষার জন্য সমবায় প্রথায় ছোট ছোট কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য শিক্ষালয়ে ছাত্রগণের উপর তাহাদের সম্পর্কিত নানা কাজের ভার অর্পিত থাকে ইহাতে স্বাধীন ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে বিকশিত হয়। তাহাদের ক্লাব, পাঠাগার, পুস্তকালয়, প্রভৃতি ছাত্রসংঘের যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভারই তাহাদের হাতে,—ভবিষ্যতে তাহারা যখন নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে তখন কোনও মতেই কোনও কাজের দুরূহতা তাহাদের বাধা দিতে পারে না—অধিকন্ত কর্ম্ম কুশলতায় তাহারা প্রত্যেক কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করে।

মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছাত্রগণ যাহাতে হাতের কাজের নিপুণতা শিক্ষা করিতে পারে এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে করুন আপনার ছাত্র মনের উৎকর্ষ লাভ করিল—তাহার মানস চক্ষে এক দিন প্রকৃতির এক অতি রমণীয় দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিল—তরুণ প্রাণের মধ্যে এই নয়নাভিরাম দৃশ্যটি এক অভিনব অনুভূতির সঞ্চার করিল—ছাত্র যদি এই সময় আপনার হাতে চিত্রকলার দ্বারা নিজের মনোভাবকে আকার দিতে পারেন, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দ তিনি বোধ হয় আর কিছুতেই পাইবেন না। 'মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যদি হস্ত পরিচালনা (manual training) না শেখেন তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষা কখনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। হস্ত পরিচালনা বা manual training খুব সহজ উপায়ে হইতে পারে। তাঁরা যদি কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে শেখেন তাহা হইলে সৃষ্টি করিবার যে আনন্দ সেই আনন্দ তাঁহারা পাইতে পারেন।

এইবার শিক্ষা প্রণালীর কথা কিছু বলিতে চাই।

আমরা শিক্ষা ব্যাপারে এতদিন শুধু পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণ করিয়া আসিতেছি, প্রাচীন ভারতবর্ষকেও, আমরা এতদিন কোনও প্রকার আমল দিই নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষকে লক্ষ্য করিয়া যে আমি অনুকরণের কথা বলিলাম তাহা যেন কেহ মনে না করেন। পাশ্চাত্য আপনার প্রকৃতি প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যকে সম্মুখে রাখিয়া আপনার শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য স্বভাবে, প্রয়োজনে, আদর্শে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—অথচ আমরা সে কথা না বুঝিয়া আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া শুধু অবিদ্যাকে শিক্ষা করিয়াছি। সেই জন্য পাশ্চাত্যের "ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দ মনে ইক্ষু চর্ব্বন করিতেছে, বাঙ্গালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধ মাত্র বেত হজম করিতেছে; মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোন রূপ মসলা মিশান নাই।"

"তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটি সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গ সন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই B. A M. A. পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই

গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।—তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথাবার্ত্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মত নহে। সেই জন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি। ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। * * * আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণ শক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।"—কিন্তু এই মানসিক শক্তি হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালীকে এড়াইতে হইবে।

কি করিয়া শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংযোগ বিধান করিতে পারা যায় ইহাই এখন শিক্ষা-ধুরন্ধরগণের সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ। কি উপায়ে শক্ত জিনিষ বোঝান যায়, কি উপায়ে বোকা ছেলেদের বোঝান যায়, বুঝাইবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় কি, স্মৃতিশক্তি কি উপায়ে বৃদ্ধি করা যায়—এই সব প্রশ্নের সমাধান পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সব চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার ফলে **Kindergarten** প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে—এই সব চেষ্টার ফলে Montessori Froebel প্রভৃতি শিক্ষাধুরন্ধরগণ শিক্ষার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অন্য দিকে Experimental Psychology (পরীক্ষা মূলক মনোবিজ্ঞান) নির্ণয় করিতেছে—কি উপায়ে সারাদিনের কাজগুলি একটির পর একটি করিয়া পর্য্যায় ভুক্ত করিলে কর্ম্মশক্তি বাড়ে—অথচ অবসাদ আসে না—শ্রেণী বিভাগের নৈপুণ্যে কি করিয়া কাজের সময় বৃদ্ধি করা যায়, কোন্ ছাত্রের কতখানি পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, কাহার কোন্ কাজে মতি বেশী—এই সব গবেষণার ফলে শিক্ষা সমস্যার একটা মীমাংসা হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য আমার মনে হয়—আমাদের দেশের প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া এবং দেশের আদর্শ, আশা, আকাঙ্খার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আমাদেরও নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

কোন্ প্রণালী আমাদের দেশের উপযোগী হইবে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বোলপুর ও গুরুকুল বিদ্যালয়ের মত বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করুন, এক দিন বাঙ্গলায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তিত যে কোনও প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া গৃহীত হইবে।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এখনও বলিতেছি আমাদের এতদিনের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। জীবনের অর্দ্ধেক সময় গেল বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে, আর নোট মুখস্ত করিতে। কাজেই "শিশুকাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে দক্ষিণে বামে দৃকপাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া" যখন ডিগ্রী লাভ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাই তখন দেখি ডিগ্রীর সঙ্গে অনেক জিনিষের ব্যাসাতি করিয়াছি। প্লীহা যকৃত চক্ষুরোগ অম্লদোষ সব লইয়া আত্মচিন্তা করিতে করিতে পিছনে

তাকাইয়া দেখি এতদিন উলুবনকে সাগর ভাবিয়া বৃথাই মনকে প্রবোধ দিয়াছি।

অনন্ত পারং কিল শব্দশাস্ত্রং

শুষ্ক মাটির উপর সাঁতার কাটিয়া দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; বুকে হাঁচড়াইয়া যেটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে লাভ ত কিছু হয়ই নাই উপরন্তু বুকে হাঁটার মজুরি পর্য্যন্ত পোষায় নাই।

কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া দেখি আমার মূল্য সেখানে দিনে ৵৫ পাঁচ পয়সাও নয়—নিজের নিত্য নৈমিত্তিক অভাবের সহিত যে যুদ্ধ করিব সেটুকু শক্তিও আমার এ শিক্ষায় লাভ হয় নাই! দেহের দৈন্য মনের দুর্ব্বলতা সংসারের মধ্যে শুধু নৈরাশ্য, শুধু বিক্ষোভ আনিয়া দেয়!

আর একদিকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ শিক্ষার ফলে জীবনে প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস সহ্য করিতে হয়। "যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারি অতি কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে" ছেলেদের শিক্ষা হয়। "ইহাতে কি সে ছেলেদের কখনও মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্ত কালে নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া—কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে শেখে না?"

বাস্তব জীবনের সঙ্গে যেমন আমাদের শিক্ষা প্রণালীর কোনও সম্বন্ধ নাই—সেইরূপ প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে আমাদের তেমন সদ্ভাব নাই। অতএব—"বালকের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি যখন সতেজ তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা ভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত রাখিও না। স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্য্যাস্ত দীপ্ত, সৌম্য, গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক্। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রস বিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মত তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জ্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষনের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র দিগন্ত ব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্য্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।"

তাহা হইলে দেখিবে নবজীবনের অফুরন্ত বিকাশের মধ্যে অবসাদ ও নিরানন্দ স্থান পাইবে না—আমরা সত্যকেই শুধু দেখিব—আনন্দকেই অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিব।

আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি—আমাদের এখানকার কর্ম্ম শুধু সত্যকে লাভ করিবার জন্য,—বিশ্ববিধাতার বিশ্বকর্ম্মের এ

একটা অঙ্গ মাত্র, তাহা হইলে তাঁরই কল্যাণ-আলোকে আমাদের সকল সৎকর্ম্ম সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

আমাদের এই শিক্ষায় যে মানুষ গড়িয়া উঠিবে সে সত্যকে আশ্রয় করিবে আনন্দকে লাভ করিবে, প্রকৃতিকে মাতৃপদে বরণ করিবে, দেশকে ভালবাসিবে—বিশ্বমানবকে পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে।

এই সব মঙ্গলের আসন্ন আবির্ভাবের সময় আমাদের দেবতা অসীম আকাশ তলে তাঁর আশীর্ব্বাদী নিশ্মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—মাভৈঃ।

জীবনের অধিকার

[শ্রীসুবোধ রায]

জীবনের অধিকার—আছে কার ? আছে কার ?
প্রাণ দিতে পারে যেই, মান যদি থাকে তার।
সত্যের ভক্ত যে শক্তের ভক্ত না
সত্যের তরে যেই হেসে সহে লাঞ্ছনা।
মিথ্যারে করি নাশ হেসে গলে পরে ফাঁস
তা'রে রোধে, তা'রে বধে, এ শকতি আছে কার ?
বুক ফাটে তবু যা'র মুখে ব্যথা ফুটে না
দুঃখের গুরুভারে শির যার লুটে না
মরণের বরণেতে মন যা'র উঠে মেতে
সঞ্চিত অন্তরে শক্তির সুখ তার।
মা'র মত ভালবাসে আপনার দেশটা
মা'র মান রাখিবারে প্রাণপণ চেষ্টা
অবিচার অপমান হানে বুকে বিধবাণ
বিশ্ব বিজয়ী তা'র সত্যের তরবার।
ধৈর্য্যের বীর্য্যের শৌর্য্যের মহাবট
অপগত শঙ্কা অন্তর অকপট
ধনী দীন সমজ্ঞান সবে করে স্নেহ দান
তা'র তরে খোলা আছে বিশ্বের দরবার।

যুগে যুগে শয়তান মারে তারে কতবার
মরিয়াও মরে না সে ফিরে আসে বারবার
নবরূপে নববেশে ফিরে আসে হেসে হেসে
আত্মার হোম শিখা বিভূতি সে বিধাতার।

সাহিত্যে সুপ্ত চৈতন্য

[শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়]

[বিপর্য্যস্ত প্রবৃত্তি]

বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের সহিত সাহিত্য সমালোচনার আপকাটি বদলাইয়া যাইতেছে। সমালোচনা-বিজ্ঞান অচিরেই যে নূতন পথে অগ্রসর হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষের যে সকল সুপ্ত, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহার মনোজীবনের গঠন ও বিকাশের মূল, সেগুলিকে বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখন নূতন চক্ষে দেখিতেছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি কখনও স্বতন্ত্রভাবে কোন এক উদ্দেশ্যে কাজ করে না। প্রাকৃতিক জগতের অণুপরমাণুগুলি যেমন সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তির আধার হয়, সেইরূপ কতকগুলি বৃত্তি, এক একটি দলে সজ্জিত হইয়া মনোজগতের শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ হয়। ঐ দলে যে প্রবৃত্তিটি প্রধান ও প্রবল তাহার দ্বারাই কর্ম্মের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য প্রবৃত্তিগুলি সুপ্ত থাকে অথবা পরাজিত হইয়া আপনার ব্যর্থতায় লক্ষ্য শূন্য হইয়া গভীর আঁধারে ধাবিত হয়। মানুষের অন্তর্জীবনের এই গভীর আঁধার দিকটার উপরে আলোকপাত, যাহা ফ্রয়েড, ইউং প্রভৃতির আবিষ্কারের ফল,—আমাদের [illegible] সাহিত্য, ধর্ম্ম, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে।

মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হইলে তাহারা অনিশ্চিত ও উদ্দাম ভাবে বিপরীত পথে মানুষকে চালায়, এই তত্ত্ব আমরা যে শুধু মনোবিজ্ঞান চর্চা হইতে পাইতেছি তাহা নহে, সাহিত্যের নানা সৃষ্টির মধ্যে আমরা তার পরিচয় পাই। বর্ত্তমান উপন্যাসে যতই মানুষের চরিত্র জটিলভাবে অঙ্কিত হইতেছে ততই আমরা সুপ্ত ও নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। ইউরোপে ডষ্টয়ভেস্কির বৃহৎ উপন্যাসে ও ষ্ট্রীণ্ডবর্গের ক্ষুদ্র নাটকে যাহার সূচনা হইয়াছিল তাহার হামসেনের 'ক্ষুধা' উপন্যাসে সম্যক পরিণতি দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর চরিত্রের দুর্দ্দমনীয় আবেগে আমরা বিফল আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণীপাক দেখিতে পাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনেও আমরা নির্জ্জিত যৌবনক্ষুধার অশোভন প্রলয় মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সাহিত্যিকদিগের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে

মানুষের জীবনের অসামঞ্জস্য দুর্বিপাক যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে আর কাহারও রচনায় তাহা হয় নাই। জীবনের ঘটনাপরম্পরায় সহজ সরল প্রবৃত্তি আপনার স্বাধীন স্ফুরণের আধার হইতে বঞ্চিত হইয়া মানুষকে যে কত বিচিত্রভাবে বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত, এমন কি উন্মত্ত করিয়া তুলে, তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পাই। শরৎ চট্টোপাধ্যায় এই হিসাবে মানুষের অন্তর্জ্জীবনের সেই অজানা গভীর আঁধারের পুরোহিত, লক্ষ্য ভ্রষ্ট বাসনা অকূল গরল পাথারে মানুষকে যে অহরহ ডুবাইতেছে, তাহার প্রধান শিক্ষক।

প্রবৃত্তির রূপান্তর

কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত সমাজ-জীবনের সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া মানুষ অনেক সময়ে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে চাহে। তাহাও সাহিত্যে নানা সুন্দর রচনার কারণ হইয়াছে। নিষ্পেষিত প্রবৃত্তির ধীরে ধীরে রূপান্তর মানুষের চরিত্রকে কত মহান কত মধুর করিয়া তুলে। বাংলা সাহিত্যে ইহার সুন্দর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাহিরে' মক্ষী রাণীর চরিত্রের বিপরীত ভাবের সমাবেশ—দুর্জ্জয়বৃত্তির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বিমলা হঠাৎ মাতৃত্বের উদ্বোধনে কি মহীয়সী হইয়া দাঁড়াইল! বাংলার উপন্যাসে সেবা ধৈর্য্যের যে সকল সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে প্রায় সবগুলিতেই মানুষের প্রবৃত্তির বাধাবিঘ্ন হইতে বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে রূপান্তর লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কমলা, শ্রীনিরুপমা দেবীর দিদি, শ্রীইন্দিরা দেবীর উমা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজলক্ষ্মী, বিন্দু, পার্ব্বতী ও চন্দ্রমুখী ও জলধর সেনের অভাগী প্রভৃতিতে অভিমান ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া কেমন তীব্র মধুর সেবা, স্নেহ ও করুণার ভাব ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে।

রুশ সাহিত্যে নির্জ্জিত প্রবৃত্তি

বিশ্ব-সাহিত্যে রুশ উপন্যাসই মানুষের অন্তর্জ্জীবনের সুপ্ত ও নির্জ্জিতের মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষক ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছে। কারণ রুশ সমাজের মতন অমন অন্তর্বিরোধী সমাজ হয় নাই, রুশের মতন অমন সামাজিক জীবও জগতে দুর্লভ। গভীর অন্ধকারে লুক্কায়িত দুর্দ্দমনীয় শক্তি যাহা প্রকাণ্ড অজগরের মত রুদ্ধ বীর্য্য তাহাকে রুশ সাহিত্য জাগরণের ক্ষেত্রে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার বিষম শ্বাস প্রশ্বাস ও বিষ উদ্গীরণে শুধু রুশিয়া কেন, সমগ্র জগৎ আজ ভীত, ত্রস্ত।

অপরদিকে রুশ সাহিত্যে যে সুষমা ও সৌসামঞ্জস্যের অভাব তাহাকে ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য একটা বিশিষ্ট আকার দান করিয়াছে তাহার কারণও সেই অনিশ্চিত, প্রবল, সুপ্ত চৈতন্যের প্রভাব। তাই একদিকে যেমন আধুনিক মানুষ বর্ত্তমান সভ্যতাকে একটা অসহ্য বিকার মনে করিয়া ভবিষ্যতের নানারূপ সুখকর কল্পনার মোহে ও সৃষ্টিতে মুগ্ধ, অপরদিকে নিষ্পেষিত ব্যক্তিত্বের একটা প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব ঘোষণা রুশ সাহিত্যে লাভ করিয়া তাহার পক্ষপাতী।

জীবনে যত কম স্বাভাবিক বৃত্তির বাধা তাহার বিচিত্র বিকাশ ততই ব্যক্তিত্বের পরিণতি—এই সত্য সমাজ ও অর্থবিজ্ঞানেরও মূলভিত্তি। ইহার সম্যক উপলব্ধি এখনও হয় নাই। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীতের দিক হইতে মানুষের ক্ষোভ ও উত্তেজনা নহে,

তাহার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার রূপান্তর ও সম্যক পরিপাক ও পরিণতিই লক্ষ্য বস্তু।

আত্মবিদ্রোহ বনাম আত্ম প্রতিষ্ঠা

নদীর 'ব' প্রদেশে লালিত পালিত তরলমতি বাঙালীর ভাবপ্রবণতা সাহিত্যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহের উপকরণ খুব জোগাইয়াছে। সুপ্ত বৃত্তিকে বিপথে প্রেরণ না করাইয়া সৎপথে সমাজের কল্যাণকর ধারায় ধাবিত করা শিক্ষকের প্রধান কাজ। সে শিক্ষার ভার বাংলা সাহিত্য লয় নাই। তাই সাহিত্য লালসার রঙে রঙীন হইয়া আলেয়ার মত দুর্গন্ধময় জলাভূমির পথে জাতিকে দিশেহারা করিয়াছে। উত্তেজনা বা বিদ্রোহের দিকটাও মানুষের অন্তর্নিহিত বাধাপ্রাপ্ত বৃত্তি সমুদায়ের পরিচয় হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বের সমগ্রতার পরিচয় দেয় না। একটা বিপুল প্রলয়ঙ্কর ক্ষোভ যাহা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে নাড়া দেয়, তাহার পরিচয় পাই না, শুধু একটা দিকের উত্তেজনা সেই দিক হইতে ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তন করে। অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে তাই হমসেনের 'ক্ষুধার' আকাশ পাতাল প্রভেদ। দিবাকরের সহিত পাপ ও শাস্তির নায়কের তুলনা হয় না। সহাজয়ার আত্মকথার সহিত শ্রীকান্তেরও সেইরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। বিদ্রোহ ও সমগ্র জীবন ধরিয়া হয় না, রূপান্তরও হয় না।

অথচ আজ দেশে চিন্তার নানাদিকে যে নিরাশা ও ব্যর্থতা মুখ ব্যাদান করিয়াছে তাহা আমাদিগকে নিরন্তর কতনা অজ্ঞাত বিরোধ, কত না সুপ্ত অন্তঃবিদ্রোহের উপকরণ জোগাইতেছে। এই অদম্য বিদ্রোহী শক্তিকে মোহ ও কল্পনা ও বস্তুতন্ত্রহীন সৃষ্টির মায়াজাল হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ববিকাশের কল্যাণকর উদার পথে নিয়োগ করা—বাংলা সাহিত্যের প্রধান কাজ। আর এই কাজে আমাদের সাহিত্য বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান হইতে যেমন নব নব তথ্য তেমনি বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে নব নব প্রণালী লাভ করিবে।

"মানুষ হিংসার বশে যুদ্ধ করিবার সময়েও নারীজাতি ও শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করে না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ব্যতিক্রম কারীর ক্ষমা নাই—ধ্বংসই তাহার একমাত্র পরিণতি!"

সংশয়

[শ্রীসরসীকান্ত দত্ত]

প্রদীপখানি যখন তোমার হাতে
ছিল উজল ছিল জ্যোতির্ম্ময়,
কি ভয় ছিল গভীর আঁধার রাতে
ছড়িয়ে গেছি বিপুল বিশ্বময়!
অসীম আকাশ স্তব্ধ তন্দ্রাহারা
আমার পানে রৈত চেয়ে সে;
হাজার আঁখির পলকবিহীন সাড়া
প্রাণের মাঝে রৈত নিমিষে!

প্রদীপখানি এখন তোমার হাতে
চ'খে আমার হয়েছে মলিন;
আঁধার পথে চল্‌ছে সাথে সাথে
ভয়-ভাবনায় আশা আমার ক্ষীণ।
অজগরের নিশাস লাগে গায়,
উষার আলোয় রক্তনিশান জ্বলে;
মরুভূমির বুকের বেদনায়
বিশ্ব আমার মূর্চ্ছে পলে পলে।

মঞ্জরী

বিজ্ঞান।

হাসি হইতে চরিত্র নির্ণয়

একজন মানুষ যে ভাবে হাসে তাহা দেখিয়া সে কোন্ চরিত্রের লোক তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়।

কিছুদিন হইতে ইটালীর একজন অধ্যাপক এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া সম্প্রতি উক্ত অভিমতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। হাতের লেখা দেখিয়া যদিও অনেক সময় লোকের চরিত্র পড়া সম্ভব, তথাপি তিনি বলেন, হাসি হইতে এ বিষয়ে আরও স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছানো যায়।

খোলা মেলা হাসিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সে হাসিতে হা-হা-হা ক'রে শব্দ হয়। যে লোক এমনি হাসিতে পারেন, তিনি বেশ সরল চিত্ত, তাঁর মনের কোথাও এতটুকুও কালো মেঘ নাই। আর যে লোকের হাসিতে হে-হে-হে শব্দ হয় তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে তাহার মনটা সরল নয়, একেবারে অপ্রসন্ন।

অব্যবস্থচিত্ত বা হালকা লোকের হাসিতে হি-হি-হি শব্দ হয়। এ রকম শব্দ হইলেই বুঝিতে হইবে সে লোক অত্যন্ত তরল, কোন কাজেই তার দৃঢ়তা নাই। আর যাহারা হো-হো-হো করে হাসে তাহারা দৃঢ়চেতা এবং যাহা করিবে একবার মনে করে তাহা না করিয়া ছাড়ে না। ইহাদের মনের জোর যথেষ্ট আর ইহারা বড়ই সরল উদার প্রকৃতির লোক হইয়া থাকে।

হু-হু-হু সব চাইতে খারাপ হাসি। এমনি ভাবে যাহারা হাসে তাদের কখনো বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের স্বভাব অত্যন্ত খারাপ।

হাসির শব্দ হইতে যখন লোকের স্বভাব টের পাওয়া যায়, তখন কি ভাবে কে হাসে তাহার দিকে মন দেওয়া উচিত। কেননা হাসি হইতে ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব ধরা পড়িয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় হাস্য করিতে যাইয়া দুনিয়ায় হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সুতরাং স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে হাসিতে ও হাসাইতে হয়।

যাহারা কখনও হাসেনা তাহাদের নিকট হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

বৈচিত্র্য।

নিজেই নিজের ঠাকুর্দ্দা

বেশ্ৰ ফ্রজোনি জেপলাদের জনৈক নাবিক। এই লোকটি নিজেই নিজের ঠাকুর্দ্দা হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমি এক বিধবাকে বিবাহ করি, এই বিধবার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসে একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম সিলাভিয়েচা। আমার পিতা এই বালিকার প্রেমে পড়েন, এবং তাহাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এই রূপে বাবা আমার জামাতা হইলেন এবং সৎকন্যা আমার মা হইল। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিলে খোকা হইল বাবার সংভাই এবং আমার বিমাতার ভাই। কিন্তু কেবল তাই নয়, কিছুদিন বাদ বাবার স্ত্রী (দ্বিতীয়) একটি ছেলে প্রসব করিল। সে হইল আমার ভাই এবং আমার মেয়ের ছেলে। আমার স্ত্রী হইল আমার দিদিমা, কেন না সে হইল আমার মায়ের মা। তাই আমি আমার স্ত্রীর এক দিক দিয়ে স্বামী ও অপর দিকে দৌহিত্র। অবশেষে সেই দিদিমার স্বামী বলিয়া আমি স্বভাবতঃই আমার ঠাকুর্দ্দা "সম্মিলনী"

সূক্ষ্মতার হিসাব

একটা চুল কতটা সরু তা মাপতে দিলে আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসব। কিন্তু গড়ে একটা চুল—এক ইঞ্চির ছয়শ ভাগের এক ভাগ।

সাধারণ পকেট ঘড়ির "হেয়ার স্প্রীং" চুলের চাইতে অৰ্দ্ধেক সরু।

এক টুকরা খাঁটি সোণা পিটিয়া এত পাতলা করা যায় যে অমনি তিন লক্ষ পাত উপরে উপরে রাখলে তবে এক ইঞ্চি পুরু হয়। আড়াই তোলা সোণা থেকে এত সূক্ষ্ম তার হ'তে পাবে, যে সেটা পঞ্চাশ মাইল লম্বা হবে। আর আধমণ সোণা থেকে অমনি সরু

তার নিম্নে মোটা পৃথিবীটা বেড়ন দেওয়া চলে।

সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ সব চাইতে পাতলা। হিসাব করে দেখা গিয়েছে উহা এক ইঞ্চির ত্রিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

"স্বরাজ"

জীবন্ত আলো

ব্রাজিলে কোকুজাস্ নামক এক রকম পোকা আছে। ইহাদের গাত্র হইতে বাতির ন্যায় বেশ পরিষ্কার আলো বহির্গত হয়। ব্রাজিলের আদিম অধিবাসীরা ঐ রকম কতকগুলি কোকুজাস্ ধরিয়া কাচের জারের মধ্যে পূরিয়া বাতির কাজ চালাইয়া দেয়। জনৈক পরিব্রাজক বলেন, একটি কোকুজাস্ পোকা পুস্তকের পাতার উপর রাখিলে অনায়াসে সেই পাতা পড়া যায়। ব্রাজিল দেশের নারীরা এই কোকুজাস্ পোকাকে গহনার ন্যায় ব্যবহার করে এবং তাহাদের পরিহিত বস্ত্রাদিতে অনেকগুলি করিয়া ঐ পোকা আটকাইয়া দেয়।

গোল আলুর উপকারিতা

আইরিশরা অতিরিক্ত মাত্রায় গোল আলু খায় বলিয়া তাহারা বাতে আক্রান্ত হয় না।

অতিকায় ঘণ্টা

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টা জাপানের ওসাকা সহরে আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ষোল হাত, আর ওজন প্রায় পাঁচ হাজার চারি শত মণ।

সুবৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ

আমেরিকার নিউইয়র্ক, ভারতবর্ষের মান্দ্রাজ ও বেলজিয়ামের এণ্টোয়ার্প সহরে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কৃত্রিমহ্রদ আছে, এইসকল হ্রদে জলচর জন্তু রক্ষিত হয়। লণ্ডনে এরূপ একটাও হ্রদ নাই।

সাগর জলের লুণ

আটলান্টিক মহাসাগরের সওয়া সাতাইশ মণ জল হইতে এক মণ আধ সের লুণ পাওয়া যায়; প্রশান্ত মহাসাগরের সওয়া সাতাইশ মণ জলে সাড়ে উন চল্লিশ সের আর মরু সাগরের সওয়া সাতাইশ মণ জলে দুই মণ সাড়ে তের সের লুণ পাওয়া যায়।

সবচেয়ে মোটা ছেলে

পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে মোটা ছেলে হইতেছে লোন ন্যাসন। তাহার বয়স প্রায় ১৫।১৬ হইবে, কিন্তু সে ওজনে ৫ মণ দশ সের। তাহার কোমরের মাপ ৬৯ ইঞ্চি, ছাতি ৬৯ ইঞ্চি। টমাস্ সাবিন নামক আর একটি মোটা ছেলের সন্ধান মিলিয়াছে, ইহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার ওজন ছিল প্রায় দুই মণ।

কৃত্রিম মুক্তা

লণ্ডনের বড় বড় জুয়েলারগণের মধ্যে সম্প্রতি খুব একটা বড়রকমের হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। মেসার্স কে, মিকিমোটা নামক এক জাপানী কোম্পানী লণ্ডনে এক প্রকার কৃত্রিম মুক্তার আমদানি করিয়াছেন। সে মুক্তাগুলি কোন অংশেই স্বাভাবিক মুক্তা অপেক্ষা হীন নহে, সর্ব্বাংশে সমতুল্য। কোম্পানী বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিধিমতে পরীক্ষা করা গিয়াছে যে, এই মুক্তা একেবারে সকল রকমেই স্বাভাবিক মুক্তার ন্যায়।

বৃহত্তম পক্ষী

অনেকের হয় ত ধারণা আছে যে, ঈগল বা অষ্ট্রীচ পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পক্ষী। আরব্য উপন্যাসে রক নামক এক প্রকার বৃহৎ পক্ষীর কথা পাওয়া যায়। কিন্তু জগতে হস্তী অপেক্ষাও বৃহত্তর এক

প্রকার পক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষীর নাম "মেয়া।" এই জাতীয় পক্ষী উড়িতে জানিত না বলিয়া ইহারা এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভূগর্ভ হইতে ইহাদিগের কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া ইহাদের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

"সম্মিলনী"

খবরাখবর।

নব-যৌবন লাভের জন্য অস্ত্র-প্রয়োগ

নব-যৌবন লাভের জন্য যে নূতন অস্ত্র-প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে অস্ত্র-প্রয়োগ হইয়াছে। ভারতে এইরূপ ধরণের অস্ত্র-প্রয়োগ এই প্রথম। ডাক্তার কে, এস, রায় এই অস্ত্র-প্রয়োগ করেন। রোগীর অবস্থা ভাল এবং তাহার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। "সম্মিলনী"

কিণ্টন গ্রামের স্ত্রীলোকগণ চর্ব্বি রাখিয়া প্রথমে নিজেদের বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য সাবান প্রস্তুত করিত। এখন সমগ্র গ্রামের সাবানই তাহারা সরবরাহ করে।

* * *

প্রত্যেক আড়াই বৎসর পরে একবার একমাসে দু'বার পূর্ণিমার মিলন ঘটে।

* * *

হাঁস পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।

* * *

সাধারণতঃ একটি সুস্থ ব্যক্তি প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত জলের নীচে থাকিতে পারে। কিন্তু ১৯১২ সনে এক ফরাসী প্রায় সাড়ে ছয় মিনিট পর্য্যন্ত জলের নীচে ছিল।

* * *

দেখা গিয়াছে, ফরাসীদেশে এক বৎসর বয়সের মধ্যে প্রতি চারিটিতে একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

* * *

ঝিনুকের পরমায়ু দশ বৎসর পর্য্যন্ত।

* * *

পৃথিবীতে ২৩,৫১২ খানা বাষ্পীয় পোত এবং ৫,০৮২ খানা অর্ণবপোত আছে।

* * *

স্বামীকে আগুনে ফেলিয়া দিতে ধাক্কা দিয়াছিল বলিয়া কুড়িফের একটি স্ত্রীলোক আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্ত্রীটি রসময়ী বটে! স্বামীকে বোধ হয় জ্বালানী কাঠ মনে করিয়াছিল।

* * *

আজ পর্য্যন্ত এক হাজার রকমের গমের কথা জানা গিয়াছে।

* * *

সমুদ্রের প্রতি বর্গ মাইলে বার কোটি মাছ আছে।

* * *

মানুষের সাথে মক্ষিকার দেহের তুলনায় মক্ষিকারা পঁচিশ গুণ জোরে চল্‌তে পারে।

* * *

রুষে ইউরোপের যে কোন দেশের চাইতে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী—অথচ পুস্তকের দোকানের সংখ্যা সব দেশের চাইতে বেশী।

* * *

জাপানে রাত্রি বেলায় কোন বাড়ীর কুকুর ডাক্‌লে—বাড়ীর কর্ত্তাকে পড়শীর ঘুমের শান্তি হরণের শাস্তি স্বরূপ পর দিন তার বাড়ী গিয়ে বেগার খেটে দিয়ে আস্‌তে হয়।

ইয়র্কশায়ারের কয়লার খনির মজুরেরা তামাকের পরিবর্ত্তে কয়লা চিবিয়ে খায়! খবর পাওয়া গিয়াছে একজন মজুর অতিরিক্ত কয়লা চিবানোর দরুণ মারা গিয়াছে!

* * *

এক ভদ্রলোক একটি "টাইপরাইটার বানিয়েছেন—তার ওজন মোট এক আউন্স এতে মোটে একটি চাকা—আর রবারের গুটিকয়েক হরফ আছে। হাতের আঙুল ও কাগজের মাঝখানে রেখে ওটাকে চালান হয়। এটাকে লিলিপুটদের দেশে পাঠালে মন্দ হয় না। "স্বরাজ"

ভাববার কথা

বধূ-নির্য্যাতনের পালা।

১। ফরিদপুর

সার্ভেণ্ট পত্রে প্রকাশ, ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারের জনৈক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্র তাহার বালিকা বধূকে শ্বাশুড়ীর নিকট হইতে টাকা আনাইবার জন্য বলে। ইহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে বালিকাটীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সে বেত মারিতে থাকে। স্বামীর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে বালিকাটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই বালিকার ভাসুর একজন উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনিও নাকি এই অত্যাচারের সমর্থক। ইহার পর সেই গুণধর স্বামী বালিকার-সর্ব্বাঙ্গে কেরো-সিন ছিটকাইয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। আগুন জ্বলিয়া উঠা মাত্র বালিকার জ্ঞান হয়। তখন সে প্রাণ ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। পাড়াপড়শীরা সাহায্য করিতে আসিলে উক্ত প্রধান শিক্ষক নাকি তাহা-দিগকে বাধা দেয়। যাহা হউক, গত ২রা তারিখে হতভাগিনীর জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। এই ব্যাপারে পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

২। পাবনা

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

পাবনা জেলার অন্তর্গত————গ্রামে বাবু————র বাস। তাহার পারিবারিক লোকের মধ্যে তাহার স্ত্রী, বিধবা জ্যেষ্ঠা এক ভগ্নি ও মাতাঠাকুরাণী। উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঐ জেলাস্থই——গ্রাম নিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত বংশের জনৈকা মেয়ের সহিত বিবাহ হয়। ঐ ভদ্রলোকের ভগ্নিটীর কোন ছেলে পিলে নাই বা হয় নাই; সেই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, তাহার এবং তাহার মাতার স্বভাব এতই খারাপ ছিল যে, উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তও বনিত না। তাহারা সর্ব্বদাই ঐ বউটির অনিষ্ট চিন্তা করিত; এমন কি সময় সময় দধির শূন্য ভাণ্ড দ্বারা মাথায় কিম্বা পায়ে আঘাত করতঃ রক্তস্রোত প্রবাহিত করিত। উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু——কে ঐ ডাকিনী যোগিনীদ্বয় তাহা-

দের শক্তি-প্রভাবে এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, ঐ সকল খুনাখুনি কাজ বাড়ীতে হইলা যাইত আর সে চুপ করিয়া এক ঘরে বসিয়া মজা দেখিতে থাকিত, কোন পক্ষকেই কিছু বলিত না। গত ১৭ই অগ্রহায়ণ উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীটি পরলোক গমন করিয়াছে। পরম্পর শুনিলাম, উক্ত ডাকিনী যোগিনীদ্বয় ঐ বউটিকে ধরিয়া মারিতে থাকে, তাহার ফলে সে মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া মারা গিয়াছে। আবার বাটীস্থ লোকেরা বলে যে, তাহার মুখ দিয়া রক্ত পড়া ব্যারাম ছিল, হঠাৎ একদিন বেশী পরিমাণ রক্ত পড়ায় মারা যায়। এক্ষণে কোনটা বিশ্বাস করি। তৃতীয় পক্ষের লোকের কথা, না ঐ ডাকিনী যোগিনীর?

উক্ত মহাশয় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। আপনারা কি কেহ ঐ ডাকিনী-যোগিনীর মধ্যে কন্যা দিতে প্রস্তুত আছেন?

৩। শান্তিপুর

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কয়েক মাস পূর্ব্বে আহিরীটোলা প্রভৃতি স্থানের বালিকাবধূ নির্য্যাতনের কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে উহা অপেক্ষা লোমহর্ষণ ব্যাপার কত শত যে সংঘটিত হয়, তাহার বিন্দুমাত্রও কেহ অবগত হইতে পারেন না। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত—পুত্রবধূকে বিবাহের কয়েক দিবস পর হইতেই অনেক প্রকার অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান করাতে ঐ হতভাগিনী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হইয়াছি যে এক দিবস উহার শাশুড়ী উহাকে জুতা দ্বারা অত্যন্ত প্রহার করে এবং অন্য এক দিবস প্রহার করিয়া ও কেশের এক অংশ কাটিয়া লইয়া উহাকে বাটী হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। এইরূপে প্রায় উহার স্বামী, শাশুড়ী এমন কি দেবর পর্য্যন্ত প্রহার করে। ইহা ব্যতীত কত প্রকার যন্ত্রণা যে উহাকে প্রদান করিয়াছে, তাহা সামান্য পত্রে প্রকাশ করা যায় না। ফলতঃ ঐ প্রকার অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থতা এবং স্বামীর ঔদাসিন্যই উহার মৃত্যুর প্রধান কারণ।

পুনশ্চ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে, পাড়ার কতিপয় বৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ অপরাধিগণকে শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক, ঐ বালিকার মাথা খারাপ হাঁপি রোগ প্রভৃতি মিথ্যা কথা বলিতেছেন। যদি এতাদৃশ লোকের দণ্ড দেওয়া না হয়, তাহা হইলে হতভাগিনী বালিকাবধূদিগের দিন দিন আরও দুরবস্থা হইবে।

—"আনন্দ বাজার পত্রিকা"

বাঙ্গালায় শিশু-মৃত্যু

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহা হইতে কিয়দংশ ও কয়েকটি সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের যে কতদূর দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে—

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ১৯২১ সালের আদম সুমারীতে ৪, ৬৫, ২২, ২৯৩, চার কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত তিরনব্বই জন হইয়াছে। ১৯১১ সালে ছিল ৪, ৫৩, ২৯, ২৪৭ চার কোটী তিপ্পান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত সাতচল্লিশ। গত দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র লোকবৃদ্ধি সমানভাবে হয় নাই।

১৯২০ এবং ১৯২১ সালে কাগজে কলমে

লিপিবদ্ধ মৃত্যুর সংখ্যা দেখিতে পাই ১৪, ৮১, ৬১২ এবং ১৪,০১,০৩০ কিন্তু ঐ ঐ বৎসরে জন্মের সংখ্যা দেখিতে পাই ১৩, ৫৯, ৯১১ এবং ১৩,০১,০০১।

ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুর তুলনায় জন্মের হার বাড়িয়া যাওয়াই হইতেছে দেশের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সত্য অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯২০ সালে বাঙ্গালা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর প্রদেশ। ডিরেক্টর মহোদয়ের বিবেচনায় আর্থিক হীনতাই নাকি এ অস্বাস্থ্যের কারণ।

১৯২০ এবং ১৯২১ সনে ২,৮২,০৯০ এবং ২, ৬৮, ১৬২ জন শিশু এক বৎসর না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহা হইলে এই দুই বৎসরের অনুপাত যথাক্রমে হাজারের মধ্যে ২০৭ এবং ২০৩ দাঁড়ায়। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ৫০০০ পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুদ্র সারকেলে যথাযথ গণনা রেজেষ্টারী করার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সেইখানে প্রতি হাজারে ৭০০ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা পঞ্চাশটী শিশুর মৃত্যু জন্মকালীন দুর্ব্বলতা হইতে হইয়া থাকে। শতকরা প্রায় ১১ জন ধনুষ্টঙ্কারে মরিয়া থাকে।

আলোচ্য রিপোর্টে প্রকাশ যে লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি রেজেষ্টারী দ্বারা সকল জেলায় যথাযথরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মৃত্যু সংখ্যা গণনা যতদূর হইয়াছে জন্মের সংখ্যা ততদূর হয় নাই। সে যাহা হউক, মৃত্যুর হার যে পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্তই আতঙ্কের বিষয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে শিক্ষিত ধাত্রী ও মেয়ে-ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে শিশুরক্ষার দিকে সুফল ফলিতেছে, রেড-ক্রশ-দিগের যত্নে কলিকাতায় এবং ঢাকায় শিশুদের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হইতেছে।

সমবায়

এতদিন সমবায় আন্দোলন চলিবার পর ভারতের কোন্ প্রদেশে সমবায় কতটা অগ্রসর হইয়াছে জানিবার জন্য সকলেরই মনে একটা ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। সেই জন্য নিম্নে একটা হিসাব তুলিয়া দিয়া আমরা বিভিন্ন প্রদেশে সমবায়ের প্রসার সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিলাম।

* * * *

পাঞ্জাবে সমবায় সমিতির সংখ্যা মোট ৮৪৫৩। তারপর সংখ্যাই বঙ্গদেশে—এখানকার সমিতির সংখ্যা ৬৩৬৬। এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজে ৬২৮৭, মধ্যপ্রদেশ এবং বিরারে ৫০১১, যুক্তপ্রদেশে ৪৪৯৩, বিহার ও উড়িষ্যায় ৩৫৮০ এবং বোম্বাইতে ২৯৫৬টী সমিতি আছে। গোড়ায় আমরা এ কথাটাও বলিয়া রাখি যে, এই যে তুলনামূলক হিসাবটী দেওয়া হইল, তাহাতে গত ১৯২১ সাল অবধি ধরা হইয়াছে। তৎপর গত এক বৎসর বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার উন্নতি হইয়াছে—সে সব প্রাদেশিক বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে।

* * * *

সকল প্রদেশের আয়তন এবং লোকসংখ্যার পরিমাণ সমান নহে। সুতরাং লোক সংখ্যার অনুপাত ধরিলে দেখা যায়, প্রত্যেক এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পাঞ্জাবে ৪০.৮টী, বঙ্গদেশে ১৩.৬টী, মাদ্রাজে ১৪.৯টী,

মধ্যপ্রদেশ এবং বিরারে ৩৬·১টী যুক্তপ্রদেশে ৯·৯টী, বিহার ও উড়িষ্যায় ১০·৫টী এবং বোম্বাইতে ১৫·৩টী সমিতি আছে। মাদ্রাজে হাজারকরা ৯·৩ জন, বোম্বাইতে ১৩·৭ জন, বঙ্গদেশে ৫·০ জন, বিহার ও উড়িষ্যায় ৮·২ জন, যুক্তপ্রদেশে ২·৪ জন এবং পাঞ্জাবে ১১·১ জন লোক কোন না কোন সমিতির সদস্য।

* * * *

একেবারে না থাকা অপেক্ষা যাহা হইয়াছে তাহাতে আমরা একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারি বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমবায়ের এই প্রসার ভারতবর্ষের মত জনবহুল দেশে অতি নগণ্য। ভারতবর্ষে হাজারকরা ১৭·৯ জন লোক সমিতির সদস্য আর ইংলণ্ডের প্রত্যেক তিন পরিবারের মধ্যে ১টী কোন না কোন সমিতির সংশ্রবে সংশ্লিষ্ট। এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাই বোঝা যায়, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষ সমবায় সম্বন্ধে কতটা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

* * * *

ইউনিয়নের সংখ্যা বঙ্গদেশে নিতান্ত অল্প—মাত্র ৬টী। মাদ্রাজে ১৭৭টী এবং বোম্বাইতে ৬৬টী ইউনিয়ন রহিয়াছে। এ দিক দিয়া মাদ্রাজ অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। তবে মাল বিক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। সেয়ারের ডিভিডেণ্ড মাদ্রাজে শতকরা ৯ এবং বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ে শতকরা ৭ করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন প্রদেশে ডিভিডেণ্ডের হার শতকরা ৬ ও আছে। অবশ্য এই হার অতি সামান্য এবং যাহাতে বৃদ্ধি করা যায় সেই চেষ্টা করা উচিত।

* * * *

সুদের হার বোম্বাইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম। সেখানে সমিতিসমূহে ঋণের টাকার উপর শতকরা বার্ষিক ৯।৵০ আনা হইতে ১০৸৵০ আনার মধ্যে প্রচলিত আছে। শুধু বঙ্গদেশেই সুদের হার একটু কড়া—শতকরা বার্ষিক ১৫৷৷৵০ আনা হারে লওয়া হয়।

* * * *

পশু বীমার প্রচলন বাঙ্গলাতে মোটেই নাই। ইহা এ প্রদেশের একটি কলঙ্ক। অথচ ইহার আবশ্যকতা যে কম আছে তাহা নহে। সময়ে অসময়ে বহু মূল্যবান গো মহিষাদি মারা গিয়া বঙ্গদেশের কৃষককুলকে বিষম বিপন্ন করিয়া তোলে। সমবায়ের সাহায্যে সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া যদি কৃষকগণ গো-মহিষাদি গৃহ-পালিত জন্তুগুলি বীমা করিয়া রাখে, তবে পশু-মড়কে তাহাদিগকে এতটা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে না। এ দিক দিয়া ব্রহ্মদেশ অনেক উন্নত—সেখানে ৩৮১টী পশু বীমা সমিতি রহিয়াছে। "ভাণ্ডার—পৌষ ও মাঘ।"

৺দ্বিজেন্দ্র লাল

[শ্রীখগেন্দ্র নাথ ঘোষ]

অধরেতে অমন হাসি বড় ভাল লাগে,
কেই তারে গড়েছিলে শত অনুরাগে
কৌতুক কিরণ খেলি নয়নের জলে ,
উষার শিশির যথা শ্বেত শতদলে
রবির কিরণ লেগে আঁখিজলে হাসে
তেমনি তোমার কাব্যে হাসির আভাসে
বেদনা বাড়িয়া উঠে বর্ণন আভায
যেটুক হাসায তার দ্বিগুণ কাঁদায
জলভরা মেঘপ্রান্তে রামধনু প্রায
কাঁদিতেছে হাসি তব বাংলা ভাষায ,
ও মান বেদনাখানি নিশি দিনমান
কাঁদিতেছে বিধবার হাসির সমান ।
যেখানে সকলে গেছে আঁখিজলে ভেসে
সেখানে গিয়াছ তুমি আঁখিজলে ভেসে ।

দায়িত্ব কার কাছে ?

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসের ফলে ঘি-খাওয়াটা স্বভাবগত হ'য়ে যাবার পর যখন সেই স্নেহযুক্ত রুচিকর পদার্থটি কেনবার অর্থের অভাব হয়, তখন লোকায়তদর্শন-কারের সেই সনাতন নীতি—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—অবশ্য অবলম্বনীয়। এই অমূল্য নীতিটি যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযুজ্য, তেমনি রাষ্ট্রপালদের পক্ষেও প্রযুজ্য। সে-

কালে লোকে মনে করত আয় ব্যয় সম্বন্ধে এক জন বিজ্ঞ গৃহস্থের যা কর্ত্তব্য, রাষ্ট্রপালদেরও তাই কর্ত্তব্য—অর্থাৎ আয়টা যাতে বাড়ে, ব্যয়টা যাতে কমে, অন্ততঃ ব্যয়টা যাতে আয়-টাকে অতিক্রম না করে, তাই কর্ত্তব্য। এ ছাড়া আর একটি অতি আবশ্যক কথা এই যে গৃহস্থেরও যেমন অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক, রাষ্ট্রেরও তেমনি একটা অর্থ সংস্থান থাকা আবশ্যক। সেকালে রাষ্ট্র ছিল রাজার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তাঁর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তার সংরক্ষণ করতেন। রাজকোষের পূর্ণতা অপূর্ণতাও তারই উপর নির্ভর করত।

আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্য ঘটলে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ঋণের বিকল্পে আর দুটি কাজ করবার ব্যবস্থা আছে—একটি হচ্ছে চুরি, অপরটি হচ্ছে ভিক্ষা। রাজার পক্ষে অবশ্য সাধারণ লোকাচরিত এ সকল কাজ করবার আবশ্যক হয় না। কেন না, প্রজার অধিকার-গত ধন আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা বা আবশ্যক হ'লে রাজাকে তার অনুমতি নিতে হয় না। রাজ-ইচ্ছা তখন রাজ-বিধিতে পরিণত হয় এবং প্রজার ধনহরণটা কর গ্রহণ-রূপে বৈধ হয়। ভিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা।

এখন কিন্তু সভ্যত-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার ইচ্ছামাত্রই রাজবিধিতে পরিণত হয় না। ঋণগ্রহণ ও কর স্থাপনও কেবল মাত্র রাজকীয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সভ্যদেশে এখন প্রজার ইচ্ছাকেও গণনার মধ্যে ধরতে হয়। অনেক দেশে প্রজার ইচ্ছাই পুঞ্জীভূত হয়ে ঋণ গ্রহণ, কর স্থাপন প্রভৃতি সকল কাজেই রাষ্ট্রপতিত্ব করছে। এখন এ সকল কাজ আর কোন ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনাপ্রসূত আকস্মিক কাজ বলে বিবেচিত হয় না। এ সকলের মূলেও কতক-গুলি নিয়ম আছে, একটা বৈজ্ঞানিক রীতি আছে, এখন এই-ই সর্ব্ববাদিসম্মত। আমা-দের দেশেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং শুক্র-নীতিতে এই বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত রাজনীতিক অর্থ বিজ্ঞানের মূলও অঙ্কুরিত হয়ে অভিব্যক্ত হতে পায় নি। কিন্তু অভিব্যক্তির বৈদেশিক বাধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ রাষ্ট্র-নীতিক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে তার সংস্কারগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে সে কাল থেকেই পেয়েছে এবং মনে মনে আজও সেই সংস্কারগুলিরই পরিপোষণ করে। সে দিন পর্য্যন্ত পাঠশালার গুরুমহাশয় তাকে বলতেন—

"নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষে রাজনীতি
সমুচ্চয়ং।"

এখনই ইস্কুল কলেজে রাজনীতি কথাটি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। তখন তা ছিল না। তখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্র নীতিতে, সাধারণ সাহিত্যে, কাব্যে লোকে অর্থ-বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত হত। লোকে শিখ্‌ত

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞ প্রজানাঞ্চ
হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু
প্রিয়ং হিতম্॥
[কৌটিল্য]

কাব্যে পড়ত

প্রজানামেব ভূত্যর্থং
স তাভ্যো বলিম গ্রহীৎ
[কালিদাস]
স কিং রাজা যো ন রক্ষতি প্রজাঃ
[সোমদেব]

প্রজা পরিপালনং হি রাজ্ঞো যজ্ঞঃ ।

[সোমদেব]

এখন নিজের হিতটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ মাত্রায় নির্বিঘ্ন করে রাজপুরুষেরা অবসরমত প্রজার হিত চান। নিজের হিতটা নির্বিঘ্ন করতে অনেক জিনিষের আবশ্যক, তার মধ্যে ইস্পাতের ফ্রেমটা (steel frame) প্রধান সুতরাং এটাকে গড়তে এবং বজায় রাখতে যে ব্যয় আবশ্যক, ব্যয়ের মধ্যেও সেটা প্রধান। তার উপর অবশ্য সামরিক ব্যয় আছে এবং অন্য অন্য ব্যয়ও আছে, এই ব্যয়গুলির সমষ্টি অনেক সময়েই আয়ের সমষ্টিগুলাকে ছাড়িয়ে যায়। তখন সেই সনাতন নীতি অবলম্বন করে—ঋণ করে—ব্যয় অনুযায়ী আয় বৃদ্ধি করা হয়। ঋণ করবার পূর্ব্বে অবশ্য এক বার নূতন কর স্থাপন করে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। অনেক সময়েই ঋণ গ্রহণ ও কর স্থাপন দুই উপায়ই অবলম্বন করা হয়। কিন্তু স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশে এ দুটি কার্য্য করবার আগে প্রজাকে বোঝাতে হয় যে ব্যয়টা পরিমিত, যুক্তিযুক্ত, অপরিহার্য্য এবং প্রজার কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। আমলাতন্ত্র পরাধীন দেশে এ সকল বালাই নাই। আমলা মনে করেন তাঁরা কৃপা করে প্রজার হিতসাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের ন্যাসরক্ষক (trustee) হয়েছেন, তাঁদের ইচ্ছা সাধু এবং সে সম্বন্ধে প্রজার মনে কোন প্রকার সন্দেহই হওয়া উচিত নয়; যদি হয় তা হলে, তাঁরা বোঝেন, প্রজার মন বিকৃত, তাদের নিজের ভাল মন্দ তারা বোঝে না। এই প্রকৃতির শাসকবর্গ প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সম্মতির অপেক্ষা না করে কর স্থাপনও করেন, ঋণ গ্রহণও করেন এবং এই সকল উপায়ে সংগৃহীত অর্থের যথেচ্ছ ব্যয় এবং অপব্যয় করেন।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় এই রকম করে ঋণ করে করে ঋণের মাত্রা বেড়ে গিয়ে হয়েছিল ২২৪ কোটি টাকা। এত ঋণ করেও কিন্তু আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নি। ব্যয় ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে, জমা-খরচ মেলে নি। গত চার বৎসরের প্রতি বৎসর জমার চেয়ে খরচ যেটা বেশী হয়েছে, সেই বেশীটার সমষ্টির পরিমাণ নব্বই কোটি টাকা। সম্ভব অসম্ভব সকল রকম কর স্থাপন করা হয়েছে—ভূমি-কর, বাণিজ্যশুল্ক ষ্ট্যাম্প ডিউটি, আবকারী-কর, আয়কর প্রভৃতি পরিচিত বড় বড় কর-গুলি ত আছেই। তার উপর রেলভাড়া বাড়ান, ডাকমাশুল বাড়ান, আমোদ আহ্লাদের সেলামী (amusement tax) হাসপাতালের রোগীর কাছ থেকেও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা আদায়—সবই হয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষ দেখেছেন ব্যয় না কমালে আর চলে না। এ কথা অবশ্য দেশের লোকে অনেক দিন থেকেই বলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে কথা শোনবার যোগ্য মনে করেন নি, সুতরাং তাতে কাণও দেন নি। এখন শাসন যন্ত্রটা অচল হবার উপক্রম দেখে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রান্তিক গবর্ণমেণ্ট সকলেই ব্যয় সংকোচ করবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেছেন। কমিটি নানা গবেষণা করে কোন কোন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করবার পরামর্শও দিয়েছেন। কিন্তু সেই ইস্পাত ফ্রেমটার গায়ে হাত দেবার সাহস কারও হয় নি। বরং তার উপর পালিশ চড়াবারই আয়োজন হচ্ছে।

এ দিকে মন্ত্রিসভা বেষ্টিত গবর্ণর জেনারেল আয়ব্যয়ের সমতা স্থাপন করবার জন্য নিয়তই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। সচিবেরা পরামর্শ দিলেন লবণের করটা দ্বিগুণিত করতে পারলে দীর্ঘকালব্যাপী পুনঃপুনঃ অর্থাভাব

রোগটা প্রশমিত হতে পারে, তাঁদের দুশ্চিন্তার অবসান হতে পারে। যেই কথা সেই কায— মন্ত্রণাগৃহে লবণকর দ্বিগুণিত করবার প্রস্তাব হল, লেজিসলেটিভ এসেম্বলি-তে প্রস্তাবটা পেশ হল, প্রজাপ্রতিনিধিদের ভোটে কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়ে গেল; অদম্য গবর্ণমেণ্ট তাকে সুপারিশ করে কৌন্সিল অভ ষ্টেটে পাঠালেন, সেখানে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের ভোটের আধিক্যে গ্রাহ্য হয়ে গেল; আবার লেজিস্লেটিভ এসেম্বলিতে পেশ হল। এসেম্বলির সদস্যেরা আবার অগ্রাহ্য করে দিলেন। কিন্তু ১৯১৯ সালের গবর্ণমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া আইনের ৬৭বি ধারারূপ প্রজাপ্রতিনিধিদের এক মৃত্যুবাণ গবর্ণর জেনারেলের তূণীরে আছে; এবার তারই প্রয়োগ হল, সে প্রয়োগ অব্যর্থ; লবণ করের প্রস্তাব আইনে পরিণত হ'ল।

কাজটার গুরুত্ব অবশ্য সসচিব গভর্ণর জেনারেল বুঝেছেন এবং সেই জন্য জনসাধারণকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কৈফিয়ৎটা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন এ বৎসর খাদ্যদ্রব্য সস্তা হয়েছে, কল কারখানার শ্রমজীবীদের মজুরী কিন্তু কমে নি। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের জন্য পূর্ব্বে যা ব্যয় হত এবার তার চেয়ে কম ব্যয় হবে। এতে যা বাঁচবে তারই একটা সামান্য অংশ মাত্র লবণ কর বলে দিতে হবে। এতে শ্রমজীবীদের কোন কষ্ট হবে না। এই করটির আর একটি গুণ এই যে প্রাসাদবাসী রাজা থেকে তরুতলবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত এবং অতিবৃদ্ধ থেকে অতিশিশু পর্য্যন্ত সকলেরই উপরে এর ভারটা সমানভাবে পড়বে, কেউ অব্যাহত থাকবে না। মাথট (poll tax) থেকে এর প্রভেদ এই যে স্ত্রীলোক এবং শিশুকে মাথট দিতে হয় না; কিন্তু এ টেক্সে দিতে হবে। গবর্ণর জেনারেল শ্রমজীবীদের কথা বলবার সময় মনে করতে ভুলে গিয়েছেন যে এ দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক কলকারখানায় কাজ করে না—চাষ আবাদ করে খায়। এই কৃষিজীবীরা চিরঋণগ্রস্ত। যদি এ বৎসরটা সুবৎসরই হয়ে থাকে, কৃষকের ক্ষেতে যদি শস্য একটু ভালই জন্মে থাকে, কৃষক তার ফলভোগী হয় নি। ফলভোগী হয়েছে তার মহাজন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্বৎসরে মহাজন কৃষকের কাছে তার পাওনা আদায় করতে পারে নি। এ বৎসর শস্য দুটি বেশী হওয়াতে মহাজন তার আগেকার পাওনা আদায় হিসেবে যতদূর পেরেছে এবারকার শস্য নিয়ে গিয়েছে। তার উপর জমিদার আছেন, পূর্ব্বের দুর্বৎসরে তার যে খাজনা বাকী পড়েছিল, তিনিও তা আদায় করে নেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে কৃষক যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে, লবণের জন্য তার টেক্স দেবার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র বাড়ে নি। গবর্ণর জেনারেল বোধ হয় জানেন, অন্ততঃ জানা উচিত, যে ভারতীয় প্রজাদের অর্দ্ধেকের বেশী বৎসরের পর বৎসর অর্দ্ধাশনে থাকে এবং সেই অশনার্দ্ধ কেবল নুনের জোরে গলাধঃকরণ করে। শাসক যখন শাসিতের চেয়ে বহু উচ্চে অবস্থান করেন তখন তিনি যে শাসিতের নুনটুকুর খবরও রাখবেন এমন আশা করা অবশ্য বাতুলতা মাত্র। সেই জন্যই আজ পৃথিবীতে একটা আন্দোলন উঠেছে যে দরিদ্র শাসিতের শাসকও দরিদ্র হবে, নইলে শাসিতের দুঃখের অনুভূতি শাসকের হৃদয়ে জন্মিতে পারে না। সেই জন্যই আজ পৃথিবীর দীন দুঃখী দরিদ্রেরা নিজেদের রাষ্ট্রপতিত্ব—Proletarian Dictatorship—চাচ্ছে।

কৈফিয়তের প্রথম কথা এই যে লবণকর এ দেশে নতুন নয়, পূর্ব্বেও ছিল। গবর্ণর-জেনারেল যখন এই কথা বলেন তখন মুসলমান আমলের মণকরা তিন টাকা হারের লবণকরের কথাটাই তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাঁর মানস দৃষ্টি অতীতের আরও কিছু দূরে প্রসারিত হলে তিনি দেখতে পেতেন তখন লবণশুল্কের মাত্রা ছিল ২০ ভাগ বা ২৫ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ 5 per cent or 4 per cent ad valorem duty (১) আর বর্ত্তমান মাত্রাটা হচ্ছে, মূল্য মণ করা এক টাকা কি পাঁচ সিকা আর শুল্ক মণকরা ২৷৷০ টাকা। অর্থাৎ 200 to 250 per cent ad valorem.

[১] * * ধান্য-স্নেহ-ক্ষার-লবণ-মদ্য পক্কান্নাদীনাং চ বিংশতি ভাগঃ পঞ্চবিংশতি ভাগো বা।

কৌটিলীয়ং অর্থশাস্ত্রম, শুল্কব্যবহারঃ। ৪০ প্রক।

কৈফিয়তে তিনি আরও বলেছেন যে অনেক কাজের মূলধনের জন্য এ দেশে এবং বিদেশে ঋণ গ্রহণ করতে হবে। তখন ভারতগবর্ণমেণ্টের জমাখরচের মিল না থাকলে ঋণ পাওয়া সহজ হবে না। অতএব জমা-খরচের সামঞ্জস্য রক্ষা করতেই হবে। খরচ কমিলে জমার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু তা অসম্ভব, খরচ আর কমান যেতে পাবে না। জমা-বাড়ানোরও সকল পথ বন্ধ, অতএব নুনের উপর টেক্স বসানই এক মাত্র উপায়। এর অন্বয় করলে এই দাঁড়ায় যে ভারতবর্ষে কোন কোন কাজের জন্য স্বদেশে এবং বিদেশে "ঋণং কৃত্বা" মূলধন সংগ্রহ করতে হবে, ভাবী মহাজনেরা তার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের জমা খরচ দেখতে চাইলে ও ছটোর মিল করে দেখাতে হবে; আর মিল করতে গেলেই নুনের টেক্স এসে পড়ে। কারণ অন্য টেক্স আর বাকী নাই।

এই সকল কথা বলতে গিয়ে গবর্ণর জেনারেল পুনঃ পুনঃ তাঁর দায়িত্বের কথা আমাদেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "Speaking with all the *responsibility* falling on me and my Government, I am convinced ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুনরায়—

I believe that it is my duty to take the necessary action to secure this in the discharge of the *responsibility* placed upon me as Governor General by the Imperial Parliament.

পুনশ্চ—

And for these [development of the Reforms and the advancement of India] I shall continue to labour in the discharge of the *high responsibility* entrusted to me as Governor General.

[Italics mine—Writer]

ভারতবাসী এই দায়িত্বের কথা বহুবার শুনেছে। কিন্তু বরাবরই তার সন্দেহ এই যে গবর্ণর জেনারেলের এই দায়িত্বটা কার কাছে? প্রশ্নটা ভারতবাসী পূর্ব্বে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে, কর্ত্তৃপক্ষ উত্তরও অনেকবার দিয়েছেন। শেষ উত্তর স্বয়ং সম্রাট ঘোষণা করেছেন তাঁর খুল্লতাত ডিউক-অভ-কনট প্রমুখাৎ। ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লেজিসলেটিভ এসেমব্লির উদ্বোধনের সময়

ডিউক-অভ-কনট বলেছিলেন ভারত শাসন কার্য্যে স্বেচ্ছাচার নীতি এক বারেই পরিত্যক্ত হল। ভারতবর্ষবাসী রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে তার আর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। [The principle of autocracy has all been abandoned ... ... Its retention would have been inconsistent with the stage of development which Indian people have attained.] এই সম্রাট বাণীর অনুবর্ত্তন করে এর এক পক্ষ কাল পরে তখনকার রাজস্বসচিব বলছিলেন যদি কোন কর স্থাপন করতে হয় ত এই লেজিসলেটিভ এসেমব্লির ভোট নিয়েই করা হবে [If we impose taxation, it will be by the vote of the Assembly] এই এসেমব্লি বার বার তিন বার এই লবণ-করটা অগ্রাহ্য করে দিলে, আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বটি স্মরণ করে ঐ লবণ করটিই প্রশস্ত বলে বিধিবদ্ধ করে দিলেন! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর তাঁর কৈফিয়তে সম্রাট বাণীর উল্লেখটি পর্য্যন্ত করতে ভুলে গেলেন!

ভারতবাসী প্রজা এখনও কামনা করছে "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ।"

কুলটা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

তেমন সুন্দরী দেখা যায় না বিশেষতঃ গরীবের ঘরে তো নয়ই। লোকে ব'লত যেন 'গোবরে পদ্মফুল'! শ্রীপুরের নন্দ কৈবর্ত্তের মেয়ে মাধুরীর এম্‌নি রূপ। একুশ বছরের পূর্ণ যৌবনের ভরা জোয়ার তার দেহে কানায় কানায় উছলিয়া পড়িত। তাহার পানে একবার চোখ পড়িলে মুহূর্ত্তের তরেও অন্ততঃ আপ্‌নাহারা হইয়া অবাক্ না হইবার্ জো ছিলনা। অথচ সে বালবিধবা, অথচ সে তার নিঃস্ব বাপের মেয়ে। চার মরা ছেলের পর বিপত্নীক বাপের সে এক মেয়ে। বাপে তাহাকে সাদা কাপড় পরিতে দিত না, মেয়ের চুলও ছাঁটিতে দেয় নাই, হাতের দু দু গাছি সোনোয়ানী চুড়ীও খুলিতে দেয় নাই। মাধুরী বুড়া বাপকে বাঁধিয়া খাওয়াইত, কখন কখন এবাড়ী ওবাড়ী বৌ-ঝিদের কাজে যাচিয়া সাহায্য করিত, আর পানের রসে ঠোঁট রাঙাইয়া মিষ্টি-হাসি ছড়াইয়া পাড়া ঘুরিয়া বেড়াইত। গাঁয়ের বুড়া বুড়ীদের রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে কিলিবিলি করিত এই সোমত্ত মেয়েটার চাল চলন দেখিয়া, আর বকাটে ছেলের দল নানান্ ছল ছুতায় নন্দ কৈবর্ত্তের বাড়ী আনা গোনা করিত। নন্দ কৈবর্ত্তের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা ছিল না কারণ তাহার সাত পাঁচ ছোটো খাটো কাজে অযাচিত সাহায্য করিয়া ঐ ছোঁড়ার দল নিঃস্বার্থ পরার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতে একান্ত উদ্‌গ্রীব

ছিল, কিন্তু তাহাতে হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নন্দ অস্বস্তি বই স্বস্তি বোধ করিত না, আর মাধুরী আপন মনে হাসিয়া কুটি কুটি হইত।

গাঁয়ে বৃন্দাবন চাটুয্যে সমাজের চাঁই, নৈকষ্য কুলীন। লগ্নী কারবার করিয়া তিনি বড় লোক। শ্রীমান্ বিপিন চাটুয্যে তাঁর একমাত্র দুলাল। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর আড়ি বলিয়াই বোধ হয় সে তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এণ্টেন্স পরীক্ষায় বার ছয় সাত ফেল হইয়া তিন বৎসর যাবৎ বাবরীকাটা চুলের কসরৎ আর সখের থিয়েটারের দলে ক্ল্যারিওনেট বাজনার মহড়া দিতেছিল। একবার ইতিমধ্যে কলিকাতায় গিয়া সে আদ্ধির গিলাকরা পাঞ্জাবী পরিতে, পাম্পসু পায় দিতে, ফিন্‌ফিনে কাপড়ে ধুলায় লোটান কোঁচা ছাড়িয়া দু আঙ্গুলে ছড়ি ঘুরাইয়া চলিতে ও ঠোঁট বাঁকা করিয়া সিগেরেটের ধোঁয়া ছাড়িতে শিখিয়া আসিয়া গ্রামবাসী ছেলে বুড়ো সবাইকে তাজ্জব করিয়া দিয়াছিল। একদিন সেও ঘাটের পথে সিক্তবসনা মাধুরীকে ফিরিতে দেখিয়া নন্দ কৈবর্ত্তের মহাভক্ত হইয়া পড়িল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, আহা বুড়ো মানুষ একলাটী থাকে, আর এমন ভক্ত লোক,—দু দণ্ড গিয়া ওঁর কাছে বসিতে কার প্রাণ না চায়। দু' একদিন কীর্ত্তন গাহিয়া বুড়া নন্দ কৈবর্ত্তের চোখে জল বহাইয়া সে ছাড়িয়াছে।

দৈবের বিড়ম্বনা—একেই বলে কালস্য কুটিলা গতি। একদিন শোনা গেল মাধুরী তাহার বুড়া বাপকে ছাড়িয়া বিপিন চাটুয্যের সঙ্গে পলাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবিষ্কার করিতে লোকের দেরী হইল না যে বিপিনের মায়ের গহনার বাক্সে নাকি সেই দিনই সোণার সাতনর, হার ও চুড়ি বালা অনন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

বুড়াবুড়ীর দল সাস্ফালনে কহিতে লাগিলেন,—হাঁ বলিয়াই তো ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। বয়াটে ছোঁড়ার দল নন্দ কৈবর্ত্তের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যে যাহার নতুন নেশার খোঁজে মন দিল। বুড়া নন্দ কৈবর্ত্তের সদাহাস্য মুখখানি আঁধারে ঢাকিল।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন সকালে বিপিন চাটুয্যে বাড়ী ফিরিল। বাপে মায়ে হারোণো ছেলে পাইয়া হাতে চাঁদ পাইলেন। বৃন্দাবন চাটুয্যে রটাইলেন নচ্ছারী মাধুরীই নানান্ ছলাকলা করিয়া তাঁহার ছেলেমানুষ ছেলেটীকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ভগবানের কৃপায় তাঁহার সোনার চাঁদ ছেলে সে সর্ব্বনাশীর বেড়া জাল কাটিয়া আসিয়াছে। সমাজের অন্যান্য চাঁইরা বলিলেন,—"হ্যাঃ, ব্যাটাছেলে, তার এতে আর এসে গিয়েছে কি ?" বুড়া বুড়ীর দল বলিলেন, তা বটেই তো, বজ্জাত মাগী যে ঢং করে ফুর্ ফুরিয়ে ফিরত ইত্যাদি ইত্যাদি" বখা ছেলের দল বলিল "বিপনে বেশ মজাটা লুটলেরে বাবা।"

মাসেক পরে নন্দ কৈবর্ত্ত মারা গেল। লোকে ভাবিয়াছিল বুড়ার যে বিঘা দুই ভুঁই আর বাড়ী ও তার চার পাশে যে ফলের বাগানটুকু আছে, তাহা সে নিশ্চয় গ্রামের জাগ্রতদেবী রক্ষাকালীর সেবার জন্য দিয়া যাইবে, কিন্তু দেখা গেল বৃদ্ধ তাঁহার সামান্য যা কিছু মরিবার সময় পলায়িতা কন্যাকেই দিয়া গিয়াছেন। বুড়ার মৃত্যুর সাত আটদিন পরে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ লোকে দেখিল বুড়ার নিরালা কুটীরের ভেজান দরোজা খোলা, আর তার ভিতরে বুকভাঙ্গা চাপা কান্নার সে কি আওয়াজ! আশে পাশের লোকেরা

নিশ্চয় ঠাওরাইল এ ভূতের কাণ্ড, ভয়ে তাহাদের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। পরদিন দেখা গেল সে মাধুরী।

সমাজের চাঁইরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন, কুলটাকে খেদাও—কুলটার গাঁয়ে স্থান নাই। বুড়া বুড়ীর দল বৌ-ঝিদের শাসাইয়া দিলেন খবর্দার মাধুরীর সাম্‌নে যেন তারা ঠোঁট না মেলে। বখা ছেলের দল আবার এক নূতন মজা পাইল।

বিপিনের লম্বা চওড়া কথার প্ররোচনায় বাড়ী ছাড়িয়া কিছুদিন পরে মাধুরী যখন দেখিল যে বিপিন তাহার কথামত তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী নয় তখন তাহার প্রাণ ঘৃণায় লজ্জায় বিষাইয়া উঠিল। একদিন রাত্রে সে দ্বিতীয়বার গৃহত্যাগিনী হইল। এদিকে বিপিনও ভালো মানুষটী সাজিয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু মাধুরী ঘরে ফেরে কি করিয়া? কোন মুখে সে স্নেহময় বুড়া বাপের সাম্‌নে গিয়া আবার দাঁড়াইবে? আর পরিচিতদের বিদ্রূপ তাচ্ছিল্য করা দৃষ্টি, সে কি সওয়া যায়! কিন্তু মাসেক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে স্থির করিল; না—বাপের কাছে সে যাইবেই তার পর যা হয় হইবে। অপমান অবজ্ঞা, বিদ্রূপই যদি সে সহিতে না পারিল, তবে এমন দুঃসাহসের পথ সে নিজেই বাছিয়া লইয়াছিল কেন? কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল কুলত্যাগিনী তাহারই জন্য ক্ষুদ কুঁড়া যাহা কিছু রাখিয়া তাহার স্নেহময় পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। বাপের বালিশে মুখ চাপিয়া সে সারারাত পড়িয়া কাঁদিল।

ইহার দুই তিন দিন পরে সত্যিই একদিন সকালে গ্রামের সমাজের কর্ত্তারা তাহাকে আসিয়া হুকুম করিলেন তাহায় গাঁ ছাড়িতে হইবে। আর্কফলা দোলাইয়া এক একজন চাঁই লম্বা চওড়া এক এক বক্তৃতা দিলেন। সকলের উত্তরে মাধুরী ক্ষুদ্র একটা জবাব দিল "বাপের ভিটা ছেড়ে আমি যাবো না" সবার চাইতে গলা সপ্তমে তুলিয়া বৃন্দাবন চাটুয্যে চেঁচাইলেন "কী এতবড় কথা, মাগীকে ঝাঁটা পেটা করে দূর করবো—।" মাধুরী নিরুত্তর। তারপরে সপ্তমের গলা নবমে চড়াইয়া সকলে মহাবীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সবলে এই অসহায়া বালিকাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময় কোথা হইতে দীনু বাগ্দীর ছেলে হরে বাগ্দী তার ছয় ফুট লম্বা বলিষ্ঠ দেহখানি ও হস্তে সাতফুট লম্বা পাকা বাঁশের লাঠিগাছ লইয়া উঠানে উঠিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল "ও এখানেই থাক্‌বে, আপনারা যান।" বৃন্দাবন চেঁচাইয়া বলিলেন হ্যাঁরে হরে তুই—" ঘাড় নোয়াইয়া হরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ আমি। মিছেমিছি আর চ্যাঁচামেচি করবেন না—মাধুরী গাঁয়েই থাক্‌বে।" তার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সকলে রণে ভঙ্গ দিলেন। বৃন্দাবন দাঁতে দাঁত খিঁচিয়া বলিয়া গেলেন "আচ্ছা, দেখা যাবে!" মাধুরী কৃতজ্ঞ নেত্রে সেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহখানির পানে চাহিল। হরে চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল "তোমার কিছু ভয় নেই মাধুরী,—ওরা আর আস্‌বে না।"

হরে বাগ্দীর বাপ দীনু বাগ্দী তেজারতি করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা জমাইয়া বৃদ্ধ বয়সে যখন ধর্ম্মে মন দিল, এবং হঠাৎ ডোর কৌপীন সম্বল করিয়া বৈষ্ণব হইল, তখন লোকে ভাবিয়াছিল যে বুড়া বয়সে কণ্ঠি বদল করিবার পথেই বোধ হয় তাহার এই অভিনয়, কিন্তু তারপর দুই বছরের মধ্যেও তেমন কিছু না করিয়া সে যখন মরিল তখন লোকে আরও আশ্চর্য্য হইল। তখন তাহার কৃষ্ণভক্তিতে

বিশ্বাস না করিয়া উপায় ছিল না। এ হেন বাপের ছেলে বলিয়াও কতকটা, আর হ'রের ঘরের খাইয়া পরের মহিষ তাড়াইবার অভ্যাসেও কতকটা এই প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ-দেহ ছেলেটীকে গ্রামের সবাই প্রায় স্নেহের চক্ষে দেখিত। মরা পোড়াইতে, রোগীর সুশ্রূষায়, গ্রামে আগুন লাগিলে আগুন নিভাইতে হরে বাগ্দী ওরফে হরে বোষ্টম হাজির আছেই। এই হরে বোষ্টম ছেলেবেলা হইতে মাধুরীকে দেখিয়া আসিতেছে ও কেমন করিয়া কখন যে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না। সে বহুদিনের কথা, কতদিন মাধুরীকে দক্ষিণা বাতাসের মত নগ্ন পদে গ্রাম্যপথে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া তাহার প্রাণখানি লইয়া তাহার চঞ্চল চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুলিবিকুলি করিয়াছে, কতদিন সে তাহার রাঙা ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখিয়া আপন মনে নাচিয়া সারা হইয়াছে, কতদিন স্নানসিক্তবসনা মাধুরীকে দেখিয়া সে বিস্মিত পুলকে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া সেই রূপের ধ্যান করিয়াছে,—তাহার ইতিহাস শুধু তাহারই স্মৃতির পাতে পাতে লেখা আছে। তার পর সে কুল ত্যাগ করিল,—আবার ফিরিয়া আসিল। জগতের চক্ষে নাকি সে ঘৃণ্য, কিন্তু কৈ তাহার কাছে তো তেমনটীই আছে, এখনও তার প্রত্যেকটী ভঙ্গিমা অসহ্য পুলকে তাহার দেহ মন ছাইয়া ফেলে, এখনও তো তাহার চোখে চোখে পড়িলে সসম্ভ্রমে তার চোখের পাতা নামিয়া আসে!

মাধুরীর দুর্দ্দিন পড়িল। ভুঁইয়ে তো চাষ দিবার লোক নাই, বর্গাও কেউ লয় না—তাহার সহিত লেনদেন করিয়া এক ঘরে হইতে যাইবে কে? সে স্থির করিল বাড়ীর নানান্ গাছের ফল বিক্রী করিয়া আর চরখা কাটিয়া সে দিন গুজরাণ করিবে। সকল পরামর্শে এখন হরে, তার দক্ষিণ হস্ত, কারণ হরে বোষ্টম কারুর পরোয়া করে না, কিন্তু তাহা ছাড়া কোন কিছু বিশেষ ভাবে মাধুরী-কে সাহায্য করিবার একটা সুমধুর কল্পনা হরের মনে জাগিলেও সে তাহার আপনাতে আপনি অটল-মূর্ত্তি দেখিয়া সাহস পায় না;—আরও বেশী করিয়া মুগ্ধ হয়।

মাধুরী ফল বেচিতে হাটে যায়। রামা, শ্যামা, যদু মধু বয়াটে ছোঁড়ার দল এবারো তার দোকানে ভিড় করিয়া থাকে, কিন্তু মাধুরীর দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যে তাহাদের দৃষ্টি ঠিক্‌রিয়া আসে, তথাপি তাহাদের অনুচ্চ কণ্ঠ-নিঃসৃত দু'একটা অশ্লীল কথা তাহার কাণে আসিয়া পৌছায় কিন্তু সে দাঁতে ঠোঁট কাটিয়া বসিয়া থাকে। এযে তার ন্যায্য প্রাপ্য! হরে বোষ্টম হাটের মধ্যে আনা-গোনা করিতে ঐ ছোঁড়াগুলার পানে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যায়; যেন সে পারিলে উহাদের ভস্ম করিয়া ফেলে,—কি বিশ্রী ভাবেই উহারা মাধুরীর পানে তাকাইয়া থাকে! মাঝে মাঝে বিপিন চাটুয্যে হাটে আসিলে মাধুরীর দুইশো হাত দূর দিয়া না দেখা ভাবে যেন পলাইয়া বাঁচে, আর মাধুরী নির্ব্বিকার নেত্রে একবার চাহিয়া চোখ ফিরায়।

হরে বোষ্টম আর পারে না। একদিন মাধুরীকে বলিয়া ফেলিল সে তাহাকে ভাল-বাসে—সে কি তাহার হইবে?

শুনিয়া মাধুরীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সে হরের দুই হাত হাতের মুঠায় তুলিয়া লইয়া বলিল আমায় মাপ করো ভাই, আমি তোমার মত দেবতার

যোগ্য নই—আমি বড় পাপিষ্ঠা, আমি যে তাকে এখনও ভুলতে পারি নে, আমি—আমি—" "থাক্ থাক্ আর বল্‌তে হবে না" বলে হরে বোষ্টম তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া মাধুরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "ছিঃ কেঁদো না, কাঁদতে আছে কি, ছিঃ—কেঁদো না" আর কোন কথা বুঝি তাহার ঠোঁটে যোগাল না।

হঠাৎ মাধুরীর একদিন কলেরা হইল। রামা শ্যামা যদু মধুর দল নানান ছুতায় তাহার কাছে ভিড় জমাইত বটে, কিন্তু রোগীর শয্যাপার্শ্বে কেহ আসিল না। দুই দিনের দিন রাত দুপুরে হরে বোষ্টমের কোলে মাথা রাখিয়া মাধুরী মরিল।

কেহ তাহাকে পোড়াইতে আসিল না,—রামা শ্যামা যদু মধুর দলও না, কেন না সে যে কুলটা! হরে বোষ্টম সারা রাত মড়া আগলাইয়া বসিয়া সকালে সতীশববাহী মহাদেবের মত একা শব কাঁধে লইয়া অশ্রুজলে তাহাকে ধুইয়া শ্মশানে দাহ করিয়া আসিল।

সমাজকর্ত্তারা বলিলেন যে সূর্য্য চন্দ্র এখনও ওঠে ও অস্ত যায়, অতএব মাধুরীর বাসিমরা হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল বলিয়াই হইয়াছে, এবং দুশ্চরিত্রা কুলটার ফল হাতে হাতে, কৈবর্ত্তের মেয়ে হইয়া সৎকার হইল বাগ্দীর হাতে! বুড়াবুড়ীর দলও বলিলেন—তাই তো, তাই তো! রামা শ্যামা যদু মধুর দল হরে বোষ্টমের পরার্থপরতার কারণের সমালোচনায় মাথা ঘামাইতে লাগিল। * * *

ইহার দুই সপ্তাহ পরে এক ভয়ানক উচ্চ বংশের কুলীন কন্যার সহিত বৃন্দাবন চাটুয্যের একমাত্র পুত্র বিপিন চাটুয্যের বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের সমাজকর্ত্তাগণ বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় বলাবলি করিতে করিতে গেলেন "একবারে রাজ-ঘোটক হয়েছে, হবে না—যেমন বাবা তেমন ছেলে, তেমনই শ্বশুর"। পাত্রের শ্বশুর মহাশয় দারোগা, চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকুরী করিয়া বাড়ীতে তিনতলা দালান তুলিয়াছেন।

সুর

শ্রীঅবনীকুমার দে

সৃষ্টির আদিম কবি সর্ব্ব অগ্রে যে সঙ্গীত শুনি
উন্মাদনা পেয়েছিল প্রাণে,
অকস্মাৎ ছুটেছিল বাহুমেলি অন্ধের আবেগে
কান্নাছাড়ি' সুরের সন্ধানে;
মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ যে সঙ্গীতে আত্মহারা হ'য়ে
নেত্রমেলি প্রথম যৌবনে,

বিশ্বের মাধুরী হেরি করেছিল অপরূপ স্তব
মুগ্ধালস বিচিত্র নয়নে ;
আমি গাহি সেই গান হৃদিতন্ত্রী উঠুক ফুকারি
হো'ক বিশ্ব পরিব্যাপ্ত নিখিলের সর্ব্বাঙ্গ ঝঙ্কারি।

(২)

যার তরে ধর্ম্ম ছাড়ি, সঙ্ঘ ত্যজি, দীন ভিক্ষু
শুদ্ধধনে দিয়াছে বিদায়,
ভিক্ষুনীর মুগ্ধ স্বরে সর্ববাচারে দিয়া জলাঞ্জলী
ছুটিয়াছে এক ইসারায় ;
কুসুম পল্লবে ঘেরা বনানীর স্নিগ্ধশ্যামচ্ছায়ে
হেরি শাপভ্রষ্টা মেনকারে
যে সুরে মজিযাছিল তপঃক্লিষ্ট বিশ্বামিত্র মুনি
জন্ম-যোগ ব্রত ভঙ্গ করে ;—
মোর সুরে সব কাব্য ফুটে ওঠে পুষ্পকলি বুকে
বিহগ কাকলী আর মধুমত্ত মক্ষিকার মুখে !

(৩)

শুমারের প্রিয়তমা সাকি এবি মাঝে সঙ্গে আছে
লালে-লাল রঙ্গীন নেশায়,
লাখ লাখ যুগ ধরি তিষা পরি তিষা রাখি
দেহমন শিরায় শিরায় ;
রজকিনী নারী এক স্পর্শে তার হইয়াছে শুচি
দেবীরূপে লভিয়াছে পূজা,
নান্নুর মঠে কবি চণ্ডিদাস দেখেছিল এক
অপরূপ সতী দশভূজা।
অন্ধ বিল্ব ব্রজধামে কাণা আঁখি ফিরে পায় তাঁর
বারমুখী গুরুরূপে মহাতীর্থে লভিল উদ্ধার।

(৪)

সিন্ধুরে মন্থন করি উঠেছিল যত সুধা বিষ
যত লক্ষ্মী-ইন্দু-পারিজাত,
দেব দানবের যুদ্ধ অমৃতের—অমৃতের তরে
মোর সুরে বাজে দিনরাত ;

নির্ঝরের স্বপ্ন নাচে তাপদগ্ধ মরু সাহারায়
হীমাচলে—অগ্নি-প্রস্রবণে,
—কোটি চন্দ্রে কোটি সূর্য্যে মেঘাম্বরে গ্রহতারকায়
দেবতার বীণার নিক্বণে ;
জন্ম মৃত্যু ভরা অই অনাহত মহান ওঙ্কার
এক সূত্রে গাঁথা এক অনশ্বর সৃষ্টি মাল্যহার।

(৫)

মন্দাকিনী যার প্রেমে নেচে ছোটে সাগরের বুকে
ফোটে ফুল মলয় পরশে,
পাষাণে পাষাণে হয় যে নিয়মে আদান প্রদান
বিশ্বধাত্রী করুণা বরষে,
শিশুর মঙ্গল হাস্যে জননীর স্তন্যক্ষীর ধারে
যতবল যতটুকু প্রাণ
আমারি সঙ্গীতে বচ' চিররাত্রি চিরদিন ধরে
সুরধূনী চির বিদ্যমান।
স্বর্গে মর্ত্তে ত্রিলোকের যত রাগ—যতেক রাগিণী
আমারি মাঝারে নিত্য সরস্বতী অনন্তবাদিনী।

(৬)

আমিই প্রথম সব রচেছিনু কবে একদিন
আমা হ'তে স্বরের উৎসব
উঠেছিল বসুধার বুকে ;-তাই এত আলো অন্ধকার
ধরণীর অমর বৈভব।
তাই এত চলিয়াছে পাশাপাশি জীবন মরণ
এত হাসি এত অশ্রুপাত,
এই দিবা এই নিশা বারমাস বর্ষ ছয় ঋতু
বাঞ্ছনার সহস্র সম্পাৎ।
আমারি মাঝারে বিশ্ব আমাতেই নিত্য হয় লয়
সব সুর সব গান ভাব-ভাষা অনাদি অক্ষয় !

দুনিয়ার কথা

[শ্রীদেবী কুমার গোস্বামী]

দুনিয়ায় কত অদ্ভুত মজার জিনিষ আছে যা দেখে আমরা আশ্চর্য্য হই। আবও কত জিনিষ আছে যা' দেখে আমরা আশ্চর্য্য হই না, কিন্তু একটু তলিয়ে যদি সেগুলার কথা ভাবি তবে আশ্চর্য্য না হবার জো থাকে না; একি তোমরা কেউ ভেবে দেখেছ? আমাদের চার পাশে যে সব সজীব জিনিষ দেখি, গাছপালা কুকুর বেড়াল নিগ্রো বাঙ্গালী আরো কত কি এসব দেখে আমাদের চমক লাগে না, যেমন একখানা এরোপ্লেন দেখলে লাগে, অথচ একটু যদি বসে ভাবি দেখতে পাই, যে এই নিত্যকার দেখা জিনিষগুলাও ভাবি অদ্ভুত। কেন অদ্ভুত ও এরা সব কি করে আশ্চর্য্যময় তাই তোমাদের ব'লবো।

আমরা নিত্য চারপাশে এসব দেখি বলে হয়তো আমাদের মনের পাতে এরা কোনো দাগ ফেলে না। আমাদের এই পৃথিবীটার সঙ্গে অন্য কোনো একটা গ্রহ উপগ্রহের তুলনা করে দেখলে তোমরা আশ্চর্য্য হওয়ার কারণটা অনেকটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ধর, চাঁদের কথা। ওটাও পৃথিবীর মতই, খুব বড়, কিন্তু ওর সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর অনেকখানি পার্থক্য রয়ে গেছে। চাঁদে জীবনের কোনো সাড়া নেই; না আছে মানুষ, না আছে পশু পাখী, না আছে গাছ-পালা। কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে সবখানেই প্রাণ রয়েছে। বাতাসে, জলে, স্থলে, মাটীর নিচে, সবখানেই জন্ম, মৃত্যু, চলাফেরা, ছুটাছুটি এই-ই খালি চলছে। তা' হলে যা চাঁদে নেই, অন্য কোনো জগতে আছে বলে মানুষ এ পর্য্যন্ত সঠিক প্রমাণ পায় নি, তা' পৃথিবীতে আছে; এ ভেবে দেখ্‌তে গেলে জীব জন্তু গাছপালা. এ গুলো অদ্ভুত বলে মনে হয় না কি? আর, এই জীবনের কথা যতই ভাববে, ততই এর সম্বন্ধে নতুন নতুন ভাববার কথা মনে পড়বে।

ধর, ২০০০ বছর আগে যে সব প্রাণী বেঁচে ছিল তা'রা এখন হয়তো কেউই বেঁচে নেই। কিন্তু এখনও সেই দুনিয়া তখনকারই মত জীব জন্তুতে ভরে আছে। কেন এমন হয়? না, যেমনি কতক মরছে অম্‌নি কতক জন্মাচ্ছে। বাপ মা মরবার সময় ছেলেমেয়ে রেখে গেল, আবার সেই ছেলেমেয়েরা মরবার সময় তা'দের ছেলেমেয়ে রেখে মরছে। এম্‌নি ক'রে সেই কোন অজানা আমল থেকে জন্মমৃত্যুর জের চলে আস্‌ছে।

এই মধ্যে একটা সুন্দর গ্রীক গল্প আছে। একটা লোক একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে করে দৌড়িয়ে চলছে। কিছুদূর এগিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে সে আর একজন লোকের হাতে মশাল দিয়ে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ছে। নতুন লোকটা আবার সেই মশালটা নিয়ে কতক-দূর ছুটে হাঁফিয়ে পড়ে আর একজনের হাতে সেই মশাল দিয়ে থেমে যাচ্ছে; সে আবার তা' নিয়ে ছুটে চলছে। এমনি ক'রে তা'দের

কেউই পথের শেষে পৌঁছাতে পাচ্ছে না, কিন্তু মশালটা নিভছেও না, থামছেও না। জীবনও এই মশালের মত। কেউ কিছুদিন বেঁচে থেকে মরছে, তা'র জীবন কতকগুলো ছেলেমেয়েকে দিয়ে যাচ্ছে, তারা আবার কিছু দিন কাটিয়ে তাদের ছেলেমেয়ে রেখে যাচ্ছে; এমনি করে প্রাণীর শেষ হ'চ্ছে বটে, কিন্তু প্রাণের শেষ হচ্ছে না। আমাদের এখন এই প্রাণের বিষয় জানতে হবে।

আচ্ছা বল তো, কোনো একটা জিনিষ বাঁচা কি মরা বুঝি কি করে? তোমরা হয়তো বলবে, যা' চলে ফিরে বেড়ায়, তাই বাঁচা, আর যা' এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় যেতে পারে না, তাই মরা। আচ্ছা গাছগুলো কি সবই মরা? মানুষে আগে কিন্তু তাই ভাবত। কিন্তু যখন সে একটু চিন্তা করতে শিখল, তখন দেখতে পেল যে নির্জ্জীব পাথর অথবা মাটীর চেয়ে সজীব মানুষ অথবা ভেড়ার সঙ্গেই গাছপালার কতকটা মিল আছে বলে মনে হয়। তখন সে ঠিক করলে যে গাছেরা আধা আধি বেঁচে আছে।

ক্রমে মানুষের পৃথিবীর জ্ঞান যখন আর একটু বাড়ল তখন সে জানল যে গাছেরাও প্রাণীদের মতই বাঁচা। প্রাণীরা চলে ফিরে বেড়ায় বলে বাঁচা, আর গাছেরা তাদের সেই চলে ফিরে বেড়াতে, বেঁচে থাকতে সাহায্য করে বলে বাঁচা। তা'হলে গাছেরা বাঁচা না হলে প্রাণীদের বাঁচতে সাহায্য করবে কি করে?

গাছপালা দেখতে ভারি শান্ত, কিন্তু তাদের বেঁচে থাকাটা জীব জন্তুদের ভারী দরকারী। কেননা তারা বেঁচে আছে বলেই জীবজন্তুরা বেঁচে আছে। যদি কোনো রকমে পৃথিবী একেবারে গাছপালা শূন্য হয়ে যেত; তা' হলে অতি ছোট পোকা মাকড় থেকে আরম্ভ কোরে মানুষ পর্য্যন্ত সব জীবই মরে যেত। সত্যি কিন্তু গাছের প্রাণ থেকে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে তাকে আধমরা বলা মানুষের ভারি অন্যায়। গাছেরা চেঁচায়ও না, লাফায়ও না; কিন্তু শুধু তা'দের প্রাণেই সব জীবের প্রাণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু নড়ে চড়ে ফিরলেই কোনো জিনিষকে জ্যান্ত বলা যায় না। অনুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে একটা পাথরের নুড়ি দেখ্‌লে দেখ্‌বে, তা'র ছোট ছোট কণাগুলো নড়ে চড়ে ফিরছে; এই পৃষ্ঠার লেখার কালির ছোট ছোট কণাগুলাও অমনি নড়ছে। তাই বলে কি পাথর, কালি এ সবকে সজীব বল্‌তে হবে? নড়ে চড়ে বেড়ালেই যদি সজীব হয়, তবে এই পৃথিবীতে নির্জ্জীব কিছুই নাই, কেন না, বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুই অহরহ নড়ে বেড়াচ্ছে।

কোন জিনিষকে কিসে বাঁচিয়ে রাখে, তা' জান্‌বার সব চাইতে ভাল উপায় হচ্ছে, কোনো সাদাসিদে জীবন পরীক্ষা করে দেখা। উদ্ভিদ্ জীবনই সব চাইতে সাদাসিদে জীবন। এই উদ্ভিদ্‌দের লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, যে জন্তুদের চেয়ে এদের বয়স বেশী, জন্তুদের আগে এদের সৃষ্টি হয়েছে। জন্তুরা যখন প্রথম পৃথিবীতে এসেছিল, তখন এদের থেকেই জীবন পেয়েছিল। এতেই বোঝা যায়, অতি সাধারণ জিনিষেও আমাদের ভেবে দেখবার মত কত বিষয় আছে। আর এতেই বোঝা যায় যে প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক প্রাণীকে সাহায্য না করলে, তাদের কেউ এ দুনিয়ায় টিঁকতে পারত না।

এখন আমাদের উদ্ভিদের জীবনের বিষয় নিয়ে বাঁচা মরার কথা আরম্ভ করতে হবে।

পৃথিবীর সব বড় বড় পণ্ডিতেরা অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করেছেন যে, সে অনেক, অনেক হাজার বছর আগে এমন দিন ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো রকম বাঁচা জিনিষই ছিল না,—গাছপালাও না। তা' থাকবেই বা কি করে, তখন পৃথিবী যে ছিল আগুনের গোলার মত একটা জ্বলন্ত গোলা। মাটী ছিল জলন্ত কয়লার মত গরম, আর জলগুলো গরম বাষ্পের আকারে শূন্যে বাতাসে ভেসে বেড়াত। যখন পৃথিবী একটু ঠাণ্ডা হোলো, সেই গরম বাষ্পগুলোর বেশীর ভাগ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে' পৃথিবীর ওপরের গর্ত্তগুলো সব ছাপিয়ে উঠ্‌ল, এ গুলোই হল সমুদ্র। তার-পরে যখন সমুদ্রের জল আরো ঠাণ্ডা হোলো, সূর্য্যের উত্তাপে ওপরের জল যেটুকু গরম হয়, তা'র চাইতে যখন ঠাণ্ডা হোলো, তখন সব চাইতে প্রথম সব চাইতে ছোট সাধারণ উদ্ভিদের জন্ম হোলো। কি গাছ জন্মালো ত' আমাদের খুঁজে দেখবার অত দরকার নেই, কেননা সব গাছই তো দেখতে প্রায় একরকম; ধর, তৃণ জাতীয় উদ্ভিদই প্রথমে জন্মেছিল, তবে মনে রাখতে হবে, সে তৃণ জলজ, যেমন শ্যাওলা।

এখন, গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি সব জ্যান্ত জিনিষের মত ঘাসও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচে, খেয়ে দেয়ে বড় হয়, তারপরে মরে যায়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তা'র আগে এই ধরণের কোনো জিনিষই ছিল না। সুতরাং যখন থেকে এই ধরণের জিনিষ দুনিয়ায় এলো, তখন থেকেই এখানে প্রাণের সূত্রপাত হোলো

এখন আর একটু ভাল করে উদ্ভিদ্‌জীবন নজর করে দেখতে হবে। আমরা সাধারণ ভাবে দেখলে উদ্ভিদে কিছুই বিশেষত্ব দেখতে পাই না। গাছ যতই বড় হোক যতই সুন্দর হোক, সাধারণ লোকের কাছে অতি ছোট মাছটী অথবা অতি ছোট ফড়িংটাও তার চাইতে বেশী আশ্চর্য্য বলে বোধ হবে। কিন্তু তা' হলে কি হবে? এই অচল প্রাণীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অজ্ঞাতে এমন সব কাজ করছে আর তার জোরেই সচল প্রাণীরা বেঁচে থেকে তাদের কাজকর্ম্ম করছে যে সব কাজ সচল প্রাণীদের করা অসম্ভব; এই হচ্ছে উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে আশ্চর্য্য। গাছেরা যা' করে, মানুষ তা'র সমস্ত বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক অনেক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে, এমন কি কলকব্জা বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়েও তা' করতে পারে নি। এক থোকা ঘাস চুপ করে থেকে সারাদিন ধরে যে সব কাজ অক্লেশে করে যাচ্ছে, মানুষ তা' ভেবে মাথা ঘামিয়েও করে উঠতে পারে নি; কোনো কালে পারবে বলেও মনে হয় না। উদ্ভিদের কাজ নিখুঁৎ, মানুষের কাজ ততদূর নিখুঁৎ হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

আচ্ছা, তা হলে বল তো, কি কাজ করে গাছ আমাদের চাইতে বড়? গাছ প্রায় সব জিনিষ থেকেই খাবার সংগ্রহ করতে পারে—কেমন করে, তা পরে বলছি,—কিন্তু জীব জন্তুতে গাছের দেওয়া খাবার ছাড়া আর কিছু খেয়ে থাকতে পারে না। তোমরা জান যাঁরা শাক সবজী খায়—উদ্ভিদ খায়—কিন্তু কোন মাংস খায় না, তাঁদের নিরামিষাশী বলে। কিন্তু যাঁরা মাংস খায়, তারাও তো নিরামিষ না হলে বাঁচতে পারে না, কেন না, জন্তুর মাংস খায়, (যেমন ছাগল কিম্বা হরিণ মেষ) সে-ই যে ঘাস খেয়ে,—উদ্ভিদ খেয়ে, বাঁচে। তা হলে দেখতে পাচ্ছ, উদ্ভিদ না

থাকলে জন্তুদের খাবার জুটত না, খাবার না জুটলে তারা বাঁচতও না।

এখন গাছের খাবার কথা শোনো। তারা হাঁ করে খায় না, কিন্তু খায় অন্য রকমে; না খেলে বাঁচে কি করে, বাড়ে কি করে? আবার এমনি মজা তারা খায়ও প্রায় সব জিনিষই। পৃথিবীর যে গুলো প্রধান উপাদান,—সেগুলো কিন্তু নির্জ্জীব—শুধু তা থেকে জীবজন্তুরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, কিন্তু উদ্ভিদ তাই থেকেই সংগ্রহ করে। সে গুলো হচ্ছে, বাতাস, জল আর মাটী। তা' হলেই বুঝতে হবে যে জন্তুদের জন্মের আগে উদ্ভিদের জন্ম; কেননা, অতি প্রথমে পৃথিবীতে খালি বাতাস, জল আর মাটীই ছিল।

কাল-বৈশাখী

[প্রদীপ্তানন্দ]

উড়িয়ে দিয়ে পাগলা ঝড়ের সর্ব্বনাশা জটা হে
ছড়িয়ে দিয়ে ছন্দে ছন্দে ক্ষণপ্রভার ছটা হে,
নিকষ কালো মেঘের বুকে নৃত্য কর কি সুখে
বজ্র তোমার দুন্দুভি সে গর্জ্জে ওঠে উৎসুকে।

ত্রিশূল তোমার ছুটে বেড়ায় ঝিলিক দিয়ে মেঘের গায়
ধূম্র নয়ন জ্বলে ওঠে নৃত্য মদে রক্ত ভায়।
ধ্বংস ক্ষেপা জাগে তোমার চপল চরণ বিক্ষেপে
নিঠুর মরণ কাত্‌রে উঠে ব্যর্থ প্রাণের আক্ষেপে!

বিশ্ব ভুবন ভাঙ্গো ভাঙ্গো ছন্দ-ভাঙ্গা, ধূর্জ্জটী
উড়িয়ে ফেল উড়িয়ে ফেল নিয়মের এই ভ্রুকুটী।
বট অশথের মাথা ভাঙ্গুক—ভাঙ্গুক তোমার হুঙ্কারে
ভাঙ্গুক, ছিঁড়ুক, চূর্ণ করুক ত্রাস দিয়ে হে শঙ্কারে।

যাক ঝরে যাক মেঘের-বারি, পথের ধূলায় যাক মিশে
যাক খুলে যাক উপরের ঐ ঝর্ণামুখের ঢাকনি সে।
যাক পড়ে যাক ঘর দুয়ার সব প্রত্নযুগের নির্ম্মাণ
সৃষ্টিছাড়া আজিকে তোমার সৃষ্টিভাঙ্গা তীব্র হান।

মুণ্ডগুলো গড়িয়ে দিয়ে বস শ্মশান আসনে
খটখটা খট বাজবে কপাল কল্প শেষের ভাষণে।
মাথার খুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজবে মধুর বাঁশরী
তালে তালে নাচবে রে ভূত আপনাকে আজ পাসরি।

একাদশ হে রুদ্র তুমি নিবাস উর্ম্মি সংঘাতে,
পদ্মা গঙ্গা গর্জ্জে পাগল তোমার মণি জঙ্ঘাতে।
ধ্যানের আসন পাতা তোমার ঘূর্ণী, তুফান ধর্ষণে
অগ্নিগিরির শিখরেতে গলা পাথর বর্ষণে।

বাংলা দেশের বুকে তুমি জাগছ নাক' কি লাগি,
ছিঁড়ে শিকল জ্বালিয়ে আগুন এসো ওগো বৈরাগী।
দমন কর হনন কর চূর্ণ কর অত্যাচার,
নমস্কার হে নমস্কার গুরু ওগো দুর্ব্বাসার।

ডেলি প্যাসেঞ্জার *

[শ্রীসুবোধ রায়]

[ধনঞ্জয়ের সুসজ্জিত বৈঠকখানা—ধনঞ্জয় একটা ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট। পুরন্দরের প্রবেশ। তাঁহার দু'হাতে আলোর চিম্‌নি, বড় কাঁচের পুতুল, একটা খেল্‌না-সাইকেল, দুটি বোতল ও অন্যান্য দ্রব্য। শূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একান্ত শ্রান্ত ভাবে সোফায় ঢলিয়া পড়িলেন]

ধনঞ্জয়:—আরে, পুরন্দর যে! কেমন আছ? ওঃ, তোমায় দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। তার পরে, কি মনে ক'রে এখানে?

পুরন্দর:—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) আর ভাই ... ... হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। ... ... তোমার কাছে জোড়হাত করছি ... ... একদিনের জন্যে আমাকে একটা রিভলভার ধার দাও ভাই,... ... বন্ধুর কাজ কর।

ধন:—রিভল্‌ভার? রিভল্‌ভার নিয়ে কি করবে?

পুর:—ও জিনিষটা আমার চাই-ই ... ... আরে বাপ্‌রে ... ... একটু জল দাও,

* Anton Chekov অবলম্বনে।

জল ... .. দেখ ওটা আমার বিশেষ দরকার ... ... আমাকে আজ রাত্রে একটা বনের মধ্যে দিয়া যেতে হবে কিনা ... ... যদি কোন বিপদ্ আপদ্ ঘটে .. ... দেখ দয়া ক'রে রিভল্ভারটা আমায় ধার দিতেই হবে।

ধন :—(তিরস্কারের স্বরে) পুরন্দর, তুমি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী! অন্ধকার বনের মধ্যে চলার তোমার কি দরকার? আমি বুঝেছি, তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি—তোমার কুমৎলব আছে! ব্যাপার কি—তোমার কোন ব্যারাম হ'ল নাকি?

পুর :—দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমাকে একটু নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় দাও। উঃ মাগো—একেবারে কুকুরের মত ধুঁক্‌ছি। আমার সমস্ত শরীর ও মাথার মধ্যে কেমন করছে! ... ... নাঃ আর সহ্য হয় না! দেখ আমায় যদি এখন কোন প্রশ্ন না কর, আর বিস্তারিত জান্‌বার জন্য জেদ না কর, তবেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হয়! তোমার পায়ে পড়ি—আমায় রিভল্ভারটি দাও।

ধন :—দেখ পুরন্দর, একি অদ্ভুত কাপুরুষতা তোমার? তুমি ৩৪ ছেলের বাপ, গভর্ণমেণ্টের এত বড় দায়িত্ব পূর্ণ একটা কাজ তোমার হাতে! ছি, ছি!

পুর :—হাঁ! আমি একটা পরিবারের কর্ত্তা! প্রকৃতপক্ষে আমি কি তা জান? আমি হচ্ছি একটি বলির জীব-ভারবাহী পশু—ক্রীতদাস—আমি হচ্ছি এক জানোয়ার—তাই ভবপারের দিকে যাত্রা না ক'রে এখানেই যদি কিছু ঘটে সেই আশায় বসে আছি। আমি বোকা, আমি মূর্খ—আমি বেঁচে আছি কেন? কি প্রয়োজনে? (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) বল, বল, আমার বেঁচে থাকার দরকার কি? এই যে দেহের ও মনের অশেষ যন্ত্রণা নিয়ত ভোগ করছি, এর সার্থকতা কোথায়? কোন একটা আদর্শের জন্য আপনাকে বলি দেওয়ার মানে বুঝতে পারি! কিন্তু এই মেয়েদের পোষাক, আলোর চিম্‌নি ইত্যাদির জন্য নিজেকে বলি দেওয়া! নাঃ—তাতে আমি রাজি নই—নই—নই! আমার খুব হ'য়েছে, আর কাজ নেই!

ধন :—অত চেঁচিও না হে, পাড়ার লোকে শুন্‌তে পারে।

পুর :—তোমার পাড়ার লোকে শুনুক আর না শুনুক, আমার পক্ষে দুইই সমান। রিভল্ভার তুমি না দাও, আর কেউ দেবে। যে কোন উপায়েই হ'ক, আমার আজ "ইতি" জেনো! এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

ধন :—আরে, থাম, থাম! দেখ্‌ছ না—বোতাম ছিঁড়ে ফেল্‌লে যে! শান্ত হও, শান্ত হও! আমি এখনও ঠিক বুঝছি না তোমার জীবনের দুঃখটা কি?

পুর :—কি দুঃখ? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, আমার দুঃখ কি? বল্‌ছি—! আচ্ছা, তোমাকে সব কথা খুলে বল্‌ছি, মনটা তা' হ'লে তবু অনেকটা হাল্‌কা হবে! এস বসা যাক্—শোন বলি—ওঃ মাগো—একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি! আচ্ছা,—আজকের কথাটাই ধরা যাক্,—ধর আজকের কথাটাই! জানত, ট্রেজারিতে আমাকে দশটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়। সেখানে ভীষণ গরম! হাওয়া নেই—দম বন্ধ হ'য়ে আসে—তার উপর আবার মাছি! আর কাজের কথা কি আর বলব ভাই, সে এক রসাতল কাণ্ড! সেক্রেটারি ছুটি নিয়েছেন, নরহরি বাবু বিয়ে কর্ত্তে গেছেন! আর বাকী

২।৪ জন চুনোপুঁটি দেশে গেছেন—কেউ প্রেম করতে, আর কেউ বা সখের দলের থিয়েটার করতে! যাঁরা আছেন, তাঁরা নিতান্তই শ্রান্ত, ক্লান্ত আর সর্ব্বদাই ঝিমুচ্চেন। তারা যে কি বলে আর কি করে, কিছুই বোঝবার যো নেই! সেক্রেটারির কাজ যাঁর হাতে, তিনি বাঁকাণে কম শোনেন, তার ওপর আবার প্রেমে পড়েছেন। সাধারণের স্মৃতি শক্তির হ্রাস ঘটেছে। সকলেই রাগে গজরাচ্ছে, আর ছুটে বেড়াচ্ছে! আর সেই জন্যে এমন কোলাহল হচ্ছে, যে নিজের কথা নিজেই শুনতে পাওয়া যায় না! সমস্ত ব্যাপারই বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বোধ্য। আর আমার কাজ একেবারে প্রাণান্তকর! চিরকাল সেই এক ভাবে চলেছে। প্রথমে ভুল সংশোধন—তার পর মিলিয়ে নেওয়া; আবার সংশোধন, আবার মিলিয়ে নেওয়া—এ একেবারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একঘেয়ে ব্যাপার। মনে হয় চোখ্ দুটো যেন কপাল থেকে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে!—একটু জল দাও ভাই—ঃ—হাঁ, যখন গেটে খুঁট বেরুলাম তখন একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত ভগ্ন দশা! তখন প্রাণ চাইছে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে! কিন্তু সেটি হ'বার জো নেই! তোমার মনে পড়ল তুমি পল্লীগ্রামে বাস কর। অর্থাৎ কিনা—তুমি কৃতদাস, ছেঁড়া নেকড়া! এখনি তোমাকে নানা ফরমাস খাটবার জন্য ছুটে বেড়াতে হবে। আমরা যেখানে থাকি সেখানে বেশ এক সুন্দর রীতি গড়ে উঠেছে। যখ ই কোন লোক সহরে যাবে গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের—নিজের স্ত্রীর কথা ছেড়েই দাও—তার উপর গাদাখানিক ফরমাস চাপাবার অধিকার ও ক্ষমতা আছে। স্ত্রী হুকুম দিলেন—"তোমাকে দরজির ওখানে গিয়ে তাকে ধম্‌কে আস্‌তে হবে কারণ সে বডিস্‌টা কাঁধের কাছে অত্যন্ত সরু ও বুকের কাছে অন্ততঃ চওড়া ক'রেছে। খুকুর এক জোড়া জুতা চাই—তোমার শালীর দু' টাকা গজ এই ক্লাক pattern এর সিল্ক চাই। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। (পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন)—এক পাউণ্ড চা, বামের জন্য ক্যাষ্টর অয়েল, পাঁচ সের চিনি, চিনির জন্য Copper jar, কারবলিক এসিড, পোকা মারবার পাউডার, দুটো লিথিয়া ওয়াটার—এইতো গেল নিজের স্ত্রীর এবং বাড়ীর ফর্দ্দ। তার পর তোমার সুহৃদ্‌বর্গ ও প্রতিবেশীদের ফরমাস আছে। কাল শস্তুর জন্মতিথি, তার জন্যে একটা খেলাঘরের সাইকেল চাই, দুর্গাচরণের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা অতএব তাঁর জন্যে রোজ একবার ক'রে দাইয়ের বাড়ী যেতে হবে। এই রকম আর কত বলব। পাঁচখানি নোট আমার পকেটে, আর সেগুলিকে আলাদা আলাদা বাঁধতে গিয়ে আমার রুমালটি বিল্‌কুল্ গেরো বনে' গেছে। এই জন্যে অফিস করে' ট্রেন ধরবার ভিতরে সমস্ত সময়টা কুকুরের মত জিব বার ক'রে' সহরময় ছুটোছুট করে বেড়াতে, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে অভিশাপ দিতে হয়। কাপড়ের দোকান থেকে ওষুদের দোকানে, ওষুদের দোকান থেকে দর্জ্জির দোকানে, সেখান থেকে মাংসের দোকানে, সেখান থেকে আবার ওষুদের দোকানে! এক জায়গায় হোঁচট খাই, আর এক জায়গায় টাকা হারাই, তৃতীয় জায়গায় টাকা দিতে ভুলে যাই আর তারা পিছনে পিছনে তাড়া করে, আর চতুর্থ জায়গায় কোন ভদ্র মহিলার পা মাড়িয়ে ফেলি। এই সব ব্যাপারে এমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি যে সমস্ত রাত্রি

ধরে হাড়ের ভিতর বেদনা করে আর কেবল কুমীরের স্বপ্ন দেখি। আচ্ছা—জিনিষ তো সব কেনা হ'ল! কিন্তু এখন এই সব জিনিষ pack করা যায় কি ক'রে? অর্থাৎ একটা ভারি তাঁবার jarএর সঙ্গে চিম্‌নি কিংবা Carbolic Acidএর সঙ্গে চা বাগিয়ে নেবে কি ক'রে? এর জন্য ভীম সেনের শক্তি, আর অর্জ্জুনের বুদ্ধি চাই! যত রকম কৌশলই ঠিক কর না কেন, শেষ কালে কিছু না কিছু ভেঙ্গে বা ছড়িয়ে বসে আছে। তার পর ষ্টেশনে আর ট্রেনে চার পাশে জিনিষ পত্র নিয়ে দু' হাতে জিনিষ ধরে, বগল দুটি ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি। ট্রেন যেই ছাড়ল, অম্‌নি passengerরা জিনিষ পত্র নিয়ে ছুঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল! হয়তো কারুর seatএ জিনিষ পত্র রেখেছি—তারা চেঁচামেচি ক'রে গাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে চায়—গার্ডকে ডাকে—হৈ হৈ ব্যাপার! কিন্তু করব কি? চুপ্‌চাপ্ গাধার মত চোক্ মিটমিট ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। তার পর শোন, কোন রকমে তো বাড়ী পৌছন গেল। তুমি ভাবছ এই দারুণ পরিশ্রমের পর বেশ আরাম ক'রে 'পেট ভ'রে' পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খেতে পাব! সেটি হ'বার জো নেই—কারণ পশ্চাতে স্ত্রী আছেন। ঝোলের বাটিটা টেনেছি কি না টেনেছি, অম্‌নি নানা রকম আবদার আর বায়না আরম্ভ হ'ল। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই—যেহেতু আমি স্বামী। আর বাংলা কথায় স্বামী মানে কি জান তো? স্বামী—অর্থাৎ কিনা এমন একটি মূক পশু যার উপর যত ইচ্ছা বোঝা চাপালেও পশু অত্যাচার-নিবারণী-সভা থেকে শাস্তি পাবার কোন ভয়ই নেই। কাজে কাজেই প্রতিবাদ কর্‌তে পারি না—তাঁর লেক্‌চার শুন্‌তে শুন্‌তে রাত্রি দুপুর হয়। তখন মনে হয়, আমি আর মানুষ নই, ঘর পোছা নেতা মাত্র। অবশেষে অব্যাহতি পেয়ে শুতে যাওয়া গেল: এতক্ষণে প্রাণ যা চাইছিল তাই পেয়ে ভাবলাম—"ক্যা তোফা"—একবার চোখ বুজলেই ঘুম। সমস্তই যেন বেশ স্নিগ্ধ সুন্দর ও কবিত্ব মাখা ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল। শেষে ঘুমও এল—কিন্তু হঠাৎ শুন্ শুন্ শুন্! মশা! (লাফাইয়া উঠিয়া) মশা হচ্ছে ইজিপ্টের প্লেগ, শূলে চাপার যন্ত্রণার সমান। শুন্, শুন্, শুন্ তোমার কানের গোড়ায় এমন বেদনার সুরে ডাক্‌বে, মনে হবে যেন তোমার কাছে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু বেটা এদিকে এমন কামড়ান কামড়াবে যে ঘণ্টাখানেক ধ'রে চুলকুতে হবে। পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা দিলাম, কিন্তু এমন ক'রে কতক্ষণ থাকব! অবশেষে বাধ্য হ'য়ে তাদের হাতে আত্মসমর্পন করি। কোন রকমে যদি মশাটা অভ্যাস হ'য়ে এল, অমনি আর এক যন্ত্রণা. পাশের বাড়ীতেই থিয়েটারের Rehearsalএর গান আরম্ভ হ'ল। আঃ সে কী নাকী-সুরে গান, মশার গুন্‌গুনানি তার কাছে লাগেই না। (গান গাহিয়া)—"দেখ সখা ভুল ক'রে ভালবেস না"—কী বীভৎস চীৎকার! প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলে। যাতে শুন্‌তে-না হয়, সেই জন্যে কাণে খানিক ক'রে তুলো গুঁজে দিই। এই ভাবে রাত ১॥০।২টা বেজে যায়! আবার এদিকে ৭টার মধ্যে উঠে খেয়ে বা না খেয়ে ষ্টেশনে ছুট্‌তে হবে জল কাদা ভেঙ্গে, পাছে গাড়ী ফেল হয়ে যাই। তারপর সহরে পৌছে আবার এই ব্যাপারের পুনরাভিনয় আরম্ভ করি। এ এক ভয়ানক জীবন—বুঝলে? অতি বড় শত্রুরও যেন এরকম না হয়। আমার নানা

রোগে ধরেছে—হাঁপানি, বুক জ্বালা—আর সর্ব্বদাহ ভয় হচ্ছে কি যেন কি একটা ঘটবে। তার উপর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—চোখের সাম্‌নে সব ঝাপ্‌সা দেখি—(চারি দিকে চাহিয়া) দেখ—এই শুধু—তোমার কাছেই বলছি—একবার গঙ্গা ময়রার নাতির কাছে আমি যেতে চাই—আমাকে বোধ হয় কোন রকম ভূতে পেয়েছে। রাত্রে যখন এই সব ব্যারামের যন্ত্রণা হয়, মশা কামড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নাকী সুরের গান আরম্ভ হয়, তখন হঠাৎ যেন সব অন্ধকার হয়ে আসে; বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বাড়ীময় পাগলের মত ছুটে বেড়াই আর চেঁচাই—"রক্ত চাই, আমি রক্ত চাই!" সেই সময়ে ইচ্ছা করে কারও বুকে ছুরী বসিয়ে দিই বা চেয়ার ছুঁড়ে কারও মাথা ফাটিয়ে দিই! এইতো জীবন! কিন্তু আমার প্রতি কারও একটুও সহানুভূতি নেই, আর সবাই মনে করে যে আমার অভিযোগ কর্‌বারও কিছু নেই। এমন কি লোক হাসে, কিন্তু জেনো আমিও মানুষ, আমিও বেঁচে থাকতে চাই। ব্যাপারটা farce নয়—একটা Tragedy! দেখ, তুমি আমাকে বিভল্‌ভার দিতে না পার, অন্ততঃ একটু সহানুভূতিও দেখাতে পার তো!"

ধন :—নিশ্চয়ই—আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে!

পুর :—হাঁ, তোমার যে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে তা' বুঝেছি! আচ্ছা তবে আসি। এখনও tooth powder, আরও দু'একটা জিনিষ কিনে তবে ষ্টেশনে যেতে হবে।

ধন :—তুমি এখন আছ কোথায়?

পুর :—রাণাঘাটে।

ধন :—(সানন্দে) তাই নাকি! তাই নাকি! তা' হ'লে তুমি মিস্ দত্তকে জান? তিনি তো এখন ওখানেই থাকেন।

পুর :—হাঁ, আমি তাঁকে জানি এবং সম্প্রতি আমাদের পরস্পরের আলাপও হ'য়েছে।

ধন :—চমৎকার! ভারি সুবিধে হ'ল! কেবল তুমি যদি একটু দয়া কর।

পুর :—(চমকিয়া) এ্যাঁ! কি!

ধন :—দেখ ভাই—আমার হ'য়ে একটা কাজ করবে না? তুমি বিশেষ বন্ধু, কথাটা রাখবে বল?

পুর :—ব্যাপারটা কি?

ধন :—দেখ, এটা বিশেষ বন্ধুর কাজ করা হবে। প্রথমতঃ মিস্ দত্তকে আমার নমস্কার দিয়ো। তা'র পর কিছু জিনিষ তুমি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি আমার কাছ থেকে একটা সেলায়ের কল চেয়েছিলেন। কিন্তু এমন লোক পাই না যার হাত দিয়ে সেটা পাঠাই। তুমি এটা ভাই দয়া ক'রে নিয়ে যাও। আর এই খাঁচা শুদ্ধ টিয়াটাও অমনি নিয়ে যেয়ো।—দেখ—একটু সাবধান—দরজাটা যেন ভাঙ্গে না।—এ্যাঁ—তুমি অমন ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?

পুর :—কী—একটা সেলায়ের কল! ... একটা খাঁচাশুদ্ধ টিয়া ...

ধন :—ওহে পুরন্দর—ব্যাপার কি? তোমার মুখচোখ এমন লাল হ'য়ে উঠ্‌ল কেন?

পুর :—(মাটিতে পদাঘাত করিয়া) দাও সেলায়ের কল—নিয়ে এস পাখীর খাঁচা ... এইবার নিজেও তার উপর চড়! আমাকে খেয়ে ফেল, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল!

খুন কর আমাকে! (হঠাৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) আমি রক্ত চাই—রক্ত!

ধন:—কিহে, ক্ষেপে গেলে নাকি?

পুর:—(সশব্দে অগ্রসর হইয়া) আমি রক্ত চাই,—রক্ত!

ধন:—(সভয়ে) এতো পাগল হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি! ওরে রামা, হীরে, শীগ্‌গির আয়! ওগো কে আছ? রক্ষে কর, রক্ষে কর!

পুর:—(ধনঞ্জয়কে টেবিলের চারিদিকে তাড়া করিয়া)—আমি রক্ত চাই—রক্ত—

(যবনিকা পতন)

বিদ্রোহী

[শ্রীপবিমল কুমার ঘোষ]

দাও দাও তব আঘাত কঠিন,
বুক পেতে এই দাঁড়ানু আজ,
ওগো বিশ্বের কঠোর দেবতা!
ওগো নির্ম্মম রাজাধিরাজ!
হের দাঁড়াইয়া উন্নত শির
ধরণীর শিশু অবিচল স্থির,
তোল তোল তব ন্যায়ের দণ্ড,
উদ্যত কর শাসন বাজ!

জানি তুমি চির অবিনশ্বর,
তুমি অনন্ত শকতিমান,
ইঙ্গিতে তব সৃজন প্রলয়,
জীবন মৃত্যু তোমারি দান;-
তেমনি অনাদি অন্তবিহীন
নরদেবতার লীলা চিরদিন,
তেমনি অজর মৃত্যু বিজয়ী
মানবের এই ক্ষুদ্র প্রাণ!

প্রতিদিন শত নিপীড়ন সহি',
শত অবিচার বহিয়া হায়,
চির-পদানত ক্রীতদাস সম
কে লুটাবে শির তোমার পায়?
ফিরে লও তব হাসি শোভা গান,—
হেলার ভিক্ষা,-করুণার দান,
চাহি না এ খেলা মেটাতে খেয়াল
তব হাতে ক্রীড়াপুত্তুল প্রায়।

তাই লয়ে খেলা খেলিছ নিঠুর
বেদনা বিথারি ভুবনময়,
অত্যাচারের কঠোর পীড়নে
চিত্তেতে চাহ করিতে জয়!
হের ধূমায়িত রোষ নিষ্ফল
শিখা বিস্তারি' বরষে অনল,—
মানব-মর্ম্ম-বহ্নির জ্বালা
সৃষ্টিরে তব করিবে লয়!

দুঃখের ভার বহিবারে আর
অন্তর মাঝে নাহিক ঠাঁই,
যে আঘাত দেছ অকারণে, আজ
শতগুণে দিব ফিরায়ে তাই!
করুণা মাগিয়া লভেছি অপার
লাঞ্ছনা দুখ-জ্বালা অনিবার,
উগারি' সে সব তীব্র গরলে
নন্দন তব করিব ছাই!

বিদ্রোহী আমি দৃপ্ত কঠিন,
বক্ষে তোমার হানিব আজ
সন্তানহারা মায়ের অশ্রু,
নিঃস্বের ব্যথা, সতীর লাজ!-
রক্ত-নয়ন হবে কি সজল,
নিঠুর হিয়া লাজ-চঞ্চল?
পড়িবে কি খসি' শাসন-দণ্ড
ওগো কল্পিত নিখিলরাজ?

পাগলের ডায়েরী

সোমবার, সাড়ে এগারটা।

সারাবেলা কেবল মিছি মিছি কুড়েমী করে মিছে আলসেমীতে জীবন যাত্রা।

সারা বেলা শুধু নদীতীরে
বালু লয়ে খেলা ধীরে ধীরে
বয়ে যায় বেলা
ছেড়ে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালনীরে

তারপর তোমার পুরুষকার আর তাঁর শুভেচ্ছা—সেই রাঙা পদ্মের উপর দুটি আবীর-রাঙা পাদুখানি রেখে হাঁসের উপর লীলায়িত ভঙ্গীতে, বীণা হাতে বই হাতে চোখে মঙ্গল দৃষ্টি নিয়ে যিনি বসে আছেন, তাঁর কৃপায় তুমি চল চল—

চল চল চল যাত্রী
বিজন পথের আঁধার ভেদিয়া, মাথে লয়ে
কালরাত্রি!

পূর্ব্ব দুয়ারে, অরুণিমাময়ী ঊষা তোমাকে বরণ করে' নেবার জন্য তাঁর তরুণ হস্তে অমল ধবল শংখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—তুমি নিরাশ ক'রোনা তাকে।

২৯শে মার্চ্চ সতেরই চৈত্র, মঙ্গলবার—

সেই সেই দিনতো তোমার সাথে প্রথম আমার পরিচয় "খেয়াঘাট" প'ড়ছিলাম—তখন কি কারুর মনে ঘুণাক্ষরেও জেগেছিল যে জীবনের খেয়াঘাটে দুজনকে লগিঠেলে, দাঁড়বেয়ে জাল তুলে পারাপার করতে হবে। তারপর কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি' তাই, খেয়ে আমার দুয়ারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে "তখন আমি ফিরাতে পারি কি তোমারে" কিন্তু দুজনের মিলনে যে সুধা উঠেছিল, তা কি গরলে উপ্‌চিয়ে উঠবে কে জানে?

সেই সকালে স্পন্দিত হাতে একযোগ আকুল ব্যাকুলতা পোরা হিয়ার রক্ত আখরের মালা আমার শরৎ শিশির ঢালা প্রাতে আমার কাছে যেয়ে পৌঁছিল। আমার চলে আসায় তোমার মনে সত্যিই কি এত কষ্ট জেগেছিল? বিদায়ের বেলা সেই ছল ছল আঁখি দুটো কি

এত কথাই করেছিল ? কই সে দিনতো তা বুঝতে পারিনি ? তবু ও তোমার কথার মালা আমার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে। সত্যিই কি তোমার

সন্ধ্যা সকাল কেবল আনাগোনা
শুধু মুখের একটি কথার আশে।
হঠাৎ যদি চোখে চোখেই হয়
সোহাগ ভরে যদি একটু হাসে!

এতো ভালবেসেছিলে ? তা যদি তখন জান্‌তাম তবে বুকের রক্তে পা ধুয়ে দিতাম্, তা কি বুঝেছিলেনা ? এক মাসের সেই চিঠির পরিচয়, তোমার প্রেমের ভিত্তির উপর ইমারৎ গড়ে তুলেছিল—সে ভালই হয়েছিল। হয়ত ভাল করে' ভিত্তি না গড়ে' তুল্‌লে, কবে ইমারৎ ভেঙে পড়ে' যেতো! যাক্—চিঠির পর চিঠি আমার মন প্রাণকে অভিভূত করে ফেলেছিলো। কি সেদিন পেয়েছিলে প্রিয়—যাতে তোমার অত কথা জুগিইছিলো ?—তার এক কণাও কি আজ অবশিষ্ট নেই! বল, যদি এক কণাও থাকে তবে তাকে আমি তোমার পায়ে তুলে দিই।

নিখিলশ্যামল কিরণে উজল অন্ধ আঁখিতে কি কালোর এত রূপকীর্ত্তনে ও মন গিইছিলো ? মুখের শোভা কালো তিলে তাতো তুমিই আমাকে জানিয়েছিলে! সত্যিই কি আমার দুটি মণিই কালো ? আজ আর সে কালো চোখে সেদিনের মাধুরী খুঁজে মেলে না। আজ আর কালো মেঘে কারুর ছবি আঁকা চোখে পড়ে না। না, তুমি যে কবি, 'কাব্য' পড়ে' যেমন বুঝি, কবি তেমন নয় গো"—

মাথায় মাণিক হ'তে সইলনা—তবে তো আজ এ লাঞ্ছনা ভুগ্‌তে হ'তো না, আজ প্রতি পদে পদে তোমাকে যা ভুগ্‌তে হচ্ছে। যে ক্ষুধা অসীম হয়ে তোমার প্রাণে জেগেছিল, তার তৃপ্তি কি পেয়েছো বন্ধু ? নিরবলম্ব সঙ্গী বিহীন বর্ষমাস কি ভুল্‌তে পেরেছো ? প্রাণের ক্ষুধা চোখের তৃষার সে অতৃপ্তির শান্তি আমি কি এত টুকুও কর্‌তে পেরেছি ?

তোমার বিরহ দিনের গান আজও আমার রয়ে রয়ে' কাণে বাজে!

এসহে এস সকল চাওয়া সকল পাওয়া ঘুচাইয়ে
ব্যাথায় ভরা নয়নজল আপন হাতে মুছাইয়ে
সে ব্যথার জল কি মুছাতে পেরেছি ?

সত্যিই কি তোমার মনের গোপনগান আমি ফুটিয়ে দিলাম ? সেতো স্বপ্ন বলে আজ মনে হয়।

ওগো, তোমার আঁধার ঘরে আমার আলো দী-প কি তোমার অন্ধকারের শ্রান্তি হরণ করেছিলো ? না—সে দী-প কবেঝড়ের রাতে নিবে গিইছিলো—তারই আলোহীন অচল কায়া তোমার ঘরকে আজ আবর্জ্জনায় ভরে রেখেছে—না—একটা দিনও তোমার জীবন ভরা যত দীনতা সব যদি সরাতে পেরেথাকি, সেই আমার সার্থকতা।

আজ মনে পড়ছে সেই নিশীথরাতে চুপি চুপি টেনে এনে কানে কানে বলা "আমার বুকের ধন হয়ে তুমি থেকো 'চিরকাল বুকে'

ভাঙাঘরে তুমি চাঁদের আলো যে
আঁধার পথের বাতি
এস ওগো এস বুকে করে' তোমা
কাটাব' সারাটি রাতি।

তোমার শূন্য গেহ কি দরদীর দানে ভরে গিইছিলো ?

তোমার প্রাণে কত ভাবে আমি ছিলাম প্রিয় ?

আমার দুষ্ট কথা কি তোমার মিষ্টি লেগেছিলো বন্ধু ?

আমার তপ্ত বুক শুনবে বলে কোনও দিন কি অনাসৃষ্টি বাধিয়েছিলে ?

আমার ডাগর চোখের মিষ্টি চাওয়া সেকি সত্যিই কোন দিন মিষ্টি লেগেছিল ?

সেদিন আজ আর মেলে না—মনে পড়ছে সেই এক সন্ধ্যায় দেখতে না পেয়ে বুকে মাঝে কি কাদন তোমার জেগে উঠেছিল ? সেই প্রতীক্ষার কথা—

কাণে কাণে তোমার কথা শুনি
বুকে তোমার পায়ের শব্দ শুনি
কখন তুমি আসবে ওগো গুণি !

কোনও দিন কি শুধু নাম ধরে ডাকবার ইচ্ছা হয়েছিল শুধু ভোরের আকাশের মত চেয়ে দেখবার সাধ হইছিল—এই মুখ ?

আজ এই তকুর নিরালা ঘরের কোণে তোমার কৌতুকের হাসি আমার বেদনা-ভরা মনের কাছে কেবল ফুটে উঠছে—সেই আকুল বিলাসে যেদিন বুকে ধরে 'হৃদয়রক্ত মন্থন করি প্রেমের চিহ্ন অঙ্গে' অঙ্গে এঁকে দিয়েছিলে ? আমি কি যুগল বাহুতে তাই ঢাকতে চেয়েছিলাম—না সে আমার আবেশঘন লজ্জার প্রতীক, সেযে তোমার--

বুকের রক্তে ফুটে উঠিছিল প্রেমের চিহ্ন
শক্ত তাহারে মুছে ফেলে দেওয়া হাতে ;
প্রদীপ লুকায়ে রাখা কি সহজ, হে মোর
পরাণ প্রিয়
গভীর আঁধার রাতে— ?

বুঝি কোনওদিন অভিমানভরে বলেছিলাম—ভালবাস না তাই তোমার জবাবদিহি--

ভাষ দিয়ে ভালবাসার কথা
বলতে' যাওয়া নিতান্ত দুরাশা
এইটে শুধু জেনে রেখো মনে
আমার পথে তোমার যাওয়া আসা।
লক্ষযুগের জীবন মরণ পণে—
পথের যাত্রী তুমিই আমার সনে।

ক'জন লক্ষযুগের পথের যাত্রী হয় প্রিয়তম ?

না থাক

"ব্যথা তোমায় দিবো নাকো ব্যথা জানিয়ে।"

একত্রিশে মার্চ্চ বিষ্যুদবার

আমি কেন তার সাথে মন্দ ব্যবহার করি, তারই কৈফিয়ৎ দেবার সময় এসেছে বোধ হয়। তারই প্রসঙ্গে গোটাকয়েক কথা পেলাম, সেটাই টুকে রাখছি—

"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ার মুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনা পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাংখার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেই জন্য সত্যকথা দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাস এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে .... প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে বিরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেছে .... বিদ্রোহী অভিমান বলে আমি ভব্যতার ধার ধারি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণ কালের খেলা মাত্র আমি চিরস্থায়ী

একনিষ্ঠার ধার ধারি না—একান্ত বেদনাকে স্পর্দ্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর।" (রবীন্দ্র নাথ)

আমার সহিত এর কোথায় ঐক্য তা অনেকে না বুঝলেও আমি বেশ বুঝছি—শেষের কথাগুলোতো হুবহু আমার কথা।

দোস্‌রা বাদল

(তনুমধ্যা ছন্দে)

[শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

অদ্ভুত মম নন্দন!
নাই একটুকু ক্রন্দন।
গোলগাল দেহ, চঞ্চল;
কে রয় ধরি' অঞ্চল?
গান গায়, খেলে এক্‌লাই,
রূপ নয় তত খোল্‌তাই।
চোখ মুখ বড় সুন্দর!
উজ্জ্বল তাজা অন্তর।
তিন বৎসরে পড়্‌তেই,
বল বুদ্ধিতে ভুল নেই।
দিনরাত করে গল্পই,
এইরূপ ছেলে অল্পই।

মোর এই ব্যাটা দুর্জ্জয়,
গুর্খার মত নির্ভয়।
ঝঞ্ঝার দিনে জন্মায়,
তাই প্রাণ নাচে ঝঞ্ঝায়।
হাঁক্ দেয় দেয়া 'কড় কড়',
যায় অঙ্গনে, কে ডর?
চাঁদ আস্‌মানে দেখলেই,
'আয় তান' বলে' ডাকবেই!
জ্যাব্‌ চাঁদ দিয়ে ভরবার,
সাধ তার জাগে দুর্ব্বার।

দুই মুঠ ভরে নির্ব্বোধ!
হয় মোর সুখে বাক্‌রোধ!
কাষ্ঠের ছোট পুত্তল,
দেখলেই বলে 'ছুন্দল'।
কয় মৌ-মুখে 'বৌ এই'।
'তোল্‌ বৌ, বাবা, আল্‌ নেই?'
দৌড় ঝাঁপ দেবে হর্দ্দম,
দিন্‌ ভর মাখে কর্দ্দম।
কুত্তার মুখে দেয় হাত,
দিনরাত করে উৎপাত।
ব্যাঘ্রের মত রাগ তার,
রাগলেই নাশে সংসার।
হাস্যের তবু শেষ নাই,—
সাব্বাস ব্যাটা, এই চাই!

রোস্‌ দিল্‌খোলা, বাপ মোর!
অন্তর খাঁটি রাখ্‌ তোর!

গুলজার করি' সংসার,
নিস্ পথ খুঁজে বাঁচবার!
বিদ্যায় হয়ে মশগুল,
জয় কর ধরা বিল্‌কুল!
আত্মার রেখে সম্মান

রাখ্ ফূর্ত্তিতে খান্দান!
তোর কীর্ত্তিতে মোর জয়,
মঙ্গল তোরি নিশ্চয়!
যুগ যুগ ধরে' জপ কর্
শৌর্য্যের সাথী ঈশ্বর!

পুস্তক সমালোচনা

[বেতাল ভট্ট]

স্বপন পসারী।—শ্রীমোহিত লাল মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস, ষ্ট্রীট মূল্য ১৲ টাকা।

বিড়াল ছাগল ইত্যাদি জন্তু রাশি রাশি সন্তান প্রসব করে—সিংহী বারো বৎসর অন্তর এক একটি শাবকের জন্মদান করে। মোহিত-বাবুর এই গ্রন্থখানি সিংহীশাবকের শ্রেণী ভুক্ত। বঙ্গদেশের মুদ্রাযন্ত্র সচরাচর যে সকল কাব্য গ্রন্থ প্রসব করিতেছে—মোহিত-বাবুর পুস্তকখানি তাহাদের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই—ইহার একটা নিজস্বতা অপূর্ব্বতা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য। পুস্তকখানিকে লোকে নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

গতানুগতিক কবিযূথের মধ্যে মোহিত বাবু আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—মৌলিকতার দিক হইতে সেটাকে ঠিক ধরা যাইবে না—কিন্তু কবির বিষয় নির্ব্বাচনে, রচনাভঙ্গির নবীনতায়, অলঙ্কার প্রয়োগে—এমন কি উৎসর্গে, পুস্তকের নামকরণে ও প্রচ্ছদপটে পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা দৃষ্ট হয়।

"কাব্য দেখে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়গো" এ কথায় কবিগুরুর কতকটা পরি-হাস বিজল্পিত হইলেও ইহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। একথাটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় কাব্য রচনা কবি মনের অভিনয় মাত্র। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আমরা চারিটি জিনিষ পাই—বক্তৃতা, গান, নৃত্য ও হাবভাব অঙ্গ বিক্ষেপাদি—কবিতার মধ্যেও এই চারিটি অঙ্গই বিদ্যমান আছে—মোহিতবাবুর কবিতায় বক্তৃতা-অঙ্গটুকু বেশ আছে এই অঙ্গটুকুই মোহিতবাবুর অনেক কবিতাকে নাটকীয় ভাবে প্রণোদিত করিয়াছে—নাদীরশাহ ও নূরজাহান দুটি কবিতায় বক্তৃতার দিকটি রীতিমত প্রবল। মোহিতবাবুর কবিতায় নৃত্যও যথেষ্ট আছে—ছন্দঃ সুন্দরীর চটুল চরণের লাস্যই অনেকগুলি কবিতার প্রাণস্বরূপ, উদাহরণ,—যেমন—ইরাণী, হাফেজের অনুসরণ, দিলদার গজল গান।

এই সকল কবিতা পাঠকালে পাঠকের কটিদেশ অজ্ঞাতসারে দুলিয়া উঠিবে। মোহিত বাবুর কবিতায় সঙ্গীতের অংশটা খুব অল্প। মোহিতবাবু গান লেখেন নাই বলিয়াই একথা বলছি না (বেদুঃনের মধ্যে ত তিনি একটি গান দিয়াছেন—তাহাও গান নয়—নৃত্য)—কোনো কবিতাতেই সঙ্গীতের মাধুর্য্য—গদগদ ভাব, তন্ময়তা বা কণ্ঠের দরদ নেই। সব চেয়ে বেশী যাহা মোহিতবাবুর কাব্যে লক্ষ্য করিবার বস্তু তাহা হাবভাব অঙ্গ বিক্ষেপাদি।

এক শ্রেণীর বক্তা আছে যাহাদের বক্তৃতা অপেক্ষা বাহ্বাস্ফোটন ও অঙ্গ বিক্ষেপই প্রবল—এক শ্রেণীর গায়ক আছেন যাহাদের সঙ্গীতের চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য অপেক্ষা হস্ত চক্ষু মস্তক ইত্যাদির পরিচালনই বিশেষরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এই শ্রেণীর বাদক নর্ত্তক ইত্যাদি অনেক প্রকার শিল্পী আছেন—মোহিতবাবু এক হিসাবে একজন পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর শিল্পী।

তবু মোহিতবাবু একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী—তিনি একজন উচ্চ দরের শব্দশিল্পী। শব্দ-শিল্প যদি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা হয় তবে ইনি একজন বড় কবিও বটেন। ইঁহার ভাষা অলঙ্কার মণ্ডিত—স্থলে স্থলে অলঙ্কারের ভারে ক্লিষ্ট ও মন্থরগতি—মিল অনুপ্রাস ছন্দোঝঙ্কার পদবিন্যাস শব্দ নির্ব্বাচন ইত্যাদি শব্দশিল্পের সকল উপকরণের উপর মোহিতবাবুর অসাধারণ আধিপত্য। মোহিতবাবুর অলঙ্কার ইংরাজী ধরণের—ইংরাজী ধরণের অলঙ্কার বাংলায় এখনো সুপরিচিত ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই—সে জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলা হরফে ইংরাজী কবিতা প'ড়ছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সহিত অলঙ্কারের বিদেশী ভঙ্গি কাব্য সাহিত্যে আনিয়াছেন—সে জন্য তাঁর কবিতা বিদেশী ভাবে প্রভাবান্বিত বলিয়া সহসা ধরা যায় না—৺সত্যেন্দ্রনাথ একটু বেশী সাহস দেখাইয়াছেন কিন্তু জাতীয় ভাবের আলঙ্কারিতা তাঁহার অধিকতর অধিগত ছিল। মোহিতবাবু এবিষয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদেশী প্রভাব তাঁহার স্বদেশীয় স্বভাবকে জয় করিয়া উঠিয়াছে। মোহিতবাবুর বিদ্রোহিতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় তাঁহার শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু অলঙ্কার সম্বন্ধে নয় ভাষা সম্বন্ধেও ইনি অসম-সাহসিক। ইরাণী ভাষা প্রয়োগে মোহিত বাবু রীতিমত আনন্দ পান—তিনি নিজে যে পরিমাণ আনন্দ উহাতে লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকে সে পরিমাণে দিতে পারেন নাই—কারণ তাঁহার ব্যবহৃত অনেক ইরাণী শব্দ আমাদের পরিচিত নহে। মোহিত বাবু অবশ্য ইরাণী আফগানী ও আরবী আখ্যান বস্তু অবলম্বন করিয়াই ঐ প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—তাহাতে কবিতায় বেশ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন ও ঐ শ্রেণীর কবিতাগুলিও বেশ মধুর হইয়াছে।

অতিরিক্ত ইংরাজী ও পার্শী কাব্য সাহিত্যের অনুশীলনে হয়ত কবির পক্ষে বিদেশী ভাবভঙ্গি ভাষা মণ্ডনাদি স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহা কবির পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ—পাঠকের পক্ষ হইতে এবং যে জাতীর জন্য তিনি লিখিয়াছেন তাহাদের পক্ষ হইতে একটা ভাবিবার কথা আছে। আমাদের পক্ষ হইতে ইহা নির্জ্জলা কৃত্রিমতা ও বিদ্যার কসরৎ বলিয়া মনে হয়। কবি আপনার দৈহিক নেত্র দুটী রুদ্ধ করিয়া কল্পনার দৃষ্টিকে দুরী-লোকে প্রেরণ করিয়াছেন—কবি বর্ত্তমানকে

অবহেলা করিয়া অতীতের খনিগাত্র খুঁড়িয়াছেন—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সাহারা আরবের দেশে কলালক্ষ্মীর সন্ধান করিয়াছেন—পরিদৃশ্যমান বঙ্গনিসর্গ তাঁহাকে মুগ্ধ করে নাই—স্বপ্নলোকের 'গুলনার বাগ' তাঁহার চিত্তকে মশগুল করিয়াছে—বীণা বেণু অপেক্ষা সেতার এস্রাজ তাঁহার অধিক প্রিয়—যূথী কুন্দ অপেক্ষা কবি গুলচামেলির বেশী ভক্ত। এ সমস্তই স্বাভাবিকতার বিরোধী—কৃত্রিমতার পরিপোষক। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আছে—কবি বলিতে পারেন, বলি দেশের পাঠক কি শুধু হিন্দু? বঙ্গের জাতীয়তা কি শুধু হিন্দুর ঐতিহ্য লইয়া? মোহিতবাবুকে বর্ত্তমান যুগের হিন্দু মুসলমানের মিলন পুরোহিতগণের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও একথা বলিব—বাংলার মুসলমানের কাছে কি ইরাণদেশের সৌন্দর্য্য বাংলার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত? আর মুসলমানের ঐতিহ্য (tradition) কি কবির চিত্তকে গৌরবময়ী প্রেরণা বা দীপনা দান করিয়াছে?—তা' করিয়াছে কবি নজরুল ইসলামকে—যে লিখিয়াছে 'মহরম' 'সাত্তীল আরব' 'মিশর' ও 'কামাল পাশা'। মোহিতবাবুর রচনা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অন্তরের অন্তরঙ্গ নয়। এ সকল কবিতা বাঙালী পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করিবে না। বাঙালী সমাজের বিদগ্ধ জন এগুলিকে উপভোগ করিবে—কিন্তু অন্তরের সম্পদ বলিয়া নিজস্ব করিয়া লইবে না। গোলাপ ফুলকে আমরা উপভোগ করি কিন্তু বাণী চরণে দেই না। আবার সে গোলাপ যদি রঙীন কাগজের কাপড়ের বা মোমের হয় তাহা হইলে প্রিয়জনকেও দেই না—ঘর সাজাইয়া রাখি।

মোহিতবাবুর কবিতায় রস অপেক্ষা রূপের, গন্ধ অপেক্ষা শব্দের প্রাচুর্য্য বেশী। অন্তরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আবার দেহের সৌন্দর্য্য বেশী—দেহের সৌন্দর্য্যে আবার নিজস্ব লাবণ্য অপেক্ষা প্রসাধন ও অঙ্গরাগের সৌষ্ঠব ও আড়ম্বর বেশী। এক একটি কবিতাকে রসিক চিত্তের মহামহোৎসব বলিয়া ভ্রম হইবে—কিন্তু ঘটাছটা ও সমারোহের মধ্যে উৎসবের দেবতা মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কবিকে সাহস করিয়া একথা বলা যায়—"শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুশ্ছট" অপেক্ষা কালের কপোল তলে এক ফোঁটা অশ্রুজল" ও অধিক স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে।

মোহিতবাবুর আর একটি বৈশিষ্ট্য—মোহিতবাবু প্রত্যেক পংক্তির কলাসৌন্দর্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতে গিয়া সমগ্র কবিতার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলে অনেক কবিতাই প্রাণবান ও জঙ্গম হইয়া উঠিতে পারে নাই রূপবান্ ও স্থাবর হইয়া থাকিয়া গিয়াছে। শুধু ব্যষ্টিগত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সূক্ষ্ম শিল্পের পোষক হইলেও অসমগ্র দৃষ্টির পরিচায়ক।

বাংলার কোনো কবির সহিত মোহিত বাবুর তুলনা করিতে হইলে কবি করুণানিধানের নাম করিতে হয়। আর Sensuousness এর হিসাবে ইংরাজ কবি 'Keats' এর ইনি তুলনীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বপনপসারীকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। মোহিত বাবুর ক্ষমতা অপরিমেয়। একটা অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা একটা বেদুইনী বিদ্রোহ ভাব ও অবলিপ্ত স্বাধীনতার ভাব একটা নাদীরসাহী শক্তিমত্ততা কবিকে যূথভ্রষ্ট বা কক্ষচ্যুত করিয়া রাখিয়াছে। কবির মধ্যে আর যে

দোষই থাক গতানুগতিকতার জড়তা নাই অনুচিকির্ষার হীনতা নাই, সুলভ যশের ভিক্ষুকতা নাই সংকীর্ণ উঞ্ছবৃত্তির দীনাত্মতা নাই। কবির চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, সংযম আছে, সাহস আছে, একটা স্বাধীন উচ্চশ্রেণীর কবি জীবনের প্রতি উদ্ধত বাসনা আছে, অনাবিস্কৃত দেশে ছুটিবার আগ্রহ আছে, ভাষায় তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও মনস্বিতা আছে। রুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, প্রচণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে, উচ্চৈশ্রবার পৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া আরোহন করিতে কবি পশ্চাদ্‌পদ নহেন। অঘোরপন্থী কবি বলিয়াছেন—

"আমরা বাজাব প্রলয় বিষান শম্ভুর মত তুলি
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার
খুলি।"

মৃত্যু নামক কবিতায় কবি মৃত্যুর সহিত একট বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোহিতবাবু ভৈরবতার কবি, রুদ্রের পুরোহিত রুদ্রের মধ্যে ভীষণের মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্য্য দেখেন নাই তা' নয় বরং ভীম ও কান্তের মিলন তাঁহার রচনায় দৃষ্ট হয়।

রুদ্রের কবি, ললিত কোমল কান্ত রসানুভূতি অবলম্বন করিয়াও কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন—কিন্তু সেগুলি তেমন রসমধুর হয় নাই কবির আয়ুধকিণাঙ্ককঠিন স্থূল হস্তাবলেপে সেগুলি যেন ক্লিষ্ট ক্লান্ত ও মলিন হইয়া গিয়াছে। কাপালীক কবির প্রেম-আলিঙ্গন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কলালক্ষ্মী যেন ভীত চকিত। অঘোরপন্থী তান্ত্রিক শ্মশানে বাস করিয়াও রূপের মোহকে জয় করিতে পারেন নাই, তাই রূপের ধ্যান করিয়াছেন রূপের স্তব গাহিয়াছেন, উদ্দাম উদ্দণ্ড লম্ফে রূপকে বক্ষে ধরিতে গিয়াছেন কিন্তু প্রেমের তদ্গত ভাব ও তন্ময়তার অভাবে রূপের অন্তরে রসের সন্ধান পান নাই—স্নিগ্ধ ভাবও তাই স্থায়ী হয় নাই। মোহিত বাবুর এই কবিতা সংগ্রহের মধ্যে "নাদীরশাহ ও বেদুইন" এই দুটী কবিতার সুখ্যাতি বন্ধু সমাজে শুনিয়াছি আমি কিন্তু এই দুটী কবিতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারিলাম না। ইহাতে বাহ্বাস্ফোটন অধর দংশন অঙ্গবিক্ষেপেন প্রাবল্যই বেশী ঘটাছটা সমারোহ ও আড়ম্বরের জন্য সদাজাগ্রত প্রচেষ্টা কবিতাটিকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পাঠককে চমকিত ও প্রলুব্ধ করিবার জন্য কবি এই দুটিতে আয়োজনের ক্রটী করেন নাই, তাহাতে একটা নাটকীয় চমৎকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব আস্ফালনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়াছে। মোহিত বাবুর "মহামানব" "আবির্ভাব" ও "উচ্চৈশ্রবা" এই তিনটী কবিতাকে আমি শ্রেষ্ঠ আসন দিই কবির "সুর জাগানে" ও যথেষ্ট কবিত্ব আছে; কবিতাটি দরদের লেখনীতে লিখিত। কবিতাটি অযথা দীর্ঘ সে জন্য একটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর শেষের দিকে চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলে। "স্বপনপশারী" নামক কবিতাটিও সুন্দর কিন্তু অযথাদীর্ঘ "Merchantman" নামক কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়। রূপতান্ত্রিক "নামক" কবিতায় কবি আপনারি কথা বলিয়াছেন "আমি পতঙ্গ, রূপানলে যাই ছুটে"। দিলদার গজল গান হাফেজের অনুসরণ ও ইরাণী—ঝঙ্কারময় অসম্বদ্ধ অসম্বদ্ধ পংক্তি সমুচ্চয় মাত্র, কর্ণের উপর মায়াজাল বিস্তার করে। আবৃত্তি করিতে করিতে একটা মোহের আবেশ ঘনাইয়া আসে—"বিলাসকলাসু কুতূহল" ও তর্পিত হয়। আর একটি কবিতায় মোহিত বাবুর কবিত্বের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সেটি তাঁহার পুরুরবা।

বসন্ত-আগমনী, চূতমঞ্জরী, শ্রাবণ-রজনী কিশোরী নারী ঘরের বাঁধন ইত্যাদী কবিতায় স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে কিন্তু ভাবের স্বচ্ছতা ও প্রসাদ গুণ আদৌ নাই। বিশদরূপে যাহাতে অর্থ বোধ না হন, সেজন্য কবি যেন রীতিমত চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতায় ভাবের পূর্ণ নগ্নতা বা পূর্ণ মগ্নতা উচ্চাঙ্গের রচনার লক্ষণ নহে স্বীকার করি—আধমগ্ন ও আধনগ্ন হইলেই ভাল হয়—কিন্তু কোনটিকে নগ্ন করিয়া দেখাইলে জুগুপ্সার উদয় হয় এবং কোনটিকে মগ্ন করিয়া রাখিলে ব্যথা জন্মে তাহা কবির লক্ষ্য করা উচিত। যে প্রচ্ছন্নতায় ব্যঞ্জনা বা লক্ষণার সৌষ্ঠব নাই—তাহা অনাবশ্যক অস্পষ্টতা মাত্র, নিরর্থক অস্পষ্টতা, জটিলতা ও গ্রন্থিলতা কবিতাকে কথনো উপভোগ্য করিয়া তুলে না। মোহিতবাবুর ন্যায় শক্তিমান কবি এসকল কথা জানেন না ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার কবিত্বকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বড়ই দুঃখের বিষয় মোহিতবাবুর এমন সুন্দর গ্রন্থখানির আমরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। মোহিতবাবুর পুস্তকের সমালোচনা (?) অন্যান্য পত্রিকায় দেখিয়াছি কিন্তু সে সকল টিপ্পনীকে সমালোচনা বলিতে পারি না—প্রবাসীতে সমালোচনার একটু চেষ্টা লক্ষিত হইল। সকল পত্রিকাই মোহিতবাবুকে ২।৪টা প্রশংসার কথা বলিয়া যেন দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Draining with faint praise তাহাই আমাদের দেশের গ্রন্থ-সমালোচনা। ঐসকল সমালোচনাতে আদৌ ব্যক্ত হয় না—সমালোচক ভালবাসিয়া গ্রন্থখানি পড়িয়াছেন কিনা। একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি এরূপ সযত্নে ও সমাদরের সহিত কেহই তাঁহার পুস্তকের আলোচনা করেন নাই—সমালোচনা বাহির করিতে এই কারণেই আমাদের অযথা বিলম্ব হইল—আমাদের আশা আছে—আমাদের সং উদ্দেশ্য বুঝিয়া গ্রন্থকার মার্জ্জনা করিবেন। অজস্র স্তুতিবাদ অপেক্ষা আমাদের এই অম্লমধুর মন্তব্য মোহিতবাবুর মনোজ্ঞ ও মনোমত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসমত আমাদের যাহা মনে হইয়াছে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহাই ব্যক্ত করিলাম—যাহা আমাদের বক্তব্য তাহা হয়ত বিশদরূপে বলিতেও পারিলাম না—তবে একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি মোহিতবাবু একজন শক্তিমান কবি এবং রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চে—তিনি তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যকে কতকটা বল্গিত করিতে পারিলেই কাব্য সাহিত্যের একজন মহারথী হইতে পারিবেন।

বাংলা দেশে একবৎসরে

কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা

৭,২৪,৯৪৭

স্বাস্থ্য—চৈত্র

অঙ্কুর

[মোহন]

বল ধনী একবার !
কোন বিজ্ঞানে গড়িবে পাষাণে
উন্নত কারাগার ?
কৌশল রাশি হয়েছে বিফল,
পীড়ন-যন্ত্র ! তাও যে বিকল ;
বনিয়াদ সহ তোমার সৃষ্টি
ভেঙ্গে আজ চুরমার।
আশার কুহকে শত প্রলোভনে
রেখেছিলে বাঁধি নিজ প্রয়োজনে ;
(শেষে) জীবনের রস নিঙাড়ি করেছ
শুষ্ক অন্তঃসার।
ভাবি' চির-প্রিয় আপনারি মত
প্রাণ- ঢালা শ্রম করি অবিরত।
বিনিময়ে লাভ যোগ্য মূল্য !
পরাণের হাহাকার !!

বল ধনি দয়া করি' —
কোন্ সে ভূষায় নিঠুর স্বরূপ
রাখিবে গোপনে ধরি ?
মর্য্যাদাহীন ভিখারীর মত
তব পদে আর নাহি হব নত ;
আপন কুটীর লইব বিরচি'
চির-কল্যাণে গড়ি'
সোণার কাঠির পরশ লভিয়া
জীবনের দাম লয়েছি বুঝিয়া,—
মোরাও জগতে সত্য মানুষ ;
নাহি থাক টাকা কড়ি ;
বুকের শোণিত নিঃশেষ করি'
মরণের পায়ে দিয়েছি বিতরি';
(তাই) মরণ মথিয়া জীবন পেয়েছি
পুরাতন পরিহরি'
অবসাদ গেছে সরি !

গ্রিফিথ ও কলিন্স

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ { ১১শ সংখ্যা

আর্ট ও ভাবুকতা

[শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত]

ফুলের সার্থকতা যেমন ফলে, মানুষের মনুষ্যত্বের সার্থকতাও তেমনি ভাব সৃষ্টিতে। যে ফুলে ফল ফসল হয় না সে ফুলের জীবন যেমনি ব্যর্থ—যে মানুষের অধ্যাত্মসত্তা ভাব-সৃষ্টিতে সার্থক হয় না তারও তেমনি।

এই যে ভাব সৃষ্টি এ দু রকম, এক নিছক আনন্দ সৃষ্টি একে বলে art। এর ২টী স্তর আছে এক স্তরের সৃষ্টি শুধু আনন্দ দেয়, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, এই আনন্দকেই লোকোত্তর আহ্লাদ বলে আমাদের কলা শাস্ত্রে। দ্বিতীয় স্তর উচ্চতর সৃষ্টি করে, অতীন্দ্রিয় ভাব জগতের অভিনব সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য, এ সৃষ্টি আনন্দের ভিতর দিয়ে অধ্যাত্ম জগতের মাধুর্য্য আস্বাদ দেয়। এ স্তরের সৃষ্টি মানুষকে এই জগতেই উচ্চতর লোকের আভাষ দেয়। এখানকার কবি অকথিত ভাষায় অশ্রুত বাণী শোনায়, এ স্তরের চিত্রকর অদৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আভাষ ফুটিয়ে তোলে।

এই স্থূল রূপরসশব্দস্পর্শময়ী পৃথিবীর অতিরিক্ত একটা সূক্ষ্ম রূপরসশব্দস্পর্শময় ভাবজগৎ আছে। তার বিচিত্রতর, বৃহত্তর সত্তা সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত যাদের ভাবের চোখে ধরা দেয়, তারা বড় বেশী ভাগ্যবান জীব। যারা আবার সেই সব ইঙ্গিত কবিতায় রচনা করে, রেখা বর্ণে বা ভাস্কর্য্যে ফুটিয়ে রূপ দিয়ে লোকের চোখে ধরতে পারে তারাই হল শিল্পীজগতের ঋষি, সত্যদ্রষ্টা। যাদের শিল্প রচনার ভিতর দিয়ে মন এই উচ্চতর লোকের আভাষ পায়—উচ্চতর সত্তার আস্বাদ পায় তাদেরই রচনা ধন্য, তারাই আমার মতে উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী—প্রতিদিনের দেখা গাছ পালা মানুষ পাহাড় পর্ব্বতের বাস্তব ছবি

আঁকিলেই বা তাদের নিয়ে কাব্য লিখলেই যে বস্তুতান্ত্রিক শিল্পী হল আর আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে সৃষ্টি করলেই যে সে ভাবাত্মক শিল্পী হ'ল তার মানে নাই।

আসলে দেখতে হবে অনুভূতিটা কার কত সত্য। আনন্দ কে কতটা দিতে পেরেছে। যার জীবনে সে বিষয়ের অনুভূতিটা জাগ্রত ও যার সাধনা যত সত্য তার রচনা তত খাঁটী। Realism ও Idealism এর শিল্পে যে ভেদাভেদ তা আসলে এই খানে। যে জীবনটা শিল্পীর প্রাতিদিনের সত্য সম্ভোগের জীবন সেই জীবন হতে বিষয় নিয়ে যে যত সৌন্দর্য্য রচনা করতে পারে সেই তত বেশী মাত্রায় realist ও idealist—আসলে মিথ্যাচারী না হ'লেই হলো। ভাল শিল্পী মাত্রেই ভাবের দিক দিয়ে idealist, প্রকাশের ভাষার দিক দিয়ে realist।

মানুষেব দুটী জীবন প্রবাহ—একটা হ'ল ইহকালের ভোগের জীবন, এই প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সম্পদের মধ্যে থেকে প্রাকৃত জীবন নির্ব্বাহ, আর এক জীবন অধ্যাত্ম অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের জীবন। যে শিল্পী যে জীবনের খাঁটি ও সত্য সম্ভোগকারী তার সৃষ্টি সেই জীবনের পক্ষে তত সত্য। আধুনিক ইয়ুরোপীয় নরনারী ঐহিক ভোগ জীবনটাকে খুব আন্তরিক ভাবে ভোগ করে—এ জীবনের অসীম বিচিত্র সৌন্দর্য্য তার চোখে ভালই লাগে—যে শিল্পী এ জীবনের চিত্র বা কার্য্য রচনা করে সে তার আনন্দ জাগায় তার কাজ সত্য বলে প্রতিভাত হয়।

মধ্য যুগের ইউরোপবাসী বা প্রাচীন ভারতযুগের বৌদ্ধ বা অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বেসেছিল—সেই জীবনের সত্যকে সাধনা করেছিল কাজেই তার কাছে অধ্যাত্ম ভাব সৃষ্টি খুব ভালই লাগতো।

আর্টেও অধিকারী ভেদ আছে। যে নিম্নাধিকারী তার কাছে বস্তুতান্ত্রিক সৌন্দর্য্য রচনা ভাল লাগবে—সাধারণ জীবনের সুখ দুঃখের ছবি—, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষ মানুষীর চেহারা সে এই সবে আনন্দ পায়।

যে উচ্চাধিকারী তার কাছে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বেশী ভাল লাগবে; ভাল ভাল আধ্যাত্মিক ভাবকে রূপ দিয়ে তার কাছে ধরলে তার ভাল লাগবে।

মধ্যাধিকারী যে সে এই দুরকম জগতকে এক সঙ্গে একভাবে ধরা পেতে চায়।

মোট কথা—সকলেই আর্টের ভিতর দিয়ে আনন্দ পেতে চায়—একই ভূমানন্দ ত্রিধারা হয়ে স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে প্রবাহিতা। যে যেখানকার অধিকারী সে সেই আনন্দ ধারা পান করবে। শিল্পী এই আনন্দকে প্রত্যেকের কাছেই লোকোত্তর আহ্লাদের চিরন্তন হেতু করে সৃষ্টি করেন।

আর্টের জাতীয়তাও আছে আবার সার্ব্বভৌমিকতাও আছে। উচ্চতম আর্ট এই সার্ব্বভৌমিকতার ছাপ নিয়ে দেখা দেয়।

কেন না উচ্চতর শিল্পীরা যে অধ্যাত্ম ভাব জগতের অধিবাসী সেখানে জাতিগত পার্থক্য নাই। Raphael এর Madonna আর ভারত শিল্পীর যশোদা—কোলে কৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক ভাবুকের মনে একই ভক্তি ভাব জাগায়। উচ্চদরের landscape—ভারতের পল্লীচিত্রই থাকুক বা সুইজরলণ্ডের আল্লাইন দৃশ্যই থাকুক, আসল রসজ্ঞ দেখবেন উভয়ের চিত্রে সেই জিনিসটা আছে কিনা যাকে Wordsworth বলেছেন "The light that never was on land or sea" যে light দেখানোই হচ্ছে কবি বা চিত্রকরের আসল উদ্দেশ্য—যেটা

সেই অতীন্দ্রিয় ঊর্দ্ধলোকের একমাত্র সম্পত্তি। এখানে সব মানুষের এক অনুভূতি, তবে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বাস্তব জগতের ভাষা বা সংকেত দিয়ে প্রকাশ করতে হবেই; এই খানে যতটুকু জাতিগত বৈশিষ্ট্য তা থাকবেই।

সব জাতই এক মহাভাবেরই সাধনা করে এসেছে এবং সেই মহাভাব তার কবি ও শিল্পীরা প্রকাশ করে এসেছে। প্রত্যেক জাতির একটা cultural বিশেষত্ব আছে, ভাব প্রকাশের ধারা আছে, এইটি তার সভ্যতার বিশেষ চিহ্ন—ভগবানের ত্রিধা প্রকৃতির ভাবটা হিন্দু ও ইহুদী ঋষিদের চোখে ধরা দিয়েছিল। হিন্দু সে ভাবকে রূপ দিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কল্পনায়-ইহুদী সে ভাবকে রূপ দিলে Holy Trinityর ভাষায়। আর্টও তাই। প্রত্যেক artist তার ভাবপ্রকাশের জন্য তার দেশীয় ধর্ম্ম সাহিত্য দর্শন দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির সাহায্য নেবে। কাব্যের যেমন ভাষা আলাদা, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র আলাদা, চিত্র বা ভাস্কর্য্য শিল্পেরও ভাষা আলাদা। বিদেশী রসজ্ঞ এই ভাবপ্রকাশের ধারাটির সঙ্গে পরিচয় না রাখলে অন্য দেশের কলা শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝবেনা।

আমাদের ভারত শিল্পের একটা বিশেষ রকমের style ছিল—তার একটা ভাষা ছিল—সে ভাষা বিশেষভাবে symbolic (রূপক)। এই বিশেষত্বটীর জন্যই ভারত-শিল্প তার স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে।

এখন যে নব্যভারত শিল্পের পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে এর উদ্দেশ্যই এই—আমাদের শিল্পকলার যে ভাষা ও ধারা ছিল—যা লুপ্ত হ'য়েছিল এখন সেই ভাষা ও ধারাকে ফিরে আনতে হবে।

সাধারণ লোকে যাঁরা একটু তলিয়ে বুঝতে চান না তাঁরা Indian art বলতে একটা শ্লেষাত্মক বাক্য বোঝেন—অনেকে আন্তরিক ভাবে বোঝে যে Indian art বলতে একটা বিকৃত ধরণের চোক মুখ হাত পা আঁকাকেই বোঝায়; এই ভুল বোঝার জন্য দায়ী অনেকটা নব্য শিল্পীরা নিজে। এ ভুল সংস্কারটা যাতে নষ্ট হয় তার চেষ্টা হওয়া উচিৎ। বাহিরের অনেক অবিষয়ী অন-ধিকারী সমালোচক বলেন—artএর আবার জাতীয়ত্ব কি? তার আবার আলাদা style বা ভাষা কেন? একথা সত্য হতো যদি চিত্র-শিল্প শুধু গরু ছাগল গাছ পালা মানুষ মানুষীর ছাব আঁকাই হতো। কিন্তু চিত্রশিল্পের উচ্চ নীচ স্তর আছে বলেছি। বড় চিত্রশিল্পী আর বড় কবি এদের মধ্যে তফাৎ খুব কম। দু'জনেই ভাবের কারবারী, দুজনেই ভাব-জগতের অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভাষার ফাঁদে ধরে সাধারণ মানুষকে দিতে চান, কাজেই কবির মত শিল্পীরও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকবেই। সে-জগতের ভাব এজগতের ভাষায় প্রকাশ সব স্থানে হয় না, কাজেই চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্য নিতে হয়।

প্রাচীন ভারত তার সাধনালব্ধ ভাব-সম্পদ প্রকাশ করবার জন্য একটা ভাষা ও ধারা পদ্ধতি আবিষ্কার করে; এই ভাষাটী না জানলে প্রাচীন ভারতের শিল্প সৌন্দর্য্যমহিমা বোঝা যাবে না।—কালোয়াতী গান সকলে বুঝতে পারে না ব'লে, সেটা বৃথা বা মিথ্যা বা মূল্যহীন নয়, ভারতশিল্পের এই বিশেষত্বের জন্য যদি সাধারণের অবোধ্য হয়, সেটা সাধারণের পক্ষে অগৌরবকর, আর্টের দোষ কি?

কিন্তু এক সময়ে ভারতশিল্পের ভাবসম্পদ

সাধারণের বোধ্য ছিল—তার কারণ সমগ্র জাতটা যে ভাবে মাতোয়ারা ছিল আর্ট সেই ভাবকেই বিধি-প্রয়োগে প্রকাশ করেছিল।—আমরা প্রাচীন culture'কে ত্যাগ ক'রেছি কাজেই সেই cultureএর সুপক্ক ফলগুলিকে আস্বাদ করতে পারছি না।—আমাদের বাহ্য ও অন্তর জীবনে সেই culture আবার ফিরে না এলে ভারত শিল্পের তদানীন্তন ধারা আমাদের কাছে অবোধ্য তো থাকবেই উপরন্তু সেই ধরণে ভাব প্রকাশের artistic চেষ্টা মিথ্যাচার হবে। সেভাব অথচ নেই—ভাব প্রকাশের সেই ভঙ্গীটা অনুকরণ করছি মাত্র।

———

জগতে যখনি যে কোনো দেশে art কিম্বা literatureএর উদ্দাম জাগরণ হয়েছে তার হেতু খুঁজলে দেখা যাবে—একটা মহাভাবের বন্যা দেশের লোকের মনের ভিতর দিয়ে বয়ে গিইছিলো, যেমন মরা গাঙ্গে বান ডাকে না—তেমনি প্রাণহীন জাতের মধ্যে শিল্প বা সাহিত্যের বন্যা আসে না। মধ্য যুগের ইয়ুরোপ, প্রাচীন গ্রীস্ বা প্রাচীন ভারত এসব স্থানে এই রকম একটা প্রবল ভাব বন্যা আসে যার ফলে শিল্প বা সাহিত্যের এরূপ জাগরণ হয়েছিল। চৈতন্য দেবের প্রেম ধর্ম্ম বৈষ্ণব সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে শতধা বয়ে গিয়েছিল।

ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে যতদিন না তেমনি একটা ভাবের মহাপ্লাবন আসবে ততদিন সাহিত্য বা শিল্প আবার কলনাদ-মুখর হয়ে উঠবে না।

ততদিন শুধুই প্রাচীন ধারার মক্স করাই চলবে—ভাব সৃষ্টি হবেনা।

ধর্ম্ম ভাব সে কালের মত আর আসবেনা—এটা খুবই মনে হয়,—মানুষের মনস্তত্ত্ব এখন এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে সে কালের মত অধ্যাত্ম ভাব প্রবাহ আর তাতে কোনো দাগই বসাতে পারবে না।

তবে কি ভাব প্রবাহ যে আসবে, তাও বলা যায় না। বর্ত্তমানের জাতীয় জীবনে কিসের অভাব? কোন রূপ ইচ্ছা, কোন অব্যক্ত বেদনা, কোন তীব্র পিপাসা ব্যর্থ হয়ে অন্তরে গুমরে মরছে? ভাষা পাচ্ছেনা প্রকাশের? যদি কোনো তেমন ভাব ভাবনা থাকে, আর যদি জাতের মর্ম্মস্থল ভেদ করে তার অস্ফুট ধ্বনি উপরে উঠতে ব্যাকুল হয়ে থাকে, তা যদি আন্তরিক হয় তা হলে নানা প্রকারে নানা ভাবে তা আত্মপ্রকাশ করবে আর সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়ে সব আগে তা প্রকাশ হবেই। যখন art ও literature সে অব্যক্ত বেদনাকে—ধ্বনি দেবার ভার নেবে তখন বুঝবো মুক্তি সন্নিকট!

পরিচয়

[শ্রীসুবোধ রায়]

জানিব আমারে
এই শুধু শেষ কথা নয়!
জানাব আমারে,
আপনার দেব পরিচয়,
এও তো আমার ব্রত, সুগভীর সাধনা আমার।
তাই বারে বার
কোন্ অনাহত ধ্বনি বাজে এসে প্রাণে—
আপনারে কর দান সুরে গন্ধে গানে।
শুধুই সঞ্চয় নয় অঞ্চলে ভরিয়া,
আপনারে কর দান নিঃশেষ করিয়া
রিক্ত, মুক্ত, সর্ব্বহারা, হও আত্মভোলা
সৃজন-সাগরে দিক্ দোলা
সহজ দানের সেই আনন্দ লহর; নব ভাষা নব সুর
ধরণীর কূলে এসে তুলুক মধুর
নব ছন্দোময়ী ধ্বনি, মানবের মনে
জাগুক তৃপ্তির সুখ অতি অকারণে।
তৃষাদীর্ণ, জরাজীর্ণ মানবের মন
লভুক শীতল স্পর্শ, নবীন যৌবন।

এতো নহে অহঙ্কার
এ যে মোর অতি সত্য নিত্য অধিকার।
মোর ভালে জ্বলে সেই রাজটীকা
মৃত্যুময়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী, দীপ্ত অগ্নি শিখা,
তাহারে আড়াল করি আপনারে করিব কি হীন?
বলিব কি "আমি ক্ষুদ্র, আমি নীচ, আমি অতি দীন?"
ধূলায় আসিব নামি ত্যজি শুভ্র সত্য সিংহাসন?
ভয়ে লাজে মানিব কি মিথ্যার শাসন?

নহে, কভু নহে
প্রাণে মোর অমৃতের ফল্গুধারা বহে,
শিরা উপশিরা মাঝে
আগুণ পরশ তার দ্রুত ছন্দে রুদ্র তালে বাজে।
মনে হয় তবে
আমি এক, আমি বহু—আমি এই ভবে
আঁধার মরণ দ্বারে আনিয়াছি জীবনের দাবী
মোর হাতে আছে এই সৃজনের রহস্যের চাবি।
ফুল যবে ফুটে উঠে, বিলায় সুবাস,
পাখী যবে কলকণ্ঠে গাহে মধুভাষ,
নদী যবে নৃত্য-তালে কূলে কূলে গেয়ে যায় গান
প্রাণময়ী ধারা দানে এ জগৎ করে প্রাণবান,
সূর্য্য যবে দেয় আলো, চাঁদ দেয় হাসি,
নীরব গগন মাঝে বাজে লক্ষ তারকার বাঁশী
সে কি তা'র অহঙ্কার ? আপনারে নির্লজ্জ প্রচার ?
অযাচিত দানে তা'র বেড়ে যায় ধরণীর ভার ?
ঝঞ্ঝা যবে ছুটে আসে, চূর্ণ করে যত্নে বাঁধা ঘর
বজ্র যবে অট্টহাসে জ্বালায় ধরণী, জাগায় অম্বর
মৃত্যু যবে শুধু খেলা-ছলে
প্রলয়ের ছন্দে মাতি' অন্ধ, ধেয়ে চলে ;
চলে যায়, দলে যায় প্রাণ
নিরাশ্রয় ছিন্ন জীর্ণ শত চ্যুত পাত্রের সমান!
কেহ তো বলে না ইহা মিথ্যা অত্যাচার
এই অযাচিত দান—এতা'র অসহ্য অহঙ্কার!
শুধু মোর বেলা,
আমার প্রাণের এই লুকোচুরী খেলা,
ক্ষণে ঢাকি', ক্ষণে পুনঃ আপনারে রিক্ত করি সর্ব্বহারা দান
বেদন বেহাগ কভু, কভু রুদ্র দীপকের তান।
দিনে দিনে মোর এই নব পরিচয়,
আলো সম আপনারে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই সারা বিশ্বময়

এই শুধু অহঙ্কার ?
জগৎ সহিতে নারে এ স্বচ্ছন্দ দানের সম্ভার ?

পাছে লোক দেয় দোষ,
অভিমানে মনে তা'র জাগে ক্ষুব্ধ রোষ,
আত্মদীন, স্বার্থলীন পাছে মনে জাগায় সংশয়
পাছে বলে—"ওরে অহঙ্কারি ! কেবা চায় তোর পরিচয় !
বলিতে আপন কথা নাহি তোর লাজ ?
ভিখারী হইয়া তুই পরেছিস সম্রাটের সাজ !"
তাই লাজে ভয়ে,
রুদ্ধ অভিমানে, আর দারুণ সংশয়ে
শিরে বহি অপমান রহিব লুকায়ে ?
বদ্ধকারা অন্ধকারে মরিব শুকায়ে !
যেজন পাঠাল মোরে ভবে,
সেই মন্ত্র দিলে কাণে—"আপনারে জানাতে যে হবে
মেলে দাও, ঢেলে দাও, আপনারে দাও বিস্তারিয়া
সঞ্জীবিয়া প্রাণ-সুধা রসে এই জীর্ণ-ধরা হিয়া
মিশাও প্রাণের রঙ্গ, সূর্য্যাস্তের ম্লানিমার সাথে
আবার সে প্রাণ পাবে নবরূপে নবীন প্রভাতে !
আঁধার ভুবন-তলে ছড়াইয়া দাও তব হাসি,
নিরাশা-পীড়িত প্রাণে বাজাবে সে দুরাশার বাঁশী।
বজ্র সাথে প্রাণ শক্তি দাও মুক্ত করি'
অত্যাচারী প্রাণ-ভয়ে উঠুক শিহরি'।
স্বাধীন প্রাণের বলে স্পর্শ কর দাসের শৃঙ্খল
শত অবিচার-ভরা শৃঙ্খল সে হউক বিকল।
পদাহত লাজনত জন
আহত সর্পের মত উঠুক গর্জ্জিয়া করুক দংশন।
হীন কাপুরুষ
লভি সত্য, লভি শক্তি লভিয়া পৌরুষ,
হো'ক নব বলে বলীয়ান
বীর্য্যে বীর, সত্যে ধীর, তেজে দীপ্যমান।"

এই তো আমার ব্রত, সুগভীর সাধনা আমার—
অলক্ষ্য এ শক্তি কোন্ অসহ্য দুর্ব্বার
আসি মোর হৃদয়ের দ্বারে
হানে কর নিতি নিতি বারে বারে
বলে—"জাগো, ওঠো, দ্বার খোলো,
আপনারে জানাবার তরে আপনারে ভোলো।
সৃজন-দেবতা-সাথে সহজ সচ্ছন্দ সুরে মিলাইয়া তান
গাহ আজ আনন্দের নব-সৃষ্টি প্রারম্ভের গান।

কর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

কুমারের দোকানে হাঁড়ি কলসী থাকে, একদিন কলসীর সহিত জলের বিরোধ উপস্থিত হইল, কলসী বলিল "জল তোমারই যত দোষ, কারণ যখন আমি কুমারের দোকানে ছিলাম তখন সকল জাতেই আমাকে ছুঁইতে পারিত। কিন্তু এখন তোমার সহিত একত্র থাকাতেই আমাকে আর সকলে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, জল প্রত্যুত্তরে বলিল "নাহে তোমারই দোষ, কারণ আমি যখন পুকুরে ছিলাম, নদীতে ছিলাম, সমুদ্রে ছিলাম তখন আমাকে সকলে স্পর্শ করিত এমন কি আমাতে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিত,. তোমার সহিত মিলনেই আমার এই দুর্দ্দশা। এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির জন্য উভয়ে বেতালের নিকট উপস্থিত হইলে, বেতাল বলিল ভাইহে তোমাদের কাহারও দোষ নাই দোষ ঐ সংযোগের, ব্যাপক বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিলেই বস্তু দূষিত হয়, বায়ুকে বদ্ধ করিলেই বায়ু মলিন হয়, বদ্ধ জল নষ্ট হইয়া যায়, অধীন গৃহ পালিত রুদ্ধ পশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে হিংস্র জন্তুও বহুদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে নিজের স্বাভাবিক সরস ভাব হারায়। ব্যাপকতাই প্রকৃত জীবন, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডত্বই মৃত্যু। সমুদ্রে জল দূষিত হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্র পাত্রে কিছুদিন থাকিলেই তাহাতে পোকা জন্মে। অন্তবিহীন আকাশে মন নিবদ্ধ করিলে মন প্রশান্তি লাভ করে। আকাশ গৃহে পরিচ্ছিন্ন হইলেই গৃহাকাশ বলি। অসীম বস্তুতে অসীমতার আরোপ করি, চিত্তের ভাব যখন অখণ্ড বস্তুর দিকে প্রবহমান, তখন তাহা শুদ্ধ, ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ খণ্ডবস্তুতে অবগাহন করিয়াই নীচ হইয়া যায়, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,"

উভয়ই প্রীতি ইচ্ছা, এক অখণ্ড বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণে তাহাই প্রেম, অন্য খণ্ড বস্তুতে বৈষয়িক সুখে তাহাই কাম, অখণ্ড বস্তুকে আমার ক্ষুদ্রতা দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া অসীম আমাকে তাহাতে আহুতি দিলেই দোষ কাটিয়া যায়। যেমন বদ্ধ জলের সহিত আর সামান্য জল আনিলেও তাহার দোষ যায় না, কিন্তু মুক্ত জলে বদ্ধ জলকে ছাড়িয়া দিলে দোষ নষ্ট হয়। সেই অখণ্ড বস্তুতে ক্ষুদ্রবস্তুকে বিলাইয়া দিলেই দোষ পরিশূন্যতা সম্ভব। আমার ইচ্ছা দ্বারা অসীম বস্তুকে সীমাবদ্ধ না করিয়া, যদি আমার ইচ্ছাকে তাঁহাতে আহুতি দিতে পারি, তাহা হইলেই দোষ কাটিয়া যায়, ফল বা ভোগ্য বস্তু আনন্দ, আনন্দ জিনিষটী অসীম, অনন্ত ব্যাপক। সেই বস্তুকে যখন আমার ইচ্ছাদ্বারা সংকীর্ণ করি তখনই তাহা কামরূপে পরিণত হয়। কামই রাগ, রাগই ভালবাসা, এই ইচ্ছাকে, রাগকে, কামকে বুদ্ধির সাহায্যে অখণ্ড বস্তুতে নিবেদন করিতে পারিলেই কাম প্রেম হইয়া পড়ে। তাহা মোক্ষের কারণ হয় বুদ্ধির সাহায্যে পরিস্কৃত হইলেই ইচ্ছা থাকে না, সাত্বিক সুখ আপনা হইতে হয়, তাহাকে চাহিলে পাওয়া যায় না। স্বয়ং প্রকাশ বস্তুকে পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয় না। সে আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করে, অনন্ত আকাশের অনন্ত মাধুর্য্য আপনা হইতেই মনঃ প্রাণ ভরপুর করে। অসীমের স্বভাবই এই, চাহিতে হয় না আপনা হইতেই দেয়, অফুরন্ত ভাণ্ডারে চাহিবার আবশ্যকতা নাই, অল্প যাহার আছে তাহার নিকটে আকাঙ্খা করিতে হয়। দানও করে অল্প দেওয়ার সহিত তিরস্কারও ভোগ করিতে হয়, তাই চাহিলেই সুখের সহিত দুঃখ আসিয়া পড়ে। অখণ্ড বস্তুব্যাপক বস্তু সকল ব্যাপিয়া আছে। তাহাকে পাইবার জন্য চাহিতে হয় না। ক্ষুদ্র ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বস্তুকেই পাইবার জন্য আকাঙ্খা করিতে হয়, কারণ মাঝে ফাঁকা আছে, অনুসন্ধান স্পৃহা যখন বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাপক বস্তুতে অবগাহন করে তখন স্পৃহা থাকেনা। বুদ্ধির সাহায্যেই ক্ষুদ্র বস্তুর কালগত, দেশগত ও বস্তুগত, ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারিয়া অসীমে আপনাকে বিলাইয়া দেয়। এই জন্যই ভোক্তাকে বলিলে ফলে আসক্ত বুঝাইতে পারে। কিন্তু পরিজ্ঞাতা সকল জানিয়াছেন, ইচ্ছাকে অখণ্ড বস্তুতে নিবেদন করায় সসীমকে অসীমে বিলাইয়া দিতে পারেন। ভোক্তার ভাবুকতা থাকিতে পারে, আকাঙ্খার বস্তু থাকিতে পারে, কিন্তু পরিজ্ঞাতা সম্যকরূপে জানায় তাহার নিকট কাম ফলস্পৃহা, লোভ হিংসা, অশুচিভাব, হর্ষ, শোক প্রভৃতি সকলেই সসীম ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত, তিনি অসমাহিত ভাব অসংস্কৃত বুদ্ধি, গোঁড়ামি অর্থাৎ কাহার ও নিকট নম্র না হওয়া, শঠতা পরের বৃত্তিচ্ছেদন পরতা, আলস্য বিষাদ দীর্ঘ সূত্রতা প্রভৃতিকে সংকীর্ণতা বলিয়া জানেন। এই সকল ভাব সংকীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোগাসক্ত তামস ব্যক্তির ভোগ্য বস্তু অতীব সংকীর্ণ ও জঘন্য, ভোগাসক্ত রাজসিক ব্যক্তির ভোগ্য বস্তু লোভনীয়, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত, জ্ঞাতা সকল জানেন, এই জন্যই পরিজ্ঞাতা শব্দটী ব্যবহার করিয়াছি। ভোক্তা বলিলে রাজসিক ও তামসিক বুঝাইতে পারিত। কিন্তু সাত্বিক ভোক্তার ভোগের জন্য স্পৃহা নাই সে ভোগ্য বস্তু আপনা হইতে আসে। পরিজ্ঞাতা বলায় তিনেরই অনুপ্রবেশ হইল সুখের খোঁজে বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। কর্ত্তব্যে অনব-

ধানতা তামস প্রকৃতির লোকের সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা মোহ জনক যাহা তীব্রাতিতীব্ররূপে মাদক সেই বৈষয়িক সুখে লিপ্ত থাকায় কর্ত্তব্যে সমাহিত ভাব থাকেনা। চেষ্টা শূন্য নির্জ্জীব অসারতায় আপনার সরস ভাব বিনষ্ট করে। কোনও কর্ত্তব্যে সমাহিত (attentive) হইতে পারে না, নিম্নস্তরে ভোগে আপনাকে বিকাইয়া দেয়, ইহা তামসিক ভোগ। শিশুর বুদ্ধি সংস্কৃত নয় ভোগের স্পৃহায় বিষ্ঠাও তাহার নিকট প্রীতির বস্তু, ভাল মন্দের বিবেচনা নাই বুদ্ধির স্বচ্ছতা নাই তমের আধিক্যে বুদ্ধি মলিন, ভোগের ইচ্ছা প্রবল। না পাইলে ব্যথা বেদনার জন্য চীৎকার, মানুষের এই প্রকার ভোগ স্পৃহা তামসিক, গোঁয়ার গোবিন্দ রকমের লোক যাহার নিকট নম্র হয় না সে তাহার অনম্র স্বভাবে ভোগাসক্ত থাকিতে চায়, কাহারও উত্তম উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে নারাজ নিজের বিচার করিবার শক্তি নাই কারণ বুদ্ধি অসংস্কৃত; কিন্তু নম্রতাও নাই, কাহারও অনুশাসন মানিতে রাজী নয়। নিজের প্রজ্ঞা নাই মিত্রের উপদেশ বা সুহৃদের বাক্যে অবজ্ঞা, তামসিক ভোগাসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম। আমি যাহা করিতেছি তাহাতেই আমার সুখ, অতিরিক্ত কথা শুনিবার আমার আবশ্যকতা নাই, লোকে বেশী বুঝিবেই বা কি? তাহার বুঝিবার শক্তি আছে কিনা? তাহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে আমার মঙ্গল হইবে, কিনা? প্রকৃত মঙ্গল কি? এতগুলি বিষয় চিন্তা করিতেও নারাজ এবং পরে প্রকৃত কথা বলিলেও শুনিতে অনিচ্ছুক; ইহার মূলে তামসিক ভোগ স্পৃহা। মূঢ় ব্যক্তি যেমন তাহার মূর্খতাতেই সুখী অনম্র ব্যক্তিও তেমনই অবিনয়কে সুখ বলিয়া মনে করে, আমি কাহারও কথা মানিনা ইহাই যেন তাহার প্রধান পৌরুষ হইয়া দাঁড়ায়। মূর্খ ব্যক্তিকে হিতোপদেশ দিলে তাহার অভিমান বাড়িয়া উঠে সে শুনিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করে। অবজ্ঞাভয়ে তাচ্ছিল্য ভয়ে হিতের বস্তুকেও অগ্রাহ্য করে, তামসিক ভোগস্পৃহাই তাহাকে ওরূপ করিয়া তোলে। পরকে বঞ্চনা করা যাহার স্বভাব অর্থাৎ যে শঠ সে কেবল মায়া অবলম্বন করে। লোককে ঠকাইতে গিয়া নিজকেও ঠকায় সে প্রতারক হইতে গিয়া আগে প্রতারিত হয়, নীচ ভোগের বস্তুতে তাহার আসক্তি, সে কেবল ঠকাইতে চায়। নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লোক ঠকাইতে সে ব্যস্ত। যে রাজনৈতিক নিজের শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ করিতেছে সে শঠ, সে বঞ্চক, সে তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লোককে অযথাভাবে বুঝাইতে ইচ্ছুক, ভিতরে নিজের জঘন্য ভোগস্পৃহা দুর্ব্বলের রক্তে স্নান করিয়া তাহার সুখ, অত্যাচারের সুপ্ত লালা শোষণে তাহার তৃষ্ণা। কামের প্রচ্ছন্ন আবরণে জীবের সর্ব্বস্ব হরণ তাহার প্রতিজ্ঞা, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করা তাহার জীবন ব্রত। সে স্বপ্ন রাজ্যের সুখে আসক্ত, সে Vampire এর মত রক্ত চুষিয়া খাইতে ইচ্ছুক। সে জন সমাজে জোঁকের মত সাধারণ ভাষায় একটী কথা আছে তাহাই; তাহার মূল মন্ত্র,—"তোর হাড় খাব মাস খাব চামড়া দিয়ে ডিগ্ ডিগি বাজাব।" লোককে বিপদে ফেলিয়া তাহার সুখ, লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার তৃপ্তি, বিপন্নের উপর কষাঘাত করিয়া, পতিতকে আঘাত করিয়া দুর্ব্বলকে পীড়িত করিয়া, জাতিকে ধ্বংশ করিয়া সজীবকে নির্জ্জীব করিয়া নিজের ভোগ সুখের তৃষ্ণা মিটায়, এই প্রকৃতির লোক সর্ব্বদাই

নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সুখকে পরামার্থ মনে করে। সে স্ত্রীকে মনে করে নিজের সুখের জন্য পুত্র নিজের সুখের জন্ত, সে পুত্রকে ঠকাইয়া পুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতে 'একান্ত' ইচ্ছুক, সে সর্ব্বদাই মনে করে "সকল পৃথ্বী আমার চরণ আসন ভিত্তি," সে ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহে! সে অন্তরে, অন্তরে কাপুরুষ বাহিরে বড়াই করিয়া লোক ঠকায়, শাসন যন্ত্রের যন্ত্রী 'যখন আপনার সুখে' বিভোর তখনই সে প্রজার রক্তে স্নান করিয়া সুখানুভব করে। নিরো, হিরদ্ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল ইহাদের বাসনা বহ্নিতে সকলকে আহুতি দিতে হইবে। ইহাদের ভোগ সুখেরই ধন যোগাইতে হইবে। প্রতিবাদ করিলে অল্পে অল্পে ক্ষণে ক্ষণে পোড়াইয়া মারিতে সুখ বোধ করিবে। শঠ প্রবঞ্চকের ভোগের স্পৃহার জন্য ছল চাতুরীর অভাব হয় না। সে নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিয়া সুখে আত্মহারা হয়, সে ধর্ম্ম পদ দলিত করিয়া আত্ম প্রসাদের বাহাদুরী নেয়। সে সনাতন স্বাভাবিক শুদ্ধ বস্তুকে অবমাননা করিয়া তৃপ্ত হয়। পিশাচের পৈশাচিক লীলায় তাহার সুখ। লক্ষ লক্ষ বক্ষের তপ্ত শোণিতে তাহার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। তাহার ভোগ রসের নিম্নে শত কোটী কোটী আর্ত্ত ব্যক্তির কাতর ক্রন্দন ব্যর্থ, সে আপনার মদমত্ততায় মুখে মিষ্টি অন্তরে হলাহল লইয়া বাহিরে সাধুতার ভান করিয়া অন্তরে পৃথক ও বঞ্চক। সে ভোগে উন্মত্ত; ভোগের বস্তু, ক্ষুদ্র, নীচ, জঘন্য, তাহাতেই সে ব্যাপৃত। ভোগের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত, ইহাতে অন্যকে না জানিতে দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনই মূল মন্ত্র। ইংরাজী ভাষায় slow but scientific process of poisoning" ইহারই অনুরূপ, এই অবস্থা হইতেহ পরের অংশে ভাগ বসাইতে ইচ্ছা হয়, পরের অংশে ভাগ বসাইয়াও নিবৃত্তি হয় না, পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। পরের বৃত্তি ছেদন করাই সুখের মূল বলিয়া গৃহীত হয়। "সবাতে বসায় আপন অংশ" এই ভাব সর্ব্বগ্রাসে সমাপ্তি লাভ করে। জমিদার তাহার বাড়ীর নিকটের গরীবের জমিটুকু নিতে লালায়িত কারণ বাগান বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইবে, বিলাস নিকেতনে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অনলে সকলকে আহুতি দিতে হইবে। প্রভুর ইচ্ছার উপর আর আপিল আদালত নাই, প্রভুর নিদ্রালস্য জনিত রক্ত নেত্রই, ভ্রুকুটী ভঙ্গীই তাহার পুরস্কার, ইন্দ্রিয় তর্পণের গতিরোধ করে কে? রাজা সুখের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, তাহাতে আবার দরিদ্রের কথা! বাক্য স্ফুরণও নিষিদ্ধ। তোমার বক্ষে আমার পদাঘাত! তাহাতে আমার পদের কলঙ্ক কিন্তু তোমার প্রতি অনুগ্রহ! তোমার অবশ্যই বলিতে হইবে "দেহি পদপল্লবমুদারম্", পরের সর্ব্বস্ব গ্রহণে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি—সুখের ঘনত্ব লাভ হইলেই তখন আলস্য আসিয়া হাজির! তখন "কেত্তা রবি জলে কেবা আঁখি মেলে, ধীরে ধীরে কহ কথা বায়ু বুঝি টলে", ইহাই মূল মন্ত্র হয়, তখন বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি, অলসতার সুখেই কাল যাপন হইতেছে। অন্য যাহারা আছে, তাহারা সকলেই আমার সুখের ইন্ধন। ভৃত্যের আবার সন্তোষ কি? সকলেই আমার সুখে নিয়োজিত। অলস সুখ চায়, নিজে পরিশ্রম করিতে নারাজ।

পরের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিক, আর আমার সুখের বিধান করুক, ইহাই অলসের ধর্ম্ম। পরের সর্ব্বস্ব অপহরণের পথ-সোপান আলস্য। চেষ্টা নাই, কেবল ভোগ আছে।

ভোগ্য বস্তুর স্পৃহা আছে, কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি নাই জড়তা আছে, সুখের সামগ্রী উপস্থিত থাকা চাই, চেষ্টা করিয়া আস্বাদন করিতেও অনিচ্ছুক, কেবল সংস্পর্শ, সংযোগ হউক। আমার যেন কিছু না করিতে হয়, নেশার সুখে যেন কাল বহিয়া যায়। উদ্যম নাই, আলস্যের ফল অবসন্নতা। অবসাদে তাহার স্বভাব খিন্ন, সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, কেবল অনুশোচনা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সন্তোষ না থাকাতে শোকের উৎপত্তি হয়। শোক নিবারণের উপায় খুঁজিতে গিয়া মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ করে। শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি সুরা পানে তাহার অবসন্ন চিত্তকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অবসন্নতা পরিহার করিতে যাইয়া অবসন্নতা-কেই বরণ করে। মদের নেশা কাটিয়া গেলেই অবসাদ আসিবে। কতক্ষণ মদে ডুবিয়া থাকা যায়? নেশা কাটিবেই, নেশা করিলেই অবসাদ। সুখের তামসিকতায় শোক অনিবার্য্য, মনের অকর্ম্মণ্যতা অবশ্য-স্তাবী, চিত্ত ক্লান্ত, শরীর অবসন্ন, শক্তি শূন্য ভাবে অবস্থান—তাহাতেই ভোগ এই অবস্থায় জড় সুখ করিতে বাসনা। ইহার ফলেই দীর্ঘসূত্রতা। কোন কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা নাই যত দিনে হয় হউক, আজ না হউক কাল করিব, কাল না হউক এক মাস পরে করিব। একটা তরল আমোদে বেশ চলিয়া যাইতেছে। পরে আমোদের যোগান দিতেছে। বেশ আরামে কাটিতেছে, চেষ্টা নাই, চিন্তা নাই, বিচার নাই, সঙ্কল্প নাই, ধৈর্য্যের দৃঢ়তা নাই, কেবল আছে আমোদের পিপাসা। পিপাসার তৃপ্তি নাই, পিপাসার নিবৃত্তি নাই, অন্ত নাই, বিশ্রাম নাই, জঘন্য বস্তুতেই আসক্তি, ইহাই তামসিক ভোগ। এই ভোগে লিপ্ত ব্যক্তিই তামসিক ভোক্তা,

এই ভোক্তৃত্ব সর্ব্বাধম। যাহা ব্যক্তির পক্ষে সত্য তাহাই সমষ্টির পক্ষে সত্য, যাহা একের পক্ষে সত্য তাহাই সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে সত্য, তামসিক ভোগে লিপ্ত জাতি প্রথমে কর্ত্তব্য বুদ্ধি হারায়, কর্ত্তব্যে অনবধানতাই তাহার পতনের প্রথম সোপান। কর্ত্তব্যবিচ্যুতি হইতেই মূর্খতা, ইহাতে জাতির বুদ্ধি অসংস্কৃত। অসংস্কৃত বুদ্ধির ফল অনম্রতা। মূর্খ ব্যক্তি কাহারও সদুপদেশ গ্রহণ করে না। মূর্খ জাতিও মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করে না। মূর্খতা হইতে শঠতার উদ্ভব। মূর্খতার অবশ্য-স্তাবী ফল পরবঞ্চনা। বঞ্চনা হইতে সুখ-ভোগের লিপ্সায় পরবৃত্তি চ্ছেদন, পরের জীবন ধারণোপায় নষ্ট করা, দুর্ব্বলকে প্রতা-রণা করিয়া নিজের মুষ্টিতে আনিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রক্ত চুষিয়া খাইয়া, পরের ধনে, পরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া অলস বিলাসে জাতি শোকাচ্ছন্ন ও দীর্ঘসূত্রতায় পতিত হয়। ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায়। ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য অলস বিলাসে বিনষ্ট হইল। বৈজয়ন্ত সাম্রাজ্য (Byzantine Empire), স্পেনীয় মুর-সাম্রাজ্য চেলডীয় সাম্রাজ্য বিলাসের মোহ মহিমায় আজ অবলুপ্ত। জাতি তামসিক ভাবে প্রমত্ত হইলেই পরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে চায়। ইন্দ্রিয় সেবার তৃপ্তি নাই। অতৃপ্ত বলিয়াই নিত্য নূতন উপকরণের আবশ্যকতা। উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ছলে বলে গ্রাস। এইরূপে পরের রক্তে পরকে দুর্ব্বল অন্তসার শূন্য করিয়া পরের শক্তি খরচ করিয়া তাহার উপাদানে, তাহার অর্থে আপনার ক্ষুদ্র সুখ, ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলমন্ত্র হয়। নিজে বিলাসী

হয়। নিজের বিলাসের নিকট সকলকে বলি প্রদান করে। বিলাসের ফলে অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হইলে মাদকতার অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। দুর্ব্বলের পেষণে, দুর্ব্বলের শোষণে সেই ইচ্ছা পর্য্যবসিত হয়। অবসন্নতার ফল নির্গম্যতা, দীর্ঘসূত্রতায় জাতি ধ্বংস হয়। ভারতীয় হিন্দু জাতি সাত্ত্বিকতার ভানে তামসিকতার পাতিত্ব ঘটিয়াছে। সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতার ভেদ কেবল প্রকাশে ও উৎসাহে নিদ্রার সুখ অপ্রকাশ ও অবসাদ, সমাধির সুখ প্রকাশ ও প্রসন্নতা বা উৎসাহ, নিদ্রার সুখ ও সমাধির সুখের পৃথকত্ব প্রকাশে ও উৎসাহে। ভারতীয় হিন্দুজাতি সাত্ত্বিকতার ভান করিতে গিয়া তামসিক হইয়া পড়িয়াছিল। অধঃপতনও হইয়াছে। তামসিক ভোক্তা হইতে রাজসিক ভোক্তা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার ভোগ্য বস্তুর নানাত্ব আছে, জঘন্য বস্তু ত্যাগ করিতে প্রয়াস আছে। ভোক্তার চেষ্টা আছে, ইচ্ছার প্রবলতা আছে। রাজসিকের চেষ্টাই জীবন, চঞ্চলতাই তাহার স্বভাব। রজঃগুণের ধর্ম্মই রাগ, তৃষ্ণা, ফলাকাঙ্ক্ষা তাহার সহচর। তামসিকের জড়তা তাহার নাই, তামসিকের অপ্রকাশ তাহার নাই। রজঃগুণ চঞ্চল। রাজসিক ভোক্তার রাগ বা ভালবাসাই স্বভাব। রাগ বা কামনার প্রবলতায় সে অস্থির। ছুটাছুটি চঞ্চলতায় সে সুখ বোধ করে। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সহিত যেন সে ঘুরিতেছে, সে যেন প্রত্যেক গ্রহ তারাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিবে।

কর্ম্মে তাহার অত্যন্ত ভালবাসা, সুখের লিপ্সা অতীব উৎকট, কিছুতেই পিপাসা মিটে না। সে কর্ম্মের ফল সুখ চায়। ভোগের বস্তু সরস হইলে তাহার আরও সুখ। যৌবনের উদ্দাম লালসাই তাহার প্রাণ। বালকের শিশুর সম্মুখ লালসা সে চায় না। সে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভোগ চায়, ভোগের বস্তুর বাহিরের চাকচিক্য তাহার মনে অঙ্কিত হয়। ঐন্দ্রিয়িক সুখের সহিত মানসিক সুখের উপাসনাও সে করিতে চায়। সুখের তারতম্যের হিসাবও কতকটা রাখে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখের তারতম্য করে। সাংসারিক সুখ ও স্বর্গের সুখের বিচার সে করে। কিন্তু ভাবুকতায় অর্থাৎ কামে সে এমন অভ্যস্ত স্বর্গে ঐন্দ্রিয়িক সুখের সংস্থান তাহার চাই। সুখের দৃশ্য দেখা চাই তাহা না হইলে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না। সে যে সুখের উপাসক। কোথায় সুখ পাইবে, পৃথিবীর প্রতি অনুতে সুখ থাকিলেও সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে ইচ্ছুক। জগতে প্রত্যেক বস্তুর অনুসন্ধানে সে তৎপর। সে মরুভূমিতেও সুখ চায়, ভূগর্ভের খনিতেও সুখ খোঁজে, গ্রহ উপগ্রহে সে সুখের অন্বেষণ করে। সে চিত্ত-জীব, চিত্তের উন্মাদনায়, ভাল বাসার পীড়নে সে ব্যস্ত, সে যাহা কিছু করে তাহারই ফলের জন্য সে ব্যাকুল, ফল দেখিতে না পাইলেই বিরক্তি। পিপাসা তাহার এত প্রবল যে সে আর আসিতে পারে না, তৃষ্ণার তৃপ্তি তাহার নাই, তাই সে লুব্ধ হইয়া পড়ে। লোভ তাহার অতীব প্রবল। "ভূধর শিখরে, গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে" তাহার লোভের বস্তু খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। সে কাহারও দুঃখে বিচলিত হয় না। সে নিজের সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণির ধ্বংসে কৃত সংকল্প। দুর্দ্দমনীয় লোভে তাহার ভাবী মঙ্গলের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না। লোভনীয় বস্তু যে স্থানেই থাকুক তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। সন্তোষ তাহার

নাই, সে পরের সুখে কাতর। সে দুর্ব্বলকে ঘৃণা করে (Hate নহে, কারণ Hate এর প্রতি শব্দ সংস্কৃতে নাই ঘৃণা অর্থ ইংরাজীতে pity)। তাহার কাম প্রতিহত হইলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। ভিতরে ভিতরে ভয়ও থাকে, বৈষয়িক সুখ অনুধ্যানে সে তৎপর, সুখে লিপ্সা তাহার ফল, লিপ্সাই কাম, কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধ, ক্রোধ উৎপন্ন হইলেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা আসে। হিতাহিত জ্ঞান বিনষ্ট হইলে উপদিষ্ট জ্ঞানের বিস্মৃতি ঘটে, বিস্মৃতি হইতে কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান নষ্ট হয়। তাহাতেই সে পরম পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হয়। লোভের অবশ্যম্ভাবী ফল হিংসা, ফলের লোভে হিংসা করিতেও পশ্চাৎ পদ নহে। কার্য্যোদ্ধার চাই সুখ তাহার লক্ষ্য। এ সুখ তামসিক সুখ হইতে অবশ্যই ব্যাপক। তামসিক স্বার্থপর রাজসিক নানাত্বের সুখ চাই। তাই তাহার সুখ একটু ব্যাপক।

হিংসার ফল মানসিক অশুদ্ধি অশুচি যে না হইয়া পারে না; তাসে দর্শের জন্যই করুক আর বিশের জন্যই করুক অন্তরে হিংসার ছাপ তাহার লাগিবেই। হিংসার ছাপ এড়াইবার তাহার জো নাই। হিংসার ফলে তাহার অশুচি ভাবচিত্তে অবশ্যই আসিবে। কার্য্যের ফল ফলিলে হর্ষ হইবে কিন্তু ফলের ক্ষণস্থায়িত্বে তাহার শোক অনিবার্য্য। ভগবান গীতাতেই তাই বলিয়াছেন "ফলে সক্তো নিবধ্যতে" ফলে আসক্ত হইয়াই বদ্ধ হয়। অনন্ত মুক্ত সুখ সে পায় না। সে যে মরিচীকায় জল ভ্রান্তিতে ঘুরিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে জল না পাইয়া শোক বরণ করিল। তাহার পক্ষে "লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাড়ল হারাণু জেলে" অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, তাহার "অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল" ইহাই তাহার শিক্ষা হয়। কবি তাহার কাব্যে নাটকে মানস প্রতিমা গড়িতে গেল। মিলনাত্মক (Comedy) নাটকের পত্তন করিয়া বিয়োগান্তক (Tragedy) নাটকের সৃষ্টি করিল। আবার মিলনাত্মক নাটকেও দুঃখের সৃষ্টি করিতে হইল। নায়ক নায়িকার মিলনে অন্য কাহারও বিয়োগের গান গাহিতে হইল। কবি তাঁহার মানস প্রতিমা রাজসিক সুখে গড়িয়া তোলে। কবির প্রতিমার সৌন্দর্য্য আছে, মাধুর্য্য কোনও ক্ষেত্রে থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু ঔদার্য্য নাই। ঔদার্য্য সাত্বিক উহা বিশুদ্ধ সত্বের উপাদানে গঠিত।

কবি সুখী। কবি চিত্তের সুখেই উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার ভোগ্য বস্তু মানস সুন্দরী। কাব্যর প্রাণ রস, সে রস ব্রহ্মানন্দের অপভ্রংশ। (কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং) সে রস রাজসিক, কোন ক্ষেত্রে সাত্বিকের আভাস থাকিতে পারে। ভারতীয় নাট্যকলার কাব্য ঝঙ্কারে সাত্বিকতা প্রাধান্য আছে, কিন্তু ইউরোপে রাজসিকভাবের অতীব প্রাবল্য। Ecstacy, Frenzy. উৎকট ভাব যাহার প্রাণ তাহা রাজসিক। রাজসিক বস্তুতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী ফল শোক; যে কাব্যই হউক যে নাটকই হউক উত্তেজনার সৃষ্টি করিবেই, সুখের আদর্শে কাব্য অনুপ্রাণিত হইবেই। আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিবেই। রোমিও জুলিয়েতের গুপ্ত প্রেমে যতই সৌন্দর্য্য থাক, উহা উত্তেজক, উহা ব্যভিচার! কবি গেটে তাহার "Faust ও Wilholmmister" প্রভৃতি গ্রন্থে সাত্বিক ভাব দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবি সোলেয়ার তাঁহার নাটকেও সেই ভাবের প্রাধান্য দিতে চেষ্টিত। কিন্তু কাব্যের বিচারে তাহা

দিগের কাব্য দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিতে হয়। কারণ তাহাতে Ecstacy বা Frenzy উৎকট ভাব কম। ভারতের কাব্য পড়িয়া ইউরোপের অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছে, ভারতীয় নাটকের আদর্শ সাত্বিক, তাহা হইলেও রাজসিক ভাব বৃদ্ধি হয় এ বিষয় সন্দেহ নাই। আলঙ্কারিকের অলঙ্কার যতই মনোহারী হউক না কেন উহা রাজসিক গেটের কাব্য নাটক, মোলেয়ারের নাটক, Wordsworth এর কবিতা, ভারতীয় নাট্য সাত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও কামনার প্রাবল্যে রঞ্জিত। কবি Wordsworth এর কবিতা ভাবুকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, কবি Shelly এবং Browning ও এই দলের। ভাবুকতার বস্তু নির্ণয় হয় না। উহা অসত্যকে সত্য বলিয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া, অধৈর্য্যকে ধৈর্য্য বলিয়া দেখায়। প্রেমের ব্যাকুলতা, ভালবাসার উদ্দাম ভাব, প্রাকৃতিক জগতের সৌন্দর্য্য কবির প্রাণ, কিন্তু এইগুলির অন্তরালের সুখ সকলই ভঙ্গুর। কবি ভোগের স্পৃহায় কাব্য সৃষ্টি করে। সুখের স্পৃহা তাহার আছে, অতএব রাজসিক ভোগ সুখ তাহার প্রাণ। আকাঙ্ক্ষার বস্তু আছে, সুখের নানাত্ব বোধ আছে। আদিরস, বীররস, করুণরস, বীভৎস রস প্রভৃতি নানারূপ রসের সমাবেশে কাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু রাজসিককে সাত্বিক সুখের দিকে নিতে পারিলেই কাব্যের দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। খণ্ড ছিন্ন ভাবকে অখণ্ড অসীম ভাবে পরিণত করিতে পারিলেই তাহার দোষ কাটিয়া যায়। কিন্তু কবির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, কারণ কবি সুখপ্রিয়। রাজসিক সুখ ভোগের নিদর্শন স্বরূপে ইহার উল্লেখ করিলাম। কবি রাজসিক ভোক্তা, রাজনৈতিক, দেশসেবক, সমাজসেবক, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, বৈজ্ঞানিক সকলেই রাজসিক ভোক্তা। ধর্ম্মজগতেও যাহারা কাম্যফলে আসক্ত তাহারা রাজসিক। ধর্ম্ম অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, ধর্ম্ম বলিতে তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। তপস্যা অন্তরঙ্গ কিন্তু দান যজ্ঞের আন্তরিক দিক ও বাহিরের দিক আছে, দানে দাতারও মঙ্গল গৃহীতারও সুখ, যজ্ঞের ফল কর্ত্তার হয় এবং যজ্ঞে দশের উপকার হয়। (ক্রমশঃ)

শৃঙ্খলিত

[শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়]

একবার দেখো ছাড়ি'—
বিশ্ব জগতে ওলেট পালট করিতে পারি কি নারি ?
রক্ত আমার টগবগি' ধায়,
উন্মাদ সম শিরায় শিরায় !
শত নাগিনীর গর্জ্জনে উঠে স্পন্দন-ধারা জাগি',
গুপ্ত ঘাতক অস্ত্রের সম হৃদয় রক্ত মাগি'।

শৃঙ্খল খুলি দাও,—
সন্ন্যাসী আমি, বন্ধনহারা কেন মোরে বাধা দাও ?

রাজদ্রোহী কেবা বলে ?—
নৃপতির পদ বক্ষে ধরেছি বিশ্বের কোল।হলে !
নই গো হিন্দু নই খৃষ্টান,
বৌদ্ধ, জৈন, জাঠ কি পাঠান ;
রক্তের প্রতি বিন্দুতে মোর মানবের প্রাণ রাজে ;
মহামানবের বংশের আমি, জানি বিশ্বের মাঝে।
কেন রাখ নিরালায় ?—
আমার বারতা—রুদ্রের বাণী সাধ্য কি রোধ তায় ?

সারা বিশ্বের মাঝে,—
যেখানে প্রলয় ঝঞ্ঝা আমার বারতা সেথায় বাজে !
অন্নহীনের অন্নের পাশে,
অত্যাচারের ভীষণ গরাসে ;
বন্ধুর পথে, দুন্দুভি মোর গর্জ্জিবে পলে পলে ;
নয়নের জলে অভিষেক মোর, দুঃখের হোমানলে।
তাই ডাকে অসহায়,—
চাহে চাহে ঠাঁই বক্ষে আমার আর কিরে সহা যায় ?

চলে অই পথ বাহি',—
শত নিরন্ন, শতবিবস্ত্র, দুঃখ কাহিনী গাহি'।
দাও দাও ছাড়ি' দাও একবার,
বক্ষে জড়ায়ে ধরি' অনিবার ;
বলি জনে জনে ভয় কিরে আর—আমি যে এখনো আছি ;
জল', ওকি চোখে ! .পদতলে মোর পৃথ্বী উঠিছে নাচি, !
দাও দাও মোরে ছাড়ি'—
অনাহারে মোর পিতা, মাতা ভাই আর কি থাকিতে পারি ?

একি নর্ত্তন হেরি ?
চারিদিকে মোর শুষ্ক প্রাচীর নাচিছে আমারে ঘেরি' !

একি নর্ত্তন এযে তাণ্ডব,
রুদ্রের একি লীলা বৈভব ;
প্রলয় বার্ত্তা এলো এলো বুঝি বিশ্বজগতে নামি' ;
না ! না ! একি সব থির অচপল, নাচিয়া উঠেছি আমি !
কাণে কাণে কি যে কয়,—
প্রতিধ্বনি তার দেয়ালে দেয়ালে সারা নিশিদিন রয় !

শুনেছি বিশ্বগীতি,—
মুক্ত অসীম আকাশের তলে কাণ পেতে নিতি নিতি ।
সাগরের জলে, হিমানার বুকে,
বিহগের তানে, বৃক্ষের মুখে ,
পশু পাখী আজ সবাই মিলিয়া অবিরাম কহে ডাকি',
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদে—কেমনে বসিয়া থাকি ?
আহ্বান শুধু আসে, –
ঝঞ্ঝনা করি' মৃত্যুর সম আপনায় পরকাশে !

কিসে আহ্বান শুনি ?—
আমার কর্ণে ফুকারিয়া যায় অনিবার কোন গুণী ?
চোখ দু'টী মোর ঠিকরিয়া পড়ে,
দেহ প্রাণ আর ধরিতে না পারে ;
জাগে মনে শত নিপীড়িত দেহী বাজে বড় ব্যথা প্রাণে,
ধ্বনি' উঠে শুধু বিশ্বের গীতি নিশিদিন মম কাণে !
আর কিরে সহা যায়' ?—
সমুখে, পিছনে চারিদিকে মোর বহ্নি-ঝলক ধায় !

না ! না ! আর নাহি পারি,—
এক হয় নিজে ছিঁড়িব শিকল নয় দাও মোরে ছাড়ি' ।
ভাঙ্গিয়া পড়িব উর্ম্মির সম,
নব অনুরাগ হ'তে অনুপম ;
মৃত্যুর মত নির্দ্দয় চিতে মাতিব রঙ্গীন প্রাণে ;
যেথা অবশেষ—ধ্বংসের শেষ কামনার অভিযানে !
কে জানে বা কবে হ'তে—
মহাজীবনের আশ্রয় মাগি' ছুটেছি মরণ-পথে ?

———

মসজেদর আবির্ভাব

'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে'

[স্বামী প্রদীপ্তানন্দ]

বাংলার বিগত শত বৎসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটা শতাব্দী ব্যাপী pessimism আমাদের জীবনের সহজ আনন্দের এবং স্বাভাবিক গতির ওপর বড় তীব্র ভাবেই দাগ পেড়েছে।

অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে আমরা সাত শত বৎসরের গলিত শব, প্রাণের লেশ মাত্র ও আমাদের নেই।

অনেকে আশার কথা শোনান বটে কিন্তু যখনই চলবার পথে আমাদের ক্ষুদ্রতম ভুল ভ্রান্তি টুকু ধরা পড়ে আমরা হতাশ হয়ে বলে ফেলি তাইত আমরা যে সাত শত বছর ধরে মরে ভুত হয়ে আছি।

আমার কিন্তু মনে হয় এ হতাশের কোন ভিত্তিই নেই। ইসলামীয় বিজেতৃদের সভ্যতায় আমাদের গৈরিকের আভাস দিতেই তিনচারশ বছর কেটে গেছে। বাইরের কাজ যখন শেষ হ'ল ভিতরের দিকে চাঁইবার সময় হল তখনই। এই যুগের বাংলা আর ভারতের মাঝখানে প্রাকার বলে বিশেষ কিছু নেই। তাই ভারত ব্যাপী যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একটা প্রয়াস দেখা যায় সেটাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনার, আমাদেরই আত্মযোগের প্রকাশ বলে দাবী করতে পারি!

বৌদ্ধ প্লাবনের পর যখন আমাদের সমাজ নূতন করে দানা বাঁধতে আরম্ভ করল, তখন থেকে সে একই নিয়মে চলতে থাকল। যদিও সেই গতির নিয়ামক শক্তি সমূহের পরিবর্তন হল, তবুও সে গতি পরিবর্তন করবার অবসরটা হয়ত হয়ে উঠেনি।

এই অবসর যখন এগিয়ে আসছে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে ইংরাজ দেবতা আমাদের সাধন কুটীরের দুয়ার ভেঙ্গে হুড় মুড় করে ঢুকে পড়লেন। এরকম সময় বাইরের গোলমাল কাটিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকা আমাদের সম্ভব ছিলনা কারণ মনটা তখনও একেবারে আত্মস্থ হয়নি।

গ্রন্থির উপর গ্রন্থি দিয়ে প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলে আমাদের অহংটাকে অটুট রাখবার তবুও একটা চেষ্টা হয়েছিল।

সাধারণ জীবের দেহবুদ্ধিটা বেশ একটু আছে। যাঁরা অসাধারণ হবার জন্যে সাধনা করছেন তাঁরা দেহের ওপরে উঠতে প্রয়াস পান। বাইরে থেকে যখন প্রচণ্ড আঘাত আসে তখন অনেকেই ঐন্দ্রিয়িক জগতে নেমে পড়েন।

এই তীব্র Sensationটা আমাদের বিচার বুদ্ধির উপরও একটা Shock দিয়েছিল। এই 'মোহসংমূঢ়াত্মা' অবস্থায় যদি আমরা বাইরের বন্ধনটা বাইরের রূপটাকেই আমাদের আমিত্ব বলে ভুল করে থাকি তবে তার দোষ দেওয়া যায়না।

অবশ্য এই আত্মরক্ষার চেষ্টাটা এতই স্বাভাবিক যে সেটার অভাবে জীবের প্রাণ থাকার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকেনা।

তবুও যদি আমাদের এই সংবৃত অবস্থা বেশীদিন চলত তবে ভবিষ্যত ত আমাদের জন্য ছিলই না, বরং চট্‌পট্ আটাত্তর ভূতে মিশে যাবার বন্দোবস্ত করতে হত।

কিন্তু তা হবার নয়। প্রাণের নিয়মই হচ্ছে বাইরের আবেষ্টনকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বার একটা বিপুল চেষ্টা, "নিজের সঙ্গে" বাইরের একটা সামঞ্জস্য। যে প্রাণী এটা পারেনা তার ধ্বংস অনিবার্য্য। যারা শুধুই বাহিরটাকে চায়, যারা ভুলে যায় "আমিত্ব"টাই সেই স্থির factor, আর সবগুলি modify করে যার সঙ্গে আপোষ করতে হবে তারাও এই চোরা বালিতে ডুবে মরে।

প্রাণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই আমরা জগৎ বৈচিত্র্যের সম্রাট। যখন সে চলে যায়, শুকন কাঠের মত দেহ খানা তখন পড়ে থাকে আর প্রকৃতির শত সহস্র বন্ধনের মধ্যে তা হারিয়ে যায়। নিজেকে ত্যাগ করে সামঞ্জস্য তাই মৃত্যুর নামান্তর মাত্র।

বাংলার গত শতাব্দী ধরে এতগুলি বিভিন্ন শক্তি কাজ করে চলেছে একসঙ্গে, যে ভূমাটার একটা বিশিষ্ট গতি নেই বলেই মনে হয়। আর এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ আমাদের আসে।

সমুদ্র ওঠে আর সরে যায় বালির ওপর রেখে যায় হয়ত দু'খানা ঝিনুক, হয়ত একটু জলের দাগ।

সে হিন্দু সমাজ আজ কোথায়—রেল দেখায়, চপকাটলেট্ খাওয়ার এবং বিলেত যাওয়ায় যাকে জাতিচ্যুত হতে হয়েছিল?

অনেকদিন নিজের ভারক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে সে কাশীপ্রাপ্ত হয়েছে।

তারপর সেই আত্মবিস্মৃত-সামঞ্জস্য-বাদীর দল প্রতীচ্যের ধর্ম্ম, সভ্যতা আচার ব্যবহার যায় বেশভূষা যাঁরা নির্ব্বিচারে মেনে নিলেন তাঁরাই বা কোথায়?

ব্যক্তি এবং বিশিষ্টতায় তাঁরা লয় পেয়েছেন সত্যি। সচল রথচক্রের নীচে যারা পড়ে জাতির অনেকেই—কিন্তু সে রথের গতি থাকে তেমনি উদ্দাম তেমনি শক্তিমান।

নব্য বাংলার ইতিহাসে এঁদের দানটাই সবচেয়ে বেশী।

প্রাচীন বাংলার অসংখ্য গ্রন্থিময় জীবনে যখন নূতন করে গ্রন্থি পড়তে লাগল নূতনের দেবতা যিনি কিছু আগে ভারতের মত করেই প্রকাশ হতে যাচ্ছিলেন, সেই অলজ্ঘ্য কারাগার থেকে বাইরের তীব্র জ্যোতিতে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সে জ্যোতি বিদেশের সে আলো আমাদের সূর্য্যের নয়।

কিন্তু বিচার করবার সময় ছিল না। পিছনে সূচীভেদ্য তমিস্রা, সমুখে তীব্র জ্যোতি হয়ত দাহময় কিন্তু সেই নবীন ঠাকুরটি যদি পিছনের হাজার হাজার শৃঙ্খলের মধ্যে নিজেকে ভয়ে চাপা দিতেন, তবে তাঁর মরণটা নিবারণ করা স্বয়ং শিবেরও সাধ্য ছিলনা।

আলোর নেশায় পাগল হয়ে, পায়ে পায়ে আগুন ছড়িয়ে, এই দেবতা তাঁর প্রলয়চ্ছন্দটাকে গতির মধ্যে সজীব করে নাচালেন।

শেকল ভাঙ্গে, শেকল ছেঁড়ে, শেকল গলে।

আমরা বিস্মিত হলাম, আমরা স্তম্ভিত হলাম। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালস্তূপের মধ্যে কোথায় ছিল এত প্রাণ। জরাজীর্ণ এই সপ্তকোটী মনের কোন অন্তস্তলে মরে ছিল

এই বিরাট চাওয়া। না ছিল তার প্রকাশ, না ছিল তার কোন আভাস।

আজ কোন অমৃতের স্পর্শে তা প্রাণ পেল, ভাষা পেল। চাই আলো, চাই স্বাধীনতা চাই মুক্তি।

ছন্দের উদগ্র তরঙ্গে কোনখানে তিনি শুকন ফুলের মত, নিবে যাওয়া তারার মত ঝরে পড়লেন।

তিনি গেলেন কিন্তু তাঁর inertia রইল। কর্ত্তা মরলেন, কর্ত্তার ভূত কিন্তু মল না। স্তব্ধ রাতে, বিজন পথে সে ভূত বাতাসের সঙ্গে গান ধরে। এও জানি তার মাদকতায় কেউ কেউ ভোলে।

কিন্তু ঝরে পড়ল শুধু তাঁর দেহটা কারণ তিনি অমর এবং অমৃতই তাঁর সাধনা। জীর্ণ বাসের মত শরীরটাকে তিনি ত্যাগ করে গেলেন।

সাগরের বুকে প্রলয়গর্জ্জী একটা ঢেউ ওঠে। হয়ত শৈলবাধার সঙ্গে সংগ্রামে তা লক্ষ কণায় চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সেই শক্তি যা ঢেউয়ের মধ্যে প্রকাশ হচ্ছিল, তাত লয় পায়না, নূতন ক্ষেত্রে, নূতন কেন্দ্রে, নূতন রূপে তা প্রকাশ পায়।

কিন্তু এই আগুন নিয়ে খেলা, কোন প্রয়োজন ছিল কি এর?

এই মুহূর্ত্তে যে 'আমি', সে "আমি"ত শিশু-আমি থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রধানতঃ তারই ফল। অভিজ্ঞতা যখন আমার হয় তখন আমার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত সকলি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে সেই অভিজ্ঞতায় আত্মবিসর্জ্জন দেয়। অনুভূতি হচ্ছে আত্ম-বিসর্জ্জন। অনুভূতির অনন্যব্যসায়ক দ্রষ্টা। দ্রষ্টা হতে গেলে অনুভূতিটারও প্রয়োজন।

যখন আমাদের নতুনের দেবতা এই জড়-বের আগুন থেকে বেরিয়ে এলেন, তিনি বেরিয়ে এলেন মহিয়ান হয়ে, তাই তাঁর পুরাতন দেহ রইল কি গেল সে নিয়ে আমাদের ভাবনা আসেই না।

কিন্তু এ গেছে একটা সন্ধিক্ষণ। সংশয় ছিল বিরাট ভয় ছিল অনেকটা।

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। নব যুগের মনটি কাঁটার মত ধীরে ধীরেই চুম্বকের দিকে ফিরছে। এ সুযোগে প্রাচীন অক্টোপাসটি আর একবার তার হাত পাগুলি মেল্‌তে লাগলেন, নবীনের সব চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে তিলক কেটে টিকির গেরো বেঁধে ভদ্রলোক হ'য়ে বসবার জন্যে।

কিন্তু তা' হবার নয়, হোল না। বসন্তের দেবতা যিনি প্রকাশ হবার জন্যে দেহ পাচ্ছিলেন না, অথচ আমাদেরই আশে পাশে অদৃশ্য হ'যে ঘুরছিলেন, স্তব্ধ রাতে আমাদের সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করছিলেন; সহসা কোন বোধি দ্রুমের নীচে বসে তাঁর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সহস্রার থেকে কি অমৃত যে সহসা ঝরে এল, চিত্তের সঞ্চয় প্রতীচ্যের সংস্কার গুলি এক আশ্চর্য্য ছন্দে নেচে উঠল, যে ছন্দ একান্তই আমাদের, যে ছন্দ শিবের প্রকাশ,—মৃত্যু, সংশয় যার নয়।

ভারতের যুগ যুগান্তের অধ্যাত্মানুভূতি সহসা একটা কেন্দ্রে অপ্রতিহত বেগে প্রকাশ পেল, নূতন চিন্তার কেন্দ্রগুলিকে সে আপনারই ক্ষেত্রে টেনে নিলে—ফল হ'ল একটা আশ্চর্য্য জিনিষ, আমাদের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

দক্ষিণেশ্বরের পাগল পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ, মিল্, ক্যান্ট্, স্পেন্সারের ছাত্র, ব্রাহ্মসমাজের যাত্রী নরেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হ'লেন—আর

সৃষ্টি করলেন বিবেকানন্দকে,—বসন্তের দেবতা যাঁর মধ্যে প্রকাশ হ'য়ে পড়লেন।

বিবেকানন্দকে আমরা একটা মানুষ ব'লে ধরিনে, জ্যামিতির আনুমানিক বিন্দু ব'লেও ধরিনে, সমুদ্রের বুকের ওপর ঢেউ যখন গা ফুলিয়ে ওঠে সে একটা কোন বিন্দুকে পাবার জন্যে নয়।

নিজের অনেক পিছনে এবং সমুখে অনেক দূর অবধি তার সীমা।

তাই বিবেকানন্দ একটা series, একটা process—যার সীমা সাধক বিবেকানন্দের কর্ম্মক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে নয়—অথচ তার অনেক পিছনে তাঁকে অনেক ছাড়িয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী নিজেকে প্রসারিত করে।

বিবেকানন্দ অনেক দিন হ'ল দেহরক্ষা ক'রেছেন। কিন্তু বসন্তের দেবতা—যিনি অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সুমঙ্গল জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন—যিনি বিবেকানন্দকে অবলম্বন ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, জাতির বোধিক্রমের নীচে তাঁর অনুভূতির শেষ এখনও হয়নি।

এ'ত গেল জাতির উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। একথাটা এখন বেশ ক'রেই বলা যায় যে নূতন জাতি জন্ম গ্রহণ করেছে।

কিন্তু গত শতাব্দি ধরে আমরা যে হতাশা যে অসন্তোষ যে 'নেতি' 'নেতি' আরম্ভ করেছি, সেত পুরাতন জরাজীর্ণ দেহখানার সঙ্গে পুড়ে মরেনি, এই একশ', বছর ধরে আমাদের আকাশ ঘিরেও তেমনি শাসাচ্ছে।

তবে হয় ত সত্যি যে এই 'নেতি'র কারণ বদলেছে বা তার রূপ বদলেছে। নানা সময় নানা ভাবে আমরা এই 'নেতি'টাকে প্রয়োগ করেছি, এই pessimismএর দ্বারা কাজও অনেক হ'য়েছে তাও সত্যি। এই সত্যিটার মধ্যে দিয়ে একটা 'কিন্তু' আমাদের খোঁচা দেয়।

তাড়নায় সুবোধ বালক পড়তে বসে বটে কিন্তু ঐ তাড়নাটা ধীরে ধীরে তার স্বভাবের এমন একটা পরিবর্ত্তন আনে যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই শিশু জাতিটির চলবার পথে একটু পা টলা বা ভুল চুক হওয়া ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল ভ্রান্তিতে যে বিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে লজ্জায় আহত হয় সেটাকে স্বাভাবিক বলার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না।

খুঁত খুঁতে রোগীদের কোন ঔষধ পথ্যই ভাল লাগে না। দিন এবং রাত্রির মধ্যে কোন সময়টাই এবং কোন পরিবর্ত্তনই তাদের ভাল লাগে ব'লে জানা নেই।

অবস্থার ক্রমেরই মধ্যে সাধক বলেন নেতি নেতি। কিন্তু এই নেতির মধ্যে প্রবল বৈরাগ্যের পাশে একটা শান্ত আত্ম-প্রসাদ বর্ত্তমান থাকে যাকে কোন ক্রমেই আমাদের pessimism এর সঙ্গে পাশাপাশি বসানো যায় না।

এই বৈরাগ্যটাকেও যেন আমরা pessimism বলে ভুল না করি। এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড optimism আছে যা সীমার কোন অবস্থাকেই অক্ষয় এবং অমর বলে মনে করে না বটে—কিন্তু তেমনি দৃঢ় বিশ্বাসে একটা চরম সত্যকে লক্ষ্য বলে আঁকড়ে ধরে। সেই খানে গিয়ে সাধক বলেন 'ইতি ইতি' বা Eureka. আমাদের জাতীয় জীবনেও এমনি একটা চরম সাধ্য আছে—আদর্শ-বাদীরা বলে থাকেন। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন, হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম, প্রতিদ্বন্দীতার পরিবর্ত্তে সহায়তা, অযোগ্যতমেরও জীবনের

অধিকার এই সমস্তই নাকি ভারতের 'মিশন' যাতে তাকে ঘরে বাইরে সিদ্ধ হ'তে হবে।

অবশ্য অবিদ্যামূলক জগৎটাকে আমি আদর্শ ব'লে গ্রহণ করিনে। এর নিরোধ-গামিনী প্রতিপদকেও আমি আর্য্য সত্য বলে জানি। কিন্তু 'নেশন' জাতি হিসাবে বা আমরা সকলেই কি সেই সত্যকে এখুনি লাভ কর্‌তে পার্‌ব? এমন মানুষও আছে আমাদের মধ্যে যাদের 'নিরোধে'র পথেই হচ্চে হিংসা এবং সংগ্রাম, কলহ এবং প্রতি-দ্বন্দ্বীতা, পশুবল এবং অধর্ম্ম। এইসব লোক-দের কি আমরা জাতির ত্যাজ্য পুত্র ক'রে দেব? না, যখন সেই সত্যযুগ 'সত্যং শিবং সুন্দরং' এর প্রকাশ নিয়ে এসে পড়েছে তখন সকলের মধ্যেই সত্ব প্রধান হবে এবং আমরা নির্দ্দোষ হ'য়ে পড়ব? আমাদের মাথার ওপর যখন এই মেঘ স্পর্শহীন তাম্রতপ্ত আকাশ এবং নীচে এই দিগন্তব্যাপী শুষ্ক মরুভূর ওপর চো'খ পড়ে তখন অন্তরাত্মাটা আমাদের ওয়েসিসের মত শুকিয়েই যায়, সত্যযুগের কথা মনেও আসে না।

আমাদের মধ্যে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ এসেছেন সত্যি। সমস্ত জাতটার মধ্যেও এই বুদ্ধত্ব লাভ কর্‌বার একটা বিপুল প্রয়াস দেখতে পাই সত্যি কিন্তু সেটা একটা প্রয়াস মাত্র এবং ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে এটা একটা প্রয়াসই থেকে গেছে। এ প্রয়াসটাকে অস্বীকার করা আমাদের কাজ নয়। কিন্তু এটাও ভুল্‌তে পারিনে যুগ-যুগান্ত ধরে আমরা একটা পদের জন্যে তপ-শ্চর্য্যা কর্‌ছি যা সাধারণ ঐন্দ্রিয়িক জীবনের দিক দিয়ে সত্যিই abnormal.

হিমালয়ের মত এই সব আদর্শের পর যখনই আমরা নিজেদের পানে চাই তখনই আমাদের 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' বলে মনে হয় এটা ত স্বাভাবিকই। তা' আমরা যতই শক্তি-মান এবং যতই বড় হই না কেন! কারণ চো'খ আমাদের ঝল্‌সে গেছে এবং বুদ্ধি হ'য়ে পড়েছে মূঢ়, আমরা ভুলে গেছি আমাদের এম্‌নি কতকগুলি লোক নিয়ে কারবার যারা অত্যন্ত সাধারণ।

এই আদর্শবাদীর দল আজ আমাদের সমস্ত চিন্তায় রাজত্ব কর্‌ছে এবং আমাদের শক্তিকে অসাড় ক'রে আন্‌ছে। আকাশের গায়ে ঢিল ছুঁড়লে ত তা' বেশী উঁচুতে উঠবেই না।

এই হিংসা এবং অন্যায়ের জগতটাকে আমরা বাস্তব বলেই গ্রহণ করি না কেন? এর ভেতর ভাল আর মন্দ, হিংসা এবং ভাল-বাসা, সবই ত আছে।

কাজেই আমাদের এই pessimism এর কোন দাম আছে ব'লে মনে করি না, ক্ষতির দিক ছাড়া। অসন্তোষ থেকেই অবশ্য নবীনের জন্ম হয়, কিন্তু এই অসন্তোষ এবং pessimism বা হতাশ বিদ্রূপটা ঠিক এক রকম নয়। কারণ এটা আমাদের কোন ফলেই পৌছাতে দেয় না এবং আমাদের দিকে অহরহ একটা রক্তশোষা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যাতে বসন্তের দেবতা বুকের মধ্যেই শুকিয়ে যান এবং মরণটা অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে।

আমরা যে সমস্তটাই achieve ক'রেছি তাও বলি না—কারণ সেটা মৃতের লক্ষণ। বসন্তের ঠাকুর ঘরে আর বাইরে মনে আর দেহে অনেক রূপে অনেক ভাবে আমাদের কাছে ধরা দেবেন, দেবেনই। আমাদের কাজ বসন্তের ছন্দে আত্মসমর্পন ক'রে তার প্রকাশকে এগিয়ে আনা। অসন্তোষের বেতালা সুরে মেজাজ বিগ্‌ড়ে রাখা নয়।

মনকে শুদ্ধ কর্‌তে হবে তবেই ত তিনি আস্‌বেন। ইন্দ্রিয়ের দাস সন্দেহের দাস মনে ত কথনও বিস্ময়ের জ্যোতি পড়ে না।

অক্ষমতা, দীনতা, ভীরুতার idea আমাদের hypnotise করেছে।

আমাদের আত্মবিশ্বাসী হ'তে হবে—শ্রদ্ধাবান্ হ'তে হবে।

আমাদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধায় আমাদের বলিষ্ঠ হ'তে হবে, আমাদের অন্তরের দারিদ্র্য মোচন করতে হবে, শ্রদ্ধা দিয়ে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে এই পরম শুদ্ধির নদীতে পুণ্যস্নাত হ'যে শ্রেয় বীজরূপী মহাবস্তু লাভ করতে হবে।

ভারতের যৌবনের চাঞ্চল্য, উষ্ণ রক্তের অসম সাহস এবং আত্মস্পর্দ্ধা আমাদের অনুভব করা চাই, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই, শিরায় শিরায় অনুভব করা চাই। চাই যৌবনের তেজ যা' দৈন্য এবং বিজ্ঞতাকে উপহাস করে। বসন্তের উন্মাদ যখন পৃথিবীর গায়ে ঢলে পড়ে, মৃত্যুর মত চিরন্তন সত্যকেও তখন সে উপহাস করে। দেহের যৌবন হয়ত ইন্দ্রিয়ের গৌরব করে, কিন্তু মনের যৌবন সংযমে এবং সাহসে, আনন্দে এবং ঐকান্তিকতায় নিজেকে বরণ করে। দাসত্ব তার নয়, ক্লৈব্য তার নয়, মোহ তার নয়। শিশু যে সমাজধর্ম্ম পালন করে, তার ভেতর বার্দ্ধক্যের যুক্তি নেই, বয়সের শ্লীলতা নেই এবং নীতির মর্য্যাদাও নেই। সে সুন্দর, তাই তার সব সুন্দর।

যে সব সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই—থাক্ তা—পড়ে থাক্। শুধু আমরা প্রচার ক'রে দেব—হে ভারত, তোমার সম্পদ অনন্ত—তোমার বিশ্বাস অনন্ত—তোমার শক্তি অনন্ত—অনন্তই তোমার স্বরূপ। শুধু এই আমাদের কাজ। আর সব আপনিই আস্‌বে—এই অসাড় মড়াগুলোর ভেতর তা মায়ামন্ত্রের মত কাজ করবে।

হে তরুণ ভারত! তোমার প্রাণ হ'ক সুন্দর, তোমার মন হ'ক সুন্দর, তোমার দেহ হ'ক সুন্দর। হে নিয়মের অতীত—হে ছন্দের বন্ধহীন—আমাদের দৈন্যের শৃঙ্খল তোমার ঝঞ্ঝায় ছিন্ন হ'ক। পুরাতন পরিত্যক্ত মাটীটা যখন ধু ধু করে জ্বলে উঠবে, সেই অনল শিখা থেকেই তুমি প্রকাশ হয়ো—অনলের মত দীপ্তিমান, বজ্রের মত প্রচণ্ড—শ্মশানের অট্টহাস্যে জাগ্রত হয়ো—হে সিন্ধুর মত উন্মাদ—প্রলয়ঙ্কর।

মুরলী

[শ্রীমুণীন্দ্র নাথ ঘোষ]

কাহার সৌভাগ্য এত ? শ্যাম সুধাধর
অবিরত পরশিছে তোরে রসপূর,
রাধাআলিঙ্গনরস পরশ মধুর
কোমল কমল কর আশ্রয় সুন্দর !
সঞ্চারিনী রাগিণীর উন্মাদন সুরে ;

রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি সন্ধানে স্ফুরে রাধা নাম,
প্রেমে মগ্ন বৃন্দাবন মূরছিত কাম,
ব্রজবধূ উন্মাদিনী ভেটিতে বঁধুয়ে।
উজান যমুনা বহে—উদার প্রবাহ
রাধা নামে গলি' গলি' বিশ্ব ধারা ধারা।
নাহি বৃন্দাবনে কাম কামনার দাহ
পঙ্ক প্রেম রসাবেশে সবে আত্মহারা।
নাম সহ বিতরিয়া শ্রীঅধর শীধু
প্রেম বিগলিত নিজে বৃন্দাবন বিধু।

নান্নুয়া

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

[১]

নান্নুয়াকে গৃহে লইয়া আসা পর্য্যন্ত কিষণ একদিনও সুখী হইতে পারে নাই। দিনরাত অভাব অভিযোগ, ঝগড়া বিবাদ তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই ছিল। আজ এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে ইহার মধ্যে একদিনও সে নান্নুয়ার কাছে একটা ভাল কথা পায় নাই।

কিষণ কাজ করিত স্থানীয় ওয়ার্কসপে। ভোর ছয়টায় সে কাজে চলিয়া যাইত, দুপুরে বাড়ী আসিয়া কোনওমতে স্নানাহার সারিয়া বারটার সময় কর্ম্মস্থলে যাইত, আবার বৈকাল চারটা বাজিলে, সারাদিনেই মজুরি লইয়া বাড়ী ফিরিত।

গৃহে তাহার একটুও শান্তি ছিল না। দুপুরে যে বাড়ী আসিত, কোনও দিন হয় তো আহারও ললাটে জুটিত না।

বড় সুখের আশাতেই সে রূপসী নান্নুয়াকে বিবাহ করিয়াছিল। ইহাতে তাহার দোষ কিছুই ছিলনা। জগতে রূপমুগ্ধ নয় কে? সুন্দর কিছু দেখিলেই তাহা লইতে ইচ্ছা হয়। যদি তাহা আয়ত্বে আনিবার মত হয়, তবে তাহা নিজের করিয়া লইতে মানুষের বিলম্ব হয় না। এই মুগ্ধতাই কিষণের শান্তি গ্রাস করিয়াছিল।

নান্নুয়ার পিতা থাকিত আর একটা বস্তিতে। সেখানে কার্য্যোদ্দেশে যাতায়াত করিতে করিতে সে নান্নুয়াকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। নান্নুয়া তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী, সৌন্দর্য্য তাহার দেহে আর ধরিতেছে না। বন্ধু আসামীয়ার গৃহে এমন সৌন্দর্য্য কচিৎ কখনো দেখা যায়।

কিষণ যখন নান্নুয়াকে তাহার ভালবাসা জানাইয়া বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল তখন নান্নুয়া তাহার ললাট কুঞ্চিত করিয়া কেবল বলিয়াছিল—ধেৎ—

কিষণ তাহাতে দমিল না, সে নান্নুয়ার

পিতার নিকট প্রস্তাব করিল। সে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটী সর্ত্তে কিষণকে রাজী করাইয়া তবে নান্নুয়ার সহিত বিবাহ দিল।

কিন্তু বিবাহের পরেই নান্নুয়ার স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল। সংসারে কিষণ যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিত তাহাতে দুই-জনের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইত না। নান্নুয়ার মনে আশা ছিল তাহার বাল্যসখী বন্নু বিবাহ করিয়া যেমন বাবুয়ানীদের মত দিন কাটায়, সেও তেমনি কাটাইবে, কিষেন আশাও দিয়াছিল তাহাই. কিন্তু বিবাহের পরেই নান্নুয়ার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে বুঝিয়া লইল কিষেনই যত অনিষ্টের মূল, তাই সে কিষেনের উপরেই ঝাল ঝাড়িতে লাগিল।

কিষেন নীরবে স্ত্রী দত্ত আঘাত সহিতে লাগিল, তাহার ও কথা কহিবার যো ছিল না। স্ত্রীর মনের এত আশা সে যদি বিবাহের আগে জানিত, তবে কখনই বিবাহ করিতে যাইত না। বিবাহ যে অশান্তি সে আগে তাহা ধারণা করিতে পারে নাই। বিবাহের আগে নান্নুয়ার মুখে চোখে সে যে ভাব দেখিয়াছিল তাহাতে জানিয়াছিল নান্নুয়া তাহাকে ভালবাসে, নান্নুয়া তাহার গৃহে আসিয়া সুখী হইবে, কিন্তু বিবাহের পর দুদিন না যাইতেই তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

নান্নুয়ার অত্যাচার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিলেও কিষেন নীরবে সবই সহ্য করিয়া যাইত। দোষী যে সেই-ই, কেন সে এই পার্ব্বত্য হরিণীটিকে ধরিয়া আনিয়া পুষিল? সে এক একদিন খাইতে পাইত না, নীরবে তাহাও সহিয়া যাইত, নান্নুয়াকে একটা কথাও বলিত না।

সর্দ্দারের পত্নী মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া নান্নুয়ার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে ইন্ধনযোগ করিয়া যাইত। সর্দ্দার দিন দুইটাকা মজুরি পায় তাহার স্ত্রীর কত না গহনা কত না ভাল কাপড় কুর্ত্তা। তাহাদের বাড়ীটাও কেমন সুন্দর। আর দুর্ভাগিনী নান্নুয়ার কিছু নাই; বাসের ঘরখানা তাহাও খড়ের, বর্ষায় ঝর ঝর করিয়া চাল ভেদ করিয়া জল পড়ে, ফাল্গুন চৈত্রের দুপুরের বাতাসে চাল এদিক ওদিক দোলে, মনে হয়, এখনি পড়িয়া যাইবে।

ইহার চেয়ে পিতার কাছে সেই কুটীর খানাতে সে ছিল বেশ। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে স্বাধীনভাবে বেড়াইবার অধিকার তাহার ছিল, বুকেও আশা ছিল। সে স্বাধীনতা ও গিয়াছে।

যখন সব কথা গুলা ভাবিত তখন তাহার মাথার মধ্যে আগুণ জ্বলিত। সে সেদিন উঠিত না, কাজও করিত না, কিষেনকেও খাইতে দিত না, নিজেও খাইত না। লোকের সামনে সে মোটেই বাহির হইত না। সর্দ্দারণী বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া অবশেষটায় খুব রাগ করিয়াই চলিয়া যাইত। নান্নুয়া এমন ভাবে লুকাইয়া থাকিত যেন সে একেবারেই নাই।

[২]

সে দিন নিতান্ত অসময়েই কিষেণ ফিরিয়া আসিল। নান্নুয়া তখন চুলায় কাঠ দিয়া সমীপবর্ত্তী কলে স্নান করিতে গিয়াছিল। কিষেন গৃহের দরজা খুলিয়া তক্তার উপর শুইয়া পড়িল।

স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া নান্নুয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল! "কিরে কিষনা এখনি ঘুরলি যে; কাম কাজ কিছু করলিনে আজ?"

কিষেণ গম্ভীর হইয়া শুইয়াই রহিল, নান্নুর

কথার উত্তর দিল না। নান্নুয়া তাহার পানে আর একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া বলিল "কথা বললে উত্তর দিচ্ছিসনে কেনরে কিষেন ?"

কিষেণ উত্তর করিল "আমি কাজ আর করব না কামে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।"

বিস্মিতা নান্নুয়া বলিল "ইস্তফা দিয়ে এসেছিস ? দিন দশ আনা বার আনা কামাতিস এখন ঘরে বসে খাবি কি, আমাকে খাওয়াবি কি ? তোর হল কি কিষেণ এমন বাউরা পানা কাম করছিস কেন ?"

কিষেন বলিল "আমি বাউরা হইনি নান্নু, আমার একটা পেট, যেখানে সেখানে চলে যাবে।"

নান্নুয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া কিষেন বলিল "তোর ভাবনা কি নান্নু, আম তোকে ছেড়ে দিচ্ছি তুই চলে যা। আমার সঙ্গে সাদি হয়ে পর্য্যন্ত তুই খুসি থাকতে পারিস নি, দিনরাত কেবল ঝগড়া করেছিস, কেঁদেছিস, তবু একটা ভাল কাপড় কুর্ত্তা কিছু পাস্‌নি। আমি আগে বুঝতে পারিনি নান্নু, তাই তোকে সাদি করেছিলুম। আমার ভারি চুক হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি। তোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি নান্নু, তুই আর কাউকে সাদি করে সুখে ঘর করগে, আমি তোর পরে কোন ও দাবী দাওয়া রাখব না

নান্নু চুপ করিয়া খানিক কিষেনের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহার পর ধীরে ধীরে একখানা মেঘ যেমন নীলাকাশের বুকে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়, তেমনই চলিয়া গেল।

নিশ্চয়ই নান্নুয়া খুব খুসী হইয়াছে। সে তো ইহাই চাহিয়াছিল, কিষেনই না তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহা মুখ এতদিন বলিলেই না ভাল হইত, তাহা হইলে কিষেন কবে তাহাকে ছাড়িয়া দিত আজই সকালে কর্ম্মস্থলে যাইয়া সে ইহা শুনিল। তাহার সহকর্ম্মী আল্লার কাছে কবে নান্নুয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল কে জানে কথাটা বজ্রাঘাতের মতই কিষেণের বুকে বাজিয়াছিল; তাহার মনে হইল তাহার বুকটা যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। নান্নু তাহাকে ভালবাসে না তাহা সে জানে কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করার কথা তাহাকে না বলিয়া তুচ্ছ আল্লাকে বলিবার কি দরকার ছিল।

হাতে কয়েক আনা পয়সা ছিল। রাগের মাথায় কাজে জবাব দিয়া আসিবার সময় কিষেন পেট ভরিয়া মদ খাইয়া গৃহে ফিরিল। বিবাহ করিয়া অবধি নান্নুয়ার ভয়ে সে মদ খাইতে পারিত না, নান্নুয়া মদ খাওয়ার পক্ষপাতিনী ছিল না। আজ যদি প্রথমেহ সে না জানিত কিষেন কর্ম্মে জবাব দিয়া আসিয়াছে তাহা হইলে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিত।

নান্নুয়া চলিয়া গেলে কিষেণ দুই হাত মুখে চাপা দিয়া তাহার অলৌকিক চরিত্রের কথা ভাবিতে লাগিল। আজ নান্নুয়াকেও সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীত্ব হইতে মুক্তি দিয়া সে কোন মতেই চোখের জল রাখিতে পারিল না। আজ বড় আনন্দের দিন, আজ সে সব বন্ধন হইতেই মুক্তি লাভ করিল। আর ভোরের আগে কাজের ভাবনায় ঘুম ভাঙ্গিবে না, পথে অনর্থক ছুটাছুটি করিয়া ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া কাজ করিতে যাইবে না। বাড়ীতে ফিরিয়া স্ত্রীর গম্ভীর মুখখানা, তাহাতে কথাই নাই, সে মুখ দেখিতে হইবে না, আজ সে একেবারেই মুক্ত কিন্তু একি, মুক্তির কথা ভাবিতে চোখ জলে ভরিয়া উঠে কেন, বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যায়!

দুপুরে নান্নুয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল "ভাত খাবিনে কিষেণ ?"

এমন সুরে সে বহুকাল ডাকে নাই। বিবাহের কয়েকদিন পরেই এ সুর বদলাইয়া গিয়াছিল। কিষেণ আজ বহুদিন পরে সেই কণ্ঠে তেমনি সুর শুনিয়া একবার চোখ তুলিয়া তখনি আবার নামাইয়া লইল।

আজ তাহার মাথায় বাঁধা সাদা রুমাল খানা গলায় ঝুলিতে ছিল। মাথার কালো কোঁকড়া চুলগুলা এলোমেলো ভাবে অনিন্দ্য মুখখানার চারিদিকে দুলিতেছিল।

নান্নুয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল "ওঠ কিষেণ, ভাত বেড়ে এনেছি, খাবি চল।"

কিষেণ মাথা তুলিতেই তাহার মুখ হইতে তীব্র মদের গন্ধ ছুটিল, নান্নুয়া তীব্রকণ্ঠে কি বলতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল,—না আর কথা বলিবার অধিকার তাহার নাই, সে স্ত্রীর অধিকার হারাইয়াছে।

স্খলিত পদে কিষেণ দাওয়ার পিঁড়ির উপর আহারে বসিল। আজ কত ব্যঞ্জন সে যাহা যাহা ভালবাসিত, নান্নুয়া সব গুলিই বাঁধিয়াছে। কিষেণ জড়িত কণ্ঠে বলিল "এত বাঁধলি কেনরে নান্নু ?"

নান্নুয়া বলিল "আজ আমি চলে যাব, তাই তোকে জন্মের মত খাইয়ে যাচ্ছি কিষেণ। এর পরে কাল থেকে আমরা পরহ হয়ে যাব, আজ যতক্ষণ আছি তোকে একটু যত্ন করে নিচ্ছি। নইলে এর পর ভাববি, আমি এমন হারামি করেছি তোকে একটা দিন যত্ন করিনি।"

সে একটু হাসিল সে হাসি বুক-ফাটা রোদনেরই রূপান্তর মাত্র তাহা কিষেণ জানতে পারে নাই।

খুব জোর করিয়া কিষেণকে খাওয়াইয়া সে ছাড়িয়া দিল, তাহার পর সে চলিয়া গেলে নিজে তাহার ভুক্তাবশেষ খাইল. শেষে উঠিয়া গিয়া বলিল "আমি যাচ্ছিরে কিষেণ।"

কিষেণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, চমকাইয়া বলিল "এখুনি যাবিযে ?

নান্নুয়া বলিল "যাবনা তো এখানে থাকব নাকি ? তুইতো আমায় ছেড়েই দিয়েছিস, আর তো তোর কোনও অধিকার নেই। আমি এখনই চলে যেতে চাই, আর তোকে জড়াতে চাইনে।"

কিষেণ একটু নীরব থাকিয়া শুধু বলিল "হুঁ"।

তাহার পর বলিল "কোথা যাবি ?"

নান্নুয়া ভঙ্গী করিয়া বলিল "যেখানেই যাই না তাতে তোর কি ?"

কিষেণ বলিল "সাদি করবি কাকে সেটা বলবি নে ?"

নান্নুয়া বলিল "সে খবর জেনেই বা কি লাভ হবে তোর ?"

কিষেণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "লাভ কিছু নেই, তোর কাপড় জামা নিয়ে যা, ও গুলো রেখে যাচ্ছিস কেন ?"

নান্নুয়া বলিল "ও গুলো ময়না এসে নেবে, তার জন্যে রেখে যাচ্ছি।"

তাহার পর আর একটাও কথা না বলিয়া সে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। হতভাগ্য কিষেন দুই হাতের মধ্যে মুখ বাখিয়া পড়িয়া রহিল।

[৩]

নান্নুয়া গিয়া বড় সাহেবের ঘরে আয়াপদ প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইল। এই রূপসী তরুণীর এমন একটা শক্তি ছিল যাহাতে রোম্যান সাহেব বিনা প্রশ্নেই তাহাকে মিসেস রোম্যা-নের আয়াপদে নিযুক্ত করিলেন।

এ স্থান ছাড়িয়া সে কিছুতেই যাইতে পারিবে না, এখানে কিষেণ আছে। চোখে তাহাকে দেখা চাই, তাহাকে বিধিমতে জ্বালানো চাই, তবে তাহার শান্তি, তৃপ্তি।

ময়নাকে সে বেশ চেনে। তাহার মনে কেন যে সন্দেহ লাগিয়াছিল তাহার স্বামী ময়নাকে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে দেখিতে পারে না তাহা বলা যায় না। রাক্ষসী ময়নাকে যদি সে হাতের কাছে পাইত, নিশ্চয়ই গলা টিপিয়া মারিত। ময়না একদিন কথায় কথায় গল্পও করিয়াছিল কিষেণ তাহাকেই বিবাহ করিত, মাঝখানে হঠাৎ নান্নুয়া আসিয়া পড়াতে বিবাহ হইতে পারে নাই, নচেৎ আজ কিষেণের গৃহলক্ষ্মীরূপে সেই বিরাজ করিত। এখনও কিষেণ পূর্ব্ব প্রেম বিস্মৃত হইতে পারে নাই, দিনে দুবার তিনবার ময়নার খোঁজ লয়।

হায় ভগবান, সেই কিষেণ এরূপ বিশ্বাস ঘাতক নিজের পরিণীতা স্ত্রীকে সে ভাল খাইতে পরিতে দিতে পারে না, ময়নাকে ভাল খাইতে পরিতে দেয়। তাই তো তাহার হাতে কখনও একটা পয়সা থাকে না।

রাগ অনেক কারণই হইয়াছিল, ইহার শাস্তি দিবার পথও সে আবিষ্কার করিয়াছিল।

নান্নুয়া বড়সাহেবের মেমের কাছে বেশ সুখে সচ্ছন্দেই রহিল। সেইখানে থাকিতে সাহেবের প্রধান চাপরাশী তারকের সহিত তার খুব আলাপ হইয়া গেল।

তারক লোকটা মন্দ ছিলনা, মাহিনা বেশ মোটা রকমেরই পাইত, তাহা ছাড়া সাহেবের কাছে মাঝে মাঝে টাকাটা সিকেটাও পাইত। এতদিন সে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিবাহ করিতে পারে নাই, পয়সার জন্য ও বটে পাত্রীর অভাবেও বটে। এই সুন্দরী পাত্রীটিকে সে এক কথাতেই পছন্দ করিয়া ফেলিল এবং প্রস্তাব ও করিল।

চকিতে কিষেণের সেই কথাটা নান্নুয়ার মনে পড়িয়া গেল—সাদি করবি কাকেরে নান্নু।

সেই দিনই মেমসাহেবের শিশু কন্যাটীকে লইয়া বেড়াইয়া আসিতে পথে দেখা হইল, কিষেনের সঙ্গে।

মদ খাইয়া মাতাল হইয়া সে ফিরিতেছে তিন চা'র মাস আগে নান্নুয়া তাহার যে চেহারা দেখিয়া গিয়াছিল আজ আর সে চেহারা ছিল না। তাহার গণ্ডাস্থি এবং নাকটা অস্বাভাবিক রকম উঁচু হইয়া গিয়াছে, ললাটে অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে, সে বড় শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার গায়ের রং বড় কালো, এ যেন সে কিষেণই নয়।

এক মুহূর্ত্তে নান্নুয়ার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল হতভাগা বদমাইস, ময়নার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজের যা কিছু সবই বিসর্জ্জন দিল। সকাল হইতে তাহার মনটা যে করুণ হইয়াছিল, কিষেণের এই মাতাল অবস্থা দেখিয়া তাহা দৃঢ় হইয়া গেল

কিষেণ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহে নাই, আপন মনে অসংযত পা ফেলিয়া অসংযত কণ্ঠে গাহিয়া যাইতেছিল—"কোন লালিয়া নজর লাগায়া টড়ক টড়ক চিয়া যাউ—"

'এই, এই কিষেণ—'

কিষেণ ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার নেশা প্রায় ছুটিয়া আসিল, 'কে, নান্নু?'

নান্নুয়া অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিল 'জিজ্ঞাসা করলি নে আমি কোথায় আছি?'

কিষেণ তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল 'সে আর কি জিজ্ঞাসা করব, দেখতেই পাচ্ছি।'

নাম্রুয়া তেমনি উদাস ভাবে বলিল 'আমার সাদি হবে সাহেবের বড় খানসামার সঙ্গে, তুই তখন খবরটা জান্তে চেয়েছিলি, ঠিক ছিল না বলে দিতে পারিনি, এখন সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে; অনেক দিন তোর ঘর করেছি তাই খবরটা দিলুম।'

বিদ্রূপের সুরে কিষেণ বলিল 'তোর খুব মেহেরবাণী। যা, এবার নতুন খসমের ঘরে গিয়ে খুব সুখে থাক্‌বি।'

সে চলিয়া যাইতেছিল, নাম্রুয়া আবার ডাকিল 'একটা কথা শোন।'

ফিরিয়া কিষেণ বলিল 'কি বল্‌বি?'

একটু থামিয়া নাম্রুয়া বলিল 'তুই এত মদ খাচ্ছিস্ কেন? ওতে কি বাঁচবি, দুদিনেই যে মরে যাবি। দেখ দেখি, কি চেহারা হয়েছে তোর।'

'আমার খুসি—আমি মদ খাই।'

হো হো করিয়া হাসিয়া সে চলিয়া গেল। নাম্রুয়ার দুই চোখ হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল, এ দুর্ব্বলতা চাপিতে সে পারিল না।

কেন এমন করিবা মরিবার দরকারটা কি? এক নাম্রুয়া গিয়াছে তাহাতে কি হইয়াছে? নাম্রুয়া তো স্বেচ্ছায় যায় নাই, সেই তো নাম্রুয়াকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

নাম্রুয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাংলায় ফিরিয়া গেল।

[৪]

পরদিনই সে তাহার প্রতিবেশী জনিয়াকে পাকড়া করিল। কিষেণের সম্বন্ধে সে এতদিন অত্যন্ত রাগ করিয়াই উদাসিনীর ন্যায় ছিল, কালকার দৃশ্য দেখিয়া সে আর কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিল না।

জনিয়া যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া সে কোন মতেই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিল না।

কিষেন সত্যই অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে? সেই কিষেণ যে ধর্ম্ম পথ ব্যতীত চলিত না সে এখন অধর্ম্মের দাস। হয় তো একদিন কুলীর কাজ করে তিনদিন কেবল মদ খাইয়া বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কোথায় মনিয়া, কোথায় কি? বন্ধু বান্ধব কেহ যদি তাহার হুঁস করাইয়া দিতে চায় সে হাসিয়া বলে তাহার এই ভাল সে ভাল হইতে আর পারিবে না। সে এখন কি বাঁচিতে চায়, সে মরিবে বলিয়াই না এত মদ খায়।

সে দিন নাম্রুয়া আর উঠিল না, অসুখ করিয়াছে বলিয়া মেমসাহেবের কাছেও গেল না। তারক দিন স্থির করিয়া তাহাকে জানাইতে আসিবামাত্র সে সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহাকে তাড়াইতে গেল, তারক প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইল।

এই ভাবেই কয়েক দিন কাটিয়া গেল, তাহার পর জনিয়া একদিন তাহাকে খবর দিয়া গেল কিষেণ এবার সত্যই মরিয়া যাইবে, তাহার বড় বেমার আছে।

মরিয়া যাইবে—সে মরিয়া যাইবে, আর বাঁচিয়া থাকিবে রাক্ষসী নাম্রুয়া? না, ভগবান! তাহা কখনই হইতে পারে না। নাম্রুয়া জীবনে মরণে তাহারই, জীবনে ছিল, মরণেও থাকিবে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা। আকাশে চতুর্থীর চাঁদখানা উঠিয়াছে মাত্র, কিন্তু আলো তাহার তেমন স্পষ্ট রূপে ফুটিতে পারে নাই। পাতলা কুয়াশার মত মেঘ আকাশের গায়, মাঘ মাসের শেষ হইলেও কুয়াশায় চারি দিক ধূমময়। দূরে দূরে পাহাড়গুলো দৈত্যের মতই

কাল মাথা আকাশে তুলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে।

মেমসাহেবের কাছে গিয়া সে কাঁদিয়া পড়িল—তাহার স্বামীর বড় ব্যারাম, আজ রাত্রের মত সে ছুটি চায়।

মেমসাহেব ছুটি মঞ্জুর করিলেন।

সেই পাতলা কুয়াশা ভেদ করিয়া যে মলিন চাঁদের আলো আসিয়া ধরার বুকে পড়িয়াছিল, তাহারি সাহায্যে পথ চিনিয়া নান্নুয়া বাজারে চলিল।

ওই তো তাহার সেই কুটিরখানি, একটি আলো টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে না?

সতর্কপদে নান্নুয়া আসিয়া বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইল, বেড়ার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিল হতভাগ্য তাহার স্বামী সেই তক্তার উপর সামান্য একটা সতরঞ্চের উপর পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে। গৃহিণীর নিপুন হস্তে গৃহের যেখানে যেটি সে সাজাইয়াছিল, আজও ঠিক সেখানেই সেটি রহিয়াছে। তাহার স্মৃতি কিষেণ একটিও নষ্ট করে নাই। এই একটা বৎসর চাকরী ছাড়িয়া কুলির কাজ করিয়া মদ খাইয়া, সময় সময় অর্থাভাবে অনাহারে থাকিয়া সে নিজেকে এত কষ্ট দিয়াছে তবু প্রিয়তমা নান্নুয়ার একটা জিনিষ সে সরায় নাই।

আঃ, কি গভীর ভালবাসা!—

নান্নুয়ার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"নান্নু, আঃ, নান্নুরে—"

আর্ত্তকণ্ঠে কি আহ্বান এ,

নান্নুয়া আর বাহিরে গোপন ভাবে থাকিতে পারিল না, গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "কিষেণ—"

"কে, নান্নু?"

কিষেণ যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া নান্নুয়া বলিল "হ্যাঁ রে নান্নু। রাক্ষুসী রে কিষেণ, আমি মানুষ নই।"

কিষেণ শান্তিপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বড় ভাল কালে এসেছিস্ নান্নু, তোর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। মনে বড় আপশোষ জাগছিল তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোর খসম কই রে নান্নু, সে এসেছে?"

ললাটে করাঘাত করিয়া নান্নুয়া বলিল "তোকে সত্যি কথা বলিনি কিষেণ, তুই ভিন্ন নান্নুর খসম আর কে আছে রে? আমার ওপর রাগ করে তুই যাচ্ছিস কিষেণ? আমি তোকে কেবল জ্বালিয়েছি, আমায় মাপ কর।"

কিষেণ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মুখ একবার প্রদীপ্ত হইয়া তখনই অন্ধকার হইয়া গেল "আঃ, দুদিন আগে কেন বল্‌লিনিরে নান্নু, তা হ'লে আমি তো মরতুম না। এখন যে মরতে বসেছি, ডাক্তারবাবু জবাব দিয়ে গ্যাছে। তোকে দেখবার জন্যেই বেঁচে আছি, নইলে—"

"না তুই মরতে পাবিনে, মরতে পাবিনে, আমি তোকে আমার পরাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব, তুই যাবি কোথা, কে তোকে নিয়ে যাবে?"

সে দুই হাতে কিষেণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পিয়াসী

[শ্রীশ্যামাপদ সরকার]

কোথা জল্, কোথা জল্ ধূ ধূ করে প্রান্তর—
পুড়ে থাক্ তৃণদল জ্বলে মরু অন্তর।
ওকে আসে মুসাফের উনমাদ্ আসোয়ার,
ছুটে ঘোড়া আর্বীর, ঝলকিয়া তলোয়ার।
পিপাসা হুতাসীর, হু হু বালু ঘূর্ণী,
বুক ফাটে সেলিমের পঞ্জর চূর্ণী ;
ঐ বুঝি দেখা যায় ওই দূরে নির্ঝর—
মরুময় প্রান্তরে দেবতার কৃপাকর।
বুকে জল-পিয়ালা তরুঢাকা পল্লী,
ঢলে রবি আস্মানে তাজা তরুবল্লী,
আয় আয় ছুটে আয় ওগো দূরপিয়াসী !
মরু মাঝে আছে তব তিয়াসার সরসী।
রঞ্জিয়া আস্মান গৈরিক স্বর্ণে,
ডুবে রবি লালে লাল পুঞ্জিত পর্ণে—
দলে দলে তরুণীরা চম্পক বর্ণা,
কাঁকে লয়ে ভরা ঘট উচ্ছলা ঝর্ণা।
ঐ আসে সাহাজাদা, —দরদী লো ললনা ?
পিপাসার পিয়ালার পানিটুকু ঢালনা।
কুণ্ঠিত চরণে ওকে আসে বালিকা,
গলে তার দুল্ দুল্ গুল্ফুল্ মালিকা—
ভরা ঘট লয়ে হাতে তনু ভরা লজ্জা,
ধীরে আসে বালিকা সে বনবালা সজ্জা,
উজ্জ্বল কজ্জল চল ঢল আঁখিয়া,
আলুলিত কুন্তল শ্রাবনের আঁধিয়া,
অঙ্গুলি রঞ্জিত মেহেদীর বর্ণে
শিরীষের মঞ্জুরী দুল্ দুল্ কর্ণে।

ওগো লাজ বঁধুয়া মুখে জল ঢাল না,
ওগো দূরপিয়াসী অঞ্জলী পাত না,
ওকি ওকি মুসাফের পিপাসা কি ভুলিলে ?
সরমে চকিত বালা কেন আঁখি তুলিলে ?
অঞ্জলি ভরি জল্ তব জল-সত্রে
ডাগর জাগর আঁখি অপলক পত্রে,
বহু দূরে বহু দূরে ফাগুয়ার প্রভাতে
দেখা কিগো হয়েছিল অরুণের আভাতে ?
সেই তব ছিল সাথী ওগো নব যাত্রী ?
কোথায় রঙীন হ'ল মিলনের রাত্রি ?
সরমের বাধা তব টুটিল কি দুলালী ?
জলভরা আঁখি কেন তার পানে চাহিলি—
কত কথা কয়ে গেল চকিতের চাহনি ;
উচ্ছলা ঝরণা নেচে চলে নটিনী।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

নবম পরিচ্ছেদ

ম্যান্‌হিম্ হইতে সংবাদ।

জ্যানেটের কৌতূহল পূর্ণভাবে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। পত্রোল্লিখিত নারীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে জুলিয়ান গ্রেসের দিকে চাহিল—আবার গ্রেসের সহিত সেই নারীর বিষয় ব্যাখ্যার কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করাতে জুলিয়ান বলিল গ্রেস্ ঘরে থাকিতে সে-কথা বলা অসম্ভব! এ সকলের অর্থ কি? তিনি জুলিয়ানকে বলিলেন—

"আমি রহস্য ও হেঁয়ালির ব্যাপারকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। গোপনে কোন কথার আলোচনা করা আমি অভদ্রতা মনে করি। কিন্তু যদি গোপনে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একান্তই আবশ্যকতা থাকে তবে তুমি আমার সঙ্গে লাইব্রেরীর ঘরে চল।"

জুলিয়ান মাসিমার পশ্চাতে গমন করিল। হঠাৎ তাহাকে সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে—সে তাহা মনে ভাবে নাই। এই জন্য সে একটু গোলযোগে পড়িল। জ্যানেট একখানি চেয়ারে বসিয়া

জুলিয়ানের উত্তর শুনিতে যাইতেছেন—এমন সময় একটি বাধা উপস্থিত হইল। একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁহার জন্য দ্বারে অশ্বযানে অপেক্ষা করিতেছেন।

সে দিন জ্যানেটের একটি সভায় যাইবার কথা ছিল। তদনুসারে বৃদ্ধা তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছেন। জ্যানেট উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"তুমি তাঁকে আমাদের বৈঠকখানায় বস্‌তে বল। তাঁকে বল—যে আমার হঠাৎ একটা বড় দরকারী কাজ এসে পড়েছে—আমি যেতে পারব না, কিন্তু গ্রেস্ এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।" তাহার পর জুলিয়ানকে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"যদি গ্রেস্ শুধু ঘর ছেড়ে নয়—পরন্তু এই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায়, তাহ'লে বোধ হয় তোমার রহস্য উদ্ঘাটনের আরো সুবিধা হবে?"

জুলিয়ান গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"গ্রেস্ বাড়ী হ'তে চলে গেলে আরো সুবিধা হয় বটে।"

জ্যানেট মার্সির নিকট যাইয়া বলিলেন—"গ্রেস, আজ তোমার শরীর ভাল মনে হচ্ছে না—যদি কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় বাইরে বেড়িয়ে এস তা' হ'লে তোমার শরীর ভাল হ'তে পারে। আমার এক বন্ধু আমাকে একটা সভাতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। আমি তাঁকে ব'লে পাঠিয়েছি—আমি এখন যেতে পারব না। তুমি যদি আমার হ'য়ে তাঁর সঙ্গে যাও, তা' হ'লে আমি বড় সুখী হব।"

মার্সি ভীত হইল। সে বলিল—'সভায় গিয়ে আমি কি করব? আমি তো কোন মতামত দিতে পারব না।'

"আমি যদি পারি, তা' হ'লে তুমি কেন পারবে না তা' তো আমি বুঝতে পারি না। আমার নিয়ম হচ্ছে—যে পক্ষে দল পুরু আমি সেই পক্ষেই মত দিই। তুমিও আমার নীতি অনুসরণ ক'রবে। গণ্ডায় আণ্ডা মিশানই হচ্ছে সভাসমিতির চতুর সভ্যদের কাজ।—তুমি বেশ পারবে। আর দেরি ক'রো না—আমার বন্ধুর গাড়ীতে উঠে চ'লে যাও।"

হোরেস্ তাড়াতাড়ি মার্সির জন্য দরজা খুলিয়া দিল। সে চুপ চুপি বলিল—"সভায় তোমার কত বিলম্ব হবে? আমার বড় কথা তোমাকে বল্‌বার ছিল। কোথা হ'তে এই আপদ জুটলো!"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।"

"ফিরে এসে এইখানে আমাকে খুঁজো—আমি এইখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

মার্সি চলিয়া গেল।

জ্যানেট বলিলেন—"তবে জুলিয়ান, আরম্ভ কর। এখন আর তো কোন বাধা নেই—তবে এখনও ইতস্ততঃ করছ যে? হোরেস্‌কেও যেতে বল্‌ব নাকি?"

"হোরেস্ থাকায় তো আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি ভাবছি—আপনি ঐ মনোহারিণী বালিকাটিকে অতিশয় অসুবিধার মধ্যে ফেল্‌লেন—তাকে জোর ক'রে সভায় পাঠালেন।"

হোরেসের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে জুলিয়ানকে বলিল—"ঐ মনোহারিণী বালিকা ব'লছ কা'কে? গ্রেস্‌কে বুঝি?"

"হাঁ; কেন তা' বলায় দোষ কি?"

জ্যানেট বলিলেন—"শোন, জুলিয়ান; আমি শুধু পালিত কন্যা ব'লে তোমার কাছে গ্রেসের পরিচয় দিয়েছি—"

হোরেস্ কথায় বাধা দিয়া রাগতঃ ভাবে বলিয়া উঠিল—"আর আমার এই মুহূর্ত্তেই জানিয়ে দেওয়া উচিত যে গ্রেস আমার ভাবী পত্নী।"

জুলিয়ান এ কথায় অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইল। সে যেন বিষাদে ও বিস্ময়ে বলিল—"তোমার পত্নী?"

"হাঁ—আমার পত্নী। এক পক্ষের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হবে। তুমি কি এ বিবাহে অসম্মত জানাচ্ছ নাকি?"

জ্যানেট বলিলেন—"কী পাগলের মত কথা বল্‌ছ হোরেস? জুলিয়ান তোমার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ কর্‌ছে।"

জুলিয়ান অন্যমনস্কভাবে এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই তোমার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ কর্‌ছি।"

জ্যানেট বলিলেন—"আচ্ছা, এখন এ সব কথা চুকে গেল। এইবার জুলিয়ান তোমার পত্রে উল্লিখিত সেই নারীর কথা বল। এইবার রহস্যের উপর হ'তে পর্দ্দা উঠাও—সেই রহস্যাচ্ছন্ন নারীর মুখখানি দেখতে দাও। তিনি আমাদের জুলিয়ানের ভাবী পত্নী নন তো?"

জুলিয়ান বলিল—"তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

"অপরিচিত? তুমি না চিঠিতে লিখেছিলে—তার জন্য তোমার যথেষ্ট মাথা ব্যথা আছে? তুমি তার উপকার ক'রবে ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ?"

"হাঁ, তাঁর ব্যাপারে আমার সম্পর্ক তো আছেই—কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হ'বেন—সেই নারীর ব্যাপারে আপনার সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ।

জ্যানেট কতকটা অধীর ভাবে টেবিলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিলেন—"জুলিয়ান, আমি পূর্ব্বেইতো তোমাকে জানিয়েছি যে আমি হেঁয়ালি কি রহস্য ভালবাসি না। তুমি এই সব হেঁয়ালির ভাষা ছেড়ে সোজা কথায় আমাকে সেই স্ত্রীলোকের ব্যাপার বল'বে কি না বল।"

হোরেস উঠিয়া বলিল—'তা হ'লে আমিই দেখছি এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি চল্‌লাম!"

জুলিয়ান হোরেসকে বাসতে অনুরোধ করিয়া বলিল—"কেন, আমি তো পূর্ব্বেই মাসিমাকে বল্‌লাম তোমার এখানে থাকাতে আমার কোন আপত্তি নেই; শুধু আপত্তি নেই তাই নয়—এখন আমি তোমাকে জানাচ্ছি—যখন গ্রেসের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা স্থির হ'য়েছে—তখন এই কাহিনীর সঙ্গে তোমারও খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

হোরেস্ বিস্মিত হইয়া উপবেশন করিল। তখন জুলিয়ান জ্যানেটকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনাকে আমার একজন পুরাতন বন্ধুর কথা আমি অনেকবার ব'লেছি। সেই বন্ধুটী জার্ম্মানিতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; আপনার সে কথা মনে আছে কি?"

"হাঁ; তুমি ম্যানহিমে ইংরাজ দূতের কথা ব'লছ তো!"

"হাঁ, তাঁরই কথা বলছি। আমি যখন পল্লী হ'তে ফিরে লণ্ডনে পৌছুলাম, তখন অন্যান্য পত্রের সঙ্গে তাঁরও একখানি পত্র পেলাম। আমি সেখানি সঙ্গে ক'রে এনেছি। আমি সেই পত্র হ'তে কিছু কিছু অংশ প'ড়ে শোনাতে চাই। তাতে এক অতি বিস্ময়জনক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আমি নিজের কথায় সে কাহিনী তেমন ভাল ক'রে বলতে

পারব না। তাই আমি চিঠি প'ড়ে শোনাতে চাই।"

জ্যানেট দেখিলেন—জুলিয়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা এক সুদীর্ঘ পত্র বাহির করিল। তিনি বিরক্তির ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনতে অনেকক্ষণ লাগবে নাকি? চিঠির বহর যে বেজায় লম্বা দেখছি।"

হোরেস বলিল—"তুমি ঠিক জান যে এই চিঠির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে? ম্যানহিমের ইংরাজদূতের সঙ্গে আমার কোন কালে কোন পরিচয় নেই।"

"আমি এ বিষয়ে নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি যে যদি মনোযোগের সহিত তুমি এই কাহিনী শোন তা হ'লে দেখবে যে তোমার বা মাসিমার এতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না।" এই কথা বলিয়া জুলিয়ান দূতের পত্রখানি হইতে নিম্নোদ্ধৃত প্রথম অংশ পাঠ করিল—

"তারিখের কথা আমি ভাল মনে রাখতে পারি না। বোধ হয় তিন মাস পূর্ব্বে আমার কাছে সংবাদ এল—এখানকার হাঁসপাতালে একটী ইংরাজ রোগী এসেছে। আমি ইংরাজ দূত—সুতরাং সেই ইংরাজ রোগীর সম্বন্ধে যদি কোন খোঁজ খবর নেবার দরকার থাকে তাই আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

"আমি সেই দিনই হাঁসপাতালে গেলাম। আমাকে রোগীর শয্যাপার্শ্বে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

"রোগী একটী স্ত্রীলোক। যুবতী ও সুন্দরী। আমি যখন প্রথম দেখলাম তখন আমার মনে হ'ল সে মৃত। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম ক'রে মাথায় আঘাত লেগেছিল? হাঁসপাতালের লোকেরা বল্লে—'জার্ম্মান ও ফরাসীদের মধ্যে সম্প্রতি যে যুদ্ধ হ'য়ে গেল সেই যুদ্ধে স্ত্রীলোকটী উপস্থিত ছিল। কিজন্য বা কিরূপে যে সে সেই যুদ্ধস্থলে গিয়ে প'ড়েছিল তা কেউ জানে না। যা হো'ক, সেইখানে একটী জার্ম্মান গোলার টুকরায় সে আহত হ'য়ে পড়ে।'

হোরেস্ সহসা চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! এ সেই স্ত্রীলোক নাকি যাকে আমি ফরাসী কুটীরে মৃতরূপে শয্যায় শায়িত দেখেছিলাম।"

জুলিয়ান বলিল—"আমি তো সে কথা ব'লতে পারব না। চিঠির বাকী অংশ শোন তা হ'লে হয়তো তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।"

সে পড়িতে লাগিল—

"আহত স্ত্রীলোকটীকে সকলেই মৃত মনে করেছিল। জার্ম্মানরা যখন সেই স্থান অধিকার করলে তখন ফরাসীরা পলায়ন কালে তাকে সেইখানেই ফেলে রেখে যায়। সে এই অবস্থায় একটী কুটীরে এক বিছানার উপর প'ড়ে থাকে। এমন সময় জার্ম্মান আহত সৈন্যের প্রধান চিকিৎসক—

হোরেস বলিল—'ইগ্‌নেশিয়াস্ উইজেল?"

"হাঁ, ইগ্‌নেশিয়াস্ উইজেল্ তাকে সেই অবস্থায় দেখলেন।"

হোরেস বলিল—"তবে তো এ নিশ্চয় সেই স্ত্রীলোক!" তাহার পর জ্যানেটকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"সত্যিই এ কাহিনীর সঙ্গে আমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আপনার মনে আছে—আপনাকে ব'লেছিলাম কি অবস্থায় আমার গ্রেসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গ্রেস্‌ও বোধ হয় আপনাকে সে কথা সব ব'লেছে?"

জ্যানেট বলিলেন—"গ্রেস্ তার ইংল্যাণ্ডে আসবার পথে সেই ফরাসী কুটীরে যা ঘটেছিল

তার কথা বলতে মোটেই রাজি হয় না—সে কথা বলতে তার যেন খুব ভয় হয়। সে শুধু বলেছে—সীমান্ত প্রদেশে জার্ম্মানরা তার পথ রোধ করে—সেখানে ঘটনাক্রমে একটী ইংরাজ নারীর সঙ্গে তার মিলন হয়—সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই স্ত্রীলোক জার্ম্মান-দের একটী গোলার আঘাতে নিহত হয়। তারপর আর আমি সে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নি। জুলিয়ান, গ্রেস ঘরে থাকতে তুমি যে এ কাহিনী বল নি—সে ভালই করেছ। এখন আমি সব বুঝতে পারছি। গ্রেস সেই স্ত্রীলোকের কাছে তার নিজের নাম আর আমার নাম ক'রে-ছিল—মনে হচ্ছে। স্ত্রীলোকটী অভাবে পড়েছে—কিছু সাহায্য চায়। তাই আমার সাহায্য পাবার জন্য সে তোমাকে ধ'রেছে কেমন না? তা আমি তাকে অবশ্যই সাহায্য করব। কিন্তু সে যেন সহসা আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত না হয়। সে আবার বেঁচে উঠেছে—এ বিষয়ে গ্রেসকে আগে হ'তে সংবাদ দিয়ে প্রস্তুত ক'রে রাখতে হবে। এখন তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন দেখছি না।"

"আপনার কথায় আমি ঠিক সায় দিতে পারিচি না।"

"তার অর্থ কি? তুমি কি ব'লতে চাও এখনও এ রহস্যের শেষ হয় নি?"

"রহস্যের তো এখনও মোটে আরম্ভই হয় নি। আমি আমার বন্ধুর চিঠি পড়ি।" জুলিয়ান পুনরায় পড়িতে লাগিল—

"খুব যত্নের সহিত পরীক্ষা করে জার্ম্মান ডাক্তার দেখলেন—স্ত্রীলোকটী প্রকৃত পক্ষে মারা যায় নি। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগায় তার সাময়িক সংজ্ঞালোপ ঘটেছিল। ফরাসী ডাক্তার ভুলক্রমে সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থাকে মৃত্যু মনে ক'রেছিল। জার্ম্মান ডাক্তারের কৌতূহল জাগ্রৎ হল—তিনি অস্ত্র চিকিৎসা করলেন। সে চিকিৎসায় অদ্ভুত ফল হল—রমণীর সংজ্ঞা ফিরে এল—সে বাঁচল। কিছুদিন ডাক্তার তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন—তার পর তাকে ম্যান-হিমের হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আমি প্রথম হাঁসপাতালে গিয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখলাম। হাঁসপাতালের লোকেরা তার সম্বন্ধে কিছুই জানত না। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কোন কাগজপত্রও ছিল না। হাঁস-পাতালের ডাক্তার শুধু আমায় তার পরিচ্ছদ দেখালেন। সেই পরিচ্ছদে তার নাম লেখা ছিল—আমি সেই নাম লিখে নিয়ে হাঁসপাতাল হ'তে চ'লে এলাম। তার নাম হচ্ছে—"মার্সি মেরিক"।

জ্যানেট তাঁহার নিজের পকেট পুস্তক খুলিলেন। তিনি বলিলেন "আমিও নামটী লিখে নিই—এ নাম কখনও শুনি নি, ভুলে যেতে পারি। জুলিয়ান, তারপর পড়"।

জুলিয়ান পড়িল—

"আমি হাঁসপাতাল হ'তে আবার সংবাদ পাব সেই আশায় অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। স্ত্রীলোকটি কথা বল্‌তে পার্‌লে তারা যেন সংবাদ দেয়—এ অনুরোধ আমি ক'রে এসেছিলাম। কএক সপ্তাহ কেটে গেল—কোন সংবাদ পেলাম না। পুনরায় হাঁসপাতালে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম—যে স্ত্রীলোকটির খুব জ্বর, আর সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে ও প্রলাপ বক্‌ছে। প্রলাপের অবস্থায় তোমার মাসিমার নাম সে অনেক বার উচ্চারণ করেছিল। তা' ভিন্ন তার প্রলাপের আর কেউ কোন অর্থ বুঝতে পারে

নি। আমি তোমাকে এর পূর্ব্বেই লিখব ভেবেছিলাম—মনে করেছিলাম তোমার মাসিমাকে এই কথা বল্‌বার জন্য লিখব। কিন্তু ডাক্তারেরা বললেন—স্ত্রীলোকটি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে রয়েছে—কি ঘট্‌বে কিছুই বলা যায় না। তাই মনে ভাবলাম—দরকার না হ'লে অনর্থক তোমাকে বিরক্ত করব কেন?"

জ্যানেট বলিলেন—"তুমি অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু জুলিয়ান, এই কাহিনীর এ অংশের সঙ্গে আমার কি যে সম্বন্ধ আমি তা' বুঝে উঠতে পারছি না।"

হোরেস্ বলিল—"আমিও ঠিক এই কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম। অবশ্য এ বড় দুঃখের কাহিনী—কিন্তু আমাদের দু'জনের সঙ্গে এ কাহিনীর সম্বন্ধ কি?"

জুলিয়ান বলিল—"আমি শেষটুকু পড়ি, তার পর বুঝতে পারবে কিছু সম্বন্ধ আছে কিনা।"

জুলিয়ান পড়িল—

"শেষে সংবাদ এল—মার্সি মেরিকের সঙ্কট অবস্থা কেটে গেছে—আর তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা নেই। সে খুব দুর্ব্বল, কিন্তু এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। হাঁসপাতালে যেতেই সেখানকার লোকেরা আমাকে ব'ললে—আগে আমাকে প্রধান ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে। তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি রোগীর কাছে যেতে পাব না। ডাক্তার বল্লেন—"আপনি রোগীর সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলবেন। রোগী যদি আপনার সঙ্গে একটু উদ্‌ভ্রান্তের মত কথা বার্ত্তা বলে তা হ'লে আপনি বিস্ময় প্রকাশ ক'রবেন না, কারণ তা হ'লে রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠবে। তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এখানে মতভেদ আছে। আমি মনে করি যে রোগী শারীরিক সুস্থতা লাভ করেছে বটে কিন্তু তার মানসিক অবস্থা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। সে ঠিক পাগল না হ'তে পারে কিন্তু সে উন্মাদের প্রলাপগ্রস্ত। আমি আপনাকে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক ক'রে দিলাম—এই কথা মনে রেখে—নিজে গিয়ে রোগীর অবস্থা বুঝুন।" এ কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম—সে অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণ। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলেই মনে হল। আমি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম—'যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয় তবে আমি অত্যন্ত সুখী হব।' এই কথাগুলি বলবার সময় আমি তাকে "মার্সি মেরিক্" নামে সম্বোধন করেছিলাম—কারণ এই নামই আমি তার পোষাকে অঙ্কিত দেখেছিলাম। "মার্সি মেরিক্" নাম উচ্চারণ হতে না হতেই রোগীর চক্ষু প্রতিহিংসার বহ্নিতে যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সে সক্রোধে বলে উঠল—"ঐ ঘৃণিত নামে আমাকে সম্বোধন করবেন না। ওটা আমার নাম নয়। এখানে সকলেই আমাকে ঐ জঘন্য নামে জ্বালাতন করছে। ঐ নাম শুনে আমি রাগ প্রকাশ করলেই তারা আমাকে আমার পোষাক দেখিয়ে দেয়। আমি যতই প্রতিবাদ করি না কেন—তাদের বিশ্বাস এটা আমারই পোষাক। যদি যথার্থই আপনি আমার উপকার করতে চান, তা হ'লে আপনি অনুগ্রহ ক'রে এইটী বিশ্বাস ক'রবেন না।" প্রধান ডাক্তারের কথা স্মরণ করে আমি কৌশলে তার উত্তেজনা প্রশমিত করলাম। আর নাম সম্বন্ধে

কোন কথা না বলে আমি বললাম—"যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয় তবে আমাকে আদেশ করুন—আমি সে আদেশ পালন ক'রতে প্রস্তুত আছি। আপনি এখন কি করবেন স্থির ক'রেছেন?" রোগী সন্দিগ্ধ ভাবে বলল—"আমি কি স্থির ক'রেছি সে কথা আপনি জানতে চাচ্ছেন কেন?" আমি বললাম—"আমি এখানকার ইংরাজ কন্‌সাল্; আমার এখানে যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে, সুতরাং আমার দ্বারা আপনার অনেক সাহায্য হতে পারে—এই জন্যই এ কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।" রোগী বলল—"মহাশয়, আপনিই তা হ'লে আমার সর্ব্ব-প্রধান সাহায্য ক'রতে পারেন; সেই পাপী-য়সী মার্সি মেরিক্‌কে আপনি অনুসন্ধান করে বার করুন।" এই কথা বলবার সময় তার মুখমণ্ডল তীব্র ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি বললাম—"মার্সি মেরিক্ কে?" "একটা জঘন্য স্ত্রীলোক—সে কথা সে নিজের মুখেই প্রকাশ ক'রেছে।" "আমি কিরূপে তাকে বার ক'রব?" "তার পরিধানে একটা কালো পোষাক আছে, তার কাঁধে একটী ক্রুশের চিহ্ন আছে—ফরাসী আহত সৈন্য শিবিরে সে এক জন সুশ্রূষা কারিণী। সেই স্ত্রীলোককে আপনি বার করুন।" "সে আপনার কি করেছে?" "আমি আমার কাগজপত্র হারিয়েছি, আমি নিজের পোষাক হারিয়েছি—মার্সি মেরিক্‌ই সেই সব চুরি ক'রেছে।" "মার্সি মেরিক্‌ই যে সে সব নিয়েছে তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?" "আর কেউ সে সব নিতে পারত না—তাই জানি সেইই নিয়েছে। আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে কি?" আবার উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল। আমি বললাম—"আমি এখনই তার সন্ধানের ব্যবস্থা ক'রছি।" রোগী যেন সন্তুষ্ট হয়ে বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে শুল। সে বলল—"আপনাকে ধন্যবাদ; তাকে ধ'রতে পারলেই ফিরে এসে আমাকে সংবাদ দেবেন।"

ম্যানহিম্ হাঁসপাতালে ইংরাজ রোগীর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাতের ইতিহাস। এ কথা অনাবশ্যক যে মার্সি মেরিক্ নামে যে কোন সুশ্রূষাকারিণী আছে—সে কথা আমি প্রথমে আদৌ বিশ্বাস করি নি। ডাক্তার ইগ্‌নেশিয়াস্ উইজেল্‌কে আমি এর সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পত্র লিখিলাম। যথা সময়ে তাঁর উত্তর আসল। তিনি লিখলেন যে যুদ্ধের সময় তিনি একদিন ফরাসী আহত সৈন্যদের শিবিরে প্রবেশ করে যে সকল সৈনিক সেখানে পড়েছিল তাদের দেখেছিলেন। কিন্তু সেখানে এরূপ কোন সুশ্রূষাকারিণী দেখেন নি। সেখানে কেবল একটী স্ত্রীলোক দেখেছিলেন—সে একজন ইংরাজ যুবতী। সেই স্ত্রীলোকটী ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিল—পথে সীমান্ত প্রদেশে তার গতিরোধ হয়; কিন্তু একটী ইংরাজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদ দাতার সাহায্যে সে ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি পেয়েছিল।

জ্যানেট বলিলেন—"সেই তো গ্রেস্"

হোরেস বলিল—"আর আমিই সেই সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদ দাতা।"

জুলিয়ান বলিল—"আর আমার দুচারটী কথা শুনাবার আছে। সে কথা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন কেন আমি এ

কাহিনী শোনাচ্ছি।" তাহার পর জুলিয়ান পত্র হইতে নিম্ন লিখিত অংশ পাঠ করিল—

"আমি নিজে হাঁসপাতালে না গিয়ে চিঠি লিখে জানালাম যে সেই সুশ্রূষা-কারিণীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তারপর রোগীর কাছ হ'তে কিছু দিন পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

বন্ধু ও শত্রু

[শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক]

মম যশে যবে ক্ষুন্ন হ'য়েছ
　　বন্ধু বলিয়া মানি
সুখ্যাতি যবে করিলে বন্ধু
　　শত্রু হইলে জানি।
ক্লেশের দিবসে মমতা করনি
　　দুঃখে মরিনি তাই
তোমারে যদি না ভাই ব'লে বলি
　　কাহারে বলিব ভাই !
হতাশায় তুমি:আশা দিয়েছিলে
　　আশার আঘাতে হত
কেন বলিব না ঘাতক তোমায়
　　নিষ্ঠুর রণরত ?

তীর্থ ও অনর্থ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

নাস্তিক নরেশ কাশী হতে ফিরে এসে ভারি চটেমটেই ভবেশের বৈঠকখানায় এসে হাজির হল। মনের ভাব আধ্যাত্মিক ভবেশকে হিন্দুর তীর্থ সম্বন্ধে দুটো খুব মিঠে কড়া শুনিয়ে দেবে। ভবেশ ও নরেশ দুজনের মধ্যে মত ও মেজাজের তফাৎ জল ও আগুন, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। তবু দুজনের অন্তরের অন্তরে কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক মিল আছে; সেখানে দুজনে একেবারে হরিহর, রামলক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন বল্লেই হয়। ভবেশ বলিছি খুবই আধ্যাত্মিক, সব বিষয়েই বেশ একটু তলিয়ে বুঝে কথা বলে; নরেশ ঝোঁকের মাথায় যখনি যা মনে আসে তাই বলে বসে; নিজের মতটা মনে ভুল বুঝলেও তর্কের খাতিরে আর প্রেস্‌টিজের সেকে টেবিল চাপড়ে কিলিয়ে তদনুপাতে গর্জ্জন করে যুক্তি অযুক্তি, কুযুক্তির ধুলো ঝালি ছড়াতে থাকে।

তখন তর্কের সময় নয়, তবু নরেশ ভবেশের আড্ডায় এসে হাজির। ভবেশ জানতো না নরেশ কাশী হতে ফিরেছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে "কবে এলি?" নরেশ উত্তর করলো আজই সকালে এখনো ঘণ্টাও পেরোয়নি"।

ভ। কাশী কেমন দেখ্‌লি?

ন। শত নমস্কার তোমার কাশীধাম্‌কে।

ভ। (হাসিয়া) কেন?

ন। কি ভয়ানক dirty সহর! বাপ্‌!

ভ। কাব্যের দিকটা রেখে দাও; ধর্ম্মস্থান ভাবে কেমন দেখ্‌লে?

ন। সো পাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ

ভ। কেন? কিসে?

ন। দেখলাম হাজার হাজার অজ্ঞানী বেচারী কি একটা বিরাট ধর্ম্ম ব্যবসার ফাঁদে পড়ে লুটোপুটী খাচ্ছে—আকণ্ঠমগ্ন কুসংস্কারের পাঁকে!

ভ। Just as I thought! যা ভেবেছিলাম।

ন। কি ভেবেছিলে শুনি?

ভ। নাঃ তোমার মত মহাজ্ঞানীর কি শোচনীয় মহার্ঘ্যতা।

ন। ঠাট্টা হচ্চে! অজ্ঞানী নয়তো কি? কি বলতে চাও শুনি?

ভ। বিশ্বেশ্বর দর্শন করিছিলি?

ন। একদিন গিয়েছিলাম, কী ভীষণ ভিঁড়—কী গোলমাল, কী অপরিষ্কার নোংরা! বাবাতো এক হাঁটু কাদাজল আর পচা বিল্বপত্রের পাঁকে ডুবে আছেন; জাগ্রত চৈতন্য ভাগ্‌গিস্‌ নন্‌ তা হলে নাকে দেড়থান মার্কীন জড়াতে হতো! অথচ কি আশ্চর্য্য শত শত লোক ভাবে বিভোর, চখে দর দর জল ঝরছে মাথা কুট্‌ছে যথা সর্ব্বস্ব ঢেলে দিচ্ছে! কী Hypnotism!

ভ। খুব আশ্চর্য্য বোধ করছো তা হলে?

ন। আশ্চর্য্য হবনা? ঐ এক খণ্ড misshapen পাথর কে ঐ dirt এর মধ্যে অমনি ভাবে deified হতে দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয় না? কেমন করে ভক্তি আসে লোকের?

ভ। এসেছে তো? তা কি অস্বীকার করতে পারো: হাজার হাজার লোকের শত শতাব্দী হতে আসছে—মহাজ্ঞানী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত পরমহংসেরও এসেছে অজ্ঞানী বামা শ্যামা চাষারও আসছে—আসেনা কেবল তোমার মত neuter জীবের—আধ্যাত্মিক ক্লীবের—

ন। Thank you for the উপাধি—হায় গাল দেওয়া যদি সুতর্ক হতো।

ভ। নবে মোড়লের ছবিটাকে গড় করতে পারিস?

ন। আমি কেন গড় করতে যাবো রে?

ভ। একজন তো পারে? তার স্ত্রী বা তার ছেলে—তারা তো বেশ ভক্তির সঙ্গেই তার পায়ের ধূলো নেয়?

ন। তারা পারতে পারে, তাদের সঙ্গে একটা ভাবের সম্বন্ধ আছে—তাদের পক্ষে এটা natural.

ভ। তা হলে ঐ সব হাজার হাজার লোক পারবেনা কেন ঐ misshapen পাথরটীকে ভক্তি করে গড় করতে? এটাও কি ভাবের সম্বন্ধ? ওরা কি পাথরটীকেই দেখে আত্মা উদ্ভ্রান্ত হয়? আরো তো পাথর আছে ভূভারতের পথে ঘাটে? আসল কথা এর unknowable জগৎ কারণকে সাধারণ মানুষ ধরতে ছুঁতে পারে না, কাজেই একটা কিছুতে তাঁর রূপ কল্পনা করে রূপাধীন মনটাকে তাতেই মগ্ন করে রাখা—এতো সোজা কথা যে যেমন অধিকারী তার পক্ষে তেমনি সোজা ব্যবস্থা করে দেওয়াই ভাল নয় কি? রাজা রামমোহন রায়ের বা কেশব সেনের মত জ্ঞানীভক্ত নিরাকারে মন দিতে পারেন তা বলে ভাই হলধর দাস আর ভগ্নী কেকাবতীও চোখ্ বুজলেই নিরাকারকে আঁকড়ে পাবেন তা বলতে চাও? পাশ্চাত্য ধরণে একরূপ ধর্ম্মব্যবস্থাকে—মুনি হতে মুনিশ পর্য্যন্ত সবারই সমান সাধন সম্পত্তি করলে, ফল যা হয় তা তো দেখছ নব্যধর্ম্ম সমাজে?

ন। অজ্ঞানীরা না হয় ঐ করলে বা করালে—পরমহংসরাও কেন এ প্রকার চিহ্নকে দেখে ভাবে বিভোর হন?

ভ। একটা বাঁশের ডগায় টাঙানো একটা তিনরঙা কাপড় দেখে [illegible], ডিকেন্স্ গ্লাডষ্টোন, [illegible] কেন মাথার টুপি খুলে সসম্ভ্রমে মাথা হেঁট করেন? ঐ কাপড়ের টুকরাটাকে হাজার বছর ধরে Common Consent এ দেশমাতৃকার পুণ্যাঙ্কন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে বলেই না? ন্যাকড়াটা যে ব্রীটেনিয়া মাতা নয় তা নিশ্চয়ই?—association of ideas দরুন একটা জিনিসে একটা ভাব আরোপন করা ছিল বলে তা দেখবা মাত্রই যার প্রতীক তাকে মনে পড়ে। তা ছাড়া পরমহংস জ্ঞানীর এমনো মনের ভাব হতে পারে যে অজ্ঞানীর জ্ঞানভেদ করা ভাল নয়। তাঁরা "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়—" তোমাদের মত ভাবুকরা Spirit কে materialise বেশ করতে পার, কিন্তু matter যে spiritualised হয় তা বিশ্বাস কর?

ন। এইবার দেখছি ছুপ্পাচ্য মিস্টিসিজমে এসে পড়লি—আমরা Spirit কে materialise কোথায় করি?

ভ। দু বেলাতেই করছ। ভাবকে রূপ না দিলে এক মুহূর্ত্ত বাঁচতে পারো? বই মানে কতকগুলো কালির আঁচড়ই কি? ছবি বা ভাস্কর্য্য এগুলো কি materialised ভাব নয়? Cologne এর গথিক্ গির্জ্জাটা

ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা বা তাজ মহলটা কি কতকগুলো ইট্‌ কাঠ্‌ পাথরের স্তূপ মাত্র?

আস্ত তাজটা দেখলে বা তার ছবিটা দেখলে বা তার নামটা মাত্র শুনলে মনের ভিতর একটা বিপুল ভাবসিন্ধু উথলে ওঠে, বিরাট একটা অতীত রক্তমাংসে সজীব হয়ে ওঠে, কত মধুর মধুর ভাব সুপ্তচৈতন্যের গুহাগহ্বর মুখরিত করে তোলে—আবার materialisation of spirit কাকে বলে?

ন। সে ভাবে যদি তাই বলতে চাও তা বটে!

ভ। তেমনি spiritualisation of matter হতেও পারে তো? তোমার বাবার ফটোটা তো কতকগুলি সাদা কালোর দাগ্‌ মাত্র? তবে সেটা দেখে তোমার পিতৃ-ভক্তি জেগে ওঠে কেন? সমস্ত হাড়মাস কঠিন দেহটা ভাবে ভক্তিতে তরল কোমল হয়ে ওঠে কেন? চোখে জল আসে কেন? তেমনি ঐ পাথরটীতে অজ্ঞানীরা তাদের সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা প্রণতির পাত্র দেখতে পায় বলে!

ন। analogy বড় happy নয়। বাবার photo বাবার প্রতিকৃতি ঐ পাথরটী কি ঈশ্বরের প্রতিকৃতি?

ভ। তার ঠিক প্রতিকৃতি জানো?

ন। কেহ বা জানে?

ভ। তা হলে আমি একটী মনের মত প্রতিকৃতি করে নিতে পারিতো? আমার যেমন ইচ্ছে! তোমার রুচিভক্তি না হয় তাকে পূজো ক'রনা। রামের খড়ম ভরতের চোখে রাম তুল্য; রাবণের কাছে না হতে পারে। যার কাছে যেটী তার চৈতন্যের অংশভূত তার কাছে সেইটীই পরম সত্য। জন্ম স্থান হিসেবে তোমার গ্রামের মাঠ ঘাট বন জঙ্গল আমার ভাবচোখ হতে বেশী সত্য নয়কি? ঐ misshapen পাথর খণ্ডটা লক্ষ অজ্ঞানীর মনের অতল পাতাল ওলট্‌-পালট্‌ করে দয়া মায়া, ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধার বড় বড় ঢেউ তুলে দিচ্ছে অথচ তোমার মনে একটা বুদবুদও তুলতে পারছে না? কার বেশী লাভ ভায়া? এ পথে কে বেশী জ্ঞানী বলতে পার? কার চৈতন্য বেশী সজাগ বোঝাতে পার?

ন। তেমনি আর একদিক দেখ?—একটা তারা হতে আলো আসতে লক্ষ বছর লাগে এ ভাবটা কার চৈতন্য বেশী আলোকিত করে?

ভ। বলিছিতো অধিকারী ভেদে—তা ছাড়া দেশ কালের অসীমতা ভেবে তুমি বিস্ময়ে জোর অবাকই হলে—কিন্তু যা বল্লাম তাতে করে দয়া মায়া ভক্তি ভালবাসা প্রেম বিকাশ এ সব দিক দিয়ে তোমার লাভ যে বেশী তা মনে হয় না। জগত সংসারে সাধারণ জীব পক্ষে বিস্ময় অপেক্ষা দয়ামায়া প্রেমপ্রীতির ব্যবহারিক মূল্যটাই বেশী নয় কি? প্রকৃতির marvels ভেবে কি তোমার অনাথ গরীব কাঙ্গালকে দান করবার ইচ্ছে হয়? না ত্যাগ স্বীকারের প্রবৃত্তি জাগে? আগে তোমারি ধরণে তর্ক করে ভাবতাম্‌ পুতুল পূজাতে আর কাষ্ঠ লোষ্ট্রে ভগবান দেখে দেখেই জাতটা গোল্লায় গেল—এখন বুঝছি ঐটী আছে বলেই জাতটার আধ্যাত্মিক under current টা অবিরাম প্রবাহে টীকে আছে—প্রাচীন হিন্দুজাত বলে পরিচয় দিতে পারছে আর দুরতম অতীতের সঙ্গে এ জাতটা সংযোগ রাখতে পেরেছে। যখনি দেখছি স্বয়ং মহাপ্রভু জগন্নাথের ঐ-রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেঁদে দিশেহারা হচ্ছেন—

আর রামকৃষ্ণের মত মহাজ্ঞানী মা মা বলে ছেলের মত মূর্ত্তির কাছে বসে আদর আব্দার জানাচ্ছেন তখনি চুপ হয়ে যেতে হয়।— সাধারণ লোকের পক্ষে যা সত্য যা কার্য্যকরী, তাই সত্য তাদের পক্ষে। তা আমাকে তোমাকে মানতেই হবে। মনের একটা বা কয়েকটা উচ্চতম বৃত্তি যদি কোনো একটা ভাব চর্চ্চায় বিকাশ পায় তার পক্ষে সেই ভাবটা পরম সত্য। তোমার জ্ঞানের মাপ কাটীতে অপরের জ্ঞান কম বেশী এ বলাও দুষ্কর। আমার বিশ্বাস আমাদের তর্কশাস্ত্র-রূপ পুটপাক-শোধিত জ্ঞান ছাড়া আরো একটা অন্য রকম সহজ জ্ঞান আছে যেটাকে intuition বলে—প্রজ্ঞাই বল আর শুদ্ধ জ্ঞানই বল যাই বল—এই জ্ঞানে নিরক্ষর মূর্খ তথা-কথিত অজ্ঞানীরা অনেকেই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি বৈদ্য শাস্ত্র মন্থন করে ঔষধ পেতে পারি—আর নবদ্বীপ মোড়লের স্ত্রী ঠাকুরঘরে ধরণা দিয়ে রোগের ঔষধ পেতে পারে—কার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ আমার বলতে ভরসা হয় না।

ন। তোমার অবস্থা দেখছি ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে আসছে। একেই বলে atavism সভ্যতার পশ্চাৎ গতি প্রাপ্তি। নবদ্বীপ মোড়লের স্ত্রীর ধরণা দিয়ে ঔষধ লাভও বিশ্বাস করতে হবে? ক্রমে দেখছি সমস্ত কুসংস্কার কেই বরণ করে ঘরে তুলতে হবে!

ভ। ইংরিজিতে গাল দিলে খুব জম-কালো গাল হয় বটে কিন্তু ঠিকভাবে তর্ক করা হয় না। চাষা ভূসোবা বা অজ্ঞানী সাধারণ লোকরা যে সব সম্ভব অসম্ভব সংস্কার মেনে চলে তা সবই তাদের মনকল্পিত নয়। যে কোনো উন্নতজাতির শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানীরা সাধ্য সাধনার বলে যে সব সত্য লাভ করেন, অধঃস্তন অজ্ঞানীরা তা মেনে চলে। পিতার অর্জ্জিত অর্থে যেমন ছেলেদের অধিকার জন্মায় সমাজের জ্ঞানী গুণীদের অর্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধিতে ইতর শ্রেণীদেরও তেমনি অধিকার জন্মায়। তারা শুধু মেনে চলে, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় নিয়ে মাথা বকায়না। কালক্রমে এই সব লব্ধ সত্যের ইতিহাস হারিয়ে গিয়ে জাতি অধঃপতিত হলে তখন এই সব প্রচলিত ক্রমে চলিত সংস্কার গুলোই থেকে যায়। এদেরকেই Culture relics বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ উত্তর দিকে মাথা করে ঘুমাতে নাই; এই রকমের কথা গুলি একটা না একটা প্রাকৃতিক সত্যকে প্রকাশ করে; অনেক জ্ঞান বিবেচনার ফলে এগুলি জ্ঞানীলোকে জেনে-ছিলেন; তাছাড়া অনেক নিগূঢ় প্রাকৃতিক অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার মানুষ মাত্রেরই জীবনে দেখা দেয়: এখানে জ্ঞানী অজ্ঞানী বিচার নাই তবে জ্ঞান দর্পীরা অনেক বিষয় অপ্রা-মানিক অসম্ভব বলে হেসে উড়িয়ে দেন অজ্ঞানীরা সরলভাবে সে গুলোকে মেনে নেয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়া, আর প্রমান পেলেও না মানা, উভয়ই একই পরিমানে দোষযুক্ত। উভয়েরই বাড়া বাড়ি আছে।—

ন। সে যাক্ তোমার Esoteric ব্যাখ্যা রেখে দাও। এ সব Electric Hinduism এর একটা অধ্যায়। এ দিয়ে আসল কথা unpleasant truth চাপা যায় না—

ভ। অর্থাৎ?

ন। তোমার এই nasty তীর্থস্থান গুলোকে defend করা যায় না!—

ভ। আর যা বলো বলো—ভারতবর্ষে হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলিকে nasty বল্তে পার না, অতি বড় নাস্তিকও এ অপবাদ দিতে

পারে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে এমন সুন্দর ভাবোদ্দীপক স্থান খুবই কম আছে। যা শুনেছি আর বর্ণনায় পড়িছি, হরিদ্বার, পুষ্কর, চন্দ্রনাথ, পুরী, সোমনাথ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, বদরিকাশ্রম এ সবের কি তুলনা আছে? এইরূপ বাছা বাছা স্থানে তীর্থস্থান যাঁরা স্থাপিত করেন তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির খুব তারিফ করতে হয়!

ন। কারণ বোকা ভুলিয়ে পয়সা রোজগারের এমন অব্যর্থ ব্যবস্থা খুবই কম আছে জগতে—

ভ। আধুনিক অন্য কতকগুলা ধূর্ত্ত বা অর্থলোভী মোহান্ত নাধারীর কাজ দেখে আর্য্যধর্ম্মবেত্তাদের বিচার করা না—এ ধরণের কথা মিশনরী পাদরী, গোঁড়া ব্রাহ্ম আর নাস্তিক ইংরাজীনবীশের মুখেই শোভা পায়—যার ধমনীতে হিন্দুর রক্ত আছে তার পক্ষে শোভা পায় না। তীর্থস্থানের ব্যবস্থা সব ধর্ম্মের মধ্যেই আছে।

ন। সে যাক, অন্তর্দৃষ্টির কি পরিচয়টা শুনি?

ভ। একটা ভাল স্থানের যে মনের উপর একটা ভাল প্রভাব হয় তা স্বীকার কর?

ন। তা করে না কে?

ভ। মানুষ মাত্রেরই একটা বৈষয়িক মন আছে আবার তারই গভীর তলে একটা আধ্যাত্মিক মনও আছে। বৈষয়িক মনটি মূলতঃ আসল মনেরই একটা পাঁচরঙ্গা আবরণ; আধ্যাত্মিক মনটাই আত্মার আসল রূপ; বৈষয়িক মন টাকা কড়ি, লাভ লোকসান 'আমার' 'তোমার' 'হেয়-প্রেয়' এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে; ঐ করতে করতে তার পর্দ্দাটা ক্রমশঃ পুরু হ'য়ে পড়ে; এই জন্যে মধ্যে মধ্যে আসল মনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এই সংযোগটা বজায় রাখা দরকার। তার ফলে জীবের আসল আত্মাটা বিশেষ ভূমাত্মার সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা বুঝতে পারে। এই জন্যে মধ্যে মধ্যে বিষয়ের ধুলো কাদা হ'তে সরে গিয়ে আধ্যাত্মিকের মুক্ত বাতাসে বস্‌তে হয়। খানিকক্ষণ প্রকৃতির আসল মূর্ত্তির কাছে গিয়ে বস্‌লে মনের বৈষয়িক আবরণটা খুলে যায়। মনের খিড়কী দরজা খুলে গিয়ে আত্মার সঙ্গে বিশ্বের আত্মার সংযোগ হয়। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শনে সুবিধা হয়। সাধারণ-বিষয়মুগ্ধ জীবতো ইচ্ছে করে এই অনুভূতির আনন্দ লাভ করতে চায় না; তাকে ধর্ম্মের ও পুণ্যের লোভ দেখিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। সাধারণ লোকেতো বিশ্বস্থ তুচ্ছ জিনিষেও ভূমার দর্শন পায় না, কাজেই তাকে বিরাটের ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির দিকে তার নজর ফেরাতে হয়। উত্তম অধিকারীরা ধূলিকণা তৃণ জলবিন্দুতে ভগবান দেখে না; কিন্তু যেখানে প্রকৃতির বিরাট বিশাল বিকাশ সেখানে কতকটা পায়। খুব magnificent দৃশ্য দেখলেই প্রাণটা লাফিয়ে বেড়ে ওঠে, ভগবানের মহিমায় বুক ভরে ওঠে; এটা মধ্যম অধিকারীদের হয়; অধম যারা তাদের তাতেও হয় না, তাদের জন্য কাজেই দেবতার সাকাররূপে মন বসানো চাই। তীর্থস্থানে দু-ই-ই আছে। তোমার মত লোক প্রকৃতির মহিমাময় বস্তুতে ভগবান দর্শন করবে; কিন্তু অজ্ঞানদের জন্য ঐ সব স্থানে দেবপ্রতিষ্ঠা দরকার। বিশ্বেশ্বরের পাথর মূর্ত্তিতে তোমার মন না বসতে পারে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সময় এ পার হ'তে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সৌধকিরিটিনী গঙ্গাবিধৌতা কাশীর দৃশ্যে মন-মুগ্ধ হ'তে পারে।

তো? যে যেমন তার জন্যে তেমনি আয়োজন হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে আছে। হরিদ্বারের অপূর্ব্ব দৃশ্য বা বদরিকাশ্রমের তুষারময় হিমালয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য, বা পুরীর সিন্ধু দৃশ্য এসবের সুমুখে এসে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবাহ বয় না এমন অসাড় মন কমই আছে। প্রকৃতির এই মোহন রূপের চাক্ষুষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে আত্মার এই বিরাট বিকাশ যেখানে হয় তাকেই আসল তীর্থস্থান বলে। মাঝে মাঝে বিষয়ী মনকে যদি টেনে নিয়ে গিয়ে এই অসীমের কোলে ফেলে দেওয়া যায় তাতে লাভ না লোকসান বল্‌তে পার? তীর্থস্থানের মহিমা এইখানে, সার্থকতাও এই খানে। যেমন অধিকারী তার তেমনি ব্যবস্থা এই সব তীর্থ স্থানে করা হয়েছে।

ন। তুমি তীর্থস্থানের যে আধ্যাত্মিক মহিমা কীর্ত্তন করলে সেটা কতদূর সত্যি তা জানি না; তোমার নিজ বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে এটাকে এমনি করে দেখছো হয়তো—সে যাক সাধারণ লোকে কি তোমার ভাব নিয়ে তীর্থ মহিমা উপলব্ধি করে? আমিতো দেখি এগুলি Commercial Religion এর ঘাটী বা Depot—আর সম্ভবতঃ ওগুলির উৎপত্তিও ঐ পয়সা রোজগারের ফন্দী হতে। কোনো এক যুগে ব্রাহ্মণেরা যে নিজেদের আধিভৌতিক ও আর্থিক প্রভুত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় তার ফলে এইসব তীর্থ স্থানের co-operative কারখানা! এই যে পাণ্ডাদের পয়সা রোজগারের জঘন্য চেষ্টা ঠাকুরের নামে মানুষ ঠকিয়ে খাবার আয়োজন এ অস্বীকার কর?

ভ। সব জিনিসের অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে; আসল খাঁটী বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বা চৈতন্য দেবের প্রেমধর্ম্মের যদি এই পরিণাম হতে পারে তা হলে তীর্থ স্থানের এই সব কদাচার কুলোকের হাতে পড়ে হবে তার উপায় কি? তাতে কবে আসল ধর্ম্ম পিপাসুদের কোনো ক্ষতি নাই। তুমি আমার কাছে অভাব জানিয়ে ফাঁকি দিয়ে দু পয়সা নিয়ে গেলে, তাতে তোমার দিক যা হয় হলো আমার লোকসান কিছু না আমার দুঃখ জনিত দয়া ভাবটার সার্থকতা হলো তো—? যেসব লোক আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভের জন্যে তীর্থ দর্শনে যায় তাদের ষোলো আনাই লাভ।

সত্যকে একান্ত ভাবে গ্রহণ করার শক্তি থাকা চাই। সত্যপথের বাধা—ক্ষতি অপচয় ও নির্য্যাতনকে পরাহত করিয়া যে আপনার বলে অগ্রসর হয় সেই শক্তিমান পুরুষ—

কবি

[শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ]

বক্ষে লয়ে দহন-জ্বালা
গান গেয়ে যাস্, ও কবি!
দুঃখ যে তোর কণ্ঠমালা,
ও বেদনার গৌরবি!
চল্‌তে পথে চলার দলে
ফুট্‌বে কাঁটা চরণ-তলে,—
পথ হারায়ে অশ্রুজলে
সবার পিছে তুই রবি।

লক্ষ্মীছাড়ার ঠাঁই নাহি রে
লক্ষ্মীমায়ের অঞ্চলে,
হায় অভাগা ঘর বাহিরে
সব হারালি কোন্ ছলে?
কে জুড়াবে ক্ষুধার জ্বালা,
ঠেল্‌লি যে পায় অন্নথালা?—
লাভ হ'ল হায় কাঁটার মালা,
শায়ক-বেঁধা বুকতলে!

সম্মুখে তোর আঁধার রাতি,
যাত্রা কোথায় কে জানে!
দম্‌কা বায়ে নিব্‌ল বাতি,
সঙ্গী র'ল কোন্‌খানে!
বাঁধলি যে সুর বীণার তারে
ঝঙ্কারে তা' বাজ্‌ল নারে,
বন্ধু ফিরে আঁধার-পারে
সেই হারাসুর সন্ধানে!

দুঃখ যতই বাজ্‌বে বুকে
গান গেয়ে যাস্ ও কবি!
সর্ব্বনাশের নেশায় সুখে
রক্ত দিয়ে আঁক ছবি।
কান্না যখন বক্ষ জুড়ে
আনন্দ-গান গাইবি সুরে,
সবার নীচে সবার দূরে
সব হারায়ে তুই রবি!

আফিংখোরের জাগ্রত স্বপ্ন

[শ্রীসুবোধ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

কালোয় যে জগৎ আলো এ কথার সার্থকতা আমি বেশ বুঝেছি কারণ কালাচাঁদ এখন আমার প্রাণ, তাঁর প্রেমে আমি এখন বিভোর—মশগুল্। পিরিতটা তাঁর সঙ্গে বহু দিন ধরেই চল্‌ছে এবং পবিত্র এই প্রেমের বাঁধনটা এত দিনে এতই জমাট বেঁধে গিয়েছে যে তাঁর ক্ষণিক বিরহও এখন আমার কাছে অসহ্য, প্রাণান্তকর ব্যাপার। ষোল আনা প্রাণটা তাঁর পায়ে বিকিয়ে দিয়ে এক রকম তাঁর কেনা গোলাম হ'য়েই বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। জীবনের সমস্ত ভারটা তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে নির্ভাবনায় মনের সুখে দিনগুলো আমার বেশ কেটে যাচ্ছে। পাড়ার পাঁচজন বদ্‌লোকের প্রাণে, আমার প্রাণের এই অনাবিল শান্তিটুকু দেখে বোধ হয় সহ্য হয় না তাই তাঁরা মাঝে মাঝে আমার পাঁচটা

gratis advice দিতে না এসে থাক্‌তে পারেন না। মন্দ লোকের স্বভাবই ওইরূপ, সে জ্ঞানটুকু আমার চিরদিনই বিশেষরূপে আছে বলিয়াই তাঁদের ফাঁদে আমি পড়ি নাই—সে সমস্ত বাজে কথাগুলো মনে মনে হেসে উড়িয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীকালাচাঁদের শ্রীচরণ আশ্রয়টুকু আমি একটি দিনের জন্যও ছাড়ি নাই। মতি গতি এত সহজেই যদি পরিবর্ত্তন হয়ে যায় তাহা হইলে জীবনে আর সাফল্যের আশা কোথায়? আমি কিন্তু এত সহজে ভুলিবার পাত্র নই—মুক্তিকামী বীর আমি—তাই লজ্জা, মান, ভয় সব ত্যাগ করিয়া মোক্ষ লাভের প্রবল আশায় কালো সোনার রাঙা চরণ দুখানি বরাবরই স্মরণ লইয়া পড়িয়া আছি। সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া, মুক্তি ও চির শান্তি লাভই যদি মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তবে কাজটা যে আমি খুব ভালই করিয়াছি এবং আমার বুদ্ধিবৃত্তিটাও যে যথার্থই বেশ তীক্ষ্ণ একথা আপনারা পাঁচ জন সুধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন। 'লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়"—ঠাকুরের একথাটার সারবত্তা এতদিনে বেশ বুঝিয়া সবই সেই কালাচাঁদের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি।

প্রেম কোনও বাধা মানে না, কোন আইন কানুন স্বীকার করে না। প্রেমের ডাকে প্রাণটা যেই উথলে উঠ্‌লো তখনই সেই সান্ধ্যদিবার সঙ্গম কালে সব বাঁধা বিঘ্ন ভুলিয়া গিয়া কালাচাঁদের চরণতলে আশ্রয় লইলাম—এক মহাস্বপ্নে বিভোর হইয়া গেলাম। প্রেমের তরঙ্গে তখন গা ঢালিয়া হেলে দুলে মনের সুখে কোন এক সুদূর দেশে ভেসে যাচ্ছি, প্রাণটা তখন উধাও হ'য়ে এ সংসার ছেড়ে পাপ পুণ্যের ঊর্দ্ধে কোন এক শান্তিময় আনন্দের রাজ্যে চলে গিয়েছে। দূর গগনের কোলে খণ্ড খণ্ড ভাসা ভাসা মেঘগুলো বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়া কোন এক স্বপ্নময় রাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলো—কোন এক দূর অতীতের মধুর স্মৃতি প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া তুলিল। ওগো! তোমরা বুঝিবে না—তখন—তখন আর আমাতে আমি রহিলাম না। দেহটাকে এই ধরাধামে দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া আমি তখন ছুটিলাম সেই অজানা অনন্তের সন্ধানে। বিচিত্র রঙে সারা আকাশ রাঙাইয়া চোখের সম্মুখে আমি তখন আমার কালাচাঁদের লীলাভূমি বৃন্দাবনের সৃষ্টি দেখিলাম—দেখিলাম মেঘের গায়ে আঁকা বাঁকা সেই যে যমুনা প্রেমের ভরে কুলুকুলু রবে উজান বহিয়া চলিয়াছে—তীরের সারি সারি কদম্ববৃক্ষের প্রস্ফুটিত কুসুমসহ কালাচাঁদের সেই মদনমোহন বেশ সুখে সেই প্রণয় লীলার বাঁশরি বাদন বক্ষে ধরিয়া কালো যমুনা ছুটিয়াছে। গোপীগণের নগ্নবস্থায় যমুনাবক্ষে সরম জড়িত কাতর চাহনি—যোড় করে বস্ত্র লাভের জন্য আকুল আবেদন প্রাণের ভিতর যেন চমক্ লাগাইয়া ছুটিয়া গেল।

ভাবে বিভোর, আত্মহারা হইয়া মনে মনে কালাচাঁদের বাঁশরি বাদন অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবলুশ কাঠের কালো টুকটুকে ছোট হুঁকাটীতে জোরে জোরে দম্ লাগাইয়া আমাদের মেস্ বাসার ধোঁয়াঘরের উপর উপু হইয়া বসিয়া ভাববেশে তন্ময় হইয়া এক রূপ সমাধি লাভ করিলাম। সমাধির সে তন্ময় অবস্থায় জীবনতত্ত্বের, ধর্ম্মতত্ত্বের, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বের কত কত যে জটিল রহস্য ভেদ করিয়া ফেলিলাম তাহার সংখ্যা করা যায় না। দেহটাকে তখন মিশিয়ে

দিলাম—অস্তিত্বটা তার তখন একেবারে লোপ করে দিলাম কোন একটা অজানা নিবিড় অন্ধকারে। শুধু জ্ঞানময় প্রাণটুকু দেহ হতে ছিন্ন করে নিয়ে উধাও হয়ে উড়ে গেলাম সেই মেঘমালার ভিতরে—অবাধ মুক্ত হাওয়ার মত খেলিয়া বেড়াইলাম কত গ্রহ, উপগ্রহ, নদ, নদী, পর্ব্বত ও সমুদ্রের ভিতরে। একটু জ্ঞান হইলে সম্মুখে চাহিয়া দেখি ছতুলালের শান্ত শিষ্ট গাধাটি যেন আমার পানে কাতর নয়নে চাহিয়া আছে এবং প্রাণের আমার এই অনাবিল শান্তি টুকু লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে "ভাই কেরাণী তুমি আর ভারবাহি আমি উভয়েই আমরা ত প্রায় একই জাতীয়। ভার পিঠে আমাদের দুজনেরই আছে এবং আমাদের উভয়েরই প্রভু সেই ভারের উপর ও সুবিধা পাইলেই কাঁধে, পিঠে উঠিয়া বসেন। সে বোঝা বহিতে অস্বীকার করিবার সাহস আমাদের উভয়েরই সমান। উভয়েই আমরা সমানভাবে সংসারের এই দারুণ পীড়নে বদ্ধ। মুক্তির বা শান্তির আশা আমাদের আর কোথায় ভাই? তবে তুমি যে মুক্তি লাভের আশায় আশ্বস্ত হওয়া এই অনাবিল শান্তিটুকু উপভোগ করছো তা কিন্তু বড়ই লোভনীয়—বড়ই মধুর। এ শান্তিটুকু তুমি কোথা পেলে ভাই? দাও—সে পথটা আমাকে ও বলে দাও আমি ত জীবনের এই ভীষণ বেদনাটা ভুলতে একটু চেষ্টা করি।'' আহা! হা! বেচারিকে দেখিয়া প্রাণটা আমার কাঁদিয়া উঠিল এবং আমরা উভয়েই যে সমজাতীয় তাহা তাহার যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি সমবেদনায় প্রাণটা আমার ভরিয়া গেল। তাহার প্রাণের কাতরতা ও এ দুঃখটুকু ভুলিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করিতে নিত্য অন্ততঃ পক্ষে সন্ধ্যা-কালেও একটী বার শ্রীশ্রীকালাচাঁদের শ্রীচরণ স্মরণ লইবার উপদেশ দিয়া মোক্ষ-লাভের নিশ্চয়তার কথা তাহাকে বুঝাইতে যাইতেছি এমন সময় নিচেতালার রান্নাঘর হইতে একটা বিকট আওয়াজ "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" সুখের ধ্যানটা আমার ভাঙ্গিয়া দিল—প্রাণটাও সে সুরের মধুর লহরীতে চম্‌কে উঠ্‌লো। সপ্তমে সুর চড়াইয়া ঝি ঠাকুরাণী বলছেন "ভাল আপদেই পড়া গেছে, রাত্রি ১১টা বাজে রোজই এ এ জ্বালাতন আর সয়না। সকালে আর আমি আস্‌ছিনা—২।১ দিন খাওয়া না হলেই তবে ঠিক হবে।" উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ ঠাকুরতো রেগেই লাল; ভাত নিয়ে একটা লোকের জন্য তিনি আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বেন, ভাত বেড়ে ফেলে রাখলেই বাবু জব্দ হয়ে যাবে!! মুক্তিটুক্তি সব কোথায় গুলিয়ে গেল। চট্ করে নিচে নেমে গিয়ে খেতে বস্‌লাম। আহা! হা!—কি মধুর রান্না—গৃহিণীর রান্না কোথায় লাগে? সে রন্ধনকৌশল স্বয়ং উড়িষ্যাবাসী পুরুষ দ্রৌপদীর অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। তখনই পৃথিবী হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা হইতেছিল—ব্রাহ্মণ ঠাকুর ও ঝী ঠাকুরাণীরও তাহাতে বোধ হয় কোন ও আপত্তি ছিলনা শুধু গৃহিণীর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই; ২।১টা উপদেশের কথা বলিয়া যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন বোধে সে যাত্রায় আর তাহা ঘটিয়া উঠিলনা। রান্নার খুব সুখ্যাতি করিয়া উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে তো কোন রকমে একটু নরম করলাম্ কিন্তু ঝি ঠাকুরাণী গম্ গম্ করে রেগে বলে চলে গেলেন যে তাঁর মাথা ধরেছে, সকালে আর তিনি আসতে পারবেন না। কালাচাঁদের প্রেমের আনন্দ একেবারে উবে গেল। পরদিন সমস্ত দিনটা অনাহারে কাটাতে হবে মনে করে প্রাণটা কেমন মাঝে মাঝে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠতে লাগ্‌লো। সে রাত্রিটা আর ভাল করে ঘুম হলোনা।

"ইন্দু-স্মৃতি" *

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম হইতে দেখেছি তোমায় বঙ্গ-ভারতী-সাধনা-মগ্ন
প্রতিভার জ্যোতি মনোময় ভাতি ফুটাইল ধীরে জীবন-লগ্ন ;
লোকলোচনের আড়ালে থাকিয়া রচিলে মায়ের পূজার অর্ঘ্য
স্নেহ প্রীতি দিয়ে তোষিলে তোমার প্রাণের দোসর অনুজবর্গ ;
দেবতা দেউল মানস করিয়া চলেছিনু মোরা কত না রঙ্গে,
কি যে আনন্দ উচ্ছল প্রাণে জাগিয়া উঠিত তোমার সঙ্গে !

গানই ভারতী-সাধনা-মন্ত্র গানই তোমার চরম লক্ষ্য
বন্দি' তোমায় হে গায়ক-কবি গানেই তোমার মিলেছে মোক্ষ !

গানে কবিতায় রঙ্গ ব্যঙ্গে তুমি যে করিলে পুলক সৃষ্টি
প্রাণে ভালবাসা দুর্দ্দম আশা নয়নে তোমার মধুর দৃষ্টি ;
তুমি যে ইন্দু ইন্দু-কিরণে স্নিগ্ধ করিলে সবার অঙ্গ
শিক্ষা, দীক্ষা, গানে অভিনয়ে লভিনু তোমার স্নেহের সঙ্গ ;
তব 'হিমালয়' ভুলিবার নয়, পাষাণে দেবতা মূর্ত্ত দেখি,
অনাচারী জনে করিলে আঘাত প্রাণের দহন জ্বালায় লেখি !

গানই ভারতী-সাধনা-মন্ত্র গানই তোমার চরম লক্ষ্য
বন্দি' তোমায় হে গায়ক-কবি, গানেই তোমার মিলেছে মোক্ষ !

উন্মুখ শত চল-চঞ্চল যৌবন-দল মাতালে প্রেমে
মূঢ়ের তর্কে মানি পরাজয়, বাড়ালে শক্তি অসীম ক্ষেমে ;

---

* আমাদের "ইন্দুদা", সাহিত্যক্ষেত্রের রসরচনার "শরদিন্দু"—"হিমালয়" সঙ্গীতের অমর কবি শরদিন্দু নাথ রায় আজ পৃথিবীর ধূলিম্লান আবেষ্টনীর বহু ঊর্দ্ধে। তিনি আজ নিন্দা প্রশংসা, শ্রদ্ধা অবহেলার বাহিরে—তিনি যে তাঁহার ইহ জীবনের অপ্রমেয় প্রেম-শক্তির বলে আমাদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমাদের সমস্ত হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। তাঁহার কথাবার্ত্তা, তাঁহার গান, তাঁহার অভিনয়, তাঁহার হাস, সবার উপর তাঁহার ব্যগ্র বাহুর স্নেহপাশ আজ যেন আমাদের অন্তরকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিতেছে। আজ আমরা কায়মনবাক্যে তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি। ওঁ শান্তি !

জ্ঞান-উন্মুখ পরাণে পাগল করিলে বর্ষি' অমিয় বাণী,
আপনা ভুলিয়া কাটাইলে দিন আপন জীবন ধন্য মানি,
পরের কর্ম্ম মাথায় তুলিয়া পরের দৈন্যে ভিখারী সাজি'
জীবনের ব্রত করি সমাপন মরণে অমরা লভিলে আজি !

গানই ভারতী-সাধনা-মন্ত্র গানই তোমার চরম লক্ষ্য,
বন্দি' তোমায় হে গায়ক কবি, গানেই তোমার মিলেছে মোক্ষ !

ইতিহাস *

[শ্রীবিশ্বমোহন সান্যাল]

মানব হৃদয়ে অসাম্য নাই। প্রত্যেক মানব একই শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আমরা পরস্পর এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। দার্শনিক তাঁহার তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন—ধার্ম্মিক তাঁহার অনুভূতির অনুধাবন করেন—সাধারণ তাঁহাদের ভাগ্য সংঘটিত বিষয়ের চিন্তা করেন, কিন্তু এই বিশ্ব-হৃদয়ের অনুভূতি যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিধাতা—আর সেই অনুভূতিই ইতিহাসের চরম ও পরম সত্য।

ইতিহাস এই বিশ্ব হৃদয়ের কার্য্যাবলীর বিবরণী মাত্র। ইতিহাসই মানবকে সুষ্ঠুতর-রূপে প্রকাশ করে। সৃষ্টির আদি হইতেই মানব-চিত্ত শান্ত-আগ্রহে সময়োপযোগী প্রবৃত্তি, চিন্তা ও ভাবার্জ্জনে উন্মুখ হইয়া উঠে। কিন্তু তার উৎপত্তি কার্য্য অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে—এবং ইতিহাসের কার্য্যাবলীও চিন্তারূপেই মানব হৃদয়ে অবস্থিত। প্রত্যেক স্বতন্ত্র চিন্তার আবশ্যকতা সময় বিশেষে অনুভূত হয়। একটি মাত্র বীজই বনানীর সৃষ্টির কারণ—একটি মাত্র মানবেই পৃথিবীর যাবতীয় জাতির সূচনা। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যুগ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতির প্রবর্ত্তন মানব চিত্তেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

ইতিহাস রচয়িতা মানব—তাঁহার পাঠকও মানব। রহস্যই রহস্যোদ্ভেদ্ করে। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গে বিভিন্ন যুগের একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে। বহু দূরস্থিত তারকা যেমন আমাদের চক্ষে আলোক প্রদান করে, বহুকাল গত অতীতও সেইরূপ বর্ত্তমানকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে। মানুষ মাত্রেই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। জনসংঘের কল্পনার ছায়াই ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখি—একটি মাত্র মানবের

* শান্তিপুর পূর্ণিমা সম্মিলনীতে পঠিত

দুর্দ্দশাই মানব জাতির দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্রোহের চিন্তা প্রথমে একটি মাত্র মানবের মনেই উদয় হয়; কিন্তু সেই চিন্তা যখন জনসংঘের মনে জাগিয়া উঠে, তখনই সেটী যুগবাণীর আকার ধারণ করে। আমার ভিতরের সহিত বাহিরের উপলব্ধি আমার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠে। ইংরাজকে বুঝিতে হইলে আমাদের ক্ষণেকের জন্ম ভুলিতে হইবে যে, আমরা বাঙালী—সম্রাটকে উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদের একথা মনে রাখিলে চলিবে না যে অমরা দীন হীন প্রজা—ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের ভিতরকার পাপচিন্তাকে নিমেষের জন্ম বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। নূতন রাজনীতি অথবা সমাজনীতি মাত্রেরই আমাদের হৃদয়ের সহিত একটি যোগ আছে—এবং সেই জন্মই তাহাদের উপকারিতাও আছে।

বিশ্বপ্রকৃতি ব্যক্তিবিশেষকে ও দ্রব্য বিশেষকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। যে জীবনে সেই মহিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা সত্য সত্যই অনন্ত রহস্যের ভাণ্ডার। আমরা তাহারই পার্শ্বে দণ্ড ও নীতির গণ্ডী টানিয়া দিই। প্রত্যেক নীতিই আবার সেই অনন্ত মহিমাকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা অধিকাংশ সময়েই কোন গ্রন্থকারের সহিত তুলনায় নিজেকে হীন কল্পনা করি না। বিশ্বের ইতিহাস, কবির কল্পনা, অথবা লেখকের কাহিনী যে অভিনব চিত্রের সৃষ্টি করে, তাহার মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য আমাদের আনন্দ দেয়—অভিভূত করে না। ইতিহাসের বিশিষ্টতায়—নূতনের প্রবর্ত্তনে—জাতির প্রবর্ত্তনে—জাতির উত্থান ও পতনে, আমাদের হৃদয়ের সহিত একটি সত্যকার যোগ আছে।

অবস্থা ও চরিত্রের সহিতও আমাদের মন বিশেষভাবে সংযুক্ত। ধনীকে সম্মান করায় এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আমরা সকলেই বাহ্য স্বাধীনতা, শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষী। প্রত্যেক সাহিত্যেই জ্ঞানবানের চরিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। পুস্তকরাশি, প্রস্তরলিপি ও চিত্রাবলীতে মানুষ নিজের প্রতিচ্ছবিই আঁকিয়া থাকে।

রাত্রের অন্ধকারে আমরা এতক্ষণ স্বপ্নের জাল বুনিলাম, এক্ষণে দেখা যাউক দিনের আলোকে তাহার রেখাপাত হয় কি না। ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। জীবনকে পুস্তক ও পুস্তককে তাহার টীকা স্বরূপ ব্যবহার করিলে তবেই ইতিহাস পাঠে সার্থকতা। যিনি বর্ত্তমানের মোহে অতীতকে ভুলিয়া যান, তাঁহার পক্ষে ইতিহাস পাঠ বিড়ম্বনা মাত্র।

পৃথিবী ব্যক্তি মাত্রেরই শিক্ষাগার। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগ ও প্রতি আচার ব্যবহারই আমাদের জীবনের সহিত কোন না কোন সূত্রে আবদ্ধ। আমাদের স্বতন্ত্র জীবনে এক একটি পূর্ণ ইতিহাসের অভিনয়ই আমরা দেখিতে পাই। সম্রাট বা সাম্রাজ্যের ভয়ে ভীত হইলে ঐতিহাসিকের চলিবে না—জাতি বর্ণের বিচার করিয়া একপার্শ্বে পড়িয়া থাকিলেও ইতিহাস পাঠ চলিবে না। ঐতিহাসিককে বিবাদ বৈষম্যের কথা ভুলিয়া সত্যের সন্ধানই করিতে হইবে। কবি ও ঐতিহাসিক যেখানে এক হইয়া যান, সেইখানেই ইতিহাস পাঠ সার্থক হইয়া উঠে। অন্তরের বাণী ও প্রকৃতির পরিচয়ই ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কোন ঘটনাকেই ঘটনা মাত্র বলিয়া তুচ্ছ

করা চলে না। প্রাচীন রোম, পুরাতন গ্রীস্ ও অতীত মিশর এক্ষণে উপাখ্যানের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই "নেপো-লিয়ান্" সর্ব্ববাদী-সম্মত উপাখ্যানকেই ইতি-হাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বদাই ইতিহাসের সত্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইতিহাস মাত্রেই মানুষকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে—অথবা প্রকৃত ইতিহাস ও জীবন চরিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আত্মানুভূতির জন্যই প্রত্যেককে ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে—তাহার সমালোচনা করিতে হইবে। অতীতের বক্ষে যে বাণী মুদ্রিত থাকে, তাহা আলোচনার অভাবেই নিরর্থক হইয়া উঠে। নতুবা যে বাণী অতীতের বুকে হর্ষকোলাহল জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা কি বর্ত্তমানের প্রাণে স্পন্দন মাত্র আনিয়া দিতে পারে না?

রাজ্যে যে নিয়মের প্রবর্ত্তন হয়, তাহা মানব প্রকৃতিকেই প্রকাশ করে—ইতিহাস সেই প্রকাশের সাহায্য করে। আমরা আমাদের ভিতরেই সকল কার্য্যের কারণ ও ফলাফল দেখিতে পাই। মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগে—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের বীরত্বে ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের মন্ত্রে আমরা আমাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাই। পুরাতনের অনুসন্ধানে ও প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্করণে ইহাই প্রমাণ হয় যে আমরা অতীত বীভৎসতাকে বর্ত্তমান সৌন্দ-র্য্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চাই ইহাতে অতীতের সহিত সৌহার্দ্দ্য বন্ধনের চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়—আমরা যে অতীতকে কত ভালবাসি, তাহাই প্রমাণ হয়।

তাজমহলের শিল্পচাতুর্য্য আমাদের হইলেও আমাদের নহে। উহা যে মানবের শিল্প-কলা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই মানব ও বর্ত্তমান মানবে অনেক প্রভেদ। কিন্তু সেই তাজমহলের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে আমরা যখন "সাহাজানকে" তাঁহার অনন্ত প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া প্রেয়সীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি—আর সেই প্রেমকে মূর্ত্তিরূপে শিল্পীর হাতে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখন আর পার্থক্যের কথা মনেই হয় না। পরন্তু এই কথাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিতে কোন সময়েই বিলম্ব হয় না। রুচির বৈষম্যই মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখে। কেহ বর্ণ ও আকৃতির আলোচনা করে—কেহ বা কার্য্য ও কারণের বিচার করিতে বসে। কবি, দার্শনিক, ও ধর্ম্মাত্মার কাছে পৃথিবী অনন্ত কার্য্যের ছন্দেই প্রকাশ পান। আমরা সাধারণতঃ কার্য্যের অনুসন্ধান অপেক্ষা, যিনি কার্য্য করেন—তাঁহার অনুসন্ধানেই ব্যস্ত।

প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টিলীলা দেখিয়াও আমরা কেন যে সামান্য ঘটনাকে চরম বলিয়া মনে করি, তাহা বলা দুরূহ। আকারের সমালোচনা অথবা সময়ের হিসাব যে আমরা কেন করি, কে তাহা বলিতে পারে? আমা-দের অন্তর পুরুষ এবং তাহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী প্রতিভা উহাদের কোন খবরই রাখে না। প্রতিভাবান্ পুরুষ প্রকাশের পূর্ব্বে বিশ্বমূর্ত্তির স্বরূপ জানিতে অতীতের গহ্বর অনুসন্ধান করেন—প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই অনাদি পুরুষের বিকাশই তিনি খুঁজিয়া বাহির করেন।

প্রকৃতিতে সাম্যের মধ্যেও অসাম্য রহিয়াছে। কবি যেমন একটি নীতিকে বিভিন্ন কথায় ফুটাইয়া তুলেন প্রকৃতিও সেই-রূপ একটি ইচ্ছাকে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ

করেন। ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন কার্য্যেও একই চরিত্রের স্ফুরণ দেখিতে পাই। জেনোফোন, হেরোডোটাস ও প্লুটার্ক লিখিত ইতিহাস হইতে আমরা গ্রীক্‌সভ্যতার একটি আভাষ পাই—তাঁহাদের সাহিত্য, কাব্য, নাটক ও দর্শনেও সেই সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই। অর্থাৎ, একটি মাত্র জাতির সভ্যতার আভাষ আমরা দুই বা ততোধিক উপায়ে দেখিতে পাই।

আকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও অনেক সময়ে একখানি মুখ অথবা একটি মানুষ যে আমাদের মুগ্ধ করে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। একখানি চিত্র অথবা একটি কবিতা যে সময়ে সময়ে আমাদের হৃদয়ে অননুভূত আনন্দের স্পন্দন আনিয়া দেয়, সে কথা অস্বীকার করিবে কে? প্রকৃতি কয়েকটি বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করিয়াই চলিয়াছে—সে সেই চিরপুরাতন সঙ্গীতেই নূতন সুর জুড়িয়া গাহিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীতে একের সহিত অন্যের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা প্রায়ই চমকিত হই। পূর্ণিমার শশধরকে দেখিয়া মানসী প্রতিমাকে মনে পড়িবার কথা কে না শুনিয়াছে?

•　　•　　•　　•

কোন চিত্রকর আমাকে বলিয়াছিলেন যে শিশুর বাহির দেখিয়া শিশুকে ফুটাইয়া তোলা যায় না। যে চিত্রটি আঁকিতে হইবে, তাহাতে আত্মহারা না হইলে সেটি ফুটিয়া উঠিতে পারে না। চিত্রকর নিজের চিত্রের মধ্যে যখন আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, তখনই তাঁহার শিল্প ধন্য—সাধনা সার্থক! সাধারণে মানুষকে কার্য্য হিসাবেই বিচার করে, কিন্তু বিজ্ঞেরা মানুষকে মানুষ হিসাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

ব্যক্তিগত ইতিহাস হইতেই রাজ্যের ইতিহাস, প্রকৃতির ইতিহাস ও সাহিত্যের উৎপত্তি। বিশ্বের সহিত সকল বিষয়েই আমাদের সম্বন্ধ আছে—অনু পরমাণু হইতে সেই বিরাট পুরুষের সহিত আমরা এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কবির অন্তর্জ্জগতই প্রকৃত কবিতা—শিল্পীই বিশ্বের প্রধান শিল্প। আমাদের বহির্জ্জগত অন্তর্‌জগতেরই বিকাশ মাত্র। যে কথা অথবা যে ঘটনা আমরা সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দিই, কালে তাহাই আমাদের নিকট অসামান্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঘন বন দেখিয়া আমার এক বন্ধুর মনে হইত যে, তাহারা যেন কিসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—অথবা সেই বন-লক্ষ্মীরা যেন পথিকের পদশব্দে সচাকিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কবির মুখেও আজকাল আমরা অনেক সময়ে ঐ ভাবের কথা শুনিতে পাই। চন্দ্রের অস্ত ও সূর্য্যের উদয় দেখিয়া মানব জীবনের কথাই কালিদাসের মনে পড়িয়াছিল—উত্থান ও পতনই যে এই পৃথিবীর বিচিত্র লীলা, সেই সত্যই কবির মনে জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক ঘটনাকে অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতে পারিলে তবেই ইতিহাসে সত্যের আভাষ পাওয়া যায়—জীবন-চরিতে মাধুর্য্যের আস্বাদ মিলে।

বৈদিক যুগের ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্প আমাদের জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক মানবের ভিতরেই এমন একটি শক্তি আছে যাহা বৈদিক, প্রাকৃতিক অথবা স্বাভাবিক। এক কথায় বলিতে গেলে বিভিন্ন যুগ মানুষের বিভিন্ন শক্তিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণ অথবা খৃষ্টের বাণীর সহিত আমাদের বাণীর কোন অনৈক্য নাই। মোট কথা, মানুষ ও প্রকৃতিকে লইয়াই ইতিহাস। একটি বাদ

দিয়া অপরটীর আলোচনা করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক্ষণে নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাস নীরস ঘটনার কাহিনী নয়। মানব জীবন ও প্রকৃতি যে অনন্ত রসের প্রস্রবণ; এ কথা কে না স্বীকার করিবে? বিভিন্ন যুগের কথা আমরা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। বৈদিকযুগ জীবনের বাল্যলীলার কথাই মনে করাইয়া দেয়—মনুর যুগ যৌবনের আরম্ভের কথাই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস ও উপাখ্যানের সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হই তখন কবির কল্পনা আমাদের নিকট আর অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাহার মধ্যে আমরা সত্যের আভাবই পাইয়া থাকি। চিন্তার ফলেই পুরাণ বর্ণিত উপাখ্যানগুলি এত সুন্দর—এত প্রাণস্পর্শী! মধ্যম পাণ্ডব ভীমের কাহিনীতে আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হয়। তাঁহার বীর্য্য ও কৌশল আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে—আমরা তাঁহার মধ্যে আদিম বীরত্বের মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হই। সীতা চরিত্রের মাধুর্য্য আমাদের মনকে সহজেই ছাইয়া ফেলে—বাল্মীকির সীতা যে আমাদেরই তপস্যার ফল, সে কথা স্বতঃই মনে হয়। বিশ্বপ্রকৃতি কবির হাতে ধরা দিয়া আমাদের সম্মুখে অপূর্ব্ব রহস্যে প্রকাশ পাইয়াছেন। সেই জন্যই কবিকে আমরা সময়ে সময়ে হেঁয়ালী বলিয়া মনে করি।

অন্তর্জগতের ইতিহাসের সহিত বহির্জগতের ইতিহাসও আমাদের আলোচনার যোগ্য। মানুষ অনন্ত কালেরই অংশস্বরূপ—প্রকৃতির সহিত ও তাহার নিকট সম্বন্ধ। বহুর সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই মানুষ এত শক্তিশালী। প্রকৃতির প্রত্যেক সুরের সহিত আমাদের সুরটি মিলাইতে পারিলে তবেই আমাদের জীবন ধন্য হইয়া উঠে। বুদ্ধিজ্ঞান আমাদের পরিণতি—আত্মীয়তায় আমাদের সার্থকতা! ভিতর বাহির মিলাইয়া আমরা আপন আপন পৃথিবী গড়িয়া তুলি—তাহাতেই আমাদের সার্থকতা।

আমি এ সম্বন্ধে অধিক আর বলিতে চাহি না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, আমাদের অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের একটি অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে—এবং সেই যোগের কথা মনে রাখিয়া তবে ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐতিহাসিক আত্মার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়নে অপূর্ব্ব সুষমা আনিয়া দিবে!

তোমার জাতির ইতিহাস সৃষ্টির ভার দেশ-দেবতা তোমার উপর দায় স্বরূপ অর্পন করিয়াছেন।

চীনার বৈশিষ্ট্য

সম্প্রতি ওয়াশিংটনের "জরনাল অব হেরেডিটি" পত্রিকায় শো ওআং নামে এক তরুণ লেখক লিখিয়াছেন, শরীরের ও মনের গঠনে চীনাদের মত সুস্থ সবল জাতি আর নাই। পুরুষানুক্রমেই যেমন তাহাদের বলিষ্ঠ শরীর, নৈতিক চরিত্রও তেমনি নির্দ্দোষ! চীনার রাষ্ট্র-ইতিহাসের মত এমন সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসও অপর কোন জাতির নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্প-কলায় চীনার মাথা খেলিয়াছে চিরদিন; এবং চীনারা শিল্প নানা দিক দিয়াও এমন বৈশিষ্ট্য জগতে চিরকাল দেখাইয়া আসিয়াছে, যাহা দেখিয়া বিশ্ববাসী মুক্ত হৃদয়ে তার তারিফ করিয়াছে।

অনেকে বলেন, চীনারা সভ্যতার হিসাবে অনেক ধাপ পিছাইয়া আছে। এ কথা সত্য প্রাচীন যুগে চীনা-সভ্যতা যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাহার তুলনায় মধ্যপথে সে গতির বেগ কমিয়া যায়—শুধু কমা নয়, গতি রুদ্ধও হইয়াছিল। এর কারণ চীনার ভৌগোলিক অবস্থান। প্রকৃতির নির্দ্দেশে চীনাকে সমস্ত জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন একা থাকিতে হইয়াছে বহুদিন; কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাত্য শক্তির সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে চীনারা চকিতে নিজেদের সামলাইয়া লইয়া অপর বিশ্ব-পথ-যাত্রীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছে।

চীনার নৈতিক চরিত্র অকলঙ্ক—এটা প্রবাদ-বাক্যের মতই দাঁড়াইয়াছে! চল্লিশ শতাব্দী ধরিয়া চীনা শান্তি ও শিল্প-কলারই পূজা করিয়া আসিয়াছে। বিচারে চীনা নিরপেক্ষ। চীনার পারিবারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, বন্ধুত্ব, আতিথ্য ও অমায়িকতা জগৎ-প্রসিদ্ধ। কয়জন মাত্র চীনা ইকাব বা ফোড়ের ব্যবহারে সমগ্র চীনা জাতির চরিত্রের বিষয় যদি কেহ ধারণা করিতে যান তবে তিনি ভুল করিবেন। তারা চীনাকুলের কলঙ্ক—সে সব চীনা গৃহহারা দেশছাড়া, সামাজিক জীবন বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই! তবুও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জে, হাওয়াই দ্বীপে চীনা ব্যবসাদারদের যাঁরা দেখিয়াছেন, তাঁরা এ কথা হলফ্ করিয়া বলিবেন যে, তাহা খুবই সজ্জন ও অমায়িক।

চীনে যে সব মিশনারী স্কুল আছে, তার অধ্যক্ষেরা বলেন, মানসিক উৎকর্ষে চীনা ছাত্র মার্কিন ছাত্রের অনুরূপ, কোন বিষয়ে তাহাদের চেয়ে এক তিল ছোট নয়। তারা বিশ্ব-সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ কলেজের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন—আমার চীনা ছাত্রেরা সকলের সেরা। বিজ্ঞানে চীনা আজো কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই সত্য, ইহার কারণ বৈজ্ঞানিক আব্-হাওয়ার অভাব। হোম্‌স্, পোশল্, জনশন, পোপিনোর মত মনীষী-বর্গও স্বীকার করিয়াছেন, মানসিক উৎকর্ষে চীনা কোন জাতির চেয়ে খাটো নয়।

আকারে খাট হইলেও চীনারা খুব

পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী, আর তাহাদের দেহে শক্তিও প্রচুর। তাহাদের সবল পেশী, স্বাস্থ্য ভালো—'পুঁয়ে বোগা চীন' বড় একটা দেখা যায় না। চীনার এই নৈতিক ও শারীরিক শক্তির কারণও লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

১। বহু উন্নত জাতির সংমিশ্রণে চীনার জন্ম।

২। জনবহুল দেশে আধি-ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী বলিয়া চীনারা কর্ম্মী সংযমী এবং পরের দিকে চাহিয়া চলে।

৩। চীনাদের মধ্যে প্রচলিত পূর্ব্ব পুরুষের পূজা, একান্নবর্ত্তিতা, বাল্য বিবাহ তাহাদিগকে স্বার্থপর হইতে দেয় না।

৪। কৃষিকার্য্য চীনার দেশে গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

—ভারতী

বাংলা দেশের মৃত্যু সংখ্যা

বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ১৯২১ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ,—এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে—

কলেরায়	মরিয়াছে	৭৩,৯৪৩ জন।
বসন্তে	„	৭,৮০৫ „
কালাজ্বরে	„	৯২৬ „
ম্যালেরিয়ায়	„	৭,৩৭,৩২৩ „
সর্ব্ববিধ জ্বরে	„	১০,৪৬,৬৬১ „
আমাশয়ে	„	১৩,৭৪৮ „
ইনফ্লুয়েঞ্জার	„	২,৮০৯ „
নিউমোনিয়ায়	„	৫,৭৬১ „
যক্ষ্মায়	„	১,'৯৪ „

সমগ্র পল্লীগ্রামসমূহে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১৯২১ সালে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন:—বৎসর বৎসর যদি এইরূপ ভাবেই ইহাদের উপর রোগের আক্রমন হইতে থাকে তাহা হইলে পল্লীগ্রাম সমূহের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন যে অচিরেই অবশ্যম্ভাবী ইহা দূরদর্শী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বিলাতী কাপড়ের আমদানী

গত ১৯২০—২১ সালে বিদেশ হইতে কিঞ্চিদধিক একশত দুই কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছিল। উহার পরবর্ষে অর্থাৎ ১৯২১-২২ সালের প্রায় ৫৭ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হইয়াছিল। গত বৎসরে অর্থাৎ ১৯২২-২৩ সালে কিঞ্চিদধিক ৭০ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে। বলা বাহুল্য উক্ত বস্ত্র সমস্তই প্রায় বিলাতী। এই তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে ১৯২১-২২ সাল হইতে গত বৎসরে প্রায় ১৩ কোটি টাকার বিলাতী বস্ত্র অধিক আমদানি হইয়াছে। আমদানির হিসাব ধরিয়া দেখিতে গেলে আমাদের দেশে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলন যে গত বৎসরের তৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রপ্তানি হিসাবেও ১৯২১ ২২ সালে কিঞ্চিদধিক সাড়ে ১৫ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্রাদি ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। গত বৎসর প্রায় ১৩ কোটী টাকার বস্ত্রজাত রপ্তানি হইয়াছে। ইহাতেও মোটের উপর প্রায় আড়াই কোটি টাকার কম দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

—সম্মিলনী
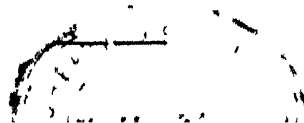
"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ-পসরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৮শ বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩০ { ১২শ সংখ্যা

রথযাত্রা

[স্বামী প্রদীপ্তানন্দ]

বাজারে শাঁখ বাজা কাঁসর তূর্য্যনিনাদ কর
জগন্নাথের রথ এসেছে আজকে ধরার পর।
ধূপের গন্ধে মাতুক হাওয়া, ফুলের বহুক বৃষ্টি
হাজার কণ্ঠের "জয় জগন্নাথ" ভাঙ্গুক সারা সৃষ্টি।

বৈকুণ্ঠ আজ নীরস লাগে পাগল হ'ল মন
শ্যামল বরণ একটি ভূমির তরে অনুক্ষণ ;
শৃঙ্খলেতে শক্ত বাঁধা ক'টি ভক্তপ্রাণ
ভাঙ্গা কুঁড়ের আঙ্গিনাতে কিসের গাহে গান ?

জোরে আরো চলরে জোরে আষাঢ় মেঘের রথ,
ঘর্ঘরিত চক্রধ্বনি পুরুক আকাশ পথ,
অভ্রভেদী ধ্বজায় শত বিদ্যুতেরি মেলা
দুধারে জল কলকলিয়ে করছে কি এক খেলা!

চূর্ণ মেঘের রথের ধূলী ভরল দিকের রেখা
পাগল হয়ে ছোটরে সবাই হয় কি না হয় দেখা ;
ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো ধররে রথের ডোর
পুণ্যবান তুই সরে দাঁড়া আয়রে পাপী, চোর !

ধর্ম্ম ওদের দ্বারে বাঁধা ওরা পুণ্যবান
ক্ষুধায় মরে পুত্রকন্যা সইতে নারে প্রাণ ;
তিলে তিলে এগোয় সে যম, আমরা থাকি বেঁচে
কর্চ্চি চুরি, জোগাতে ভাত জেলকে আনি যেচে !

দেশ বিদেশে কীর্ত্তি রটে ওরা পুণ্যবাণ,
মোদের দুঃখে কাঁদে সে কোন পাষাণ দেবের প্রাণ !
টানছি ঘানি ভাঙ্গছি খোযা সেলাই করি থলে
কোথায় সে সব বামন ঠাকুর স্বর্গে দিত তুলে ?

তোদের তরে কেঁদেছেরে ভাই স্বয়ং জগন্নাথ
আযরে ছুটে টানরে দড়ী রাখরে অশ্রুপাত।
পাপীর জন্যে আকুল প্রাণে স্বয়ং ভগবান
মুক্তি-পুরীর দুয়ার খুলে করতে আসে ত্রাণ।

সর্পিত ঐ জনধারা মত্ত হয়ে ছোটে,
আকুল হয়ে ভক্ত শত পথের ধূলায় লোটে,
ধন্য যে আজ স্পর্শ করে ঐ রথেরি ডোর
চাকার নীচে ঘুমোয় যে তার বৈকুণ্ঠে হয় ভোর !

সৃষ্টি জুড়ে এমনি চাকা ঘুরছে অনিমিখ
সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বী ঘোরে ঘোরে চতুর্দ্দিক
নীহারিকার পথে পথে কোন দিকে রথ চলে,
অমৃত কি জাগেন লেখা মুক্তি দিব বলে' ?

আন্তরীর পূর্ণ বিকাশ

[শ্রীমহামায়া দেবী]

নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে—এ কথা সকলেই জানেন, এবং সত্যই তাই। নারীর বাল্য যৌবনের সফলতা তখনই যখন সে সন্তানের জননী হয়। এ কথা শুনে কেউ যেন চমকাবেন না যে আমি নারীকে একমাত্র সন্তান প্রসবিনী-রূপেই গণ্য করে থাকি। কিন্তু মাতৃত্বেই যে নারীর জীবনের চরম সফলতা ও গৌরব, এ কথা আমি সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করি। কিন্তু আমি স্বীকার করিনা নারীর সে মাতৃত্ব যে মাতৃত্ব সংখ্যাহীন মেষ-মূষিক প্রসব করে' ধরিত্রীকে অযথা ভারগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ-মড়কের আকর ক'রে তোলে। ভগবান নারীকে এমন মেষ-মূষিকের মাতৃত্ব হ'তে রক্ষা করুন।

নারী মা, সন্তানের জীবন-গঠন-কারিণী। সন্তান মায়ের বিকাশ, মা সন্তানের প্রকাশিকা। সন্তান যদি মার অবাধ্য বা অত্যাচারী হয় তবে সন্তান ততখানি অপরাধী নয় যতখানি অপরাধী মা। এ হ'চ্ছে স্নেহের আঁচল ঢাকা দিয়ে গৃহ কোণে সন্তান লালন পালন করার বিষময় ফল। যে সন্তান আজীবন দেখে এসেছে স্নেহ-কাতর দুর্ব্বল-চিত্ত মা তার কেবল মাত্র সন্তানের দীর্ঘ-জীবন ও দাসত্বে অর্থ উপার্জ্জনের কামনা ছাড়া আর কোনও কামনা অন্তরে স্থান দেয়নি; যে সন্তান আজীবন দেখে এসেছে তার মা পরদুঃখ বিমুখ এবং সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায় কোন দিন কারও উপকারার্থে সন্তানকে উপদেশ দেয়নি, উপরন্তু সন্তানের মঙ্গল-কামনায় শত শত জীব হত্যা, ছাগ শিশু বলি, এমন কি শ্মশান জাগিয়ে অন্য মায়ের কোল শূন্য করতেও ইতস্ততঃ করেনি; যে সন্তান আজীবন দেখে এসেছে মাতার স্নেহের আড়ালে কতখানি স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে, অর্থলোলুপতায় তার মা কি না করতে পারে, বিবাদে ও গৃহবিচ্ছেদে তার মা কতখানি দক্ষ,—এমন ভাবে সন্তানের কাছে যে মা পরিচয় দিয়ে এসেছে, সে মা সন্তানের কাছে কত আর বেশী আশা করতে পারে? সে সন্তান মা পরিচয়ে মা বলে' মাকে কখনও পায়নি, পেয়েছে মাত্র মহাজন হিসাবে; তাই সে ও মাকে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করে দিয়েই খালাস—এই ভাবে মাতৃঋণ শোধের বন্দোবস্তই তার চরম কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন। যে সন্তান তাও দিতে কুণ্ঠিত সে মাকে বলেই নিশ্চিত যে তার জন্য তাঁর কিছু করবার কোন প্রয়োজন ছিলনা। ব্যাস্, এই খানেই মা ও সন্তানের সম্বন্ধের পরিণতি। ধিক্ এমন মাতৃত্বে!

ওগো ভারতের মায়েরা! তোমরা মায়ের আসন কবে ফিরে অধিকার করবে? কবে তোমরা মা বলে সন্তানের কাছে পরিচয়

দেবে? কবে অমিত বিক্রমে বুক ফুলিয়ে গৌরবের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বল্‌বে—"আমি মেষ মুষিকের মা নই, আমি ভীরু কাপুরুষের মা নই,—আমি ভণ্ড বিড়াল তপস্বীর মা নই; মা সিংহীর মা, আমি বীরের মা, আমি মহাপুরুষের মা!" এতবড় সাহস কবে তোমাদের বুকে আসবে এতবড় সত্যকে কবে তোমরা মূর্ত্ত করে তুল্‌বে?

জাননা কি সন্তান বর্দ্ধিত হয় তোমারই গর্ভে, তোমারই বুকের দুধ খেয়ে, তোমারই কোলে শুয়ে? সন্তানের ভাল-মন্দের দায়ী যে তুমি!

যিনি মা তিনি কেমন হ'বেন? মা এক দিকে যেমন স্নেহে কোমল হবেন, অন্যদিকে তাঁকে তেমনি কর্ত্তব্যে কঠোর হ'তে হবে। মা কিংবা সন্তান উভয়ের মধ্যে যিনি মনে করেন যে মায়ের স্বভাব কেবলি স্নেহ-কোমলতা মাখা তিনি খুব বড় রকমই ভুল করেন। যে মা মনে করেন সন্তানকে স্নেহের আঁচল ঢাকা দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেবেন, সে মা সন্তানের শুভদায়িনী নহেন, সন্তান ঘাতিনী! যে অন্ধ মাতৃস্নেহ সন্তানকে ভীরু করে স্বার্থপর করে' জড় পঙ্গু অলস করে, সে মাতৃস্নেহ কি স্নেহ?—না তিনি মা? সেই মা, সেই মাতৃস্নেহ, যা' সন্তানের বুকে অযুত সিংহের বল প্রদান করে, বিশ্বের হিতার্থে জীবনদানে অগ্রসর করিয়ে দেয়। কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বুকে ধরে সন্তান লালন পালন তারা করে না। সন্তানকে স্নেহ করাই মার কর্ত্তব্য নয় মার কর্ত্তব্য সন্তানকে মানুষ করা। কিন্তু মানুষ করবে কে? যার অন্তর স্নেহ ভালবাসায় ভরা সেই। স্নেহ ভালবাসা যা'র নাই সে কখনও মানুষ করতে পারে না। এমন অনেক সময় আসে যখন মাকে অলক্ষে স্নেহের ধারা লুকিয়ে—সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাকে কঠোরতম আঘাত দিতে, রূঢ় কর্কশ কথা বলতে হয়। তখন মার স্নেহটা সুখদায়ক হয় না মাকে তখন কঠোরমূর্ত্তি ধরতেই হয়। কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য ঐ যে মায়ের পাষাণ মূর্ত্তি, ওমূর্ত্তি সন্তানস্নেহ বর্জ্জিত তা মনে করা একান্ত অন্যায়। স্নেহের প্রেরণাতেই মা সন্তানের মঙ্গলান্বেষণ করে থাকেন। মায়ের সে কঠোর মূর্ত্তি সন্তানের ভীতিপ্রদ নয়, শুভদায়ক। সুতরাং মায়ের সেমূর্ত্তি, স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিরই প্রতিচ্ছায়া।

গোঁড়ার কথা হচ্ছে, উপযুক্ত জননী না হলে উপযুক্ত সন্তান হবে না এবং উপযুক্ত সন্তান নাহলে দেশ বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের বাঙ্গলার মায়েরা অতি স্নেহশীলা। 'অতি' জিনিষটা যে চিরদিনই খারাপ, সেকথা বলাই বাহুল্য। সেই যে শিশুকাল হতে সন্তানকে স্বাধীন ভাবে খেলতে বেড়াতে না দিয়ে, জননীরা জুজুর ভয় দেখিয়ে, ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন সে মোহনিদ্রার হাত হতে ছেলেরা কি আজ পর্য্যন্তও নিস্তার পেলে না? চোখ খুলতেই ছেলেরা জুজুর ভয়েই অস্থির। আর জননীরা ও স্নেহাধিক্যে এত কাতর, যে সন্তানের পদমাত্র অগ্রসরে আতঙ্কে সারা, পাছে ছেলের কিছু অমঙ্গল হয়। ছেলে পঙ্গু, রুগ্ন শ্রীহীন হউক, তাতে কিছু যায় আসে না। মায়ের প্রাণে তা সইবেই, ছেলে বেঁচে থাকলেই হল; তবু কিন্তু মুক্ত বায়ুতে ছেলেকে খেলতে দেবে না পাছে অপদেবতার হাওয়া ছেলের গায় লাগে। এমনি শঙ্কা কাতর মায়ের মন দিয়ে ছেলে মানুষ সম্ভবে না।

নারীকে মা হতে হবে, মাতৃত্বের দাবী নিয়ে আজীবন সন্তানের বুকে শক্তি সঞ্চার করে, তাকে শক্তিমান করতে হবে। সন্তানকে শিশুকাল পার করিয়ে দিলেই মায়ের খালাস নাই। মার দেহান্তে তাঁর শক্তি, তাঁর শুভেচ্ছা, সন্তানের জীবন সংগ্রামে সঙ্গী হয়ে থাকবে।

অগ্নি-পরীক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার]

মাত্র গত কল্য হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তারের একখানি চিঠি পেয়েছি—তিনি পুনরায় আমাকে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। এর মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে—সে হাঁসপাতাল হ'তে চলে যাবার অনুমতি পেয়েছে। এখান হ'তে ছাড়া পেয়ে সে ইংলণ্ডে যাবে এরূপ অভিপ্রায় জানিয়েছে। প্রধান চিকিৎসক এই জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আর তাকে হাঁসপাতালে আট্‌কে রাখা চলে না—সুতরাং প্রধান ডাক্তার আমার হাতে তার ভার অর্পণ করতে চান।

এবার গিয়ে দেখলাম—রোগী যেন বিমর্ষ। সে কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে চায় না। সে বল্লে—"তাকে খুঁজে বা'র ক'রতে পারলেন না? সুখের কথায় কি সে সেরুবে? তার জন্যে একটু চেষ্টা ক'রতে হ'তো। কিন্তু আমার উপকারের জন্যে কে সে চেষ্টা ক'রছে! আমি তাকে ব'ললাম—"ইংল্যাণ্ডে যাবার খরচ আছে তো?" তার উত্তরে সে জানা'ল যে তার দুঃখের অবস্থা শুনে সেখানকার ইংরাজ অধিবাসীরা চাঁদা তুলে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছেন। তার পর আমি জানতে চাইলাম ইংলণ্ডে তার কোন বন্ধুবান্ধব আছে কিনা। উত্তরে রোগী বল্‌লো—"ইংল্যাণ্ডে আমার একটি মাত্র বন্ধু আছেন—কিন্তু তিনি একাই একশো। তাঁর নাম হচ্ছে—মাননীয়া জ্যানেট রয়।" এ কথা শুনে আমার যে কি বিস্ময় হ'ল তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পার। আমি আর তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম না—না হ'লে ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞাসা করি, কেমন ক'রে তোমার মাসিমার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। কিন্তু আমার প্রশ্নে সে বিরক্ত হ'য়ে উঠছিল। সুতরাং একটু চিন্তার পর স্থির করলাম যে যখন সে লণ্ডনে যাবে তখন তোমাকে একখানি চিঠি দিলেই তার পরম উপকার সাধন করা হবে। আমি তোমার সদয় স্বভাবের কথা জানি—আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে তোমার কাছে গেলে তুমি এই দুঃখিনীর যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তুমি তার মুখ হ'তে সব কথা শুনতে পাবে—আর তুমি ঠিক বুঝতে পারবে তোমার মাসিমার দয়ার উপর এর প্রকৃতই কোন অধিকার আছে কি না। আর একটি সংবাদ দিয়েই আমি এ সুদীর্ঘ পত্রের উপসংহার করবো—এ সংবাদটী কাজে লাগতে পারে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রথম বার রোগীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি তার নামের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করি নি। এই দ্বিতীয় বারে কিন্তু আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করব স্থির করলাম।"

এই কথাগুলি পড়িবার সময় জুলিয়ান দেখিল তাহার মাসিমা ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যানেট নিজেই চিঠির শেষ

অংশ পড়িতে চান। জুলিয়ান চিঠির শেষ অংশ হাত দিয়া চাপিয়া ফেলিল।

জ্যানেট বলিলেন—"তুমি এ রকম ক'রচ্ছে কেন?"

জুলিয়ান বলিল—"তুমি নিজে চিঠির শেষ অংশ টুকু পড়তে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পড়বার আগে আমি তোমাকে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা সম্বন্ধে প্রস্তুত ক'রে নিতে চাই। তুমি একটু স্থির হও—আমি ধীরে ধীরে শেষ অংশটুকু পড়ে যাই। শেষের দুইটী কথা তুমি নিজেই পড়বে।"

জুলিয়ান শেষ অংশ পড়িল—

আমি স্ত্রীলোকটীর দিকে তীব্র দৃষ্টি রেখে ব'ললাম—"তুমি বারম্বার ব'লেছ পোষাকের উপরে যে নাম লেখা আছে—সে তোমার নাম নয়। আচ্ছা তুমি যদি মার্সি মেরিক্ নও, তুমি কে?"

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমার নাম"—

জুলিয়ান চিঠি হইতে হাত উঠাইয়া লইল। জ্যানেট পরবর্ত্তী দুইটী কথা পড়িয়াই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হোরেস বিদ্যুদ্বেগে চেয়ার ছাড়িয়া বলিল—"তোমাদের দুজনের মধ্যে যে হোক্ আমাকে শীঘ্র বল সেই স্ত্রীলোকটী নিজের কি নাম বলেছিল?"

জুলিয়ান বলিল—"গ্রেস্ রোজবেরি"

১০ম পরিচ্ছেদ।

তিনের মন্ত্রণা।

হোরেস কএক মুহূর্ত্তের জন্ম স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বিস্ময়ের মাত্রা কিছু কমিলে সে জুলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এটা কি পরিহাস না কি? তাই যদি হয়, তবে আমি তো এ পরিহাসের মাধুর্য্য উপভোগ ক'রতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

জুলিয়ান সেই সুদীর্ঘ পত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"যে লোক এত বড় পত্র লেখে সে কখনই পরিহাস করবার জন্যে লেখেনা। সত্যিই স্ত্রীলোকটী আপনার নাম "রোজবেরি" ব'লেছিল। ম্যানহিম্ ছেড়ে সে সত্যি সত্যিই মাসিমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড যাত্রা ক'রেছিল।" তারপর জুলিয়ান মাসিমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"যখন আমার কাছে তুমি রোজবেরির নাম উল্লেখ ক'রেছিলে তখন আমাকে চ'ম্‌কে উঠতে দেখেছিলে; এখন বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ কেন আমি চ'ম্‌কে উঠেছিলাম।" তারপর সে হোরেস্‌কে বলিল—"তোমাকে আমি ব'লেছিলাম যে মাসিমার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার সময় তোমার সেখানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক—কারণ তুমি রোজবেরীর ভাবী পতি মনোনীত হ'য়েছ। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ কেন আমি সে কথা ব'লেছিলাম।"

জ্যানেট্ বলিলেন—"সে স্ত্রীলোকটী নিঃসন্দেহই পাগল। কিন্তু এ পাগলামিটা খুব বিস্ময়কর বটে! যাই হোক্ এখন এ ব্যাপারটা কিছুতেই গ্রেস্‌কে শুনতে দেওয়া হ'বে না।"

হোরেস্ বলিল—"অবশ্যই না। তার শরীর এখন অত্যন্ত খারাপ। আর চাকরদেরও আগে হ'তে সাবধান ক'রে রাখতে হবে—কি জানি যদি সেই পাগল স্ত্রীলোক অথবা প্রতারিকা হঠাৎ এই বাড়ীতেই এসে হাজির হয়।"

জ্যানেট বলিলেন—"হ্যাঁ, এখনই সে ব্যবস্থা ক'রতে হবে। জুলিয়ান ঘণ্টাটা বাজাও তো।—জুলিয়ান, তুমি তোমার পত্রে লিখেছিলে এই স্ত্রীলোকটীর জন্যে তোমার

সহানুভূতির উদ্রেক হ'য়েছে—এই কথাতে এখন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হচ্ছি।"

জুলিয়ান ঘণ্টা না বাজাইয়া বলিল—"কিন্তু এখন আমার সহানুভূতি আরও বেড়ে উঠেছে—কারণ এই স্ত্রীলোক এখন এই বাড়ীতে আপনার অতিথি।"

জ্যানেট্ বলিলেন—"জুলিয়ান, ছেলেবেলা হ'তেই তুমি বড় একগুঁয়ে। এখনও দেখছি তোমার সে দোষ পূরো মাত্রায় বর্ত্তমান। তুমি ঘণ্টা বাজাচ্ছ না যে?"

জুলিয়ান বলিল—"আসিমা, একটী কারণে বাজাই নি; সে কারণটী হ'চ্ছে এই—আমি চাই না যে তুমি তোমার চাকরকে ডেকে বল যে এই অসহায়া স্ত্রীলোকটীকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিও না।"

জ্যানেট্ জুলিয়ানের দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ—তুমি আমার বাড়ীতে এসে বেজায় সর্দ্দারি সুরু ক'রেছ দেখছি। তারপর তিনি বলিলেন—"তুমি অবশ্যই আশা কর না যে এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রবো?"

জুলিয়ান বলিল—"আমি আশা করি যে তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হবে না। যখন স্ত্রীলোকটী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন আমি বাসায় ছিলাম না। তার কি ব'লবার আছে সে কথা আমাকে শুনতেই হবে; আমার ইচ্ছা যে তোমার সম্মুখে আমি তার বক্তব্য শুনি। যখন তোমার চিঠি পেয়ে জানলাম যে সেই স্ত্রীলোককে তোমার কাছে হাজির করতে তুমি আমাকে অনুমতি দিয়েছ, তখন আমি তদ্দণ্ডেই তাকে চিঠি লিখলাম। তাতে লিখলাম—এই খানে আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

জ্যানেট বিরক্তির স্বরে উত্তর করিলেন—"বটে! তা'হলে কখন্ সেই মাননীয়া মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটবে?"

জুলিয়ান ধীর ভাবে বলিল—"আজই"।

"আজই? কখন্?"

জুলিয়ান ধীর ভাবে পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল—"স্ত্রীলোকটীর আসতে ১০ মিনিট দেরী হয়ে গেছে দেখছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটী চাকর এক খানি 'কার্ড' আনিয়া জুলিয়ানের হস্তে দিয়া বলিল—"একটী স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

জুলিয়ান কার্ডখানি জ্যানেটের হস্তে দিয়া বলিল—"এই দেখুন সেই স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

জ্যানেট বিরক্তির সহিত কার্ডখানি জুলিয়ানের দিকে ছুড়িয়া ফেলিলেন। "মিস্ রোজবেরী।' কি স্পর্দ্ধা! কার্ডে আবার 'রোজবেরি' নাম ছাপান হ'য়েছে! জুলিয়ান, আমারও সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। আমি কিছুতেই এ স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করব না।"

ভৃত্যটী কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। জুলিয়ান সে আদেশ দিল—

"জেম্‌স্, সে স্ত্রীলোকটী কোথায়?"

"খাবার ঘরে, হুজুর।"

"আচ্ছা, সেই খানেই থাকতে বল। তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আবার তোমায় ডাকলে এসো।" ভৃত্য বাহির হইয়া গেল।

জুলিয়ান মাসীমাকে বলিল—"তোমার সম্মুখে তোমার চাকরকে হুকুম করলাম, সে জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি চাই না, যে তুমি সহসা বিবেচনা না করে' একটা হুকুম দিয়ে ব'সো। স্ত্রীলোকটীর বক্তব্য আমাদের শোনা উচিত।"

হোরেস্ বলিল—"তার কথা শুনতে যাওয়া তো গ্রেস্‌কে অপমানিত করা বই আর কিছুই নয়।"

জ্যানেট বলিলেন—"নিশ্চয়ই। আমারও তাই মত।"

জুলিয়ান হোরেসকে বলিল—"মিস্ গ্রেসের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সেটা তুমি ভুল বুঝছ।" মাসীমাকে বলিল—"কন্‌সলের চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে স্ত্রীলোকটার সম্বন্ধে ম্যানহিমের ডাক্তারদের বিভিন্ন মত। কেউ কেউ বলেছেন—শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে তার মনের সুস্থতা ফিরে আসে নি।"

জ্যানেট বলিলেন "অর্থাৎ কি না, একটা পাগল মেয়ে মানুষ আমার বাড়ীতে এসেছে। আর আমাকে সেই পাগলের সঙ্গে দেখা করতে হবে? কেমন তাই না?"

"কোন ব্যাপারকে মিছিমিছি বাড়িয়ে দেখায় লাভ কি বল? কন্‌সাল এ কথা তো বলেছেন—তাকে দেখলে বেশ প্রকৃতিস্থ ব'লেই মনে হয়। কিন্তু সত্যিই যদি স্ত্রীলোকটী কোন মানসিক বিকারগ্রস্তই হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সে কি অনুকম্পার পাত্রী নয়?—তা হ'লে তার যথোচিত ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। মাসিমা তুমি তোমার হৃদয়কেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না—কোনরূপ অনুসন্ধান না নিয়ে এই অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্ধুহীন অবস্থায় এই পৃথিবীতে ভেসে ভেসে বেড়াতে দেওয়া কি নিষ্ঠুরতা নয়?"

জ্যানেট বুঝিলেন—এ কথা ন্যায্যও বটে এবং মনুষ্যত্বের পরিচায়কও বটে। তখন তিনি বলিলেন—

"জুলিয়ান, তোমার এ কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। হোরেস্, তুমিও কি তাই মনে কর না?"

হোরেস্ বলিল—"না, আমি তা মনে করি না।"

জুলিয়ান বলিল—"মাসিমা, আমাদের তিন জনেরই উচিত এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করা। আর এই কি তার প্রকৃষ্ট সুযোগ নয়? রোজবেরি এখন এ বাড়ীতে নেই। আমরা যদি এ সুযোগ চ'লে যেতে দিই, তা হ'লে কে বল্‌তে পারে যে কিছু দিন পরে এ বিষয়ে বিষম গোলযোগ ঘটে উঠবে না?"

জ্যানেট আর কিছু বিবেচনা না করিয়া বলিলেন—"জুলিয়ান, সে স্ত্রীলোক এখুনই আসুক। এখ্‌খুনি—গ্রেসের ফিরে আসবার আগেই। এইবার ঘণ্টাটা বাজাবে কি?"

এইবার জুলিয়ান ঘণ্টা বাজাইল। ভৃত্য গৃহে আসিল। জুলিয়ান বলিল—"মাসিমা, চাকরকে আমি কি হুকুম দেব?"

"তোমার যা ইচ্ছা তাই দাও। ফলকথা শীঘ্র এ ব্যাপার শেষ ক'রে ফেল।"

ভৃত্য স্ত্রীলোককে আনিবার হুকুম লইয়া গৃহত্যাগ করিল।

হোরেস্ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে চলিল।

জ্যানেট বলিলেন—"হোরেস্, চ'লে যাচ্ছ নাকি?"

"আমার এখানে থাকার কোন আবশ্যকতা দেখছি না তো।"

"তা হ'লে, এই ঘরে তোমাকে থাকতেই হবে—কারণ আমি চাই যে তুমি থাক।"

"অবশ্য আপনি চাইলে আমাকে থাক্‌তেই হবে। তবে এ কথা বলে রাখি—আমার বন্ধুর মতের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার মতে এই স্ত্রীলোকটার আমাদের উপর কোন দাবী দাওয়া নেই।"

জুলিয়ানের এই প্রথম একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে তীব্রস্বরে বলিল—"হোরেস্, এত কঠোর হ'তে নেই। সকল স্ত্রীলোকেরই আমাদের উপর দাবী আছে।"

এমন সময় দরজার দিকে একটি শব্দ শ্রুত হইল—কে যেন সেটী খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিল। একই সময়ে তিন জনেরই দৃষ্টি যে দিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। (ক্রমশঃ)

নবজীবন

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী]

(১)

স্বেচ্ছাসেবকের দল যখন স্বদেশী প্রচার কার্য্যে জীবন পণ করিয়া কার্য্যে নামিয়া পড়িল, তখন সে ঢেউ গ্রামেও গিয়া পৌছিল। শান্ত গ্রামবাসী মাথা নাড়িল—এ সব কি ছেলে খেলা হইতেছে। সহরের লোক গুলা কেবল হুজুগ চায়, নিত্য নূতন তার দরকার।

নায়েব শ্রীকান্ত বাবু একেবারে আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "নাঃ, এসব কাজের প্রশ্রয় দেওয়াই মহা পাপ। সহরের ছোকরাগুলো যেন এক একটা গোঁয়ার। আগে হতেই দেখে আসছি তাদের ভাব, আজ আর নতন করে দেখব কি? সেকালের ছোকরা গুলো ছিল বটে, একবার তারা মাথাটি তুলে দাঁড়াতে পারত না সামনে, আর আজ কালকার ছোকরাগুলো বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে চুরুট টানতে টানতে পাশ ঘেঁসে চলে যায়। এদের রক্ত সদাই গরম হয়েই আছে, তাতে একটু কিছু ঘটলেই ফুটে ওঠে টগবগ করে। এই না বছর কত আগে এমনি একটা ঢেউ উঠেছিল সারা বাংলা জুড়ে, আবার সবই জুড়িয়ে গেল, মরল কেবল কয়টা ছোঁড়া। এবারও হবে তেমনি, তার বেশী আর কিছু হচ্ছে না।"

স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত মৃন্ময় প্রতিবাদ করিয়া বলিল "এবারও যে তেমনি হবে তা আপনাকে কে বললে?"

শ্রীকান্ত রায় ঘৃণার সুরে বলিলেন 'ওহে ছোকরা, আমার বয়েস ঢের হয়েছে, পঞ্চাশ উত্তরে গেছে, তা বোধ হয় জানো। অনেক দেখেছি শুনেছি আমি, তোমাদের মত তরুণ ছোকরার চেয়ে বুঝিবার শক্তি আমার ঢের আছে। আমি দেখছি কত হচ্ছে কত যাচ্ছে কোনটাই ঠিক থাকতে পারছে না। বছর কত আগে যে স্বদেশী হাঙ্গামাটা হল তাতেও না এই সব কথা উঠেছিল? বিলেতী পরব না, বিলেতী ছোঁব না, এমনি প্রতিজ্ঞা না কত লোক করেছিল? কই একটা কথাও তো টিকতে পারে নি। তখন যারা মস্ত স্বদেশ হিতৈষি নামে পরিচয় দিইছিলেন, তাঁদেরই আজ একবার দেখে এস, পরে কথা বল। সেই ঢেউটাই আবার এসেছে বই তো নয়, এর একটাও টিঁকছে না।"

মৃন্ময় ক্ষুব্ধস্বরে বলিল "কিন্তু তখন তো আমরা যথার্থ ত্যাগীর মহান আদর্শ সামনে পাইনি। তখনকার কথা আর এখনকার কথা আলাদা। সামান্য কয়টা বোমা প্রভৃতি নিয়ে দেশহিতৈষিরা এগিয়েছিল। কিন্তু জানেন কি—যেখানে মূলেই ন্যস্ত হিংসা বৃত্তি সেখানে সবাই ব্যর্থ হয়ে যায়? আজ সে দিনের সঙ্গে এ দিনের মিলিয়ে দেখুন এর মূলে ন্যস্ত কি? আমরা হিংসাদ্বারা স্বরাজ চাইনে, আমরা ইংরাজের একটী চুল পর্য্যন্ত কাঁপতে দেবনা, তাদের বন্ধু বলে মনে করব, রাজা বলে অভিবাদন করব। আমরা ব্রত নিয়েছি অহিংসার, আমাদের পিঠে বেত্রাঘাত, আমরা কারাগারে গেছি তবু বলতে পারেন কেউ তার ব্রত ত্যাগ করেছে?

আমাদের সামনে গুরুর মহান্ আদর্শ, আমরা ত্যাগ করেই যাব, লাভ করতে চাইনে। দেশ যদি এই মহান আদর্শ সামনে রেখে এই ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গুরু প্রদর্শিত পথে চলে, দেখতে পাবেন আমাদের সাধনা যথার্থ সাধন হয় কি না।"

শ্রীকান্ত বাবু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "রাখ তোমার গুরু আর রাখ তোমার ত্যাগ। চরকা দিয়ে তোমরা স্বরাজ লাভ করবে—নয়?"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মৃন্ময় দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ চরকা দিয়েই করব।"

শ্রীকান্ত বলিলেন "তবে মাঠের কাজেও লেগে যাও না কেন?"

মৃন্ময় বলিল "লাগবো কিনা তাও দেখতে পাবেন। আমরা হেলায় যা হারিয়েছি তা ফিরে পেতে আবার আমাদেরই প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। চাষা বলে যাদের ঘৃণা করেছ, আজ তাদেরই পাশে আমাদের স্থান। অভাব আমাদের জীর্ণ করে ফেলেছে বলেই আমরা তার অনুভব করতে পারছি। আমরা দেখছি আমাদের যতদূর অবনতি ঘটবার তা ঘটেছে পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতি এমন করে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেনি, আমাদের খাওয়া পরার ভার পর্য্যন্ত আমরা পরের হাতে তুলে দিয়ে—নিয়ে আছি শুধু বিলাসিতা। আমরা আমাদের মিথ্যা মানের বোঝা পায়ে দলে মিশব গিয়ে চাষার দলে, আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তার সার্থকতা করব। আমরা নিজেদের পরণের কাপড় নিজেরাই সরবরাহ করব, যাতে আমাদের পরিধেয়ের জন্যে পরের কাছে হাত পাততে না হয়। এ কি কম লজ্জার কথা, যে যদি আজ ম্যানচেষ্টার কাপড় না দেয় আমাদের উলঙ্গ হয়ে থাকতে হবে? আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি, বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছি, চাকরী করছি, মাইনের টাকা পাচ্ছি খাটতে হচ্ছেনা, আমাদের দেশের বাজার হাট সব ভরে গ্যাছে বিদেশীতে, বাণিজ্য এমন কি আমাদের জমাজমিতেও এরা হাত দিয়েছে। আমরা নিয়ে রয়েছি কি বলুন তো?"

শ্রীকান্ত বাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোমার কথাগুলো নেহাৎ মন্দ নয়, কিন্তু বাবু, তুমি রাজবিদ্বেষের বীজ ছড়াচ্ছ, এতে দেশের লোক —যারা জ্ঞানী তারা, কখনও মাথা দেবে না। যারা তোমার মত হালকা, তারাই ক্ষেপবে বটে। তা দেখ বাপু, এ দেশটাকে তোমাদের জাগাতে হবে না, তোমরা সহরে যাও. এ সব হুজুগ খাটে সহরে, পাড়া গাঁয়ে এ রাজ বিদ্বেষের বীজ আর এনো না।"

মৃন্ময় উত্তর করিল "সহর নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত হয়নি. এর মধ্যে পল্লীগ্রামই বেশী, আমরা পল্লীকে উন্নত করে তুলব, আমাদের কার্য্য স্থল সহর নয়, পল্লী। মাপ করবেন আমরা পল্লী ছেড়ে কোথাও যাব না।"

শ্রীকান্ত বাবু অতি মাত্রায় চটিয়াছিলেন, কিন্তু কথা কহিতে আর সাহস করিলেন না. কি জানি গুণ্ডা ছেলের দল পাছে তাঁহাকে প্রহার করে।

(২)

স্বেচ্ছাসেবকের দল পিকেটিংয়ে বাহির হইল। প্রতি রবিবারে গ্রামের প্রান্তে একটা খুব বড় হাট বসিত. এখানে কাপড় জামা জুতা প্রভৃতি সবই বিক্রয় হইত।

পিকেটার অরুণ যে সময় একটা বিলাতী

কাপড়ের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লেক্‌চারে স্বদেশীর উপকারিতা বুঝাইতেছিল, সেই সময় শ্রীকান্তবাবু দু'তিন জন বন্ধু পাইক পরিবৃত অবস্থায় পথ দিয়া যাইতেছিল।

অরুণের দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া তিনি ঠিক থাকিতে পারিলেন না, ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ ছোক্‌রা, বেশ লেকচার দিতে শিখেছ, কালে মানুষ হবে, বটে।" তাহার পর জনৈক বন্ধুর পানে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন অ্যাঁ, কালে কালে সব হ'ল কি? এই ছেলেগুলো, যারা আজও স্কুল কলেজে পড়ে, তারাও কিনা আমাদের সামনে এসে চোটপাট লেক্‌চার দিয়ে যায়। কলির অন্তিম দশা উপস্থিত নচেৎ আর এমন হয়?"

অরুণের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, সে একটু থামিয়া উত্তর করিল "কাজটা আপনাদেরই; আপনারা করেন না বলেই তো আমাদের করতে হয়।"

শ্রীকান্তবাবু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন "তা বটে, এ বয়সে রাজদ্রোহীতার অপরাধে জেলে না গেলে আর চলে কি করে? তোমরাই রক্তের জোরে তার নাম রেখেছ 'স্বরাজ আশ্রম', বুড়োর কাছে তো তা নয় বাপু। দেখ, ওসব ছেলেমানুষি খেলা ছাড় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তোমরা এক দল এই গ্রামে এসে আড্ডা করেছ শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসছেন। জমিদারবাবু খবর পাঠিয়েছেন দেশে যেন কোনও গোলমাল না ওঠে, স্বেচ্ছাসেবকের হাঙ্গামার জন্যে তাঁকে যেন জবাবদিহীতে না পড়তে হয়। মনিবের নুন খাই আমি, তাঁর হুকুম অবশ্যই আমাকে মান্‌তে হবে। তিনি তোমাদের এ গ্রামে থাকতে দিতে রাজি নন, বিশ্বাস না হয় চল আমার বাড়ী, আমি সে পত্র তোমায় দেখাব।"

অরুণ বলিল "আজ্ঞে না, আমার যথেষ্ট বিশ্বাস হ'য়েছে, আপনার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নেই। সাহেব আস্‌বেন আসুন, আমরা কয়টি ছেলে তাঁর কি অনিষ্ট করব? তিনি বেশই জানেন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যেরা তাঁর কোনই অনিষ্ট করবে না। আমার মনে হয় আপনার চেয়েও তিনি বিদেশী হ'য়েও আমাদের ভাল রকমই চেনেন।"

গরম হইয়া শ্রীকান্তবাবু বলিলেন "তা চিনতে পারেন, সহরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা শুনা কথাবার্ত্তা করতে পার, বাবুর হুকুম তাঁর জমীদারির মধ্যে সে সব চল্‌বে না। তিনি এ বছর রাজাবাহাদুর টাইটেল পাবার জন্যে বড় চেষ্টা করছেন, তোমাদের এখানে থাকলে গবর্ণমেণ্ট তা' দেবেন না। তাঁর এতকালের দান, অন্য সৎকাজ ব্যর্থ করবার মতলবেই যে তোমরা এখানে এসেছ তাতে তাঁর একটু মাত্র সন্দেহ নেই। কেন বাপু, ভদ্রলোককে গবর্ণমেণ্টের চোখে এমন করে অপদস্থ করবে? ওসব বুজরুকি এখানে খাটবে না, এ বড় শক্ত মাটী, এখানে নখ বসে না। সহরে যাও. সেখানে কাজের বেশ সুবিধা হ'য়ে যাবে'খন।"

অরুণ হাসিয়া বলিল "আমাদের সহরে কাজ করবার ঢের লোক রয়েছে, ভগবানের ইচ্ছেয় লোকের অভাব হবে না। আপনি আপনার সব কথা মন্মথবাবুকে বলবেন, তিনি আমাদের এখানকার মাথা, তাঁর মত পেলে আমরা আজই চলে যাব'খন।"

শ্রীকান্তবাবু মাথা দুলাইয়া বলিলেন "হুঁ, সেই মৃন্ময় ছোকরাটা তো? তার মত এক-

গুঁয়ে স্বভাব যদি আর থাকে। তা আর বলব কি বাপু, তোমরা সবাই একসমান একগুঁয়ে। আচ্ছা, সাহেবদের বর্জ্জন করলে তোমরা থাকবে কি নিয়ে বল তো? আজ দেড়শো বছরের উপর হ'য়ে গ্যাছে ইংরাজ এসেছে। মনে কর তখন কি দিন ছিল এখন কি দিন হ'য়েছে। তখন না ছিল রেল না ছিল ষ্টীমার, পথ ঘাটই বা কি ছিল। তখনকার দিনের কথা ভাবতে গেলেও গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। জগতে সবাই বলে ইংরাজ রাজত্ব রাম রাজত্ব, না কি সেই রাম রাজার সময়ে এমনি ছিল। তোমরা কেন বাপু এ সুখের রাজত্বটাকে হিংসে করছ? অতি সুখ যে মানুষের সহ্য হয় না সে ঠিক কথা—যাকে বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলায়, এ ঠিক তাই। তোমরা বাপু, কলকাতা সহর ছেড়ে, বড় লোকের ছেলে, পাড়াগাঁয়ে এসে যেন অন্ধকারে হাঁপিয়ে মরছ বলতো? এই অসহ্য গরমে পরেছ ওই মোটা কাপড়, যা দেখলে চমকে উঠতে হয়। এমন ফাইন বিলিতি কাপড়—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল "আমরা এই মোটা কাপড়ই নির্ব্বাচন করেছি নায়েব মশাই, আমরা বিলাতীর আদর করে ঘরের জিনিস নষ্ট করেছি। আমরা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, নগণ্য হয়ে রয়েছি, ঘৃণা করে চলে যান, সামনে দাঁড়িয়ে নিন্দে গুলো করবেন না কারণ একদিন আবার আপনাকেই পস্তাতে হবে।"

সদর্পে শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন "আমাকে পস্তাতে হবে? আচ্ছা দেখা যাবে কেমন পস্তাই আমি। ওহে ছোকরা তোমাদের মত আমার রক্তের জোর নেই যে একবার জল করে আবার পস্তাব। সাহেবদের সঙ্গে লড়বার ইচ্ছে আমি কখনও করিনি, করবও না। তোমদের বলছি যদিই থাকতে হয় এখানে চুপ চাপ থেকো, ও সব জারি জুরি খাটিয়ো না। সাহেব এলে এ সব যদি দেখেন তা হলে ভাবি রাগবেন বাবুকে তলব দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও মরব।"

তিনি সদর্পপাদে চলিয়া গেলেন।

সাহেবদের বাস্তবিকই তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন যখন কোন সাহেবের এ দিকে পদার্পণ হত, ভৃত্যের ন্যায় তিনি সাহেবের ফরমাইস খাটিতেন, ইহাতে সাহেবেরা ভারি খুসি হইতেন এবং জমীদার নীরদা বাবুকে জানাইতেন তাঁহার নায়েব বড় আচ্ছা লোক আছে এবং এইরূপ ভাল নায়েব আছে বলিয়াই তিনি জমীদারি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সাদা মুখের প্রশংসা পাইবার জন্য কত শিক্ষিত ধনী লোকই ব্যস্ত নায়েব তো অশিক্ষিত নায়েব মাত্র। তাঁহার বুকটা দশ হাত ফুলিয়া উঠিত। তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত যে বৈঠক বসিত তাহাতে আলোচনাই ছিল সাহেবের কথা। কোন সাহেব কবে নায়েব মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কোন সাহেব কবে আসিয়াছিল ইহাই ছিল আলোচ্য বিষয়।

মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট আর, এস, রাইলি এবার মফঃসলে বাহির হইয়াছেন। সাহেবটী নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন, স্বভাবটা নাকি অত্যন্ত উগ্র, কিন্তু শিক্ষিত গুণীর মর্য্যাদা ঠিক বুঝেন। ইনি নাকি আবার গভর্ণরের শ্যালক, সুতরাং ইহাকে হাত করিতে পারিলে যে রাজা বাহাদুর উপাধিটা সহজেই মিলিয়া যাইবে তাহা নীরদা বাবু ঠিক বুঝিয়াছিলেন। নিজে পীড়িত, শয্যাগত

থাকায় জমীদারিতে আসিতে পারেন নাই, নায়েবের দস্তখত করা পত্র দিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং নিজের পুত্র শরৎ কুমারকে ও পাঠাইতেছেন।

নায়েব মহাশয় এই ভলণ্টীয়ার দলকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। জোর করিয়া কিছু করিবার সামার্থও তাঁহার ছিল না পাছে ইহারা তাঁহাকে ধরিয়া একেবারেই তাঁহার ভাবের খেলা সাঙ্গ করিয়া দেয়। সমীপ বর্ত্তী থানায় তিনি এই দলকে এনার্কিষ্টের দল বলিয়া সংবাদ দিয়া সকলকে গ্রেপ্তার করার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দারোগা বাবু একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন এরা প্রচার কার্য্যে এসেছে, আপনার কোনও ভয় নেই। এরা লোভাকৃষ্ট নয়, এরা ত্যাগী, এরা দিয়ে যাবে—আর কিছু নেবে না।

দারোগার কথায় তিনি আরও চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সাহেব আসিলে তিনি যে তাঁহার কাছে সব কথা বলিবেন, দারোগা যে ইহাদের গোপন উৎসাহদাতা তাহা জানাইবেন তাহা ঠিক করিয়া রাখিলেন। তিনি চালাক লোক এক ঢিলে দুই পাখী মারিবেন এই তাঁহার লক্ষ্য।

৩

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া তাম্বু ফেলিলেন গ্রামের বাহিরে একটা খোলা ময়দানে। নায়েব মহাশয় জমীদার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রচুর ভেট সংগ্রহ করিয়া হুজুরের সম্বর্দ্ধনা করিতে গেলেন।

মিঃ বাইলি খাঁটি বিচারক ছিলেন, ভেট প্রভৃতি তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। ভেট দেখিয়া তাঁহার ভ্রুকুঞ্চিত হইয়াগেল, তিনি বলিলেন "এই সব কি দিয়াছে নায়েব বাবু?"

নায়েব সেলাম করিয়া বিনীত হাস্যে বলিলেন "হুজুরের ভেট দিয়া জমাদার বাবু বলে পাঠিয়েছেন।"

মিঃ বাইলি বলিলেন 'জমীদার বাবুকে হামার বহুৎ বহুৎ সেলাম দেও ভেট হামি চাই না।"

সাহেব ভেট চান না কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকিল। বোধ হয় সাহেবের নজরে অল্প ঠেকিয়াছে তাই তিনি বলিতেছেন ভেট চাই না। লাট সাহেবের সুখ্যর্দ্ধী, কত দেখিয়াছেন কত শুনিয়াছেন তাহার ঠিক কি? শশব্যস্তে শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন "হুজুর বাবুর অসুখ তিনি কলকাতায় পড়ে আছেন, আসতে পারেননি। আমি নিজের ক্ষমতায় যা কুলিয়েছে তাই দিয়েছি বাবু আবার আপনাকে—"

সাহেব টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বস করো আমি নেহি মাংতা ভেট লে যাও ঘরমে।"

ভেট যেমন গিয়াছিল তেমনিই ফিরিয়া গেল। নায়েব বাবু গেলাম করিয়া সাহেবের পানে চাহিয়া রহিলেন, তরুণ যুবক শরৎ অপমানে লজ্জায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার উজ্জ্বল গৌর মুখ খানা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল।

সে গোপনে দেশ সেবকের দলে মিশিয়াছিল ইংরাজ ভক্ত পিতা তাহা জানিতেন না জানিলে পুত্রকে নিশ্চই ত্যাগ করিতেন। সে সাহেবের সম্বর্দ্ধনায় কিছুতেই আসিত না পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়াছেন। সামনে একজামিন বলিয়া সে কাটাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু একজামিনের চেয়ে সাহেবের সুনজরে পড়া যে যথার্থ সৌভাগ্যের চিহ্ন তাহাতে নীরদা বাবুর

একটুও সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অবিদ্যমানে তাঁহার মান অপমান পুত্রকেই অর্শিবে ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইয়া বলার পরে তবে সে আসিয়াছে।

সাহেবের সহিত খানিক কথাবার্ত্তা বলিয়া নায়েব বুঝাইয়া দিলেন গ্রামে কতক গুলি এনার্কিষ্ট আসিয়া আড্ডা লইয়াছে ইহাদের দমন করা বিশেষ দরকার। ইহারা এখানে থাকিয়া যে পরামর্শ করে সমগ্র ভারতে তাহা দুদিন বাদে প্রচার হয় এবং সরকারও বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি হঠাৎ ইহাদের সন্ধান পাইয়া দারোগা বাবুকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দারোগা বাবু তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন তাঁহাদের দলে দারোগা বাবু ও আছেন নচেৎ এমন সাংঘাতিক কাজটা তিনি উড়াইয়া দিলেন কেন?

সাহেব নিবিষ্ট মনে তাঁহার কথা শুনিলেন, গম্ভীর ভাবে শেষে বিদায় দিলেন।

পথে আসিতে আসিতে শরৎ একটাও কথা কহিল না, তাহার মুখ বর্ষনোন্মুখ শ্রাবন আকাশের মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া সে সহসা মৌন ভঙ্গ করিল "আচ্ছা শ্রীকান্ত বাবু এতে বোধ হয় আপনার মতে কোনও পাপ বলে গন্য হয় না?

বিস্মিত হইয়া শ্রীকান্ত বাবু বলিল "কিহে"

শরৎ বলিল "এই মিথ্যাকে অনায়াসে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া?"

শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন "পাপ বই কি?"

শরৎ বলিল "তবে এমন জীবন্ত মিথ্যাটাকে সত্য বলে চালিয়ে দিয়ে এলেন কেন? আপনি নিজে বুঝছেন এ মিথ্যা, সবাই জানছে এ তবে কেন সেই দুদিনের অপরিচিত অথচ প্রবল পরাক্রান্ত অতিথির পানে তুলে দিয়ে এলেন জীবন্ত সত্য আপনি অনেক প্রমান, অনেক সাক্ষী দিতে পারবেন? সাহেব দুদিন পরেই চলে যাবে, কিন্তু সে এই সাক্ষী ত্যাগীদের নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যাবে কারণ সে অধিকার তার আছে, শক্তির পরিচয় দেবরে এমন সুযোগ সে হারাবে না। কিন্তু যাদের পরে দণ্ড দেবে, তারা যে যথার্থই সৎ, তার পরিচয় সে পাবে না কারণ এই সব ত্যাগীরা কখনই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না। অনর্থক নিরীহ দারোগা বাবু যুদ্ধ জড়ালেন কেন বলুন তো? সে ভদ্রলোক সত্যকে সত্য চিনতে পেরেছে, সত্যের অমর্য্যাদা করে মিথ্যাকেই উর্দ্ধে আসন দিতে পারে নি এই তো অপরাধ তার?"

শ্রীকান্ত বাবু নীরব বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, শরতের এরূপ কথার কারণ তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

শরৎ আর বাড়ীতে প্রবেশ করিল না, একেবারে মৃণ্ময়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল "কি হে, সাহেবের কাছ হতে সমাদরটা লাভ করিলে কেমন?"

শরৎ গম্ভীর মুখে বলিল 'সমাদর যতটা লাভ করি বা না করি, তোমাদের যোগ্য সমাদর করবার জন্যে সাহেবকে বলে এলুম।"

মৃন্ময় বলিল "কি রকম?"

শরৎ বলিল 'রকমটা খুবই ভাল। কালই হয় তো সকাল বেলা কি আজ বিকালেই সাহেব তোমাদের নিয়ে গিয়া দেখা শুনা করবেন। এত গুলো এনার্কিষ্ট মিলে তোমরা এখানে আড্ডা করেছ, এ কি সাহব অমান

শুনেই চলে যাবেন ভেবেছ ? প্রস্তুত থাক, তোমাদের আর দেরী নেই।"

মৃন্ময় হাসিল "তাই যদি হয় শরৎ কোনও আপত্তি নেই তাতে। আমরা স্বরাজ আশ্রমে যেতে চাই, তা'ও একটু ভয় করিনে। মনে একটু ব্যথা থেকে যায় কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখানে সে দুঃখও থাকবে না কারণ তুমি রয়েছ।"

বিষণ্ণ মুখে শরৎ বলিল "আমি ? আমি কি করব ?"

মৃন্ময় বলিল "আমরা যে কাজের পত্তন করেছি সেই কাজ শেষ করবে। তোমার বাপের ভয় করছো ? ভয় কি ? বাপের পা ধরে কেঁদে পড়ো একমাত্র সন্তানের কথা নিশ্চয় শুনবেন।"

শরৎ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বেশ, আমি বাবার কাছে ভিক্ষা চাইব। কিন্তু তোমরা এত বড় অপবাদটা মাথায় করে নিয়ে জেলে যাবে।

মৃন্ময় শান্তমুখে বলিল "না, এ অপবাদ নিয়ে যাব না, মায়ের সন্তান নামে খ্যাত হয়ে যাব, সেইটেই কেবল মাত্র বলব, আর কিছু না। জানতো, নিজেদের পক্ষ সমর্থন আমরা করিনি, করব ও না। তিনমাসের জন্যে আর একবারও গেছলুম, তখনকার কথা তুমি জানো ?

শরৎ বলিল "জানি।"

মৃন্ময় বলিল "তবে নিশ্চিন্ত থাক।"

শরৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে বাহির হইল।

(৪)

সাহেবের আদেশে দেশসেবক সম্প্রদায় যখন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল তখন সেখানে শ্রীকান্তবাবু এবং গ্রামের অনেকগুলি গণ্য মান্য ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন সাক্ষীও উপস্থিত ছিল।

অরুণ মৃন্ময়ের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া চুপি চুপি বলিল "নায়েব মশাই আট সাট বেঁধেই আসরে নেমেছেন দেখছো। আমাদের ছাড়চেন না কবে ভদ্রলোক জল গ্রহণ করবেন না দেখছি।

শান্ত সংযত আকৃতি এই কয়েকটী অল্প বয়স্ক যুবকের পানে চাহিয়া মিঃ বাইলি কত ক্ষণ নীরব রহিলেন। মৃন্ময় অগ্রবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিল, সুস্পষ্ট স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আমাকে ডেকেছেন ? আমি আমার সহচর সকলকেই নিয়ে এসেছি কারণ এদেরও আপনার প্রয়োজন আছে।"

মিঃ বাইলি একবার নায়েব মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন "বোধ হয় এদেরই কথা আপনি বলেছিলেন ?"

শ্রীকান্ত বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন "হ্যাঁ আজ্ঞে হাঁ—"

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল "থতমত খাচ্ছেন কেন ? আপনি যা বলবেন স্পষ্ট বলুন, আমাদের ভয় করবার কোন কারণ নেই। আমরা প্রাতঃ পাদেই আপনার কাছে পরাজিত হয়ে আসছি, এবারও হয়েছি।"

তাহারপর সে মিঃ বাইলির পানে চাহিয়া বলিল "আপনি বিচার করবার জন্যেই বসেছেন আজ, আমাদের পক্ষ হ'তে আমি স্পষ্ট কথা বলছি। আমরা রাজদ্রোহী নই, রাজভক্ত। মনে করবেন গত যুদ্ধের সময় আমরাই রাজার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি। আবার যদি কখনও আপনাদের কোনও দরকার পড়ে, দাস ভাবে না চেয়ে মিত্রভাবে চাইলেই আবার আমাদের সাহায্য

পারেন। আমরা মাতৃভক্ত সন্তান, এ ছাড়া আর কিছু নই। আপনি যা দণ্ড দেবেন, আমরা তা মাথা পেতে হাসি মুখে গ্রহণ করব। আমি দোষ স্বীকার করছি, দণ্ড দিন।"

মিঃ রাইলি শ্রীকান্ত বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন "আপনি কি বলতে চান বলুন।"

শ্রীকান্ত বাবু নিজের সাক্ষী হাজির করিয়া দিলেন।

তাহাদের সাক্ষ্যেও প্রকাশ পাইল, আসামীরা এখানে অত্যাচার করিতেছে। বিলাতী কাপড় দেখিলেই ইহারা কাড়িয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলে, বাজারে দোকানে কোনও ক্রেতাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। সামান্য গৃহস্থবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারা জমাদার বাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। জমীদার নীরজা বাবু সন্দেহ করিতেছেন বহু লোককে তাহারা নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইবে এবং জমিদারীর প্রচুর ক্ষতি করিবে।

মিঃ রাইলি মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া বলিলেন "এ সব সত্য?"

মৃন্ময় দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "আমার যা কথা তা আগেই বলেছি, আর কিছু বলবার মত নেই।"

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন "আমার সন্দেহ হয় এরা সেই স্বদেশী হ্যাঙ্গামার সময় যেমন হয়েছিল তেমনি করবার চেষ্টায় আছে। বোধ হয় বোমা ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে ও সেগুলো রপ্তানিও হয়ে যাচ্ছে।"

মিঃ রাইলি তীব্র নেত্রে মৃন্ময়ের পানে চাহিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য?"

মৃন্ময় উত্তর করিল না।

মিঃ রাইলি তাহার আরক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "উত্তর দাও বলছি।"

মৃন্ময় তথাপি নীরব।

"এলি, শরৎ যে"

শ্রীকান্তবাবু বিস্ময়ে শরতের পানে চাহিলেন।

শরৎ তাঁহার পানে চাহিল না, বরাবর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, অভিবাদন করিয়া বলিল "আমি একটা কথা বলতে চাই, আশা করি আমার কথা শুনবেন।"

মিঃ রাইলি তীব্রনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন "কি বলতে চাও?"

শরৎ তখন মুক্তকণ্ঠে সব কথা বলিয়া গেল। আসামীদের সঙ্কল্প, উদারতা, দেশহিতৈষিতা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "হুজুর, যতও যদি এদের ক্ষমা করতে না পারেন, তবে দণ্ড দিন আমায়, আমিই এ দলের কর্ত্তা, আমার কথা এরাও জানে, কিন্তু আমায় বাঁচাবার জন্যে এরা আমার নামও করছে না।"

মিঃ রাইলি নির্ব্বাকে তাহার মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন, তিনি মনুষ্য চরিত্র অধ্যয়নে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া তিনি ডাকিলেন "নায়েব বাবু—"

সে স্বর শুনিয়া নায়েবের প্লীহা চমকাইয়া উঠিল।

সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "এত বড় মিথ্যাবাদী তুমি, তোমার ভুলের জন্যে নিশ্চয়ই দণ্ড পেতে হবে। এই চাপরাশী, ইধার আও।"

চাপরাশী আসিয়া দাড়াইতেই সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে আবক্ত মুখে আদেশ দিলেন "ইয়ে বাদিকো বাচ্চাব কান পাকড়কে সারা মাঠ ঘুমায়কে আগুন দশ বেত লাগায়কে ছোড়ি দেও।"

শ্রীকান্তবাবুর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

মৃন্ময় অগ্রসর হইয়া বলিল "মাপ করবেন সাহেব, এ ছোক্‌রার কথা বিশ্বাস করবেন না, আমাদের রক্ষা করবার জন্যে এ মিথ্যা কথা বল্‌ছে। আমরা যথার্থই বোমা তৈরি করি, আপনাদের আম্‌রা শত্রু বলেই জ্ঞান করি, আপনাদের উচ্ছেদ সাধনই আমাদের মূলমন্ত্র। নায়েবমহাশয় সত্য কথা বলেছেন, আম্‌রা এ দোষও স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের কোনও দোষ নেই, ওঁকে যেতে দিন।"

মিঃ বারুলি তাহার মুখের পানে খানিক চাহিয়া রহিলেন, একটু হাসি তাঁহার মুখে ভাসিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "আমি সবই বুঝেছি। যুবক, তুমি যে এই ভদ্রলোকের মান বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা দোষ মাথায় নিয়ে যাবজ্জীবনের জন্যে দ্বীপান্তরে যেতেও রাজি তা আমি জেনেছি। যাও, ওঁকে নিয়ে তোম্‌রা সচ্ছন্দে চলে যাও, আমার তাতে কোনও কথা বল্‌বার নেই।"

অপমান-মসী মুখে মাখিয়া শ্রীকান্তবাবু মৃন্ময়ের স্কন্ধে ভর করিয়া তাম্বুর বাহিরে আসিলেন।

মৃন্ময়ের হাত দু'খানা দুই হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আমার খুব শিক্ষা হ'য়েছে মৃন্ময়, খুব শিক্ষা হ'য়েছে। আমার সাহেব প্রীতি দূর হ'য়ে গ্যাছে। ওদের মুখের একটা মিষ্ট কথা শুনবার জন্যে জীবন পণ রাখতুম, সে ভুল ভেঙ্গেছে, আর আমি ভুলব না, মিছে মায়ায় মজব না। আমায় মায়ের সেবার অধিকার দিয়ো, এই বুড়োকেও তোমাদের কাছে ডেকে নিয়ো।"

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে উত্তর করিল "আস্‌বেন বই কি। মা যে এখন সন্তানদের জাগিয়ে বুকে তুলে নিতে চান, তাঁর ডাক আমরা আপনাদের শুনাতেই তো আপনাদের দরজায় এসেছি। উঠুন তবে—বলুন—বন্দেমাতরম্—"

গদগদ কণ্ঠে শ্রীকান্তবাবু বলিলেন "বন্দেমাতরম্।"

পশু শক্তিকে অপরাজেয় মনে করিয়া আত্মাকে দীন ও মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিও না। তোমার সাধনা আত্মার সাধনা দেহের নহে।

নারীর শিক্ষা

[শ্রীশিশিরা দেবী]

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে নারী কিরূপ সম্মানের পাত্রী ছিলেন, বর্ত্তমান নারীজাতির অবস্থা দর্শনে কেহই তাহা ধারণা করিতে পারেন না। এই ভারতই বিদুষী গার্গী, ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী, সতী সাবিত্রীর জন্ম এবং কর্ম্মভূমি। পুরাকালের বিশ্ববরেণ্য নারী-চরিত্র আলোচনায় দেখা যায় তাঁহারা—একাধারে তেজস্বিতা, বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহারা পুরুষের সহযোগিণী ছিলেন। নারী এক দিন বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, এখন অনেকেই বেদের নামও জানেন না। বর্ত্তমান নারী জাতির এবম্বিধ অবনতির মূলে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই অবহেলা বর্ত্তমান। পুরুষ যখনই তাহার শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যালোচনা প্রভৃতি পুরুষত্ব হারাইলেন, নারীও তখনই মাতৃত্বের গৌরব ভুলিয়া তাহার বিশ্ব প্রসারিত দৃষ্টি গৃহ কোণেই নিবদ্ধ করিলেন। ফলে তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত অধিকার হইতেই বঞ্চিতা হইলেন। মন সঙ্কুচিত হইল, কাজে কাজেই পদদ্বয়ও তাহার গমন পথ সীমাবদ্ধ করিয়া লইল। অনভ্যাস হেতু তাহারা ক্রমে শারিরীক বল ও চিন্তাশক্তি বিবর্জ্জিতা হইলেন। যুগে যুগে ক্রমে ক্রমে নত হইতে হইতে আজ নারী এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এখন নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহের অঙ্গন, স্নেহ প্রেম মাত্র পরিজন বর্গেরই জন্য। বিশ্বের জন্য যে তাহার হৃদয়ে সুধার ভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, আচারব্যবহার সমস্তই স্বাভাবিকতা হারাইয়া দেশাচার ও লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা যেদিন বুভুক্ষু সন্তানের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন, সেইদিন হইতেই তাহার মাতৃত্বের গৌরব খর্ব্ব হইল। ক্রমে সকল কর্ত্তব্যই তাহার সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। পুনরায় সতেজ উন্নত নারী জীবন গঠন করিতে হইবে। তাই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে প্রত্যেক নারীকে, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষায় হইবে না। যাহাতে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে সেই শিক্ষাই দিতে হইবে—অতীত যুগের আদর্শ মহিলাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাহাতে চলিতে পারা যায়।

নারীর লজ্জা কোথায় এবং কিসে, বুদ্ধদেবের সহধর্ম্মিণী গোপা দেবী তাহা বলিয়াছেন। তিনি কাহাকেও দেখিয়া অবগুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে পুরকামিনীগণ তাঁহাকে লজ্জাহীনা বলিয়া উপহাস করিতেন। 'মধুর হাস্যে গোপাদেবী সকলকেই বলিতেন, লজ্জা কাহারো বাহিরের জিনিস নয় অন্তরের জিনিস। আমার অন্তর আবৃত রহিয়াছে বাহিরে আবরণের প্রয়োজন কি?—আমাদেরও সেই কথা স্মরণ রাখিতে

হইবে। অন্তর আবৃত করিয়া রাখ, বাহিরে অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন কি? বিশ্বপ্রেমের যে করুণা ধারা সুভদ্রাদেবী ঢালিয়া দেখাইয়াছেন প্রত্যেক নারীরই সেই সুপ্তবৃত্তি বিকসিত করিতে হইবে। এই রকম কর্ম্মদেবী ও লক্ষ্মী বাঈয়ের বীর্য্য, দেবী অহল্যা ও রাণী ভবানীর বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রজ্ঞান, গার্গী ও দেবহুতির বিদ্যাবত্তা, সীতা সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ও মীরা বাঈয়ের প্রেম প্রত্যেক নারীজীবনেই মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই সব দেবীর জাতি হইয়া আমরা যে এত নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছি এত সামান্য অধঃপতন নয়? নারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিস্মৃত হইয়াই নারী এত লাঞ্ছিতা। স্রোত ফিরিয়াছে আমাদেরও উপরে উঠিতে হইবে। যে জীবন স্রোত একটানা ক্লান্ত করুণ সুরে নিম্নাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে, প্রবল উত্তরে হাওয়ার বাধা ঠেলিয়াও তাহাকে উজান বহিতে হইবে।

নারীর যাহা প্রকৃত গৌরব, তাহা মাতৃত্ব। বিশ্ব নারী মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ। এই মাতৃত্বকে অন্তরের সহিত ধারণা করিয়া নারী বাহিরে বাহির হইবেন। জ্ঞানে প্রেমে জননী সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিবেন। আশা ও উৎসাহে, জ্ঞানে ও প্রেমে তাহার চরিত্র উন্নত করিয়া তুলিবেন। এই মাতৃত্বকে মনে দৃঢ়মূল করিবে যে শিক্ষা—সেই শিক্ষাই বর্ত্তমান নারী জীবনে প্রয়োজন।

ভ্রষ্টচরিত্রা

[শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

তুমি বুঝি মনে ভাবো বড় সস্তা ভালোবাসা বাসি!
ধরাটাকে সরা বোধে পদতলে যেতেছ পিষিয়া!
বুকের বসন যেচে রাখিয়াছ ঈষৎ খুলিয়া!
নেহাৎ কদর্য্য তুমি, অনিন্দিত থাক রূপরাশি!
কে কোথা বাসিছে ভালো রমণীর শুনি অট্টহাসি?
ন্যাকা-ন্যাকা বুলি, আর নয়নের ছলা-কলা দিয়া,
কাড়িয়া লইবে প্রেম? হেন ঘৃণ্য নহে কারো হিয়া!
নহে নহে প্রেম কভু [illegible] পাড়া-প্রতিবাসী!

আমি পূজি সে রমণী, চিত্ত যার শুভ্র নিরমল!
লাজে নত আঁখি যার, যে আপনি রাখে নিজ মান!
বিপদে কুলিশচিত্ত, পুষ্পসম অথচ কোমল!
নারীর শুচিতা রাখে, যায় যাক্ থাকুক পরাণ!
হোক্ সে কুরূপা তবু, আমি তার চরণ যুগল,
আঁখি জলে ধুয়ে দিয়ে সদা তারি গাহি জয়গান!!

শিক্ষা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

কথাটা উঠেছে শিক্ষার এবং যাঁরা এ বিষয়ে বলবার অধিকারী, বলবার যোগ্যতা রাখেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞাসু হয়ে 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এ সম্বন্ধে দু' একটা কথা জানতে ইচ্ছা করি। বলা বাহুল্য আমি ধরে নিয়েছি যে শিক্ষাটা আমাদেরই ছেলেদের জন্য।

আমার প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে "যে আমাদের" বংশধরদের জন্য এই শিক্ষার কথাটা উঠেছে "সে আমরা" কারা? "সে আমরা" জমিদার নই, ব্যবসাদার নই, কল, কারখানা ওয়ালা নই, খনি-ওয়ালা নই, "সে আমরা" ব্যারিষ্টার নই, ভকীল নই, উকীল নই, ডাক্তার নই; "সে আমরা" উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী নই—জজ নই, ম্যাজিষ্ট্রেট নই এমন কি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা মুন্সেফও নই; প্রোফেসর নই, ইঞ্জিনিয়ার নই। "সে আমরা" মুদির দোকান করি না, বেনের দোকান করি না কাপড়ের দোকান করি না। "সে আমরা" ছুতারের কাজ করি না, কামারের কাজ করি না, কুম্ভকার বৃত্তি করি না, তৈলিকের কায, কাঁসারির কায, শাঁখারির কায করি না। "সে আমরা" শ্রম জীবীর কায হেয় মনে করি, বাঁশের কাজ ও বেতের কাযও তাই মনে করি, যদিও চীন জাপানের বাঁশ ও বেতের কায আমরা আদর করে উচিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে কিনি।

এ ত গেল আমাদের "নেতি নেতি" বিশ্লেষণ। তবে বাস্তবিক "সে আমরা" কারা? "সে আমরা" তাঁরাই যাঁরা ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের এবং বানিজ্য বিস্তারের জন্য ইংরেজ যখন যেখানে আপিস খুলেছেন তখনই সেখানে আপিসের বাবু রূপে তাঁদের কার্য্যে সহায়তা করেছি। শুধু বাবু রূপে নয়, ইস্কুল মাষ্টার রূপে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার করেছি; ওভারসিয়ার, হস্পিতাল সহকারী কমিসেরিয়া-টের গোমস্তা; তার বাবু, রেল বাবু প্রভৃতি নানাবিধ রূপে, ছোট বড নানা কার্য্যে ইংরেজের সহায়তা করেছি। আর এই সকল কাযের জন্য ভারতের সকল প্রদেশেই গিয়েছি। এখন অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনে আমাদের বংশ-ধরেরা বাঙলার বাইরে ভারতের অন্য প্রদেশে "বিদেশী" বলে লাঞ্ছিত। সে সকল প্রদেশে তাদের এখন আর কোন ভরসা নাই। বাঙলার ভিতরে আমরা এই ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরেজের চাকরীর জন্য আমাদের পাড়া-গাঁয়ের পৈতৃক বাড়ীটী হারিয়েছি। পিতামহ সহরে চাকরী করেও দেশের বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম গুলি করতেন। পিতৃদেব তাও উঠিয়ে দিলেন দেশের বাড়ীতে আর পদার্পণ করলেন

না। আমরা পিতৃদেবের পদানুসরণ করলাম, এখন আর দেশে আমাদের কেউ চেনে না। এই রকম করে দেশের বাড়ী ঘর দুয়ার সব গিয়েছে, অথচ তার পরিবর্ত্তে কোথাও এক খানি কুটির নির্ম্মান করতে পারি নি। এবম্বিধ যে "আমরা" সেই আমাদের বেকার সন্তানদের শিক্ষাটা কিরূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষাটা কিরূপ হলে তারা আর বেকার হবে না সেই প্রশ্নটা উঠেছে। এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটা বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই—সেটা হচ্ছে বিবেকানন্দের ভাষায় "আগে এদের দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে দে তারপর এ দেকে ভাগবত পড়ে শোনাস্।" আর একটা কথাও ঠিক যে এই শিক্ষার আন্দোলন হচ্ছে উপরি বর্ণিত "আমাদের" ছেলেদের জন্য—দেশের সকলের ছেলেদের জন্য নয়। "আমরা" মনে করি ইংরেজের চাকরীতে আমাদের একটা মৌরূষী স্বত্ব জন্মে গেছে এবং এখন তা থেকে বঞ্চিত করলে "আমাদের" এক-মাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি হরণ করা হয়। আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হরণ করার অর্থই Communion নামান্তর Bolshevism! সুতরাং এর জন্য গবর্ণমেণ্টের একটু চিন্তিত হবার কথা। আমাদের বাঙলার গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য আমাদের এই বেকার বংশধরদের একটা কিছু করে দেবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেছেন! কমিটি যথারীতি গবেষণা করছেন সুস্থদেহ কর্ম্মক্ষম এবং কর্ম্ম করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে ইচ্ছুক এমন সকল লোককে কর্ম্ম দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে কি-না এ প্রশ্নটা নিতান্ত নতুন নয়। যদি এটা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে হয় তা হলে অতি সহজেই বেকার সমস্যাটার একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে "উত্তম, বর্ত্তমান বেকারদের অন্ন সংস্থানের উপায় আমরা করে দিচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যতে বেকারদের সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি যাতে না পায় তার উপায়টাও আমাদের করতে হয়; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কে বেকার হবে আর কে হবে না, তার যখন স্থিরতা নাই তখন প্রজা সাধারণের সকলেরই বংশবৃদ্ধিটা নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতাটাও আমাদের হাতে থাকা উচিত।" বেকার হিতৈষীদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা এতে মস্তক সঞ্চালন করে, বোধ করি বলবেন "হাঁ, বিষয়টা প্রণিধানযোগ্য বটে; তবে এ দেশে ঐ বংশ বৃদ্ধি কার্য্যটা ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্মের সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংপৃক্ত, তাতে ওবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় হবে না।" গবর্ণমেণ্ট তখন আহ্লাদের সহিত বলতে পারেন (অন্ততঃ এ রকম কল্পনা করা যেতে পারে) "তা হলে গবর্ণমেণ্ট অনুমান করতে পারেন যে সে ভারটা আপনারা স্বয়ংই নেবেন। গবর্ণমেণ্টকে তা হলে আর আপনা-দের বেকার সন্তানদের শিক্ষাই হোক আর কাযকর্ম্ম জুটিয়ে দেওয়াই হোক বড় কিছু করতে হবে না। এই সহযোগিতার জন্য গবর্ণমেণ্ট আপনাদের ধন্যবাদ দেবেন।"

কর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ হিসাবে কবি প্রভৃতি সকলেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহারা কাম্য ধর্ম্মেই নিবদ্ধ। ফলাকাঙ্খা থাকায়, লোভে আপনাহারা হইয়া যায় একটু সত্যকে বিকৃত করা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক Plato এর মতে ইহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নয়। বরং ইহাদিগের ভাব যাহাতে সাত্ত্বিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় তাহারই জন্য যত্ন আবশ্যক। ইহাদের এই ভোগস্পৃহা এবং উদ্দাম লালসা যাহাতে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় Plato কবির উৎপ্রেক্ষা, কবির উৎকট ভাব ও অসত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করিবার জন্য শিক্ষার হিসাবে আসল ভাবের নিকট নকল ভাবের প্রাধান্য দিতে রাজী হন নাই, তিনি চিত্তের ভাব মাত্রকেই মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। দার্শনিক Socrates এর "Knowledge is virtue" 'জ্ঞানই পুণ্য' এই মন্ত্রেও ভাব রাজত্ব নাই। সাংখ্য পাতঞ্জলেও নাই, কিন্তু রাগ বা ভালবাসা একেবারে বিদায় দেওয়া চলে না। প্রশ্ন হইতে পারে কি উপায়ে এই ভাবুকতা, ভোগস্পৃহা বিদূরিত হইতে পারে? উত্তর—ফলাকাঙ্খা ত্যাগ কর, ইচ্ছা দূর কর, কিন্তু উৎসাহ ও ধৃতির সহিত বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাপক বস্তুতে পরিণত কর। ফলের অভিসন্ধি ত্যাগ কর। কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া অধিকার সাব্যস্ত করিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। ভগবান ব্যাপক, অখণ্ড, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, নিত্য, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, তাঁহাতে সকল নিবেদন কর, সকল সমর্পন কর, ভাবুকতা ভক্তিতে পরিণত হইবে। বুদ্ধি-অগ্নিতে ভাবুকতা পুড়িয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ভোগের স্পৃহা না থাকিলে ব্যাপক সাত্ত্বিক ভগবৎ সুখ আপনা হইতেই প্রতিভাত হইবে। যে সুখ সহজ তাহা ত্যাগ করিয়া সুখের জন্যই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমরা আমাদের নিজস্ব জিনিষ হারাইয়া ফেলি। যাহা আকাশের মত সর্ব্বগত যাহা বায়ুর মত সর্ব্বগ ও মহান্ যাহা তেজের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ ও প্রোজ্জ্বল যাহা জলের ন্যায় ব্যাপী ও স্নিগ্ধ যাহা পৃথিবীর ন্যায় স্থির এমন বস্তু ত্যাগ করিয়া সামান্য খণ্ড ছিন্ন বস্তুতে মজিয়া আমরা নিজস্ব বস্তুটী হারাই। সাত্ত্বিক পরিজ্ঞাতা বিষয় সুখের দোষ দেখিয়া, আসক্তি সর্ব্ব দোষের আকর জানিয়া ব্যাপক বস্তু চাহিতে হয় না জানিয়া মুক্ত-সঙ্গ। সে ফল কামনা করে না ফল কামনা না থাকায় অভিমান নাই, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিত। কিন্তু চেষ্টার বিরতি নাই, কারণ সে ধৈর্য্যশীল ও উৎসাহ সম্পন্ন। কার্য্য সম্পন্ন করিতে সে সর্ব্বদাই উৎসাহী। কামনা নাই বটে, ইচ্ছা

নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধির উৎসাহে, বুদ্ধির ধৈর্য্যে ও শ্রদ্ধায় সে ভরপুর, কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে সে ব্যগ্র। কিন্তু হর্ষ শোক নাই, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়েতেই সে নির্ব্বিকার। সকল সুখের আশা, সকল ভাষা, সকল ভাব অখণ্ডে বিসর্জ্জন দিয়াছে। সমভাব প্রাপ্ত হওয়ার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তাহার ব্যাকুলতা নাই। খণ্ড বস্তুতে ব্যাকুলতা সম্ভব, অখণ্ড বস্তুতে মিশাইতে গেলে ফাঁক থাকিতে পারে না। কল্যাণের পথের দুর্গতি নাই, লোকে একটা কথা বলে "দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ" কথাটীর মূলে ঐ সত্যটী নিহিত। ব্যাপক কর্ম্মের ভোগে আসক্তি কম, দশে মিলিয়া কর্ম্ম করা ও দশে মিলিয়া ভোগ করা উভয় দিকেই দায়িত্ব কম থাকে, দায়িত্ব কম থাকার অর্থ তামসিকতা নহে, পরন্ত মিলনে ব্যাপকতায় ভোগের পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহাতেই হারি জিতি হইতে লজ্জা নাই। ফল কামনা না থাকিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার হওয়া একান্তই সম্ভব। দশে দশে মিলিয়া কার্য্য করিতে যেমন চেষ্টা আছে এক্ষেত্রেও তেমন চেষ্টা আছে, উৎসাহ আছে, কর্ম্মে নিষ্ঠা আছে, আন্তরিকতা আছে, নাই কেবল সুখের স্পৃহা। ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ায় কোনও দলকে পুরস্কার দিলে সকলের সমষ্টি গত সুখ, ব্যক্তিগত পারিতোষিকের সুখের চেয়ে বেশী হয়। কোন সমাজকে ভাল বলিলে সে সমাজের যে কোনও ব্যক্তি সুখ অনুভব করে, তাহাকে প্রশংসা করিয়া সমাজের অন্য সকলকে গালি দিলে বোধ হয় তাহার সুখ বেশী হয় না। জাতি সম্বন্ধে তাহাই, দেশের সম্বন্ধেও তাহাই। সমষ্টিগত সুখ ব্যাপক বস্তু, ব্যাপক বস্তু বলিয়াই কেহ প্রশংসা করিলে সেই প্রশংসা আমি না চাহিলেও তাহাতে আমার বিশেষ সুখ হয়। সমষ্টিগত সুখের মূলেও আমি আছি বটে কিন্তু সে আমি একটু ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। ব্যাপক সুখের তাৎপর্য্য এই না চাহিয়া পাওয়া যায়। কেবল উৎসাহ সহকারে আদর পূর্ব্বক নিরন্তর দীর্ঘকাল তাহাতে ব্যাপৃত থাকিলেই সাত্ত্বিক সুখ লভ্য হয়। প্রশান্ত অবস্থায় থাকিবার প্রযত্ন বা অভ্যাস থাকা চাই, সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর আদর সংকারে অনুশীলন করিলেই তাহা বদ্ধমূল হয়। ভোক্তৃত্বের উপরই কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। পরের প্রবন্ধে "প্রবর্ত্তক" সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিয়া তৎপরবর্ত্তি প্রবন্ধে কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তা এবং প্রবন্ধের অবতারণা করিব। ভোক্তা ও কর্ত্তা একই। কর্ত্তৃত্ব আছে ভোক্তৃত্ব নাই ইহাও হইতে পারে না, ভোক্তৃত্ব আছে কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাংখ্য দর্শনে ভোক্তৃত্বের কথা স্বীকার করিয়া কর্ত্তৃত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু ইহা সমীচীন মনে হয় না। এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে ইহার সমালোচনা করিব। সামান্য ভাবে এই বলা যাইতে পারে ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অবিভক্ত। ইহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে না। ভোক্তা দর্শক হইলেও দৃশ্যের ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারে না, দৃশ্য থাকিলেই দৃষ্টার আরোপের সম্ভব।

দর্পন থাকলে তাহার একদিকে আবরণ দিলে সে আবরণ খসিয়া যাইতে পারে। দৃশ্যের জন্য দ্রষ্টার চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। ভোগ থাকিলেই চাঞ্চল্য আছে। চাঞ্চল্য থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব আছে। দৃশ্য মিথ্যা হইলে ভোক্তৃত্ব নাই কর্ত্তৃত্বও নাই কিন্তু কর্ম্মের ভিত্তি অজ্ঞানে ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণিত করিয়াছি। অতএব ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অপৃথক কর্ত্তা ও

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। কর্ম্মে প্রবর্ত্তক উদ্দেশ্য (জ্ঞান) লক্ষ্য (জ্ঞেয়) ও ভোক্তৃত্ব। প্রবর্ত্তকের প্রেরণায় কর্ত্তা কর্ম্ম করে।

প্রবর্ত্তক

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে তাহাই আমরা তিনটি প্রবন্ধে দেখাইলাম। উদ্দেশ্যের প্রেরণায় আমরা কর্ম্ম করি। লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র হইবার জন্য আমরা করিতে ব্যাপৃত হই। আমাদের অভাব আছে, পরিপূর্ণ করিবার ইচ্ছাও আছে। লক্ষ্য বস্তুতে পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। তাই লক্ষ্যও কর্ম্মের আর লক্ষ্য বস্তুর সহিত আমার ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধ। লক্ষ্য বস্তুই ভোগ্য বস্তু। আনন্দই লক্ষ্য। সচ্চিদানন্দ প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। স্বর্গ-সুখ যাহার ভোগ্য সেও সুখই চাহিতেছে। ইহলৌকিক ইন্দ্রিয় তর্পণ যাহার লক্ষ্য সেও সুখ চাহিতেছে। ভয়ে লোক কর্ম্ম করে, ভয় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু ভয়ের কর্ম্মে প্রকৃত আন্তরিকতা থাকে না। আন্তরিকতা থাকে না বলিয়াই উহা প্রকৃত উপকারে আসে না। চোখ রাংগানিতে কার্য্য করাইয়া নিতে পারা যায়, তাহাতে বাহিরের দিকে কার্য্যোদ্ধার সামান্য রূপে হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাণ-হীন, তাহাতে কর্ত্তার কোন উপকার হয় না। কার্য্যোদ্ধারেরও নানারূপ অঙ্গহীনতা দোষ থাকিয়া যায়। ভয়ে ভুল ভ্রান্তি স্বাভাবিক। হস্তিকে অঙ্কুশের তাড়নায় কার্য্য করান যায়, গরু প্রহারের ভয়ে গাড়ী টানে, কিন্তু তাহাতে আন্তরিকতা আছে কি? কিন্তু ইহাদের কল্যাণের বা মঙ্গলের বোধ নাই। কিন্তু মানুষের মঙ্গল বোধ সহজ ও স্বাভাবিক। বুদ্ধি জিনিষটা তাহার পরিস্ফুট। লজ্জার জন্য কর্ম্ম করিতে পারা যায়। লজ্জা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। লজ্জার কর্ম্মে দোষ অবশ্যম্ভাবী। লোক চক্ষুর অন্তরালে আর লজ্জা থাকে না। তখন কেহই আর দেখিবার নাই, যাহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে। প্রভুর ভয়ে প্রভুর দেখিবার লজ্জায় ভৃত্য কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাণহীন। প্রভু না থাকিলেই, দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেই প্রবর্ত্তনা কমিয়া যায়। ধর্ম্ম স্বাভাবিক কর্ম্ম, তাহা লজ্জা ভয়ে করিবার জিনিষ নহে, ভয়ে ভয়ে সুখ ভোগও হয় না। লাজুক মানুষ কর্ম্ম করিতে সংকুচিত হয়। ক্রোধের বসে কর্ম্ম করিতে গেলে অনর্থ ঘটিয়া বসে। উত্তেজনার বসে কর্ম্মেও সেই দোষ। কামপ্রপীড়িত হইয়া কর্ম্ম করিতে গেলে কর্ম্ম বিকর্ম্মই হয়। তাহাতে নিজের ও সমষ্টির ক্ষতি অনিবার্য্য। কর্ম্মের সূত্র নির্দ্দেশ করিতে হইলে যাহা আমার নিজের ও সমষ্টির মঙ্গল দায়ক হয় তাহাকেই প্রকৃত কর্ম্ম বলিতে হইবে। অতি লোভে কর্ম্মেও বিষম দোষ হয়। দ্বেষের বশে কর্ম্ম করিতে গিয়া হিংসাই কর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করে। যে বিষ দূর করিতে যত্নবান সেই বিষেই জর্জ্জরিত হইতে হইল। বিষ শরীরের পক্ষে কোন অবস্থায় অর্থাৎ রোগের অবস্থায় উপকারী নহে। বিষের ক্রিমী বিষ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অন্যে বাঁচিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ তাহার স্বাভাবিক সহজ কর্ম্ম করিতে গিয়া একটু দোষযুক্ত কর্ম্মও করিতে পারে। কিন্তু সেই কর্ম্ম শুভ্র হইতে শুভ্রতর হওয়া আবশ্যক, বিষ রোগের সময় উপকারী বলিয়া সর্ব্বাবস্থায় ব্যবস্থেয় হইতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের ভোগ্য বলিয়া সকলের ভোগ্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু নির্দ্দেশের বস্তু এমন হওয়া চাই যাহা সকলেই

বর্ত্তমানে বা সময়ান্তরে গ্রহণ করিতে পারে। তাই প্রকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে কর্ম্ম সর্ব্বাবগাহী হইতে পারে। বুদ্ধির সাহায্যে ভাব পরিস্কৃত হইয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতম হইলেই তাহা সর্ব্বাবগাহী হইতে পারে। বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয় বুদ্ধি সকল ভাবকে পরিস্কৃত করে, ময়লা দূর করিয়া দেয়, ধাতু যেমন অগ্নিতে পরিস্কৃত হয়, সেইরূপ বোধাগ্নিতে সকল ভাব সকল কাম পরিস্কৃত হয়। সুখে রাগ, দুঃখে দ্বেষ স্বাভাবিক হইলেও বুদ্ধির সাহায্যে সুখকেও দুঃখ বলিয়া অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক সুখকেও হেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। চার্ব্বাক ও ইউরোপে সুখবাদী Eyrenaics ও Epicurians সুখের বিষয় অবতারণা করিয়াই দোষ করেন নাই, তাঁহাদের দোষ কেবল তারতম্যের হিসাব রাখেন নাই, কালগত, পরিমাণ গত ও গুণগত বিচার তাঁহারা করেন নাই। বর্ত্তমানে সুখ হইতে পারে কিন্তু দু'দণ্ড পরে দুঃখ অনিবার্য্য। সুখের পরিমাণ সম্বন্ধেও হিসাব করেন নাই, কম বেশীর হিসাব রাখেন নাই, গুণগত ভাল মন্দও বিচার করেন নাই, এই অংশেই তাঁহাদের দোষ, বুদ্ধির সাহায্য পরিনত করেন নাই—এই অংশেই দোষ। বিবেকী ব্যক্তির নিকট সাংসারিক সকল সুখই দুঃখ বলিয়া মনে হয়। কারণ ভূমানন্দ তাঁহার লক্ষ্য, তিনি খণ্ডিত বস্তু চান না। তিনি অখণ্ডে ডুবিতে চান। অতএব ভয়, লজ্জা, ক্রোধ, কাম প্রভৃতিকে প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে না। কাম কর্ম্মের অধিষ্ঠান। সেই অধিষ্ঠান বুদ্ধির সাহায্যে পরিস্কৃত হয়। পরিস্কৃত হইলেই তাহা ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা, অর্থাৎ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভোক্তা, ইচ্ছা, দ্বেষ, শোক, দুঃখ কর্ম্মের ভূমি বা অধিষ্ঠান। ইচ্ছাই কাম, ইচ্ছার বিষয় সুখ, দ্বেষের বিষয় দুঃখ, যাহাতে সুখ হয় তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা বুদ্ধির। দুঃখের প্রতি দ্বেষ স্বাভাবিক, কিন্তু নির্ণয়কর্ত্তা বুদ্ধি। পূর্ব্বে সুখের বস্তু পাইয়াছি, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইয়াছে, পুনরায় সেরূপ বস্তুপাইলেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, উপলব্ধির ফলেই ইচ্ছা হয়, উপলব্ধি বুদ্ধির ধর্ম্ম, অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যাপারে উপলব্ধি হয়, দ্বেষও তাহাই, উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও ভোক্তৃত্বর নির্ণয় বুদ্ধির সাহায্যে হয়। এই জন্যই বুদ্ধিকে করণ বলিয়াছি। চিত্ত কর্ম্মের অধিষ্ঠান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেরক। প্রেরণা ভিতরের, মীমাংসা দর্শন বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদকে প্রেরক বলাতে একটু অশোভন হইয়াছে, এই গুলি বাহিরের। অন্তরে ইহাদের বিচার না হইয়া কর্ম্ম হইলে তাহা অনেকটা পরিমাণে অনিচ্ছায় বোঝা টানিবার মত হয়। ভট্ট কুমারিল ইহার মীমাংসায় 'শাব্দী ভাবনা' এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসকের মত বিচার কালে ইহার আলোচনা করিব। কর্ম্মই হউক আর বিকর্ম্মই হউক তাহার হেতু খুঁজিতেই হইবে। তাহার হেতু পাইলাম, কিন্তু সংগ্রাহক হেতু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। করণের সাহায্যে অধিষ্ঠানে যে বিকাশ হয়, সেই বিকাশই উদ্দেশ্য প্রভৃতি। কিন্তু কর্ম্মের হেতু কর্ত্তা প্রভৃতিও উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রবর্ত্তক ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এখন প্রবর্ত্তক বলিতে কি বুঝি তাহাও বিবেচ্য। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতি বলায় বচন বা উপদেশ বা আদেশের অবকাশ থাকিল না, কারণ জ্ঞানে বচনত্ব নাই, মীমাংসকগণ চোদনা উপদেশ এবং বিধিকে একার্থবাচক মনে করেন। ভট্ট কুমারিল

শাস্ত্রী ভাবনা বলিতে তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু 'জ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করাতে উহা উত্তেজক মাত্র হইল। এ স্থলে 'চোদনা' বা 'প্রেরণা' বলিলে উপদেশের প্রবর্ত্তকত্ব বা বচনের ক্রিয়া প্রবর্ত্তকত্ব প্রতীত হয় কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানাদিতে বচনত্বের অভাব। উত্তেজক মাত্র আদেশ বা উপদেশ বাহিরের, কিন্তু জ্ঞান অন্তরের আদেশ বা উপদেশ, তাই তোমার বাড়ীতে গিয়া তোমার চাকরকে তামাক দিতে বলিলাম কথাটা তাহার কর্ণপটাহে আঘাত করিল। কিন্তু সে কথার অনুযায়ী কার্য্য করিল না। তুমি আসিলে বলিলাম আমার কথা তোমার চাকর শুনিল না বাস্তবিক শব্দ সে শুনিয়াছে, শব্দ তাহার কর্ণপটাহে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু সে গ্রহণ করে নাই। উপরালা নিম্ন কর্ম্মচারীকে আদেশ করিল, কর্ম্মচারী শুনিল, কিন্তু গ্রহণ করিল না। গ্রহণ জিনিষটা ভিতরের। জ্ঞানে জিনিষের আবশ্যকতা—প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া বিষয় অবধারণা করিয়া আমার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। অনেক সময় যে বোধ পরিস্ফুট থাকে না, তাহার কারণ আমাদের তামসিকতা, অন্য কিছুই নহে। একটু বিচার করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনার সময় তাহা দেখাইয়াছি। প্রেরণা সকলের অনুভব সিদ্ধ। রাজা আমাকে পাঠাইয়াছেন, কি কোন বালক আমাকে পাঠাইয়াছে, অথবা কোন ভদ্রলোক আমাকে পাঠাইয়াছেন আমি আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি এরূপ প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বলে। এই প্রবর্ত্তনার প্রবর্ত্তক আজ্ঞাদিতে নিষ্ঠ। শিক্ষক ছাত্রকে, পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে প্রেরণ করিতেছে। এই প্রবর্ত্তনা বা প্রেরণার প্রবর্ত্তক শিক্ষক প্রভৃতিতে নিষ্ঠ। এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতেছে এ প্রবর্ত্তনা উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টে ইহাকে প্রেরণাও বলা যাইতে পারে। দরিদ্র ভিক্ষা চাহিয়া ধনীকে দানে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, পুত্র পিতার নিকট আব্দার করিয়া আদায় করিতেছে, ছাত্র শিক্ষকের নিকট ছুটী চাহিতেছে, শিক্ষক ছুটী দিতেছেন। এ ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এ ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তনা যাঞ্চা বা অধ্যেষণা বন্ধু বন্ধুকে কোনও বিষয়ে নিয়োজিত করিতেছে, তাহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে, সতীর্থদ্বয় পরস্পর পরস্পরের কার্য্যে অনুমতি দিতেছে। এক্ষেত্রে সম ব্যক্তিই তৎসম ব্যক্তির কার্য্যে অনুমোদন করিতেছে। সভায় যে কোনও সভ্যই অন্য কোন সভ্যের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া তাহাকে তৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে। এক্ষেত্রে উৎকর্ষ বা নিকর্ষ কিছুই নাই, কিন্তু প্রবর্ত্তনা আছে, এ ক্ষেত্রে ইহাকে অনুজ্ঞা বা অনুমতি বলিব। সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই আজ্ঞাদি সকলই জ্ঞান বিশেষ বা ইচ্ছা বিশেষ, এবং ইহা চেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্মে 'বিধিনিষেধের প্রেরণা আছে। বিধি নিষেধের প্রমাণ নির্ণয় কি প্রকারে করিব? অবশ্যই উত্তর দিতে হইবে—বিধি নিষেধের প্রমাণ—কার্য্য অকার্য্যের প্রমাণ—শাস্ত্রিত বুদ্ধি। শাস্ত্রের অনুশাসনে যে বুদ্ধি সংস্কৃত হইয়াছে তাহাই শাস্ত্রিত বুদ্ধি। শাস্ত্রিত বুদ্ধিই বিধি নিষেধের মূলে। এই বুদ্ধির প্রেরণায় আমরা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হই। বিধি প্রভৃতি বোধের উত্তেজক, বোধই প্রকৃত প্রবর্ত্তক।

বর্ষা-মঙ্গল

[শ্রীসুবোধ রায়]

আষাঢ় গগন ঘিরে, আবার আসিল ফিরে
তড়িৎ-কিরীট শিরে—বরষার মেঘ।
গুরু গুরু গরজনে, বাতাসের নিঃস্বনে,
মাতিল বাদল-রণে জলধারা-বেগ।
ঝটিকা ঝটিতি ধায়, চপলা চমকি' চায়,
ধরণীর শ্যাম গায় জাগে শিহরণ।
মেদুর-অম্বর-তলে, নদীর উছল-জলে,
মরাল-মরালীদলে করে বিহরণ।
আষাঢ়ের ঘন-ছায়া রচিয়াছে নব-মায়া,
প'রেছে প্রকৃতি-জায়া শ্যামল অঞ্চল।
প্রেমে বুক ভরি' উঠে তটিনী উছসি' ছুটে
তীরে আসি পড়ে লুটে আবেগ-চঞ্চল!
গভীর আঁধার-রাতে উতালা-বাতাস মাঝে
শাণিত বজ্রাঘাতে কেঁপে উঠে বুক।
সচকিতে মহাত্রাসে প্রিয়া ফিরি' ছুটে আসে,
বাঁধে মোরে বাহুপাশে,—কী গভীর সুখ!
বাহিরে শীতল-ধারা,—ঘরেতে পাগল-পারা
ছুটে উষ্ণ-রক্ত-ধারা দুটি বক্ষ-মাঝে।
দুটি দেহ এক হ'য়ে আছে যেন মিশাইয়ে—
তবু দূর মনে হয় রহি এত কাছে।
তমালের শাখে শাখে মত্ত ডাহুকী ডাকে,
বেতসের ফাঁকে ফাঁকে বহি যায় বায়ু।
বিরহীর কাণে কাণে কহিছে করুণ তানে—
"প্রতি দিবা অবসানে ফুরায় যে আয়ু।
এ বরষা যদি যায় শূন্য শয়নে হায়!
আবার ফিরায়ে তায় কোথায় বা পাবে?

গাঁথি মালা ফুলদলে,—তা'রে না পরিলে গলে
দুদিন বিগত হ'লে শুকায়ে' যে যাবে।
ঘন-দেয়া-গরজনে রিমি-ঝিমি বরিষণে,
আপনার প্রিয়জনে লহ বুকে টানি'।
মেতেছে প্রকৃতি যবে জীবনের উৎসবে
তুমি কেন বসি' রবে প্রাণ-হীন প্রাণী ?

বাঙ্গালায় কথা

[শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত]

(১)

কথা ও কাব্যের উৎপত্তি এক জায়গায়। বাস্তব জগতের বাঁধাবাঁধির ভিতর চিত্তে যে অতৃপ্তি আসে, যে অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা মনের ভিতর বসিয়া যায় তাই কল্পলোকে কথা ও কাব্যরূপে আকারিত হইয়া উঠে। এমন যদি কোনও ঘটনা ঘটে যা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, যাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বুদ্ধি ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন আমাদের চিত্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, কল্পনার সাহায্যে তার একটা ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

আধুনিক মনস্তত্ত্বে স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। মনের ভিতর যে সব আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি চাপ পড়িয়া যায়, হয়তো বা সংবিতের ভিতর আসিতেই পারে না মগ্ন-চৈতন্যের সেই সব প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা প্রতীকের সাহায্যে স্বপ্নে ফুটিয়া উঠে ইহা ফ্রয়েড প্রমাণ করিয়াছেন। কাব্য ও কথা জাগ্রত স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। যেটা মনে হওয়া উচিত ছিল, অথচ হইল না বলিয়া মনে একটা অতৃপ্তি রহিয়া গেল, যে আকাঙ্ক্ষাটা পরিতৃপ্ত হইল না তাহা লইয়াই কথা, তাহা হইতেই কাব্য। যে সব প্রতীক আশ্রয় করিয়া এই আকাঙ্ক্ষাগুলি ফুটিয়া ওঠে তার ভিতরও এই চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষার আবেষ্টনের ক্রিয়া দেখা যাইতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমি আমার কথাটা বুঝাইয়া বলিব। একবার কোনও রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা কুলী একটা সাহেবের মাল ফেলিয়া দিয়াছিল। অতিকায় সাহেব তৎক্ষণাৎ কুলীকে পশ্চাৎ হইতে লাথি মারিয়া শাস্তি দিল। নিরীহ কুলীর উপর এই অত্যাচার দেখিয়া আমার বড়ই রাগ হইল, কিন্তু কিছুই করা আমার পক্ষে সম্ভব মনে হইল না। আমি মনে মনে গজরাইতে লাগিলাম। সাহেবকে খুব ঘা কয়েক দিবার জন্য আমার হাত নিশ্ পিশ্ করিতে লাগিল; কিন্তু অশক্তি এবং এমন কাজের ফলাফল বিবেচনা প্রভৃতি নানা কারণে আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মন তাই বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। আমি কল্পনা

করিতে লাগিলাম, আমি মহা শক্তিশালী! আমি গিয়া ওই সাহেবের সঙ্গে তকরার করিতে গেলে সে যেই আমাকে মারিতে আসিল অমনি তার ঘুষিটা ধরিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া এমন মার দিলাম যে বাছাধন বুঝিয়া গেলেন। তারপর পুলিস আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল, আদালতে আমার বিচার হইল। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিল, জেরা, জবানবন্দী হইল, আমি আমার বক্তব্য বলিলাম—এমনি করিয়া একটা লম্বা জাগ্রত স্বপ্ন আমার মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল। এ স্বপ্নের মূল আমার রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা যে প্রতীকের আশ্রয় লইয়া স্বপ্ন হইয়া উঠিল তাহার মূল আমার মগ্ন চৈতন্যে, আমার সমস্ত চরিত্রে সমস্ত জীবনের শিক্ষা ও সংস্কারে। তার একটা পরিচয় এই যে এই সব জাগ্রত স্বপ্নে আমার মনে চট্‌ করিয়া আইন আদালতের কথা কেমন করিয়া আসিয়া পড়ে আর বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে তাহা যে আইন ব্যবসায়ী নয় তার হইতে পারে না।

এমনি করিয়া রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা বুদ্ধির অতৃপ্তি হইতে সংস্কারের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে কথা ও কাব্য। মূলে এ দুইটীর ভিতর প্রভেদ অনেক সময় বুঝিয়াই ওঠা যায় না। পৃথিবীর প্রথম কাব্য ও প্রথম কথা বোধ হয় myth বা অলৌকিক কথা। কঙ্গোর নিগ্রোদের বিশ্বাস সূর্য্য একটি বৃদ্ধ; সে সারাদিন পাহারা দিয়া শেষে সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিমের পাহাড়ে তার কুঁড়ে ঘরে বিশ্রাম করে। আমাদের বেদে সূর্য্য ও ঊষা সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। কত রকম কত উপাখ্যান আছে। এগুলি কাব্য ও বটে, কথাও বটে এগুলি কাব্য ও কথা দুইয়েরই মূল।

সেই আদি কবিগণ আকাশে সূর্য্য দেখিতেন, রোজ তার উদয়াস্ত দেখিতেন, দিবা নিশা ঊষা ও সন্ধ্যার পারম্পর্য্য দেখিতেন, কিন্তু ইহাদের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বুঝিতেন না। কিন্তু না বুঝিয়া চুপ মারিয়া যাওয়া মনের স্বভাবই নয়, তাই তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাদের সম্মুখে এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অলৌকিক মানবরূপে আঁকিয়া দিত, তাহাদের লীলা খেলার ছবি আঁকিয়া বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিত। আজও কবি তেমনি ফুলের মুখে হাসি, হাওয়ার ভিতর প্রেম ও পাগলামি দেখিয়া চিত্তের ঠিক এই একই খেয়াল পরিতৃপ্ত করেন। আবার বৈজ্ঞানিক ঠিক এই আকাঙ্ক্ষাকেই লাগাম পরাইয়া Hypothesis গড়িয়া আপনার কাজে লাগাইয়া দেন।

মনের ভিতর যে সব অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তি জমাট বাঁধিয়া থাকে তাহা হইতে একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। কবি ও শিল্পীর মনে সেই আকাঙ্ক্ষা একটা পরিপূর্ণ প্রতীক হইয়া দেখা দেয়। এমন একরূপে দেখা দেয় যাহাতে সেই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা পরিতৃপ্তি লাভ করে। অন্যের মনে সে আকাঙ্ক্ষা হয়তো তেমন তীব্র হয় না, না হয় তো তাহা প্রকাশের যোগ্য প্রতীক খুঁজিয়া পায় না তাই তাহা চিত্তের ভিতর গুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কবি বা শিল্পী তাঁর কল্পনাকে ভাষায় বা চিত্রে গাঁথিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হন তখন তার অন্তরের গুপ্ত কন্দর হইতে এই সব আকাঙ্ক্ষা ছাড়া পাইয়া বাহির হইয়া তৃপ্তি লাভ করে। যার মনে প্রকাশ বা প্রচ্ছন্নভাবে এই একই আকাঙ্ক্ষা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রতীক খুঁজিতেছিল সেই কেবল এ তৃপ্তি লাভ করিতে

পারে, তার কাছেই কবি বা শিল্পীর কলার আদর হয় অন্যের কাছে হয় না।

কিন্তু শিল্পীর বা কবির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ষোল আনাই তাঁর নিজস্ব নয়। তাঁর ভাব, চিন্তা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার কতখানি যে অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ধার করা তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, We do not pay enough heed to the fact that a writer, even if he is very original, borrows more than he invents......His very thought is inspired into him from all sides. He has received the colours, he only brings the shades, though these are, I know, infinitely precious. Let us be sensible enough to recognise it : our works are far from being all ours. They grow in us, but their roots are every where in the nourishing soil. Let us admit that we owe a good deal to every body and that the public is our collaborator." যে সব রুদ্ধ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার মগ্নচৈতন্যের ভিতর প্রতীক খুঁজিয়া ফিরিতেছে তার অনেকটাই আমার সমধর্ম্মী সমসাময়িকের সঙ্গে এক, তার অনেকটা আমি তাদের কাছেই পাইয়াছি। তাই, যে প্রতীক আশ্রয় করিয়া তাহা কল্পনায় ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা যেমন আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে, তেমনি তাহাদেরও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কবি ও শিল্পীর চিত্তের আকাঙ্ক্ষা যে কল্পনায় তৃপ্ত হয় প্রায়ই তাহা তাঁহার সমসাময়িক সমাজের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। কিন্তু কবির বিশেষত্ব এই যে তাঁর চিত্ত সমসাময়িক সমাজ হইতে অল্পবিস্তর অগ্রসর। তাঁর কল্পনা কেবল সমাজের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে না, সাধারণের চিত্তের ভিতর নূতন আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত করিয়া তুলে। সে তত বড় কবি যে পাঠকের অন্তরে বেশী করিয়া নূতন ভাবের ধারা বহাইতে পারে। কিন্তু এই ভাব প্রেরণা (suggestion) দিবার শক্তি কবির হয় শুধু এই জন্য, যে কবি যুগসমাজের চিত্তের আকাঙ্ক্ষার সহিত যোগ রাখিয়া কল্পনা করেন এবং সেই কল্পনা এমনরূপে উপস্থিত করেন যাহাতে সমাজের চিত্ত তৃপ্ত হয়।

কাব্যের মত কথা-সাহিত্যেরও সফলতার মূল এই সহানুভূতি, লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই আকাঙ্ক্ষার যোগ। যেখানে এই সংযোগ নাই সেখানে লেখকের কথা আদর পায় না, যেখানে এই সংযোগ আছে সেখানে তাহা সমাদর পায়। শিশুর কাছে রাজারাণীর কথাই মনোরম, উচ্চ অঙ্গের কাব্যের তলায় যে পরিণত চিত্ত ও আকাঙ্ক্ষা আছে শিশুর চিত্তে তাহা নাই তাই শিশু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সত্য সত্যই বলে,—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে!
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি, বল্ মা সত্যি করে!
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কি হ'বে?
তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেন না কো উনি?
ঠাকুর মা কি বাবাকে কখ্‌খনো
রাজার কথা শোনায়নিকো কোন?
সে সব কথা গুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

শিশুকালে রূপকথা শুনিয়া যে আনন্দ পাই য়াছি, আজকার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে আনন্দ পাই কি? অথচ সেই আনন্দের সন্ধানে যদি আজ আমরা রূপ-কথা পড়িতে বসি তবে তৃপ্তি পাইব না। এক বয়সে Scott এর উপন্যাসের সব বীর-কীর্ত্তিতে আত্মহারা হইয়া বার বার পড়িয়াছি আজ সে বইয়ে সে তৃপ্তি পাই না। পরিণত বয়সের লোকের ভিতরও favourite author লইয়া মতভেদ আছে, লেখার ভালমন্দ বিচার লইয়া মতভেদ হয়। সব সময়েই, বিশেষ করিয়া যুগসন্ধি স্থলে, এক একটি লেখক সম্বন্ধে লোকের মত যে কত রকম হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক লেখক-দের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আজও আমাদের মধ্যে এমন লোক দেখা যায় যাঁরা স্কটকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে এমন লোকও আছেন যাঁহারা মনে করেন যে স্কট অতীত যুগের লেখক, বর্ত্তমানের সাহিত্যে তাঁর স্থান নাই বলিলেও চলে। এর একটাও আমার নিজের মত বলিয়া বলিতেছি না, এ সব মত আমি অপরের কাছে শুনিয়াছি। এত নানাবিধ Culture এর ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সমাজের ভিতর এত বিচিত্র শক্তি নানাপথে ক্রিয়া করিতেছে, যে এই সমুদয় কারণের বিবিধ সংমিশ্রণে নানাচিত্তে নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার, সংশ্লেষের (complex) সৃষ্টি হইতেছে। তাই যাহা একের তৃপ্তি সম্পাদন করে তাহা অন্যের কাছে বিস্বাদ লাগে।

তবু মানবের আকাঙ্ক্ষার এই বিচিত্র সংযোগ বিয়োগের ভিতর কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহা চিরদিন সবার ভিতর এক। মানবসমাজের অপূর্ব্ব বিচিত্রতার ভিতর, তার নানা অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, মানবত্বের একটা প্রকাণ্ড সাধারণ ধারা বহিয়া চলিয়াছে। সেটা এত প্রকাণ্ড ও এত সাধারণ যে তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায় না। অত্যন্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া যাদের আমরা মনে করি, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতার ভিতর পরিপুষ্ট বলিয়া যাহাদের দূর বলিয়া মনে করি, দূরতম অতীতের লোক বলিয়া যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সংযোগ নাই বলিয়া মনে করি, তাদের সকলের সঙ্গে আমাদের অন্তর যে কতটা এক তাহা ভাবিতে অবাক হইতে হয়। এই সাধারণ মানব চরিত্র বলিতে যে আকা-ঙ্ক্ষার সংশ্লেষ বুঝায় তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থায়ী কাব্য, কথা বা শিল্প রচিত হয়। তাই Homer বা ব্যাস সুদূর অতীত হইতে আমা-দের হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারেন, তাই শেক্‌সপীয়ার জগতের কবি, তাই শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে জর্ম্মাণীর কবি মুগ্ধ, তাই চণ্ডীদাসের প্রেমের কবিতা পড়িয়া আজকার বাঙ্গালী চক্ষের জল ফেলে।

সাহিত্যের এই সার্ব্বজনীনতা লাভ করিতে হইলে যে সকল প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করিতে হয় তাহা নহে, প্রাদেশিক আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই চিরন্তন মানবের অন্তর ফুটিয়া উঠে, যদি শিল্পী কুশলী হয়, যদি সে সেই শাশ্বত মানবের আকাঙ্ক্ষার ভিতর তুলি ডুবাইয়া সে লিখিতে জানে। তাই নিতান্ত প্রাদেশিকভাবে যে সব গান বা ছবি বা কথা রচিত হইয়াছে তাও আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে।

(২)

সকল দেশের মত বাঙ্গলা দেশেও লোকের আকাঙ্ক্ষা আছে; বাস্তব জীবনের শত অতৃপ্ত ইচ্ছার ব্যথা এখানেও জমাট বাঁধিয়া নানা-

ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, গানে, ছন্দে, কথায়। সেই গান, সেই কাব্য ও কথা বাঙ্গালীর বিশিষ্ট সত্তার পরিচয়, তার বিশিষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাঙ্গালীর সেই হৃদয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে তার মানব হৃদয়, তাই সে গান ও কথা শুধু বাঙ্গালীর নয়, বিশ্বমানবের।

বাঙ্গালার প্রাচীন কথা রূপকথা, কাব্য, পাঁচালী প্রভৃতি। রূপকথার বিশেষত্ব তার অসাধারণত্ব। শিশু হৃদয়ে অশক্তির গুপ্ত অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে যাহা অসীম শক্তিশালী, সকল বাধাবিঘ্নাতিক্রমী বীরে, সকল রূপের আধার রাজকন্যায়, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত ঐন্দ্রজালিক শক্তির কল্পনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপকথা এই সব অলৌকিক অসাধারণ চরিত্রের অদ্ভুত কার্য্যকলাপে ভরা। ইহা শিশু-হৃদয়ে ও শিশু-প্রতিম বর্ব্বরের অন্তরে বড় আনন্দ দান করে। যখন মানুষ প্রথম কথা রচিতে শেখে তখন সে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের ভিতর কোনও সীমা স্বীকার করে নাই। বরং প্রকৃতির সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অলৌকিকের রাজ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াই তার কল্পনা আনন্দ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতই মানুষের বয়স বাড়িতে লাগিল ততই কল্পনার এই উদ্দাম ভাব কাটিয়া গেল। শিশুর যে উদ্ভট কল্পনায় আনন্দ হয়, পরিণত বয়সে লোকের তাহাতে আনন্দ হয় না, তাই সাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা যত উদ্দাম হয় পরিণত অবস্থায় ততটা হয় না। ক্রমে দেখিতে পাই সমাজের শৈশবের সেই স্বপ্ন পরিণতরূপে নানা পৌরাণিক কাহিনীতে গাঁথিয়া গিয়া পরম্পরা-গতভাবে চলিয়া আসিতেছে।

এই সব পৌরাণিক কাহিনী এবং কদাচিৎ বা কোনও বিশেষ কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের অলৌকিক কাহিনীই পরিণত বয়সের সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের উপজীব্য। উপাখ্যান রচনা ইঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছেন, মাত্র কয়েকটি সুপরিচিত কাহিনী লইয়, সকল কাব্য ও নাটক রচিত হইয়াছে। রামসীতার কাহিনী, মহাভারতের নানা কাহিনী লইয়া কত কবি কত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পশু পক্ষীর কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী, ভোজ-রাজের কথা, বিক্রমাদিত্যের কথা প্রভৃতি কয়েটি কথা লইয়া কত না গ্রন্থ, কত না কাব্য রচনা হইয়াছে।

বাঙ্গলার কাব্য ও কথাসাহিত্যেও তেমনি কয়েকটি চিরপ্রচলিত কাহিনীকে নানা কবি নানা ভাবে আঁকিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী, কালিকা বা অন্নপূর্ণার কাহিনী, মনসার কথা প্রভৃতি একই কথা লইয়া কত কবি কত কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ধনপতি সওদাগরের কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের কথা লইয়া অনেক কবি অনেক পালা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মূল কাহিনীতে বৈচিত্র্য খুব অল্পই আছে, কিন্তু সেই মূল কাহিনীর সঙ্গে লতা পল্লব যোগ করিয়া, নানামতে বর্ণনা করিয়া নানা কবি নানা রস সৃষ্টি করিয়াছেন। একই কথাকে নানা কবি নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনার বিচরণের ক্ষেত্র এইরূপে সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিভা গভীর-ভাবে (intensively) বিশ্লেষণ করিয়া রস-রচনা করিতেই বেশী মনোযোগ করিয়াছেন। তাই কৃষ্ণের কথা, কালীর কথা মনসার কথা এমন নানা বিচিত্ররসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সব কথা আশ্রয়

করিয়াই বাঙ্গালীর অন্তর, বাঙ্গালীর নানা আকাঙ্ক্ষা বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেবল খুল্লনা, লহনায় বাঙ্গালী কবি আপনার ঘরের কথা বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের তুলিকায় মেনকার ভিতর বাঙ্গালার মা ও পার্ব্বতীতে বাঙ্গলার মেয়ে এমন কি শিব, নারদ, নন্দী সকলের ভিতরই বাঙ্গালা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলায় কথা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল দেব দেবীর কথা লইয়া। কিন্তু ক্রমশঃ কথার গণ্ডী বিস্তীর্ণ হইয়া দেব দেবীকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল লিখিতে লিখিতে লিখিয়া বসিলেন মানসিংহ, লিখিলেন বিদ্যাসুন্দর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক বিপুল প্রশস্তি করিতে গিয়া তিনি বাঙ্গলার প্রথম ঐতিহাসিক উপাখ্যান লিখিয়া বসিলেন।

কিন্তু বাঙ্গলার পুরাতন কথার আদ্যোপান্ত অলৌকিক ও অত্যন্ত অসাধারণ ব্যক্তি ও ঘটনা লইয়া লেখা হইয়াছে। দেবদেবী, রাজা রাজড়া এ সব কাহিনীর নায়ক নায়িকা। এসব উপাখ্যানের বিষয় তাহাদের অদ্ভুত কর্ম্ম যাহাতে কল্পনাকে মাতাইয়া তোলে। সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনের হাসিকান্না লইয়া এসব উপাখ্যান রচিত হয় নাই। সে চেষ্টা প্রথম হয় আধুনিক উপন্যাসে।

আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য সাহিতে গল্প লেখার যে প্রথম চেষ্টা হয় তাহার বিষয় ছিল সংস্কৃত আরবী ও ফারসী অদ্ভুত উপাখ্যান। সে সব গল্পের লেখক ছিলেন সাবেকী লোক; তাঁরা ছিলেন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী সাহিত্যের রসজ্ঞ। সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে গল্প রচনার প্রথম চেষ্টা বোধ হয় "আলালের ঘরের দুলাল।" "আলাল" ও এই শ্রেণীর উপাখ্যান, কথা-সাহিত্যে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর পথ সন্ধানের চেষ্টা মাত্র। পথসন্ধানীর দল আপনার কাজ করিয়া গেলে সেখানে তুরী ভেরী বাজাইয়া চতুরঙ্গ দলে আসিলেন রাজা—বঙ্কিমচন্দ্র!

বঙ্কিমচন্দ্র ও সেকালের কথা-সাহিত্যের মাঝখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান; আর সে ব্যবধান জুড়িয়া ছিল ইংরেজী কথা-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন এদেশে ইংরাজী কোন্ কোন্ উপন্যাস বিশেষভাবে চলিত ছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। জনসনের রাসেলাস পাঠ্য ছিল এবং তার একখানা অনুবাদও বাহির হইয়াছিল। Fielding ও Smollett এর বই অনেকে পড়িত। Dickens বা Thackeray তখনও বোধ হয় এদেশে পরিচিত হন নাই। Jane Austen এর গ্রন্থ বিলাতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও বাঙ্গলা দেশে সেকালে বেশী চলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঠিক সেই সময়ে এবং তার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন নাটকে সেক্সপীয়ার এবং উপন্যাসে স্কট। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয় স্কটের ছায়ায়।

স্কটের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে Jane Austen, Edgeworth প্রভৃতির রচনায় Comedy of Manners বা শান্ত সামাজিক কথার পত্তন হইয়াছিল। অলৌকিক, অসাধারণ আদর্শ ব্যক্তির চরিত বা লোমহর্ষণ ঘটনার দ্বারা কৌতূহল উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া ঔপন্যাসিক বাস্তব জগতের সাধারণ সহজ ঘটনার ভিতর কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপাদানের সন্ধান করিতেছিলেন। Jane Austen এদিকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তীকালে আরও পরিসর লাভ করিয়া অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানকালের শান্ত সামাজিক কথায়

পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে স্কট একখানার পর আর একখান রোমান্স সৃষ্টি করিয়া, ইতিহাসের অতীতযুগ হইতে অদ্ভুত অসাধারণ চরিত্র, আশ্চর্য্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর সমাহার করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য সমাজকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিলেন যে, শান্ত উপন্যাস কিছুদিনের মত চাপা পড়িয়া গেল। স্কট নিজে জেন অষ্টেনের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁহার সময়ে অষ্টেন তেমন আদর পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় বাঙ্গলা দেশেও যে পান নাই তার পরিচয় কমলাকান্ত! কমলাকান্ত বলিয়াছে, "Jane Austen বা George Eliot উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।" পক্ষান্তরে Bulwer Lyttonএর উপন্যাসের সে সময় অত্যন্ত খ্যাতি ও বিস্তৃতি ছিল। Lytton, Scottএর শিষ্য এবং তাঁরই পন্থার অনুসরণকারী।

সাধারণ ভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন তখন এ দেশের শিক্ষিত সমাজে সেই কথারই বিশেষ খ্যাতি ছিল যাহা আমাদের অদ্ভুতত্ব পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। "চাহার দরবেশ" বা "হাতেম তাই"ও এই শ্রেণীর উপন্যাস, কিন্তু ইহা শিক্ষিত সমাজকে তৃপ্ত করিতে পারিত না, কেন না ইহাদের রস ছিল অত্যদ্ভুত। যে অদ্ভুত রস সেকালের নব্য বাঙ্গালীর প্রীতিপ্রদ ছিল তাহা অদ্ভুত হইলেও স্বাভাবিক হওয়া দরকার। তাই একালে যে Romance এর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস—স্কট বা লিটনের ধরণের। তাহার ঘটনা সব রোমাঞ্চকর, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, অথচ সেগুলি ইতিহাসের ঘটনার এমন একটা আবহাওয়ার ভিতর উপস্থিত করা হইয়াছে যে তাহাতে অপ্রত্যয় হয় না। সেই আবেষ্টনের মধ্যে ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই সাহিত্যের ছায়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী লেখা হইয়াছে।

(৩)

"দুর্গেশনন্দিনী" Ivanhoeর অনুকরণ কি না এ সম্বন্ধে অনেক নিরর্থক আলোচনা পড়িয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার সময় তিনি Ivanhoe পড়েন নাই। এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে Ivanhoeর যে পরিমাণ মিল আছে তেমন মিল অনেক সময় অনেক স্থলে দেখা যায় যেখানে পরস্পরের কাছে ধার করার সম্ভাবনাই থাকে না। গল্প লেখায় আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি এমন দৃষ্টান্ত একাধিক স্থলে দেখিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে Ivanhoeর মিল খুব বেশী নয়। বঙ্কিম চন্দ্র নিজে Miranda ও শকুন্তলায় যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, আয়েষা ও রেবেকায় তার চেয়ে সাদৃশ্য কোনও মতে বেশী নয় আর বঙ্কিমচন্দ্রের যেখানে বুলওয়ার লিটন ও উইল্কি কলিন্সের কাছে ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেখানে সত্য হইলে তিনি এ ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার হেতু কোনও দেখিতে পাই না।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী যে স্কটের ছায়ায়, তাঁর সাহিত্যের আবহাওয়ায় লেখা সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুর্গেশনন্দিনী ও Romance স্কটের উপন্যাসও Romance আর সেই রোমান্সের অদ্ভুতত্বকে সম্ভাব্য করিবার উপায় উভয়

স্থলেই একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টন যাহা কতক সত্য কতক মনগড়া। তা ছাড়া আরও অনেক বিষয়েই দুর্গেশনন্দিনীর কলা-বিকাশ প্রণালীর ভিতর স্কটের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে Romance এর এই আকর্ষণ চিরদিন ছিল। তাঁহার শেষ বয়সের সংস্কৃত রাজসিংহের ভিতরও এই আকর্ষণ পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান, তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলায়" ইহা পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত। মেদিনীপুরের সাগরতীরে বালিয়াড়ির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেক্সপীয়রের মিরান্দা ও কালিদাসের শকুন্তলার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁর চক্ষে কেমন করিয়া কপালকুণ্ডলার ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন নয়। তাঁর পরবর্ত্তীকালে লেখা "মিরান্দা, শকুন্তলা ও দেসদিমোনা" প্রবন্ধ হইতে আমরা পরিচয় পাই যে মিরান্দা ও শকুন্তলাকে কি চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "উভয়েই ঋষিকন্যা উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া অমানুষিক সাদৃশ্য প্রাপ্ত • • • উভয়েই ঋষি পালিতা। দুইটিই বনলতা, দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা • • • উভয়েই অরণ্য মধ্যে প্রতিপালিতা। সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া সুন্দর সরল বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে কেমন করিয়া পুরুষকে জয় করিব এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ তাহার মাধুর্য্য কালিমা প্রাপ্ত হয়।"

এই স্বভাব পালিতা নারীর চরিত্র ধ্যান করিতে মনে অনেক প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে। মিরান্দা ফার্ডিন্যাণ্ডকে দেখিয়াই ভাল বাসিয়াছিল। এমন মেয়ের এমনি ভালবাসা হয় কি? এমন মেয়ে যদি সংসারে গিয়া পড়ে তবে সে কেমন হয়? এসব ভাবনা হইতে কপালকুণ্ডলার উৎপত্তি, কাঁথির বালিয়াড়ি, কাপালিক, কপালকুণ্ডলার মন্দির প্রভৃতি এই সাগর মন্থনে এই কল্পনা লক্ষ্মীর আশে পাশে দাঁড়াইয়া তার জীবনটাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার চরিত্র অদ্ভুত; মতিবিবি Romance এর নায়িকা; কেবল নবকুমার সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ। প্রধানতঃ এই কয়টি চরিত্র লইয়া কপালকুণ্ডলা রচনা হইয়াছে ইহা খাঁটি রোমান্স। কিন্তু ইহার ভিতর মৃণ্ময়ীর গৃহজীবনের চিত্ররচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সামাজিক চিত্র রচনায় ক্ষমতা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ক্রমে ইহার পর তিনি Comedy of Manners লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই ক্ষেত্রেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল" নিঃসন্দেহ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

সমাজচিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী কি ছিল তাহার সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁহার প্রণালী উপনয়মূলক (Deductive)। তাঁর মনে প্রথম জাগিয়া ওঠে একটা প্রশ্ন,—সমস্ত কাহিনীটি তার সমাধান। কপালকুণ্ডলায় তিনি প্রশ্ন করিলেন, এমনি একটি সংসারানভিজ্ঞ মেয়ে যদি একটি যুবকের সঙ্গে মিলিত হয় এবং সংসারে গিয়া পড়ে তবে কি হয়? সমস্ত প্লটটা এই প্রশ্নের সমাধান। "রজনীতে" প্রশ্ন এই যে অনাশংসিতসম্পদা সুন্দরী এক

নারীর মনে কি ভাব হয়, কেমন করিয়া তার ভালবাসা জন্মে, আর সে সম্পদ্ পাইলে কি করে? রজনী তাহার উত্তর। "বিষবৃক্ষের" সমস্যা সুস্পষ্ট। পত্নীপরায়ণ সচ্চরিত্র নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিলে কি হইতে পারে? "কৃষ্ণকান্তের উইল" এই সমস্যারই একটা ভিন্ন উত্তর।

আমার মনে হয় কৃষ্ণকান্তের উইলের ভিতর আরও গূঢ় একটি অভিসন্ধি আছে। এই বইখানির লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য ভ্রমর—ভ্রমর চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইহার ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের অতীত যুগের একটা অপূর্ব্ব আদর্শ বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজের আবেষ্টনের ভিতর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমরের আদর্শ দ্রৌপদী।

কথাটা বোধ হয় নূতন; তাই একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমে দেখা যাক্, বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীচরিত্র কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন। সে কথার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্পষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর ভিতর দুইটি লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন, দর্প ও ধর্ম্ম।—তাঁহার "প্রবল ধর্ম্মানুরাগই প্রবৃত্ত দর্পের মানদণ্ড স্বরূপ।" "দ্রৌপদী" প্রবন্ধের গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকার চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা সহিষ্ণুতাগুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্য সাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। * * * একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অসম্ভব। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমার একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভ্রমর যে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত হিন্দুকাব্যের সাধারণ নায়িকার মত নয় তাহা সুস্পষ্ট। ভ্রমর দর্পিতা, তেজস্বিনী। আর দ্রৌপদীর মত তাহারও দর্পের আশ্রয় ধর্ম্ম। দ্রৌপদীর যে ধর্ম্মানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহা aggressive নহে, দ্রৌপদী তাহা বক্তৃতা করিয়া বুঝান না, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভিতর তাহা অনুস্যূত রহিয়াছে। ভ্রমরের ধর্ম্মানুরাগও তেমনি সুপরিস্ফুট। যাহা অধর্ম্ম তাহার প্রতি তাহার স্বাভাবিক বিরাগ। সব স্থানেই তাহার দর্পের আশ্রয় ধর্ম্ম। প্রেমের প্রতিমা ভ্রমর যখন ভাবিল যে স্বামী পাপ প্রেমে মগ্ন তখন সে সাধারণ সতীসাধ্বীর মত কাঁদিয়া কাটিয়া পায় লুটাইয়া পড়িল না, স্বামীকে লিখিল; "যতদিন তুমি ভক্তি যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।" যখন গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন 'ভ্রমর' জোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'তবে যাও—আর আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। * * * যদি আমি সতী হই। কায় মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * যদি এ কথা নিস্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।" একথায় ভ্রমরের দর্প আছে,

প্রেম আছে, সতীত্ব আছে আর ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব গুণ তার পরবর্ত্তী ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আর বিশ্লেষণ করিব না। শেষে, যখন গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ তখন যামিনী ভ্রমরকে বলিল, "যদি গোবিন্দলাল এখানে আসেন ?" তখন ভ্রমর বলিয়াছিল, "যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন ঈশ্বর তাহাকে সেই মতি দিন।" শেষে বলিল, "আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।" —বিপদ মানে, গোবিন্দলাল যদি ফিরিয়া আসেন। যামিনী বলিল "সে ত আহ্লাদের কথা।" "যামিনী বুঝিল না যে, গোবিন্দলাল হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।"

এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমর চরিত্রে ধর্ম্মের স্থান লক্ষিত করিয়াছেন। স্ত্রীহত্যাকারী মহাপাতকী স্বামীর সহবাস সে অসম্ভব মনে করিতেছে। এ বিষয়ে তাহার এই স্বাভাবিক বিরাগ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সম্মত। শাস্ত্রমতে পতিব্রতা নারীর "আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক দূষিতম্।" অপরিশুদ্ধ মহাপাতকী স্বামীর সঙ্গে সহবাসে বিমুখতা ভ্রমরের চরিত্রের এই ধর্ম্মপ্রবণতা ও তেজস্বিতা সুপরিস্ফুট করিয়াছে।

অনেক কথাই এ বিষয়ে বলিবার আছে; কিন্তু দুইটি বিশিষ্ট বিষয়ে ও বঙ্কিমব্যাখ্যাত দ্রৌপদী চরিত্রে সাদৃশ্য দেখাইয়া এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরকে কালো করিয়াছেন। কালো হইয়াও ভ্রমর পতি সোহাগিনী। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত কাব্য শাস্ত্রের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার আদর্শ অনুকরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণার কৃষ্ণত্ব তার গুণের গৌরব সূচিত করিতেছে। ভ্রমরেরও তাই। আর একটি ক্ষুদ্র কথা এই যে ভ্রমরের একটি ছেলে হইয়া আঁতুড়ে মারা গিয়াছিল, এ সংবাদটা লেখক কৌশলে আমাদের দিয়াছেন। এ ছেলের প্লটের পক্ষে কোনও প্রয়োজন নাই তবু এ আসিল কেন ? ইহার উত্তর দ্রৌপদী সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন। "এখন বুঝা যায় দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম। গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। * * কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। * * স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন, তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।" ভ্রমরের এক পুত্রের ঠিক এই তাৎপর্য্য কল্পনা কি অসঙ্গত ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর অদ্ভুতের মোহ শেষ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহা তাঁহার উপাখ্যানে যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অভিরাম স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া ভবানী পাঠক, সত্যানন্দ ও আনন্দমঠের চিকিৎসক পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত অল্প বিস্তর ঐশীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পাত্রকল্পনা তাঁর গ্রন্থে আছে। রজনীর শেষকালে চোখ হইল যোগবলে, শৈবলিনীর মতি ফিরিল স্বামিজীর মন্ত্রে, এমন নানারূপে ঐশীক্রিয়া তাঁহার কথার ভিতর কার্য্য করিয়াছে। স্কটের গ্রন্থেও এমনি সব অতিপ্রাকৃত বিষয় দ্বারা কাহিনীর কার্য্যপরম্পরার ভিতর যোগ সাধন করা হইয়াছে। তা' ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ,

যবননিগ্রহ, স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি লইয়া তাঁহার কল্পনাকে খেলাইতে তিনি ভাল বাসিতেন। রাজসিংহ যে ঔরঙ্গজেবকে নিগৃহীত করিয়াছেন, সন্তানেরা যে মুসলমান ও ইংরেজদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন এ কল্পনায় লেখকের একটা তৃপ্তির আনন্দ তাঁর লেখনীমুখে ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই সব অলৌকিক বীরকর্ম্ম তিনি আনন্দের সহিত আঁকিয়াছেন, আঁকিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন কিন্তু যদিও স্থান বিশেষে অতি প্রকৃতশক্তির আশ্রয় লইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই তবু মোটের উপর তাঁর উপাখ্যানগুলি অতিপ্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করে না। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত তাঁহার গল্প প্রকৃতের সীমা একেবারে অস্বীকার করিয়া অদ্ভুতের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করিতে চায় না। বেশীর ভাগ স্থলে তিনি এই অদ্ভুতের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন ইতিহাস আশ্রয় করিয়া, এদেশের রোমান্টিক অতীতের কল্পনা অবলম্বন করিয়া। এ বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণরূপে স্কট ও লিটনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ অবস্থায় তিনি তাঁর উপাখ্যানকে বেশীর ভাগ শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজী উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা Richardson, তাঁর Pamela, Clarissa Harlowe, Sir Charles Grandison প্রভৃতি উপন্যাসকে উপদেশ দিবার মত করিয়া রচিয়াছিলেন, এবং এপথে তাঁহার যে শিষ্য প্রশিষ্য না আছে তাহা নয়। কিন্তু যখন উপন্যাসের রসবোধ ইংলণ্ডে জাগিয়া উঠিল, তখন এই didactic বা উপদেশমূলক উপন্যাস শ্রদ্ধা হারাইল। জীবনকে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া ঘটনা বিন্যাসদ্বারা কৌতূহলের উদ্রেক করা ও রসবোধ পরিতৃপ্ত করাই উপন্যাসের জীবন বলিয়া পরিগণিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ও মধ্যযুগের উপন্যাসে শিক্ষকতার কোনও চেষ্টাই নাই। মধ্যযুগে শিক্ষার চেষ্টা কিছু কিছু আসিতেছে; শেষকালে শিক্ষক উপন্যাস লেখককে প্রায় অভিভূত করিয়াছে। ইউরোপে ইদানীন্তন কালে এমনি একদল ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি হইয়াছে যাঁরা উপন্যাসকে শিক্ষার বাহন করিতেছেন। Tolstoy, Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw, H. G. Wells প্রভৃতি কথালেখক তাঁহাদের গ্রন্থকে স্ব স্ব মতামতের বাহন করিয়া তুলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর বাঙ্গালার কথা-সাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। তাঁর ভিতর যে বীজ দেখিতে পাই তাহা পরবর্ত্তী কালে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকের গল্প শুনিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার তিনি যে আয়োজন করিয়াছেন তার ভিতর একদিকে আছে অসম্ভব অস্বাভাবিক কাহিনী বর্জ্জন করিয়া স্বাভাবিক জীবন আশ্রয়, অপর দিকে এই স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে যতদূর সম্ভব অদ্ভুত রসের সঞ্চার। এজন্য তিনি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইলে তাঁর যে চেষ্টা পরিণতি লাভ করিয়াছিল তার একটা ফল "স্বর্ণলতা।" ইহার ভিতর অদ্ভুতের বংশও নাই। "কৃষ্ণকান্তের" মত dramatic situation ও নাই। ইহা দরিদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের অনাড়ম্বর করুণ চিত্র। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সের প্রতিক্রিয়া। ইহার মধ্যে সরল সৌন্দর্য্যের অবধি নাই, কিন্তু ইহা রোমান্স নহে।

তারকনাথের ভিতর এই ধারা পরিপূর্ণ হইয়া আবার আর একটা সম্পূর্ণ নূতন রকম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে লিখিয়াছিলেন রোমান্স। তাঁর "বউঠাকুরাণীর হাট" রোমান্স, "রাজা ও রাণী" রোমান্স, "রাজর্ষি" ও রোমান্স। কাব্যের ভিতর তাঁর কল্পনা তো চিরদিনই প্রাকৃতের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া অতি-প্রকৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়াছে আজও করিতেছে। কিন্তু মধ্যযুগে এবং বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে রোমান্সের পন্থা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত উপাখ্যান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। কবির চক্ষে তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, কবির তুলিতে লিখিয়াছেন। জীবনের বাহিরটা তিনি যতটা দেখিয়াছেন, ভিতরটা তার চেয়ে বেশী দেখিয়াছেন। তাই তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই দীর্ঘ ভাব বিশ্লেষণে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁর মধ্যবয়সে ছোট গল্পের মধ্যে তার কবির দৃষ্টি এক একটি ছোট ভাবকে কেন্দ্র করিয়া নিপুণ ভাবে তার আশে পাশে নিতান্ত আবশ্যক আবেষ্টন গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প এক একটি ছবির মত এক একটি ঘটনার ভাবময় প্রতিকৃতি। তাঁর পরিণত বয়সের "পলাতকার" কবিতাগুলিও এই শ্রেণীর। ছোট গল্পের আদর্শ তিনি পাইয়াছিলেন ফরাসী সাহিত্যে। কিন্তু তিনি সে আদর্শ খাঁটি বাঙ্গালার আবহাওয়ার ভিতর বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তা দিয়া ফুটাইয়া অতি সুন্দর এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বঙ্গদর্শনের নূতন পর্য্যায় বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়। এ দুখানি এক গোত্রের বই। ইহাদের কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতর ফেলা বড়ই শক্ত, কেন না, এগুলি কিম্বা 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' কোনওটাকেই সাহিত্যের একটা ধরাবাঁধা শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা আলোচনা করিতে গেলে আমাদের মোপাসাঁর উপদেশ স্মরণ হয়। তিনি বলেন, উপন্যাস লিখিবার কোনও ধরাবাঁধা প্রণালী নাই। শক্তিমান্ লেখক প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন। সমালোচকের সেগুলি শ্রেণী বিভাগের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় অতিপাত না করিয়া ঠিক যেমনটি লেখা হইয়াছে তাই ধরিয়া লইয়া তার রস গ্রহণ করা উচিত। রসগ্রাহীর কেবল দেখিতে হইবে যে লেখার ভিতর কোনটুকু নূতন। রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আগাগোড়াই নূতন। তা' ছাড়া এক এক যুগে তিনি এক এক নূতন পন্থা ধরিয়াছেন। তাঁর আদি যুগের রোমান্সের সঙ্গে, পরবর্ত্তী ছোট গল্পের সম্পর্ক অভেদের নয়। ছোট গল্পের পর তাঁর "চোখের বালি" পর্য্যায়ের গল্প একটা নূতন জিনিষ। তার পর 'গোরা', সে একাই এক স্বতন্ত্র বস্তু। তারপর "স্ত্রীর পত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া "ঘরে বাইরে' পর্য্যন্ত এক পর্য্যায়। ইহা ছাড়া তাঁর নাটক আছে, কথা কাব্য আছে কত কিছু আছে।

এ সবের বিশদ আলোচনায় একটা গ্রন্থ লেখা চলে। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের উপাখ্যানের একটা বিশেষত্বের উল্লেখ করিব যে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পন্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ কাহিনীই মনের ইতিহাস।

'চোখের বালির' উপাখ্যান অত সামান্য, ঘটনা কয়টি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায়। 'নৌকাডুবির' যদিও একটা ভয়ানক dramatic situation এ আরম্ভ তবু তার উপাখ্যান খুব বিস্তৃত নয়। 'গোরার' ভিতর কর্ম্মবহুল dramaর যথেষ্ট অবসর ছিল, তবু গোরার পরিসরের তুলনায় তার ঘটনার সংখ্যার পরিমাণ কিছুই নয়। "ঘরে বাইরে" "চতুরঙ্গ" "স্ত্রীর পত্র" "ভাইফোঁটা" প্রভৃতি সবই এই রকম। এ সকল উপাখ্যানের প্রধান উপাদান মনের সূক্ষ্ম ও বিস্তীর্ণ ইতিহাসে। নাটকের জীবন ঘটনায়। একজন কৃতি নাট্যকার গোরা বা নৌকাডুবির মূলঘটনা আশ্রয় করিয়া এমন একটা কাহিনী গড়িতে পারিতেন যাহাতে কৌতুকাবহ ঘটনার পর ঘটনা কৌতুহল উদ্দীপ্ত ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিত, সেটা হইত বাহ্য ইতিহাস, যাকে চোখে দেখা যায় এমন একটা ইতিহাস। তার ভিতরে নিগূঢ় থাকিত অন্তরের কথা, অল্প সল্প কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে সে কথা প্রকাশ হইত কিন্তু চিত্তের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ থাকিত না। পাত্র পাত্রীদের অন্তরের কথার ইতিহাস গড়িয়া লইবার ভার থাকিত পাঠকের হাতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘটনাটার বাহ্যিক প্রকাশের বড় কম মূল্য। প্রত্যেকটি ঘটনার পাত্র পাত্রীদের মনের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হইল, কেমন করিয়া তাদের চিত্তের ভিতর ভাব ও চিন্তাগুলি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিল ইহাই তাঁহার কাছে সব চেয়ে বেশী দরকারী কথা। তাই তিনি চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া এই ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে সুনিপুণ ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছেন। তাঁর এই যে ভাব বিশ্লেষণ তাহা Psychologistএর বিশ্লেষণ নহে, কবির বিশ্লেষণ। এ বিদ্যায় তাঁর প্রতিযোগী আছে, বিশেষ করিয়া ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে, কিন্তু তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। উপাখ্যান-লেখক সাধারণতঃ মনের কথা বেশী লেখেন না, কেন না এই সব ইতিহাস প্রায়ই নীরস হইয়া পড়ে। মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া উপাখ্যান পাঠ করিতে বসে তাহা এই সব বিশ্লেষণ প্রায়ই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, তাই উপাখ্যান অনেক সময় তাহাতে অত্যন্ত রসশূন্য ও সাধারণ হইয়া পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় ক্ষমতার বলে ঠিক এই ভাব বিশ্লেষণে এমন ভাবে কৌতুহলের উদ্রেক করিতে পারেন, চিত্তকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া ফেলেন, যে মনোযোগ বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে gripping interest তাহা রবীন্দ্রনাথের এই চিত্ত বিশ্লেষণে যেমন দেখা যায় অনেক বড় বড় ঘটনাবহুল উপন্যাসে বা নাটকে তাহা হয় না। নষ্টনীড়ে" চারুর মন ধীরে ধীরে অমলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, 'ঘরে বাইরেতে' বিমলাও সন্দীপের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, পায় পায় তাহারা অগ্রসর হইয়া একটা গভীর অন্ধকূপের কিনারা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, এই ইতিহাস পড়িতে যে একাগ্র কৌতুহল উদ্রিক্ত হয় তাহা অতুলনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে অতিপ্রকৃত ক্ষেত্র হইতে অবতীর্ণ করাইয়া স্বাভাবিকের ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলেন। বিষবৃক্ষাদি গল্পে তিনি রোমান্স বর্জ্জন করিয়া শান্ত সামাজিক করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অদ্ভুত ছাড়িয়া সাধারণের ভিতর কৌতূহলের উপাদান খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। 'স্বর্ণলতায়" এই ইতিহাসের ধারা

পরিণতি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়ও এই সহজ সাধারণ জীবন, ইহার ভিতর রোমান্স নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সাধারণের তলা খুঁড়িয়া মানুষের ভাবরাজ্যে কৌতূহলের অশেষ উপাদান সঞ্চয় করিয়াছেন Comedy of Menners যে অন্ধকুঠারীর দ্বারদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া তার ভিতর কদাচিৎ আলোকপাতে তার অংশবিশেষ উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, রবীন্দ্রনাথ সেই কুঠারীর ভিতর বিজলী বাতি জ্বালিয়া তার লুক্কায়িত রত্নরাজি আলোকিত করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তির নূতন পন্থা বাহির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁর আর্ট হয়তো বা তাঁর নিজের আবিষ্কার, না হয় তো তিনি এ বিষয়ে ফরাসী কথা-লেখকদের বিস্তার ভিত্তির উপর গড়িয়াছেন। কিন্তু যাহা গড়িয়াছেন তাহাতে বোধ হয় তাঁর চেয়ে আর কেহই অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্ত্তমানের সাহিত্য। কিন্তু তাঁর চেয়ে অল্প বয়সের অনেক লেখক ও লেখিকা এখন কথা-সাহিত্যে নূতন নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভারতীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এক হিসাবে তাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের। তাঁহাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু বিচিত্রতা আছে, কার কতটা আছে, কার কতটা দোষগুণ তাহা হয়তো নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, লক্ষ্যও বোধ হয় আমরা ঠিক করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল কৃতী সাহিত্যিকের মধ্যে একজন এমন বিশিষ্ট ভাবে মাথা উঁচু করিয়া আছেন, এবং এমন স্পষ্টভাবে তিনি কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট নূতন সম্পদ দান করিয়াছেন যে তাঁহার কথা উল্লেখ না করিলে এ প্রবন্ধ গুরুতর অপূর্ণতা-দোষে দোষী হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎ বাবু অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন, আরও অনেক লিখিতেছেন। তাঁহার হাতে যাহা বাহির হইয়াছে তার ভিতর বৈচিত্র্য আছে। নানাদিক দিয়া তাঁর উপন্যাসের আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি তাঁহার উপন্যাসগুলির একটি দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ইউরোপে কথাসাহিত্যে স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারেকে ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। জর্জ্জ মেরেডিথ, হেনরী জেম্‌স, টমাস হার্ডি, রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন, H. G. Wells প্রভৃতি কৃতী লেখক কথাসাহিত্যে নূতন নূতন পন্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশীর মধ্যে Zola, Guy de Maupassant, Anatole France, Gautier, Tolstoy, Turginev, Dostoevsksy, Maeterlinck, Ibsen, Bjornsen, Strindberg, Bernard Shaw প্রভৃতি বহু বহু কৃতী লেখক নানা দিক দিয়া কথা ও নাট্য-সাহিত্যের বৃদ্ধি ও পরিণতি সম্পাদন করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সব নূতন ধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তাহাদের কলা-বিকাশ তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ভাব প্রেরণা ইঁহাদের ভিতর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে কার্য্য করিতেছে। কাজেই আজকার উপন্যাস যে গতযুগের বাঙ্গলার উপন্যাস হইতে ভিন্ন হইবে সে আর বিচিত্র কি? কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্য বাঙ্গলার সাহিত্যিকদের উপর ঠিক প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিশিষ্ট প্রভাবের চেয়ে পরোক্ষভাবে সমষ্টিভাবেই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইহার ফলে বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গলা কথা-সাহিত্য জী‘নের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়া সাহসের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছে। দেশের ও সমাজের ভিতর যে সকল শক্তি অনুস্যূত থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে সেগুলি বিশিষ্ট অবস্থা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া একদিকে দেশকে ও মানবকে ভাল করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং অল্পবিস্তর একটা উন্নত আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহা কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের নয় আজকার বিশ্ব-সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এইরূপে বিশ্বসাহিত্যের একটা অঙ্গাঙ্গীযোগ সাধিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথার ভিতর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব কেহই দেখাইতে পারিবে না। তাঁর প্রাণটা খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ, আর তিনি আঁকিয়াছেন খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন। বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারের জীবন তাঁর মত আর কেহ আঁকিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু তিনি সুধু আলো আঁকেন নাই, ছায়াও আঁকিয়াছেন, আর ছায়ার ভিতর আলোর সন্ধান দিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য যে তিনি তাহাদের নিকট পাইয়াছেন চিত্রাঙ্কনে এই কঠোর সত্যনিষ্ঠা। তিনি আদর্শবাদী নহেন। সমাজকে কোন বিশিষ্ট আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কোনও গল্প লেখেন নাই। তাঁর লেখার ভিতর সমাজের আলোচনা আছে, মাঝে মাঝে তীব্র ঝাঁঝাল সমালোচনা আছে; তাঁর কল্পিত মানব চরিত্রের ভিতর হইতে আমরা হয় তো অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে কেবল তাঁর চরিত্রচিত্রগুলি সত্য বলিয়া। সত্য মানুষের জীবন হইতে আমরা যেমন উপদেশ লাভ করিতে পারি, শরৎচন্দ্রের বই হইতে তার চেয়ে বেশী পাই না। বাস্তব জীবনের এই অনাড়ম্বর চিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রাণ।

এ বিষয়ে তারকনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্র তারকনাথের চেয়ে বিস্তৃত, কেন না, তিনি দেখিয়াছেন বেশী, লিখিয়াছেন বেশী; কিন্তু ক্ষেতের মাটি তাঁদের এক—বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর জীবন। কিন্তু তারকনাথ যেখানে সেই ক্ষেত চষিয়া, নিপুণ পাচকের হাতে সুমিষ্ট ডাল ভাত তরকারী বঙ্গবাসীর পাতে পরিবেশন করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বঙ্গভারতীর গলায় রত্নের মালা পরাইয়াছেন। সাধারণ জীবনের ভিতর, আমাদের চারিদিকে সাধারণ লোকের ভিতর যে রূপকথারই মত অসাধারণ, অদ্ভুতের উপাদান আছে তাহা তাঁহার মত দিব্যদৃষ্টিতে আর কোনও বাঙ্গালী লেখকই দেখিতে পান নাই। তাঁর ভিতর এই দিব্যদৃষ্টি আছে বলিয়াই তিনি এই সমুদয় অসাধারণ বিষয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া তার অন্তরের কথা এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে তাহার ভিতর "স্বর্ণলতার" সরলতার সঙ্গে রূপকথার অলৌকিকত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের ভিতর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর ভাষা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু তিনি ইহা আহরণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবহাওয়ার ভিতর। তাঁর উপাখ্যান রচনা ও বর্ণনার প্রণালীও তাঁর নিজস্ব; তবু তিনি খুব বিশেষ ভাবে রবীন্দ্র-নাথের নিকট ভাবের ইতিহাস গাঁথিবার

সঙ্কেতটা শিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও তাঁর পাত্র পাত্রীদের মনোভাবকে বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁর শ্রীকান্তের অনেকটা "নৌকাডুবি" বা "গোরার" মত ভাব বিশ্লেষণ পূর্ণ। কিন্তু তিনি এই বিশ্লেষণ এমন ভাবে করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার বিশেষত্ব প্রতি অক্ষরে সুপরিস্ফুট।

কিন্তু যে প্রকারে তিনি সাধারণ জীবনের ভিতর অসাধারণত্বের উপাদান সন্ধান করিয়া মানুষের স্বাভাবিক অদ্ভুতত্বের পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকের প্রতি অপ্রত্যয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন সেইটাই শরৎ চন্দ্রের সাহিত্যেচেষ্টায় সবচেয়ে বড় ফল। তাঁহার এই কৃতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর শ্রীকান্ত। ইহার ভাষাও যেমন আড়ম্বরশূন্য হইয়াও শোভা-সম্পদে মণ্ডিত, কাহিনীটিও তেমনি সহজ আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়াও অপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক। "শ্রীকান্তের" ভিতর যে সকল পাত্রপাত্রী আছে তাহারা কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, আর যে সব ঘটনা ইহাতে আছে তেমন ঘটনা হয়তো হামেষাই আমাদের চারিদিকে ঘটিতেছে কিন্তু এই অনাড়ম্বর চেষ্টাবিহীন সরল উপাখ্যানের ভিতর সহজভাবে শরৎবাবু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া —ইহাদের প্রত্যেকটির চরিত্রের ভিতর এমন একটা অসাধারণত্ব আছে যাহাতে তাহাদের কাহিনী রূপকথার রাজপুত্রের কথার মতই চমকপ্রদ। ইহার কেহই সাধারণ নয়, প্রত্যেকটিই সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সাধারণের ভিতর অসাধারণ ফুটাইয়া তোলা কেবল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব নহে, বর্ত্তমান যুগ-সাহিত্যের এটা একটা সুপরিচিত উপায়। বাঙ্গলা সাহিত্যেও, শরৎবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্বে হইতেই এমন চেষ্টা দুই চারিটা হইয়াছে। সে সব চেষ্টার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয় শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "দিদি" ও "শ্যামলী"। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভিতর এই ক্ষমতা এতই প্রখর ও অসাধারণ যে ইহার সুন্দর পরিচয় তাঁর প্রথম লেখা "বড় দিদি" হইতে আজকার লেখা "দেনা-পাওনা" পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান ফুটিয়া রহিয়াছে। সহজ ও সাধারণ আবেষ্টনের ভিতর এতগুলি বিশেষ ভাবে দেদীপ্যমান অসাধারণ চরিত্র কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। "বিরাজ বৌ" শরৎ বাবুর একখানা অনাড়ম্বর সংসার চিত্র। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এ গল্প কিন্তু ইহার ভিতর বিরাজের যে চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা আগাগোড়া অসাধারণ। অসাধারণ বলিয়া সে আমাদের অপরিচিত নয়—আমাদের ঘরের কোণেই "বিরাজ বৌ" সম্পূর্ণ নূতন—সম্পূর্ণ অসাধারণ। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কায়মনোবাক্যে সতী। তবু সে স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিলাসী জমীদারের সঙ্গে গৃহত্যাগী হইল। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার যাহার দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে তেমনি করিয়াই বিরাজ বৌকে তিনি আঁকিয়াছেন।

কিরণময়ী ও সাবিত্রী যে অসাধারণ সে কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তারা দুজনেই ভালবাসে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভালবাসা। সাবিত্রীর ভালবাসা কেবল তাহার ব্যক্তিত্বকে আপনা হইতে দূরে সরাইতে ব্যস্ত, আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে বিলুপ্ত করিয়া তার প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টায় সে ব্যস্ত। অথচ

সে সাধারণ পতিপরায়ণা বাঙ্গালীর মেয়ের আদর্শের মত মেরুমজ্জাশূন্য প্রাণী নয়, তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের ভিতর চরিত্রের বল যেন ছুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঠিক তেমনি জোর আছে কিরণময়ীর চরিত্রে। প্রথম হইতেই সে তেজস্বিনী। উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে তেজে মন্দা পড়িল, উদ্দাম অশ্ব লাগাম পরিয়া সংসার করিতে লাগিয়া গেল, কিন্তু তার ভিতর জ্বলিতে লাগিল একটা তীব্র প্রেম যার আকাঙ্ক্ষিত একেবারেই অলভ্য বলিয়া সে আগাগোড়াই জানে। তাকে লাভ করিবার চেষ্টাও সে কখনও করে নাই। ইহা হইতে সাধারণ পরিণতি যাহা কিছু হইতে পারে সে সবের ধার দিয়াও এ গল্প যায় নাই। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে এত বেশী ভালবাসিত বলিয়াই দিবাকরের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। কতকটা এমনি বিনোদিনী গৃহত্যাগ করিয়াছিল মহেন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল বেহারী; মহেন্দ্রকে সে বেহারীকে লাভ করিবার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আর কিরণময়ী তেমন কোন ও আশা না করিয়া, নিরাশায় না ডুবিয়া, কেবল একটা উদ্দাম উন্মত্ততায় দিবাকরকে লইয়া চলিয়া গেল আর ভীরু অনিচ্ছুক দিবাকরকে পাপের কালিমায় লেপিয়া দিতে বিধিমতে চেষ্টা করিল—কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালবাসে বলিয়া। এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে কেবল কিরণময়ীর অপরূপ চরিত্রের কল্পনায়।

'বিন্দুর ছেলের' বিন্দুটি অসাধারণ, 'রামের সুমতির' রাম অসাধারণ, 'একাদশী বৈরাগী' অসাধারণ, শরৎ বাবুর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অসাধারণত্বে বোঝাই। এমন কি বারোয়ারী উপন্যাসের যে কয় পরিচ্ছেদ তিনি লিখিয়াছেন সেই স্থানেই গল্পটা একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে ও নায়িকার হঠাৎ মেরুমজ্জা গজাইয়া সে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্ভুত ও সৃষ্টিছাড়ার যে আকাঙ্ক্ষায় কথা-সাহিত্যের উৎপত্তি তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে এইরূপ সাহিত্যে যাহার ভিতর অস্বাভাবিক কিছুই নাই, dues ex machina পর্য্যন্ত নাই, নিতান্ত সহজ সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরায় এ কাহিনী গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু সেই ঘটনা পরম্পরার ফল অনাড়ম্বর সমাজচিত্র হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিক সম্ভব জগতের ভিতর অসাধারণ ও অলৌকিককে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিতে চান; সহজ জীবনের ভিতর রোমান্সের রোমাঞ্চ ঘটাইতে চান, সাধারণ জীবনে অসাধারণের উপাদান আহরণ করিয়া। তার জন্য তাঁরা নিত্য নৈমিত্তক জীবনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জীবনের ক্ষেত্র তাঁরা অণুবীক্ষণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন অন্তরের গভীরতম তলদেশে তাঁহারা ডুবুরী নামাইয়া দিয়াছেন, অন্ধকার মণিকোঠায় আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন।

আলোকে যারা অনভ্যস্ত তন্দ্রার ঘোরে যারা মশগুল হইয়া আছে, অন্ধকারে যাহারা বাণিজ্য করে, সবার মধ্যে চেঁচামেচীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কমলমণির আবির্ভাবে নগেন্দ্রের অট্টালিকায় যেমন অস্থায়ী বাসিন্দাদের সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি সোরগোল অনেক দিকে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিনই হইয়াছে। সত্য যখন আসে সে কোনও দিনই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিতে পায় না। অন্ধকারের রাজ্যে আলোর

রেখা যখন দেখা দেয় তখন যে চারিদিকে চেঁচামেচী লাগিয়া যায় সে যে কেবল আনন্দেরই কলরব এমন নয়, তার ভিতর বেদনারও আর্ত্তনাদ আছে।

আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের চারিধারে কতক সম্মতির কতক প্রতিবাদের কলরব শোনা যাইতেছে ইহাতেই প্রমাণ করে যে সত্য আসিতেছে, যে আলোতে অনেকের চোখ ধাঁধিয়া উঠিয়াছে যে আলো সত্য শিব সুন্দরেরই অপূর্ব্ব দ্যুতি—আর্টের আত্ম প্রকাশ, জীবনের নববিকাশ।*

তমাল

[শ্রীমৃণীন্দ্রনাথ ঘোষ]

শ্রীরাধার প্রিয় তরু সুন্দর তমাল,
গোবিন্দের শ্যামকান্তি তোমাতে প্রকাশ,
রাসরাতে দেখিয়াছ পূর্ণ প্রেমোচ্ছ্বাস,
ফাগুনের হোলিখেলা সব লালে লাল !
দেখেছ রাধার দাহ—হিয়া দগদগি
শ্যামের বিরহে তীব্র প্রেম-উন্মাদনা,
তোমাতে মাধব-ভ্রম বিলুপ্ত চেতনা,
কেঁদেছে শাখায় শুক—কাননে কুরঙ্গী।
শ্যামস্পর্শসুখে ভরা সে ভুজ-বল্লীর
পরমপরশ আজো স্ফুরে তব প্রাণে,
আছ মৌন মাধবের লীলাস্মৃতি ধ্যানে,
অঙ্গে কি মোহিনী মালা মাধবী মল্লীর !
রাধাপদস্পর্শসুধা জানে প্রাণে, বীজে,
সেই সুধা, নিধি, বন্ধু দাও তুমি নিজে।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত

পুস্তক-সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

ফুলের ব্যথা।—(কাব্য) শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা ৪৯এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট 'বিচিত্রা' প্রেস লিমিটেড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পর গীতিকবিতার সরস রচনায় বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন হেমেন্দ্রলাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। শিল্প মাধুর্য্যের উৎকর্ষতায়, মানবমনের অনন্ত ভাব সম্পদের সৌন্দর্য্যে, ছন্দোবন্ধের মনোহারিত্বে, ব্যঞ্জনাশক্তি ও প্রসাদগুণের চমৎকারিত্বে হেমেন্দ্রলাল খুব অল্প কবিতা লিখিয়াও সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনায় ভূরি প্রসব নাই বলিয়া প্রকাশিত কবিতাবলীর মধ্যে একদিকে যেমন কবিপ্রাণের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই, অন্য দিকে তেমনি কলাকৌশলের বাহাদুরী দেখিয়া মুগ্ধ হই। তিনি এ পর্য্যন্ত যে সব খণ্ড কবিতা লিখিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ প্রবাসী, ভারতী, উপাসনা প্রভৃতি মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গুলির মধ্য হইতে বাছিয়া এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত নূতন কবিতার সংযোগ করিয়া এই 'ফুলের ব্যথা' প্রকাশিত হইল। সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় (ভূতপূর্ব্ব 'সবুজ পত্রের' সম্পাদক) কবিতাগুলি বাছিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সমালোচন দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণে হেমেন্দ্রলালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি 'ফুলের ব্যথায়' স্থান পাইয়াছে।

সমগ্র মানবমনের যে বিকাশের ব্যথা, সুপ্ত আত্মার মধ্যে পরম ধনের বিকাশের জন্য যে ব্যাকুলতা এবং লোকে লোকে আপনাকে সর্ব্বহারা করিয়া বিলাইয়া দিবার পরে আনন্দের যে অব্যক্ত বেদনা তাহাই ত ফুল-জীবনের ইতিহাস এবং তাহাই ত ফুলের ব্যথা।

পুষ্প আমি সুপ্ত ছিলাম কুঁড়ির আকারে,
গন্ধ আমার বদ্ধ ছিল বুকের প্রাকারে
এক নিমেষে আজকে মোরে ফুটিয়ে দিল
গো ?—
গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল বায়ুর পাথারে!

* * * *

আমার ধনে বাতাস আজি বিশ্ববিজয়ী
সর্ব্বহারা ব্যথা ফোটে আমার গানে যে

* * * *

গন্ধহারা পুষ্প কভু হাস্‌তে নারে গো
হাসির কাঁদা যেমন কাঁদে তেমন কাঁদে কে!

কবি বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানব মনের মর্ম্মবেদনা ও আনন্দ সম্ভোগের যে সংযোগ অনুভব করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মনোরম।

হৃদয়ের কুসুমের বর্ণ গন্ধ হাসি,
ধরার ফুলের দলে উঠেছে বিকাশি'

* * * *

মনের বসন্তে যদি ফুল নাহি ফোটে।
বনের বসন্ত তবে মিথ্যা হ'য়ে ওঠে॥

তাঁহার 'মুকুল ও পুষ্প', 'পতিতা', 'দুঃসহ', 'শ্রাবণের মেঘ', 'চিঠি', 'সন্ধ্যায়', প্রভৃতি কবিতাগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।

"কালো কোকিল নয়ত কালো
আলোর সবিতা,
সুরের ঝোরা—বসন্তেরই
বুকের কবিতা"

"চিঠির আখর আমার আঁখিতলে—
সে যে তোমার হাসির মতই জ্বলে!
চিঠি তোমার মিথ্যে সে ত নয়
নয় সে কালির হরপ দিয়ে গড়া
তোমার মত কথাও সে যে কয়
মূর্ত্তি নিয়ে দেয় সে মোরে ধরা"

ও কাহার পা'র আল্‌তার ধার
জলে ঐ পড়ে গ'লে
আঁখির বিজুরী থির হ'য়ে হোথা
নাহিতে নেমেছে জলে।
সাদা মেঘখানি যেমন করিয়া
বাতাসে মিলাতে চায়
তেমনি করিয়া মিশে যেতেছিল
রূপ সে তোমারি গায়।
আজি বাতাসের দুরু দুরু বুকে
বিরহ উঠেছে জেগে
ধারায় ধারায় মন জানাজানি,
কানা-কানি মেঘে মেঘে
ধবল পাখার পালক উড়ায়ে
বলাকা দিয়েছে সাড়া
চক্ষুর সাথে চক্ষু জড়ায়ে
পাখীরা আত্মহারা—

প্রভৃতি তাঁহার কবিপ্রাণের চরম নিদর্শন।

'চিঠি' শীর্ষক কবিতায় 'চিঠি'র সহিত 'সেটি'র মিল সুষ্ঠু হয় নাই। 'অবুঝ' কবিতায়—

খসা পাতা তার গলিতেছে
তরু কাঁদিতেছে ধীরে ধীরে

এই কথায় শিশির বিন্দু ধীরে ধীরে পড়িতেছে ইহা প্রকাশ করাই বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য কিন্তু লাইনটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। 'পতিব্রতা' কবিতায় "রায়ের পুকুরটি পাড়ে নিয়ে যাই এঁটো ঘটি বাটিগুলি' এবং 'বসন্তের আগমন' শীর্ষক কবিতায় 'দুখহ দুলাকে' স্থানে যথাক্রমে "রায় পুকুরের পাড়ে" এবং 'দুঃসহ' হইবে।

'সন্ধ্যায়' "ময়দানবের মায়ার মাধুরী আকাশে ভেরেছে রে"; 'শীতের দিনের গান'এ "কুজ্‌টিকায় ধূসর ধোঁয়ায় তফাৎ করে দিয়া;" "কালো মেঘ'এ কি ব্যাথারই বজ্র-গান" প্রভৃতি নিম্নরেখ কথাগুলি ছাড়া আরও দু' একটি মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হয়। কাব্য-সমালোচনার মধ্যে প্রুফ্ সংশোধনের বালাই দেখিয়া কবি অসন্তুষ্ট হইলেও ভবিষ্যতে তাঁহার উপকারে আসিবে।

'দেহের মহিমা', 'বসন্তের আগমন', 'দৃষ্টি', 'আদি নর-নারী', 'চুম্বন', 'আলিঙ্গন', 'নিষ্কলঙ্ক' প্রভৃতি সনেট্‌গুলিতে কবি যে যৌন-তত্ত্বের দুজ্ঞেয় ও জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে নূতন না হইলেও সেগুলিতে কবিপ্রাণের সাহসের পরিচয় আছে। যে সব নীতিবাগীশের দল বিজ্ঞানসম্মত সত্যেও দুর্নীতির ছোঁয়াচ্ আছে বলিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত তাঁহাদের সেই সূক্ষ্ম বিচারের মাপকাটিতে কাব্য সমালোচনা করিতে গেলে সাহিত্য আর্ট ও মানব জীবনের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তাহাকে

অস্বীকার করিতে হয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত সত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন থাকিলেও আমারা যে অসংযম, অশ্লীলতা ও অভব্যতাকে প্রশ্রয় দিব এমন কথা কেহ যেন মনে না করেন। বিষয়টি দুরূহ এবং দুরূহ বলিয়াই ইহা বিশেষ প্রণিধান সাপেক্ষ। যে কোন বিষয়ের গবেষণাই সাধনা। কবি যদি চিত্তের ঔদ্ধত্য ও চঞ্চলতাকে জয় করিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে এবিষয়টী অনুভব করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি সফলকাম হইবেন।

মোটের উপর 'ফুলের ব্যথা' পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং আমরা আশা করি কাব্যামোদী মাত্রেই আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

চরিত্রচিত্র বা সমাজ সেবার আদর্শ

—শ্রীসুনীতিবালা চন্দ বি-এ ও শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি প্রণীত, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ ১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, শ্রীবিভূতি ভুষণ নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের দেশের ও বিদেশের কতিপয় মহাপুরুষ ও মহীয়সী রমণীর অলোকসামান্য জীবন বৃত্তান্তের কথা বিবৃত হইয়াছে। বাংলার সুকুমার মতি বালক বালিকাগণ এই জীবনীগুলি পাঠ করিয়া যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে মহৎ হইবার উচ্চাশা ও আত্মশক্তি অর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত।' মহাপুরুষগণ কোন বিশিষ্ট জাতি, ধর্ম্ম বা দেশের সম্পত্তি নয়, লোকোত্তর চরিত্র মাহাত্ম্যের দ্বারা তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির সাধ্য বস্তু। এই জীবনীগুলি যাহাতে বালক বালিকাগণের মনোজ্ঞ হয় তাহার জন্য শুধু ঘটনার বিবরণ না দিয়া চরিত্রের কোন গুণে কর্ম্ম সাধনার কোন শক্তিবলে হৃদয়ের কোন কোমল বৃত্তির পরিণতির ফলে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আপনাদের জীবনকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্রী ও গ্রন্থকার তাহাই আপনাদের সরল ভাষায় শিশুগণের হৃদয়গ্রাহী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলার ছেলে মেয়েরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া শুধু উপকার পাইবে তাহা নয় তাহাদের কৌতুহলও চরিতার্থ হইবে।

মরীচিকা—শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রণীত (কাব্যগ্রন্থ) ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব হইতে শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত—শক্ত মলাটের উপর লাল খদ্দর মোড়া—মূল্য এক টাকা।

মরীচিকার মধ্যে ভ্রান্তির বিক্ষেপ, তৃষাহত নৈরাশ্যের জ্বালা, মৃত্যুর তীব্র দহন শিখা থাকে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে দেখিলাম যে মরীচিকার মধ্যে এমন শান্ত শীতলতা আছে যাহা দেহ মনকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে, আশার আনন্দে চিত্তকে উৎফুল্ল করে। গ্রন্থকার এই কাব্যগ্রন্থের নাম কেন "মরীচিকা" রাখিলেন জানিনা—বোধ হয় এই পুস্তকে তাঁহার জীবনের বিফল আশা, ব্যর্থ প্রত্যাশা ও প্রেমের ব্যথা ও বেদনার তিক্ত অভিজ্ঞতার তীব্র মর্ম্মোক্তি আছে বলিয়া। কিন্তু আমাদের কাছে এই পুস্তক মরীচিকা নহে—মরূদ্যান।

প্রথমেই চোখে পড়ে কবির সত্যানুরাগ ও সেই সত্যানুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করিবার নির্ভয় চেষ্টা। জোর করা কল্পনা ও ধার করা ভাবের মূলধন লইয়া কারবার ইনি করেন নাই। ইঁহার মনোভাব কল্পনার মুক্ত আকাশে

ভাবা ও ছন্দের দুই সবল স্বাধীন পক্ষ বলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে। এই হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থের সর্ব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা —"ঘুমের ঘোরে"। এই "ঘুমের ঘোরে" "সাতটি ঝোঁকে" কবি এই জগত ও জীবনের বিষয়ে তাঁহার ধারণা ঋজু ভাবায় নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা ও শক্তির অতীত যে শক্তি এই জগতে আমাদের সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ জন্ম মৃত্যুর বিধান করিতেছে সে শক্তি নিয়ম, স্নেহ ও দয়ার বড় ধার ধারে না। আমাদের হাসি কান্নার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কালের পেষনী যন্ত্র ঘুরিতেছে ও চিরকাল ঘুরিবে। এখানে ভাবিবার ও বুঝিবার বিশেষ কিছু নাই আছে দুঃখ সহিবার

"জগৎ একটা হেঁয়ালি
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল
থামখেয়ালি।"

*　　*　　*

সৃষ্টি চমৎকার
ঠোকাঠুকি নাই, গতিবিজ্ঞানে বাঁধা
আছে চারিধার!
সে দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু
ছুটাইলে তুমি ঘোড়া
লোহা বাঁধা তার পদাঘাতে মোর
ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া!
দেখি চলিবার কালে
গতিবিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া
ঠ্যাংই পড়ে খালে।"

আমাদের জীবনে নিত্য এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র সম্মত নহে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার তীব্র চকিত অভ্যুদয়ে আমাদিগকে নিত্য ব্যথিত করে। অনেকে এই দুঃখ ও বেদনায় অনেক "ফিলজফি" সৃষ্টি করিয়া এই অনিয়মের মধ্যে নিয়ম দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিতেছেন:—

"যুগ যুগ ধরে কেন এ প্রয়াস
গরমিলে মিলাইতে।
কোন যম নাই হিসাব করিয়া
সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী,
যার গায়ে যত ধাঁটা
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির
ভোট-হীন অধীনতা,
নিরুপায় হ'য়ে কেহ বলে তোমা পিতা,
কেহ বলে মাতা।
আমি বলি কিনে কুলো—
পিঠে বেঁধে দাও গভীর নিদ্রা দুকানে
গুঁজিয়া তুলো"।

এই নিত্য দুঃখ ও বেদনাকে ভুলিয়া থাকিবার এক মাত্র উপায় কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কাণে তুলো দিয়া ও পিঠে কুলো বাঁধিয়া গভীর নিদ্রা দেওয়া।

"জারি কর তবে খ্যাতি
এ ভব রোগের নব চিকিৎসা আমার
"ঘুমিয়োপ্যাথি"

দুঃখীর প্রয়োজন, ব্যথিতের প্রার্থনা কোন দিনই পূর্ণ হয় না। সূর্য্য আলোক ও আহার দান করেন, জগতে সেইজন্ত তাঁহার নিত্য-জয়-গান ধ্বনিত হয়। তাঁহার উদ্দেশ্যে কবি বলিতেছেন—

তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক
পাইল লোক
শুধাই তোমায়ে কি আলো পেয়েছ
জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি
সাহারার বুকে?

সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি
আন ডালা ভরি'
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে তাঁর অপার
করুণা স্মরি।
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গরু মেরে জুতা দান" অপেক্ষা
নহে কভুবেশী পুণ্য।

অতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক অবতার ও মহাপুরুষ ভগবৎ প্রেরিত বলিয়া আপনাদের প্রচার করিয়া জানাইলেন যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিলে জগতের জরা, ব্যাধি দুঃখ সব চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—

"যেমন জগৎ তেমনি রহিল নড়িলনা
একচুল;
ভগবান চান আমাদের শুভ এ কথা
হইল ভুল!
কি হ'বে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় নাক, একথা
পাগলে বলে!

ভয়ে, দুঃখে, রাগে, এই ভগবানের প্রতি মানুষ আপনার মনোভাব নানাভাবে ব্যক্ত করে এবং মনে করে তাহার এই মর্ম্মোক্তিতে বুঝি বা ভগবান অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু সব ভুল—

অনিমেষ আঁখি পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে
মোদের তরে।
মোরা ভুল করে' প্রণমি তোমায়,
ভুল করে করি রোষ
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ
নাহিক অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে
দিই ফাঁকি!

* * *

সাগরের কূলে পুরী তব দারুমূরতি
জগন্নাথ;
রথের চাকায় লোক পিষে যায়,
তোমার নাহিক হাত!
তুমি শাল গ্রাম শিলা—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান তারে
নিয়ে রাসলীলা!

অধিকাংশ লোক এই কথা বুঝে, মনে মনে স্বীকার করে, কিন্তু ইহাকে অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লজ্জা ও ভয় পায়। তাহারা মহত্বের মিছা ভান করিয়া, অসীমকে সীমায় বাঁধিতে কথার ছলে মৃত্যুকে জিনিতে দুঃখকে দেবতার দান বলিতে চাহে। তাহাদের কবি বলিতেছেন—"এ সবই রঙীন্ কথার বিম্ব।" এই মিথ্যা চেষ্টা ও কৃত্রিম মহত্বের ভাণ দূরে ফেলিয়া চাই নির্ম্মল উলঙ্গ সত্যকে অনুভব ও প্রকাশ করিবার শক্তি ও সাহস। কবি বলিতেছেন—

"কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার
বিলাসিতা?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য দেখাবে দুখের নগ্নমূর্ত্তি খানি!
কালোকে দেখাবে কালো করে আর
বুড়োকে দেখাবে বুড়ো
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ
ফেরানো গুঁড়ো
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবো
তীরের মতন কথা
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্ম ব্যথা?
এ কথা বুঝিব কবে—

ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে
থাকে না ঢেঁকির রবে।"

কেহ কেহ অভিযোগছলে বলিয়াছেন যতীন্দ্রনাথের এই কাব্যগ্রন্থে তেমন সুন্দর, চিত্তহারী প্রশংসাযোগ্য কবিতা বিশেষ কিছু নাই, বরং "ঘুমের ঘোরে" কবিতার মধ্যে যে দুঃখবাদের (Possimisim) সুর আছে তাহা নিন্দনীয়। উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে যতীন্দ্রনাথ বাংলার কাব্য তন্ত্রীতে দুঃখবাদের যে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। কোন এক অদৃশ্য অনধিগম্য অজ্ঞাত জগৎ হইতে যে 'দুজ্ঞেয়' শক্তি আমাদিগকে নিত্য ব্যথিত ও নির্জ্জিত করিতেছে, ভয়ে ও অন্ধ ভক্তির বশে সে শক্তির পদে পূজার অর্ঘ্য দেওয়ার মধ্যে কোন সার্থকতা বা মহত্ব নাই। অনেকে আর্ক ফলা নাড়িয়া, "বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলি" তুলিয়া, গায়ে নামাবলী ঝুলাইয়া, জগতের সমস্ত সুখদুঃখ ভগবানের হাতের দান বলিয়া ভাবে গদগদ হইয়া যান—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আবার তাহাদিগকে ভ্রাতার সহিত অসদ্ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ও প্রতিবেশীর সহিত মোকদ্দমা করিতে দেখা যায়। এইরূপ ভণ্ড সুখবাদী ও ধাপ্পাবাজ ভক্ত অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী অ-ভক্ত সমধিক আদরণীয় ও পূজার্হ। যতীন্দ্র নাথের মহত্ব ইহাই যে তিনি লোকের মুখ চাহিয়া ও পাঠকের নিকট হইতে চাটুবাক্যের আশা করিয়া কবিতা লেখেন নাই। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা কবির অপূর্ব্ব ভাষায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই রবীন্দ্রযুগে অধিকাংশ কবিগণের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোক নাই কিন্তু ছায়াটুকু আছে। যতীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই খানে—তিনি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাব-বিমুক্ত।

কল্পনার মাধুর্য্যে, ভাবের ব্যঞ্জনায়, ভাষার প্রসাদগুণে যতীন্দ্রনাথের কবিতা অতুলনীয়। উল্লিখিত "ঘুমের ঘোরে" কবিতা হইতে দু' এক স্থান উদ্ধৃত করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। কবি তাঁহার সৌভাগ্যের দিনে বন্ধুকে হুকুম করিতেছেন :—

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ, নক্ষত্রের বাতি
রাহুকে বল—সে গিলুক সূর্য্যে না কাটে যেন
এ রাতি।
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার
শিরে,
কণ্ঠের হার রচ গো তাহার তড়িতের তার
ছিঁড়ে।
পূরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচ তাহে রাঙ্গা
বাস।

তাহার পর সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি যে কয়টি লাইন লিখিয়াছেন, জগতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির লেখার সহিত তাহা তুলনীয় হইতে পারে।

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা
ছিলে এতদিন
আমার প্রমোদ ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটা
হীন?
আমার দীপালি রাতি
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন
বাতি!
অশ্রু সাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমলদল
তারি পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণতল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন
ভরি'

যে ছায়া পড়েছে তাহাতে লুকায় কত শোক
বিভাবরী !

ভরেছ আতর-দানি
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল মর্ম্ম নিঙাড়ি'
ছানি' ?

কণ্ঠে দুলালে মিলন মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা
সদ্য-ছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা !"

আলোচনা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে চলিল। তাই আর দু চারিটি খণ্ড কবিতার উল্লেখ করিয়া সমালোচনা শেষ করিব। নূতনত্বের দিক হইতে আর একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কবিতা 'পথের চাকরী"। কবি একজন ইঞ্জিনিয়ার, বৎসরের সমস্ত ঋতুর মধ্য দিয়া কিরূপে তাঁহাকে এই পথের চাকরী বজায় রাখিতে হয় এ কবিতাটিতে কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে বেয়াদা
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁ ধাঁ !

আমি কি করি
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি,
আল পথে টাল রেখে
বেড়াই ইঁদারা দেখে
যোগাই যে চায় তার কলসি দড়ি !"

ছন্দোমাধুর্য্য ও হাস্যরসের সংমিশ্রণে কবিতাটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "বহ্নিস্তুতি" "শিবের গাজন" 'বারনারী' 'মানুষ' 'প্রেমের স্পর্দ্ধা' প্রভৃতি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসল কথা যতীন্দ্রনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। আশা করি বাংলাদেশে তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর হইবে।

বল্লরী ও ঋতুমঙ্গল—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত দুইখানি গীতিকাব্য (কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ ও ॥৵০) সৌন্দর্য্যের যুগল বাহুর মত আসিয়া আমাদের বেষ্টন করিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য সঙ্গীতময় ইঙ্গিতময়।

গীতি কবিতার রচনা ভঙ্গিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একের ছন্দ—সঙ্গীত,—অন্যের ছন্দ—শুধুই ছন্দ। কবি কালিদাস এই উভয় শ্রেণীর রচনাতেই সুপটু—উদাহরণ বসন্তলক্ষ্মী (ঋতুমঙ্গল) ও জিজ্ঞাসা (বল্লরী) কবিতাদ্বয়। ঝঙ্কৃত ও নর্ত্তিত ছন্দের একটা পৃথক সা রে গা মা আছে। সে সুরের কাণ সব সঙ্গীতবিদের ত নাই-ই, সকল গীতি কবিরও নাই। সুর ও যৌবন এ দুই-ই যাদুকর। যৌবন কুৎসিতকে সুন্দরবেশে উপস্থিত করে, সুর অসার কথা-মালা-কেও কাব্য করিয়া তুলিতে চায়। তাই ধ্বন্যাত্মক কবিতার লেখক ও পাঠককে সংযত ও সতর্ক থাকিতে হয়—যেন কাণ প্রাণের সঙ্গে দাগাবাজি না খেলে। 'গীত গোবিন্দ' একদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ের যে জায়গাটা দখল করিয়াছিল, আজ বোধ হয় ঠিক সেই স্থানটা আর তাহার অধিকারে নাই। বিংশ শতাব্দীর পাঠকের সঙ্গীতের তৃষ্ণা বা নেশা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কিন্তু আজ আর তাহাকে শুধু ঝঙ্কারে ভুলাইবার উপায় নাই। শুধু ঝঙ্কারে—কেবল মাত্র অলঙ্কারে আর গীতি কবিতার সাধ মেটে না। তার রসবোধের পরিধি বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু কাণের সুখ আর বিপুল বিচিত্র প্রাণ ধারার তলস্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্যই এযুগের ধ্বন্যাত্মক কাব্য পদাবলীর আদর্শ কবি সুইন বার্ণ (Swin burne)। নবযুগের নবীন আশায়

কৃত্ত, অভিনব আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত পাঠকের জটিল জীবন সমস্যা গুলিকে এই গীতি-কবি বিচিত্র কল্পনা ও ভাবের মধ্যদিয়া সমাধানের পথে লইয়া গিয়াছেন। অথচ কবি বর্ণিত সে জটিল জীবন রহস্য শুধু কাব্য নহে—একটি সুরতান লয়ে গঠিত ছন্দোবন্ধের ইন্দ্রজাল।

নব্য-কবিকুলে কালিদাসের এই "সুইন বরূনী" প্রতিভা আছে। ইঁহার"ও উত্তাল ভাব রাশি আট-ঘাট-বাঁধা নর্ত্তিত ও ঝঙ্কৃত ছন্দের লহরে লহরে মিলিয়া মিশিয়া যায়। কোথাও কষ্ট কল্পনা, শব্দাহরণে চেষ্টার লক্ষণ, ভাবের স্ফীতি, উপমা অনুপ্রাস ও রূপকের বাহুল্য, যুক্তাক্ষরী মিলের অতিরিক্ত প্রয়োগ ঘটে নাই, এ কথা বলিতেছিনা। পরের ঝঙ্কারের মোহ ষোল আনা কাটাইয়া উঠিয়াছেন একথা বলিয়াও "ঋতুমঙ্গলে"র কবিকে বাড়াইতে চাহিনা। তাঁহার নিজস্বের জোরেই তিনি বড়। কিন্তু কবি কেন যে তাঁর রত্ন ভরা সিন্দুকটী সব সময়ে খুলিতে নারাজ তাহা তিনিই জানেন। তাই ঘর ছাড়িয়া পরের দুই চারিটী জিনিসের প্রতি থামকা—তিনি নজর দেন, ও দিন দুপুরেই তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইতে চাহেন। পরের ভাবের ঘরে যে বেমালুম সিধ কাটিতে পারে তার চুরির নামই বাহাদুরী কালিদাসও সে-রকম বাহাদুরী অল্প দেখান নাই। তবে তাঁর পরিপক্ক হস্তের দুর্ব্বলতা মাত্রই অনুপেক্ষনীয় বলিয়া একথা তুলিলাম। যিনি "নারী" "জিজ্ঞাসা" (বল্লরী) ও "রাঙাচুড়ি," "বসন্তলক্ষ্মী" (ঋতুমঙ্গল) প্রভৃতির মূলধনী, কাব্য ব্যবসায়ে তাঁর ঋণগ্রহণ,—হয়—আত্মবিস্মৃতি —না হয় আলস্য। কিন্তু তিনিযে নিছক নিজের মূলধনে কারবার জমাইতে পারেন এবং এক দিন পারিবেনও, তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। নচেৎ বৃথা এ অনুযোগের অপব্যয় করিতাম না।

"বল্লরীর" ছোট খাটো সাদাসিধা কাব্য খণ্ড গুলি পাঠককে প্রকৃতই মোহিত করিয়া দেয়—ঋতুমঙ্গল পড়িতে পড়িতে সম্ভ্রমে হৃদয় ভরিয়া উঠে।

সমগ্র বালিকা প্রাণ চুড়ি সনে খান্‌-খান্‌
(রাঙাচুড়ি)

দাদুরী মুখরা হলো আদরে (ভাদরে)
ব্যাপার দেখে হাস্‌ছে আজি বনের যত
খোকা খুকী (বসন্তে)

ইত্যাদি পদগুলি ভুলিতে পারা যায় না।

কবি কালিদাসের কাব্য পড়িয়া মনে হয় যে, নব্য কাব্যসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় তিনি নিজের নাম সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারিবেন।

কবির স্বপ্ন—শ্রীরাধাচরণ দাস প্রণীত পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।• আনা।

এই একত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী কাব্য সমালোচনার পুস্তিকা খানি পড়িয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। "তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া সরস রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন" ভূমিকাকারের সহিত একমত হইয়া এই কথা স্বীকার করিতে পারিলে বিশেষ আনন্দিত হইতাম কিন্তু পারিলাম না। বরং গ্রন্থকার বিনয় প্রকাশ করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে যে সত্য বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হইতেছে "এটি বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি অমর কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খেয়া কাব্যের অক্ষম সমালোচনা—'বামন হইয়া চাঁদে হাত।"

প্রথমেই গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ কে

বৈতরনীর পাড়ে বসাইয়া শেষ খেয়ার প্রতীক্ষা করাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৈতরনীর তীরে বসিয়া খেয়া কাব্য লিখিয়াছেন, এ সংবাদ আমাদের কাছে নূতন এবং বোধ হয় স্বয়ং কবির নিকটেও নূতন। গ্রন্থকারের মৌলিকতা আছে বটে। ইহার পর খেয়া কাব্যের এক একটি কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। "ফুল ফোটানো" কবিতাটি কবি নাকি বিজ্ঞানের পরাজয় বিবৃত করিবার জন্য লিখিয়াছেন। আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে মনে হয় গ্রন্থকার আর দুচারবার খেয়া কাব্য খানিকে ভাল করিয়া পড়িয়া সমালোচনা লিখিলে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই ভাল হইত।

উপমন্যু—শ্রীবিনয় ভূষণ সরকার। মূল্য দুই আনা। শিশুকাল হইতে আমাদের ছেলেরা গুরু আয়োধ ধৌম্য ও তাঁহার তিন শিষ্য, উপমন্যু আরুণি ও বেদের বিষয় অনেক গল্প পড়িয়া থাকে। উক্ত উপমন্যুর কাহিনী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার "উপমন্যু" নামে এই নাট্য-কাব্য খানি লিখিয়াছেন। বই খানি কাব্য সম্পদে শ্রেষ্ঠ না হইলেও বিষয়গুণে ও রচনা ভঙ্গিতে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বই খানি পড়িলে ছেলেরা বিশেষ আনন্দ পাইবে।

ভাঙ্গাগড়া—শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ প্রণীত ও রায় এণ্ড রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২৪নং [দোতালা] কলেজষ্ট্রীট মার্কেট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার কথা, নারায়ণ ও উপাসনায় গ্রন্থকার যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকার চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক ভাব ও চিন্তার ধারা অবলম্বন করিয়া লেখা হইলেও নিবন্ধ গুলিতে অনেক স্থায়ী সত্যের আভাস আছে। স্থানে স্থানে ভাবের জড়তা ও ভাষার অস্পষ্টতা দোষ না থাকিলে প্রবন্ধ গুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

আষাঢ়ে প্রবাসে

(শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়)

আকুল বরষা সন্ধ্যা ঘেরিয়া আঁধার
ফুটায়েছে সুমহান গৌরবের ছবি,
মেঘের আড়ালে অস্ত গেছে শ্রান্ত রবি,
ঝরিতেছে ঝর ঝর ধারা করুণার,
সম্মুখে বহিছে নদী ভরা বরষার
মেঘের আভাষ ক্ষীণ ধরি বক্ষোপরে,
নীলাভ পাহাড় রেখা দূর পরপারে
কাল মেঘ সাথে মিশি আজি একাকার;
একাকী বসিয়া আমি পর্ব্বত কুটীরে,
বরষা বাতাসে ভাসে মেঘদূত গান,
প্রাণে জাগে বিরহের আভাষ আকুল,
দূর পল্লী অলকার পানে চাহি ফিরে,
মনোমাঝে উঠে ফুটে কার আঁখি ম্লান,
সে যে গো প্রেয়সী ছবি জগতে অতুল।

ত্যাগ

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হ'য়ে পর্য্যন্ত 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হ'য়ে গেল! ইনি এত টাকার ত্যাগী, উনি অত পয়সার ত্যাগী—এই সব নিয়ে নেতাদের দাম ঠিক হ'তে লাগলো! ফাষ্ট ক্লাশ ত্যাগী সেকেণ্ড ক্লাশ ত্যাগী কত প্রকারের ত্যাগী ভাগ করা হ'ল। যাবা জীবনে ভোগের অবসর ছেড়ে ছাত্রজীবনেই সব ঘোচাল, তাদের নাম কেউ জান্‌লো না। অথচ ভিতের ইঁটের মত মাটির নীচে চাপা থেকে তারাই মায়ের মন্দিরের বনিয়াদটুকু গড়ে দিল। যে জীবনে মদ খাওয়ার দিকেই গেল না, বা সরকারী চাক্‌রী অথবা ব্যারিষ্টারী করাকে পাপ মনে ক'রে ওদিকে ঘেঁসলো না—সে বেচারার ত্যাগ করার তো তেমন কিছু নেই। অসামান্য ত্যাগ দেখাতে হ'লে তাকে মদ খাওয়া ধর্‌তে হয়, কিম্বা সরকারী চাক্‌রীতে ঢুকতে হয়—তার পরে একদিন সভার হাততালি আর খবরের কাগজের প্রশংসার মাঝে ঐ সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে হয়!

অমুক ব্যারিষ্টারি ক'রে মাসে ৫০ হাজার টাকা রোজগার কর্‌তেন, কি অমুক নবাবের মত বিলাসিতা কর্‌তেন—তাঁরা সেই সব ছেড়েছেন ব'লে আমাদের একশো বার নমস্য—কিন্তু তবুও বল্‌বো আমরা মনে করি সমাজকে ঠকিয়ে তিনি মাসে ৫০ হাজার টাকা নেওয়ার পথ ত্যাগ করেছেন বলেই তিনি আমাদের নমস্য।

শুধু বাইরের ত্যাগেই সবটা হয় না। পূজোর আগে যেমন ময়লা দূর ক'রে পবিত্র হওয়ার জন্য মানুষ স্নান করে তেমনি কোন একটা কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য ত্যাগ প্রয়োজন। মানুষ বাইরে টাকা রোজগার ছাড়তে পারে, বেশভূষা ছাড়তে পারে—কিন্তু মনের ভিতরকার অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছাড়তে সহজে পারে না। জুতো পায়ে দেওয়া ছাড়লেই যে সুখটা কম হ'ল তা নয়—বাইরে-দেখানো ভাব এর ভিতর থাক্‌তে পারে। জুতো পায়ে দিয়ে একজনের যে সুখটুকু হয়, জুতো ছেড়ে দিয়ে আর এক জনের হয় ত ঠিক ততটুকুই সুখ হয়। এ ত্যাগের মূলে রয়েছে সেই ভোগ—কেবল একটু সূক্ষ্ম-মাত্রায়। অনেক সময় অভ্যাসের বশে এ ত্যাগ ভোগের কোনটাই উপলব্ধি করে না—জুতো পায়ে না দেওয়াটাই যার জন্ম হ'তে অভ্যাস তার কাছে জিনিষটার প্রয়োজনই বোধ হয় না—বরঞ্চ কষ্ট ক'রে জুতো পায়ে দেওয়া অভ্যাস করাই তার পক্ষে ত্যাগ।

আমাদের দেশে এই ভাবের ত্যাগ প্রয়োজন। চাইলেও যে ভোগের সামগ্রী পায় না, তার কাছ ত্যাগ একটা কপালের দুগ্র্হ—ভোগই তার মুক্তির একমাত্র পন্থা আমাদের দেশের অধিকাংশের বেলায় এই কথা খাটে। সেই জন্য যে কাজের প্রোগ্রামে চুপ ক'রে থাকা, স'য়ে থাকা কিম্বা ব'সে

থাকার কথা আছে, সে প্রোগ্রাম আমাদের জাতির পক্ষে মনের মত হলেও ঘোরতর অনিষ্ট করে। ভারতের যখন সুখের ঐশ্বর্য্যের দিন ছিল—তখন সে অনাসক্ত ভোগের পথে বড় হয়ে ছিল। বেদের প্রতিছত্রে জীবনের আনন্দ ভোগ রয়েছে—হিন্দুর দশ অবতারের অধিকাংশই রাজসিক ক্ষত্রিয়—জনক ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেষ্টা—শুকদেবের নপুংসক আদর্শ তখনও ভারতের জীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করেনি, তাই ভারত চারি দিক দিয়ে এত বড় হ'তে পেরেছিল—তাই ঐশ্বর্য্যের পথে ভোগী ভারত যোগী হ'তে শিখেছিল।

কিন্তু এখন হ'য়েছে আমাদের ভিক্ষুকের একাদশী পালন। ঘরে যার চা'ল নেই—তার তো গতিকেই একাদশী। তার ধর্ম্ম-নিষ্ঠার বাহাদুরি দিয়ে লাভটা কি? তাকে উপোষ করা শেখালে সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু সেটা ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনে সস্তা ত্যাগের আদর্শ বড় বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু নিজে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিলেই যদি দেশ উদ্ধার হ'ত তা হ'লে আমাদের দেশে এত লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, প্লেগে কত যন্ত্রণা পেয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে মরছে—তবু স্বাধীনতা আসে না কেন? যদি ত্যাগেই সবখানি হ'ত তাহ'লে কংগ্রেসের নেতারা যাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে এখন ফকির হয়েছেন এবং যাঁদের ত্যাগ করবার আর কিছু নেই বল্‌লেই হয়, তাঁদের পাগুলো কেটে ফেললে কি দেশ স্বাধীন হবে?

শুধু ত্যাগ নয় ত্যাগের পরও মানুষের অনেক কিছু অনুশীলন করবার আছে, ভগ-বদ্দত্ত সেই সমস্ত বৃত্তির অভাব হলে বা সে-গুলিকে জাগ্রত না করতে পারলে আমাদের মুক্তি নেই। নীতিবুদ্ধি চাই, সংঘচালনার ক্ষমতা চাই, দেশ কাল পাত্র অনুসারে ভবিষ্যতের দৃষ্টি নিয়ে আন্দোলনকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা চাই—এমন শক্তিমান পুরুষ আমাদের মুক্তি আনতে পারবেন। ত্যাগ শুধু পূজার আয়োজনে শুদ্ধিমাত্র দিতে পারে—সিদ্ধি দিতে পারে না। তাই ছাড়ার আদর্শে মুক্তি নাই—মুক্তি গ্রহণের ভিতর অনাসক্ত ভাবের মধ্য দিয়েই আসতে পারে—অন্যথা নয়।

"শঙ্খ" শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।